শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী নিঝুম রাত ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বিচার

বড় অফিসার — অধীনস্থকে ডিস্‌মিস্ করিবার পর বদলী স্থান হইতে পুরাতন পদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তোমার প্রমোশন হোলো … কোন্ বেলিকে এমন কীর্তিটি করলে?

বিনাদোষে দণ্ডিত — ইতিমধ্যে নিরপেক্ষ বিচারে পুনরায় বাহাল হইয়া পদমর্যাদায় Dismissing authority-র নাগালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সাধু-সংসর্গ স্যর!

শিল্পী : দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

তাহাদিগের বিবিধ প্রণালীর কবরীবন্ধন, কুরুবক ও লোধ্র-কুসুমের গুচ্ছ কবরীর শ্রী ও হ্রী বর্দ্ধন করিত। মুখমণ্ডলের কমনীয়তা ও শোভা বাড়াইবার জন্য নানারূপ অনুলেপন ও তৈল এই কাজে ব্যবহৃত হইত। কালীয়ক, মনঃশিলা, হরিচন্দন, হিঙ্গুল, বকুল, প্রিয়ঙ্গু, মৃগনাভিচূর্ণ, কুমকুম, চন্দন নির্য্যাস ও চূর্ণক এবং নানাবিধ ঔষধি রস ও তৈল সাহায্যে এই অনুলেপন প্রস্তুত হইত। গুপ্তযুগে সাধারণ-ভাবে এই সকল অঙ্গরাগকে 'মুখ প্রসাধন' বলা হইত এবং প্রসাধন কার্য্যে নিযুক্ত কর্মীকে 'প্রসাধক' ও 'প্রসাধিকা' বলা হইত। চক্ষুদ্বয়কে সুন্দর দেখাইবার জন্য শলাকা সাহায্যে অঞ্জন ব্যবহার, ভ্রূযুগলকে বেশ লম্বা ও ঋজু দেখাইতে পারিলে অক্ষিযুগলকে যে ভাসা-ভাসা পটলচেরা দেখা যায় এই জ্ঞান তখন অজ্ঞাত ছিল না এবং এই সকল বৈশিষ্ট্যের (টেক্‌নিকের) জন্য নানাবিধ মলম ও কজ্জলী ব্যবহৃত হইত, গণ্ডদ্বয় মাংসল ও রঙ্গীণ দেখাইবার জন্য যে অঙ্গরাগ ব্যবহৃত হইত তাহাকে 'বিশেষক' বলা হইত। গণ্ডদেশে ও ললাটে নানাবিধ পত্রের অনুলেখন পরিচিহ্নিত করিবার রীতি জানা ছিল এবং ওষ্ঠদ্বয় অলক্তকে রঙ্গীণ করা হইত। জাফরাণ, গুরুগুরু, গোরচনা ও লোধ্ররেণু সাহায্যে মুখমণ্ডলের জন্য মুখ-প্রসাধন, লেপনী, তৈয়ার হইত। সুন্দরী নারীর শুভ্র বক্ষদেশে যে লেপনী ব্যবহৃত হইত তাহা চন্দন নির্য্যাসে সুরভিত ও জাফরাণ রংএ রঞ্জিত হইত। লেপনী ব্যতীত চন্দনচূর্ণও ব্যবহৃত হইত। প্রিয়জনের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য সুকোমল নিটোল বাহুদ্বয় চন্দন লেপনীতে সুশোভিত ও সুরভিত করা হইত। পদদ্বয় লাক্ষারসে লাল টুকটুকে দেখাইত।

মহাকবি বাণভট্ট মহারাজ হর্ষের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর পরিণয়োপলক্ষে যে সকল অঙ্গরাগের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহা তৎকালীন রাজরাজড়াদের যুগে যে প্রশস্ত পদ্ধতি ছিল—তাহার উল্লেখ অসঙ্গত মনে হয় না। রাজ্যশ্রীর বিবাহোৎসবে অঙ্গরাগ তৈয়ারী হইতে বাসরসজ্জা ও প্রসাধন ক্রিয়া পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজবধূদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছিল, এই উপলক্ষে জাফরাণী গন্ধে ভরপূর ঘনীকৃত কল্পসনাম্বুতে মুখ লেপনী প্রস্তুত হইয়াছিল। বোকুল ফুল ও লবঙ্গ কুঁড়ির মালিকায় শুভ্র কর্পূর স্ফটিক রাজকুমারীর গলদেশ বিভূষিত করিয়াছিল। ললাটে ও গণ্ডদেশে চন্দনপত্র লেখনী ও ভালে মৃগনাভিচূর্ণের সুবাসিত তিলকবিন্দু ও পদযুগল লাক্ষারসে রঞ্জিত হইয়াছিল।

জন্মোৎসবের সময় যে সকল প্রসাধন ও অঙ্গরাগ ব্যবহৃত হইত মহাকবি বাণের লেখনীতে তাহাও অমরত্বলাভ করিয়াছে। শ্রীহর্ষের জন্মোৎসব বিবরণীতে বলা হইয়াছে মাঙ্গলিক হস্তে রাজললনা ও সম্রান্ত বধূরা সম্রাট প্রভাকর-বর্দ্ধনের প্রাসাদে যাইতেছেন—তাঁহাদের পশ্চাতে ভৃত্যের হস্তে চামর, মাল্য ও স্নানীয় সম্ভারপূর্ণ পেটিকা, পুষ্পডালায় কর্পূরখণ্ডক, গজদন্ত নির্ম্মিত রত্নাভরণের বাক্স, পারিজাতের সুগন্ধি, শম্বুকখোলক পরিপূর্ণ আম্রতৈল রজত পাত্রে চলিয়াছে। ইহার পশ্চাতে আছে গুবাকস্তূপ ও বীটকের শোভাযাত্রা, আম্রশাখাবৃন্তে চতুর্দ্দিক সুসজ্জিত। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও এইরূপ উৎসবমুখর গৃহ এবং সাজ-সজ্জা আজও শ্লাঘ্য।

কালিদাস ও বাণের যুগে লাক্ষারসের প্রচুর ব্যবহার ছিল। অঙ্গরাগ ব্যতীত রূপসৃষ্টিতে ও সাজসজ্জায় দক্ষতা দেখাইতে তুলিকাকার সর্ব্বদা লাক্ষা, জাফরাণ ও কুমকুম হাতের কাছে রাখিতেন।

মহারাজ হর্ষ রাজসম্মান হিসাবে বৈদেশিক কিম্বা রাজ্য দূতদিগকে শুভ্র বস্ত্রবেষ্টিত নারিকেল পাত্রে চন্দনচূর্ণক উপহার দিতেন। রাজন্যদিগকে জাফরাণ মিশ্রিত পান সুপারী দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত। রাজা হর্ষ পানের রঙ্গে ঠোঁট রাঙ্গা রাখিতেন। পানবহনকারী ভৃত্যকে সরকারী আখ্যায় 'পাটলধরা' বলা হইত। অতিরিক্ত পান খাওয়ায় দাঁত রঙ্গীণ হইয়া যাইত বলিয়া য়ুয়ান সিয়ান রাজা-রাজড়াদের দাঁত রঙ্গীণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অজন্তা গুহায় সখী-পরিবৃতা প্রসাধনে-ব্যাপৃতা বহু চিত্র আছে। দক্ষিণহস্তে গণ্ডদেশ ও কপোলে লেপনী দেওয়ার কালে বামহস্তের আরসীতে মুখ দেখিতেছে এইরূপ চিত্রও অজন্তা গুহায় আছে। হয়তো ওষ্ঠ, করকমল এবং পদদ্বয়ের গোড়ালী অলক্তক রঞ্জিত ছিল—কালের অমোঘ বিধানে রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কালিদাসের কাব্যে বর্ণিত প্রসাধনরতা সম্রান্ত মহিলার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা পেটিকা হস্তে পরিচারিকা, কিম্বা ব্যজনরতা কুব্জদেহ ভৃত্য দণ্ডায়মান, সকলের চোখেই অঞ্জন দেওয়া, কজ্জলীতে ভ্রূযুগল বেশ টানা টানা, চুড়ি পরিধান করিতেছেন এইরূপ

চিত্রও অনেক আছে। গুপ্তযুগের সাহিত্য হইতে আরও জানা যায় যে প্রাসাদের অন্তঃপুরে বোবা, বিকৃতদেহ, নপুংসক পুরুষ ও কুঁজোর দল প্রসাধকের কার্য্যে নিযুক্ত হইত। বহু রাজবংশের উত্থান পতনের কাহিনীর সহিত এইরূপ দুই একজন কুঁজো কিম্বা নপুংসকের নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

মহিলাদের ন্যায় পুরুষেরাও প্রসাধন-প্রিয় ছিলেন। ব্যাৎসায়ন তাঁহার সমসাময়িক পুরুষদের প্রসাধন সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। এখনকার ন্যায় সাবান তখন সুলভ ছিল না, হয়তো বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহৃত সাবানের ব্যবহার তখন অপ্রচলিত ছিল ; কিন্তু ব্যাৎসায়নে "ফেনক।" কথার উল্লেখ আছে। আরও জানা যায় যে ক্ষৌরকার্য্যের পূর্ব্বে 'ফেনকা' ব্যবহার তখন প্রচলিত ছিল। ক্ষৌরকার্য্যের পরেই স্নান করা বিধি ছিল এবং স্নানান্তে মহিলাদের ন্যায় বাহুদ্বয় চন্দনচর্চ্চিত করা হইত, তদন্তর ক্ষৌমবস্ত্র ও অগুরু গন্ধে সুরভিত মাল্য পরিধান করিতেন। মাল্য মস্তকে কিম্বা গলদেশে আপন খুসীমত ব্যবহৃত হইত। চোখে সুরমা ও কজ্জলী এবং ওষ্ঠে অলক্তক দেওয়া হইত। সৌগন্ধ পেটিকায় পছন্দ মত সুগন্ধি কাছেই থাকিত। সুগন্ধি তাম্বুল ও তাম্রকুট সেবন প্রচলিত ছিল। মুখ-গহ্বরের বায়ু সুরভিত রাখিবার জন্য সুগন্ধি মসলা ও তাম্বুল 'মুখবাস' হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

গুপ্তযুগের পরে ভারতীয় প্রসাধনের অগ্রগতি সম্ভবতঃ শ্লথ হইয়া পড়ে। ভারতীয় সংস্কৃতির বন্ধ্যাত্ব ইহার পরে প্রতীয়মান হয়। বৈদেশিক প্লাবন ও অন্তর্দেশীয় মাৎস্য-ন্যায় উভয় কারণেই ভারতীয় সভ্যতায় কূর্ম্মবৃত্তি প্রসার লাভ করে। এমন কি ইসলাম বিজয়ের দুইশত বৎসরের মধ্যে ভারত ভূখণ্ডে উল্লেখযোগ্য মনীষার উদ্ভব হয় নাই। জেতা ও বিজেতাদের মধ্যে ধীরে ধীরে মন জানাজানি আরম্ভ হয়। এই সমঝোতার পরিণতিতে এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়। সমন্বয়ের মৃত্যুকর স্পর্শে মূক ও স্তব্ধ সংস্কৃতি পুনরায় ভারত গগন মুখরিত করিয়া তোলে। সঙ্গে সঙ্গে তাল ঠুকিয়া প্রসাধন ও অঙ্গরাগ শিল্পের বৈচিত্র্য সুরু হয়। আরব, ইরাণ ও হিন্দের ত্রিমুখী ধারায় স্নাত হইয়া শিল্প সম্ভারে বিবিধ কলার জয়যাত্রা আগাইয়া চলে।

আধুনিক প্রসাধনের জন্মলাভ প্রায় এই সময়। ভারতীয় পূর্ব্বগগনে এই নবীন রবির উদয় নিছক ভারতের আকাশেই নিরুদ্ধ থাকে নাই, পঞ্চনদের সীমানা ছাড়াইয়া ইরাণের গুলবাগ ধরিয়া মরুভূমির তপ্ত ধূলি শান্ত করিয়া গ্রীসের থার্ম্মপলির অপর পারে রোমক সাম্রাজ্যও রবিকর-স্পর্শ লাভ করে। ভারতীয় জ্ঞান ও দর্শনের সহিত ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষবিজ্ঞানের ঢেউ সে দেশে আসিয়া পৌছায়। নূতন দেশে নূতনের সংস্পর্শে আসিয়া জ্ঞান নির্ঝরের স্বপ্ন টুটিয়া গিয়া অঝোর ঝোরা প্রবহমান হয়, ভারতীয় 'এলকেমীর' জীয়ন্ত কাঠির সংস্পর্শে আসিয়া আরবীয় 'এলকেমী'র ঘুমন্ত পুরীতে সাড়া পড়িয়া যায়। বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতের ফলে বীজগণিত, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, কিমিতি এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে অপূর্ব্ব উন্নতি আরম্ভ হয়। সুকুমার-শিল্প ও কলাবিভাগে প্রভূত উন্নতি হয়, নানাবিধ পুষ্পের আতর, ফুলেল তৈল, ঔষধি চূর্ণক ও মলম এবং সাবান শিল্পের প্রসার লাভ ঘটে। দেশ বিদেশের এই কাহিনীই এখন বলা যাউক।

আধুনিক প্রসাধনের মধ্যে সাবান ও সাবান জাতীয় শিল্পই প্রধান অংশ দখল করিয়াছে। সাবান কথাটী কিন্তু বিদেশী, সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ স্যাভন (Savon) শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতে ও ভারত সমুদ্রের দুইধারে স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ বণিকদের ব্যবসার ও সমৃদ্ধির কথা সকলেই জানেন ; ব্যবসায় আদান-প্রদানের সূত্র ধরিয়া সংস্কৃতির আদানপ্রদান হয়। এই সমঝোতার পথেই বহু বিচিত্র আচার-ব্যবহার ও শব্দ সম্ভার উভয় ভাষার সম্পদ বাড়ায়। সাবান জাতীয় দ্রব্য আমাদের একেবারে অজ্ঞাত ছিল না, পূর্ব্বেই বাৎসায়নের গ্রন্থে 'ফেনকা' ব্যবহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আধুনিক 'রিটা' জাতীয় দ্রব্যের ন্যায় নানা রকম উদ্ভিজ্জ ফলের রস, বিবিধ ক্ষারজ মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জক্ষার বস্ত্রপ্রক্ষালনে ব্যবহৃত হইত। আজকাল যেমন গায়ে মাখা সাবান সর্ব্বত্র অজস্র পাওয়া যায় সেরূপ কিছু ছিল বলিয়া জানা যায় না। বড় বড় পরিবারে দুগ্ধ নবনীত ও ব্যসমের সাহায্যে গাত্র মার্জ্জনা করা হইত। সাজি মাটীর ন্যায় ক্ষারজ মৃত্তিকা, তিলক প্রভৃতিও গাত্র পরিষ্কারে ব্যবহৃত হইত। কাপড় কাচা সাবান তৈয়ার সম্ভবতঃ মুস্লিম আগমনের পরেই আরম্ভ

হয়। ভারতের বাহিরেও সাবান তৈয়ারী ঠিক কবে আরম্ভ হয় সঠিক বলা মুস্কিল, তবে আব্বাসীয় সুলতানের সময় দামাস্কস নগরী সাবান তৈয়ারীর প্রধান কেন্দ্র ছিল। পারস্য দেশীয় চিকিৎসক আবু মনসুর (৯৭০ খৃঃ) তাঁহার পুস্তকে সাবানের প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারই পুস্তকে নাকি লিখিত আছে যে ঐ সময়ে ভারতের ভেরা বন্দরে প্রচুর সাবান পাওয়া যাইত।

মিশর-দেশীয় ফিনিসিয়ান বণিকদের সহায়তায় য়ুরোপে সাবান প্রথম প্রবেশ করে, অথচ আধুনিক যুগের গায়ে-মাথা সাবান উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপের দান। এখন জানা যায়, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে য়ুরোপে সাবান তৈয়ারী হইত। চর্ব্বি ও উদ্ভিজ্জ ছাই একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া এই সাবান তৈয়ারী হইত। প্লিনির 'Historia Naturalis' এ চর্বি ও বার্চকাঠের ছাই দিয়ে 'Sapo' তৈয়ারীর বিধি লিখিত আছে, নিশ্চয়ই কাপড় কাচা কিম্বা গায়ে মাথার জন্য ঐ স্যাপো ব্যবহৃত হইত না, কতকটা পমেড ও ক্রীম হিসাবে কিম্বা ঔষধের সহিত মিশাইয়া মলম তৈয়ারীর জন্য 'স্যাপো' ব্যবহৃত হইত। ধীরে ধীরে ঔষধের নির্দ্দিষ্ট সীমানা ও তালিকা হইতে মানুষের ব্যবহারিক জীবনেও ইহার যে চাহিদা আছে তাহা ক্রমে অনুভূত হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে য়ুরোপের বহু জায়গায় সাবান তৈয়ারী হইতেছে দেখা যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সেভিল, ভেনিস ও মার্সাইলস্ নগরী সাবান তৈয়ারীর কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু এই সময় সাবান শিল্পের নূতন বিপদ ঘনাইয়া আসে।

খ্রীষ্টীয়ান পাদরীরা অনেকেই ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার সময় সাবানের উল্লেখ করিয়া বলেন, সাবান যেমন বাহিরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেহ নির্ম্মল রাখে তেমনই প্রায়শ্চিত্ত, স্বীকার ও অনুশোচনা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। এই তুলনামূলক ইঙ্গিতের অনুসরণ করিতে গিয়া ইতালী দেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে সাবানশিল্প ধর্ম্মমণ্ডলীর অনুশাসনে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। রোমক সাম্রাজ্য ও রোমের ধর্ম্মাচার্য্য তখন য়ুরোপের ধর্ম্মগুরু, কাজেই য়ুরোপের সর্ব্বত্র সাবানশিল্প ধর্ম্মীয় দলগত শিল্পে পরিণত হয়। লুথারের অভ্যুত্থানের সহিত য়ুরোপ আত্মার স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সাবান শিল্প যে নিছক দৈহিক পরিশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন এই স্বীকৃতি সাধারণ্যে গৃহীত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাজকীয় স্বেচ্ছাচারতন্ত্র এবং উচ্চহারে শুল্ক-গ্রহণ প্রথা এই সময়ে উঠিয়া যায়। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসন-বিধি অমান্য করিবার অপরাধে একমাত্র ইংলণ্ডেই ১৬ জন সাবানশিল্পীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইয়াছিল, বহু আন্দোলনের ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজঅনুকম্পায় ব্যক্তিগত স্বাধীন ব্যবসায়ের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হয় এবং আবগারী শুল্ক হ্রাস করা হয়। হলাণ্ডের আইন ছিল আরও অদ্ভুত। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট তৈল কিম্বা চর্বি দ্বারা সাবান প্রস্তুত নিষিদ্ধ ছিল, সরকারের ধারণা ছিল অবিশুদ্ধ চর্বিতে চর্ম্মরোগ হয়। এই সময় য়ুরোপের অনেক স্থানে তুর্কী দেশীয় স্নানাগার আন্দোলন আরম্ভ হয়। শৈত্যপ্রধান দেশে আমাদের মত প্রতিদিন স্নানের রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু চর্ম্মরোগ নিবারণের জন্য সে দেশের মনীষিরা স্নানের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং স্নানাগার আন্দোলন সাধারণ্যে প্রাবল্য লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে সাবান শিল্পের উন্নতিও আরম্ভ হয়। সাবান ব্যবহার যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিমাপক এই তথ্যও প্রসার লাভ করে। জার্মান রাসায়নিক জুষ্টুস বন্ লাইবিগ (Justice Von Liebig) ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুস্তকে 'Chemiche Brief' এ লিখেন যে দুই দেশের সমসংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে যে দেশে সাবানের খরচ বেশী সেই দেশই বেশী অগ্রগামী এবং সভ্যতা হিসাবে বেশী অগ্রসর। এই কারণে আমেরিকা আজ সবচেয়ে সভ্য। যেখানে প্রত্যেক আমেরিকান গড়ে প্রতিবৎসরে ২৪ পাঃ সাবান খরচ করে যেখানে ইংরাজ করে ১৪ পাঃ এবং ভারতীয় করে ১ পাঃ এর কম মাত্র। ভারত এমনই অনগ্রসর ও দরিদ্র! তবে ভারতের পক্ষে এইটুকু বলিবার আছে যে দৈনিক স্নান এখানে বিলাস নহে, পরন্তু ভারতের মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্যের জন্য দৈনিক স্নান একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে স্নানাদি আচমন শাস্ত্রীয় বিধির অন্তর্গত এবং একান্ত করণীয়।

শিল্প হিসাবে সাবান ও সুগন্ধি আজ অতুলনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। দৈহিক পরিশুদ্ধি ও মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য সুগন্ধি দ্রব্যের স্থান সমাজের সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। শিল্প হিসাবে সাবানের এই অগ্রগতির

পশ্চাতে বিজ্ঞানের অবদান অবশ্য স্বীকার্য্য। মূল উদ্ভিজ্জ সুগন্ধি সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে ছিল বলিয়া পুরাকালে একমাত্র বিলাসী ধনিকদের মনোবিকলনেই ইহা ব্যবহৃত হইত। পরিবর্ত্ত রাসায়নিক সুগন্ধির আবিষ্কার এবং সংশ্লেষণ জ্ঞানের উন্নতি আজ শিল্প হিসাবে সুলভ এবং প্রত্যেক শ্রেণীর নরনারীর তহবিলের অনুকূল হওয়ার সাবান ও সুগন্ধি আজ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানুষ সৌন্দর্য্যব্যাকুল। দৈনন্দিন আচার ব্যবহার এবং খাদ্যতালিকার দিকে একটু নজর দিলেই আমরা বুঝিতে পারিব সাধারণের অলক্ষিতে দেশ, কাল, রুচি বিভেদে এই সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জীবনধারায় কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমাদের বাংলা দেশের নগরবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালীই ধরুন; দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত মধ্যবিত্ত জনসাধারণের রুচি ও নীতির মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধ তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে। সহরে স্থানাভাব, উপযুক্ত সুবিমল বাতাসেরও অভাব, তাই মানুষ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই সম্ভব হইলে খোলা মাঠে অথবা বাড়ীর খোলা ছাদে, কিম্বা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া গত রজনীর অবসাদগ্রস্ত তন্দ্রার উপরে প্রকৃতির মৃদু প্রলেপ পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করে। হয়তো দন্ত মঞ্জনের সাথে সাথে তাহার এই প্রাতঃক্রিয়া সমাপ্ত হয়। তারপরে অবস্থা ও রুচি অনুযায়ী ‘চা’ কিম্বা এক পেয়ালা কফি পানের সহিত দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ, তদন্তর সুগন্ধি সাবানের সাহায্যে ক্ষৌর ক্রিয়া সমাপন, সুবাসিত তৈল অভাবে সরিষার তৈলের মৃদু গন্ধে গাত্র মর্দন করিয়া সাবান সহযোগে স্নান সমাপন। সকল সাবানই গাত্র পরিশুদ্ধ করে—ইহা জানা থাকা সত্ত্বেও সুরভিত সাবানই লোকে কামনা করে। স্নানান্তে রুচি অনুযায়ী দেহবিন্যাস করাই প্রথা। নিতান্ত দরিদ্র এবং গ্রামবাসী হইলেও উখু মাথায় স্নান অশাস্ত্রীয়। অন্ততঃপক্ষে এক পলা সরিষা তৈল সকলে আশা করে এবং স্নানান্তে তিলক ভূষিত হওয়া গ্রামদেশেও বিলাসিতা নহে বরং বৈষ্ণবের ঘরে ইহা করণীয়। আহারের সময় দেখুন—ব্যঞ্জন প্রস্তুতে কাঁচা লঙ্কা, হরিদ্রা, তেজপত্র, মসলা ও ঘৃত এই সকল সামান্য হইলেও প্রয়োজন। ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃত হইলে বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে খুবই আরাম ও আনন্দবোধ করে। এই সকলের পশ্চাতে অলক্ষিতে কি সুগন্ধির হস্ত কৌশল নাই? তণ্ডুল যদি সুগন্ধ হয় তবে নিশ্চয়ই তাহার স্বাদুতা কত বাড়িয়া যায়, খাদ্যগুণ না বাড়িলেও তৃপ্তির সহিত আহার সমাধি হয়, পাকস্থলীর ক্রিয়াও নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। কণ্ট্রোলের দিনে ‘কাঁকরমনি’ চাউল খাইয়া একথা নিশ্চয়ই সকলে হাড়ে হাড়ে স্বীকার করিবেন। খারাপ, আঁকাড়া ও দুর্গন্ধ চাউলের খাদ্যগুণ যতই থাকুক, সংস্করণ অমাত্য যতই কেন এই আঁকাড়া চাউলের মহিমা ব্যাখ্যা করুন, প্রতিগৃহে চিকিৎসক ও বৈদ্যের গতায়াতের যদি কোনও হিসাব সংখ্যাবিদ্‌রা রাখিতেন তবেই বলিতে পারিতেন প্রয়োজনের তাগিদ থাকিলেও মানুষের মনের উপরে স্বেচ্ছাচার চালান যায় না। মানসিক তৃপ্তির উপরে হজম ক্রিয়া কত নির্ভরশীল! গ্রামের চাষী দিনান্তে পরিশ্রমের পরে সুসিদ্ধ ভাত, কাঁচা লঙ্কা ও পাতলা মসুর ডাল পাইয়া কত তৃপ্ত, তাহার মাংসপেসী কোন আখড়ায় মহড়া দিয়া বাড়ে নাই। কাঁচা মুগ ডালের আস্বাদ স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর—কিন্তু ভাজিলে সুরভি বাড়ে, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিম্বা হিতকর তাহা কেহ বিবেচনা করে না। এই সুরভিই আসল কথা এবং সাধারণ রাঁধুনী ইহা জানে। আমরা বাংলা দেশের লোক সরিষার তৈলে প্রস্তুত ব্যঞ্জন পছন্দ করি, গব্যঘৃতের প্রক্ষেপ পড়িলে রসনা যে আরও বেশী তৃপ্তি পায় তাহাও সকলের জানা। আবার দেখুন হিং এর গন্ধ যিনি সহ্য করিতে পারেন না তিনি চা' 'এর সময় হিং এর কচুরী বেশ সাগ্রহেই হাত বাড়াইয়া লইয়া থাকেন। পিঁয়াজ পলাণ্ডু না হইলে যাঁহার আহারে তৃপ্তি হয় না, হিং এর গন্ধ তাঁহার নিকটে অপাংক্তেয়, উল্টোটাও ঠিক তেমনই সত্য। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন অনেক গন্ধসার আছে যাহার গন্ধ বমন উদ্রেক করে, কিন্তু সুরাসার সহযোগে পাতলা করিলে সুগন্ধের কারণ হয়, খাদ্য প্রস্তুতেও তেমনি এই কথা খাটে। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, শশা, ফুটি, তরমুজ, তাল, বাতাপী নেবু প্রভৃতি ঋতু বিশেষে, প্রয়োজন বোধে কত তৃপ্তির কারণ হয় এবং আমাদের অসীম সৌভাগ্যে সামান্য আয়াসে প্রচুর পরিমাণে এই সকল ফলমূল হাতের কাছে পাইয়া থাকি। এই তৃপ্তি কি কেবলমাত্র খাদ্যগুণের উপর নির্ভরশীল—নিশ্চয়ই নহে? ঋতু বিশেষে বিভিন্ন সুঘ্রাণ রসনাতৃপ্তিকর। প্রভাতে, সন্ধ্যায়—বেল, চামেলী, গন্ধরাজ, বনফুল, হেনা, কিম্বা ধূপের গন্ধে বিমোহিত হই, বিশ্রাম কক্ষ সুরভিত হয়। এইরূপভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে অলক্ষিতে সুগন্ধি আমাদের জীবনে কতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমাদের পক্ষে যাহা সত্য, সর্ব্বকালে, সর্ব্বযুগে, সকল দেশেই মানুষের নিকটে কি তাহাই চরম সত্য নহে?

হিরোইন

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকগুলি নবীনা অভিনেত্রী সোমনাথকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। নব-বসন্তে যেমন প্রজাপতির ঝাঁক আসিয়া প্রস্ফুটিত গোলাপকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্যোৎসব সুরু করিয়া দেয়, গন্ধে বিহ্বল হইয়া কেবল উড়িয়া উড়িয়া ফুলকে প্রদক্ষিণ করে, তেমনি এই তরুণীগুলি সোমনাথকে কেন্দ্র করিয়া বসন্তোৎসবের সমারোহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

অন্যায় করে নাই; কারণ আজ বসন্তোৎসব—হোলি। এই মেয়ে-গুলির দেহে যেমন যৌবনের মদশ্রী, মনেও তেমনি অফুরন্ত রঙ্গরস। সকলে সুন্দরী নয়, কিন্তু সকলেরই অন্তরে রসোল্লাসের মাদকতা তাহাদের কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। আজ তাহারা একযোট হইয়া, রঙ ও আবীরের হাতিয়ারে সজ্জিত হইয়া সোমনাথের অফিস আক্রমণ করিয়াছিল এবং সোমনাথকে একাকী পাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া দিয়াছিল। হাসির লহর, পিচকারির তরল বর্ণ-স্ফুরণ, আবীর গুলালের চূর্ণোচ্ছ্বাস চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে রঙীণ তরঙ্গ তুলিয়াছিল।

সোমনাথ এখন সিনেমা রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট; সকলেই তাহাকে চেনে, সকলেই তাহাকে সম্ভ্রম করে। এই মেয়েগুলির সহিত কর্ম্মসূত্রে সোমনাথের পরিচয় আছে; প্রত্যেকটি মনে মনে তাহার প্রতি প্রীতিমতী। তাই আজ হোলির সূত্র ধরিয়া তাহারা তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রীতির ঝারি উজাড় করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

অন্যের প্রীতি নিজের মনেও প্রীতির সঞ্চার করে। মেয়েরা চলিয়া গেলে সোমনাথ ভিজা কাপড়চোপড় পরিয়াই বসিয়া রহিল এবং স্মিত-মুখে তাহাদের কথা ভাবিতে লাগিল। ইহারা কেহ শ্যামলী কেহ গৌরী; কেহ প্রগল্ভা, কেহ বা ঈষৎ গর্ব্বিতা। সোমনাথ শুধু ইহাদের চেনেই না, ইহাদের জীবনের গূঢ় কথাগুলিও তাহার জানা আছে। সিনেমা সমাজে কাহারও কোনও কথা গোপন থাকে না, সকলেই কাচের ঘরে বাস করে। ইহাদের জীবনে নিন্দার কথা অনেক আছে। কেহই নিষ্কলঙ্ক নয়, কেহই সতীসাধ্বী নয়। তবু—

ইহাদের নারীত্ব অবহেলার বস্তু নয়; সোমনাথ ইহাদের ঘৃণা করিতে পারে না! সত্য ইহারা নারীত্বের ব্যবসা করে; কিন্তু পণ্য মাত্রেই কি হেয়? ফুলও তো বাজারে বিক্রয় হয়; ফুল কি হেয়?

সোমনাথের মনের চিত্রপটে মেয়েগুলি একটি একটি করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাহাদের হাসি, চাহনি, দেহভঙ্গিমা—তাহাদের চমক-ঠমক—

সোমনাথ মনের মধ্যে মগ্ন হইয়া গেল।

'কি দোস্ত, একেবারে তন্ময় হয়ে গেছ যে!'

সোমনাথ চমকিয়া উঠিল। পাণ্ডুরঙ বাহির হইতে আসে নাই, অফিসেই ছিল। তরুণীপুঞ্জের আকস্মিক আক্রমণে সে আত্মরক্ষার্থে পাশের ঘরে লুকাইয়াছিল; তরুণীরাও সোমনাথকে পাইয়া আর কাহারও খোঁজ লয় নাই। এখন বিপদ কাটিয়াছে দেখিয়া পাণ্ডুরঙ গুটি গুটি পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সোমনাথের সম্মুখে বসিয়া পাণ্ডুরঙ দুষ্টামিভরা হাসিল;—'যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ধ্যানের পাত্রী বটে। তা— কোন্‌টির ধ্যান হচ্ছিল?'

সোমনাথ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল,—'আরে না না—'

'পীরের কাছে মামদোবাজি চলে না, সে চেষ্টা কোরো না। আর এতে লজ্জারই বা আছে কি? এতদ্ভিন্নে যদি তোমার প্রাণে রঙ ধ'রে থাকে—'

'কী পাগলের মতো বকছ।'

'ভাই সোমনাথ, তোমাকে আমার জীবনের ফিলজফি বলি শোনো। তোমাদের ঐ সঙ্কীর্ণ অনুদার যৌন-নীতি আমি মানি না। এ বিষয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমার আদর্শ; অর্জ্জুন আমার আদর্শ। আরও অনেক বড় বড় আদর্শ আছে। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি; সে আমার গৃহদেবতা। কিন্তু তাই বলে আমি অন্য মেয়ের পানে চোখ তুলে চাইব না, এত অধম আমি নই। তুমি এতদিন নিজের পথে চলেছ, আমি কোনও দিন তোমাকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু আজ যদি তোমার ভিন্ন পথে চলবার ইচ্ছে হয়ে থাকে, আমি বাধাও দেবনা। এসব তুচ্ছ জিনিষ, এদের বড় ক'রে দেখতে নেই। আসল কথা হচ্ছে, দিল খাঁটি হওয়া চাই, ইমান দুরস্ত্ থাকা চাই। তবেই মানুষের মনুষ্যত্ব। তোমার যদি কারুর ওপর মন পড়ে থাকে তাতে লজ্জার কিছু নেই। ওটা বয়সের ধর্ম, প্রকৃতির লীলা—'

'চুপ কর পাণ্ডুরঙ, ওসব কথা আমার ভাল লাগে না।'

'তুমি মনকে চোখ ঠারছ সোমনাথ। একদিন ঘাড় মুচড়ে পড়বেই, তার চেয়ে চোখ খুলে পড়া ভাল। ঐ যে মেয়েগুলো আজ এসেছিল ওদের প্রত্যেকের মনের কথা আমি জানি। তোমার জন্যে ওরা পাগল। ওরা যখন পরের বাহুতে বাঁধা থাকে তখনও ওরা তোমার কথা ভাবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওরা তোমার স্বপ্ন দেখে—'

'ছি পাণ্ডুরঙ—সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, তুমি আমাকে লোভ দেখাবার চেষ্টা করছ।'

পাণ্ডুরঙ নিশ্বাস ফেলিল।

'লোভ দেখাইনি ভাই, অদৃষ্টের কথা ভাবছি। কেউ চেয়ে পায় না, আবার কেউ পেয়েও চায়না—এই দুনিয়া। কিন্তু যৌবনকে বঞ্চনা করলে আখেরে ভাল হয় না সোমনাথ; অন্তরের ক্ষুধা ভগবান একদিন প্রতিশোধ নেবে—'

সোমনাথ আর দাঁড়াইল না, বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় পাণ্ডুরঙকে গম্ভীর কণ্ঠে ভৎর্সনা করিয়া গেল,—'তুমি একটা নরকের কীট।'

কিন্তু মুখে যত ভৎর্সনাই করুক মনের কাছে তো লুকোচুরি চলে না। সোমনাথ মনে মনে এই মেয়েগুলির রূপযৌবনের চিন্তা করিতেছিল ইহা সে নিজে কি করিয়া অস্বীকার করিবে? নিজের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়া তাহার অন্তরাত্মা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ছি ছি ছি! সে এ কী করিতেছে! তাহার একান্ত অজ্ঞাতসারে এ কোন্ আস্তাকুড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তাহার মন তো এমন ছিল না। তিন বছর আগে যখন সে এই সিনেমা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার মন দৃঢ় ছিল, নির্মল ছিল; পরস্ত্রীর প্রতি লুব্ধতা তাহার ছিল না। মন লইয়া সে গর্ব করিতে পারিত। কিন্তু আজ এ কি হইয়াছে! কোন শিথিলতার ছিদ্রপথে এই দৌর্বল্য তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে? সব চেয়ে আশ্চর্য, তাহার মনে যে এমন ঘুণ ধরিয়াছে তাহা সে নিজেই এতদিন জানিতে পারে নাই।

লম্পট! কথাটা মনে আসিতেই তাহার শরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। লোকে তাহাকে আড়ালে লম্পট বলিবে, প্রকাশ্যে চোখ টিপিয়া হাসিবে। ভদ্রলোকেরা তাহাকে দেখিয়া স্ত্রী-কন্যা সামলাইবে। আর রত্না—সে কি ভাবিবে? ছি ছি ছি!

বাড়ী ফিরিয়া সোমনাথ ভিজা কাপড় চোপড় ছাড়িয়া স্নান করিতে গেল। অশান্ত বিবেক পীড়িত মন, অথচ বাড়ীতে কথা কহিবার একটি লোক নাই। দিদি ও জামাইবাবু এখনও পুণায় আছেন।

স্নান করিতে করিতে তাহার ইন্দুবাবুর কথা মনে পড়িল। ইন্দুবাবু একদিন তাহাকে ললিত ও লতার কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। ললিতও ভাল ছেলে ছিল—

বৈকাল বেলা সোমনাথ আবার মোটর লইয়া বাহির হইল; ইন্দুবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দুবাবু তক্তপোষের উপর পদ্মাসনে বসিয়া একটি লম্বা-চৌড়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, সোমনাথকে দেখিয়া বই সরাইয়া রাখিলেন।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—'কি বই পড়ছেন?

ইন্দুবাবু একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—'গীতা। একটা নতুন এডিশন বেরিয়েছে—বেশ ভাল। তাই নেড়ে চেড়ে দেখছিলাম।' বইখানা আবার টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিতে লাগিলেন,—'বঙ্কিম চার অধ্যায়ের বেশী টীকা লিখে যেতে পারেন নি, বাংলাভাষার দুর্ভাগ্য। যদি শেষ করতে পারতেন, অমর গ্রন্থ হত।'

গীতা সম্বন্ধে সোমনাথের কোনও জ্ঞানই ছিল না। গীতা ভগবদ্বাক্য, তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব ছাত্র দর্শন পড়ে তাহারা পাশ্চাত্য দর্শন মুখস্থ করে কিন্তু ষড়দর্শনের খোঁজ রাখে না। সোমনাথেরও মনের ও দিকটা অন্ধকারই ছিল। ইন্দুবাবু কথাপ্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যে আলোচনা করিতে লাগিলেন সে তাহা বিশেষ কিছু বুঝিল না, কেবল নীরবে শুনিয়া গেল।

ইন্দুবাবু এক সময় বলিলেন,—'আমাদের দর্শন শাস্ত্র পড়বার সময় একটা বড় অসুবিধা হয়—পরিভাষা নিয়ে। কখন কোন পারিভাষিক শব্দ কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে তা বোঝা শক্ত। টীকাকারেরাও সবাই নিজের কোলে ঝোল টেনেছেন, নানা মুনির নানা মত। এই ত্যাখো না, গীতায় এক জায়গায় বলা হয়েছে—'বিষয় বস্তুর ধ্যান করতে করতে পুরুষের সেই বিষয় আসক্তি জন্মায়; আসক্তি থেকে কাম জন্মায়; কাম থেকে ক্রোধ; ক্রোধ থেকে সম্মোহ; সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম; স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশের ফলে মানুষ বিনাশ পায়।' এই শ্লোকগুলিতে সব কথারই মানে বোঝা যায়, কেবল স্মৃতিবিভ্রম ছাড়া। এই স্মৃতিবিভ্রম বলতে ঠিক কি বোঝায় তুমি বলতে পার?'

সোমনাথ বলিল,—'স্মৃতিবিভ্রম কথার সাধারণ মানে তো—'

ইন্দুবাবু বলিলেন,—'সাধারণ মানে এখানে চলবে না, এটা পারিভাষিক শব্দ। আমার কি মনে হয় জানো? ইংরেজিতে যাকে Sense of values বলে সেই মূল্যবোধ হারানোর নামই স্মৃতি বিভ্রম। মানুষ যখন এই জ্ঞান হারিয়ে ফ্যালে তখন তাকে রক্ষা করা শিবের অসাধ্য। তোমার কি মনে হয়?'

সোমনাথ উঠিয়া পড়িল;—'আমি এসব কিছু বুঝি না। আচ্ছা, আর একদিন আসব। আপনি শাস্ত্রচর্চা করুন।' বলিয়া সে বিদায় লইল।

আজ সোমনাথ ইন্দুবাবুর কাছে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য লইয়া আসে নাই; তাহার অস্থির মন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল ইন্দুবাবুর সঙ্গে সাধারণ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিলেই তাহার মনটা সুস্থ হইবে। কিন্তু ইন্দুবাবুকে গীতায় মশগুল দেখিয়া সে নিরাশ হইল। তাহার যে মনের অবস্থা তাহাতে এই জাতীয় সূক্ষ্ম আলোচনা তাহার অপ্রাসঙ্গিক মনে হইল। সোমনাথের মনে কোন সজ্ঞান ধর্মবোধ ছিল না এ বয়সে তাহা থাকে না। যাহা ছিল তাহা রক্তগত শুচিতার সংস্কার। এই সংস্কারই তাহাকে অনেক বিপদে আপদে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘকাল থাকিলে জন্মগত সংস্কারও পঙ্গু হইয়া পড়ে—মূল্যবোধ বিকৃত হয়। সোমনাথ যদি মন দিয়া গীতাবাক্য শুনিত তাহা হইলে হয়তো তাহার বর্তমান সঙ্কটও অনেকটা সরল হইয়া যাইত। কিন্তু সে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় নিয়তির দ্বারা চালিত হইতেছিল। তাহার ভাগ্যদেবী তাহাকে লইয়া আবার নূতন খেলা খেলিবার উপক্রম করিতেছিলেন।

মোটরে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে আবার ষ্টুডিওতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষ্টুডিওতে আজ ছুটি; কাজকর্ম কিছু নাই। তবু এই ষ্টুডিও তাহার মনের চারিপাশে এমন শিকড় বিস্তার করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে যে কাজে অকাজে এ স্থানটি ছাড়িয়া থাকা

তাহার পক্ষে অসম্ভব। হানা বাড়ীর মতো ইহার একটি অনিবার্য মোহ আছে। কিন্তু ষ্টুডিওতে পৌঁছিয়াই একটা সংবাদ বোমা-বিস্ফোরণের মতো তাহাকে প্রায় মূহ্যমান করিয়া দিল। শম্ভুলিঙ্গ মহাশয় হঠাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিলেন,—'সোমনাথবাবু, আমার কি হবে? রুস্তমজি মারা গেছেন।'

'কী!'

'হ্যাঁ—এই ঘণ্টাখানেক হল। আজ হোলি; বন্ধু বান্ধব নিয়ে খুব মদ খেয়েছিলেন, হঠাৎ হার্ট ফেল করে গেছে।'

সোমনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

* * *

রুস্তমজির মৃত্যু যেন চোখে আঙুল দিয়া সোমনাথকে পথ দেখাইয়া দিল।

তারপর একহপ্তা কাটিয়াছে। রুস্তমজি উইল করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাই ইতিমধ্যেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে মামলা সুরু হইয়া গিয়াছে। ষ্টুডিও আদালতের হেফাজতে রাখিবার কথা হইতেছে।

সোমনাথ অন্য অনেক চিত্র-প্রণেতার নিকট হইতে সাদর আমন্ত্রণ পাইতেছে; সকলেই তাহার হাতে চিত্র রচনার ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে প্রস্তুত। কিন্তু সোমনাথ এই সাত দিনে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ছক কাটিয়া যাত্রাপথ স্থির করিয়া ফেলিয়াছে; কোনও প্রলোভনই আর তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

এই কয় বৎসরে সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা তাহার সঞ্চয় হইয়াছে। একটা মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়? উপরন্তু, তাহার কর্মজীবন এখনই তো শেষ হইয়া যাইতেছে না।

জামাইবাবুকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া সে ডাকে দিল। তারপর বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে বিদায় লইল। পাণ্ডুরঙকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—'কলকাতায় চললাম। আমার মোটরটা তুমি ব্যবহার কোরো।'

পাণ্ডুরঙ্ ভারী গলায় বলিল,—'তুমি যেখানেই যাও, আমার ভালবাসা তোমার সঙ্গে থাকবে।'

২

কলিকাতায় পৌঁছিয়া সোমনাথ হ্যারিসন রোডের একটি ভাল হোটেলে উঠিল। তাহার চেহারা দেখিয়া হোটেলের ম্যানেজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু সোমনাথ আত্মপরিচয় দিয়া একটা হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিতে রাজি নয়। বিখ্যাত অভিনেতা সোমনাথ চৌধুরী কলিকাতায় আসিয়াছে একথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে তাহার আর প্রাণে শান্তি থাকিবে না, সময়ে অসময়ে লোক দেখা করিতে আসিবে; কাগজে লেখালেখি হইবে। সে হোটেলের খাতায় ছদ্মনাম লিখাইল।

তারপর তাহার কাজ আরম্ভ হইল। বসিয়া থাকার কাজ নয়; অনেক ছুটাছুটির কাজ। উকিলের সহিত পরামর্শ, সরকারী দপ্তরে ঘাঁটাঘাঁটি, বড় বড় বিলাতী সওদাগরী অফিসে যাতায়াত, কলকব্জা খরিদ। তিন চার বার তাহাকে কলিকাতার বাহিরেও যাইতে হইল।

এই ভাবে মাস দেড়েক কাটিল। তারপর একদিন হোটেলের সম্মুখেই একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল।

'সোমনাথ! তুমি হেথায়?'

ইনি সেই শিক্ষক-বন্ধু, যিনি সোমনাথের প্রথম ছবি বাহির হইবার পর প্রশস্তি জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং প্রসঙ্গান্তরে মিষ্টান্ন দাবী করিয়াছিলেন। ইনি জামাইবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

সোমনাথ বন্ধুকে হোটেলে নিজের ঘরে আনিয়া বসাইল। অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ; দুই বন্ধুতে অনেক মনের প্রাণের কথা হইল। কিন্তু সোমনাথ নিজের বর্তমান বৈষয়িক ভাবান্তরের কথা কিছু ভাঙিল না।

বন্ধু এক সময় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হঠাৎ এ সময় এলে যে! রত্নাকে দেখতে?'

'রত্নাকে দেখতে! কেন, কি হয়েছে রত্নার?'

'সে কি, তুমি কিছু জানো না? আমি ভেবেছিলাম—'

'না, আমি কিছু জানি না।'

বন্ধু বিস্মিত হইলেন; 'রত্না প্রায় এক বছর ধরে ভুগছে।'

'কী হয়েছে?'

'সত্যি কিছু জানো না? আমি ভেবেছিলাম রত্না আর তোমার মধ্যে একটা বোঝাপড়া—'

'না, তুমি ভুল বুঝেছ। রত্নার সঙ্গে আমার কোনও বোঝাপড়া নেই। সে মাঝে বার দুই বোম্বাই গিয়েছিল; দেখা হয়েছিল এই পর্যন্ত।—কিন্তু তার অসুখটা কী?'

বন্ধু সাবধানে বলিলেন,—'তা ভাই আমি ঠিক জানি না। তবে শরীর সুস্থ নয়। তুমি তো জানো আমি ওদের দূরস্থ আত্মীয়, বেশী মেলামেশা নেই। শুনেছি রত্নাকে মধুপুর না গিরিডিতে নিয়ে গিয়ে রাখবার কথা হয়েছিল; কিন্তু রত্না রাজি হয় নি।—তোমার বোধহয় দেখা করা উচিত।'

বন্ধু চলিয়া যাইবার পর সোমনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সেই যে বছর দেড়েক আগে একটি ঝড়ের রাত্রে রত্না তাহার বাসায় রাত কাটাইয়াছিল, তারপর হইতে রত্নার কোনও খবরই সে রাখে না। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই; বিবাহ হইলে সোমনাথ নিশ্চয় খবর পাইত। হয়তো অসুখের জন্যই বিবাহ হয় নাই; নচেৎ বিবাহ না হইবার অন্য কোনও কারণ নাই। অসুখটা কী? বন্ধু যেন গুরুতর অসুখের ইসারা দিয়া গেলেন। তাহাকে দেখিতে যাওয়া কি সোমনাথের উচিত হইবে? রত্না সোমনাথের উপর বিরক্ত; হয় তো দেখা করিতে গেলে আরও উত্যক্ত হইবে—

তবু সন্ধ্যার প্রাক্কালে সোমনাথ রত্নাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

জামাইবাবুর দাদা কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। বালীগঞ্জে তাঁহার সুদৃশ্য দ্বিতল উদ্যানমধ্যবর্তী বাড়ীটি তাঁহার শ্রীসমৃদ্ধির সাক্ষী।

গৃহস্বামী বাড়ী ছিলেন না ; দিদির জা মনোরমা দেবী সমাদর করিয়া তাহাকে বসাইলেন। তিনি স্থূলকায়া ও বহুভাষিণী ; নচেৎ লোক ভাল।

'এস ভাই। অনেক দিন তোমায় দেখিনি ; অবিশ্যি ছবিতে অনেকবার দেখেছি। কী সুন্দর ছবিই করেছ ! কে ভেবেছিল তোমার পেটে এত আছে ! তা—কবে এলে ?'

সোমনাথ ভাসা-ভাসা উত্তর দিল। দু'চার কথার পর সে জিজ্ঞাসা করিল,—'রত্না কেমন আছে ?'

মনোরমা দেবী বলিলেন,—'রত্নার শরীর ভাল যাচ্ছে না ভাই। সেই যে ও-বছর বর্ষার সময় বোম্বাই গিছল, সেখান থেকে ফিরে অবধি ওর শরীর খারাপ যাচ্ছে। তোমাদের বোম্বাই ভাল যায়গা নয়, যাই বল। কী রোগ যে নিয়ে এল, দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। অথচ বাড়ীতেই ডাক্তার ; ওষুধ-বিষুধ সবই খাওয়ানো হচ্ছে ; কিন্তু কিছুতেই ওর শরীর সারছে না।'

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—'রোগটা কি ?'

মনোরমা গলা খাটো করিয়া বলিলেন,—'উনি তো প্রথমে সন্দেহ করেছিলেন বুঝি টিবি। কিন্তু এক্সরে করে কিছু পাওয়া যায় নি। ভগবানের দয়া। তবু খুব সাবধানে রেখেছি, বাড়ী থেকে বেরুনো বারণ—বেশী চলাফেরা বারণ—'

'এখন সে বাড়ীতে আছে তো ?'

'ওমা, বাড়ীতে আছে বৈকি ! ওপরে আছে—ওর দাদা বেশী ওপর নীচে করা মানা করে দিয়েছেন। তা ও কি শোনে ? মাঝে মাঝে নেমে আসে। তুমি এসেছ সাড়া পেলে হয়তো এখনি নেমে আসবে। তা তুমি ওপরেই যাও না ভাই। তুমি তো বাড়ীর ছেলে। এখন না হয় মস্ত লোক হয়েছ, কাক-কোকিলে নাম জানে। যাও, ওপরে যাও, আমি তোমার চা জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

দ্বিতলে গিয়া সোমনাথ একটি বন্ধ দরজায় টোকা দিল। ভিতর হইতে রত্নার গলা আসিল,—'কে ? ভেতরে এস।'

সোমনাথ দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মেয়েলি ছাঁদে পরিপাটি ভাবে সাজানো একটি ঘর ; আধা লাইব্রেরী, আধা বিশ্রাম কক্ষ। এটি রত্নার নিজস্ব ঘর।

পশ্চিম দিকের জানালার সম্মুখে বসিয়া সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোয় রত্না একখানা বই পড়িতেছিল। সোমনাথকে দেখিয়া সে সম্মোহিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল। তাহার শীর্ণ মুখ হইতে রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা যেন আরও পাংশু দেখাইল।

সোমনাথ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'আমাকে কি চিনতে পারছ না ?'

'না, পারছি না। এস—বোসো।' কথাগুলি ব্যঙ্গোক্তি হইলেও রত্নার স্বর এত ক্ষীণ ও দুর্বল শুনাইল যে সোমনাথের বুকে তাহা শলাকার মতো বিঁধিল।

দু'জনে একটি সোফায় বসিল। রত্না আরও কিছুক্ষণ সোমনাথের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'কি ভাগ্যি যে এলে ! একেবারে ভুলে যাওনি তাহলে ?'

সোমনাথ একথার উত্তর অনেক ভাবে দিতে পারিত, কিন্তু সে আবেগভরে বলিয়া উঠিল,—'তুমি যে বড্ড রোগা হয়ে গেছ রত্না !'

রত্না হাসিল। তাহার শীর্ণ মুখে হাসি ভাল মানাইল না। কপাল হইতে একগুচ্ছ রুক্ষ চুল সরাইয়া সে বলিল, 'ও কিছু নয়। তুমি কেমন আছ বল। হঠাৎ এ সময়ে কলকাতায় এলে যে ! কাজকর্ম কি বন্ধ ?'

সোমনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'সিনেমার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।'

রত্না উচ্চকিত ভাবে চাহিল।

'সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ ? ও—এবার কলকাতায় বাংলা ছবি করবে !'

সোমনাথ মাথা নাড়িল।

'না। সিনেমা করাই ছেড়ে দিয়েছি।'

রত্না নিশ্বাস রোধ করিয়া চাহিয়া রহিল।

এই সময় একটি দাসী সোমনাথের জন্য চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। ঘরে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়াছিল, রত্না উঠিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। বলিল,—'ঝি, আমার জন্যেও এক পেয়ালা চা নিয়ে এস।'

ঝি বলিল,—'তোমার যে এখন ডাক্তারী দুধ খাবার সময় দিদিমণি।'

রত্না বিরক্ত হইয়া বলিল,—'না, চা নিয়ে এস।'

ঝি চলিয়া গেল।

রত্না আবার গিয়া বসিল। সোমনাথ লক্ষ্য করিল রত্নার গালে ঈষৎ রক্ত সঞ্চার হইয়াছে, চক্ষু দুটিও যেন চাপা উত্তেজনায় উজ্জ্বল দেখাইতেছে। সে জলখাবারের রেকাবি টানিয়া আহারে মন দিল।

রত্না বলিল,—'এর মানে ? সিনেমায় তো বেশ টাকা পাচ্ছিলে।'

সোমনাথ বলিল,—'ছেড়ে দেবার ওটাও একটা কারণ। এই তিন বছরে যা পেয়েছি তাতে বাকি জীবনটা চলে যাবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রত্না বলিল,—'সিনেমায় এত শিগগির তোমার অরুচি ধ'রে যাবে তা ভাবিনি। ও পথে যে যায় তাকে বড় একটা ফিরতে দেখা যায় না। তোমার এই বৈরাগ্যের অন্য কোনও কারণ আছে নাকি ?'

সোমনাথ শান্তভাবে বলিল,—'আছে। মন্তজি মারা গেলেন, সেটাও একটা কারণ। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া ?'

ঝি আসিয়া রত্নাকে চা দিয়া গেল। সোমনাথ নিজের চায়ের বাটি তুলিয়া লইয়া একটু হাসিল।

'আর একদিনের চা খাওয়ার কথা মনে পড়ে? বাইরে ঝড়ের গর্জন, সমুদ্রের আফ্‌সানি, তার মধ্যে টর্চের আলো জেলে চা তৈরি করে খাওয়া?'

রত্নার মুখখানা ক্ষণকালের জন্য কেমন যেন একরকম হইয়া গেল; তারপর সে সামলাইয়া লইল। বলিল,—'আসল কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ যে! বল না—তা ছাড়া কী?'

সোমনাথ ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,—'কি হবে ব'লে? তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'তবু বলই না শুনি।'

নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালা ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া সোমনাথ বলিল,—'ইদনীং ভয় হয়েছিল বুঝি তোমার কথাই ফলে যায়—'

'আমার কথা?'

'হ্যাঁ। তুমি দিদিকে একবার লিখেছিলে, আমি যখন সিনেমায় ঢুকেছি তখন আমার পতন অনিবার্য। ইদানীং আমারও সেই ভয় হয়েছিল। তাই—পালিয়ে এলাম।'

রত্নার পানে অসঙ্কোচে চোখ তুলিয়া সোমনাথ দেখিল, রত্নার করতলে চায়ের পেয়ালা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, এখনি পড়িয়া যাইবে। সে তাড়াতাড়ি পেয়ালা লইয়া সরাইয়া রাখিল। রত্নার মুখ আবার পাঙাস বর্ণ ধারণ করিয়াছে—ঠোঁট দুটি অসম্ভব রকম কাঁপিতেছে।

'কি হল রত্না?'

রত্না প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ করিল।

'কিছু না। আমার শরীরটা একটু—। মাঝে মাঝে অমন হয়। তুমি আজ এস গিয়ে।'

সোমনাথ ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। মানসিক উত্তেজনা দুর্বল শরীরের পক্ষে ভাল নয়। সে বলিল,—'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। বড়দিদিকে পাঠিয়ে দেব?'

'না না, তার দরকার নেই। আমি আপনিই ঠিক হয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

সোমনাথ দ্বার পর্যন্ত গিয়াছে, পিছন হইতে রত্না ডাকিল,—'শোনো।'

সোমনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'আবার আসবে তো?'

'আসব। কিন্তু—'

'কবে আসবে?'

সোমনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—'কাল আমাকে বাইরে যেতে হবে। হপ্তাখানেক পরে ফিরব। তারপর আসব।'

সন্তর্পণে দরজা ভেজাইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

৩

কলিকাতায় আসিয়া সোমনাথ একটি মোটর-লঞ্চ কিনিয়াছিল। পরদিন সকালবেলা সে কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া লঞ্চে উঠিল। ভাগীরথীর আঁকা বাঁকা পথে নৌকা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেল।

এক হপ্তার মধ্যে ফিরিবার কথা, কিন্তু ফিরিতে সোমনাথের এগারো দিন লাগিল। যা হোক, কাজকর্ম সব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতায় ফিরিয়াই সোমনাথ রত্নাদের বাড়ী গেল। আজ রত্নার দাদা বাড়ীতে ছিলেন। বয়স্থ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, জামাইবাবুর মতো রঙ্গ-রসিকতা বেশী করেন না। কিন্তু ভিতরে রস আছে; বর্ণচোরা আম।

দেবেশবাবু বলিলেন,—'সেদিন এসেছিলে, দেখা হয়নি। এস তোমার সঙ্গে গল্প করি।' বলিয়া নিজের বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন।

দুজনে উপবিষ্ট হইলে দেবেশবাবু বলিলেন,—'শুনলাম তুমি সিনেমা ছেড়ে দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'টাকা তো বেশ পাচ্ছিলে; নামও যথেষ্ট হয়েছে তবে ছেড়ে দিলে যে! আর কি ভাল লাগল না?'

'আজ্ঞে না। সময় থাকতে ছাড়াই ভাল।'

দেবেশবাবু একটু হাসিলেন,—'বেশ বেশ। কোনও জিনিষেই মোহ থাকা ভাল নয়।'

সোমনাথ নীরব রহিল। দেবেশবাবু তখন বলিলেন,—'রত্না অনেক দিন ধ'রে ভুগছে। ও আমাদের বড় আদরের বোন; ভারি ভয় হয়েছিল। রোগটা কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। এখন মনে হয় ধরেছি।'

সোমনাথ সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিল। দেবেশবাবু উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন, তারপর বলিলেন,—'দেহের রোগ নয়, মনের রোগ। সেদিন তুমি তাকে দেখে গিয়েছিলে তো, আজ আবার দেখলেই বুঝতে পারবে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, বোম্বাই থেকে ফিরে আসবার পরই তার রোগের সূত্রপাত হয়। মনের মধ্যে অনেকগুলো জট পাকিয়েছিল। যাহোক, এখন বোধহয় সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।'

সোমনাথ নিরুত্তর রহিল। দেবেশবাবু আবার আসিয়া বসিলেন; বলিলেন—'সোমনাথ, তুমি যদি রত্নাকে বিয়ে করতে চাও, আমাদের কোনও আপত্তিই হবে না; বরং আমরা খুব খুশী হব।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ হেঁট মুখে বসিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল,—'আপনি বোধ হয় জানেন না, আগে একবার এ প্রস্তাব হয়েছিল; কিন্তু রত্না—'

দেবেশবাবু বলিলেন,—'রত্না বড় অভিমানী মেয়ে। সে সময় হয়তো ওর মনে ক্ষোভের কোনও কারণ হয়েছিল। যা হোক, সে সব কেটে গেছে।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'ওর স্বভাব, যে জিনিষ ও মনে মনে চায় প্রাণ গেলেও তা মুখ ফুটে চাইবে না। আমি জানতে পেরেছি, তোমাকেই ও বিয়ে করতে চায়। এখন তোমার হাত।'

সোমনাথ আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দেবেশবাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ, যাও। রত্না ওপরেই আছে। মনে

দেখো, রোগীকে অনেক সময় জোর করে ওষুধ খাওয়াতে হয়।' বলিয়া একটু হাসিলেন।

সোমনাথ উপরে গেল।

রত্নাকে দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া গেল। এই কয় দিনে তাহার কী অপূর্ব্ব পরিবর্তন হইয়াছে! শীতের শেষে পাতা ঝরিয়া লতা শুষ্ক শীর্ণ আকার ধারণ করে, আবার নব-কিশলয়ে তাহার সর্বাঙ্গ ভরিয়া যায়। রত্নার মুখের সেই দৃঢ় অথচ সুকুমার ডৌল ফিরিয়া আসিয়াছে; গাল দুটিতে নব পল্লবের কোমল অরুণিমা।

রত্না নত হইয়া সোমনাথের পদধূলি লইল; একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল,—'সেদিন তোমাকে পেন্নাম করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

সোমনাথের হৃদ্‌যন্ত্র দুন্দুভির মতো শব্দ করিতেছে; প্রথম যেদিন সে ক্যামেরা ও মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল সেদিনও এত ভয় হয় নাই। কিন্তু সে সংযত ভাবে একটি গদি মোড়া চেয়ারে গিয়া বসিল; গম্ভীর মুখে বলিল,—'ভুল সকলেই করে। কিন্তু সময়ে শুধরে নেওয়া চাই।'

রত্না তাহার প্রতি একটি চকিত দৃষ্টিপাত করিল; পরে সোফার এক কোণে বসিয়া বলিল,—'এই বুঝি তোমার এক হপ্তা পরে আসা? কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

সোমনাথ বলিল,—'সোঁদর বনে।'

রত্না চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল।

'সে কি! শিকারে গিয়েছিলে?'

'উহুঁ।'

'তবে?'

সোমনাথের স্নায়ুমণ্ডলী এতক্ষণে কিছু ধাতস্থ হইয়াছে, হৃদ্‌যন্ত্রও বেশী গণ্ডগোল করিতেছে না। সে উঠিয়া গিয়া সোফায় রত্নার পাশে বসিল।

'রত্না, তোমাকে একটা খবর দিই। আমি সুন্দরবনে পাঁচশো বিঘে জমি কিনেছি। খুব ভাল ধান জমি। আর কী সুন্দর যায়গা! চারদিকে নদী আর জঙ্গল। কলকাতা থেকে জলপথে চার ঘণ্টার রাস্তা। এবার সেইখানে বসে চাষবাস করব।'

রত্না যেন বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো চাহিয়া রহিল; শেষে ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল,—'চাষবাস করবে? কিন্তু—চাষবাসের তুমি কী জানো?'

কিছু জানিনা। যখন সিনেমা করতে গিয়েছিলাম তখন সিনেমার কিছুই জানতাম না। শিখেছি। এও শিখব। আমি ট্র্যাক্টর কিনেছি, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস করব। একটা মোটর-লঞ্চ কিনেছি, যখন ইচ্ছে হবে কলকাতায় চলে আসব।'

কিন্তু চাষবাস কেন? অন্য কোনও কাজ কি করতে পারতে না?'

'আমি সৃষ্টি-ধর্মী কাজ করতে চাই। যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁরা অনেক বড় বড় সৃষ্টি করেন, তাঁদের সৃষ্টি দেশের সম্পদ। আমার প্রতিভা নেই, কিন্তু শস্য উৎপাদন তো করতে পারব। আমার পাঁচশো বিঘা জমিতে বছরে অন্তত পাঁচ হাজার মণ ধান হবে। সব ধান আমি একলা খেতে পারব না, বেশীর ভাগই দেশের লোকের পেটে যাবে। দেশের অন্ন-সম্পদ বাড়বে। সেটাই কি কম কথা?'

রত্না অনেকক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। সোমনাথ দেখিল তাহার মুখে শ্বেতাভা ও রক্তাভা পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করিতেছে। সে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল,—'আমি যা করতে যাচ্ছি তা কি তোমার ভাল লাগছে না।'

রত্না একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাসিল; বলিল,—'খুব ভাল লাগছে—'

উৎসাহিত হইয়া সোমনাথ বলিল,—'আমি সেখানে একটি ছোট্ট বাড়ী করাচ্ছি রত্না। মাত্র দুটি ঘর; তাদের ঘিরে বারান্দা। আর বাড়ী ঘিরে বাগান। কেমন, সুন্দর হবে না?'

'তা হবে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

রত্না নিজের চুড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল,—'তুমি সারা জীবন সহরে কাটিয়েছ, গত তিন বছর হাজার লোকের মধ্যে কাজ করেছ। দেশযোড়া তোমার সুখ্যাতি। এখন সব ছেড়ে দিয়ে ঐ বনে জঙ্গলে কি তোমার মন লাগবে?'

সোমনাথ রত্নার একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল। গাঢ়স্বরে বলিল,—'লাগবে, যদি একটি মেয়ে আমার সঙ্গে থাকে।'

রত্না সোমনাথের মুঠি হইতে নিজের হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সোমনাথ হাত ছাড়িল না। তখন রত্না ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সোমনাথ বলিল,—'কান্নাকাটি কিছু শুনব না। আমাকে বিয়ে করতে হবে; ঐ জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে। যদি রাজি না হও জোর করে ধরে নিয়ে যাব। তোমার দাদা কিছুই বলবেন না।'

রত্না বাঁ হাতে চোখ মুছিবার চেষ্টা করিয়া ভাঙা গলায় বলিল,—'তুমি জানো না, আমার টিবি হয়েছে। দাদা মুখে বলেন না, কিন্তু আমি জানি।'

সোমনাথ তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—'তুমি কিচ্ছু জানো না। তোমার যা হয়েছে তা দাদা আমাকে বলেছেন। দেহের রোগ নয়, মনের রোগ। মনে মনে প্রেম, আর মুখে ঝগড়া করলে ঐ রোগ হয়। বুঝলে?—যাহোক, ঠিক সময়ে ওষুধ পড়েছে, এবার আর রোগ থাকবে না। ওষুধ যে ধরেছে তার লক্ষণও এরি মধ্যে দেখা যাচ্ছে—' বলিয়া তাহার গালে আঙুলের মৃদু টোকা দিল।

মেয়েরা সময় বিশেষে কাঁদিয়া বড় আনন্দ পায়। রত্না প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সোমনাথ যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল,—'কাল সকালেই দিদিকে 'তার' করতে হবে। দিদি আর জামাইবাবু যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ কিছুই হবে না।'

ফুলশয্যার রাত্রে ঘর অন্ধকার করিয়া দু'জনে শুইয়াছিল। মধ্যরাত্রির পর বাড়ী নিস্তব্ধ হইয়াছে ; ফুলের গন্ধে রুদ্ধশ্বাসে বাতাস নিঃশব্দ সঞ্চারে জানালা দিয়া যাতায়াত করিতেছে। আকাশের খণ্ডচন্দ্র অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে।

অন্ধকারে রত্নার একটা হাত সোমনাথের বুকে আসিয়া পড়িল। রত্না মৃদুস্বরে বলিল,—'তুমি আমাকে বড্ড জ্বালিয়েছ।'

সোমনাথ তাহার হাত মুঠিতে লইয়া বলিল,—'আমি জ্বালিয়েছি ; তা তো বটেই।—আচ্ছা রত্না, কবে তোমার এই দুর্বুদ্ধি হল, মানে কবে তুমি আমাকে ভালবাসলে ঠিক করে বলো তো।'

'দশ বছর বয়সে।'

'উঃ, কী পাকা মেয়ে!'

'মেজদার বিয়ের ফুলশয্যার দিন তোমাকে প্রথম দেখি, তুমি বৌদির সঙ্গে এসেছিলে। সেই দিনই মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।'

'প্রথম দর্শনেই এত! তারপর?'

'তারপর আট বছর অপেক্ষা করলাম। ঠিক করেছিলাম আই-এ পর্যন্ত পড়ব, তারপর বিয়ে। যখন বিয়ের সময় হল তখন দেখি তুমি সিনেমায় ঢুকে পড়েছ।'

'তাতেই বুঝি মেজাজ বিগড়ে গেল?'

'বোম্বাই গেলাম নিজের চোখে দেখতে। যা দেখলাম তাতে মন আরও বিষিয়ে গেল। তারপর এই তিন বছর যে আমার কি করে কেটেছে তা আমিই জানি।'

সোমনাথ বলিল,—'আমার ওপর যদি তোমার মন বিষিয়েই গিয়েছিল তবে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ছবি দেখতে কেন?'

'তোমাকে না দেখে থাকতে পারতাম না। ছবিতে তোমাকে দেখতাম আর ভাবতাম—তুমি কি ভাল আছ? নষ্ট হয়ে যাওনি?—সেবার সেই ঝড়ের রাত্রে গিয়ে পৌঁছুলাম ; সে রাতটা ভুলব না—'

সোমনাথ বলিল,—'আমিও না।'

রত্না বলিতে লাগিল,—'সে রাত্রে যদি তুমি আমাকে চাইতে, আমি বোধহয় না বলতে পারতাম না? কিন্তু তুমি ও দিক দিয়ে গেলেনা। আমি কি করব? আমি কি বলব, ওগো তুমি আমায় বিয়ে কর?'

'তাহলে সে রাত্রে আর তোমার সন্দেহ ছিল না?'

'সন্দেহ যায়নি। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম, ভাল হও মন্দ হও তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।'

সোমনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল।

'এখন সন্দেহ গেছে তো?'

রত্না তাহার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সোমনাথ বলিল,—'রত্না, আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়েই যেতাম, যদি তুমি আমার মনের মধ্যে না থাকতে। তুমিই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ।'

তারপর দীর্ঘকাল আর কোনও কথা হইল না। স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনের মধ্যে চোখ বুজিয়া রত্না ভাবিতে লাগিল, পূর্ব জন্মে কোন্ পুণ্য করিলে মানুষ এত সুখ অনুভব করে?

* * *

একটি মোটর লঞ্চ নদীর রবিকরোজ্জ্বল বুক চিরিয়া দক্ষিণ মুখে চলিয়াছে! নক্ষত্র বেগে ছুটিতেছে ; যেন উড়িয়া চলিয়াছে।

দুই তীরের নগর পিছনে পড়িয়া রহিল ; গ্রামগুলি কিছু দূর আসিয়া থামিয়া গেল। কেবল রহিল উপরে নির্মেঘ নীল আকাশ, আর নীচে সুজলা শ্যামলা বঙ্গভূমি।

নদী ক্রমে সপ্তমুখা হইল ; আঁকিয়া বাঁকিয়া শাখা বিস্তার করিয়া গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করিল। ক্ষিপ্রবেগা তরণী তাহারই পাকে পাকে পথ চিনিয়া চলিয়াছে ; যেন বন-কপোত নিজ নীড়ের সন্ধানে উড়িয়া যাইতেছে। অতি নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষুদ্র একটি নীড়, সেই নীড়ে সে ফিরিবে—তাহাতে কেবল দুইটি পাখীর স্থান—

চারিদিকে আলো ও ছায়ার লুকোচুরি। কোথাও আলো বেশী, ছায়া কম ; কোথাও আলো কম, ছায়া বেশী। আলোতে ছায়াতে মিলিয়া বিচিত্র চঞ্চল ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে।

অনন্তকাল ধরিয়া আঁকিতেছে, অনন্তকাল ধরিয়া আঁকিবে।

শেষ

অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

গীতার বিভূতিযোগ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি,"—আমি অক্ষরদিগের মধ্যে অকার। আচার্য্য শংকর স্বকীয় ভাষ্যে ইহাকে বিশদীকৃত করেন নাই। শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যে আছে, "বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি, তস্য সর্ব্ব-বাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—অকারো বৈ সর্ব্বাবাক্, সৈষ স্পর্শোষ্মভিঃ ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতী শ্রূয়তে ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং।" অর্থাৎ "বর্ণদিগের মধ্যে আমি অকার। অকার সর্ব্ব বাঙ্ময় বলিয়া শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, অকারই সর্ব্ববাক্। অকারই স্পর্শও উষ্ম প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বহুসংখ্যক ও বহুরূপ হইয়া থাকে। সেই জন্যই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব।" বিভূতি যোগ অধ্যায়ে ভগবান যাবতীয় শ্রেষ্ঠ পদার্থকেই স্বকীয় রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণদিগের মধ্যে অকারই শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া আপনাকে অকারও বলিয়াছেন। এই ভাবে দেখিলে শ্রীধরস্বামীর অর্থ সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু একটা গূঢ়তর অর্থও সম্ভবপর।

বাক্-যন্ত্র হইতে যত প্রকার ধ্বনি নির্গত হয়, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া বৈয়াকরণিকগণ কতকগুলি মৌলিক ধ্বনির আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ণমালার বর্ণগুলিই সেই মৌলিক ধ্বনি। এই মৌলিক ধ্বনিগুলিকে বুঝাইবার জন্য তাহারা প্রত্যেক ধ্বনির চক্ষুগ্রাহ্য চিহ্নেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানসিক ভাব নিজের নিকট স্পষ্টীকৃত ও অন্যের নিকট প্রকাশিত করিবার জন্য ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। সেই ধ্বনি লিখিত অক্ষর দ্বারা রূপায়িত হয়। মানসিক ভাবের সহিত তৎপ্রকাশক ধ্বনির সম্বন্ধ, এবং ধ্বনির সহিত তৎপ্রকাশক অক্ষরের সম্বন্ধ আমরা মনুষ্যকৃত—মানুষের সুবিধার জন্য মানুষেরই সৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকি। একই পদার্থ বুঝাইতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়, এবং একই ধ্বনি প্রকাশ করিতে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন লিপি ব্যবহৃত হয়, দেখিয়া মানসিক ভাব ও তৎপ্রকাশিত ধ্বনি, এবং ধ্বনি ও লিপির সম্বন্ধ মনুষ্যকৃত (Conventional) মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন বাক্য ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ, এবং বাক্য ও লিপির মধ্যে সম্বন্ধ নিত্য। জাগতিক যাবতীয় দ্রব্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত, এবং ইহাদের প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের ধ্বন্যাত্মক এক একটি রূপ আছে। বর্ণ (রং) চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য, কিন্তু প্রত্যেক মৌলিক বর্ণের একটি শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপও আছে, যাহা ধ্বনি মাত্র। প্রত্যেক চক্ষুগ্রাহ্য আকারেরই (form) একটি শ্রবণ-গ্রাহ্য রূপ আছে, যাহা ধ্বনি মাত্র। ধ্বনি দ্বারা সেইরূপ শ্রবণ-গ্রাহ্য হয়। যৌগিক দ্রব্য সকলের ধ্বন্যাত্মক রূপ মৌলিক ধ্বনির সমবায়ে গঠিত হয়। গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান্। ভগবান বলিতে যাহা বুঝায় "অকার" তাহার ধ্বন্যাত্মক রূপ। তাই ভগবান্ আপনাকে অকার বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন।

George Russel প্রথিত-নামা সাহিত্যিক। তিনি কবি ও কলাকৌশলী চিত্রকর। 'A. E এই ছদ্ম নামে তিনি পরিচিত। তিনি বলেন "The true roots of language are vowels and consonants, each with affinity to idea, force, colour and form, the veriest abstractions of these, but by their union into words, expressing more complex notions as atoms and molecules by their union form the compounds of the chemist.......The roots of human speech are the sound correspondences of powers, which in their combination and interaction, make up the universe. The mind of man is made in the image of the Deity, and the elements of speech are related to the powers in his mind, and through it, to the being of the Oversoul (Candle of Vision 1920 Edition, p p. 120-121) অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলিই মানুষের ভাষার প্রকৃত মূল। প্রত্যয় (idea) শক্তি, বর্ণ ও আকারের (form) সহিত,—ইহাদের বিশুদ্ধতম রূপের সহিত—স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ দিগের সাদৃশ্য আছে। পরস্পরের সংযোগ দ্বারা শব্দ গঠিত করিয়া তাহারা জটিলতর ভাব প্রকাশিত করে, যেমন অণু ও পরমাণুর সংযোগে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়।...যে সমস্ত শক্তির সংযোগ ও পরস্পরের উপর ক্রিয়া দ্বারা এই বিশ্ব গঠিত, মানবীয় ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলি তাহাদের প্রতিরূপ। মানবের মন ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট। মানবের মনে যে সকল শক্তি আছে, ভাষার মূলগুলি তাহাদের সহিত, এবং সেই সূত্রে পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ।"

George Russel আরও বলেন "The first root (of language) is A—the sound symbol for the self in man, and the Deity in the cosmos—ভাষার মৌলিক ধ্বনি সকলের প্রথমটি "অ"—মানবাত্মার, ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের প্রতীক।

কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? Russel বলেন তিনি পরীক্ষা করিয়া এই মতের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। বর্ণমালার এক একটি বর্ণ লইয়া গভীর মনঃসংযোগ (পাতঞ্জল দর্শনের "সংযম") সহ তাহার চিন্তা করিতে করিতে মনের মধ্যে তাহার ফল লক্ষ্য করিয়াছিলেন।" সংযমের সময় তিনি এক একটি ধ্বনি জপ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে যে অনুভূতি, যে বর্ণ, যে আকার অথবা প্রত্যয় তাহারা মনে উদিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় গুহ্যশাস্ত্রের (mystical literature) উল্লেখ করিয়া Russel বলিয়াছেন, যে

তিনি পরীক্ষা দ্বারা রূপ, বর্ণ ও শক্তির সহিত বিভিন্ন ধ্বনির যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ভারতীয় শাস্ত্রের সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও, অনেক স্থলে মিল আছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি গীতায় "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি"—উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, ইহার সহিত তাহার পরীক্ষালব্ধ ফলের মিল আছে। "শিবাগম" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহার সহিত তাহার পরীক্ষালব্ধ ফলের আংশিক মিল আছে। শিবাগমে 'র' বর্ণকে অগ্নির প্রতীক, এবং ত্রিকোণ বলা হইয়াছে। Russel যদিও 'র' ধ্বনিকে রক্তবর্ণ ও অগ্নির প্রতীক রূপে পাইয়াছিলেন, উহার আকার ত্রিকোণরূপে প্রাপ্ত হন নাই।

প্রকৃতি পরমাত্মার ব্যক্ত মূর্ত্তি। স্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। প্রকৃতি ও জীবাত্মার মধ্যে এই সাদৃশ্য আছে বলিয়াই প্রকৃতি মানবের জ্ঞানগম্য এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে স্বাজাত্য উপলব্ধি করে। মানবসৃষ্টির প্রথমাবস্থায় আর্য্য ঋষিগণ এই স্বাজাত্য অনুভব করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তাঁহাদের আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মূর্ত্তি বেদ ও উপনিষদে প্রতিফলিত। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শ তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই উপভোগের আনন্দ তাহাদের কণ্ঠ হইতে ভাষারূপে স্বতঃ নির্গত হইয়াছিল। তখন তাহা যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সেই ভাষার বর্ণিত পদার্থের স্বয়ংসিদ্ধ রূপ, শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ধ্বনিরূপ। বিশ্বকর্ম্মা কবি, বিশ্ব তাঁহার কণ্ঠের বাণী! বিশ্বের প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ—প্রত্যেক মৌলিক বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, শব্দ ও স্পর্শ—তাঁহার বাণীর এক একটি অক্ষর, সেই সকল অক্ষরের সমবায়ে বিশ্বকাব্য রচিত। সেই কাব্যের বর্ণমালা কোনও কোনও দেশে মানুষ অভিজ্ঞা (intuition) দ্বারা লাভ করিয়াছিল। আর্য্য ভাষাগুলির মূল ধাতু ও প্রকৃতির গবেষণা দ্বারা George Russel এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। জগতের কোনও কোনও জাতি অন্তর্মুখী, কোনও কোনও জাতি বহির্মুখী। অন্তর্মুখী জাতির কেহ কেহ আপনাদের অন্তরে আলোকের সন্ধান করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে ধ্বনি ও পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ তাহাদের মনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল জাতির ভাষাই অভিজ্ঞা-প্রসূত (intuitional) নহে। কোথাও কোথাও বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে বুদ্ধির দ্বারা ভাষা সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই সকল ভাষায় বাক্য ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য নহে। অভিজ্ঞা-জাত ভাষাতে যেখানে শব্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, সেখানেও সে সম্বন্ধ রক্ষিত হয় নাই।

কলম

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

সেদিন এক ব্যাঙ্কার বন্ধুর চেম্বারে বসেছিলুম। বাইরে জীপ গাড়ী থামিয়ে এক আমেরিক্যান মিলিটারী ঢুকল। চেহারাটা সুশ্রী, হয়তো সেখানকার কোন ভাল বাড়ীরই ছেলে। আভিজাত্য রক্ষার জন্যে নিউইয়র্কের একটা ব্যাঙ্কের চেকবই বার করে জানতে চাইলে, যদি একটা চেক কেটে দেওয়া হয়, এখনি তার বদলে টাকা দেওয়া যায় কিনা। তা দেওয়া সম্ভব নয় শুনে অন্য দু চারটে সাধারণ কথা কয়ে উঠে পড়ল। যাবার জন্যে এক পা বাড়িয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে পকেট থেকে একটা কলম বার করে বললে, হাঁ দেখ, কলমটা নেবে, একেবারে নতুন, ভাল কলম।

কলমটা কেনা হল। আমি অনেক দিন থেকে একটা ভাল কলম খুঁজছিলুম বলে বন্ধু আমাকেই দিলেন। যুদ্ধের সময় একান্ত দুষ্প্রাপ্য জিনিসটি এমনভাবে পেয়ে আমার বড় আনন্দ হল।

সত্যি কলমটা সুন্দর এবং নতুন। সময় সময় কলমটার দিকে চেয়ে আমার মন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার ফিকে নীল রঙের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মন নীলাকাশ বেয়ে উড়তে উড়তে সুদূর আমেরিকার এক পল্লীপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়। তরুণী তার দয়িতের কথা চিন্তা করছে, কদিন চিঠি না পেয়ে মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। রোজ একখানা করে দেবার কথা ছিল, কয়েক মাস যাবার পর সেটা সাত দিনে একখানা করে দাঁড়ায়, এখন একেবারে এক মাস কোন খবরই নেই। দূরে গিয়ে মিলিটারী জীবনের কোলাহলে পাছে তাকে চিঠি লিখতে সব সময় মনে না থাকে, সেইজন্যে এই কলমটি কিনে প্রেমাস্পদের পকেটে লাগিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই কলমটা দেখলেই আমার কথা তোমার মনে পড়বে, এই কলমটা দিয়েই আমাকে চিঠি লিখো।

হেসে বলেছিল দয়িত, কলম তো দিলে, যদি কালি

ফুরিয়ে যায়? উত্তর করেছিল চম্পকবরণী, যেখানেই যাও, জল পাবে তো, সেই জলে ডুবিয়ে নিয়ে লিখো, আমি ঠিক পড়ে নেব।

যদি তাও না মেলে, তাহলে কিসে লিখব? চোখের জলে? বল।

আমার এত ভাগ্য—বলে হেসে কণ্ঠলগ্ন হতে গেছল শ্রীমতী, মাথায় হঠাৎ প্রেমাস্পদের পেনটাই লেগেছিল আগে। উঃ, কেমন বাধা দিচ্ছে দেখ!

তাইতো, এমন ভালবাসার স্মারকচিহ্নকে হয়তো মাত্র এক বোতল সুরার জন্যে এমনভাবে ছেড়ে দিয়ে গেল! এখনও যেন তার স্নেহকোমল করস্পর্শ আমি কলমটিতে পাচ্ছি।

কিন্তু কলমটাতে কেমন যেন বারুদের গন্ধ মনে হচ্ছে। তা আশ্চর্য নয়, কত যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটেছে পকেটে, কত কামানের গোলার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে, কত সেলের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে শঙ্কিত হয়ে কেঁপেছে। কত সময় রিভলবারের পাশাপাশি থেকে প্রহর গুণেছে।

কোথা থেকে যেন সুরার গন্ধ আসছে। বোধ হয় নিবটা থেকে। তা হতে পারে। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, হয়তো ট্রেঞ্চে কেটেছে, বেরোবার উপায় নেই। এমন সময় হয়তো প্রিয়াকে মনে পড়েছে; চিঠি লিখতে গিয়ে দেখে, কালি ফুরিয়েছে। উপায়ান্তর না পেয়ে হয়তো পানপাত্রেই নিবটা ভিজিয়ে লিখতে গেছে।

সত্যি, কি বিস্তৃত এই কলমটির অভিজ্ঞতা! কত ঊর্মিময় সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস এটি হাতে নিলে আমি শুনতে পাই। এর ফিকে নীল রঙের দিকে চাইলে আমার মনে পড়ে নীলাকাশ ভেদ করে এরোপ্লেনের তীব্র গতি। স্বর্ণাভ নিবটির দিকে চোখ পড়লে মনে ভাসে দিকচিহ্নহীন মরুভূমি।

সত্য, আজকালকার অত্যন্ত ব্যস্ত জীবনের সত্যকার লেখনী হচ্ছে ফাউনটেনপেন। কলম মসীপাত্রে রাখবার সময় নেই, চিন্তার সময় নেই, দ্রুতগতিতে দিতে হবে কালির খোঁচড়। অস্থির প্রতীচি-জীবনের সঙ্গে ফাউনটেন-পেন ষোল আনা খাপ খায়, আমাদের অভাবগ্রস্ত দীন ভারতীয় জীবনের সঙ্গে এখনও তার পুরোপুরি মিল হয়নি।

লিখি আর না লিখি, কলমটা টেবিলে সাজান আছে দেখতে আমার ভাল লাগে। আমার সাধারণ লেখার সময় আমি আর একটি কলম ব্যবহার করি, সেটিও মসীবাহন, তবে কিছুদিন আগে কেনা এবং এতটা মূল্যবান নয়। সময় সময় আমি পড়তে পড়তে থেমে গিয়ে একটা লেখার প্লট চিন্তা করতে থাকি এবং মাঝে মাঝে আমার সুন্দর কলমটির দিকে চাইতে থাকি। কলমটি যেন আমাকে অভয় দিতে থাকে, যত শক্ত ও জটিল সমস্যাই রচনা কর না কেন, সে সাবমেরিন-সঙ্কুল সমুদ্র যেমন সহজভাবে পার হয়ে এসেছে, তেমনি স্বাবলীলভাবে সেই সব সমস্যা অতিক্রম করে যাবে।

অনেক লেখকেরই তাঁদের কোন একটি কলমের উপর অত্যন্ত প্রীতি থাকে। বিশেষ কিছু লেখার সময় তাঁরা তাঁদের বেশী প্রিয়টিকেই বেছে নেন, সেটি যেন অনেক সেঞ্চুরি-করা ব্যাটসম্যানের পয়মন্ত ব্যাট, না নিয়ে খেললে হারবার ভয়। পাছে কোন ক্ষতি করে বসে কলমটির, এই ভয়ে সেটি তাঁরা অতি নিকট-আত্মীয় বা পরম বন্ধুকেও দিতে চান না কিছু সময়ের ব্যবহারের জন্যে।

আমার এ কলমটি আমি সর্বদা সাবধানে রাখবার চেষ্টা করি। কিন্তু চেষ্টা করলে কি হবে, সব সময় পুত্রকন্যার তীক্ষ্ণ চক্ষু এড়াতে পারি না। টেবিলে আমার অন্য কলমটা পড়ে থাকলে ততটা তাদের লক্ষ্য হয় না, এমন কি তাদের মায়ের কলমটাও তাদের তেমন আগ্রহ সঞ্চার করে না, যত ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে এই কলমটি। একবার ছেড়ে গেলেই হল! কেউ না কেউ নিশ্চয়ই নিয়ে বসেছে।

সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, আমার স্ত্রী তাঁর নিজের একটি সুদৃশ্য কলম থাকতেও এই কলমটিতে বাজারের হিসেব লিখতে ভালবাসেন। তাঁর বান্ধবীদের এক আধটা চিঠি দেন এতে, বা সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি থেকে কোন কিছু দরকারী কথা লিখে রাখেন, তাতে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু বাজারের বা ধোপার হিসেব লেখা এই কলমে—এ যে এরোপ্লেন দিয়ে রাবিশ বওয়ান! তাঁর কাছে এ নিয়ে কথা তুললে তিনি বলেন, তোমার রোমান্টিক যুদ্ধফেরৎ লেখনীকে সংসারী করেছি।

তা হবে। হয়তো তা অনুচিতও নয়, কারণ সেই

সৈনিক হয়তো এতদিন একেবারে সংসারী হয়ে গেছে; তার কলম একটু সংসারী হবে, তাতে আর ক্ষতি কি! প্রিয়ার কাছে তার দেওয়া সেই কলমটি যুদ্ধক্ষেত্রে কোথায় হারিয়ে গেছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে আবার একটা কলম কিনেছে; হয়তো এইটারই মত সম্পূর্ণ দেখতে। আশ্চর্যের বিষয় কিছুমাত্র নয়, সেই সৈনিক, অবশ্য এখন আর সৈনিক নয়, এখন এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, তার অফিসে বসে অত্যন্ত সাধারণ চিঠিপত্র সেই কলমে লিখছে।

কিন্তু এক আধ সময় এখনও কি আকস্মিক অন্যমনস্কতায় সৈনিকটি কলমটা সুরাপাত্রে ডুবোতে যায় না? হয়তো যায়, কিন্তু চকিতে চোখের সামনে ভেসে উঠে প্রিয়ার বদলে গৃহিণী! মানুষের জীবনে নিত্য পরিবর্তন। কিন্তু কোথা থেকে সুরার গন্ধ আসছে না?

রাষ্ট্রভাষা ও পরিভাষা

অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে এ স্বপ্ন একদিন আমরা বাঙালিরা দেখেছিলাম, কিন্তু যখন আমরা উপলব্ধি করলাম যে ঘটনা স্রোত আমাদের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তখন আমরা আবার হেলায় সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়েছি। ভারতের সংবিধান পরিষদে ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের কাল আসন্ন—রাষ্ট্র ভাষা সম্বন্ধে বাঙালির এখন এতটা নিরুদ্বিগ্ন থাকা অনুচিত।

প্রবল যুক্তিতর্কের অবতারণা করেও বাঙালি একটি মাত্র কারণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সংবরণ করেছেন। তাঁরা অনুভব করেছেন, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী বহু পূর্বেই কেমন ক'রে ভারতের সর্বত্র তার আসন বিস্তার ক'রে নিয়েছে। উত্তর ভারতে পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, গাড়োয়ালী, আউধী, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরী, মৈথিলী, মালবী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষায় যাঁরা ঘরে কথা বলেন, পোষাকি ভাষা হিসাবে সভা-সমিতিতে, বিদ্যালয়ে, সাহিত্যে তাঁরা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করেন,—এই ভাবে বিহার থেকে রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের ভাষা হয়ে পড়েছে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। এখন এই ভাষা যাঁরা ব্যবহার করছেন, তাঁদের সংখ্যা হবে মোটামুটি ১৬ কোটি। এ ছাড়া ইংরাজী না জানলে ভিন্ন প্রদেশের ভিন্নভাষাভাষী জনসাধারণ ভাঙা হিন্দীতেই ভাব বিনিময় করেন। বহু স্থানে বাংলা দেশের গ্রামেও কুলি-মজুর হিন্দুস্থানী হ'লে তার সঙ্গে ভাঙা হিন্দীতেই কথা বলা হয়। দেশ বিভাগের আগে গোয়ালন্দ ঘাটের হিন্দুস্থানী কুলি বাংলা ভাষা না জেনে অবাধে বাঙালি যাত্রীর সঙ্গে তাদের কাজ চালিয়ে গেছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—ভারতের প্রায় সর্বত্র ভাঙা হিন্দী ছড়িয়ে পড়েছে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মাত্র এই একটি বিষয় অনুভব করেই বাঙালি এই প্রসারশীল ভাষাটির পক্ষে নিজেদের দাবি ত্যাগ করেছেন।

এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে বহু প্রসার ও প্রচারকার্যের ফলে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাই আমাদের রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করতে চলেছে, আর আমরা অধিকাংশ বাঙালিই এ বিষয়ে আমাদের মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করছি। কিন্তু বাঙালি একটা কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেননি। হিন্দী ভাষার কয়েকটি রূপ ভেদ আছে—এই ভেদের ব্যবধানও বড় কম নয়। আমরা যাঁরা হিন্দীভাষী নই, তাঁরা হিন্দীর কোন্ রূপটিকে স্বচ্ছন্দে বরণ করতে পারি? শুধু বাঙালির নয়, সমগ্র ভারতবাসীরই বর্তমান মুহূর্তে এটি চিন্তা ও উদ্বেগের বিষয়।

হিন্দুস্থানের ভাষা হিন্দুস্থানী এবং হিন্দী বরাবরই একার্থক ছিল, রাজনৈতিক কারণে বর্তমানে হিন্দুস্থানী হিন্দী থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে—এ কথায় পরে আসছি। উর্দু এবং 'খড়ীবোলী' হিন্দী এক না হলেও দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা বলা চলে না—দুটি ভাষাই ভারতীয়, দুটিই সংযুক্ত প্রদেশে জাত এবং প্রথমাবস্থায় বর্ধিত, দুটিরই ব্যাকরণ এক, পার্থক্য মাত্র শব্দ সম্ভারে। হিন্দীতে সংস্কৃত এবং সংস্কৃতজ শব্দের প্রাচুর্য এবং উর্দুতে আরবী ফারসীর। বিহার থেকে রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের পোষাকি ভাষা, লেখার ভাষা হওয়ায় হিন্দীর বিভিন্ন রচনাশৈলী আছে—অঞ্চল বিশেষে আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগের হারে কম বেশী আছে—এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে কোন অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানে প্রায় একই ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষাই ফারসী লিপিতে লেখা হ'লে আর আরবী ফারসী শব্দের অধিক প্রয়োগ থাকলে উর্দু নামে অভিহিত হয়। হিন্দী সাহিত্যিকদের অভিযোগ হচ্ছে—মুসলমান লেখকেরা তাঁদের রচনা-শৈলীতে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষাকে ছাড়িয়ে আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ এত অধিক পরিমাণে ক'রে এসেছেন যে বিশেষ শিক্ষা না থাকলে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের বোধের বাইরে চলে গেছে তাঁদের সে রচনা—এইভাবে লিপিভেদের সঙ্গে রচনাভেদও প্রচুর রয়ে গেছে। তাছাড়া সঙ্গে বিষয় ভেদও রাখা হয়ে এসেছে। দেবতাত্মা নগাধিরাজ ভারতের হিমালয়ের বর্ণনা সে সাহিত্যে দুর্লভ, আছে তার স্থানে কাল্পনিক কোহকাফের বর্ণনা, মলয়ানিল স্পর্শে কোকিলের

কুহুধ্বনির চেয়ে বাগিচার বুলবুলির সেখানে অনেক বেশী সমাদর, বীরের নাম করতে হলে আমরা সেখানে ভীমকে একবারও পাই না—পাই রুস্তমকে, ত্যাগ উদারতার কথায় দধীচির বা শিবির নাম কখনও শুনি না, শুনি হাতিমের, সুশাসক ব'লতে ও সাহিত্যে পাব দারা, সিকন্দর, খুসরু, জমশেদ আর আদর্শ প্রেমিক বলতে পাব লৈলা-মজনু আর শিরিফরহাদ প্রভৃতিকে। হিন্দী সাহিত্যিকদের অভিযোগ, এইভাবে উর্দু'র মারফৎ ভারতবর্ষের মুসলমানদের একটা পৃথক সংস্কৃতি রক্ষা করা হয়ে এসেছে—যা আমরা চীন, ব্রহ্ম, জাভা, সুমাত্রা, রুশ প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে দেখি না এবং এরই ফলে হয়েছে দেশবিভাগ। জন্মভূমির কোন সাধনার সঙ্গেই এ সাহিত্যের শিক্ষায় অন্তরের যোগ গড়ে ওঠে না।

"হিন্দুস্তানী কোঈ ভাষা হৈ হী নহীঁ। উসকা ন কোঈ ব্যাকরণ হৈ, ন সাহিত্য।"—হিন্দুস্থানী বলে কোন ভাষাই নেই, না আছে তার ব্যাকরণ, না সাহিত্য—বলছেন হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের বর্তমান সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস। একথা যে শেঠ গোবিন্দদাসই বলেছেন তা নয়, আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই একই কথা বলেছেন। এ হিন্দুস্থানী হিন্দীর নামান্তর নয়। এ হচ্ছে ভারত-বিভাগের পূর্বে লীগের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের কল্পিত এক ভাষা—এ ভাষায় সত্যই কোন সাহিত্য নেই, এর কোন পূর্ব-ইতিহাস নেই। এর কথ্যরূপ আছে, তা হচ্ছে কথ্য উর্দু। এ ভাষায় লিখতে গেলে লেখার উর্দু থেকে দুর্বোধ্য আরবী-ফারসী শব্দ বাদ দিতে হবে, আর হিন্দীতে আরবী-ফারসীর হার বাড়াতে হবে। দেশ বিভাগ না হ'লে সম্মিলিত রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলতে নানা অসুবিধা সহ্য ক'রেও এ ভাষাই হয়ত ভারতবাসীকে স্বীকার করতে হ'ত, কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পণ্ডিত নেহরু, শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ, শিক্ষাবিভাগের ডাঃ তারাচাঁদ, কাকা কালেলকর প্রভৃতি ইচ্ছা করলেও ভারতের অধিকাংশ জনগণ এ ভাষাকে অস্বীকার করবে—অবশ্য তা সাম্প্রদায়িক কারণে নয়।

রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের কল্পনায় ছাড়া হিন্দুস্থানী বলে একেবারেই কোন ভাষা নেই বলে একটু অত্যুক্তি করা হয়। পূর্বেই বলেছি, বিশেষ সাহিত্য না থাকলেও বাজারের বুলি হিসাবে এরকম একটা ভাষা যুক্তপ্রদেশের অঞ্চল বিশেষে চলিত আছে। এখন কথা হ'চ্ছে, এই সাধারণ আলাপ আলোচনার ভাষা বাজারের বুলি রাষ্ট্রভাষা হ'তে পারে কিনা? আমাদের রাষ্ট্রভাষাতে প্রথমত আমাদের নবরচিত শাসনতন্ত্রটুকু লিপিবদ্ধ করতেই হয়। বাজারের বুলিতে পারিভাষিক শব্দগুলি কোথা থেকে আসবে? এই রাষ্ট্রভাষা যদি আইন-আদালত, শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চার ভাষা হয়, তাহলে অনতিবিলম্বে অন্তত ৫০ হাজার পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হবে, সে শব্দ জনসাধারণের ভাষায় কোথায়? এ শ্রেণীর ইংরাজী শব্দগুলি সবই হুবহু গ্রহণ করার অনুকূলে আমাদের অভিরুচি থাকলে তার চেয়ে ইংরাজী ভাষাটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেই সব বখেড়া মিটে যায়। আর যদি আরবী ফারসী এবং সংস্কৃত-সংস্কৃতজ শব্দসম্ভারপূর্ণ রাজনৈতিক "হিন্দুস্থানী" রাষ্ট্রভাষাতে পরিভাষা তৈরী ক'রে নিতে হয়, সে পরিভাষা আরবী-ফারসী, না সংস্কৃত থেকে তৈরী ক'রে নেওয়া হবে? গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহায়তা ছাড়া এ কাজ হবার নয়। Vice President-এর হিন্দুস্থানী কি হবে, 'নায়ব প্রেজিডেণ্ট', না 'উপরাষ্ট্রপতি'; Council of Ministers='বজীর মণ্ডল', না 'মন্ত্রি-পরিষৎ'; Chief Minister='বড়া বজীর', না 'মহামন্ত্রী', 'প্রধান মন্ত্রী'; Ex-officio='ওহ্‌দেকে নাতে', না 'পদাধিকারিক'; Sinking fund='বট্টাখাতা', না 'ঋণশোধকোষ'; Tribe='কবীলা', না 'উপজাতি'; Writ of Habeas Corpus='পরবানা হাজরী মুলজিম', না 'বন্দীউপস্থাপন লেখ'; Writ of Quo-warranto='পরবানা ইজহার হক', না 'অধিকার প্রশ্ন লেখ'?

যাঁরা হিন্দুস্থানী ভাষার সমর্থক তাঁরা প্রথম প্রদত্ত শব্দগুলির পক্ষপাতী, অন্য শব্দগুলি তাঁদের নিকট দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম। এই হিন্দুস্থানী সমর্থকদের সংখ্যা খুব কম হলেও রাষ্ট্রীয় হাটে তাঁদের দর খুব চড়া—তাঁরা অঘটনও ঘটাতে পারেন। এই দলের পণ্ডিত নেহরু বলেছেন—ফারসী বা সংস্কৃত পণ্ডিতের ভাষা নয়, জনসাধারণের ভাষাই (language of the people) রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযোগী। তিনি বলেন—হিন্দুস্থানী এই জনসাধারণের ভাষা। তিনি আরও বলেছেন—সমৃদ্ধিশালী ইংরাজী ভাষা এখনও প্রতি বৎসর বহু বিদেশী শব্দ তার শব্দভাণ্ডারে গ্রহণ ক'রে আরও অধিক শক্তিশালী হচ্ছে। তাঁর মতে জীবিত উন্নতিশীল ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানে প্রচলিত ইংরাজী শব্দগুলি হিন্দুস্থানীতে গ্রহণ করা উচিত।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্ণয়, জাতীয় সংগীত নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে সংবিধান পরিষদে অনেকখানি উত্তাপ সঞ্জাত হওয়ার আশঙ্কায় এই সব অনলবর্ষী বিষয়গুলি পরিষদের শেষের পর্যায়ের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু হিন্দী এবং হিন্দুস্থানীর সমর্থকদল নীরবে বসে নেই, সকলেই পুর্ণোদ্যমে প্রস্তুত হচ্ছেন। সংবিধান পরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের আদেশে মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীঘনশ্যামসিংহ গুপ্তের অধিনায়কতায় "ভারতীয় সংবিধানকা প্রারূপ" (অর্থাৎ পূর্বরূপ) নাম দিয়ে খসড়া শাসনতন্ত্রের একটা হিন্দী অনুবাদ তৈরী হয়েছে। তাঁরই আদেশে হিন্দুস্থানীতে এই খসড়ার আর একটি অনুবাদ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর শ্রীসুন্দরলাল প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত করান হয়েছে। এই দ্বিতীয় অনুবাদটিতে মহাত্মাজীর বিশ্বস্ত অনুচর কাকা কালেলকর, ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের শিক্ষা বিভাগের ডাঃ তারাচাঁদ প্রভৃতির হাত আছে। এই অনুবাদটি পাশাপাশি নাগরী এবং ফারসী দ্বিবিধ লিপিতে ছাপা হয়েছে—বইটির নাম "হিন্দকে বিধানকে মসৌদে কা হিন্দুস্তানী অনুবাদ"। প্রথম অনুবাদটিতে সন্তুষ্ট না হতে পেরে হিন্দীর সমর্থক প্রয়াগের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন ও শ্রীবিদ্যানিবাস মিশ্র অপরএকটি হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এই অনুবাদ তিনটি পাশাপাশি লক্ষ্য করলে হিন্দী আর

হিন্দুস্থানীর মধ্যে থেকে আমাদের উপযোগী রাষ্ট্রভাষা চিনে নিতে মোটেই কষ্ট হয় না। আমাদের আশংকা আর উদ্বেগ আমরা যা সহজেই চিনে নিতে পারি, রাষ্ট্রনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সেটাই না তলিয়ে যায়।

Part I

The Union and its territory and jurisdiction.

(1) **India shall be a Union of States.**

(2) **The states shall mean the states for the time being specified in parts I, II and III of the First Schedule.**

হিন্দুস্থানী অনুবাদ— হিস্‌সা এক

য়ুনিয়ন ঔর উসকা ইলাকা ঔর অমলদারী

(১) হিন্দ রিয়াসতোঁ কা এক য়ুনিয়ন হোগা।

(২) রিয়াসতোঁ সে মতলব উন রিয়াসতোঁ সে হোগা জিনকে নাম উস সময় পহলী পট্টাকে পহলে, দুসরে ঔর তীসরে হিস্‌সোঁ মেঁ দর্জ হোঁ।

হিন্দী দুইটি অনুবাদই প্রায় একরূপ,—

ভাগ এক

সংঘ ঔর উসকা রাজ্যক্ষেত্র তথা অধিকারক্ষেত্র

(১) ভারত রাজ্যোঁ কা সংঘ হোগা

(২) রাজ্যোঁ সে প্রথম অনুসূচীকে ভাগ ১, ২ ঔর ৩মে উস সময় উল্লিখিত রহে রাজ্য অভিপ্রেত হোংগে।

প্রথম হিন্দুস্থানী অনুবাদটি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে বিন্ধ্য পর্বতের এদিককার বহুগুণে সংখ্যাধিক জনসাধারণ এ ভাষাটি বোঝে, আর তাই এর নামও দেওয়া হয়েছে হিন্দুস্থানের ভাষা হিন্দুস্থানী। আমরা কিন্তু হিন্দী হিন্দুস্থানীতে অনভিজ্ঞ বাঙালিরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমটি অর্থাৎ হিন্দুস্থানীর তুলনায় দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ হিন্দীতে আমাদের পরিচিত শব্দ অনেক বেশি রয়েছে। এর কারণ আরবী-ফারসী হিস্‌সা, অমলদারী, রিয়াসৎ প্রভৃতির চেয়ে সংস্কৃত ভাগ, অধিকার-ক্ষেত্র, রাজ্য প্রভৃতি আমরা অনেক ভাল বুঝি। হিন্দীর মত বাংলাভাষা, সংস্কৃতভাষা থেকে উৎপন্ন বলেই এ রকমটি হ'ল। বিন্ধ্য পর্বতের একদিকে কেন উভয় ভাগেরই ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলি অসমীয়া, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, অন্ধ্রের তেলেগু, কেরলের মলয়ালম, কর্ণাটকের কানাড়ী প্রভৃতি বাংলার মত সংস্কৃত থেকে জাত অথবা সংস্কৃতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। এগুলির তুলনায় কম হলেও দক্ষিণ ভারতের অপর একটি গৌরবময় ভাষা তামিলনাদের তামিলের মধ্যেও বহু সংস্কৃত শব্দ আছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীর পক্ষে মোটের উপর আরবী ফারসী শব্দবহুল ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দ-বহুল ভাষা আপন আপন অঞ্চলের ভাষার অধিক নিকটবর্তী হবে। এ অবস্থায় আমাদের আবেদন এই যে হিন্দুস্থানী অনুবাদের ভূমিকার নিয়ে প্রদত্ত আবেদনটি যেন সংবিধান পরিষদের সভ্যদের বিভ্রান্ত না করে।

"Now that the real power of the State is in the hands of the people, it is the people who prepare the constitution. * * * * Therefore it is natural and even necessary that this constitution should be prepared in the language of the people, and it is quite clear that if there is any language which will be understood by the largest number of the members of the Constituent Assembly, it is this language." "This language" এখানে হিন্দুস্থানীকে বুঝিয়েছে।

এ আবেদনটুকুর পরের অংশটি থেকে প্রকৃত তথ্যটুকু লেখক নিজেই প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন—দেখা যাচ্ছে একমাত্র প্রধানত সংযুক্ত-প্রদেশের সমস্যা—হিন্দু মুসলমানের হিন্দী উর্দু ভাষা দ্বন্দ্বের সমন্বয় চেষ্টার বোঝা সমস্ত ভারতবাসীর স্কন্ধে আরোপ করা হয়েছে।'

"**Hindi Knowing persons will find very few Persian or Arabic words which they cannot understand * * * * Similarly Urdu knowing people will find only a few words of Sanskrit origin which they may not easily understand.** মাত্র সংযুক্ত প্রদেশের অধিবাসীর পক্ষে, এ কথাগুলি বহুলাংশে সত্য। কিন্তু উপরি উক্ত উপায়ের দ্বারা নবনির্মিত ভাষাটি অন্য প্রদেশবাসীদের ভাষার নিকটবর্তী হ'ল কি? একটি প্রদেশ সমগ্র দেশ নয়।

এই সংবিধানের হিন্দুস্থানী মসৌদাটি, নাগরী এবং ফারসী উভয় লিপিতে প্রদত্ত হয়েছে। ভারত রাষ্ট্র অল্পসংখ্যক উর্দু-শিক্ষিতের জন্য নাগরীর সঙ্গে ফরাসী হরফকেও রাষ্ট্রভাষার লিপিরূপে যদি স্বীকার করেন, তাহলে অন্যান্য প্রাদেশিক লিপি-গুলিরই বা অপরাধ কি? এ বিষয়ে অধিক লেখাই বাহুল্য। এরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আশা করি, আমাদের সংবিধান পরিষদে কিছুতেই গৃহীত হবে না। এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। রাজনৈতিক চাল হিসাবে আমাদের শাসন তন্ত্রের একটা পৃথক সম্পূর্ণ উর্দু অনুবাদও সরকারী অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে,—হিন্দী আর উর্দু দু' প্রান্তের দুটি অনুবাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দ্বিলিপিক মধ্যবর্তী হিন্দুস্থানী অনুবাদটি সংবিধান পরিষদের সভ্যদের দিয়ে সমর্থন করানই কি এর উদ্দেশ্য নয়?

বর্তমান সময়ের একটা বড় সমস্যা পরিভাষা বিচার। দুঃখের বিষয় বাঙলার সুধীমণ্ডলী এবিষয়ে এখনও কৃতনিশ্চয় হন নি। আমাদের এ আলোচনাতেও পরিভাষার কথা প্রধানভাবে এসে পড়ে।

হিন্দুস্থানী অনুবাদক বলছেন জনসাধারণের ভাষায় অনুবাদ করার জন্য তিনি যতদূর সম্ভব পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে চলেছেন। তবে কিছু কিছু পরিভাষা তিনি যা রচনা করেছেন আমাদের দৃষ্টিতে তার মধ্যে পরিচয় আছে রচয়িতার রাজনৈতিক বুদ্ধির। Censusএর প্রতিশব্দ 'জনগণনা' অথবা 'মরদুম শুমারী' এর কোন পক্ষই তিনি

গ্রহণ না ক'রে অপূর্ব শব্দ সৃষ্টি ক'রেছেন—'গিনাবা'। unit হচ্ছে 'ইকাঈ', তারপর unity হচ্ছে 'একা,' unify—'ইকানা,' unite—'ইকিয়ানা', union—'ইকাবা', unionism—'ইকাবাবাদ,' uniform—'একরূপ', uniformity—'ইকরূপতা', এর মধ্যে একরূপ, একরূপতা আমাদের পরিচিত। Retired—'সেবামুক্ত'—এটা হিন্দী, Scheduled—'পট্ট দের্জ' হ'ল উর্দু, ভারসাম্য বজায় রইল। এই রকম Administration—শাসন ; Administrative—ইন্তজামী।

হিন্দী আর হিন্দুস্থানী আরও কয়েকটি লাইন পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে।

হিন্দুস্থানী :—গবর্নরকো মদদ ঔর সলাহ দেনে কে লিয়ে বজীর মণ্ডল
হিন্দী :—শাসক কো সহায়তা ঔর মন্ত্রণা দেনেকে লিয়ে মন্ত্রি-পরিষদ
হিন্দুস্থানী :—আমসদন কা স্পীকর ঔর ডিপ্টী স্পীকার কা ওহদা খালি হোনা, উনকা ইস্তিফা দেনা ঔর ওহদেসে হটায়া জানা।
হিন্দী :—বিধানসভাকা অধ্যক্ষ আর উপাধ্যক্ষ কী পদরিক্তি, পদত্যাগ তথা পদনিষ্কাসন।
হিন্দুস্থানী :—খাসসদনকা চেয়রমৈন ঔর ডিপ্টী চেয়রমৈন ইত্যাদি
হিন্দী :—ব্যবস্থাপিকা পরিষদকে সভাপতি ঔর উপসভাপতি ইত্যাদি

কারপোরেশন, অডিটার, চীফ জাসটীস্, কলচর (culture), ইঞ্জীনিয়ারিং, গবর্নর, হাইকোর্ট, মশীন (Machine), পাশপোর্ট, প্রবিডেণ্ট ফণ্ড, প্রেজিডেণ্ট, সুপ্রীমকোর্ট প্রভৃতি ইংরাজী শব্দগুলি ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য হিন্দুস্থানী অনুবাদটিতে হুবহু গ্রহণ করা হয়েছে। পণ্ডিত নেহরুর কথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি, তিনিও এইভাবে হিন্দুস্থানী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন। তাঁদের বিবেচনায় এবং বাংলাদেশেরও বহু পণ্ডিত ব্যক্তির বিবেচনায়—ভাষার শক্তিবৃদ্ধি করার উপায়স্বরূপ এই হচ্ছে "healthy assimilation of words of extraneous origin"

হিন্দুস্থানে এইসব ইংরাজী শব্দগুলির কিছু ইংরাজী শিক্ষিতমহলে কিছুবা সর্বত্রই প্রচলিত। কালচার (সংস্কৃতি) ইঞ্জিনিয়ারিং (নির্মাণবিদ্যা), পাশপোর্ট (নিক্রমপত্র, ছাড়পত্র), প্রেজিডেণ্ট (সভাপতি), মশীন (যন্ত্র), গবর্নর (প্রদেশপাল, শাসক), হাইকোর্ট (উচ্চন্যায়ালয়, মহাধর্মাধিকরণ), প্রবিডেণ্ড ফণ্ড (সংস্থান কোষ), চীফ জাসটিস্ (মুখ্য ন্যায়াধীশ), অডিটর (নিরীক্ষক, অংকেক্ষক) প্রভৃতি ইংরাজীশব্দ হিন্দী ভাষায় গ্রহণ করলে কি তার দ্বারা আমাদের ভাষা সরস্বতীর শোভা বৃদ্ধি পাবে, না আমাদের ভবিষ্যতের গৌরবময় স্বাধীনতার সৌভাগ্যের মধ্যে আমাদের অতীত দাসত্বের কলংক কাহিনীর স্মৃতি ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠার বাইরেও আমাদের ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় কাল অক্ষরে চির অংকিত হয়ে থাকবে? তুষ আর শস্য মিশে থাকলে একই রকম দেখায়, কালের সুবাতাস লাগলে তুষ উড়ে যায়—শস্য পড়ে থাকে তার নিজের ওজনের ভারে। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ ইংরাজী শব্দই আমাদের দেড়শো বছরের দাসত্বের ফল। নব প্রভাতেও রাত্রির দুঃস্বপ্ন আমাদের স্মৃতিকে পীড়িত করে, কিন্তু দীপ্ত মধ্যাহ্নে তার কোন চিহ্নই থাকে না; ভারতে মুসলমান রাজত্বের অবসানে এই তো কিছুদিন পূর্বে আর একবার এই একই রকম ঘটনা ঘটে গেল। কিছুদিন পূর্বেও হিন্দুর বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র হিন্দীতে না হয়ে অধিক গৌরবজনক মনে ক'রে উর্দুতে ছাপান হত। পত্র ব্যবহার বিশেষভাবে উর্দুতেই হত। হিসাবের খাতায় মিঠাইকে শীরনী, ছোলাকে নখুদ, ঘীকে রোগনজর্দ, ধোপীকে গাজুরে ইত্যাদি ইত্যাদি লেখা হত। এই শব্দগুলি এখন গেল কোথায়? এ শব্দগুলিকে তখন ছাপমেরে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি, আর এদের বহিষ্কৃত করার জন্যও কোন রাজাদেশ পত্র ঘোষিত হয়নি। ভারতের দক্ষিণের বাতাস মৃদু গতিতে সকলের অজ্ঞাতসারে কখন হালকা জিনিসগুলি সরিয়ে নিয়ে গেছে। সংযুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যার সীতারাম তাঁর বাল্যকালের কথা স্মরণ ক'রে লিখছেন :—

"বহুতসে জমীন্দারোঁকে য়হাঁ কুছ বর্ষ পহলে তক উর্দুমেঁহী হিসাব লিখা জাতা রহা হৈ। মুঝে আপনে বচপন কী যাদ হৈ কি হিন্দীকে শব্দ হোতে হুয়ে ভা ফারসী শব্দোঁ কা প্রয়োগ সভ্যতাকা দ্যোতক সমঝা জাতা থা। হিসাব কিতাব মেঁ গেহুঁকো 'গন্দুম', চনেকো কো "নখুদ", ঘীকো "রোগনজর্দ," তিলকো "কুঞ্জদ," মিঠাইকো "শীরনী", ধোবীকো "গাজুরে", নাঈকো "হজ্জাম," ঘোড়ীকো "অস্পমাদা," কপড়ে কো "পারচা," আনেজানেকো "আমদরফ্ত," নহানে কো "গুসল," লবণ কো "নমক" আদি লিখা জাতাথা। কারণ ইসকা স্পষ্ট থা। হমারে উপর পুরানী সভ্যতাকা প্রভাব অধিক থা। তব বিবাহকে নিমন্ত্রণ-পত্র উর্দুমেঁ লিখে জাতে থে। পত্র ব্যবহার বিশেষতঃ উর্দুমেঁ হোতা থা। মেরা বিদ্যারম্ভ সন ১৮৮৯ মেঁ উর্দু, হিন্দী ব অংগ্রেজী মেঁ একসাথ কিয়া গয়া থা ঔর সংস্কার করানেবালে থে পণ্ডিত গৌরী দত্তজী ঔর মৌলবী অবদুর রহমান।"

এখন সংক্ষেপে আমাদের দাবি হচ্ছে—তাহলে তৎসম শব্দবহুল হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার আর নাগরীকে রাষ্ট্র লিপি করার,—দ্বিলিপিক রাষ্ট্র ভাষার বোঝা আমরা বহন করতে অক্ষম। কিন্তু হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকার করার সঙ্গে একটা গুরুতর প্রশ্ন আসে। আমাদের এ স্বাধীনতা যদি ভারতের প্রতি প্রান্তের অধিবাসীদের জন্য খাঁটি জিনিস হয়, তাহলে হিন্দীভাষার এ প্রাধান্য আমরা কি শর্তে মেনে নিতে রাজী হব? এবারকার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি যে ভরসা দিয়েছিলেন, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলেও বাংলা ভাষা এর জন্য পেছিয়ে যাবে না, তাতে প্রকৃত ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। বিহারের মত অন্য ভাষার শ্বাসরোধকারী হিন্দী প্রচার যদি প্রসার লাভ

হয়ে, তাহলে তার কার্যকরী প্রতিকার কোথায়—শাসনতন্ত্রে বড় বড় অধিকার লেখা থাকলেই তো আমরা সান্ত্বনা পাব না।

তারপর হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলে সমস্ত ভারতবাসীকে হিন্দী শিক্ষা করতে হবে। অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক যে এর ফলে ভাল ক'রে হিন্দীভাষার সেবা করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর হিন্দীভাষী এবং অহিন্দীভাষীদের সম্মিলিত সহযোগিতায় হিন্দীভাষা ও সাহিত্য যে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে, এতেও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতদিন একটা বিদেশী ভাষা ছিল আমাদের রাষ্ট্রভাষা, আজ হিন্দী সেই স্থান অধিকার করতে চলেছে। হিন্দীর এই শুভোদয়ে আমাদের ঈর্ষা নেই, তবে স্বাধীনতার অধিকার সকলেরই জন্য যখন সমান, তখন আমাদের অহিন্দীভাষীদের সম্মিলিত দাবি হ'বে—মাতৃভাষা ছাড়া আমাদের যেমন শিক্ষায়তনগুলিতে আবশ্যিকভাবে হিন্দী শিক্ষা করতে হবে, সেরূপ হিন্দীভাষীদেরও যেন মাতৃভাষা ভিন্ন অপর একটি দ্বিতীয় ভারতীয় ভাষা আবশ্যিকভাবে পাঠ ও শিক্ষা করতে হয়। আর সমস্ত প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি সভার উপর যেন ভার থাকে—যাতে হিন্দীভাষীদের এই অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা লোক-দেখান ব্যাপারে পর্যবসিত না হতে পারে। মাতৃভাষা ভিন্ন হিন্দী বা অন্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষার মান যাতে সকলের জন্য সমান উন্নত হয়, এই সভার ক্ষমতা থাকবে তার যথাযথ ব্যবস্থা করার। আমাদের সংবিধান পরিষদে রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনকালে এ জাতীয় ব্যবস্থাগুলি যাতে আমাদের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার জন্য বাঙালি এবং অন্য ভারতবাসীর উদ্বেগ থাকা খুবই উচিত।

অভিনেতা

শ্রীমতিলাল দাশ

(নাটিকা)

পূর্বানুবৃত্তি

শচীন্দ্র। (কপোল হইতে ঘর্ম্ম মুছিয়া) কি মস্ত বড় নাটক একটা ঘটে গেল—এখানে এমন ঘটবে স্বপ্নেও তা ভাবিনি [টেবিল হইতে পাণ্ডুলিপির কাগজ গোছাইতে গোছাইতে] লোকটা কি সত্যই গেছে—(জানালার দিকে গিয়া বাহিরে চাহিয়া) হাঁ ঐ যে গঙ্গার ধার দিয়ে যাচ্ছে—লোকটা নেহাৎ পাগল—হঠাৎ মাথায় যদি ভাগ্য-খেলায় দোলার কথা না জাগত—তাহলে এতক্ষণ ওখানে পড়ে থাকত রুধিরাক্ত দেহে। [স্মরণ করিতেও তাহার গায়ে কাঁটা দিল] যাক্, এখন যদি আর কোনও দিন দেখা করতে চাও—তুমি রতনপুরার সরকারই হও আর যেই হও, আমি আর কিছুতেই দেখা করব না—[জানালা হইতে ফিরিয়া] না মাথাটা যেন ঘুরছে—শিরঃশান্তি তেলটা কোথায় রেখেছি—(ঘুরিয়া তোরঙ্গ খুঁজিতে লাগিল) না কোথায় কি যে ফেলি কিছুই ঠিক থাকে না—

মঞ্জুগোপাল। [ছোট সুটকেশ হাতে প্রবেশ করিয়া] আমি এই বেলাই চলে এলাম—শেষে আর কেউ এসে দখল করে বসুক—তারপর অমন হয়ে কি খুঁজছ।

শচীন্দ্র। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে—

মঞ্জুগোপাল। আমার সুটকেসে এসপিরিণ ট্যাবলেট আছে—এক গ্লাস জল নিয়ে এস ভায়া।

[শচীন্দ্র জল আনিয়া এসপিরিণ ট্যাবলেট গলাধঃকরণ করিল]

মঞ্জুগোপাল। খুব মাথা ধরেছে ?

শচীন্দ্র। মাথা ধরার আর অপরাধ কি—সামনে যে ট্রাজেডির অভিনয় হল—জীবনে এর চেয়ে কঠোরতম ঘটনা আমার সম্মুখে ঘটেনি।

মঞ্জুগোপাল। কখন ঘটল।

শচীন্দ্র। এইমাত্র, তুমি যখন চলে গেলে তারপরই—তোমার সেই রক্ষিত বন্ধুজায়া না খাইয়েই ছেড়ে দিল।

মঞ্জুগোপাল। রক্ষিত নয়, পালিত।

শচীন্দ্র। কি যে বলছি আমার কিছুই ঠিক নেই—আমার মাথা ঘুরছে।

মঞ্জুগোপাল। সত্যিই তোমায় একান্ত বিবর্ণ ও পাণ্ডুর দেখাচ্ছে—(কাছে গিয়া) তুমি যে ভায়া থর থর করে কাঁপছ—কপালে ঘাম ঝরছে, ব্যাপার কি ? কি হয়েছিল ?

শচীন্দ্র। সত্যকার ট্রাজেডি—

মঞ্জুগোপাল। তুমি কি উপহাস করছ ?

শচীন্দ্র। গরীব বেচারী এক এসেছিল—সে সাহিত্যিক, বলছিল লিখে সে কিছু করতে পারেনি—সে আমার সামনেই গুলি করে আত্মহত্যা করছিল। আমি সাহায্য করতে চাইলাম—সে সাহায্য নেবেনা। কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারিনি—তখন আমার মাথায় হঠাৎ খেয়াল হল—

মঞ্জুগোপাল। (বাধা দিয়া) তার রিভালভারটি কিনে নেবে।

শচীন্দ্র। কেমন করে জানলে দাদা ?

মঞ্জুগোপাল। সেবার ঔপন্যাসিক মুখার্জ্জি যখন রাঁচি যান তখন এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছিল—তিনিই আমায় বলেছিলেন—যে একজন ভদ্রবংশীয় অভিজাত তরুণ ভিক্ষা নিতে চায়নি—মুখার্জ্জি তাকে আত্মহত্যা করা থেকে বাঁচান, লোকটির নাম ছিল—ঝাঁ—কি যেন—

শচীন্দ্র। নাম হরি সরকার।

মঞ্জুগোপাল। ঠিক তাই।

শচীন্দ্র। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) যাক্ বাঁচা গেল।

মঞ্জুগোপাল। তার রিভলবার নিয়েছ ত ?

শচীন্দ্র। (বন্দুকে দিয়া) এই ত।

মঞ্জুগোপাল। (পরীক্ষা করিতে করিতে) কত দাম দিলে ভায়া ?

শচীন্দ্র। পাঁচশত টাকা।

মঞ্জুগোপাল। হুঁ, বড় জোর এর দাম এক'শ, কিন্তু এমন একটা চমৎকার অভিনয়ের খুবই দাম আছে—কি বল ভায়া ? (রিভলভার ফিরাইয়া দিয়া) এই নাও তোমার পাটনার সুখস্মৃতি—

শচীন্দ্র। ব্যাটার নামে পুলিস কেস করছি—

মঞ্জুগোপাল। কোন্ অপরাধে ? সে তোমার ভিক্ষা নেয়নি বলে—সে ত রিভালভার বেচে তোমায় ঠকাতে যায়নি—তুমিই তাকে বেচতে স্বীকার করিয়েছ। আর আত্মহত্যা করতে চেয়ে যে করেনা, তার ত কোনও অপরাধ হয় না—কাজেই পিনাল কোডের কোনও ধারাই এর বিরুদ্ধে চলবে না—

শচীন্দ্র। দেখা যাবে, কোন ধারা খাটে—এ ত দিনে ডাকাতি। এর চেয়ে ঠকামি আর কি হতে পারে ?

মঞ্জুগোপাল। ব্যাপারটিকে তুমি এত ঘোরালো করে দেখছ কেন ?

শচীন্দ্র। তোমায় যদি এমন করে বঞ্চনা করত।

মঞ্জুগোপাল। আমি এটাকে অদ্ভুত কৌতুক বলে মনে করতাম—

শচীন্দ্র। সত্যি দাদা !

মঞ্জুগোপাল। এতদূর বিভ্রান্ত হবার কি আছে ভায়া ? বদমাসেরা কত সময় কত ভাবে কলকাতায় টাকা ঠকিয়ে নেয়, কই তা নিয়ে হয়ত কখনও এতদূর ক্ষেপতে না। জুয়াচুরি চলছে না কোথায় ? যেদিকে যাও সেই দিকেই বসে আছে রাঘব-বোয়ালের দল। বলে ঠক বাছিতে, গাঁ ওজোড়, বাংলা দেশে জোচ্চোর নয় কে বলতে পার ভায়া ?

শচীন্দ্র। অন্যায়কে কিছুতেই মানা উচিত নয় দাদা।

মঞ্জুগোপাল। অন্যায় চলছে মানুষের সর্ব্ব চেষ্টায়—দেশ আজ পূতিগন্ধময়, মানুষ সব পশু হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমরা বোধ হয় সভ্যতা থেকে বেরিয়ে আদিমযুগে চলেছি—এই পাশবিকতার গ্লানির মাঝে নরহরি একজন রসিকস্রষ্টা, তাকে সমাদরই করা উচিত।

শচীন্দ্র। সমাদর ?

মঞ্জুগোপাল। সমাদর বই কি—সে ভেজাল জিনিষ বেচেনি, জিনিষ আটকে রেখে দুনো মুনাফা করেনি—তবে বরং ভেবে নিয়েছে এক নূতন পন্থা—তার নাটকীয় রূপায়ন একেবারে নিখুঁত—কি বল ভায়া—

শচীন্দ্র। নিখুঁতই বটে।

মঞ্জুগোপাল। তবেই বল—সংসারে নবীনতা কি উপেক্ষণীয় ? উদ্ভাবনী প্রতিভা কি আদরণীয় নয় ?

শচীন্দ্র। আপনাকে ঠকায়নি, তাই এমন সদুপদেশ বর্ষণ করছেন—

মঞ্জুগোপাল। সত্যিই লোকটার প্রশস্তি পাঠ কর্ত্তব্য—দরদ দিয়ে প্রতিভাকে বুঝতে হয় ভায়া—রবীন্দ্রনাথকেও আমাদের দেশের লোক প্রথম প্রথম গালি দিয়েছে—

শচীন্দ্র। এসব ভাবালুতা আমার বোধগম্য নয়—আমি যদি তাকে কোনও দিন ধরতে পারি—তাহলে দেখিয়ে দেব—আমি এখানে এক তিলও অপেক্ষা করব না—আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা গাড়ী আছে—সেটাতেই রওনা হব—

(টেলিফোন রিং রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল)

মঞ্জুগোপাল। প্রতিহিংসায় বিচলিত হয়ো না—আমিই ফোন ধরব কি ? (ফোন ধরিয়া) হ্যালো,, আমি বোস কথা কইছি—কে দেখা করতে চান ? বাবু নরহরি সরকার—

শচীন্দ্র। (টেবিল চাপড়াইয়া) রাস্কেল কোথাকার—দেখাচ্ছি মজা—

মঞ্জুগোপাল। (রিসিভার নীচে রাখিয়া হাসিতে হাসিতে) এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—সে ভেবেছে তুমি চলে গেছ—আর খাতায় আমার নামও রয়েছে—সে হয়ত জানত ললিতদের ওখানে আমি উঠব (মাথা দোলাইয়া) তোমার কাছ থেকে সে ললিতদের ওখানে গিয়ে শুনেছে যে আমি এসেছি মধুচক্রে এবং হয়ত শুনেছে যে আমি তোমার ঘরেই আছি। তার ধৈর্য্য ও কর্ম্মশক্তির প্রশংসা না করে পারি না—সত্যই চমৎকার প্রতিভাবান যুবা (শচীন্দ্রকে দরজার দিকে যাইতে দেখিয়া) কোথায় চলছ ভায়া ?

শচীন্দ্র। ব্যাটাকে পাকড়াও করে পুলিশে দেব—

মঞ্জুগোপাল। না, না—ওর মত একজন রসিক রূপশিল্পীকে ধৃত করা হবে আর্টের অপমান—না ভায়া এমন অসহ্য হয়ে কাজ নেই—ওকে সমাদর করা কর্ত্তব্য—(রিসিভার তুলিয়া) আচ্ছা সরকারকে পাঠিয়ে দিন—মিনিট পাঁচেক পরে।

শচীন্দ্র। কি করবে দাদা ?

মঞ্জুগোপাল। তোমার জিনিষপত্র সব বাথ-রুমে সরিয়ে ফেলা ক—তারপর তুমি ওখানে লুকিয়ে থেকে মজাটি দেখ।

শচীন্দ্র। কিন্তু তাহলে এ গাড়ীটা আর ধরা হবে না—

মঞ্জুগোপাল। নাই বা হল—বিকালের গাড়ীটা এক্সপ্রেস—সেটায় যে—নাও তাড়াতাড়ি কর ভায়া—

[উভয়ে ধরাধরি করিয়া শচীন্দ্রের জিনিষপত্র বাথরুমে নিয়া গেল, তারপর আসিয়া গম্ভীর ভাবে টেবিলে বসিল—দরজায় শব্দ হইল] আসুন (নরহরি সরকার প্রবেশ করিল) কি চান বলুন ?

নরহরি সরকার। আপনি পাটনায় এসেছেন শুনে দেখা করতে লাম—আপনি মহদন্তঃকরণ—[দৃঢ় অথচ কম্পিত সুরে] আমি এমন পদে পড়েছি যে ন্যায় অন্যায় বিচারের আমার সময় নেই। আমার াহিনী এত মর্ম্মস্পর্শী।

মঞ্জুগোপাল। বসুন।

নরহরি। (বসিয়া) ধন্যবাদ—আমি রতনপুরের অভিজাত সরকার শের সন্তান—স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব গেছে। ছোট াল থেকে—

[নরহরি প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় চুপ করিল]

মঞ্জুগোপাল। বলুন, আমি স্থিরচিত্তে শুনছি।

নরহরি। আমার লোকেরা চেয়েছিল যে আমি উকিল হয়ে একজন দ্বতীয় রাসবিহারী ঘোষ হব—কিন্তু তা আমার রুচিমত হয় নি—আমি াস্তিবাদী—আমি কবি—কল্পনাবিলাসী।

মঞ্জুগোপাল। আমিও তাই।

নরহরি। আমি চেয়েছিলাম কীর্ত্তি—সাহিত্যিক বলে আপন দেশের দয় জয় করব—এই ছিল আমার স্বপ্ন—কিন্তু জীবনের ধূলিধূসর পথে কণ্টকবিক্ষত হয়েছে আমার যাত্রা—আমি পাইনি অর্থ—আমার প্রতিজ্ঞা হয়েছে ব্যর্থ।

মঞ্জুগোপাল। আর বলতে হবে না—বুঝেছি আপনি অর্থকৃচ্ছ্রতায় ক্লিষ্ট—

নরহরি। কাল থেকে আমার খাওয়া হয় নি (মঞ্জুগোপাল পকেট হইতে নোট বাহির করিতেছে দেখিয়া) আপনি কি করতে যাচ্ছেন মশায়।

মঞ্জুগোপাল। আপনি যখন ক্ষুধাকাতর।

নরহরি। (তিক্ত পরিহাসে) আপনি আমায় একশত টাকার নোট ভিক্ষা দিচ্ছেন—

মঞ্জুগোপাল। একশত নয়—দশ টাকা

নরহরি। বলেন কি—রতনপুরার সরকার আমি—আমায় কি দীন ভিখারী পেয়েছেন। একজন ভাগ্যহত সাহিত্যিক বন্ধুকে এমন ভাবেই অভ্যর্থনা করতে শিখেছেন। আমার বেদনার কাহিনী শুনে এই আপনার মনে হল (উত্তেজিতভাবে) না, না এই অপমানের আমি প্রতিশোধ নেব—লাঞ্ছনা অনেক হয়েছে—

ব্যাগ হইতে রিভলবার বাহির করিল

মঞ্জুগোপাল। কি করছেন আপনি

নরহরি। আপনার সামনেই আমি আত্মহত্যা করব—করবই করব।

মঞ্জুগোপাল। (সহমর্ম্মিতা দেখাইয়া) আপনি কি দৃঢ়সংকল্প করেছেন—

নরহরি। হাঁ—এ আমার অবিচল প্রতিজ্ঞা

মঞ্জুগোপাল। (গম্ভীরভাবে) ভালই করেছেন—তাহলে আত্মহত্যাই করুন—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—

নরহরি। (বিস্মিত কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়তায়) তাহলে আপনি আত্মহত্যা সমর্থন করছেন ?

মঞ্জুগোপাল। করছি—সত্যই আপনি বীর—প্রশংসাভাজন। অনেক দিন পরে একজন পুরুষের মত পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি—আপনি ভিক্ষা চান না—এ মর্য্যাদা-বোধ দুর্লভ—সাবাস বন্ধু সাবাস। টাকায় কি হত—দশ টাকা দেই, দশ হাজার দেই—তাতে আর কি হত তোমার রক্ষার উপায় হয় না। সাহিত্যও হল আমাদের দেশের অলস অবসর-বিনোদন—সাহিত্যিক কীর্ত্তি মেলেনা : কখনও পরিপূর্ণ হয়ে—আজ ভাবছ পেয়েছ দেশের মন—কাল দেখছ দেশের চিত্ত পাওনি। আমার কথাই ধরনা ভাই—তোমায় এবার তুমি বলব—

নরহরি। তাই বলুন।

মঞ্জুগোপাল। আমায় তুমি শ্রদ্ধা কর, ভক্তি কর—ভাবছ আমি উঠেছি যশের উচ্চ-শিখরে—ভাবছ আমি পরম সুখী—কিন্তু আসলে নিয়তির চূড়ান্ত পরিহাস ভোগ করছি—দৈনিক কাগজের সহকারী সম্পাদক এ আমার বন্দীর জীবন—প্রতিদিন ঘানি টানছি—এর চেয়ে মৃত্যু নরক—সে শতগুণে সহস্রগুণে ভাল—কাজরে কবিতা কুতঃ ? কালিদাসের সেকথা একান্ত সত্য। দেশে আজ এই যে দুঃসহ অন্ন-চিন্তা—এর থেকে মৃত্যু ভাল—ধন্যবাদ ভাই, তুমি দেবদূতের মত এসেছ আমার জীবনে—তুমি দেখাবে মুক্তির পথ—তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ।

নরহরি। (বিস্মিত হইয়া) আমায় ধন্যবাদ !

মঞ্জুগোপাল। (জোরে মাথা দোলাইতে দোলাইতে) তোমায় বন্ধু তোমায়। আমিও মরতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি—এখন আর ভয় পাব না। তুমিই আমায় দেখাবে জীবনের যাত্রাপথে মৃত্যু এক অধ্যায়—যা এনে দেয় নিঃশেষ নির্ব্বাণ—যার পরে থাকে না ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা। ফলে কি হয়—এ দুঃস্বপ্ন আর দেখতে হয় না—ধন্যবাদ ভাই—তুমি আগে মর—আমি তোমার পরে মরব (নরহরি হতবুদ্ধি হইয়া এক পা পিছাইয়া গেল) পিছিয়ে যেও না বন্ধু, তাহলে পড়ে যাবে।

নরহরি। কিন্তু

মঞ্জুগোপাল ! তুমি কি আমার চেয়ার নেবে ভাই। বসে বসেই গুলি করবে ? কোথায় করবে—বুকে না মাথায় ?

নরহরি। সত্যি বলতে কি—

মঞ্জুগোপাল। বুকে করাই ভাল—তাহলে মৃত্যু ধ্রুব—

নরহরি। যা বলছেন—

মঞ্জুগোপাল। না ভায়া, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলব না—তুমি যদি পৃথিবীর শেষ বিদায় মুহূর্ত্তের প্রেরণায় কিছু করতে চাও আমি তাতে বাধা দেব না—তুমি যে ভাবেই মরতে চাও সেই ভাবেই মর—তোমায় দেহ যখন রক্তাহত দেহে ধূলায় গড়াবে—তখন আমিও আর দেরি করব না—আমিও তোমার পশ্চাদনুসরণ করে মৃত্যু আলিঙ্গন করব—

সত্যিই কি আনন্দ। প্রতিশোধ—দুরন্ত প্রতিশোধ নেব আমরা—যখন ওরা দেখবে তোমার আর আমার শবদেহ—তখন পৃথিবীর বোকা লোকেরা কি হতবুদ্ধিই না হবে,—আমরা যে তাদের আজন্ম ঘৃণা করেছি তখনই তারা বুঝবে—না বন্ধু আর দেরী নয়—আমার আর তর সইছে না মুক্তি—চির মুক্তি—তাড়াতাড়ি কর বন্ধু—গুলি কর—বল জয় জয়, মৃত্যুতে মানিনা ক্ষয়—

নরহরি। (বিব্রত হইয়া) না, আমি আর মরতে পারব না দাদা!

মঞ্জুগোপাল। কেন পারবে না ভাই—

নরহরি। আমি নিজে মরতে পারি, কিন্তু আপনাকে সহযাত্রী করতে পারি না, তাহলে আমি সে হত্যার দায়ে দায়ী।

মঞ্জুগোপাল। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তাহলে রিভলভার আমায় দেও—আমি প্রথমে তোমাকেই গুলি করব—

নরহরি। ক্ষমা করবেন

মঞ্জুগোপাল। ব্রত ভঙ্গ করছ?

নরহরি। না।

মঞ্জুগোপাল। সত্যি

নরহরি। আপনাকে মৃত্যুর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এই ভাবে মরতে দিলে আমার অপরাধ কম হবে না দাদা—সে আমি করতে পারব না—

মঞ্জুগোপাল। এই মাত্রই না বলেছিলে যে ছোটখাট ন্যায় অন্যায়ের বিচার তোমার নেই—এখন কেন এত চুল-চেরা তর্ক তুলছ ভাই?

নরহরি। আমার এই দ্বিধা—সত্যকার দ্বিধা

মঞ্জুগোপাল। বেশ, তাহলে আর কি করব—তুমি নিজেই মর—আমি কথা দিচ্ছি তোমার জন্যই আমি ব্যর্থ জীবন বহন করেই চলব।

নরহরি। একি আপনার সত্য প্রতিজ্ঞা?

মঞ্জুগোপাল। হাঁ আমি শপথ করছি—সত্যই ভাই তুমি একান্ত ভাগ্যবান, তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ার অমৃত-আনন্দের অধিকারী হতে চলেছ—আমি তোমায় হিংসে করি—বিদায় বন্ধু বিদায়।

[সে বসিয়া পড়িল—নরহরি কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়া পায় না] কি? তুমি এখন বেঁচে আছ?

নরহরি। [রিভলবারের দিকে তাকাইয়া] কারণ—

মঞ্জুগোপাল। না ভাই সময় নষ্ট করো না—গুলি কর।

নরহরি। [হঠাৎ যেন হদিস পাইয়া] আমার রিভলবার ঠিক নাই—

মঞ্জুগোপাল। কি জ্বালা!

নরহরি। কি করব বলুন

মঞ্জুগোপাল। বেশ এতে ভাববার কিছু নেই—এই নাও আমার রিভলবার

[পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া দিল]

শচীন্দ্র। (বাথরুমের দরজা খুলিয়া নবক্রীত রিভলবার হাতে তুলিয়া, কিংবা এই নাও আমারটি

[মাথা বাহির করিল]

নরহরি। (তাহাকে দেখিয়া) কে? ভট্টাচার্য্য মহাশয়?

মঞ্জুগোপাল। রিভলবারের অভাব বন্ধু (নিজের রিভলবার ব্যাগের সঙ্গে নরহরির হাতে দিয়া) এটা দিয়েই কাজ শেষ কর ভাই।

শচীন্দ্র। (বাহিরে আসিয়া নিজেরটী দিয়া) এটা দিয়েও চলবে।

নরহরি। (ভীত লজ্জিত কণ্ঠে) হায়! হায়! ধরা পড়ে গেছি এবার—আর আমার চাকরি থাকবে না দেখছি—

মঞ্জুগোপাল। চাকরি—

নরহরি। হাঁ এইভাবে রিভলবার বেচে আমার সংসার চলে—আমার কর্ত্তা এবার আমায় তাড়াবে—

শচীন্দ্র। ওঃ বুঝতে পেরেছি তোমার ফার্ম্ম তোমায় এমন করে রিভলবার বেচতে পাঠায়—তুমি নিজেকে হত্যা করতে চেয়ে রিভলবার বেচ।

নরহরি। ঠিক ধরেছেন।

শচীন্দ্র। তোমার কর্ত্তাটি ত খুব চালাক—কে তিনি—বাঙ্গালী না বিহারী?

নরহরি। বুদ্ধিটি আমার কর্ত্তার নয়।

শচীন্দ্র। তোমার? খুব বাহাদুর ছেলে দেখছি

মঞ্জুগোপাল। (উচ্চহাস্যে) কি চমৎকার বিক্রেতা ভায়া—

নরহরি। ক্ষমা করবেন—আমি আসলে একজন অভিনেতা—

মঞ্জুগোপাল। অভিনেতা—? কোন থিয়েটারে কর অভিনয়—

নরহরি। আমার কাজ নেই—আমি ভাল কমিক পাট করতে পারি—বাংলাদেশে হাসাতে পারে এমন এক্টর কজন আছে বলুন ত? অথচ আমি পাইনে কাজ—তাই এই ব্যবসা ধরেছি—এতে চলে যাচ্ছিল একরকম করে—

শচীন্দ্র। তোমাকে নূতন ব্যবসা করতে হবে—

মঞ্জুগোপাল। থিয়েটারেই যোগ দাওনা ভাই

নরহরি। কোন থিয়েটার?

মঞ্জুগোপাল। যে কোনটায় হোক ঢুকে পড়। ভট্টাচার্য্য ভায়ার সুপারিশ হলে সর্ব্বত্র হবে তোমার অবাধ গতি

শচীন্দ্র। না, তা কখনও হতে পারে না—

মঞ্জুগোপাল। কেন? দেখছ না ভাগ্য তোমায় এনে দিয়েছে সেই অভিনেতা যার জন্য তুমি এত উদ্বিগ্ন। জয়যাত্রায় নায়কের পাট করতে চাই ব্যক্তিত্ব—চাই করুণ রস। সে তার কমেডি দিয়ে তোমায় বোকা বানিয়েছে—যে তোমার সৃষ্টিকে করতো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—

শচীন্দ্র। (ইতস্ততঃ করিয়া) বেশ, আমি ওকে আমার বইটা অভিনয় করতে দেব—কিন্তু আমি কোনও কথা দিচ্ছি না—

নরহরি। (প্রসন্ন হাস্যে) শচীনবাবু, আমি একান্ত কৃতজ্ঞ থাকব, আপনার নাটক রূপায়নে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব—আর যদি না পারি

মঞ্জুগোপাল। তাহলে গুলি দিয়ে মাথার খুলি ওড়াবে।

নরহরি। (নিশ্চয় দৃঢ়তায়) হাঁ নিশ্চয়ই করব

মঞ্জুগোপাল। না, একজন বদ্ধ পাগল—ওকে শোধরানো চলবে না

শচীন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) আমারও তাই মনে হচ্ছে—ও সারা জীবন এই ভাবেই আত্মহত্যা করে চলছে।

সমাপ্ত

ইউরোপে কয়েক দিন

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

বার্জ হোটেল, জেনিভা, ২রা নভেম্বর ১৯৪৮

ভারতের সংবাদ এখানে এসে আদৌ পৌঁছায় না—একখানিও ভারতীয় সংবাদপত্র সারা সুইজারল্যাণ্ডে আসে না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক আজগুবি ধারণা এরা অজ্ঞতাবশত পোষণ করে।

যে জায়গায় আমরা আছি তা অতি অপরূপ। চার পাশে আল্‌স্ পর্বতমালা, তার কোলে সারি সারি সাজানো ফুলের বাগান ও সুন্দর সুন্দর বাড়ী, মাঝে বিরাট ৬০ মাইল লম্বা হ্রদ—তাতে হাজার হাজার বড়ো রাজহাঁস, আর নানা রঙের পাখী সাঁতার দিচ্ছে। সুইজারল্যাণ্ডের বড়ো বড়ো শহরগুলি এই হ্রদের চারধারে গড়ে উঠেছে।

দূর থেকে ঠিক ছবির মতন সুন্দর দেখায় এই জেনিভা শহরটিকে। এদেশের রাস্তাঘাট ঘরদুয়ার অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, কারণ অতিরিক্ত ঠাণ্ডার দেশ বলে ধুলোবালির বালাই নেই—সব ধবধবে পরিষ্কার—মানুষগুলোরও স্বভাব ও সংস্কার সেইদিকে নিয়ে চলেছে।

বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রীজ—লণ্ডন

বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সারা দেশটিকে স্বপ্নপুরী করে গড়ে তুলেছে। পাহাড়ের বুক চিরে এরা প্রাকৃতিক শিল্পসম্পদ সৃষ্টি করেছে। আল্‌সের বরফগলা জলপ্রপাত ও হ্রদগুলি থেকে Hydro Electric System-এ সারা দেশে এরা বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং তা থেকে শিল্পসম্পদ গড়ে উঠছে। আশ্চর্য পরিশ্রমী এই জাতটা। গোটা দেশটা বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে নানাভাবে সমৃদ্ধ। এখানে এমন কোনো জায়গাই নেই যেখানে বিদ্যুতের ব্যাপার নেই—এমন কি পাহাড়ের সুড়ঙ্গের (tunnel) মধ্যেও বৈদ্যুতিক বাতি ও লিফ্‌টের (lift) ব্যবস্থা আছে।

এ দেশের সাধারণ লোকেরা খায় দায় ও আনন্দ করে, রাজনীতির ধার বড়ো একটা ধারে না। ফলে একটু ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে এরা। ছোট দেশ, তার ওপর তিনটি ভাষাভাষী লোকের সমারোহে সুইস্ সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই তিন ভাষা হল ফরাসী, জার্মান এবং ইতালিয়ান। ইংরেজির সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই—কাজেই আমাদের মতন লোকের একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। এমন কি সরকারী দপ্তরে যাবতীয় নথিপত্রও এই তিনটি ভাষায় রাখা হয়। সেইজন্য এখানকার Federal Court ও League of Nations (বর্তমানে United Nations Organisation এবং) I. L. O অর্থাৎ International Labour Office-এর দপ্তরখানায় খুব ভালো অভিজ্ঞ দোভাষী বা Interpretors আছে। কারণ বেশির ভাগ লোকই, এমন কি অনেক বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও, ফরাসী ভাষাতেই বক্তৃতা দেন। কেবল United Kingdom, United States এবং ভারতীয় প্রতিনিধিরা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে ফরাসী ভাষায় তর্জমা করা হয়।

ছোট দেশ হলেও এখানে খুব বড়ো বড়ো কাপড়ের কল ও কারখানা আছে। তাছাড়া কলকব্জা এবং অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণ বিষয়ে—যাকে বলে Precision Instruments—এরা বিশ্ববিখ্যাত। আমি সুইজারল্যাণ্ডে এসে পর্যন্ত নানা শিল্পকেন্দ্র ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরে দেখেছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের ভারতীয় দূতাবাস থেকেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বের্ণ (Berne), জুরিখ (Zurich),

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মিলের ষ্টুডিও ও বাসভবন

হাইড্ পার্কের একাংশ—লণ্ডন

উইণ্টারথর (Winterthur), লুসাঁ (Laussane), ইণ্টারলোকেন (Interloken) প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরগুলি ঘুরে এসেছি ছুটির দিনে।

এখানে সকল ট্রেণই বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। সেবার বোম্বাই যেতে তোমার বোধহয় ইগৎপুরী ষ্টেশনে ইলেকট্রিক ট্রেণের কথা মনে আছে। এখানকার এক্সপ্রেস ট্রেণগুলি ঘণ্টায় ৭০।৭৫ মাইল পর্যন্ত যায়। ট্রেণগুলি অতিশয় সুন্দর এবং আরামদায়ক। সেকেণ্ড ক্লাশ কামরাগুলি আমাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (air-conditioned) গাড়ীর মতন। কিন্তু শোবার ব্যবস্থা নেই কোনো ক্লাশেই, সবই কেবল বসবার জায়গা, তবে শীতের দেশ বলেই বোধহয় কামরাগুলিকে গরম করে রাখা হয়। আর একটা কথা। এখানে কোনো ষ্টেশনেই কুলির ব্যবস্থা নেই—নিজের মালপত্র নিজেকেই বহন করে নিয়ে যাওয়া এখানকার রীতি।

গত শনি ও রবিবার ছুটি থাকায় আমরা ইয়ংফ্রো (Yangfranch) বেড়াতে গিয়েছিলাম। ইয়ংফ্রো আল্‌সের অন্যতম চিরতুষারময় গিরিশৃঙ্গ—১২৫০০ ফুট উঁচু। এখান থেকে প্রায় দুশো মাইল দূর হবে। সারা পৃথিবী থেকে ভ্রমণবিলাসীরা এসে জোটে এর অপরূপ সৌন্দর্য দেখবার জন্যে।

ইণ্টারলোকেনে রাত কাটিয়ে ভোর আটটার গাড়ীতে রওনা হতে হল। ভোর আটটা কথাটা শুনতে বেখাপ্পা লাগে। কিন্তু সত্যিই তাই। শীতের দেশ—ভোর হতে না হতেই আটটা বেজে যায়। ছ হাজার ফুট পর্যন্ত পাহাড়ের গা বয়ে, পাইন বনের মধ্য দিয়ে সর্পিল গতিতে ট্রেণখানি উঠতে লাগলো। সেখান থেকে সুইস উপত্যকার কি মনোরম দৃশ্য!

সোর্জউইগ্ ষ্টেশনে গাড়ী বদলাতে হল। ছোট্ট পার্বত্য ট্রেণ—মাত্র দুটো কামরা—বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে এক বিরাট সুড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়ে গিরিশৃঙ্গে উঠতে লাগলো। শীতের দেশ বলেই ছ হাজার ফুটেই তুষাররাজ্য (snowline) ছোঁয়। এখান থেকেই চির-তুষারের রাজ্য শুরু হল। মানুষের বসতির সঙ্গে সঙ্গে গাছপালাও শেষ হল। চারিদিকে কেবল তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গ। তাপযন্ত্রে দেখা গেল প্রায় জিরো (Zero) ছুঁয়েছে।

এখান থেকে শুরু হল টানেল ট্রেণ। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ ধরে আল্‌সের মাথায় এসে পৌঁছতে হয়। আশ্চর্য বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—বিজ্ঞানের সঙ্গে শ্রমশক্তির সমন্বয়ে

অসাধ্যসাধন। সুড়ঙ্গ পথটি বিরাট, প্রায় ২০ মাইল বিস্তৃত। মাঝে মাঝে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে আবার ছোট Halt Station আছে। সেখান থেকে হিমবাহক্ষেত্র (Glacier) ও তুষারময় উপত্যকাগুলি বড়ো সুন্দর দেখায়। এইভাবে বেলা বারোটা নাগাদ আমরা ইয়ংফ্রো এসে পৌঁছাই। সেই সুড়ঙ্গপথের মধ্যেই আছে সুন্দর ইউরোপীয় হোটেল ও তার সাড়ম্বর সাজসরঞ্জাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হোটেল বন্ধ। অতি কষ্টে একটু গরম কফির বন্দোবস্ত হল। ঘরদুয়ার সব সাজানো; পালঙ্কের ধবধবে বিছানা পাতা, সেই তুষারপুরীতেও ধারাস্নান এবং আরামের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম। তবে লোকজন নেই, সব খালি। আবার নাকি Winter Sportsএর সময়, ডিসেম্বরের শেষ থেকে লোক আসতে শুরু হবে।

অষ্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাই-কমিশনার ও বেলজিয়ামের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত—মধ্যভাগে লেখক

সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সব বন্ধ থাকে, কারণ এই সময় তুষার-ঝটিকা (Blizzard) শুরু হয়। তুষার-ঝটিকা বড়ো বিপজ্জনক।

অনুসন্ধানে জানা গেল ১৯০০ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় বারো বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয়ে **Swiss Federal Government** এই ট্যানেল ট্রেণের ব্যবস্থা করেছেন। প্রকৃতির ওপর বিজ্ঞান তথা মানুষের আধিপত্যবিস্তার আর কি। ফলে এই ট্রেণের ভাড়া এবং আনুষঙ্গিক খরচা অত্যন্ত বেশি।

এই পর্বতের এক অংশের সঙ্গে একটি glacier অবিচ্ছিন্নভাবে লেগে আছে। তার মধ্য দিয়ে বরফ কেটে একটি রাস্তা তৈরী হয়েছে। সেখানে এক বিরাট বরফের **Hall**, বরফ কেটে খোদাই করা জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতি, একটি বরফের মোটর প্রভৃতি নানা জিনিষ দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করে। ইংরেজিতে একে বলে **Ice Palace**।

এখান থেকে সেই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে আবার একটি বৈদ্যুতিক লিফটের সাহায্যে ৩৫০ ফুট উঠলে তবে পর্বত শীর্ষে পৌঁছানো যায়। সেখানে একটি বীক্ষণাগার (Observatory) আছে। কিন্তু অসময় বলে সেটিও বন্ধ ছিল। কিছুক্ষণ সেই চিরতুষারময় পর্বতশিখরে ঘুরে বেড়ালাম। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, তবে বরফে বরফে ঘষলে একটু গরম পাওয়া যায়। সে দৃশ্য চমৎকার। চোখ ঝলসে যায় বরফের শুভ্রতায়। তলায় মেঘ আর চতুর্দিকে সেই অনন্তধবল তুষাররাশি।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারা গেল না। ঝুপ ঝুপ করে বরফ পড়ছে। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ একেবারে সাদা হয়ে গেল। লিফ্‌টে ঘরে নেমে দেখলাম তাপ জিরোরও নীচে দশ ডিগ্রি। এ ঠাণ্ডা আমরা সমতলভূমির মানুষেরা কল্পনাও করতে পারবো না। যাক; আমাদের তেমন কষ্ট অবশ্য হয়নি। এক অভিনব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আনন্দও পেয়েছিলাম প্রচুর। বেলা আড়াইটে নাগাদ সেই তুষাররাজ্য থেকে বেরিয়ে রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আবার আমরা জেনিভার সেই হোটেল ঘরে এসে পৌঁছলাম।

বার্জ হোটেল, জেনিভা, ৩রা নভেম্বর ১৯৪৮

এখানকার ছেলেমেয়েরা কত পরিশ্রম করে, তাই তারা জীবনে সুখী হয় ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এদেশে ভিক্ষুক নেই। সকলে আট ঘণ্টা পরিশ্রম করে এবং ফলে জীবনে উন্নতি করে প্রচুর। শ্রমের

মর্যাদাবোধ এদের আছে। ছোট বড়ো ভেদবিচার নেই। এই বয়কের রাজ্যেও এরা কি ভাবে শিল্পসম্পদ গড়ে তুলেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

সময় বড় অল্প। আজ সকাল দশটা থেকে রাত দশটা অবধি মিটিং করে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এলাম। আগামী ৮ই এখান থেকে রওনা হব মহানগরী প্যারীর উদ্দেশ্যে।

রয়্যাল মনসু হোটেল, প্যারী, ১৩ই নভেম্বর ১৯৪৮

শহর তখন ছিল কুয়াশায় ঢাকা। শীতের প্রকোপে মানুষগুলো যেন একটু জড়ভরতের মতন ঠেকলো। আমাকে নিতে আমাদের দূতাবাস থেকে একজন ইংরেজি-জানা ফরাসী ভদ্রলোক এসেছিলেন। কাজেই অজানা শহরেও কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি।

সোজা এসে আমার জন্যে নির্দিষ্ট হোটেলে উঠলাম। আগে থাকতেই
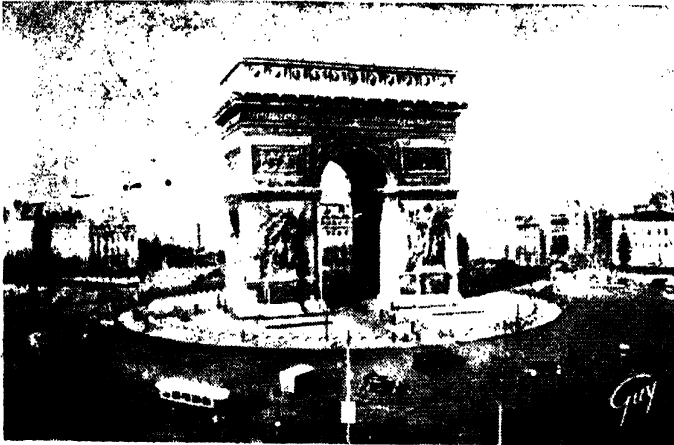
নেপোলিয়ঁার জয়স্তম্ভ

সব ব্যবস্থা ছিল। নেপোলিয়ঁার জয়স্তম্ভের (Aro De Triomphe) কাছেই Avenue Hoche রাস্তার ওপর সাততলা এক বিরাট হোটেল।' পরে জানলাম অনেক ভারতবাসী যাঁরা U. N. O. সম্বন্ধে এসেছেন তাঁরা অধিকাংশই এখানে থাকেন। এই প্রাসাদোপম হোটেলের একাংশে ভারতীয় পতাকাও দেখা গেল। কিন্তু হোটেলটির প্রণালী এবং আনুষঙ্গিক খরচ প্রচুর।

বেলা এগারোটা নাগাদ ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি (Trade Commissioner) কয়েকজন ফরাসী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে এসে দেখা করলেন এবং আমার ফরাসী দেশের ভ্রমণ-তালিকা ও নামজাদা শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের সমস্ত ব্যবস্থা করার ভার তাঁরা নিলেন এবং সঙ্গে একজন দোভাষী রাখার বন্দোবস্ত করলেন। দোভাষীটি এক ইংরেজি-জানা ফরাসী মহিলা। পরে শুনলাম যে ফরাসী সরকারের সাহায্যে ও সৌজন্যে একটি প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে উঠেছে—যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত ও এশিয়ার সঙ্গে এদেশের সৌহার্দ এবং বাণিজ্য বিষয়ে পারস্পরিক সাহায্য বিধান করা। বলা বাহুল্য এঁদের সহৃদয়তা ও আতিথ্যে চমৎকৃত হতে হয়। এঁদের সাহায্যে আমি প্যারী শহর এবং ফরাসী দেশের শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলি যেমন—রুঁয়ে (Rouen), আমিয়া (Amien), সাঁফ্রা (Saint Freres), লিল্ (Lille), রুবেঁ (Robieux) প্রভৃতি বস্ত্র, কয়লা ও লৌহ শিল্পকেন্দ্রগুলি দেখে এসেছি এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছি। মফঃস্বল শহরে থাকা, খাওয়াদাওয়া ও যানবাহনের সমস্ত ব্যবস্থা করা বা তার খরচাদি বহন করা সব এঁরাই করেছেন।

সত্যই প্যারী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানগর। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার ঐশ্বর্য এবং সম্পদ হরণ করে কয়েক শতাব্দী ধরে ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ নগর প্যারী এবং বুরবোঁ সম্রাটদের (Bourbon Dynasty) রাজধানী ভার্সাই (Versailles) শহর গড়ে উঠেছে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে শহর দেখে শেষ করা যায় না। তার পর এর বুকের ওপর দিয়ে এত বড়ো বড়ো বিপ্লব ঘটে গেছে যে প্রতিটি রাস্তাঘাটে ইতিহাসের ছাপ পড়েছে। এ সম্পর্কে আমি অনেক ছবি সংগ্রহ করেছি। তোমাদের জন্যে এই প্যারী শহরই কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করেছে—জাতির উত্থান পতনের ছাপ বহন করেছে। বর্তমানে আবার এক বিপ্লবের ধূমায়মান বহ্নির সমুখে জাতি এসে দাঁড়িয়েছে—জানিনে এর শেষ কোথায়। কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে বোঝাপড়া চলেছে। ধর্মঘটের ফলে কয়লার খনিগুলো বন্ধ, রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে, খবরের কাগজগুলো মাঝে মাঝে বন্ধ হচ্ছে—নানাদিক দিয়ে জাতির সুমুখে নানা সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। সরকার ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন রাজপ্রাসাদগুলো দখল করে নিয়ে সরকারী অফিসরূপে ব্যবহার করছে—বড়ো বড়ো উদ্যান-বাটিকাগুলো এখন হাসপাতাল বা মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে।

ফরাসী জাতির অন্তরটা বিপ্লবমুখী, কিন্তু শিল্প ও ললিতকলার ধারাবাহিক অনুশীলনের ফলে এবং বারবার যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যাওয়ার দরুণ এরা কতকটা যেন আরামপ্রিয় এবং রক্ষণশীল হয়ে পড়েছে। তার ওপর অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও ফরাসী মুদ্রার দাম লঘু হওয়ায়

Depreciation of Currency) গরীব লোকেদের কষ্টের আর সীমা ই। অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির শোচনীয় অবস্থায় আজ ফরাসী জাতি সে পৌঁছেছে। একে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে জাতি চতে পারবে না। শুনে আশ্চর্য হবে যে বর্তমান অবস্থায় এক Swiss anc এর বিনিময়ে ১১০ French franc পাওয়া যায়, ফলে সকলেরই শেষত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে। ফরাসীরা দেশ থেকেও বিশেষ কিছু আনতে পারছে না, কারণ আন্তর্জাতিক গতে তাদের মুদ্রার মর্যাদা আজ আর নেই।•

হাতে সময় কম। কালই আমি এখান থেকে বেলজিয়ামের রাজধানী russels (ব্রসেলস্) অভিমুখে রওনা হবার স্থির করেছি। সেখানকার লকজা ও কাপড়ের কারখানাগুলি দেখে আঁত্তোয়ার্প (Antwerp) বং ঘেন্ট (Ghent) হয়ে লণ্ডন যাব।

ারিজ হোটেল, লণ্ডন, ২০শে নভেম্বর ১৯৪৮

ভবঘুরের মতন সারা পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলি ও াখানকার বড়ো বড়ো শহর ও প্রাচীন ঐতিহাসিক ক্ষেত্রগুলি দেখে এবং াখানকার সমাজজীবনের গতি ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে াবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারছি। প্রায় সব দেশেই ামাদের দূতাবাস থাকার ফলে স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করতে ারা গেছে এবং তাতে আমার এই স্বল্পকালীন প্রবাসে খুব সুযোগ বিধা পাওয়া যাচ্ছে।

বেলজিয়াম। বেলজিয়ামের Charge de Affaire মি: ভায়েবজী ামার অন্যতম সহকর্মী হিসাবে জেনিভার আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে াগদান করেছিলেন। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই ছিল, র জন্যে আমার বেলজিয়াম ভ্রমণের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল।

দূতাবাসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী গাড়ীসহ ব্রসেলস্ স্টেশনে পস্থিত ছিলেন এবং আগে থেকেই সেখানকার বৃহত্তম হোটেলে ামার থাকবার বন্দোবস্ত, সুতরাং কোনো কষ্ট হয়নি।

ব্রসেলস্ এক পরিষ্কার পাহাড়ী শহর—প্যারী মহানগরীর অনুকরণেই া। রাস্তা-ঘাট সুপ্রশস্ত এবং চারিদিক ফলে ফুলে সুশোভিত। ঝে মাঝে খুব বড়ো বড়ো শহীদ বেদী ও বিরাট স্তম্ভ (Unknown artyrs' tomb) আছে। লোকেরা রোজ সকালে সেখানে ফুলের লা উপহার দেয় এবং দিন-রাত সেখানে আলো জ্বলে শ্রদ্ধার চিহ্ন- প। কারণ সারা দেশের ওপর দিয়ে দুটো বৃহত্তম লড়াইয়ের তাণ্ডব- লা ঘটে গেছে—এমন বাড়ী নেই যেখানে দু' একজন লোকও না হত হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত মানুষ এরা—এত অল্প সময়ের মধ্যেই কে আবার নতুন করে গড়ে তুলেছে। অতিশয় পরিশ্রমী জাতি, র ওপর ছোট হলেও ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষত খনিজ শিল্পে অতিশয় দ্ধ। সুইজারল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের Currency Exchange অর্থনীতিকে Hard Currency বলে।

ঘেন্ট এবং আঁত্তোয়ার্পও দুটি বড়ো বড়ো শিল্পপ্রধান শহর। এখানকার একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি মিঃ ভেব্‌ডার কাস্কেম নিজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে দু'দিন ধরে এসব অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনেন। ইউরোপের সর্বত্রই আমি সংশ্লিষ্ট সরকার এবং বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য, সহৃদয়তা এবং আতিথ্য পাচ্ছি। আমার আসা উপলক্ষে ভারতীয় দূতাবাস থেকে একটা পার্টি দেয়। তাতে এখানকার সরকারী ও বেসরকারী অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা সব উপস্থিত ছিলেন। এর জন্যে এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে।

ব্রসেলস্ থেকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটার্লু (Waterloo) দেখতে যাই। এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের ইতিহাসের গতি বদলে যায়। যেখানে যুদ্ধ ঘটেছিল সে জায়গাটা দেখতে আজও সারা পৃথিবী থেকে লোক আসে। যুদ্ধের দু'দিন পূর্বে এক চাষীর ঘর দখল করে নেপোলিয়ঁ তাঁর প্রধান সামরিক দপ্তর স্থাপন করেন। আজ
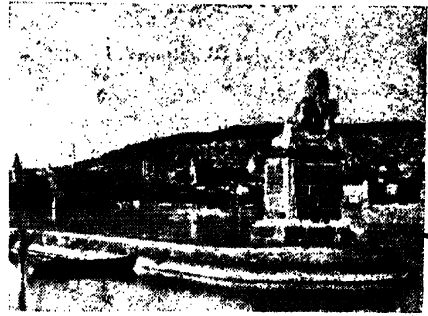
জুরিখের একাংশ

সে ঘরটি জাতীয় মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের এক অত্যাশ্চর্য Panoramic view রেখে দেওয়া হয়েছে সেখানে—দেখলে মনে হবে যেন সত্যই যুদ্ধ হচ্ছে। আমি তার কতকগুলি ছবি সংগ্রহ করেছি।

আঁত্তোয়ার্প ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ বন্দর। গত যুদ্ধের সময় জার্মানরা এটা প্রথমেই দখল করে নেয়। কিন্তু তাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের পর পলায়ন করবার সময় তারা সেতু ভেঙে দিয়ে যায় এবং এই সুন্দর সুসজ্জিত শহরটিকেও একেবারে ধ্বংস করে দেয়। শুনলে দুঃখিত হবে যে এই শহরে কেবল বোমাবর্ষণের ফলেই প্রায় দশ হাজার লোক মারা যায়। কিন্তু আশ্চর্য জাতি এরা। যুদ্ধ থামার পর দু'বছরের মধ্যেই আবার নতুন করে গড়ে তুলেছে শহরটিকে। এদের মনে কোথাও ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, আছে কেবল একটানা চলার বেগ ও আনন্দ। নর্থ সী (North Sea) কাছে বলে। এ সব জায়গায় শীত একটু বেশি, কাজেই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অত্যন্ত কাজের লোক হয়ে পড়েছে। শীতে কাজ করার সুবিধা আছে। এখানে সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত একটি প্রাচীন গির্জা আছে। গির্জাটি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থাপিত। গির্জাটির মধ্যে বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কিত অনেক

ছবি ও দেয়ালচিত্র সাজানো আছে। জার্মান ধ্বংসকার্য এগুলিকে স্পর্শ করতে পারেনি—এটা সুখের কথা। ইউরোপের প্রায় সকল ফরাসী ভাষাভাষী স্থানই ক্যাথলিকপ্রধান।

লণ্ডন। কাল দুপুরে আমি Continent ছেড়ে বিমানযোগে লণ্ডনে এসে পৌঁচেছি। এখানকার হাই কমিশনারের প্রতিনিধি গাড়ীসহ বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে ক্লারিজ হোটেলে নিয়ে এলেন। এই হোটেলটি ইউরোপের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল হোটেল। শুনলাম পণ্ডিতজীও নাকি যখন লণ্ডনে এসেছিলেন এই হোটেলেই ছিলেন। ভারতবর্ষের মর্যাদা রক্ষার জন্য নাকি আমারও এখানেই থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

কাল ও আজ দু'দিনে আমি লণ্ডনের যাবতীয় দ্রষ্টব্য বিষয়বস্তুগুলি দেখে নিয়েছি। কাল এখান থেকে ম্যানচেষ্টার রওনা হব। সেখানকার শিল্পাঞ্চলগুলি দেখানোর ভার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বোর্ড অব ট্রেড ও শ্রমদপ্তর নিয়েছেন এবং দু' তিন দিনের মধ্যে লণ্ডনে ফিরেই আবার ২৫ তারিখ বিকেলে "ষ্ট্রাথেয়ার্ড" (SS. Strathaird) নামে মেলবাহী জাহাজযোগে ভারত অভিমুখে রওনা হব।

জান বোধহয় আজকাল জাহাজে জায়গা পাওয়া এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। ছয় মাস আগে থেকে টাকা জমা দিলেও সীট পাওয়া যায় না। তবে আমার ক্ষেত্রে High Commissionerএর "highest priority"র ফলে 'প্রথম' শ্রেণীর কেবিন একটি সংগ্রহ হয়েছে। কিন্তু ভাড়া খুবই বেশি। এরোপ্লেনের চেয়ে সাত পাউণ্ড বেশি দিতে হচ্ছে। তবে শুনলাম যে জাহাজটি নাকি অত্যন্ত আরামদায়ক।

বর্তমান কার্যতালিকা অনুসারে আমি বোম্বাই পৌঁছাব ১১ই ডিসেম্বর। সেখান থেকে আকাশপথে কলকাতা।

ক্লারিজ হোটেল, লণ্ডন, ২৪শে নভেম্বর ১৯৪৮

প্রথমে চোখের ওপর পশ্চিমের নতুন জীবনের ঝলক কতকটা মানুষকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে—তাদের সব কিছুই ভালো বলে মনে হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই চমক যায় ভেঙে, মেকী পড়ে ধরা। এদের জীবনে গতি আছে, কর্মে স্পৃহা আছে, আসক্তিও আছে, গড়বার আনন্দে এগিয়েও যায় বটে; কিন্তু আমাদের জীবনের সঙ্গে যেন খাপ খায় না—কেমনধারা যেন যন্ত্রের আধিপত্যের মাঝখানে এরা আছে।

সুইজারল্যাণ্ডের যে শোভা ও সৌন্দর্যের কথা লিখেছিলাম, সেরকম প্রাকৃতিক শোভা বা সৌন্দর্য আর কোথাও বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশটাও খুব সুন্দর। দু' দুটো লড়াইয়ের ধাক্কায় ফরাসীদের মনের বল প্রায় ভেঙে পড়েছে এবং আমাদের দেশের মতন নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও কম্যুনিস্টদের সঙ্গে অহর্নিশ দ্বন্দ্ব, ধর্মঘট প্রভৃতি এত বড়ো আভিজাত্য ও শৌর্যসম্পন্ন জাতটাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। কিন্তু আমি সারা ইউরোপে যে আতিথেয়তা ও সহৃদয়তা পেয়েছি তা ভুলবার নয়।

আপাতত লণ্ডনে থাকলেও যেদিন ইংলণ্ডের অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলি দেখবার জন্য যন্ত্রশিল্পগুলির কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। ম্যানচেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারই বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। লণ্ডন থেকে প্রায় দুশো মাইল রেলে যেতে হয়। সেখানে যখন গিয়ে পৌঁছুলাম তখন রাত সাড়ে দশটা। কুয়াশায় সব ঢাকা—এমন কি পাশের লোককেও দেখা যায় না। অতি কষ্টে এক কুলিকে পাকড়ে সেখানকার একটি পরিচ্ছন্ন হোটেলে গিয়ে উঠি।

দু'তিন দিন ঐ সব অঞ্চল ঘুরে আজ সকালে আবার এখানে ফিরেছি। সর্বত্র আমাদের দূতাবাস থাকাতে আমাদের পক্ষে কাজের খুব সুবিধা হয়। সব জায়গায় এরা টেলিফোন করে আগে থাকতেই সমুদয় বন্দোবস্ত করে রাখে, কাজেই কোথাও অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় না এবং বর্তমানে ইংরেজ সরকার ও বিলেতি কল-মালিকরাও দেখছি আমাদের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো ব্যবহার করছে।

আজ দুপুরে ভারতীয় হাই কমিশনার আমার লণ্ডন আসা উপলক্ষে ইণ্ডিয়া হাউসে একটি ভোজ দেন। অনেক ভারতীয়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদেশে নিজেদের লোক দেখলে আনন্দ হয়। ম্যানচেষ্টারে ইংরেজ বণিকেরাও এক ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। কাল সকালে আবার এখানকার খবরের কাগজওয়ালাদের প্রতিনিধিরা দেখা করতে আসবেন বেলা দশটার সময়। একটা ছোট প্রেস কনফারেন্সের মতো হবে এখানে আমারই বসবার ঘরে।

কাল বেলা বারোটা নাগাদ আবার আমার ভারতের অভিমুখে রওনা হবার কথা। টিলবেরি বন্দর থেকে "স্ট্রাথেয়ার্ড" জাহাজটি বিকেল নাগাদ ছাড়বে। টিলবেরি লণ্ডন থেকে ৪০ মাইল রেলের পথ। কিন্তু আমার বোধহয় রেলে আর যেতে হবে না, সোজা মোটরে চলে যাব, কারণ লণ্ডনে থাকাকালীন এখানকার হাই কমিশনার আমার ব্যবহারের জন্য একখানি মোটরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

স্ট্রাথেয়ার্ড জাহাজ, সমুদ্রবক্ষ, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪৮

বর্তমানে লোহিত সাগরের বুকে পাড়ি দিচ্ছি। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি মাল্টা পার হবার পর প্রায় দু'দিন ধরে সাগরবক্ষে ঝড় ও তুফান দেখা দেয়। উত্তাল তরঙ্গমালার সংঘাতে জাহাজকে দোলাতে শুরু করে, ফলে আরোহীদের অনেক লোককেই শয্যার আশ্রয় নিতে হয়। অতিকায় সুরক্ষিত জাহাজ, তাই কোনো ক্ষতি হয়নি বা বিপদ ঘটেনি। শুনলাম নাকি যেখানে আড্রিয়াটিক সাগর এসে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে সেখানে সর্বদাই ঝড় তুফান লেগে থাকে। সেজন্যে নাবিকেরাও সতর্কতার সঙ্গে সেখানে জাহাজ চালিয়ে থাকেন। তারপর আবার একঘেয়ে দৃশ্য। সেই সীমাহীন অনন্ত জলরাশি। মাঝে মাঝে দূরে দু'একখানা অন্য জাহাজ দেখা যায় মাত্র। ভূমধ্যসাগরে বেশ শীত ছিল। মাঝে মাঝে ঝলকা ঠাণ্ডা বাতাস এসে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিত।

বৃহস্পতিবার বেলা তিনটে নাগাদ আমরা সুয়েজ খালের মুখে ইজিপ্টের সুবৃহৎ বন্দর পোর্ট সৈয়দে (Port Said) এসে

পৌঁছাই। দূর থেকেই দেখা যায় উপকূলের ওপর বিরাট এক প্রস্তরমূর্তি। প্রস্তরমূর্তিটি হচ্ছে বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ও শিল্পী Ferdinand De Lesseps-এর। ইনিই সুয়েজখালের পরিকল্পনা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। উত্তমাশা অন্তরীপ বা Cape of Goodhope দিয়ে আসতে গেলে আরো দশ হাজার মাইল ঘুরতে হত। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে খালের খননকার্য শেষ হয়—লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত হয়। খালটি প্রায় ১০০ মাইল লম্বা, ১৫০ ফুট চওড়া ও ৩৭ ফুট গভীর। মিশরের মরুপ্রান্ত ভেদ করে এই খালকে টেনে আনা হয়েছে।

আট দিন একটানা জলের মধ্যে থেকে লোকের প্রাণ যেন হাঁফিয়ে ওঠে। কূলের সন্ধান পেয়েই আমরা কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু তীরে গিয়ে বন্দর ও শহর দেখতে বেরোলাম। সেখানে গিয়ে দেখি জাহাজ প্রায় খালি করে সকলেই শহর দেখতে ও প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে বেরিয়েছে। বন্দরটি আধুনিক ইউরোপীয় ছাঁচেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু জেটী থেকে এগিয়ে আসাই দায়—সেখানে সারা বিশ্বের চোর, জুয়াচোর ও ঠগের আড্ডা—বিশেষ কাজকর্ম নেই, লোক ঠকিয়ে খাওয়াই তাদের ব্যবসা—নানা রকম সৌখীন জিনিষ ও চামড়ার ব্যাগ নিয়ে এসে রাস্তা ভিড় করে দাঁড়াবে এবং জোর করে কিছু না কিছু গছাবেই।

শহরটি কিন্তু বেশ সুন্দর। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। সাগর আসায় যেন মরুভূমি মিলিয়ে গেছে এবং এই সুয়েজ খালকে অবলম্বন করে নানা ইউরোপীয় ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে উঠেছে। এখান থেকেই প্যালেস্তাইনের রেলপথ শুরু হল।

মিশরীয়েরা অত্যন্ত ইহুদী-বিদ্বেষী বলে মনে হল। গোঁড়া fanatic আরবীয় মুসলমান। খালটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজও দেখলাম বৃটিশ এবং মার্কিণ নৌবহর ও টহলদারি জলপুলিশ মোতায়েন। খালটির দুপাশে কেবল অনন্ত বালুরাশি এবং মাঝে মাঝে ভারবাহী উটের দল। মাঝে মাঝে আবার শ্যামল মরূদ্যানগুলি এই শুষ্ক বালুকাময় মরু প্রান্তরে সত্যই এক অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্য বহন করেছে।

খালের শেষে সুয়েজ বন্দর। সেখানে মস্ত বড়ো খনিজ তেলের কারখানা ও ব্যবসাকেন্দ্র আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সবই বিদেশীর হাতে। এখান থেকে ১৮০ মাইল Gulf of Suez-এর মধ্য দিয়ে গিয়ে লোহিতসাগরে পড়তে হয়। এর চারপাশে ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ আছে। জলটা আর তেমন ঠাণ্ডা নয়। এখন আবহাওয়া প্রায় আমাদের দেশেরই মত। আর শীতের ভয় নেই।

সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ আমরা এডেনে গিয়ে পৌঁছাব। সেখান থেকে সোজা ১৬৫০ মাইল গিয়ে ১০ তারিখ শুক্রবার বেলা দশটা নাগাদ বোম্বাই বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়বার কথা। আমার ইচ্ছা ১১ তারিখেই ভোরে বিমানযোগে কলকাতা রওনা হওয়া। এবার ঘরের দিকে মন ছুটেছে।

[পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় গত নভেম্বর মাসে জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম-সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ঐ সময়ে তিনি ইউরোপের আরও কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে লেখা পত্রাবলী হইতে সংকলিত হইয়াছে। ভাঃ সঃ]

সন্ধ্যা

অধ্যাপক শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

দিবসের অবসানে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়,
আঁধারের যবনিকা দিগন্তে ঘনায়।
সুগম্ভীর স্তব্ধতার ছায়া, ভয়ে ভয়ে করি পরিহার,
দূরে সরে যাই বারবার।
আশ্রয় খুঁজি দীপজ্বালা গৃহকোণে,
নিজেরে লুকাই কথার গহন বনে।

অন্ধকার ভয়াল রূপেরে ব্যঙ্গ করি যে আমি,
মুখর প্রমোদে নামি।
কিন্তু যবে শান্ত হয় জীবনের উত্তাল প্রবাহ
শান্ত হয় কামনার উগ্রদাবদাহ
সেদিন নিস্তব্ধ সন্ধ্যা মৌনতার শান্ত আলিঙ্গনে,
বন্ধুর মত বুকের মাঝারে টানে।

বিদেশী কবিতার মর্মানুবাদ।

সত্যের সন্ধান

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য চুণীলাল মুখোপাধ্যায় এসেছেন দেওঘরে। প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে হাওয়া খেতে যান তিনি রোহিণী রোডে—বেশ খোলা জায়গা। শীতের দিনে কনকনে হাওয়া হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দেয় যেন। সেদিন চুণীবাবু প্রত্যুষে উঠে গরম জামাকাপড় গায়ে চড়াচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে থেকে কে ডাকল "বাবা!" চুণীবাবু মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, এক গেরুয়াধারী আধা-বয়সী লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, তার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। চুণীলাল প্রশ্ন করলেন: কি চাই?

আগন্তুক মিনতিভরা কণ্ঠে বলল: আমি চুণীলাল মুখোয্যে মশাইকে চাই। চুণীলাল আগন্তুকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বিরক্তিসূচক কণ্ঠে বললেন: বল, কি দরকার?

আগন্তুক বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরে ঢুকে চুণীবাবুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল, দুই হাতে দু'খানি পা জড়িয়ে ধরল। চুণীলালের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল, তিক্ত কণ্ঠে বললেন: ভনিতা রেখে—আসল মতলবটি খুলে বল—কে তুমি?

—এঁজ্ঞে আমার নাম ছিদাম—জাতে কৈবত্ত, নিবাস চামচক। আমার ইস্তিরির ভারী ব্যামো—আমি বাবা বদ্দিনাথের কাছে হত্যে দিছিলাম—আজ শেষ রাত্রে বাবা আদেশ দেছেন, যা বেটা চলে যা রোহিণী রোডে—চুণী মুখোয্যে মশাইর কাছে। সাতদিন তার পাদোদক খাবি আর তার সেবাপূজা করবি, তা হলেই তোর ইস্তিরি সেরে উঠবেন।

চুণীলাল সন্দিগ্ধ ভাবে একবার ছিদামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অবজ্ঞার সুরে বললেন: অসুখ হল তোমার স্ত্রীর, আর পাদোদক খাবে তুমি—তাতেই অসুখ সেরে যাবে তার?

ছিদাম সলজ্জ ভাবে বলল: এঁজ্ঞে, ইস্তিরি হলেন আমার অর্দ্ধাংগিনী কি না?

অপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চুণীলালের বৃদ্ধা জ্যেঠাই-রাইমণি-দেবী এদের কথাবার্ত্তা শুনে। রাইমণি চুণীলালকে জিজ্ঞাসা করলেন: কার সংগে কথা বলছ চুণী? আজ যে বড় বেড়াতে যাও নি, এখনো?

চুণীলাল অবিশ্বাসের ভাষায় ছিদামের আগমন কাহিনী রাইমণি দেবীকে জানালেন। ছিদাম কাঁদ কাঁদ ভাবে রাইমণির চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল: দেখুন তো মা, বাবু আমার কথায় পেত্যয় কত্তিছেন না। আমারে বাবা আদেশ দিলেন যাও, চলে যাও চুণীবাবুর বাড়ী, বাবু ধাম্মিক লোক—তার চন্নামেত্তর খালি আমার ইস্তিরি ভাল হবে; কিন্তুক বাবু আমারে ঠাট্টা কত্তিছেন খালি।

বাবা বৈদ্যনাথের নামে জ্যেঠাই-মা মাথায় হাত ঠেকিয়ে গদগদ ভাবে বললেন: বাবা চুণী, বাবা বৈদ্যনাথের আদেশ অমান্য করতে পারবে না—বাবা তোমার ওপর সদয় হয়েছেন বলেই ওকে পাঠিয়েছেন। যাও বাবা, তুমি বেড়িয়ে এস, আমি সব ঠিক করে নেব।

চুণীলাল কি বলতে যাচ্ছিলেন জ্যেঠাই-মা তাঁকে বাধা দিলেন। চুণীলাল অপ্রসন্ন মুখে গৃহত্যাগ করলেন। এই অসামান্যা ধর্মপরায়ণা নারীর কথা অমান্য করবার ক্ষমতা চুণীলালের ছিল না।

ছিদাম জ্যেঠাই-মা'র সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিল ক্রমে। বৃদ্ধা ছিদামের কাছে তার বাবা বৈদ্যনাথের দোরে হত্তে দেবার কথা জিজ্ঞাসা করতেই, ছিদাম এমনি ভনিতা করে বর্ণনা শুরু করলে যে তিনি একবারে গলে গেলেন!

চুণীলাল ফিরে এসে দেখলেন ছিদাম সকলের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে—ছোট ছেলেমেয়েরা তার চারদিকে ভীড় করে বসেছে এবং ছিদাম গল্প জুড়ে দিয়েছে তাদের সঙ্গে। চুণীলালকে দেখে ছিদাম তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

তারপর একটি গ্লাশে জল নিয়ে এসে চুণীলালের সামনে হাঁটুগেড়ে বসল। হাতযোড় করে ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলল: বাবু, একটু পায়ের ধুলো?—চুণীলাল কিছু বলবার পূর্বেই ছিদাম তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটি গ্লাশের

ভিতর ডুবিয়ে নিয়ে প্রণাম করে নিঃশব্দে চলে গেল। নন্দরাণী সামনেই ছিলেন, তাঁর পানে চেয়ে চুণীলাল একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন: আচ্ছা পাপ! এসব আবার কি?

নন্দরাণী বললেন: আহা বাধা দাও কেন। ঠাকুরের আদেশ—

চুণীলালের কাছে ঠাকুরের আদেশের চেয়ে নন্দরাণীর আদেশটাই বড়; সুতরাং আর কোন কথা বললেন না কিম্বা বাধাও দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন: কিন্তু এদিকে যে মহা মুস্কিল। এ মুল্লুকে চাকর পাওয়া তো দায়! সারা শহর তোলপাড় কোরেও কোথাও পেলুম না একটা চাকর।

—উপস্থিত চাকরের জন্যে বেশী মাথা ঘামাতে হবে না তোমার।—বলে নন্দরাণী অদূরে দণ্ডায়মান আনত-মস্তক ছিদামের পানে তাকিয়ে স্বামীর উদ্দেশে সহাস্যে বললেন: ছিদাম নিজের হাতে তোমার সেবা করবে, ঠাকুরের আদেশ, কাজেই উপস্থিত চাকরের অভাব মিটিয়ে দিয়েছে ও।

চুণীলাল বোকার মতো তাঁর পানে তাকালেন, কিছু তেমন বুঝলেন বলে মনে হল না। কিন্তু স্নান করবার সময় তিনি দেখলেন—বাড়ীর কয়লার ঘরটাকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—সেইটি ছিদামের শোবার ঘর হয়েছে। সে একমাস নাকি বাড়ীর বাইরে যাবে না, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে বাবার আদেশক্রমে। চুণীলাল বাথরুমে ঢুকে দেখেন, জলের চৌবাচ্চা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জল ভর্তি করা হ'য়েছে—বাথরুমের চেহারা বদলে গেছে পরিচ্ছন্নতায়। স্নান শেষ করে দেখেন, ছিদাম বস্ত্রাদি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। আহারের সময়ও ছিদাম পাখার বাতাস করলে। বিশ্রামের সময় পদসেবা করলে। চুণীলাল ছিদামকে কোন কিছু করতে বলেন না, আবার করতে নিষেধও করেন না। ছিদামের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করেন না। শুধু ছিদামের হাবভাব গতিবিধি লক্ষ্য করেন মাত্র।

জ্যেঠাইমা বৃদ্ধা। সন্ধ্যা হলে বাতের ব্যথায় ছটফট করেন, ছিদাম সযত্নে কবরেজী তেল মালিশ করে তাঁকে ঘুম পাড়ায়। তিনি কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করেন ছিদামকে। জিজ্ঞাসা করেন তার দেশের কথা। জিজ্ঞাসা করেন বউয়ের কথা। জ্যেঠাইমা ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক। ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন রাতদিন। মানুষকে ধর্মবিষয় উপদেশ দিতেও ভালোবাসেন তিনি খুব। প্রত্যহ দুপুরে রামায়ণ পাঠ তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

একদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ছিদাম তাঁর পায়ে যথারীতি তেল মালিশ করে দিচ্ছে এমন সময় তিনি প্রশ্ন করলেন: হ্যাঁ রে ছিদাম, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ শুনেছিস কখনো।

বোকার মত তাঁর পানে চেয়ে ঘাড় নাড়ে ছিদাম। জানায়, শোনেনি সে ওসব কোনদিন।

—সে কি রে! তুই যে অবাক করলি! সবিস্ময়ে তার পানে চেয়ে জ্যেঠাইমা বললেন: বাঙালীর ছেলে রামায়ণ, মহাভারত শুনিসনি কি বল্?

—আমি কি নেকাপড়া জানি।—মাথা নিচু করে বলে ছিদাম।

—ওমা, তাতে কি? তোদের গাঁয়ে ঘরে বুঝি ওসব পাঠ হয় না কোথাও?

—হয়, আমি শুনতে যাই না।

—শুনতে যাস না? কেন?

—ওসব ধম্মকথা আমি বুঝতে পারি না, ভালোও লাগে না।—বলেই জোরে জোরে মালিশ করতে লাগলো ছিদাম মাথা নিচু করে। জ্যেঠাইমা গালে হাত দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন: ভালো লাগে না কি রে হতচ্ছাড়া! আচ্ছা রোজ দুপুরে আমার কাছে বসে বসে রামায়ণ শুনিস দিকি, দেখবো ভালো লাগে কিনা।

পরদিন থেকে আহারাদির পর দুপুরে প্রথমে জ্যেঠাইমার বাতপঙ্গু পায়ে কবরেজী তেল মালিশ, তারপর জ্যেঠাইমার মুখে রামায়ণ পাঠ শোনা নিয়মিত চলতে লাগলো ছিদামের।

এক একটি অধ্যায় পড়েন জ্যেঠাইমা আর ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে বোঝাতে থাকেন। অবাক হ'য়ে শোনে ছিদাম। শুনতে শুনতে চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে ওঠে বিস্ময়ে। মনের মধ্যে তোলপাড় হ'য়ে ওঠে তর্ক। এও কি সম্ভব! চোর কি কখনো সাধু হয়।

জীবনে কোনদিন ধর্ম্মকথা শোনেনি ছিদাম। শোনেনি কারো ন্যায় উপদেশ। অন্যায়কে জীবনের সঙ্গী করে অধর্মের রথ চালিয়েছিল সে এতদিন। কারো ভালো কথায় কোনদিন কান দেয়নি সে ভয়ে, পাছে ধর্মের পাগলামি মাথায় ঢুকে পড়ে—পাছে তার উপায়ের রাস্তা বন্ধ হ'য়ে যায় ধর্মের পাহারায়। তা ছাড়া ওসবে বিশ্বাসও নেই তার। তার ধারণা চোর বাটপাড় কখনো সাধু হতে পারে না, সাধুও কখনো চোর হয় না! চোর ধর্মকথা শুনলে বা ধর্ম করতে গেলে শুধু কষ্টই হবে, আর কিছু হবে না। চোর চিরকাল চোরই থাকে, সাধু সাধুই। কিন্তু আজ এ কি কথা শুনছে সে, জ্যেঠাইমা একি শোনাচ্ছেন তাকে! এমন কথা জীবনে তো শোনেনি সে। রামায়ণের রত্নাকর—দস্যু রত্নাকর—সে কিনা হ'ল সাধু বাল্মীকি! বুকখানার ভেতর তোলপাড় ক'রে উঠল তার। আরো মোচড় দিয়ে উঠলো বুকখানা যখন শুনলে—রত্নাকর যাদের ভরণপোষণ করবার জন্যে চুরি করতো, তারা কেউ পাপের ভাগী হতে চাইলো না তার। তাহলে, ~~তাহলে~~ ছিদামের কি হবে অবস্থা! সারা জীবন ধরে যে পাপ সে সঞ্চয় করেছে কি হবে তার পরিণাম!—কিন্তু—আবার একটা সন্দেহ দোলা খেয়ে গেল মনে—কেতাবের কথা কি সত্যি!

মালিশ করতে করতে হাত কখন থেমে গেছে ছিদামের জানতে পারেনি। দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে তার জ্যেঠাইমার মুখের দিকে। অবাক হয়ে শুনছে তাঁর কথা।

জ্যেঠাইমা বোঝাচ্ছেন তখন রত্নাকরের পাপ জীবনের অবসান সম্বন্ধে। কেমন ক'রে রত্নাকরের পরিবর্তন সম্ভব হ'ল! অকস্মাৎ প্রশ্ন করে উঠলো ছিদাম: এও কি হয় মা? ডাকাত সে কখনো—

—কেন হবে না?—জ্যেঠাইমা বললেন: ডাকাত হলেও রত্নাকর তো মানুষ ছিল। সমস্ত জীবেই ভগবান বিরাজ করেন। সুমতি কুমতি সব মানুষের ভেতর আছে। কুমতিকে এড়িয়ে যে সুমতির আশ্রয় নেয় সেই সাধু হ'তে পারে। ভগবান তাকেই আশীর্বাদ করেন। কুমতির প্রভাব কাটিয়ে যেমন উঠলো রত্নাকর—যেমন সে বুঝলে পাপের পথে শান্তি নেই—অমনি সে সাধু হ'য়ে গেল। রাম নামে বিভোর হ'য়ে গেল।

রাম নামে!—ছিদাম কি যেন ভাবতে লাগলো উদাস হয়ে। বুকের ভেতর থেকে একটা কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম করতে লাগলো। কতক্ষণ মনে নেই এই-ভাবে কেটে গেল। জ্যেঠামার সব কথা তার কানে গেল না। তারপর হঠাৎ সে এক সময় ছেলে মানুষের মত কেঁদে উঠলো। মাথাটা তার নিচু হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো জ্যেঠাইমার পায়ের ওপর।

আশ্চর্য হয়ে জ্যেঠাইমা বললেন: এ কি রে ছিদাম? কি হ'ল? অমন করছিস কেন?

ছিদাম আত্মসংবরণ করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: মা—তুমি আমাকে নূতন আলো দেখালে, নূতন আলো দেখালে। —আজ আমার পুনর্জন্ম হল।—একটা দম নিয়ে আবার বললে: মা, আমি মহাপাপী। আমি মিথ্যাবাদী, চোর—আমায়, আমায় বলে দাও—শিখিয়ে দাও—কি করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে? আর কথা বলতে পারলে না সে।

রাইমণি স্নেহভরে ছিদামের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন: অনুশোচনা তোমার এসেছে—এবার ভগবান তোমাকে দয়া করবেন—মনে মনে রামনাম স্মরণ করো খালি। যে নাম নিয়ে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ মৌনভাবে থেকে ছিদাম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: তুমি জান না মা, আমি কি মহাপাপী—আমি তোমাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছি। বাবু ঠিকই অনুমান করেছেন, আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। আমি কতো লোকের সর্বনাশ করেছি তার ঠিক নেই। লুণ্ঠতরাজ করেই জীবনের এতদিন কাটিয়েছি। শেষে একটা খুনের মামলায় জেল হয়েছিল। জেল ভেঙে পালিয়ে এসে মিথ্যে কথা বলে—ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে তোমাদের সঙ্গেও প্রবঞ্চনা করেছি।—বল মা আমার প্রায়শ্চিত্ত কী? আমার মত পাপীকে কি দয়া করবেন ভগবান?

তার স্বীকারোক্তি শুনে জ্যেঠাইমা শিউরে উঠলেন—মন তাঁর বিষিয়ে উঠল এই প্রবঞ্চকের কাহিনী শুনে। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না তিনি, তারপর বললেন: ছিদাম তুমি তোমার পাপ স্বীকার করেছ, অনুতপ্ত হয়েছ এই কারণে আমিও তোমাকে ক্ষমা করলুম! তুমি যদি সত্যি সত্যিই

অনুতপ্ত হয়ে থাক তবে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ কর—তাঁর ভজন পূজন কর।—তারপর আরো কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর আস্তে আস্তে তিনি বললেন : একটা গল্প শোনো। বেশী দিনের কথা নয়, একজন মহাপুরুষ জন্মেছিলেন নবদ্বীপে। নাম তাঁর নিমাই—তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার কর্তে গিয়ে দুই ভীষণ গুণ্ডা মহাপাপী জগাই মাধাইএর সঙ্গে দেখা করে তাদের উদ্ধার করেছিলেন কেবল নাম বিলিয়ে!

ধীরে ধীরে জ্যেঠাইমা বলতে লাগলেন অতীতের সেই পুণ্য কাহিনী। কেমন করে সেই পাষণ্ড জগাই মাধাই উদ্ধার পেলো—কলসীর কাণা মেরেও ভগবানের দয়া হতে বঞ্চিত হয়নি তারা। নামের গুণে পাপী জগাই-মাধাই পর্যন্ত তরে গেল। শেষে বললেন : ছিদাম তুমি যদি সত্যই অনুতপ্ত হ'য়ে থাকো তাহলে একান্ত মনে রাম নাম করো, সব পাপ ধুয়ে যাবে।

ছিদাম একাগ্রচিত্তে শুনে যেতে লাগলো জ্যেঠাইমার কথা। বুকটার মধ্যে কেমন যেন একটা যন্ত্রণা—কেমন যেন একটা জ্বালা অনুভব করতে লাগলো ছিদাম। ইচ্ছে হতে লাগলো কি যেন একটা করতে, কিন্তু সে ইচ্ছাটা কি সে বুঝতে পারলে না।

পরদিন সকালে ছিদামকে আর দেখা গেল না চুণী-বাবুর বাড়িতে। চুণীবাবু স্বল্প হেসে বললেন : এ রকম হবে আমি জানতুম। আমি তো আগেই বলেছিলুম ও ব্যাটা একনম্বরের জোচ্চোর। দেখ এখন কিছু নিয়ে-টিয়ে সরল কিনা। কত রকমের বদমাশই যে আছে দুনিয়ায়! ব্যাটা বলে কিনা বাবা বদ্যিনাথের আদেশ—সামনে দণ্ডায়মানা নন্দরাণীকে লক্ষ্য করে বললেন : নাও বোঝ এবার, ঠাকুরের আদেশ কেমন!

অধোবদন হলেন নন্দরাণী। জ্যেঠাইমা কাছে ছিলেন তিনিও লজ্জিত হলেন।

যাই হোক পরে অনুসন্ধান করে দেখা গেল বাড়ির কিছুই খোয়া যায় নি। ছিদাম শুধু হাতেই চলে গেছে। চুণীবাবু বললেন : সুবিধে করতে পারেনি হয়ত। কিম্বা ভেবে দেখলে সুবিধে তেমন হবেও না এখানে, তাই সরে পড়েছে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ দৈনিক পত্রিকার একটি বিশেষ সংবাদের ওপর দৃষ্টি পড়লো চুণীবাবুর। সংবাদের মর্ম এইরূপ :

একটি দাগী আসামী বহুদিন যাবৎ আত্মগোপন করে থাকার পর হঠাৎ কয়েকদিন পূর্বে নিজে এসে পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছে। আসামীর নামে নানা অভিযোগ—রাহাজানী, চুরি থেকে আরম্ভ করে খুন পর্যন্ত। মাস কয়েক পূর্বে হাজত থেকে আসামী উধাও হয়েছিল। ছদ্মবেশ ধারণে আসামী সিদ্ধহস্ত। আসামীর নাম—শ্রীনিবাস তালুকদার।

চুণীবাবু সংবাদটি নিজেও পড়লেন এবং নন্দরাণী ও জ্যেঠাইমাকেও শোনালেন। জ্যেঠাইমার মনটা কেমন ছাৎ করে উঠলো শুনে। ছিদাম নাকি! কিন্তু মনের কথা কাউকে জানতে দিলেন না তিনি। চুণীবাবুর মনেও সে সংশয় দেখা দিলে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। ভাঙা গড়ার ভেতর দিয়ে দশ বছর কালের কোলে হারিয়ে গেছে। এবারও চুণীলাল দেওঘরে বেড়াতে এসেছেন পরিবারবর্গ নিয়ে। এবারে এসে উঠেছেন স্থানীয় এক ধনী মক্কেলের বাড়িতে। মক্কেলটি ধনীও বটে, ধার্মিকও বটে। সাধু সজ্জন করে বেড়ান খুব।

সেদিন সান্ধ্য বৈঠকে ওই সম্বন্ধে আলোচনাই হচ্ছিল। মক্কেল লছমীনারায়ণকে চুণীলাল জিজ্ঞাসা করলেন : তারপর লছমীনারায়ণবাবু, সাধুসঙ্গ কেমন কচ্ছেন বলুন? নতুন সাধু-টাধুর কোন সন্ধান পেলেন?

—নিশ্চয়ই।—খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন লছমী নারায়ণ।—বছর তিন থেকে এক পাগলা সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছে এখানে। সে এক বদ্ধ পাগল মশাই! তার সঙ্গে মিশতে পারলে সে বেশ ভালো ভাবেই আলাপ করে। অনেক চেষ্টার পর আজ কদিন হ'ল আমার সঙ্গে ভালো ভাবে কথাবার্তা বলছেন। একটু থেমে লছমী নারায়ণজী বললেন : আমার কাছে তাঁর অতীত জীবনের যে ইতিহাস বলেছেন তা সত্যিই অদ্ভুত। তিনি নাকি পূর্বে ঠিক রত্নাকরের মতই একজন ভয়ঙ্কর দস্যু ছিলেন, একটি মহিলার উপদেশে তিনি সে-পথ পরিত্যাগ করে

সৎ হবার চেষ্টা করছেন। বলেন নাকি রামায়ণ শুনতে শুনতেই তাঁর পরিবর্তন আসে।

চুণীলালের ললাট কুঞ্চিত হল। খানিকক্ষণ কী যেন ভেবে বললেন: রামায়ণ শুনতে শুনতেই।—অনেক দিন আগেকার একটা ক্ষীণ স্মৃতি যেন মনে পড়লো।

লছমীনারায়ণ বললেন: লোকটার নাকি খুনের দায়ে জেল হয়েছিল। তারপর জেল থেকে পালিয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ি আত্মগোপন করেছিল। সেইখান থেকেই তার জ্ঞানোদয় হয় এবং হঠাৎ আবার একদিন নিজেই গিয়ে পুলিশে ধরা দেয়। সাত বছর বুঝি তাঁর জেল হয়েছিল। কিন্তু—

—কোথায় থাকেন সে সন্ন্যাসী?—অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন চুণীলাল।

—রোহিনী রোডে। একটা পোড়ো বাড়ির সামনে একখানা কুঁড়ে বেঁধে থাকেন। তাঁর মুখে শুনেছি—সেইখান থেকেই নাকি তিনি জ্ঞানের আলো দেখতে পেয়েছেন!

—সাধুজীর কোন অলৌকিক ক্ষমতা টমতা—

—না না, সে সব কিছু দেখা যায় নি। কিন্তু তাঁর মুখের রামায়ণ গান অপূর্ব মশাই। তাঁর মুখে একবার রাম নাম শুনলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্মরণ থাকবে।

—বলেন কি?

—আজ্ঞে হাঁ। যে পোড়ো বাড়িটার সামনে তিনি আশ্রম বেঁধে আছেন, দশ বছর আগে সেই বাড়িতে এক স্বাস্থ্যান্বেষী পরিবার এসেছিলেন। সেই পরিবারের একটি বর্ষীয়সী ধর্মপ্রাণ মহিলা নাকি তাঁর মনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিলেন।

ভীষণ ভাবে চমকে উঠলেন চুণীবাবু।—সেই মহিলাটির নাম জিগ্যেস করেছিলেন কি?

—নাম? না, তা জিগ্যেস করিনি। তবে সাধুজী বলেন—গুরুমা। কিন্তু কেন বলুন তো?

—না, এমনি।—অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলেন চুণীবাবু। কি যেন ভাবতে লাগলেন। গভীরতম চিন্তা রেখান্বিত হ'য়ে চললো তাঁর মুখে, তাঁর কুঞ্চিত ললাটে, তাঁর প্রদীপ্ত চক্ষু।

বহুক্ষণ নীরবতায় কেটে যাবার পর আস্তে আস্তে চুণীবাবু বললেন: কাল যাব আপনার সঙ্গে সাধুজীকে দেখতে।

—বেশ, বেশ, নিয়ে যাবো আমি। বাড়ির মেয়েদেরও—

ঠিক এই মুহূর্তে চুণীবাবুর বড় ছেলে হঠাৎ উপস্থিত হ'ল। চুণীবাবুর ছেলের নাম হীরালাল—গত বৎসর এম-এ আর ল' পাশ করে বাপের কাছে তালিম নিচ্ছে। সে ব্যস্তভাবে বললে: বাবা, শিগগির আসুন, এক মহা মুশকিলে পড়া গেছে।

—কেন, কি হ'ল?—চুণীলাল ও লছমী নারায়ণজী সমস্বরে প্রশ্ন করলেন।

—না ভয়ের কিছু নয়!—একটু হেসে হীরালাল বললে: ঠাকুমা এক ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসেছেন।

—ঠাকুমা? মানে জ্যেঠাইমা?

—হ্যাঁ। লছমীবাবুর স্ত্রীর মুখে এক সাধুর খবর পেয়ে তিনি সকাল থেকে আমায় তাড়া দিচ্ছিলেন সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে। বিকাল বেলা মাকে আর তাঁকে নিয়ে সেই সাধুর আশ্রমে গেলুম।

—কোথায় সে সাধুর আশ্রম?—লছমীনারায়ণজী প্রশ্ন করলেন।

—রোহিনী রোডে। ঠাকুমা সেখানে গিয়ে আর কিছুতে আসতে চাইছেন না। সাধুজীও ঠাকুমাকে ছাড়তে চাচ্ছেন না। সাধুজী বলে, ঠাকুমা নাকি তাঁর গুরুমা। ঠাকুমাকে দেখার অপেক্ষাতেই তিনি ঐখানে পড়ে আছেন আজ তিন বছর। দশ বছর আগে সেইখানের পোড়ো বাড়িটাতে নাকি আপনারা ভাড়া ছিলেন কিছুদিন? সেই সময় তাঁর নাকি পরিচয় হয় আপনাদের সঙ্গে এবং ঠাকুমার সঙ্গে।

বিস্ময়ের ঘোর খানিকটা কেটে গেল চুণীবাবুর।

—ঠিকই হ'য়েছে। যা ভেবেছি—এ নিশ্চয়ই সেই ছিদাম!—কতকটা আত্মগতভাবে বললেন: কিন্তু, কিন্তু আজকের দিনেও এমন সম্ভব? আজকের রত্নাকরও বাল্মীকি হ'তে পারে!—উঃ, কি আশ্চর্য পরিবর্তন।

—ছিদাম! ছিদামটা কে?—লছমীনারায়ণ প্রশ্ন করলেন।

—সে এক মজার গল্প। পরে বলবো। চলুন এখন রোহিণী রোডে একবার ঘুরে আসি।

তাঁরা ব্যস্ততায় সঙ্গে যাত্রা করলেন রোহিণী রোডের দিকে।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। ঝির ঝির করে দক্ষিণা বাতাস বইছে। রাত প্রায় এগারোটা।

লক্ষ্মীনারায়ণের মোটর চুণীবাবু, হীরালাল প্রভৃতিকে নিয়ে তীর বেগে ছুটেছে বস্তিনাথের কাঁকর বিছানো রাঙা পথের বুকের ওপর দিয়ে। পথ নির্জন। আশে পাশে বসতি নেই। একটা বাঁকের মুখে গাড়ির গতি মন্থর হ'ল। শোনা গেল অনেক দূরে যেন একটি কান্নাভাঙা পরিচিত কণ্ঠে রামায়ণ গান হ'চ্ছে।—

রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল প্রত্নতত্ত্ববিদ

প্রাচীনকালে রাঢ়দেশ পুণ্যতীর্থে, শৌর্য্যবীর্য্যে, স্থাপত্যে ও শিল্প-বাণিজ্যে এক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। আজিও রাঢ়দেশের বিভিন্নাঞ্চলে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানাদ প্রাচীন রাঢ়দেশের পুণ্যতীর্থ ও অন্যতম রাজধানী।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মহানাদ এক পুণ্যতীর্থ। মহামুনি বশিষ্ঠ গয়াপীঠ হইতে মহানাদে আসিয়া আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক শেষ জীবনযাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাবারিতে অবগাহন করিবার আশায় ভাগীরথী হইতে আশ্রম পর্য্যন্ত একটি শাখা নদীর সৃষ্টি করেন। বর্তমানে আশ্রম সংলগ্ন অংশ "বশিষ্ঠগঙ্গা" নামে এক বৃহৎ পুষ্করিণীর আকার ধারণ করিয়াছে। তৎকালীন আশ্রমটি জিয়ৎকুণ্ড, মুক্তকুণ্ড, সিদ্ধকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, গোদকুণ্ড, ক্ষীরকুণ্ড, কুকুরকুণ্ড, যোগিনীকুণ্ড, দুর্গাকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ড নামক দ্বাদশ কুণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। মহামুনি বশিষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য বহু মুনি-ঋষি এই আশ্রমে তপস্যা করিতেন তাহা বলা বাহুল্য।

আদি তীর্থঙ্কর শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারকালে মহানাদে শুভাগমন করেন। তাঁহারই সময় হইতে এই আশ্রমটি "নাথমঠ" নামে অভিহিত হইয়াছে। জিয়ৎকুণ্ডের দক্ষিণতীরে যোগিগণের সমাধি রহিয়াছে; তন্মধ্যে একটি "জীবন্ত সমাধি" নামে বিদিত। কোন হঠযোগী জীবন্ত অবস্থায় সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। রাজপুতানায় এই প্রকার জীবন্ত সমাধি পরিদৃষ্ট হয়।

সুপ্রাচীনকাল হইতে মঠটি নাথ সম্প্রদায় মহান্তগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। মহান্তগণের সঠিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে সকল মহান্ত কর্ত্তৃক মঠের মন্দিরাদির সংস্কার হইয়াছে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম।

খৃষ্টীয় ১৮০৮ অব্দে মহান্ত মহারাজ অচলনাথ যোগীরাজ ৺জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দিরটির সংস্কার করেন।

খৃষ্টীয় ১৮৪৩ অব্দে ভগবন্ত নাথ যোগেশ্বর যোগীরাজ জোড়বাংলা মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যোগিনীকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করেন। কুণ্ড হইতে আবিষ্কৃত দুইটি প্রস্তরময় বুদ্ধমূর্ত্তি এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
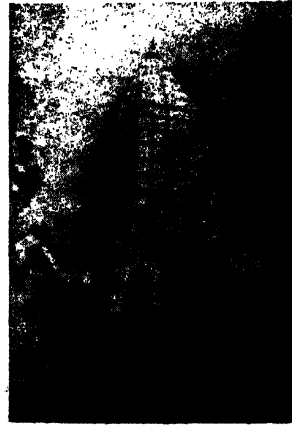
শ্রীশ্রীজটেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দির এবং পার্শ্বে "জোড়বাংলা"
শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির

খৃষ্টীয় ১৮৯৮ অব্দে মহান্ত মহারাজ মথুরানাথ যোগীরাজ ৺জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং

মঠের প্রাঙ্গণটি একটি ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন।

খৃষ্টীয় ১৯০৫ অব্দে মহান্ত মহারাজ খুসীনাথ যোগেশ্বর যোগীরাজ ৺জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দিরটির সংস্কার করেন এবং মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ বারান্দাটি নির্ম্মাণ করেন।

খৃষ্টীয় ১৯১৩ অব্দে মহান্ত মহারাজ সমর নাথ যোগেশ্বর যোগীরাজ মঠের ভিতর-বাটীর ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরটি নির্ম্মাণ করেন ও একটি একটি ইন্দারা খনন করাইয়া দেন।

খৃষ্টীয় ১৯২৫ হইতে ১৯৩৬ অব্দ পর্য্যন্ত মহান্ত মহারাজ লছমী নাথ যোগেশ্বর যোগীরাজ কর্ত্তৃক বশিষ্ঠগঙ্গার ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত, জিয়ৎকুণ্ড ও ক্ষীরকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, সমাধি সংস্কার, নলকূপ প্রতিষ্ঠা ও উদ্যান রচনাদির কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে প্রসিদ্ধ কুতুবমিনারের সন্নিকটস্থ দণ্ডায়মান লৌহস্তম্ভে খোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে—চন্দ্র নামে কোন পরাক্রমশালী নৃপতি গঙ্গার মোহনা হইতে আরম্ভ করিয়া

৺গঙ্গাধর করের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির। (কর-বংশের এক পুণ্যকীর্ত্তি)

সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ অব্দে তিনি ভারতভূমিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই মহানাদ চন্দ্রের রাজত্বকালে সমৃদ্ধ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান মহানাদের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চন্দ্র দীঘি নামে এক সুবৃহৎ দীঘি বা জলাশয় তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি মহানাদ নাথ-মঠে অনেক ভূমি ও জলাশয় দান করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কাল হইতে আজিও সরকারী জরীপের সময় তাঁহার দানের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। মহানাদ হইতে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী যাতায়াতের জন্য যে প্রশস্ত পথটি রহিয়াছে ইহাও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। রাঢ়ের রাজা চন্দ্রের উপাধি ছিল 'কেতু'। সেইজন্য তিনি চন্দ্রকেতু নামে পরিচিত।

চন্দ্রকেতুর পরবর্ত্তীকালে গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে মহানাদ যে সমুন্নত হইয়াছিল তাহার প্রকৃত নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। বহুকাল মহানাদ বক্ষে ভগ্ন স্তূপশ্রেণী অরণ্যাবৃত ছিল। খনন কার্য্য ও গবেষণার অভাবে স্তূপগুলির বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই।

গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে নাথমঠের সন্নিকটে জেলাবোর্ডের রাস্তার ঠিক পার্শ্বেই একটি প্রাচীন স্তূপ খনন করিয়া আমি এক প্রাচীন অট্টালিকার প্রাচীর আবিষ্কার করি। রাস্তার পার্শ্ব খনন করিবার অনুমতি প্রাপ্তির আশায় জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পত্র দিয়াছিলাম। চেয়ারম্যান আমার আন্তরিক ইচ্ছা সাফল্যমণ্ডিত করিবার ইচ্ছায় জেলাবোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জি, সি, মুখার্জ্জীকে নির্দ্দেশ করেন।

জেলাবোর্ডের অনুমতি পত্রখানি পাইয়া পুনরায় খনন কার্য্য আরম্ভ করিবার ফলে কতিপয় বৃত্তাকার ইষ্টক ও দুইটি বুদ্ধমূর্ত্তি ক্ষোদিত মৃণ্ময় ছাঁচ (Terracatta Matrix) আবিষ্কার করি। একখানি ইষ্টক ও ছাঁচ দুইটি কলিকাতার ভারতীয় সংগ্রহাগারের (Indian Museum, Archaeological Department) তদানীন্তন

কাজীমন সাহেবের সমাধি। (৬০০ বৎসরের প্রাচীন নিদর্শন)

সুপারিটেন্‌ডেণ্ট ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করি। মজুমদার মহাশয় দ্রব্যগুলির প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করিয়া সংগ্রহাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি কয়েক দিন পরেই মহানাদে যাইয়া আমার আবিষ্কৃত স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি মহানাদ নাথমঠের প্রাচীন মন্দির, মূর্ত্তি এবং স্তূপাদি পরীক্ষা করিয়া গুপ্ত ও পালবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালীন নিদর্শন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি এই প্রাচীন স্তূপটি খনন করিবার জন্য সচেষ্ট হন।

খৃষ্টীয় ১৯৩৫ অব্দে ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক আমার নির্দ্দিষ্ট স্তূপে খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। কয়েক দিন খননের ফলে প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ, মৃণ্ময় পাট নির্ম্মিত একটি কূপ, দেওয়াল গাত্রস্থ নক্সাদার মস্তক (Stuccohead) এবং বহুবিধ মৃৎ-পাত্র-খণ্ড আবিষ্কৃত হয়। নক্সাদার মস্তকটি এবং কতিপয় মৃৎ-পাত্র-খণ্ড ভারতীয় সংগ্রহাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। মহানাদের খনন কার্য্যের বিষয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

The Annual Report of the Archaeological Survey of India for the year 1934-35.

"At a third Site in Bengal named Mahanad in Hooghly district, an exploratory trench revealed the existence of interesting Structures. All the three sites are attributed to the period from the 5th to the 7th Century A. D., when Bengal appears to have had particularly prosperous times."

গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পুনরায় এই স্তূপে খনন করেন এবং সমগ্র স্তূপটি "সংরক্ষিত অঞ্চল" বলিয়া ঘোষণা করেন।

নাথমঠের মধ্যস্থলে লিঙ্গরাজ জটেশ্বর নাথ মহাদেবের সুরম্য মন্দির বিরাজিত। এই মন্দিরের তলদেশস্থ ইষ্টকাদি পরীক্ষা করিয়া গুপ্ত যুগের নিদর্শন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মঠে এক প্রকার স্তম্ভাকৃতি শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। এই প্রকার শিবলিঙ্গ রাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের সময়কালীন প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া স্থির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন একপাদ ভৈরব মূর্ত্তি গুপ্তযুগের এক বিশিষ্ট অবদান। মঠে একটি একপাদ ভৈরব মূর্ত্তির নিয়মিতভাবে পূজা হইতেছে। আর একটি এই প্রকার ভৈরব মূর্ত্তি বশিষ্ঠগঙ্গার তীর খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

শিলা ভৈরবনাথের মন্দির গাত্রে একটি প্রস্তরময় "গণকীর্ত্তি" মূর্ত্তি প্রোথিত আছে। এই প্রকার গণকীর্ত্তি মূর্ত্তি গুপ্তযুগের একটি বিশেষ অবদান। মহানাদের ডাঃ অবনীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রকার মূর্ত্তি ক্ষোদিত একটি প্রস্তরফলক মহানাদ বাগান পাড়া (বা কাগজীপাড়া) মহল্লা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

মঠে সংরক্ষিত প্রস্তরময় কারুকার্য্যখচিত মকরাকৃতি জলনিকাশের প্রণালী দৃষ্ট হয়। এই প্রকার প্রণালী গুপ্তযুগের মন্দিরে ব্যবহৃত হইত।

খৃষ্টীয় ১৮৮২ অব্দে রেঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহানাদ বক্ষে কুমারগুপ্তের একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মুদ্রাটির এক পৃষ্ঠায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তি এবং অপর পৃষ্ঠায় লক্ষ্মী মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে(১)।

একই সময়ে রেঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্কন্দগুপ্তের একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন(২)। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম গয়াতে এই প্রকার স্কন্দগুপ্তের একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন(৩)।

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহানাদ নিবাসী ৺অন্নদাপ্রসাদের সহধর্ম্মিণী মহানাদ বক্ষে শশাঙ্কের একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই প্রকার মুদ্রার এক পার্শ্বে নন্দীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্ত্তি এবং অপর পৃষ্ঠে পদ্মাসনে সমাসীন লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। মুদ্রাটি কলিকাতার ভারতীয় সংগ্রহাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন মহানাদে গুপ্তযুগের কতিপয় মৃণ্ময় ঢাকনী, বিভিন্ন প্রকার মৃণ্ময় ওজন ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছি। এইগুলি হুগলী বৈষ্ণবাটীর সারদাচরণ-মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

গুপ্তযুগের পর পালবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালীন কতিপয় নিদর্শন নাথমঠে দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর সুন্দর কারুকার্য্যখচিত এক প্রস্তরময় হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তি নাথমঠে ছিল। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাহা ভারতীয় সংগ্রহাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। মঠে একটি বিশাল গৌরীপট্ট রহিয়াছে। এই প্রকার গৌরীপট্ট রাঢ়দেশের অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। মঠের এক ক্ষুদ্র মন্দিরে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা
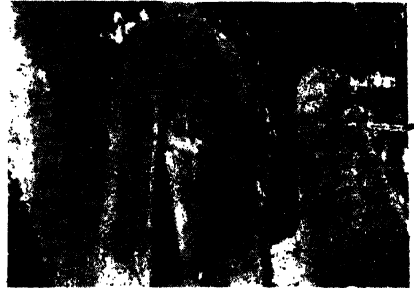
গুপ্তযুগের একপাদ ভৈরব মূর্ত্তি এবং তৎপার্শ্বে মকরমূর্ত্তিবিশিষ্ট জলপ্রণালী

হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জীয়ৎকুণ্ড হইতে একটি বৌদ্ধ কুবের জাম্ভেলার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর একটি উৎকৃষ্ট অবদান বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় ভারতীয় সংগ্রহাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে। মহানাদস্থ গড়ের বাগান নামক স্থানে দুইপ্রকার পাল যুগের বিষ্ণু মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছি। মূর্ত্তি দুইটী সারদাচরণ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত অঞ্চলে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছি। মন্দিরের নক্সাদার একখানি ইষ্টক এই মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মহানাদের উত্তরদিকে পাইকপাড়া নামে একটি পল্লী আছে। বৌদ্ধযুগে এই স্থানে 'পাইকগণের' বাসস্থান ছিল।

বর্ত্তমান মহানাদের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে কোটালিপাড়া নামে একটি পল্লী আছে। এই স্থানে "কোটালগণ" বাস করিত।

বর্ত্তমান মহানাদের পশ্চিম প্রান্তে গড়ের মাঠ নামে এক প্রকাণ্ড সমতল ক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া বশিষ্ঠ-গঙ্গা নদী

---

(১) **Proceeding of the Asiatic Society of Bengal, 1882, P. 91 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1883, P. 116 ; Catalogue of Coins in the Indian Museum, vol, i, P. 115, No 33 and note 1.)**

(২) **Proceeding of the Asiatic Society of Bengal, 1882, P, 91 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1882, P. 112.**

(৩) **Ibid.**

প্রবাহিত হইতেছে। এই গড়ের মাঠে সৈন্যগণকে রণকৌশল শিক্ষা শিক্ষা দেওয়া হইত।

এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান মহানাদ হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে উকুশপুরের পয়া নামে একটি প্রকাণ্ড পরা বা পতিত ভূভাগ দৃষ্ট হয়। এই প্রকার উচ্চ অনুর্ব্বর ও সুবিস্তৃত ভূভাগ এতদঞ্চলে দৃষ্ট হয় না। এই স্থান প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্র ছিল বলিয়া আমার অনুমান হয়।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাণ্ডু বা পাণ্ডব নামে জনৈক নৃপতি মহানাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃষ্টীয় ১৩১০ অব্দে পাঠান বীর সাহসুফী সুলতান বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে মহানাদ আক্রমণ করেন। ফলে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। পাণ্ডু রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। আজিও এতদঞ্চলে পাণ্ডু রাজার প্রতিষ্ঠিত "পারুই" নামক এক বৃহৎ দীঘি এবং তাঁহার মহিষীদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত "ষো সতীন" নামক অপর এক দীঘি বিদ্যমান রহিয়াছে।

কুমার গুপ্তের সমকালীন প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি

সুলতান সাহসুফীর জয়লাভের পর হইতেই মহানাদ এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমানগণের বসতি বিস্তার আরম্ভ হইল! কাজিমন সাহেব নামক একজন ফকীরের প্রচেষ্টায় সুলতান জয়লাভ করিয়াছিলেন। কাজিমন সাহেবের মৃত্যু হইলে সুলতান মহানাদ বক্ষে তাঁহাকে সমারোহের সহিত সমাহিত করিয়াছিলেন এবং একটি সমাধি স্থাপন করিয়াছিলেন। আজিও সেই সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাধিটী ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় পরিবার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এতদঞ্চলের কি মুসলমান কি হিন্দু সকলেই ভক্তিভরে তথায় সিন্নি দেয়। প্রতি বৎসর উত্তরায়ণ উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে বিজ্জল ভূপতির অনুমতি ক্রমে পাটনানিবাসী জগন্মোহন পণ্ডিত রাঢ় দেশস্থ এই মহানাদ নগর পরিদর্শন করেন। তাঁহার রচিত দেশাবলী বিবৃত্তি নামক গ্রন্থে "অথ মানাত দেশ বিবরণম্" বলিয়া নগরের উল্লেখ আছে—

> যোগি জাতি গৃহে জাতো ভাগ্যবান সর্ব্বলক্ষণঃ।
> মহেন্দ্র নারায়ণ নৃপে মানাত নগরে পুরা॥
> মৃত্তিকাময় দুর্গন্তু মর্য্যাদাভিঃ সুমন্বিতম্।
> স্থাপিতা বেণু বৃক্ষান্ত দুর্গমধ্যে পুরানৃপৈঃ॥
> প্রাচীনা রাজবাটীচ বর্ত্ততে ভগ্ন বাটীকা।
> রাজবাট্যাঃ পার্শ্ববর্ত্তী বহবঃ যোগিজাতয়॥
> অথ মানাত বিখ্যাত রাঢ়দেশেষু—

(পুঁথিখানি সংস্কৃত কলেজে সংরক্ষিত)

এই পুঁথি ব্যতীত ৺সহদেব চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্মমঙ্গল" পাঠে অবগত হওয়া যায়—মীননাথ নামে জনৈক যোগী মহানাদের রাজা ছিলেন। উভয় পুঁথি হইতে বেশ প্রমাণিত হয় যে তৎকালে মহানাদে যোগী জাতির বসতি বিস্তার ও আধিপত্য ছিল।

মুসলমান রাজত্বে মহানাদের অন্তর্গত কতিপয় মহল্লার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহানাদে কাজীর বিচারালয় ছিল। এখনও কাজীপাড়া নামে একটি মহল্লা আছে এবং তথায় কাজী বংশধরগণ বাস করিতেছেন। কাজীগণের প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন মসজিদাদির নিদর্শন এবং বড় পীর নামে একটি পবিত্র সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

মীরাপাড়া নামক একটি মহল্লা আছে। এই স্থানে বহু ধনী মুসলমান পরিবারের বাস ছিল।

কাগজীপাড়া নামক একটি মহল্লা আছে। এই স্থানে বহু মুসলমান কাগজীর বাস ছিল। মহানাদের হাতে-গড়া কাগজ প্রসিদ্ধ ছিল। আজিও তৎকালীন কাগজের গড় ভূগর্ভ খনন কালে বহির্গত হয়।

হাড়মালা নামক আর একটি মহল্লা আছে। আজিও তথায় বহু মুসলমান পরিবার বাস করিতেছেন।

মহানাদ বক্ষে মুসলমান রাজত্বের বহু রঙ্গীণ মৃৎপাত্র-খণ্ড আবিষ্কার করিয়াছি। এইগুলি সারদাচরণ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই প্রকার মৃৎপাত্র সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জের পার্শ্ববর্ত্তী সকুগড় নামক স্থানে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। তৎসমুদয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের প্রতিষ্ঠিত সাহেবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংগ্রহাগারে সংরক্ষণ করিয়াছি।

ব্রিটিশ রাজত্বের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে মহানাদের অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৮৫৭ অব্দে স্কটলণ্ডের মিসনারিগণ (**Free Church of Scotland Mission**) মহানাদে আসিয়া একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়টি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং ইহা স্থানীয় অধিবাসিগণের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। গত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় অধিবাসিগণ

স্কটল্যাণ্ড মিসনের বাংলা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ডব্ল্, এস, সোমেলির (Mr. W. S. Somelle) নিকট বিদ্যালয় গৃহটি ৫০০৲ (পাঁচশত) টাকায় ক্রয় করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ১৮৫৯ এবং ১৮৬০ অব্দে নীলকর আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই মিসনারিগণের চেষ্টায় মহানাদে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। তৎকালে মহানাদের তিনটি অঞ্চলে নীলকুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে নীলকুঠিগুলির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ভারতে ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহানাদে "সাব পোষ্টাফিস" ছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইহা "ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসে" পরিণত হয় এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। তৎপরে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা ই, ডি, পোষ্টাফিসে পরিণত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মহানাদে কর বংশীয় জমিদারগণের প্রভাব খুব বেশী ছিল। তাহাদের চেষ্টায় মহানাদ সুরম্য অট্টালিকা, মন্দির, চাঁদনী প্রভৃতিতে সুশোভিত ছিল এবং হাট-বাজার ও ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহাদিগের অট্টালিকা, মন্দির ও দোলমঞ্চ বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১৭৭৩ শকাব্দে ৺সহজরাম করের পুত্র অর্জ্জুন দাস কর এবং ৺রামসুধীর দাস করের পত্নী দ্রবময়ী দাসীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলালজিউ প্রভুর এক চূড়া বিশিষ্ট অত্যুচ্চ মন্দিরটি স্থাপত্য শিল্পে এক নূতন অবদান।

মহানাদ নগর পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত অগ্নিশ্বর মহাদেব এবং বিশালাক্ষী দেবীর পীঠস্থান সুপ্রাচীন।

মহানাদ দক্ষিণ পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত গোটেশ্বরনাথ মহাদেব সুপ্রাচীন। মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে জনপ্রিয় জমিদার ভুজঙ্গভূষণ নিয়োগী মহাশয় এক নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ পাড়াস্থ গড়ের বাগানে ১৭০৮ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি কারুকার্য্য বিশিষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী একটি দোলমঞ্চ বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৭৫১ শকাব্দে নিয়োগী বংশকুলতিলক শক্তি উপাসক ৺শম্ভুনাথ নিয়োগী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীব্রহ্মময়ী দেবীর নবরত্ন মন্দিরটি বর্ত্তমান মহানাদের গৌরবের জিনিষ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মহানাদের অবনতি ঘটিয়াছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য রাঢ় দেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করিতে হইলে মহানাদের ন্যায় প্রাচীন রাঢ়ের অন্যান্য অঞ্চলগুলির তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে রাঢ় দেশবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারতবর্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

(১)

অতীত যাহার আছে—আছে তার দীপ্ত ভবিষ্যৎ।
যে সভ্যতা দেখা দিল বিচিত্র নগরমালা ঘিরে
ষষ্ঠি শতাব্দীর পূর্ব্বে একদিন সিন্ধুনদ-তীরে,
তারি ধারা বহে আজো, সে সভ্যতা সুন্দর মহৎ।
জীবনের অভিযাত্রী অতিবাহি অতি দীর্ঘ-পথ
আসিয়াছি হেথা মোরা, মাঝে মাঝে চাহি ফিরে ফিরে
হয়ত পিছন পানে, এক করি' স্মৃতি-বিস্মৃতিরে
সুদূরের সে-মহিমা অন্তরে যে জাগে স্বপ্নবৎ।

স্বপ্নবিলাসীর নহে সে অতীত শুধুই কল্পনা,
সত্য তাহা। বক্ষে বহি' জীবনের অনির্ব্বাণ জ্বালা
মূর্চ্ছিত মহত্ত্বে পুন জাগাবে কে, আনিবে প্রেরণা
দেশমাতৃকার পদে নিবেদিতে জীবনের ডালা?
আমরা ছিলাম, আছি,—আছে সত্য, আছে সম্ভাবনা।
পূজার মন্দিরে চল নিয়ে অর্ঘ্য, নিয়ে পুষ্পমালা।

প্রণমি অতীতে আমি, দুঃখভরা নমি বর্ত্তমানে।
অফুরন্ত যার ধারা, উচ্ছ্বসিত বেগ যার, জানি
সে প্রাণ-উচ্ছল স্রোতে ধুয়ে যাবে এ-দিনের গ্লানি,
মাতিয়াছে চিত্ত তাই ভাবীযুগ-বন্দনার গানে।
কোন্ সে সুদূর তীর্থ? চলিয়াছি কাহার সন্ধানে?
নিত্য বেদনার মাঝে শুনি কার আশ্বাসের বাণী?
হৃদয়ে জাগ্রত কার সুন্দর কল্যাণ-মূর্ত্তিখানি?
কে করে নির্দ্দেশ পথ অপরূপ ভবিষ্যের পানে?

সে যাত্রা দিগন্তগামী, সে পথের অনন্ত প্রসার,
অসীম ঐশ্বর্য্যে ভরা ঐতিহ্যে সে জীবন মহান।
সঞ্জীবনী মন্ত্রে যার ভাঙিয়াছে মূর্চ্ছা বারম্বার,
শাশ্বত ভারতবর্ষ—শোন, শোন তাহার আহ্বান!
অন্তরের নেত্রে হেরি সে মহামহিম রূপ তার,
নমি নব-ভবিষ্যতে, প্রণমি তোমারে বর্ত্তমান।

ক্ষুদিরাম স্মরণে

(গান)

রক্ত তোমার ব্যর্থ হয়নি বিপ্লবী ক্ষুদিরাম—
বহ্নিকণায় ছেয়ে দিয়ে গেছ দেশের সহর গ্রাম।
ধনী জাগিয়াছে জেগেছে কিষাণ
উঠেছে বাজিয়া প্রলয়-বিষাণ
বিদেশীর কাছে আবেদন নয়,
শুধু চির-সংগ্রাম।

মুক্তির শ্বাস ফেলে মোরা বাঁচি স্বদেশের কারাগারে,
হাসিছে স্বরাজ-সূর্য এবার দুঃখের পারাবারে।
অগ্নিযুগের প্রথম সেনানী
রক্তাক্ষরে রেখে গেছ বাণী
তোমার স্মরণে জনগণ রাখে প্রথম প্রণাম—
মুক্তি পথের অভিযাত্রীর পূরিল মনস্কাম।

কথা : গোপাল ভৌমিক

সুর ও স্বরলিপি : বুদ্ধদেব রায়

II সা সা সা | গা গা মা | পা পা পা | নি ধা নি
র ক্ ত তো মা র ব্য • র্থ হ য় নি

র্সা র্সা নি | র্রে র্সা নি | ধপা -া -া | -া -া -া
বি প্ ল বী ক্ষু দি রা • ম • • •

পা পা ধা | নি ধা ধা | পা ধা পা | মা গা গা
বহ্ • হ্নি ক ণা য় ছে য়ে দি য়ে গে ছ

পা পা পা | গা গা গা | সা -া -া | -া -া -া II
দে শে র স হ র গ্রা • ম • • •

II পা পা গা | পা নি নি | পা পা গা | পা র্সা র্সা
ধ নী জা গি য়া ছে জে গে ছে কি ষা ণ

পা র্সা র্সা | র্সা নি নি | ধা ধা র্রে | র্সা নি নি
উ ঠে ছে বা জি য়া প্র ল য় বি ষা ণ

র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা পা | ধা ধা ধা | ধা গা গা
বি দে শী র কা ছে আ বে দ ন ন য়

পা পা পা | গা গা গা | সা -া -া | -া -া -া II
শু ধু চি র স ং গ্রা • ম • • •

II সা সা সা | সা সা নি্ধা্ | ধা্ ধা্ রে | রে রে রে
মু • ক্তি র শ্বা স ফে লে মো রা বাঁ চি

নি্ সা রে | গা গা মা | রে মা গা | -া -া -া

স্ব দে শে র কা রা গা • রে • • •

গা মা পা | ধা ধা ণি | পা র্সা ণি | ধা পা পা

হা সি ছে স্ব রা জ সূ র্ য এ বা র

পা ধা পা |॰ ˚মা গা সারে | গা রে সা | -া -া -া II

দু • ক্ষে র পা রা বা • রে • • •

II পা পা গা | পা নি নি | পা পা গা | পা র্সা র্সা

অ গ্ নি যু গে র প্র থ ম সে না নী

পা র্সা র্সা | র্সা নি নি | ধা ধা র্রে | র্সা নি নি

র • ক্তা • ক্ষ রে রে খে গে ছ বা নী

র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা পা | ধা ধা ধা | ধা গা গা

তোঁ মা র স্ম র ণে জ ন গ ন মা ঝে

পা পা পা | গা গা গা | সা -া -া | -া -া -া

প্র থ • ম ০ প্র ণা • ম ০ ০ •

ম্মা -া -া | -া গা গা | মা ধা নি | র্সা র্সা র্সা

মু ০ ক্তি প থে র অ ভি যা • ত্রী র

র্গা র্গা র্গা | র্রে র্রে র্রে | র্সা -া -া | -া -া -া

পু রি লং ম ন স্ কা • ম • • •

র্গা র্গা র্গা | র্গা র্গা জ্ঞা | র্গা -া -া | -া -া -া

বি প্ ল বি ক্ষু দি রা • ম • ০ •

র্গা র্গা র্গা | র্গা র্রে র্সা | র্রে পা পা | র্রে -া -া

বি প্ ল বি ক্ষু দি রা • ম • • .০

র্রে র্রে র্রে | র্ঋ র্রে র্গা | র্গা -া র্সা | -া -া -া II

বি প্. ল বি ক্ষু দি রা • ম • • • *

* এই গানটি মেগাফোন রেকর্ডে গৃহীত হইয়াছে।

ইউরোপের অভিজ্ঞতা

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

(২)

২৯শে নবেম্বর ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে সকাল ৭॥টার ট্যাক্সি করে ব্রিটিশ এলাকায় লেভারকুজেনে I. G Farbenindeustrie-র অন্যতম বিরাট কীর্তি—বায়ারের কারখানা দেখতে রওনা হই। বরাবর 'অটোবানে' গেলে বেশী সময় লাগবে বলে ট্যাক্সি-চালক বাডহোমবুর্গ থেকে বেরিয়ে বনবহুল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলল। অনেক স্থলে ৮।১০ মাইলের মধ্যে কোনও মানুষের মুখ চোখে পড়েনি—দুধারে নিবিড় সরল সুউচ্চ ওক, বীচ, পাইন প্রভৃতির বন—কোথাও ট্যাক্সি উপরে উঠছে, কোথাও বা দুই পাহাড়ের মধ্যে উপত্যকায় নামছে। অনেকস্থলে এই উপত্যকাগুলির ঢালুতে চাষের জমি এবং নীচে অনেকটা সমতলের উপর গ্রাম। স্থানে স্থানে বা ছোট সহর। দূর থেকে গির্জার উঁচু চূড়া চোখে পড়ছিল। ঘণ্টা দুই যাবার পরে ভীষণ কুয়াশার মধ্যে গিয়ে গাড়ী পড়ল। দশ হাত দূরেও কিছু দেখা যায় না। বরফ জমে যাচ্ছে ট্যাক্সির কাঁচে। চালক মাঝে মাঝে নেমে শুকনো কাপড় দিয়ে বরফ মুছে ফেলছে। আমার পায়ের উপর সে দিয়েছে একটি দামী কম্বল। অসম্ভব শীত। মাঝে মাঝে সূর্য্য দেখা যাচ্ছিল। অনেক জায়গায় পাহাড়ের ঢালুতে বরফ জমে গেছে—সাদা কাপড়ের মত বিস্তৃত। এইরূপে ক্রমে গাড়ী অটোবানে গিয়ে উঠল। মাঝে মাঝে যুদ্ধের চিহ্ন—ভাঙা ব্রীজ। ভাঙা স্থানে আধ মাইল পথ যেতে নীচে নেমে প্রায় ৫ মাইল ঘুরে অপর পারে যাচ্ছি। ব্রিজ মেরামত হচ্ছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের ৩০।৪০ মাইল পশ্চিমে বনের ধারে এক জায়গায় জেকোস্লাভিয়া থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের চালাঘর দেখা গেল। কোনও কোনও স্থানে সাময়িক ব্রিজ করা হয়েছে—কাঠের। তার একদিক দিয়ে যায় লরী, অপরদিক দিয়ে ট্যাক্সি প্রভৃতি। এ সব জায়গায় প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে ব্রিটিশ এলাকার সীমান্তে গাড়ী এল। পুলিশ পাশপোর্ট দেখে নমস্কার করে ছেড়ে দিল। রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে সাইনবোর্ডে কোন্ সহর কত কিলোমিটার দূরে ইত্যাদি লেখা রয়েছে। ক্রমে কোলন সহরের গির্জার চূড়া দেখা গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কোলন পেরিয়ে অটোবান থেকে নেমে ছোট রাস্তা ধরে বায়ারের কারখানার চিমনি লক্ষ্য করে ট্যাক্সি চলল। ২০০ মাইল পথ ৪ ঘণ্টায় গেলাম। কারখানা এত জমকালো হতে পারে আগে ভাবতে পারি নি। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় বাগানের মধ্যে পাথরের বিরাটকায় সিংহের গর্জনোন্মুখ শায়িত মূর্তি। ভাবটা যেন সমগ্র পৃথিবীর কারখানাকে এ গ্রাস করতে চায়। তারপর ফাঁকা জায়গার উপর সাততলা বাড়ীতে অফিস। ডাইনে নদীর ধারে বহু প্রস্তরমূর্তি শোভিত বাগানের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর ডুইসবার্গের মনোরম বাসভবন। তিনি মারা গেছেন। এখন এ বাড়ীতে একজন ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসর আছেন শুনলাম। বর্তমান ম্যানেজার ডক্টর হাবেরলাণ্ড অন্যত্র থাকেন। প্রকাণ্ড কাঁচের দরজাযুক্ত সুদৃশ্য গেট অফিস। মহাকবি মধুসূদন দত্ত দশাননের ছত্রধরের যেরূপ চিত্র দিয়েছেন—এই গেট অফিসরেরও সেইরূপ জমকালো সাজ। গেট অফিসের কাজ সেরে দোতলায় বসবার ঘরে গেলাম। এত সমৃদ্ধি ও এত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ইতিপূর্বে দেখিনি। Mr. Roehder নামে sales এর একজন ভদ্রলোক এলেন। তিনি শীঘ্রই কলকাতায় গিয়ে আমাদের ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন জানালেন। কারখানা দেখতে চাওয়ায় তিনি বললেন—কারখানা দেখানোর নিয়ম নেই। এতদূর পথ ২৩ ডলার খরচ করে এসে মিছামিছি ফিরে যাব ভেবে দুঃখ হল। অন্ততঃ কারখানার ভিতরটা—কোনও ঘরে না ঢুকে ঘুরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে তিনি রাজী হলেন। প্রায় ২।৩ মাইল তাঁর সঙ্গে ঘুরলাম। অধিকাংশই dyestuff এর বাড়ী। এক লাইন বাড়ী, অপর লাইন থেকে অনেকটা দূরে দূরে। মাঝে অনেকটা ফাঁকা—রেল লাইন, লরিও মানুষ চলার রাস্তা। দু'একটি বাড়ীর একতলাতে উঁকি দিয়ে still, autoclave. filterpress, vats প্রভৃতি দেখলাম। এঁদের Pharmaceuticals তৈরী হয় কয়েক মাইল দূরে—Elberfeld-এ। রুঢ়ের কয়লা খনি বেশী দূরে নয়। লরীযোগে কয়লা এক ঘণ্টায় কারখানায় আসে। নদীর ধারে বরাবর যতদূর দৃষ্টি যায়—ক্রেন প্রভৃতি দেখা গেল। নদীযোগে মাল রাইনের মোহনায় রটারডম বন্দরে এবং I. G.-র বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডাফাব্রিকে যেয়ে থাকে। নদীর ধারের প্রাচীরে কামানের দাগ দেখে জিজ্ঞাসা করায় জানলাম—মার্কিন সৈন্যেরা নদীর ওপার থেকে গোলা ছোঁড়ায় এই ক্ষতি হয়েছে। বাড়ীঘর ভেঙেছে অতি অল্পই। যদিও কোলন সহর প্রভৃতি খুব বিধ্বস্ত হয়েছে। Hoechst এবং Lever-kusen-এর I. G.-র কারখানা অক্ষত এবং পাশেই টাউনগুলি বিধ্বস্ত দেখে মনে সন্দেহ আসে। জানি না এর মধ্যে কোনও রহস্য লুক্কায়িত ছিল কিনা। কারখানার মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় গোলাপ বাগান। এ অঞ্চলে শীত অপেক্ষাকৃত কম বলে তখনও গাছে ফুল দেখা গেল। এঁদের ক্যানটিন প্রকাণ্ড সুন্দর বাড়ীতে। গাইড লাঞ্চ খেয়ে যেতে বললেন। কারখানা না দেখতে পাওয়ায় মন ভাল ছিল না, কাজেই তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলাম। এখানেও লোকে ৬৫ বৎসরে অবসর গ্রহণ করে এবং পেনসন আছে শুনলাম। পরদিন বাডহোমবুর্গে Dr. E. Fresenius-এর ছোট একটি কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল কারখানা দেখলাম। কয়েকটি বিশেষ ঔষধ, মলম, বটিকা, biological preparation এঁরা করেন। Tablet mass এখানে হাত দিয়েই

মেশান হচ্ছে দেখলাম। Filling-sealing সাধারণ রকমেরই তবে একটি নূতন কায়দাও আছে। Tablet গুলি machine থেকে বেরিয়ে একটি তারের জালের আস্তে আস্তে দোল খাওয়া ছাঁকুনির উপর পড়ায় dust-free হচ্ছে দেখলাম।

তারপর ২রা ডিসেম্বর রাত্রি ১০টায়—International train ধরে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ব্রিটিশ এলাকায় হামবুর্গে পৌঁছি। এখানে chemical, apparatus dealer, chemical plant manufacturer এবং কেমিক্যাল কারখানা যেগুলি দেখেছি তাঁদের নাম নিম্নে দিলাম। প্রধান দু' একটি কারখানা পরিদর্শনের কথা পরে উল্লেখ করব।

Otto Brueckner and Sohn—chemical dealer
T. Kettemann—apparatus dealer
Albert Dargats—Stockist of laboratory equipment
Max Deser—chemical dealer
A. D. Krauth—Medical apparatus dealer
Anker Nachf-Marienfabrik—labelling machine makers
Hermann Busch—exporter of chemicals
Chemische Fabrik Bierschorf—Plasters manufacturers
Carlowitz & Cie—Chemicals & apparatus dealers
Chemische Fabrik Marienfeld
A. Wohlgast—Chemical dealer
A. Schmidt und Sohn—Chemical plant makers
C. H. Boehringer u. Sohn—Chemical factory
Chemische Fabrik Promonta
" " Billwarder
Nordmark chemische Fabrik
Bertthel u. Luders—apparatus makers
H. Messers schmidt— "
H. Dresler—Chemical dealer at Bremen
Walter Buehner—Chemical factory at "

হামবুর্গ অঞ্চলে বড় কেমিক্যাল কারখানা অল্প। প্রোমোণ্টা কারখানায় গিয়ে দেখলাম—বোমাতে তাঁদের বিশেষ কিছুই দেখানোর মত নেই। বিলভেরদার কারখানায় দৈনিক ২০।৩০ টন কার্বন ডাইসালফাইড ও মাসিক ৩০টন থায়োইউরিয়া তৈরী হয়। মিলিটারী অনুমতি ব্যতিরেকে কারখানা দেখাতে এঁরা অক্ষম বললেন। এদের কর্মীর সংখ্যা পাঁচশত—কেমিষ্ট ৫জন মাত্র। গবেষণা বিভাগ এঁদের নেই।

Boeringer & Soehne এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কারখানা। এঁরা মরফিন, প্যাপাভেরিন, codein, synthetic caffeine, থিয়োব্রোমিন ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। জার্মাণিতে উৎপন্ন poppy capsule এঁরা ব্যবহার করেন। এঁরা মোটামুটি কারখানা দেখালেন। সহর থেকে দূরে এবং ছোট ছোট shed-এর কারখানা বলে যুদ্ধে এঁদের ক্ষতি হয় নি। কেবল চিমনিটির উপর বোমা পড়েছিল। ওটি ইতিমধ্যে সারিয়ে নিয়েছেন। এঁদের অপর কারখানা Engelheim-এ—মার্কিন এলাকায়। সেখানে আধুনিক প্রক্রিয়ায় নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী হয়। অন্যান্য Pharmaceuticals-ও সেই কারখানাতেই প্রস্তুত হয় বললেন। বোয়েরিঙ্গারে কর্মী ৫০০ ও কেমিষ্ট আছেন পাঁচজন।

এই অঞ্চলের কারখানার মধ্যে Nordmark বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারখানাটি হামবুর্গের ২০ মাইল দূরে বড় বড় গাছ সংযুক্ত মাঠের মধ্যে বলে নষ্ট হয় নি। প্রতিষ্ঠাতা Dr Wolf (ভোলফ=নেকড়েবাঘ) ৬০ বছরের উপর বয়স, কিন্তু এখনও খুব শক্তিমান, উৎসাহ উদ্যমও তাঁর অসাধারণ। তিনি নিজেই আমাকে কারখানা দেখালেন। এঁদের প্রচার বিভাগের Mr Blass রাইখসহোফ হোটেল থেকে সকালে আমাকে তাঁর মোটর করে নিয়ে যান। ইনি আগে যুদ্ধে ছিলেন—এবং যুদ্ধের মধ্যে দেরাদুনে আটক ছিলেন। ভাল ইংরাজী জানেন। কিন্তু Dr. Wolf আদৌ ইংরেজি বলতে পারেন না। তিনি জার্মান ভাষাতেই আমার সঙ্গে কথা বললেন। কেমিষ্টরাও জার্মান ভিন্ন বলেন না। এঁরা প্রচুর sulphonamide তৈরী করেন। বড় বড় still, autoclave ইত্যাদিতে reaction হচ্ছে দেখলাম। সমস্ত বাড়ীটির জন্য দুটি বড় Vacuum Pump নীচের তলায় বসান আছে। একটি বিকল হলে অপরটি চালানো হয়—কাজেই কাজ কামাই যেতে পারে না। sulphonamide তৈরীতে যে chlorosulphonic acid ও aniline লাগে তা তাঁরা অন্য কারখানা থেকে সংগ্রহ করেন বললেন। Organo therapeutics এঁদের বিশেষত্ব যদিও এখন syntheticsএর প্রতি লক্ষ্য বেশী। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে frozen liver এসেছে। হাতুড়ী দিয়ে সেগুলি ভাঙতে দেখলাম। হল্যাণ্ড এবং কানাডা থেকে এঁরা শুয়োরের পাকস্থলী নিয়ে আসেন—তা থেকে পেপসিন প্রভৃতি তৈরী হয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড extraction apparatus vac. concentratorও অনেক। কুড়ি ঘন মিটার একটি vacuum drier-এ পেপসিনের solution শুকানো হচ্ছে। Moleculer distillation যন্ত্রে একটি হোরমোন তৈরি কাজ হচ্ছে দেখলাম। Microanalysisএর যন্ত্রটি এঁদের নিজেদের কারখানাতেই তৈরী হয়েছে বললেন। Filling sealing বিভাগ ও পরে Biological sectionএ নিয়ে গেলেন। Aspergillus Niger-এর culture দেখালেন এবং তার সাহায্যে Pilot plant-এ তৈরী কয়েক পাউণ্ড ক্যালসিয়ম গ্লুকোনেটও দেখলাম। দর্শকদিগকে ব্যাক্টেরিয়ার উপর ঔষধের ক্রিয়া দেখাবার এঁরা সুন্দর একটি উপায় করেছেন। Dr. Wolf আমাকে পুরো দু'ঘণ্টা কারখানা দেখালেন। কারখানাটি একটি ছোট খালের মত নদীর দু'পারে এবং রেল ষ্টেসনও এখান থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে। এখানে কর্মীর সংখ্যা ৫০০ এবং রিসার্চ কেমিষ্ট আছেন ১৫জন। কর্মীরা যোগ্যতা এবং কার্য্যকাল অনুসারে ১৮০ থেকে ২৮০ মার্ক পর্য্যন্ত বেতন এবং কেমিষ্টরা ৮শত থেকে ১হাজার মার্ক সাধারণতঃ পেয়ে থাকেন। বিশেষ দক্ষতা বা পারদর্শিতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। এঁদের কারখানা নূতন বলে পেনসন প্রবর্তিত হয় নি এখনও। ডক্টর ভোলফের সঙ্গে ও অপর একজন

ডিরেকটরের সঙ্গে বসে ব্যবসা বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করার পর ঐ আত্মবিশ্বাসী প্রবীণ কর্মবীরের সঙ্গে কোলাকুলি করে বিদায় নিলাম।

হামবুর্গ থেকে ১০০ মাইল দূরে ট্রেনে ব্রেমেন গিয়ে সেখানকার **chemical dealer H. Dressler**-এর সঙ্গে আলাপ করি এবং তাঁদের সাহায্যে ঐ সহরের উপকণ্ঠে প্রায় ১০ মাইল দূরে Walter **Buehner** নামে ছোট্ট একটি কারখানা দেখি। ষ্টেসন থেকে **Dressler**এর ঠিকানায় যাবার জন্ম যখন ট্রাম লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছিলাম তখন আমার কথা শুনে এক ভদ্রলোক তাঁর মোটর থেকে নেমে আমাকে বললেন, তিনিও ঐ পথেই যাচ্ছেন আমার আপত্তি আছে কিনা। বলা বাহুল্য এই অযাচিত সাহায্যে এই অপরিচিত জায়গায় বড়ই মুগ্ধ বোধ করলাম। ব্রেমেন মার্কিন এলাকায়। হল্যাণ্ডের কাছে বলে টাউনের নিকটে ২।১টি Wind mill দেখা গেল। গত যুদ্ধের শেষের দিকে এখানে খুব যুদ্ধ হয়েছিল শুনলাম। অধিকাংশ বাড়ীই এখানে ভেঙে গেছে। জার্মান পদাতিক বাহিনীর যে সব আশ্রয় টাউনের বাইরে ছিল সেগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড মোটা কনক্রিটের দেয়ালের ভগ্নাবশেষ সব পড়ে আছে দেখলাম। সহরতলীতে বড় বড় দামী কাঠের বন ও শস্তক্ষেত্র। সকালে কিছু না খেয়েই হামবুর্গ থেকে রওনা হই—পথেও কিছু খাইনি। কারখানা দেখে আড়াইটায় ষ্টেসনে ফিরে দোকানে গিয়ে দেখি কুপন ভিন্ন খাবার মেলে না। অগত্যা চা ও ২।১খানি কেক খেয়ে ৪টায় ইণ্টারন্যাশানাল ট্রেন ধরে সন্ধ্যা ৬টায় হামবুর্গে ফিরে রাত্রে ডিনার খেলাম। বলা বাহুল্য, না খেলেও **Reichshof** হোটেলে পুরো চার্জই (দৈনিক ১৬ শিলিং) নিত।

হামবুর্গের উপকণ্ঠে, বিশেষ করে হারবার অঞ্চলে অনেকগুলি বড় বড় কেমিক্যাল Plant এবং মেশিনারী তৈরীর কারখানা দেখি। ডক অঞ্চলে পুলিশকে পাসপোর্ট দেখিয়ে নদীর নীচের সুড়ঙ্গপথে ট্যাক্সিতে চড়ে অপর পারে মেশিন কারখানায় গেলাম। এঁরা আগে **submarine** ও যুদ্ধের জাহাজ তৈরী করতেন। এখন **autoclave, vacuum concentrator** ইত্যাদি তৈরীতে মন দিয়েছেন। আমাদের দেশের 'ঢাল ভেঙে গড়াল করতাল' কথাটির সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। তবে করতালে পরম শান্তির কথা সূচিত হয় কিন্তু—**chemical plants** এবং **chemical industry**র মধ্যে যুদ্ধের বীজটি থেকেই যায়—মহাকবি গ্যেটেও যুদ্ধ এবং বাণিজ্যকে অভিন্ন বলেই ধরেছেন।

হামবুর্গ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রে রওনা হয়ে ১৮ই রাত্রি ৯টায় সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে পৌছি। বাজেলে ৫॥টায় পৌছল। সেখানে জার্মান ফরাসী সুইস **customs** চেকের পর ৭টায় বিদ্যুৎ-চালিত সুইজারল্যাণ্ডের ট্রেনে উঠি। বাজেলের নিকট রাইন নদী বেশ প্রশস্ত। পথে দুপুরের পর থেকেই রেলগাড়ীর ডানধারে দূরে পর্বতের গায়ে বরফ দেখা যাচ্ছিল। বিকালে **Siegfried lines** দেখা গেল। বহুদূর পর্য্যন্ত খাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে ট্রেন চলল। পাহাড়ের গায়ে আঙুর ক্ষেতের চিহ্ন—কাঠি পোঁতা রয়েছে দেখলাম। পথে দুপুরে ট্রেনের মধ্যে খাওয়ার সময় মুস্কিলে পড়লাম—আমার কাছে সুইস মুদ্রা ছিল না। জিমারলি নামক ভলকার্ট ব্রাদার্সে'র জনৈক অফিসর-আমায় সুইস মুদ্রা ধার দেন। পরদিন জুরিখ ষ্টেসন থেকে চেক ভাঙিয়ে এঁর প্রদত্ত ফ্রাঙ্কগুলি ওঁর বাসায় গিয়ে ফেরৎ দিয়ে আসি। রবিবার ৯টায় ভলটা ষ্ট্রীটে ওঁর বাসায় গেলে উনি চা-পানে আপ্যায়িত করলেন; পরে নিজের মোটরে করে জুরিখ লেকের ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির মনোরম স্থানগুলি ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী সেণ্ট গটহার্ড হোটেলে রেখে গেলেন। এঁর ভদ্রতায় আমি খুব উপকৃত ও মুগ্ধ হয়েছি।

সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি **apparatus & chemical plants maker** এর কারখানা দেখি। জুরিখের উপকণ্ঠে লুভা—এঁরা **spray. drier,, autoclave** ইত্যাদি এবং **Huggenberger company vacuum pump** এবং **automatic sealing filling machine** তৈরী করেন। এঁরা ইতিমধ্যে আমাদের কারখানায় **filling. sealing machine**এর **quotation** পাঠিয়েছেন। **Engineer H. Wismer** এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। **Semiautomatic machine** কম জটিল, দামও এর বেশী নয়। একজন লোক ঘণ্টায় ৫০০।৬০০ **ampoule** ভর্ত্তি করতে পারে। ১ সি, সি থেকে ২০ সি, সি পর্য্যন্ত **ampoule** এবং ৫০ সি, সি পর্য্যন্ত শিশি ভর্ত্তি করা চলে। **Ampoule**গুলির দৈর্ঘ্য বা বেধের পার্থক্যের জন্ম কোনও অসুবিধা হয় না। বাজেলের উপকণ্ঠে **Buss A. G. & Co**তে গিয়ে **kneading and Mixing machine**এর কথা বলি। এঁরা কলিকাতায় **quotation** পাঠাবেন বলেছেন। **Autoclaves, spray drier** ইত্যাদিও এঁরা তৈরি করেন।

অধ্যাপক কাররের চিঠির সাহায্যে সুইজারল্যাণ্ডের সব কটি বড় কারখানাই ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। বাজেলের হফমান লারোশ, গায়গি, সিবা, শাফহাউসে সিলাগ, জেনেভাতে ফারমেনিশ ও জিভোর্দা এবং জুরিখ লেকের ধারে ইউটিকন। সুইজারল্যাণ্ডে, বিশেষ করে বাজেলে কারখানাগুলি অতি বৃহৎ ও অতি সমৃদ্ধ। এঁরা **Dye stuff** বাদে অন্য সব বিভাগই দেখিয়েছেন। এঁদের রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট খুব উন্নত, বিশেষ করে **Bio-assay** এবং **testing** বিভাগগুলি নাম করা এম, ডি ডিগ্রিধারী চিকিৎসকগণ **wholetime** কাজ করে নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কারপূর্ব্বক নূতন নূতন ঔষধের পরীক্ষা করছেন।

অনেক রকমের প্রাণী মায় বিভিন্ন রকমের মাছ এবং আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত এক প্রকার ব্যাঙের উপরেও এই সব পরীক্ষা কার্য্য চালানো হচ্ছে। গাইগিতে ত মশামাছি, আরসুলা, উকুন, আঠালু প্রভৃতির চাষের জন্মই প্রকাণ্ড একটা তেতলা বাড়ী নিয়োজিত করা হয়েছে। এ বাড়ীটি গরম রাখা হয়েছে আমাদের দেশের মত তাপে, যাতে করে মশামাছি মনের সুখে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। কীটনাশক ঔষধ আবিষ্কারের জন্ম এবার গাইগির কেমিষ্ট **Dr. Mueller** নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। কীট নাশক বিবিধ কেমিক্যাল তৈরী করা ব্যতীত কীটের উপর এই সব পদার্থের ক্রিয়া দেখবার বহুবিধ পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেছেন।

ছুটি আলমারি ভর্তি কীটনাশক কেমিক্যাল দেখলাম। দেখে রবীন্দ্রনাথের—"ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ পাথর" কথাটি মনে পড়ল। এ ক্ষ্যাপা কিন্তু পাথর গুলি ছুঁয়েই ফেলে দেননি—সবই সযত্নে আলমারিতে রেখে দিয়েছেন। এঁর সহকারী একজন মেয়ে ডাক্তার বললেন—এক সময় পরীক্ষার জন্য দৈনিক ১০ হাজার মাছির তাঁদের দরকার হত। ধান গম প্রভৃতি খাদ্যশস্যের কীট বিনাশের গবেষণায় এখন ডাঃ মুলার ব্যাপৃত আছেন। একজন সহকারী প্রত্যেকটি গমের বীজ অনুবীক্ষণের নীচে রেখে দেখে ঔষধ মাখানো কাচ পাত্রে রাখছে। একটি ঘরে শিমের চারা দেখলাম—তার কতকগুলিতে পোকা বসিয়ে তার বিনাশের চেষ্টা চলছে। যাতে চারার ক্ষতি না হয় অথচ পোকা সমূলে মরে তার চেষ্টা। আপেলের ডাল আমাদের দাঁতনের মত কেটে সেগুলির কি পোকা মারবার যেন চেষ্টা চলেছে। গাইগির ডি ডিটির নূতন কারখানা বাজেল ষ্টেসন থেকে কিছু পূর্বে রেল লাইনের ধারে,—অনেক চাষের জমিও সেখানে আছে পরীক্ষা চালানোর সুবিধার জন্য। মাটির মানুষ এই ডক্টর মুলার। গাইড আমাকে তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। যতক্ষণ আমি ছিলাম দাঁড়িয়ে রইলেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। এঁকে অনেকবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে নিয়মিত লেকচার দেবার জন্য আহ্বান এসেছে কিন্তু কাজের প্রতি এঁর এতই টান যে কদাচ রিসার্চের কাজ ফেলে নামের জন্য বাইরে যান নি। আমি এঁর কাছ থেকে এসে পূর্ববঙ্গের উড়ুক্কু আমের পোকার প্রতিবিধানের জন্য এঁকে পত্র দিয়েছিলাম। উনি সানন্দে উহার চেষ্টা করবেন বলে আমার হোটেল রিগিব্লিক, জুরিখ ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলেন। গাইগির Dyestuff বিভাগ খুব বড়। এখানে পূর্বে বিখ্যাত Dr. Sandmeyer কাজ করতেন। তাঁর নামে একটি বাড়ীর নামকরণ করা হয়েছে দেখলাম।

বাজেলের সিবা, গাইগি, স্যানডোজ, হফমানলায়োশ (রচি) প্রভৃতির প্রায় সব কারখানাই রাইন নদীর ধারে। স্যাণ্ডোজ ও সিবা অতি কাছাকাছি নদীর এপার ওপারে। হফমানলারোশও নদীর ওপরেই। কারখানার মত এঁদের সকলেরই অফিস গৃহগুলিও রাজপ্রাসাদের মত জাঁকালো ও মনোরম। রচির অফিস গৃহের সিঁড়ির বরাবর ও সুদীর্ঘ করিডরের বরাবর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের এবং ঔষধের গাছ, ফুল ও ফলের সুদৃশ্য রঙিন ছবি টাঙানো। রচির ভিটামিন সি তৈয়ারীর কারখানা খুব বড়। সম্প্রতি এঁদের রিসার্চ কেমিষ্ট Dr. Isler বিশুদ্ধ সাদা দানাদার ভিটামিন এ প্রচুর পরিমাণে তৈরীর উপায় আবিষ্কার করেছেন। একটি বোতলে পাউণ্ড খানেক এই অতি অভিনব ও অতি মূল্যবান পদার্থ তিনি আমাকে দেখালেন এবং Helvetica chemica Acta পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কাজের প্রবন্ধের ১খানি প্রতিলিপি আমাকে দিলেন। সিবাতে হোরমোন সম্বন্ধে বেশী গবেষণা হচ্ছে। অবশ্য এঁদের dyestuff বিভাগও সমৃদ্ধ। ঔষধ পত্র তৈরী ভিন্ন Sandozএরও dyestuff বিভাগ আছে। বাজেলে ৪০টি বড় বড় কারখানা থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে অযথা রেষারেষি নাই; কারণ, প্রত্যেকেরই লাইনের বৈশিষ্ট্য আছে। এঁদের সকলেরই গবেষণা বিভাগ কারখানার হাতার মধ্যেই—এবং কারখানার উন্নতিকল্পেই প্রধানতঃ এরা গবেষণা চালান। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাম কিনবার চেষ্টা এঁদের যেন কম বলে মনে হল।

জুরিখ থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে শাফ হাউসে অবস্থিত সিলাগ কোংর বয়স বিশ বছরের বেশী নয়। প্রফেসর কাররের একজন প্রাক্তন ছাত্র এর প্রতিষ্ঠাতা। বিশজন কেমিষ্ট্রির ডক্টরেট এখানে কাজ করছেন। কর্মীর সংখ্যা কিন্তু তিনশতের বেশী নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম রাসায়নিক জ্ঞানের দ্বারা যে প্রচুর টাকা পয়সা পাওয়া যেতে পারে ইতিমধ্যে এঁরা তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। কেমিষ্টরা মাইনেও বেশ ভাল পান। ১২।১৪ খানা প্রাইভেট (কর্মচারীদের) মোটর কারখানার আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে দেখেই ওঁদের সচ্ছলতা বুঝা গেল। কাজের সঙ্গে আনন্দ পরিবেশনের জন্য এঁরা প্যাকিং ঘরে রেডিও রেখেছেন দেখলাম।

জেনেভাতে ফারমেনিশ এবং জিভোদাঁ দুটি বড় কারখানা। এরা প্রধানতঃ গন্ধসংক্রান্ত রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। সঙ্গে সঙ্গে scent প্রভৃতিরও এদের বিভাগ আছে। ফারমেনিশের সঙ্গে নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক রুজিকা সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট। ইনি অনেক সময় এখানে কাজ করেছেন; এখনও অবকাশকালে এখানকার কাজ দেখাশুনা করেন। বর্তমানে ইনি জুরিখের টেকনিশে হোকশুলের অধ্যাপক। এদের বসবার ঘরে অধ্যাপক রুজিকার নোবেল মেডাল (original) এবং নোবেল ডিপ্লোমার প্রতিলিপি ঝুলান আছে। তিনটি লোক দৌড়ের পাল্লা দিচ্ছে—ব্রোনজের তৈরী এরূপ একটি প্রতীকও সেই ঘরে রেখেছে। সিভেটোন, এক্জালটোন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের synthetics প্রস্তুতের জন্য এদের তিনজন কর্মীর সঙ্গে একজন করে কেমিষ্ট নিযুক্ত আছেন। যন্ত্রপাতি খুব দামী এবং অতি আধুনিক। ১৫০ জন কর্মী ও ৫০ জন কেমিষ্ট এখানে কাজ করেন। ফারমেনিশ কোং স্থাপিত হয় একজন বড় কেমিষ্ট দ্বারা—এখনও সেই বংশের উপযুক্ত আধুনিক শিক্ষিত লোকেরাই উহার কর্মকর্তা।

জিভোদাঁতে ভ্যানিলিন, অ্যাসিটোফেনোন, মাস্ক জাইলোন প্রভৃতি তৈরী হয়। scent প্রভৃতিরও এদের পৃথক বিভাগ আছে। রোন নদীর তীরে একটি বড় পাহাড়ের পাদদেশে এই কারখানা। চীফ কেমিষ্ট খুব যত্নের সঙ্গে আমাকে প্রত্যেক বিভাগই দেখালেন। Blending বিভাগে ৭৬ বৎসরের একজন বৃদ্ধ কাজ করছেন। কিন্তু বেশ শক্তিমান ও উদ্যমশীল। আমাকে অনেক কৃত্রিম ফুল-গন্ধের ঘ্রাণ নিতে দিলেন। এর এই বয়সেও ঘ্রাণ শক্তি এবং ঘ্রাণ বিশ্লেষণের ক্ষমতা অসাধারণ বলে ইনি অবসর লন নাই—যদিও অবসর গ্রহণের বয়স এদের ৬৫ বৎসর। জেনেভা অঞ্চলের লোকেরা সাধারণতঃ ফরাসী বলেন। শাফহাউসেন, বাজেল, জুরিখ প্রভৃতি অঞ্চলে জার্মান প্রধান ভাষা—যদিও সুইজারল্যাণ্ডের কথ্য ভাষাও একটি আছে। এখানে ৩৫০ জন কর্মী এবং ৫০জন কেমিষ্ট কাজ করেন। চীফ কেমিষ্ট ২০

বৎসর এ কারখানায় আছেন। যাবতীয় উন্নতি ও সম্প্রসারণের মূলে তিনিই—ইনি স্থাপয়িতার বংশধর—একজন ডিরেক্টর আমাকে বললেন। Chief chemist সুবিখ্যাত অধ্যাপক Ame Pictet-এর সঙ্গে কাজ করে doctorate পেয়েছিলেন বললেন। ১৯০৪ সালে নিকোটিন synthesis করেন বলে পিকটেট রাসায়নিকদের নিকট সুপরিচিত।

জুরিখ লেকের ধারে জুরিখ সহর থেকে ২৫ মাইল দূরে ইউটিকন কারখানা। Sulphuric acid, Hydrochloric acid, Sodium Sulphate, Sodium phosphate, তুঁতে ও হীরাকস এদের প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য। Pyrites থেকে চেম্বার processএ দৈনিক ৬০ টন এবং গন্ধক থেকে contact processএ দৈনিক ৩০ টন সালফিউরিক অ্যাসিড এরা তৈরী করেন। লবণ থেকে দৈনিক ১০ টন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও তৈরী হয়। উল্লিখিত অন্যান্য দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে এরা প্রস্তুত করেন। প্রতিষ্ঠাতার পঞ্চম পুরুষ একজন ডিরেক্টর নিজেই আমাকে কারখানা দেখালেন। কারখানায় প্রায় তিনশত কর্মী, ভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি এদের নেই। বংশগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠানের প্রতি এদের দরদ বেশী এবং এর উন্নতিকল্পে এরা সর্বপ্রকার নূতন process প্রবর্তিত করেন এবং কর্মীদেরও সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন—যাতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদেরও দরদ বর্তায়।

সুইজারল্যাণ্ডে কারখানা দেখার পর যে কয়দিন সময় পাই সে ক'দিন অধ্যাপক কারারের ল্যাবরেটরিতে কাজ ও যন্ত্রাদি দেখা, টেকনিশে হোকশুলের অধ্যাপক রুজিকার সঙ্গে দেখা করে তাঁর ল্যাবরেটরি দেখা, হোকশুলে থেকে অধ্যাপক কারারের সেক্রেটারীর সাহায্যে আনীত আবশ্যকীয় জার্মান পেটেন্টগুলি নকল করে নেওয়া প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃত ছিলাম। প্রফেসর কারারের university লাইব্রেরী থেকে Enzyklopadeie der technischen Chemie নামক বই থেকে ও আমাদের কাজের উপযোগী কয়েকটি বিষয় নকল করে এনেছি।

এদেশের অধ্যাপকেরা জ্ঞান রাজ্যে যেমন অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন—চরিত্রবল এবং চরিত্র মাধুর্য্যও এঁদের তেমনি অসাধারণ। নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক রুজিকা প্রথম দিনের সাক্ষাতেই যেরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন—তাতে সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছি। অধ্যাপক কারার ত আগে থেকেই পরিচিত। হোটেলে আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা, ঘর ভাল দিয়েছে কিনা—শরীর কেমন আছে ইত্যাদি প্রায়শঃ জিজ্ঞাসা করতেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সুইস কারখানাগুলির কাছে আমার পরিচয় পত্র দিয়ে দেন। তাঁর সহকারী ডক্টর সোয়াইটজারকে ডেকে প্রথম দিনই বললেন—যাতে তিনি ইনষ্টিটিউটের সর্ববিভাগ আমাকে দেখান ও আমার সময় হলে কাজ করতেও দেন। সহকারীও মানুষের মত মানুষ। রসায়নশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর চরিত্র মাধুর্য্য অতুলনীয়। প্রায় ৪০জন ছেলে ডক্টরেটের জন্য কাজ করছে। অধ্যাপক নিজে দিনে তিনবার প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাদের কাজের খোঁজখবর লন—আর তারাও যখনই তাদের কোন দরকার সোয়াইটজারের কাছে তারা আসে। ইনি নিজে উচ্চাঙ্গের গবেষণায় ব্যাপৃত থাকলেও ছাত্রদের কাজ সর্বাগ্রে ও আপ্রাণ চেষ্টায় করেন। আমি প্রায় ১ সপ্তাহ তাঁর সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে ছিলাম। এঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে, হাতের কাজেরও অসাধারণ দক্ষতা। অথচ বেয়ারা বা assistant প্রায় নাই। আবশ্যকীয় apparatus ধুয়ে নেওয়া থেকে—মেজেতে জল পড়লে তাও তিনি নিজ হাতেই পরিষ্কার করছেন দেখলাম। অথচ মুখে বিরক্তির লেশমাত্র নাই। এদিকে খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁর খুব নাম আছে। এঁর বাসাতে একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন—সুন্দর সাজানো লাইব্রেরী—নানা বিষয়ের বই। এঁর স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতা না হলেও চারুশিল্পে তাঁর খুব অনুরাগ—সাধারণ cultureও খুব উচ্চ শ্রেণীর। আমাদের দেশের সুগৃহিণীদের মতই নম্রতা এবং শান্তশ্রীতে বিভূষিতা।

জুরিখের শেষ কয় ঘণ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ২৮শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় অধ্যাপক কারারের বসবার ঘরে গেলাম। তিনি সংক্ষেপে তাঁর জীবন-ইতিহাস বললেন। প্রথম জীবনে ফ্রাঙ্কফুর্টে স্বনামধন্য এরলিখের সঙ্গে কাজ করতেন। অবশ্য doctorate তিনি পেয়েছিলেন জুরিখ থেকেই। তারপর ১৯১৮ সালে এখানে আসেন এবং ১৯১৯ সালে নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক ভারনার (Werner) পরলোকগমন করলে উনি তাঁর জায়গায় অধ্যাপকের পদ পান। ঘরে ভারনার, লিবিগ, বুনসেন ও অন্যান্য খ্যাতনামা কেমিষ্টদের ছবি এবং ঐ Instituteএর প্রাক্তন অধ্যাপকদের ছবিও দেখিয়ে তাঁদের পরিচয় দিলেন। তারপর সেক্রেটারীকে ডেকে তাঁর গত ১ বৎসরের কাজের reprint দিলেন এবং Development of Coaltar Colour Industry নামক আমাদের সদ্য-প্রকাশিত পুস্তকের টাইপ-করা প্রশংসা লিপি দিলেন। আমি ওঁকে একবার ভারতবর্ষে আসতে বলায় বললেন—"এত ছাত্রের দায়িত্ব—সময় কই আমার—তারপর বয়সও হয়েছে, অত দূরে যেতে ইচ্ছে হয় না!" আমি ওখানে কিছুদিন কাজ করলে সুখী হতেন এবং যদি কখনও আবার সময় হয় ওঁর কাছে যেতে বলে করমর্দন পূর্বক বিদায় দিলেন। তারপর Dr. সোয়াইটজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হোটেলে এলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁর মোটর নিয়ে হোটেলে এলেন। সঙ্গে শ্রীমান প্রমোদ ব্যানার্জি। এ ছেলেটি এক সময় আমার কাছে জার্মান শিখত। এখন ওখানে doctorateএর জন্য তৈরী হচ্ছে। ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালী ছেলেরা পড়াশুনায় ওখানে খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছে। ডক্টর সোয়াইটজার নিজেই আমার সুটকেস ঘর থেকে নিয়ে গাড়ীতে তুললেন এবং ষ্টেসনেও কুলি না করে নিজেই সেই ভারী সুটকেশ নিয়ে ট্রেণে তুলে দিলেন। ট্রেণ যতক্ষণ না ছাড়ল দাঁড়িয়ে রইলেন। ট্রেণ ছাড়ার আগে ইনি একখানি চিঠি দিলেন। তার মধ্যে তাঁর ও অধ্যাপক কারারের ছবি ছিল। করমর্দন এবং নমস্কারান্তে গাড়ী ছাড়ার সময় বিদায় নিলেন। জুরিখে সত্যই সেদিন আত্মীয়বিয়োগ ব্যথা অনুভব করলাম। জানি না আর

কখনও এঁদের সঙ্গে দেখা হবে কিম্বা—কিন্তু এঁদের স্মৃতি আজীবন আনন্দের উৎস হয়ে রইল আমার কাছে।

জুরিখ থেকে বেলা ১২টায় ছেড়ে প্যারিসে রাত্রি ১১টায় ট্রেণ পৌছল। যতক্ষণ আলো ছিল দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে এলাম। প্রায় সব সহরেই বোমায়-ভাঙা বাড়ি চোখে পড়ল। ভূমিতল ঢেউ খেলানো। অনেক স্থলেই বনবেষ্টিত পাহাড়। মাঝে মাঝে কৃষকপল্লী ও শস্যক্ষেত্র। প্যারিসে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মালাকারের হোটেলে উঠলাম। ইনি ফারমেনটেশন শিখতে গেছেন! পরদিন সুবিখ্যাত লুভ মিউজিয়ম দেখলাম। রাত্রে জামান নামে একটি বাঙালী যুবকের সঙ্গে এফেল টাওয়ার দেখতে গেলাম। মালাকার ঐ সময় লণ্ডনে ছিলেন। পরদিন জামান ষ্টেসনে সঙ্গে এল। বারটায় গাড়ী ছাড়ল। ক্যালেডোভার হয়ে রাত্রি ৮টায় ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে পৌছি। পথে বোমা বিধ্বস্ত অনেক ছোট সহর দেখা গেল। অবশ্য প্যারিসের ক্ষতি লক্ষ্য করিনি। ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমান মনোতোষ মুখার্জি। আমরা একসঙ্গে জাহাজে গিয়ে লণ্ডনে একত্রে ছিলাম। আইন পড়ছেন ইনি। এঁর মেধা, চরিত্রমাধুর্য্য ও তেজস্বিতা দেখে—ন প্রভা তরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ—এই কথাটি স্বতই মনে হয়। লণ্ডনে এঁর সাহচয্য বড়ই মূল্যবান্ ছিল। জার্মানি যাত্রার দিনও বিমান অফিসে গিয়ে বিমানঘাঁটির বাসে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এঁর কথা কখনও ভুলতে পারব না।

ইংলণ্ডে যে দুদিন সময় পাই তাতে লণ্ডন থেকে ১২০ মাইল দূরে বোর্ণমাউথের নিকট পুলে অবস্থিত B. D. H. Reagent chemical কারখানা, কেণ্টের বেকেনহামে অবস্থিত Burrows Wellcome-এর Biological বিভাগ এবং লণ্ডনে Richter & Co নামক Biological ঔষধ তৈরীর ছোট্ট একটি কারখানা দেখি। ইংলণ্ডে এঁরা সবাই খুব খাতির করেছেন। B. D. H.এর স্থানীয় ম্যানেজার নিজেই ট্রেণের কাছে বোর্ণমাউথে তাঁর মোটর নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বোর্ণমাউথের বড় হোটেলে খাওয়ালেন ও পরে কারখানা দেখানর পর আবার মোটরে করে ষ্টেসনে রেখে গেলেন। Burrows Wellcome-ও অনুরূপ ভাবে আপ্যায়িত করেছেন।

জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি সর্বত্রই যানবাহনের যথেষ্ট সুবিধা—daily passengerদের ভাড়াও যাপরনাই কম; কাজেই কারখানার নিকটে কোয়াটারসের তেমন দরকার হয় না। অধিকাংশ লোকই সহরতলীর নিজ নিজ বাড়ি থেকে কাজে আসেন। অনেক ক্ষেত্রে এঁদের বাড়ি তৈরীর জন্য কোম্পানী থেকে বিনা সুদে টাকা ধার দেওয়া—বা কোম্পানির খরিদী জমি স্বল্প মূল্যে বিলি করবার ব্যবস্থা আছে, শুনলাম।

ওদেশে সকলেই জীবনধারণের জন্য উপযুক্ত বেতন পান। অবশ্য কাজও সবাই সাধ্যমত করেন। কর্তব্যজ্ঞান ওঁদের মধ্যে অসাধারণ। নোটিশ না দিয়েই আমি গাইডের সঙ্গে বহু কারখানার বিভিন্ন বিভাগে গিয়েছি কিন্তু কোথাও কর্মীদের জটলা করতে বা বসে ঝিমুতে দেখিনি। ওদের বেতনের মধ্যেও আকাশ পাতাল তফাৎ নেই। সুইজারল্যাণ্ডে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত প্রফেসর যেখানে দেড় থেকে দুহাজার টাকা পাচ্ছেন সেখানে তাঁর সহকারী অধ্যাপকরাও হাজার বারশ এবং বেয়ারাও চার পাঁচশত পেয়ে থাকেন। কাজেই সেখানে অট্টালিকার পাশে বস্তী উঠতে পারে না। ফলতঃ জুরিখে কোথাও ছোট বাড়ি বা বস্তী আমার চোখে পড়েনি। টাউনের বাইরে কৃষকদের বাড়িও সুদৃশ্য দোতলা। জার্মানিতেও এইরূপ। তারপর কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী চাকুরী—সর্বত্রই সমান গুণসম্পন্ন ব্যক্তির বেতনের তারতম্য না থাকায় এক চাকুরী ছেড়ে অন্য চাকুরী গ্রহণের আগ্রহ স্বভাবতই কম! কাজেই সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে, অনন্যমনে আপন আপন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। যোগ্য বেতনে যোগ্য লোক কারখানাতে কাজ করায় সমাজে তাঁদের কেউ হীন ভাবতে পারেন না। আমি সামান্য লোক—কারখানায় কাজ করি—কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকগণ পর্য্যন্ত আমাকে আদৌ কোনও অবহেলা দেখান নাই, বরং পরম প্রীতি ও হৃদ্যতার সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন।

ওদেশের অধিকাংশ সহরেই উপযুক্ত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়রদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কেমিক্যাল plants এবং কেমিক্যাল equipment প্রস্তুতের কারখানা আছে। ওদের কেমিক্যাল কারখানার অনেকগুলিই স্থাপিত হয়েছে একশত বৎসর বা তারও আগে; বহু কারখানারই বয়স ৫০।৬০ বৎসর—এবং তাদের প্রতিষ্ঠাতাও বহু ক্ষেত্রেই বিখ্যাত কোনও কেমিষ্ট—তারপর পরিচালিতও হয়ে এসেছে এবং আসছে বরাবর নামকরা বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা। এদিকে জলহাওয়া, কর্মীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রমশীলতা, কর্তব্যজ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতিও অতি উন্নতস্তরের বলে এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও হৃদ্যতাপূর্ণ, সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবহার পাওয়ায় তাঁরা নিজের কাজ ভেবে প্রাণ দিয়ে খেটে কারখানাকে দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আমরাও সেই পথে চললে ওঁদের নাগাল ধরতে না পারলেও শীঘ্রই যে অনেকটা কাছাকাছি যেতে পারব—সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরবর্ত্তী কর্ম্মপন্থা নিরূপণের জন্য প্রধান কেন্দ্রে সকলে যখন যুক্তি-পরামর্শ করিতেছেন, তখন পুনরায় শত্রুপক্ষ আক্রমণ আরম্ভ করিল। রাত্রি তখন আন্দাজ দুই ঘটিকা হইবে। পুলিশ অস্ত্রাগারের অদূরেই ছিল ওয়াটার-ওয়ার্কস। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ প্রস্তুত হইয়া আসিয়া সেই ওয়াটার-ওয়ার্কস হইতে নূতনভাবে গুলিবর্ষণ সুরু করিলেন। বিদ্রোহীরাও গুলি চালাইয়াই দিলেন তাহার প্রত্যুত্তর। উভয় পক্ষের গুলিবর্ষণে নিস্তব্ধ রাত্রি আবার মুখর ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে উক্ত স্থান ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ আর্ম্মারিতে আগুন লাগাইবার ব্যবস্থা হইতে-ছিল। আগুনও শীঘ্রই ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই সময় কিন্তু সহসা আর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া বসিল। হিমাংশু সেন নামে দলের একজন যুবক আগুন ধরাইয়া দিবার কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদে আগুন ধরিয়া যাওয়ায় যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। দলের কয়েকজন তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পরিচ্ছদের আগুন শীঘ্রই নিভাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাঁহার শরীরের নানা স্থান অগ্নি-দগ্ধ হইল। অসহ্য জ্বালায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া কি করা যায়—তাহা লইয়া বিপ্লবীরা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবিলম্বেই হিমাংশুর চিকিৎসা প্রয়োজন এবং তদুদ্দেশ্যে আবশ্যক নিরাপদ আশ্রয়ের। সেই ব্যবস্থাই করিবার জন্য অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষাল তৎক্ষণাৎ হিমাংশুকে লইয়া মোটর যোগে প্রস্থান করিলেন।

ওয়াটার ওয়ার্কস হইতে এদিকে শত্রুপক্ষের গুলি অবিরামভাবেই পুলিশ আর্ম্মারির উপর আসিয়া পড়িতেছিল। গণেশ ঘোষ প্রভৃতি ফিরিয়া না আসার জন্য বিপ্লবীদেরও স্থানত্যাগে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিয়াও তাঁহারা যখন আর ফিরিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া সেই রাত্রেই চট্টগ্রাম সহর আক্রমণের পরিকল্পনাও বিপ্লবীগণকে ত্যাগ করিতে হইল। পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণই সমীচীন বলিয়া নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তদনুযায়ী বিপ্লবীরা যাত্রা সুরু করিলেন পাহাড়ের দিকে। সকলেই সাধ্যমত অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি বারুদের বোঝা বহন করিয়া চলিলেন। পথ সম্বন্ধে দলটিকে নির্দেশদান করিতে লাগিলেন অম্বিকা চক্রবর্ত্তী।

বহু চেষ্টা করিয়াও কিন্তু বিপ্লবীগণের পক্ষে রাত্রির অন্ধকারে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। পুলিশ আর্ম্মারি হইতে খানিকটা দূরে সুলুকবহর পাহাড়ের নিকট যাইতেই রাত্রি প্রভাত হইল; সুতরাং সেই পাহাড়েই তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সকাল বেলা-ই দলের জনৈক যুবককে গণেশ ঘোষ প্রভৃতির এবং সহরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দল ছাড়িয়া সহরে আসার পর তাহার কিন্তু আর ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইল না। অপর সকলে বৃথাই তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। সারাদিন শুধু প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া গেল। সঙ্গে কোনও খাদ্য-দ্রব্য না থাকায় ক্ষুধার তাড়নাতেও তাঁহারা কাতর হইয়া পড়িলেন। পাহাড়ে আম গাছের কচি কচি আম খাইয়া তাঁহারা যতদূর সম্ভব ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নের দিকে পুনরায় দীপ্তিমেধা চৌধুরী ও অমরেন্দ্র নন্দীকে অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল সহরের দিকে। সহরে গিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সহরটি সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত—পুলিশী কর্ম্মতৎপরতার কোথাও নাম-গন্ধও নাই। কি একটা গভীর আতঙ্কে যেন সমগ্র সহরটা থমথমে হইয়া আছে। সকল কিছু দেখিয়া শুনিয়া রাত্রির অন্ধকারে তাঁহারা আবার পাহাড়ের পথ ধরিলেন। পথ তো ধরিলেন, কিন্তু কোন্ দিকে কোথায় যে যাইতে হইবে, তাহা আর তাঁহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পথ ভুল করিয়া সেই রাত্রির অন্ধকারে নানা স্থানেই তাঁহারা ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পাহাড়টির আর হদিস্ মিলিল না। অগত্যা বাধ্য হইয়াই ভোর বেলা পুনরায় তাঁহাদিগকে সহরে ফিরিয়া আসিতে হইল; কিন্তু সহরে অবস্থানেও তো বিপদ আছে; সুতরাং দুইজনেই চলিয়া গেলেন দীপ্তি-মেধাদের গ্রামের বাটীতে। এদিকে ২০শে এপ্রিল সকাল বেলা হইতেই চট্টগ্রাম সহরে নূতন নূতন সৈন্যবাহিনীর আগমন সুরু হইল।

১৯শে এপ্রিল গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রেরিত যুবক তিনজনের একজনও ফিরিয়া না আসায় বিপ্লবীগণ অনুমান করিলেন যে, সহরের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ, প্রেরিত যুবক তিনজন ধৃত হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। সুলুকবহর পাহাড়েও আর অপেক্ষা করা চলে না—কারণ পাহাড়টি পুলিশ আর্ম্মারি হইতে অধিক দূরে নহে এবং বৃক্ষ-বিরল বলিয়া তথায় এতজন বিপ্লবীরও আত্মগোপন করিয়া থাকার বিশেষ সুবিধা নাই; সুতরাং রাত্রিতেই পাহাড়টি ত্যাগ করিয়া তাঁহারা আবার যাত্রা সুরু করিলেন। ফতেয়াবাদ পাহাড়ের নিকট গিয়া রাত্রি প্রভাত হইল এবং দিবালোকে পথ অতিক্রম করায় বিপদ থাকার জন্য সেই পাহাড়েই তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। ২০শে ও ২১শে এপ্রিল ঐ পাহাড়টিতেই কাটিয়া গেল। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে সকলেই বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। অদূরবর্ত্তী ফতেয়াবাদ গ্রামে অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর একটি পরিচিত গৃহ ছিল। দলের যুবকগণের জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহের আশায় ২১শে তারিখে তিনি সেই গ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন এবং

অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিলেন খাদ্য লইয়া। কয়দিনের পর যাহা হয় কিছু খাইতে পাইয়া বিপ্লবীগণ অনেকটা তৃপ্তিলাভ করিলেন।

কিন্তু খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করিয়া কতদিনই বা এইভাবে লুকাইয়া থাকা চলিবে? ইহার অপেক্ষা সহর আক্রমণের দায়িত্ব লওয়াও শ্রেয়ঃ। শেষ পর্য্যন্ত তাই সহর আক্রমণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। তদনুযায়ী ২১শে তারিখে রাত্রিকালেই সকলে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলেন সহরের দিকে। জালালাবাদ পাহাড় চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় মাইল তিনেক দূরে অবস্থিত। ২২শে এপ্রিল অতি প্রত্যূষেই জালালাবাদ পাহাড়ের পশ্চাৎদিক দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। অপরাহ্নকালে ইষ্টার্ণ রাইফেলস্ ও সুর্মাভ্যালি বাহিনী ক্যাপ্টেন টেইটের পরিচালনায় ট্রেণযোগে পাহাড়টির উদ্দেশে রওনা হইল। ট্রেণখানি প্রায় অপরাহ্ন পাঁচটার সময় পাহাড়টির নিকট গিয়া থামিল এবং সৈন্য-বাহিনী তাহা হইতে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে।

বিপ্লবীরাও পাহাড়ের উপর হইতে সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের দুর্ব্বল, অভুক্ত, পিপাসা-কাতর ও ক্লান্ত দেহে মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন

জালালাবাদ-যুদ্ধে নিহত শহীদবৃন্দ

নরেশ রায় ত্রিপুরা সেন বিধু ভট্টাচার্য্য • প্রভাস বল নির্ম্মল লালা শশাঙ্ক দত্ত

জিতেন দাস মধু দত্ত পুলিন ঘোষ টেগরা মতি কানুনগো

বিপ্লবীগণ ঐ পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তখনকার মত ঐ পাহাড়েই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বিপ্লবীদের ধরিয়া বা ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার দানের বিষয় ইতিমধ্যেই চারিদিকে প্রচার করা হইয়াছিল। সূর্য্য সেন প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ছয় ব্যক্তির প্রত্যেকের জন্য ঘোষিত হইয়াছিল ৫০০০, টাকা হিসাবে পুরস্কার। জালালাবাদ পাহাড়ে বিদ্রোহীদের অবস্থানের বিষয় জ্ঞাত হইতে কর্ত্তৃপক্ষের অধিক সময় লাগিল না। পুলিশ ও মিলিটারি কর্ত্তৃপক্ষ তখন তৎপর হইয়া উঠিলেন।

নব বলের সঞ্চার হইল এবং শত্রুপক্ষের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠিলেন। প্রধান সেনাপতি হিসাবে লোকনাথ বল তাঁহার অধীন বাহিনীকে যথাযোগ্য স্থানে অতি দ্রুত সন্নিবিষ্ট করিতে লাগিলেন। মারণাস্ত্র হাতে লইয়া সকলে শত্রুর আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সৈন্যবাহিনী পাহাড় ঘিরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। রাইফেলের পাল্লার মধ্যে তাহারা যখন আগমন করিল, তখন লোকনাথ বজ্রকণ্ঠে তাহাদিগকে থামিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিলেন এবং বিপ্লবীদিগকে

আদেশ দিলেন গুলি চালাইবার জন্য। আদেশমাত্রে বৃষ্টির বারিধারার মত তাঁহাদের গুলি সৈন্যবাহিনীর উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সে আক্রমণ এমনই তীব্র হইল যে, তাহার বেগ প্রতিহত করা অস্ত্র-সজ্জিত, সুশিক্ষিত সেনা-বাহিনীর পক্ষেও সম্ভব হইল না, কাজেই আর অগ্রসর না হইয়া তাহারা বাধ্য হইল পশ্চাদপসরণ করিতে।

ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সৈন্যগণ তখন বিদ্রোহীদিগের সহিত পাল্লা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জালালাবাদের পাহাড়ে যে তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সেদিন আরম্ভ হইল, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব এবং রোমাঞ্চকর! "বন্দেমাতরম্" এবং "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনির সহিত চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীগণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সেদিন প্রচণ্ড বিক্রমে এক রক্ত-রাঙা অধ্যায়ের যোজনা করিতে লাগিলেন। ইংরাজের সৈন্যবাহিনী সেদিন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল যে কি প্রবল বাধারই সম্মুখীন না তাহাদিগকে হইতে হইয়াছে! বিপ্লবীদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ ছাত্র। তাঁহাদের অপূর্ব্ব দক্ষতার উভয় পক্ষে সমানে সমানেই লড়াই চলিল। কর্ণেল স্মিথের অধীন আর একটি নূতন বৃহৎ বাহিনী এই সময় আবার আসিয়া পৌঁছাইল। রাইফেল, লুইসগান প্রভৃতি লইয়া তাহারা জালালাবাদের পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটি পাহাড় হইতে বিপ্লবীদের উপর মুহুর্মুহু গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা একই সঙ্গে কয়েক দিক হইতে আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনোবল বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না। বিচক্ষণ সেনাপতির মত সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করিয়া লোকনাথ যুদ্ধ পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

লুইস গানের গুলিতে কিন্তু বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। উহার গুলিতে তাঁহারা অধিক সংখ্যায় আহত বা নিহত হইতে লাগিলেন। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি গুলিতে লোকনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা টেগ্‌রা গুরুতররূপে আহত হইয়া ছিটকাইয়া পড়িল। তাহার বয়স তখন আন্দাজ তের-চৌদ্দ বৎসর হইবে। সেই অবস্থাতেও টেগ্‌রা কিন্তু যে অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দিল—তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। লোকনাথকে সে তাহার অন্তিম অনুরোধ জানাইল যে, সে মরিতেছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ যেন থামান না হয়।

টেগ্‌রা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে আরও অনেকেই গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতে লাগিলেন। এইভাবে একে একে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন—ত্রিপুরা সেন, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্ম্মল লালা, জিতেন দাশগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক সেন, মতি কানুনগো, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার আর অম্বিকা চক্রবর্ত্তী। তাঁহাদের রক্তে জালালাবাদ পাহাড়ের মাটি রঞ্জিত হইয়া গেল। যুদ্ধ কিন্তু তথাপি চলিতেই লাগিল। সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ একটি সুদীর্ঘ বংশীধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল—উহা যুদ্ধ-বিরতির ইঙ্গিত। সৈন্যবাহিনী সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। বিপ্লবীরা বিজয়োল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বন্দেমাতরম্, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

২২শে এপ্রিল তারিখের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ জমাট বাঁধিয়াছে। রণক্লান্ত জীবিত বিপ্লবীগণ মৃত সঙ্গীদিগের দেহ পর্ব্বতগাত্রে অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সব কয়টি দেহই সংগ্রহ করিয়া পাশাপাশি সাজান হইল। তারপর লোকনাথের আদেশে সকলে আবার সারি দিয়া দাঁড়াইলেন এবং সামরিক কায়দায় মৃত কর্ম্মীদের উদ্দেশে শেষ অভিবাদন প্রদান করিলেন।

সৈন্যবাহিনী প্রস্থান করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পসংখ্যক সৈন্যকে পাহারায় রাখিয়া গিয়াছিল। বিপ্লবীদিগকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখার উদ্দেশ্যে তাহারা পুনরায় গুলিবর্ষণ সুরু করিল। সূর্য্য সেন এবং অপরাপর সকলেই ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, অবিলম্বেই জালালাবাদ পাহাড় ত্যাগ করিয়া যাওয়া দরকার; সুতরাং ক্লান্ত শরীরেই আবার সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—অস্ত্র-শস্ত্রের বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া দুর্গম পথে আবার তাঁহারা যাত্রা সুরু করিলেন। একসঙ্গে সকলের অবতরণ করা সম্ভব হইল না, বলিয়া কয়েকটি ক্ষুদ্র দলে তাঁহারা বিভক্ত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ায় আর এক বিপদ বাধিল। কিছুদুর অগ্রসর হইয়া সূর্য্য সেন লক্ষ্য করিলেন যে, লোকনাথ এবং তাঁহার সঙ্গের দলটিকে দেখা যাইতেছে না। আশ-পাশে যতদূর সম্ভব খুঁজিয়া দেখা হইল—কিন্তু কোথায় গেলেন তাঁহারা? উচ্চৈঃস্বরে ডাক-হাঁক করিয়া বা সঙ্কেতধ্বনি করিয়াও কোনও সাড়া লইবার উপায় নাই। নিকটে অবস্থানকারী শত্রুপক্ষ তাহা হইলে তাঁহাদের গতি-বিধির বিষয় জানিয়া ফেলিবে। সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন লোকনাথের দলটির সহিত মিলিত হইবার জন্য, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। তখন হইতে দুইটি দলে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইল। অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল যে সূর্য্য সেন এবং তাঁহার দলটি জালালাবাদ পাহাড় হইতে অধিক দূরে আসিতে পারেন নাই। সারা রাত্রি পথ চলিয়া তাঁহারা মাত্র অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছেন! যাহা হউক, সেইখানের একটি পাহাড়ের গুহাতেই তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সকলের পক্ষেই তখন বিশ্রাম গ্রহণ একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

এদিকে জালালাবাদ পাহাড়ের উপর গভীর রাত্রিতে আহত অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। আশে-পাশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি মৃতদেহের সহিত তিনিও শায়িত আছেন। জীবিত আর কাহাকেও সেখানে দেখা গেল না। অনুমানেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অবশিষ্ট সহকর্ম্মীরা স্থানত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনিও তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি কষ্টে পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। ফতেয়াবাদ গ্রামে তাঁহার যে পরিচিত ব্যক্তির গৃহ ছিল, তথনকার মত সেখানে গিয়া আশ্রয় লওয়াই তাঁহার ভাল বোধ হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি সেখান হইতে

বিপ্লবীদের জন্য খাদ্য আনিয়াছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে তিনি আবার সেইখানেই ফিরিয়া গেলেন।

২৩শে এপ্রিল সকালের দিকেই পুনরায় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ট্রেণে করিয়া জালালাবাদ পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তোড়-জোড় করিয়া প্রথমে তাহারা করিল আশে-পাশে সৈন্য সমাবেশ, তারপর সতর্কতার সহিত একদল উঠিতে লাগিল পাহাড়ের উপর। পূর্ব্বদিনের অভিজ্ঞতার ফলে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা প্রবল বাধার আশঙ্কা করিতে লাগিল—কিন্তু সেদিন আর কোন বাধাই আসিল না, একজন বিপ্লবীরও রাইফেল তাহাদের বিরুদ্ধে গর্জ্জিয়া উঠিল না। নির্বিঘ্নে পাহাড়ে উঠিয়া তাহারা দেখিতে পাইল শুধু ডজনখানেক মৃতদেহ। মতি কানুনগো এবং অর্দ্ধেন্দু দস্তিদারের তখনও মৃত্যু হয় নাই, গুরুতররূপে আহত হইয়া তাঁহারা মৃতের মতই পড়িয়াছিলেন। অবশিষ্ট দশজনের মৃত্যু হইয়াছিল বহু পূর্ব্বেই। মতি কানুনগো অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং অর্দ্ধেন্দুকে তৎক্ষণাৎ সহরস্থ জেল হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেইখানেই পরে তাঁহারও মৃত্যু হয়।

ক্যাপ্টেন টেইট ও কর্ণেল স্মিথের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে,জালালাবাদে যুদ্ধের সময় বিপ্লবীরাই সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ চলিতে থাকাকালেই তাঁহারা নাকি এইরূপ একটা গুজব শুনিতে পান যে, সেইদিন রাত্রিতেই চট্টগ্রাম সহরের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক লুঠ করা হইবে। তাহা শুনিয়া তাঁহারা সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সহরে ফিরিয়া গিয়া রাত্রিকালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক পাহারা দিতে এবং পরদিন ২৩শে তারিখে প্রাতঃকালেই পুনরায় জালালাবাদ পাহাড়ে গিয়া বিপ্লবীদিগকে আক্রমণ করিতে সিদ্ধান্ত করেন।

যাহা হউক, মৃতদেহগুলি সনাক্তকরণ প্রভৃতির পালা সাঙ্গ হইতেই প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া গেল। তারপর সুরু হইল শব-সৎকারের ব্যবস্থা। পাহাড়ের উপরই এই উদ্দেশ্যে পাশাপাশি গুটি চারেক চিতা সজ্জিত করা হইল এবং তাহার উপর সব কয়টি মৃতদেহ স্থাপন করিয়া—করা হইল অগ্নি-সংযোগ। চিতা-ধূমে জালালাবাদের আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা জীবন দিয়া এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে রইলেন আমার রাখি-বন্ধন ভাই, তারপর বললেন—"ঐ দেখুন তাজমহলের দীপ জ্বলছে অনির্ব্বাণ, প্রেমমুগ্ধ চিত্তের শ্রদ্ধা অর্ঘ্য।" তারপর আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। উত্তেজনায় তাঁর মুখ রক্তিমাভা ধারণ ক'রেছিল। তিনি বল্লেন, "রাজকুমারী জানেন যে আপনার পিতার সম্মানার্থে উদয়পুরের দেবমন্দিরে একটি অনির্ব্বাণ দীপ জ্বলে। রাজস্থানের সৈন্যদল পরিপূর্ণ আগ্রহে সম্রাটের পতাকাতলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে।"

আমরা তাজমহলের দিকে অগ্রসর হ'লাম। রাও সমাধি পরিদর্শন ক'রলেন, আর আমি তাঁকে পরিদর্শন করলাম। মৃদুকণ্ঠে তিনি বল্লেন, "পুরুষ এই পৃথিবী শাসন করে। একটি পুরুষের শক্তি সৃষ্টি করে, আবার ধ্বংস করে—নিজের সৃষ্টি নিজেই ধ্বংস করে। পুরুষ শক্তির ইঙ্গিতেই আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা বুঝি না যে এই শক্তির পশ্চাতে আরও শক্তিময়ী শক্তি আছে, সে শক্তি নারীর। যখন সে নারীর শক্তি অঙ্গবিহীন দেবতার পদধ্বনির তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে, তখন স্বর্গ মর্ত্ত রূপান্তরিত হ'য়ে যায়।"

"রাও" কি চন্দ্রালোক-প্লাবিত তাজ দেখেছিলেন? সুমিষ্ট পুষ্পগন্ধের তীব্রতায় বাতাস ভ'রে গেল। এই গন্ধ কি সমাধি মন্দিরের শতদল উদ্যান থেকে এসেছে? এক অব্যক্ত কমনীয় ভাব ও অদম্য চিন্তা শক্তি আমাকে আমার বহু ঊর্দ্ধে টেনে নিয়ে গেল। প্রাসাদ প্রাচীরের সুগভীর গম্বুজ তাহার আশ্রয় বিহীন প্রেমিককে আশ্রয় দেয়; রাও তাঁর হরিদ্রাভ বসন মর্ম্মর তলে বিছিয়ে দিলেন। আমি তার উপরে উপবেশন ক'রলাম। আমারও বসন তাঁরই বসনের মত শুভ্র। আমার শুভ্র শাড়ীর অঞ্চল স্বর্ণখচিত। আমি তাঁর সঙ্গে কথা ব'লব—হয় এখনি, নচেৎ আর জীবনে নয়। আমার ভয় হলো আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলব। হঠাৎ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। নজবৎ খান যাঁকে আমি কখনও চিন্তা করিনি। সহসা আমার মনে উদিত হ'ল—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, অশুভ ইঙ্গিত—তাঁর নয়নে পরিস্ফুট! আমি কথা বলবার পূর্ব্বেই নিজের চিন্তা অনুসরণ করে 'রাও' অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লেন, "আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আমি নজবৎ খানের অপসরণ চাই।"

আমি আমার বাহুতে ভর দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?" "রাও" সম্মুখে অগ্রসর হলেন, নিমিলিত-নয়ন শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিলেন। "আমি তাকে ঘৃণা করি।" আমি অবাক হয়ে রইলাম।

তিনি কি শুনেছেন? তারপর মনে পড়ল আমি যখন ফতেপুরে নজবৎ খানের নাম উচ্চারণ ক'রেছিলাম, "রাও" তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যে আর কি শুনেছিলেন—তা' আমি জানি না। আমি স্থির করলাম আমাদের দুজনের মধ্যে নজবৎ খানের ছায়ারও স্থান হ'বে না। আমি আমার অবগুণ্ঠন অপসরণ করলাম। তিনি আমার

সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করুন। তিনি জানুন যে নজবৎ খানের মত মানুষকে আমি বরণ করতে পারি না।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলাম, "আপনার কি সেই পত্রের কথা স্মরণ আছে? সে পত্র আমি সর্ব্বদা আমার বক্ষে বয়ে বেড়াই। সেই পত্রে লেখা হয়েছিল—যদি আমি সংযুক্তা হ'তাম—" আমি এখানে থামলাম। ছত্রপালের মুখমণ্ডল শ্বেতমর্ম্মরের প্রচ্ছদপটে কৃষ্ণ পাংশু-বর্ণ ধারণ ক'রল। আবার আমি বল্লাম, "মনে পড়ে সেই গোলাপ…?" কিন্তু আমার সমস্ত শক্তি আমি হারিয়ে ফেল্লাম। আমি প্রাচীর গাত্রে অবসন্ন দেহভার এলিয়ে দিলাম।

তিনি যেন বহু দূর থেকে উত্তর দিলেন, "আমার মনে পড়ে বহু, বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম।" তিনি চক্ষু উন্মেলন ক'রলেন। তাঁর সে দৃষ্টি আমি কখনও ভুলব না—যখন ঈশ্বরের জ্যোতিঃ মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়, তখন আর কোন আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে না।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেন, "হাঁ, আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম—আমি তখন তরুণ ছিলাম ও স্বপ্নে বিশ্বাস করতাম। জাহানারা বেগম, ভারত-বর্ষের সম্রাট কুমারী, আমার গোপন রাজ্যের রাণী, জাহানারা বেগম! আজকে আমার সময় হয়েছে, আমি জেনেছি যে দিবসের তীব্র আলোর সম্মুখে সুন্দরতম স্বপ্নও মলিন হয়ে যায়। স্বপ্ন শুধু চন্দ্রালোকেই ক্ষণিকের অতিথি। যুদ্ধ আমার ললাটে ক্ষত চিহ্ন দিয়ে গেছে গভীর। কিন্তু জীবন আমার হৃদয়ে ক্ষত চিহ্ন দিয়ে গেছে গভীরতর। স্বপ্ন বাস্তব-রাজ্য হ'তে যত দূরে স'রে যায় ততই আরও সুন্দর প্রতিভাত হয়। সেখানে কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই……"

জীবনটা আমার কাছে প্রহেলিকা। আমরা নীরবে ব'সে ছিলাম। আমার মনে হ'ল অকস্মাৎ যেন আকাশের সব আমাদের মাথার উপর থেকে উর্দ্ধলোকে স'রে যাচ্ছে। আমি অনুভব ক'রলাম আত্মত্যাগই সপ্তস্বর্গের পথ খুলে দেয়। আমি অনুভব ক'রলাম আমাদের মধ্যে স্থূল দৃষ্টিতে পার্থক্য বৃহত্তর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের আত্মা নিকট থেকে নিকটতর হয়ে উঠেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অতি শান্তভাবে—"আমরা কি তাজমহলে প্রবেশ করব?"

নক্ষত্রের গতি কে প্রতিরোধ করতে পারে? প্রাসাদের প্রবেশ-পথে মোল্লা কোরাণ আবৃত্তি করছিল। হাজীর মোল্লাদের ডেকে নিকটবর্ত্তী "লাল মসজিদে" নিয়ে এল। সমাধি মন্দিরে তখন আলো জ্বলছিল। সে দিন ছিল শুক্রবার।

প্রতি শুক্রবার রাত্রিতে আমার মাতার সমাধি স্তম্ভের উপরে মূল্যবান মুক্তাখচিত এক খণ্ড বস্ত্র আবৃত্ত করা হয়। আমি রাখীবন্ধ ভাইকে বল্লাম, "আপনি আপনার একটি প্রিয় শব্দ উচ্চারণ করুন, যেন তাজমহলের প্রতিধ্বনি আপনার শব্দের উত্তর দেয়।"

আমি শুনলাম—আমার নাম তাজের অভ্যন্তরে সহস্র দেবদূতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তিনি বল্লেন, "এমনি ক'রে যেন আমার নাম পৃথিবীর অপর প্রান্তে অভ্যর্থিত হয়।"

আমার লেখনী অধিক অগ্রসর হতে পরাঙ্মুখ হ'য়ে উঠেছে। আমি অনেক বিষয়ে অনেক কথাই লিখতে পারি, কিন্তু সেই গম্বুজের নিম্নে আমাদের কথা বিনিময়ের বিষয়ে আর লিখতে পারছি না!…

কোন বিবাহ অনুষ্ঠান আমাদের হৃদয়কে নিকটতর ক'রতে পারতো না।

যদি দারা গৃহযুদ্ধে জয়ী হয়, আর ছত্রশাল জীবিত থাকেন তবে তিনি হিমালয়ের প্রান্তদেশে এক পার্ব্বত্য মন্দিরে তীর্থ যাত্রা করবেন। তিনি স্থির করেছেন—চম্বল নদীর যুদ্ধই তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ।

আমরা সাইপ্রাস বীথির মধ্য দিয়ে সেই বিরাট প্রবেশ তোরণের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করছি…সমাধির দিকে যাত্রার সূচনা থেকে আরম্ভ করে বহু বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমার মনে হল যেন আমরা এক গহন ধর্ম্মরাজ্যের বহু উচ্চতর স্তরে উন্নীত হলাম।

বিদায় সম্ভাষণের সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আমি কি সেই পবিত্র পর্ব্বতে তীর্থ যাত্রা করতে পারব?"

তাঁর নয়নে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। তিনি উত্তর দিলেন—"আমি আপনার জন্য পর্ব্বতের পাদদেশে অপেক্ষা করব। জাহানারা, যদি সেখানে না পারি তবে সূর্য্যালোকে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।"

সেই তাঁর শেষ বাণী আমার উদ্দেশে।

*   *   *   *

……………………!

অস্ত্রের বর্ষাধারায় হিন্দুস্থানে নর্ম্ম উদ্যানে ফুল ফুটেছিল,
সেখানে মানুষের অস্থি ছিল শুভ্রযুথি, আর রক্ত ছিল কমল।

(আনসারী)

…… ……………!

বায়ুমণ্ডল শুভ্র তরবারী দিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল,
সেই তরবারী তৈরী হয়েছিল ঘন পদ্মরাগমণি দিয়ে।

(চান্দবরদাই)

…… ……………!

হস্তীর বিকট চিৎকার অশ্বের হ্রেষারব,
ঐ শোন সৈন্যের আর্ত্তনাদ,………ঐ ঐ ঐ! (মকফী)

*   *   *   *

পরের দিন প্রভাতে আমরা প্রাসাদশিবির হতে দেখলাম এক বিরাট সেনাবাহিনী চলেছে প্রান্তর অতিক্রম করে; যুবরাজ দারার রাজহস্তী রাজপুত অশ্ববাহিনী-মধ্যে পর্ব্বতের মত উচ্চশির। সে এক অপরূপ দৃশ্য!

বুন্দীরাজের অশ্বারোহীদল চলেছে—বাহিনীর পশ্চাতে বাহিনী-সৈন্যদলের কুমকুমরাগ পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছিল তারা জয়লাভ না করে প্রত্যাবর্ত্তন করবে না। আমার শরীরে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল।

আমার যতদূর দৃষ্টি যায় আমি কেবল ছত্রসালের হস্তী অবলোকন করলাম। আমি জানতাম তাঁর পশ্চাতে ছিল তাঁর অশ্ব—নাম "যবদ্বীপ।" চৌহানবংশের প্রতিষ্ঠাতা গর্গার অশ্বের নামও ছিল "যবদ্বীপ।" অশ্বের

ললাটে বিলম্বিত ছিল একটী বৃহৎ রক্তাভ ওপেল প্রস্তর। আমিই সেই প্রস্তরখণ্ড তাঁকে আমার স্মৃতিস্বরূপ পাঠিয়েছিলাম।

দামামা ধ্বনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল, সঙ্গীত দূরে মিলিয়ে গেল; শেষে উষ্ট্রও চক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেল। আমি আমার পিতার নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁকে শান্ত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়, সম্ভাব্য সকল অশুভ জিনিষই তাঁর দূরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, তাঁর মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্য আমি সম্রাট বাবরের পুত্রচতুষ্টয়—হুমায়ুন, কামরাণ, আস্কারি, হিন্দালের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাসে বিবৃত করলাম। কামরাণ আওরঙ্গজেবের মত সকলকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে তিনি স্বয়ং দরবেশ ও হুমায়ুনকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেষ্টা করেছিলেন, অবশ্য বাবর হুমায়ুনকেই সিংহাসনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কামরাণ সফল হন নি।

পিতার চক্ষুকোটর হতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি যেন কোন বিশেষ কেন্দ্রের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল, অকস্মাৎ আমার প্রতি তিনি দৃষ্টিক্ষেপ করলেন! সেই দৃষ্টি আমাকে তীরের মত বিদ্ধ করল, তিনি উত্তর দিলেন:—

"সম্রাট হুমায়ুন কামরাণের চক্ষু উৎপাটন করেছিলেন কারণ কামরাণ বহু চাঘতাই সন্তানের প্রাণনাশ করেছিলেন। মির্জ্জা আস্কারী যদিও শিশু আকবরকে অপহরণ করেছিলেন, তবু তিনি সজ্জন ছিলেন, আকবরের প্রতি সুব্যবহার করেছিলেন, মির্জ্জা হিন্দাল সম্রাট হুমায়ুনের জন্য প্রাণ দান করেছিলেন। তৈমুর বংশ কি ভেবেছে যে তাদের বংশ নিঃশেষ হয়ে গেছে?

* * * *

আমি আমার অপরাধ চিন্তা করলাম। আমার অপরাধের শাস্তি হ'চ্ছে। সেই অপরাধে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে। আমি লজ্জায় নীরবে মাথা নত করলাম। শায়েস্তাখানের স্ত্রীকে আমিই সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হতে সাহায্য করেছিলাম—আজ আর তার জীবনের কোন মায়া নাই। শায়েস্তাখানের প্রতিশোধ স্পৃহা......উঃ।

তারপর কয়েকদিন পর্য্যন্ত দেখলাম একটী নক্ষত্র আমাদের মাথার উপরে ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট পথে চলেছে এবং প্রতিটী ঘটনাই সে নক্ষত্রের পানে ছুটেছে।

আমার পিতা শাহজাদা দারাকে সুলেমান শুকোর জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু সেই তরুণ সেনাপতি শাহসুজাকে অনুসরণ করে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছিল। অন্যদিকে আমাদের শত্রু ক্রমশঃ নিকটতর হচ্ছিল। যদি সুলেমান শুকো যথাসময়ে এসে সসৈন্যে উপস্থিত হ'ত, তবে খালিলুল্লা খান ও তাঁর অশিক্ষিত সৈন্যের প্রয়োজন হত না।

প্রতিদিন গ্রীষ্মের উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

শেষে বিরাট সৈন্যদল অভিযান আরম্ভ করল। কিছুদিনের মধ্যেই সংবাদবাহক শিবিরের সংবাদ নিয়ে এল; বিভিন্ন রকমের সংবাদ আসছিল, সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা খুব সহজ ছিল না।

কিন্তু আজ আমি অনেক ঘটনাই বলতে পারি, কারণ আমি পরে সে সংবাদ জেনেছিলাম।

শাহজাদা দারা চম্বলনদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করেছিলেন। মনে হ'ল যেন স্বপ্নের দেশে এক বিরাট নগর—অগণিত শিবির, বহুবর্ণরঞ্জিত পতাকা, প্রবহমান জনস্রোত। দুদিন পরে সৈন্য দৃষ্টিগোচর হল। শত্রুর প্রতি আক্রমণের জন্য দারার সেনাপতি অনুমতি প্রার্থনা করলেন, কিন্তু দারা তখনও তাঁর পুত্র সুলেমানের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সুলেমান তখনও আসেনি......।

চম্বল নদীর উপরে সমস্ত সেতুপথ সুরক্ষিত করা হয়েছিল। একমাত্র রাজা চম্পতরাওয়ের জন্য মধ্যে অবস্থিত সেতু অরক্ষিত ছিল। রাজা চম্পতরাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে শত্রুদিগকে সেতু অতিক্রম কর্ত্তে অনুমতি দেওয়া হবে না। দারার শিবিরের কয়েক ক্রোশ দূরে একটী পথ আছে, সে সংবাদ আওরঙ্গজেব জানতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদত জানা গেল যে রাজা চম্পতরায়কে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করা যায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্রুতপদক্ষেপে আওরঙ্গজেব আট সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সুরক্ষিত নদীর অপর তীরে উপস্থিত হ'ল।

এবার দারার শত্রু আক্রমণের সুযোগ। পরিশ্রান্ত পথশ্রান্ত নদীতীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আওরঙ্গজেবের সৈন্যদল। তার সৈন্যদলের প্রধান অংশ তখনও এসে উপস্থিত হয় নি। সৈন্যাধ্যক্ষ ইব্রাহিম বল্লেন,—দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করা হউক। কিন্তু খালিলুল্লাহখান বল্লেন—যদি দারা তাঁর সৈন্যদল এক্ষুণি প্রেরণ করেন তবে বিজয়ের গৌরব হবে সেনাপতিদের, দারার তাতে অসম্মান হবে, সুতরাং তাঁদের অপেক্ষা করা উচিত......।

আমি কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে সেই মুহূর্ত্তেই নিঃশব্দে অপরিবর্ত্তনীয় ভাগ্যদেবতা তার নির্দ্দিষ্ট পথে সরে গেল।

তখন রমজান মাসের(১) প্রারম্ভ, পরের দিন দারা শত্রু-সৈন্যদের বিরুদ্ধে সামুগড়ের দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, সেই রাত্রিতে ও প্রত্যুষে সৈন্যের বহুলাংশ ক্রমাগত এসে পৌচাচ্ছিল। শ্বাসরোধকারী উষ্ণ বায়ু চারদিক বিভ্রান্ত করেছিল, বিরাট প্রান্তরে জলাভাবে সৈন্যগণ অস্থির। দারার অভিপ্রায় ছিল দামামা নিনাদে আক্রমণের আদেশ দিবেন, কারণ তখন আওঙ্গজেব ও তাঁর গোলন্দাজ সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং তখনও বহু সৈন্য পরিশ্রান্ত, কিন্তু দারার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণ জ্যোতিষশাস্ত্রের আশ্রয় নিল। তারা বলল,—আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডল দারার ভাগ্যের প্রতিকূল, অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। দারার অপরাজেয় সৈন্যবাহিনীর তুলনায় আওরঙ্গজেবের সৈন্যদল সমুদ্রে গোষ্পদ মাত্র....."

তারপর দিন দারা সম্রাটের নিকট থেকে পত্র পেলেন যে তাকে আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তন করে সুলেমানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। দারা উত্তর

---

(১) মুসলমানের নিকট রমজান মাস পবিত্র, এই মাসে রক্তপাত নিষিদ্ধ।

দিলেন, আওরঙ্গজেব ও মুরাদকে সম্রাটের নিকট তিন দিনের মধ্যে উপস্থিত করা হবে।

পরের দিন শনিবার শাহজাদা দারার অভিপ্রায় আক্রমণ করা হউক। আবার বিশ্বাসঘাতকদল বলল—অশুভ সময়, কারণ মেঘবর্ষণ মুখর। তার পরের দিন রবিবার—এই দিনে ঈশ্বর আলোক সৃষ্টি করেছিলেন—আবার অপেক্ষা করা হউক। এই তৃতীয় বার। পর পর তিনবার।

এবার নক্ষত্র তার লক্ষ্যে উপনীত—···। শনিবার মধ্যরাত্রির দিকে আওরঙ্গজেব তিনবার কামান ধ্বনি করলেন। উদ্দেশ্য বিশ্বাসঘাতকদের জানিয়ে দেওয়া তিনি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত; বিরাট কামান-শ্রেণী প্রস্তুত। সৈন্যদল ও পশুগুলি বিশ্রাম নিচ্ছিল। দারাও তিনবার কামান ধ্বনি করে প্রত্যুত্তর দিলেন, কিন্তু পরের দিন প্রত্যুষের পূর্ব্বে দুই সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হয় নি।

দারার কামান অবিরাম গোলা বর্ষণ করছিল। বারুদের ধূম্রজালে আকাশের মেঘমণ্ডল ঘনকৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করল। কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করেই আওরঙ্গজেব কামানের গোলার বহু দূরে সৈন্য শিবির স্থাপন করেছিলেন।

আওরঙ্গজেব সামান্য কয়েকবার গোলা নিক্ষেপ করলেন। তারপর আবার তিনটী কামান ধ্বনি অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি দ্বিতীয়বার সঙ্কেত······।

খলিলুল্লাহ খান আর একবার উপদেশ দিল: "যুবরাজ যখন শত্রুর অধিকাংশ কামান দিয়ে ধ্বংস করেছেন; এবার সময় হয়েছে, আপনি অগ্রসর হন, আপনার বিজয় সম্পূর্ণ করুন।" দারার বিশ্বস্ত সেনাপতি রুস্তম খান বল্লেন—"শত্রুকে আক্রমণ করতে দেওয়া হউক। তখন যুবরাজের উপযুক্ত সৈন্য দিয়ে অভ্যর্থনা করা হবে। আমাদের সৈন্যবল বেশী এবং সুযোগ আমাদের দিকেই বেশী।"

কিন্তু খলিলুল্লাহ খানের পরামর্শ গ্রহণ করা হল। রুস্তম খানকে ভীরু কাপুরুষ বলে নিন্দা করা হল। বিজয়ের সম্মান যুবরাজের প্রাপ্য, হাঁ বিজয়ের সম্মান···আর অপেক্ষা করা অসমীচীন।

দারা গোলন্দাজ বাহিনীকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে অশ্বারোহী বাহিনীর সহিত শত্রুকে আক্রমণের আদেশ দিলেন। এই অকস্মাৎ অগ্রসর হওয়ার আদেশে অশিক্ষিত সৈন্যদল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। লৌহকার, কসাই, নরসুন্দর প্রভৃতি অশিক্ষিত সৈন্যদল শত্রুর পলায়নপর রসদ শিবিরে স্বর্ণ, রৌপ্যের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ ক'রল। শত্রুবধ না ক'রে পরস্পর হত্যায় ব্যাপৃত হ'ল।

দারা কিন্তু বীরের মত সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং হস্তদ্বারা প্রত্যেক সৈন্যকে অনুসরণ ক'রবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। কামান ধ্বনি শান্ত হয়ে গেল, দামামার শব্দ পুনরায় আরম্ভ হ'ল। শত্রুর পক্ষ থেকে দু' একটী কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল। হঠাৎ কামান গর্জ্জন এবং গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণে দারার সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত হ'য়ে প'ড়লো। তবু দারা হস্ত উত্তোলন ক'রে আদেশ দিতে লাগলেন।

ছত্রপাল এবং রুস্তম খান দারাকে রক্ষা করবার জন্য ঔরঙ্গজেবের গোলন্দাজ বাহিনীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'লেন এবং শত্রুর পদাতিক ও উষ্ট্রবাহিনীকে পলায়ন ক'রতে বাধ্য করলেন।

আওরঙ্গজেব এই আসন্ন বিপদ ধারণা ক'রতে পারেন নি। তিনি শেখমীরের অধীনে আরও সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। এই শেখমীরই তাঁকে মুক্তা খরিদ না ক'রে সৈন্যসংগ্রহের উপদেশ দিয়েছিল। যুদ্ধ চলতে লাগল। শত্রুগণ পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধে ব্যাপৃত হ'ল। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, শিঙ্গার নিনাদ, তীরবর্ষণ ক্রমাগত চলল। রাজোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ক'রে দারা হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন হ'য়ে সৈন্যদের বীরোচিত কার্য্যের জন্য উৎসাহিত ক'রতে লাগলেন। শত্রুদল প্রায় বিপর্য্যস্ত হ'য়ে প'ড়ল।

আগ্রা সহরে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক লোক জেনে গেল যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। বেলা শেষে একজন ফিরিঙ্গী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলো। তার অশ্ব নিজের গৃহের পার্শ্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হ'য়েছিল। এই ফিরিঙ্গী দারার রসদ শিবির লুণ্ঠন ক'রেছিল। সে চারিদিকে প্রচার করে দিল যে সম্রাটের সৈন্য যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। তারপর আমার মনে হ'ল যেন সমস্ত জিনিষ অন্ধকারময় হ'য়ে এসেছে। নক্ষত্রের গতি স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। কিছুকাল পর সংবাদবাহক ছুটে এসে আমার বর্ণিত ঘটনাগুলির একটী অসংলগ্ন বিবরণ দিয়ে গেল। সামুগড়ের যুদ্ধের চরম মুহূর্ত্তে এই লোকটী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে এসেছিল। তার আশা ছিল যে সে স্বয়ং সম্রাটকে শাহ্ বুলন্দ একবালের(১) জয়ের সংবাদ দেবে।

আমি কিন্তু কোন জনশ্রুতিতেই বিশ্বাস করিনি। গত কয়েক দিনের জন্য আমার পিতার বয়স কয়েক বৎসর বেড়ে গেছে। আমি আমার পিতাকে সান্ত্বনা বা উৎসাহ দেবার মত কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না। আমি প্রাসাদ শিখরে উঠে দিনের আলোয় সমস্ত প্রান্তর নিরীক্ষণ ক'রতে লাগলাম। তখন সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর। একটা অমঙ্গলের ছায়ার মত রাত্রির শীতল বাতাস নক্ষত্রের দিকে একটা কালো ঘন ধূলির মেঘ উড়িয়ে দিল।

অন্ধকারে আমি বিশেষ কিছু দেখতে পাই নি। কিন্তু সবই শুনতে পেয়েছিলাম। আমি শুনলাম, দলের পর দল অশ্ব পদধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে গেল। প্রাসাদের দিকে কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। কোন লোক এদিকে কেন আসে না?

রাত্রি গভীর হ'তে লাগল। এক প্রহর শেষ হ'য়ে গেছে। আমি শুনতে পেলাম—ঝঞ্ঝার প্রাক্কালে প্রভঞ্জনের মত এক অশ্বারোহীবাহিনী অগ্রসর হ'য়ে আসছে।

ক্রমে শব্দ নিকটস্থ হ'লে আমি বুঝতে পারলাম অশ্বখুরের শব্দ কত অসংলগ্ন! এই সমস্ত অশ্ব কি আহত হ'য়েছিল? আলো নেই কেন? কিন্তু এইবার মনে হ'ল অনেক অশ্বারোহী দুর্গদ্বারে এসে থেমেছে।

দারা এসেছে, কিন্তু প্রবেশ তোরণ অতিক্রম করেন নি। পরিশ্রান্ত ভাগ্যহত দারা দুর্গে প্রবেশ করেন নি। তাঁর ভয় হ'ল যদি শত্রু এসে তাঁকে দুর্গে আবদ্ধ ক'রে রাখে। সে দুর্গের মধ্যে পিতার কিংবা আমার সম্মুখে সেই অবস্থায় আসতে সাহস করছিল না। কিন্তু নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করার পূর্ব্বে আমার কাছে একটী সংবাদ পাঠিয়েছিল। (ক্রমশঃ)

(১) "বুলন্দ্ একবাল" ভাগ্যবান, দারার উপাধি, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস দারার মত দুর্ভাগা।

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

:বই বলেছি রাজগৃহে তথাগত তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের প্রায় তিরিশটি ঃসর অতিবাহিত করেছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবেষ্টনে রমণীয় ই পার্বত্য প্রদেশটি তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। তিনি রাজগৃহকে ন্তরের সঙ্গে ভালবেসে ফেলেছিলেন। এর গিরি, নদী, উপত্যকা, ান্তর, শস্যক্ষেত্র, অরণ্যানী ও সচ্ছ্ সলিলা হ্রদ, এর ফুলফল আম্রকুঞ্জ, াণুবন সবই বুদ্ধদেবের একান্ত প্রিয় ছিল। মহাপরিনির্বাণসূত্রে খো যায় বুদ্ধদেব তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দকে বলছেন—"মধুময় এই াজগৃহ, মধুময় গৃধ্রকুট, মধুময় গৌতম ন্যগ্রোধ, মধুময় চৌরপ্রপাত, ভার পর্বত বক্ষে সপ্তপর্ণী গুহা, মধুময় সেই সপ্তপর্ণী, মধুময় এই াজগৃহের ঋষিগিরি অঞ্চলের কলাশিলা, মধুময় এর জেতবনের সর্প ণ্ডিক প্রাগভার, মধু তপোদারাম, মধুময় এর বেণুবনের করণ্ডকময় নবাপ, মধুময় হেথা জীবকের আম্রকুঞ্জ, মধুময় খানে মর্দকুক্ষীস্থ মৃগদাব, এর সব কিছুই মধুময়!

এইখানেই তাই ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনের হু উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটেছিল, বহু উপদেশ ও বাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে বিনির্গত হয়েছিল এইখানেই। তিনি যদিও দীর্ঘদিন একস্থানে ন্দী হয়ে থাকাটা একেবারেই পছন্দ করতেন া, তবু রাজগৃহ ছেড়েও যেতে পারতেন না। াজগৃহেরই আশে পাশে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তিনি নব নব পরিবেশের মধ্যে বাস করে নিজ অবস্থানের বৈচিত্র্য সাধন করতেন। রাজগৃহে তাঁকে ধরে রাখার কৃতিত্ব যদি কেউ দাবী করতে পারেন তবে সে পারবেন একমাত্র তদানীন্তন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মগধের মহারাজ বিম্বিসার!

"—নৃপতি বিম্বিসার,
নমিয়া বুদ্ধে
মাগিয়া লইল
পাদনখকণা তাঁর!"

খৃঃ পূর্ব ৫৪৩-৪৯১ শতকে তিনি মগধের সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন। সেকালের 'মগধ' বলতে বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ ভূভাগ বোঝায়। এই সময়ে উত্তর ভারতে আরও তিনজন প্রসিদ্ধ নৃপতি রাজত্ব করতেন। তাঁরা হলেন স্বনামধন্য কোশলনৃপতি প্রসেনজিৎ, বৎসরাজ উদয়ন এবং অবন্তীপতি মহারাজ প্রদ্যোৎ। বিম্বিসারের ন্যায় এঁরাও তিনজনে এদেশের কাব্যে ও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছেন। কুলে শীলে বংশ-গৌরবে এঁদের চেয়ে প্রধান না হলেও শক্তি-সামর্থ্যে, বীর্য্যে ও পরাক্রমে বিম্বিসার যে এঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তাঁর উপর্যুপরি দিগ্বিজয় ও মগধ সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তারের দ্বারা। এই জয়যাত্রা যা বিম্বিসার শুরু করেছিলেন তা সম্পূর্ণ করেছিলেন তাঁর পৌত্র সম্রাট অশোক! উত্তরকালে বিম্বিসারের বংশধর এই সম্রাট অশোকই সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরেও তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে জগতের ইতিহাসে অমরত্ব অর্জন করে গেছেন। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের যে প্রচার ভারতে ও ভারতের বাইরে দেখতে পাই, তা এই সম্রাট অশোকের কীর্ত্তি। অবশ্য রাজগৃহের যা কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও বৌদ্ধ সংসর্গের ঐশ্বর্য্য সে ঐ

গৃধ্রকূট পর্বত শৃঙ্গ

নৃপতি বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রুর দান। অজাতশত্রু প্রথমটা বৌদ্ধ-বিদ্বেষী দেবদত্তের কুটীল প্রভাবে পড়ে পিতাকে বন্দী করে নিজে রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন এবং সর্বাগ্রে রাজপ্রাসাদ থেকে বৌদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দিয়ে ক্রমে রাজধানী ও রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মাচরণের প্রচণ্ড বিরোধিতা ক'রেছিলেন। কিন্তু, পরে ইনিও বুদ্ধদেবের একজন অনুরক্ত ভক্ত হ'য়ে ওঠেন। বুদ্ধদেবের দেহরক্ষার পর তাঁর ভস্মাবশেষ কতকাংশ যা তাঁর ভাগে পেয়েছিলেন সংগ্রহ করে রাজগৃহে নিয়ে এসেছিলেন এই মহারাজ অজাতশত্রু এবং একটি বৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করিয়ে তার মধ্যে সেই ভস্মাবশেষ স্থাপন করেছিলেন। বুদ্ধদেবের স্বর্গারোহণের কিছুদিন পরেই তাঁর শ্রমণ শিষ্যগণ একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই

সম্মেলনে তাঁরা বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী সংগ্রহ করে ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করেন। এইভাবেই বৌদ্ধ 'ত্রিপিটক' গ্রন্থ রচিত হ'য়েছিল! এই বৌদ্ধ শ্রমণদের সভানুষ্ঠানের জন্য মহারাজ অজাতশত্রুই সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে একটি বিশাল মণ্ডপ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। অজাতশত্রু গত হবার পর তাঁর পুত্র উদয়ন রাজগৃহ পরিত্যাগ ক'রে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময় থেকেই রাজগৃহের প্রাধান্য কমে যেতে শুরু হয়। অবশ্য মধ্যে একবার মগধের মহারাজ শিশুনাগ খৃঃ পূঃ ৪১১-৩৯৩ খৃঃ অব্দে পুনরায় রাজগৃহে

গৃধ্রকূট পর্বতের উপর যে বেদীতে বুদ্ধদেব বসতেন

গৃধ্রকূট পর্বতের যে গুহায় 'আনন্দ' তপস্যা করতেন

তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন কিন্তু তা' স্থায়ী হয়নি। সম্ভবতঃ পাটলিপুত্রে নদীপথের সুবিধা থাকায় পরবর্তী রাজারা আবার রাজগৃহ ছেড়ে পাটলিপুত্রে চলে যান। ফলে, রাজগৃহ ক্রমে পরিত্যক্ত ও জঙ্গলে পরিণত হয়। অবশ্য খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকেও অর্থাৎ মহারাজ অশোকের রাজত্বকালেও রাজগৃহের বোলবোলাও বিশেষ কমেনি। কেন না মহারাজ অশোক এখানে একটি বৌদ্ধ স্তূপ ও তাঁর হস্তীশীর্ষ অশোক স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

আমরা রাজগৃহে এলুম বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি! এসে কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ দেখতে পাচ্ছি শুধু লর্ড কর্জনের **Ancient monument Preservation Act**এর কৃপায়। নচেৎ যেমন বহু জিনিস ইতিপূর্বে ধ্বংস হ'য়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে বিস্মৃতির অতলগর্ভে তলিয়ে গেছে, তেমনি এসবও যেতো, যদি না ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ যক্ষের ন্যায় আগলে রাখতো এই সব ভাঙা-চোরা ভারতীয় স্থাপত্য—যা আমাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করছে। আমাদের এখানে আসবার দেড়হাজার বছর আগে চীনের পরিব্রাজক ফা-হিয়াণ রাজগৃহ পরিদর্শন করে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের পাঠক পাঠিকাদের কৌতুহল নিবারণের জন্য এখানে সে অংশটুকু উদ্ধৃত করা হচ্ছে; মনে রাখতে হবে যে ফা-হিয়াণ আসবার সময় মগধে রাজত্ব করছিলেন গুপ্ত বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু তিনি এগুলি রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করেন নি বা করা প্রয়োজনও মনে করেন নি।

ফা-হিয়াণ লিখে রেখে গেছেন :—'অজাতশত্রু এই নগর অর্থাৎ 'রাজগৃহ' নির্মাণ করেন। এখানে এক জোড়া সঙ্ঘারাম আছে। নগরের পশ্চিম দ্বার থেকে তিনশো' পা গেলেই একটি বিশাল 'স্তূপ' দেখতে পাওয়া যায়! (কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে রাজা অজাতশত্রু নিজ অংশে বুদ্ধদেবের যে সমস্ত স্মৃতি-চিহ্ন পেয়েছিলেন সেগুলি সংরক্ষণের জন্য এই স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটি ছিল যথেষ্ট উঁচু) নগরের দক্ষিণ দিকে ৪ লী গিয়ে পঞ্চগিরি পরিবেষ্টিত উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। পাহাড়গুলি নগর-প্রাচীরের মতো স্থানটিকে ঘিরে আছে। এইটি বিম্বিসারের গড়া পুরাতন নগর। পূর্ব ও পশ্চিমে এটি ৫।৬ লী বিস্তৃত এবং উত্তর দক্ষিণে ৭।৮ লী হবে। এইখানেই সারিপুত্ত ও মৌদ্গলায়ণ প্রথমে অশ্বজিতের সাক্ষাৎ পান। এখানে নিগ্রন্থ এক অগ্নিকুণ্ড করে এবং বুদ্ধদেবকে বিষাক্ত খাদ্যখেতে দেয়। এইখানেই মহারাজা অজাতশত্রু নালা হাতীকে সুরাপানে মাতাল করে বুদ্ধদেবকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেন। (মৎপ্রণীত 'গৌতমের গত জন্ম' বইখানি দেখুন) নগরের উত্তর পশ্চিমের এক বক্র উপত্যকায় 'রাজবৈদ্য' জীবক অম্বপালির (বৌদ্ধযুগের শ্রেষ্ঠ নর্তকী) উদ্যানে এক 'বিহার' নির্মাণ করিয়ে সশিষ্য বুদ্ধদেবকে সেই ধর্মপ্রাণা নারীর ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এখনও এখানে তার ধ্বংসাবশেষ আছে, কিন্তু নগরের ভিতর সবই চূর্ণ বিচূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন—অধিবাসীরা কেউ নেই। আমি

এই উপত্যকার দক্ষিণ পূর্ব পর্বতে ১৫ লী পর্য্যন্ত উঠেই গৃধ্রকূটে উপস্থিত হলুম। গৃধ্রকূটের চূড়া থেকে মাত্র ৩ লী দূরে একটি দক্ষিণমুখী পর্বত গুহা রয়েছে। এখানে ভগবান তথাগত সাধনা করতেন। এরই ৩০ পা উত্তর পশ্চিমে আর একটি গুহায় আনন্দ সাধনা করতেন। ধর্মের শত্রু ও মানবের শত্রু 'মার' গৃধ্ররূপ ধারণ করে নাকি এই গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আনন্দকে ভয় দেখিয়েছিল। ভগবান বুদ্ধদেব আনন্দের সেই বিপদের সময় স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতাবলে পাহাড় ভেদ করে আপন হস্ত প্রসারিত করে দিয়ে আনন্দকে স্পর্শ করেন এবং তার কাঁধ চাপড়ে তাকে সাহস দেন। পক্ষীর এবং হস্তের প্রস্তরীভূত চিহ্ন এখনও এ পর্বতে দেখতে পাওয়া যায়। এই জন্যই এই পর্বতটির গৃধ্রকূট নাম হয়েছে। এখানে শতাধিক পরিত্যক্ত গুহা রয়েছে—একদা যেখানে বৌদ্ধ অর্হত্‌গণ ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এইখানেই একদিন শ্রীবুদ্ধদেব যখন আপন গুহার সম্মুখে পদচারণা করছিলেন, সেই সময় দেবদত্ত তাঁকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে উত্তর দিকের উচ্চ স্থান থেকে একখানি প্রকাণ্ড পাথর গড়িয়ে নীচেয় তাঁর উপর নিক্ষেপ করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বুদ্ধদেবের প্রাণ রক্ষা পায়, কিন্তু বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তিনি অত্যন্ত আঘাত পান। (মৎপ্রণীত গৌতমের, গত জন্ম' বইখানি দেখুন)

প্রাচীন নগরীর উত্তরে ৩০০ পা গেলে রাস্তার পশ্চিমে ছিল কালন্দ বেণুবনবিহার। এটির অস্তিত্ব এখনও আছে দেখলুম। শ্রমণগণ এখানে বাস করছেন। তাঁরাই এস্থান পরিষ্কার রেখেছেন। পুষ্পতরু ও ফলমূলের গাছগুলিতে জল দিচ্ছেন। এই স্থানের ২।৩ লী উত্তরে শ্মশানভূমি। দক্ষিণের পাহাড়ের পাশে ৩০০ পা পশ্চিম মুখে গেলে একটি প্রস্তর গুহা দেখা যাবে। এইটিই সেই প্রসিদ্ধ 'পিপ্পল গুহা' যেখানে বুদ্ধদেব প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ধ্যানসমাহিত হ'তেন। পাহাড়ের আরও উত্তরে গিয়ে, সেখান থেকে ৫।৬ লী পশ্চিমে আর একটি প্রশস্ত প্রস্তর গুহা আছে। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর প্রায় পাঁচশত অর্হৎ এখানে সমবেত হয়ে বহু পরিশ্রমে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সংকলন করেছিলেন।"

নূতন রাজগৃহের ধ্বংসাবশিষ্ট অজাতশত্রুগড়ের দক্ষিণ তোরণদ্বার

ফা-হিয়াণের দেড় হাজার বছর পরে আমরা এখানে এসে যে আরও অনেক কিছুই দেখতে পাইনি একথা বলাই বাহুল্য। কারণ, ফা-হিয়াণের পরিক্রমার মাত্র একশ-দেড়শ বৎসর পরে প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিয়ুয়েন সাঙ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তখন সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ভারত শাসন করতেন। (খৃঃ অব্দ ৬০৫-৬৪৬, অর্থাৎ, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে) হিয়ুয়েন সাঙের বর্ণনায় পাই তিনি রাজগৃহকে 'কুশাগ্রপুর' বলেছেন। 'সুরভি-স্নিগ্ধ তৃণের নগর!' তাঁর মতে এই নগর ছিল তখন পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত, কিন্তু উত্তর দক্ষিণে স্বল্প। তিনি বর্ণনা দিয়ে গেছেন—"এই নগরের বেষ্টনী প্রায় ১৮০ লী। এর মধ্যস্থ প্রাচীন নগরের ভগ্ন প্রাকারের বেষ্টনী প্রায় ৩০ লী। পথের দুধারে সারি সারি সুগন্ধি কলকে ফুলের বৃক্ষরাজি বসন্তকালে স্থানটিকে স্বর্ণ বর্ণে আলো ক'রে তোলে। নগর দ্বারের বাহিরে একটি স্তূপ রয়েছে। এইখানে দেবদত্ত অজাতশত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তথাগতকে মারবার জন্য পথে মত্ত হস্তী ছেড়ে দিয়েছিল। এইস্থানের উত্তর পূর্বে আরও একটি স্তূপ আছে যেখানে সারিপুত্র ভিক্ষু অশ্বজিতের নিকট ধর্মোপদেশ লাভ করে অর্হৎ হয়েছিলেন। এরই কিছু দূর 'শ্রীগুপ্ত' গর্তের মধ্যে আগুন রেখে আর বিষ মেশানো খাদ্য দিয়ে বুদ্ধদেবকে হত্যা করবার চেষ্টা করেন। কালন্দ বেণুবন ও করণ্ডক নিবাপের কথাও হিয়ুয়েন সাঙ বলেছেন। তাঁর বর্ণনায় আছে—"বেণুবন থেকে আরও ৫।৬ লী দক্ষিণ পশ্চিমে এক প্রকাণ্ড গুহা ছিল, সেখানে মহাকাশ্যপাদি সহস্র অর্হৎ বুদ্ধদেবের লোকান্তরের পর একত্র সমবেত হ'য়ে "মহাসজ্ঘিকনিকায়" নামে বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

নূতন রাজগৃহ সম্বন্ধে হিয়ুয়েন সাঙ বলেছেন "নগরের বহিঃপ্রাকার নষ্ট হয়ে গেছে। ভিতরের প্রকাণ্ড প্রাকারের ভিত্তিমূল আজও স্পষ্ট বর্ত্তমান। এর বেষ্টনী প্রায় ২০ লী হবে।" অর্থাৎ প্রায় ৪ মাইল। (প্রত্যেক ৫ লীতে প্রায় একমাইল হয়।)

হিয়ুয়েন সাঙের রাজগৃহ পরিক্রমার ১৩০০ বছর পরে আমরা এখানে এসে পুরাতন বা নূতন কোনও শহরের কোনও অস্তিত্বই দেখতে পেলুম না, দেখতে পেলুম শুধু 'অজাতশত্রুগড়ের' ভিত্তিমূলের

বিরাট ধ্বংসাবশেষ। আরও একটা জিনিস আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে এখন যে স্থানটি 'রাজগীর' নামে খ্যাত, রাজগৃহের সঙ্গে তার কোনও সাদৃশ্য নেই। এটি প্রাচীন 'রাজগৃহ' ত' নয়ই, তবে অজাতশত্রুর প্রতিষ্ঠিত নব-রাজগৃহ বা তার উপকণ্ঠস্থ জনপদ হতে পারে, কারণ বর্তমান রাজগীর ষ্টেশনের একেবারে ধার থেকেই প্রায় অজাতশত্রুগড়ের প্রস্তর ভিত্তিমূল আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ, পঞ্চ পর্বতের দুর্ভেদ্য আবেষ্টনের মধ্যে বোধকরি হাঁফিয়ে উঠে অজাতশত্রু পাহাড় সীমানার বাইরে বেরিয়ে এসে সমতল ভূমির উপর তাঁর নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

আমরা উঠেছিলুম ঠিক রাজগীর ষ্টেশনের পূর্বদিকে 'সপ্তপর্ণী' নামে একটি বাংলোয়। থাকবার মতো ভাল বাড়ী ওখানে বেশী নেই। মোটে ৭৷৮ খানি আছে। তার মধ্যে 'সপ্তপর্ণীর' খ্যাতি শুনলুম সব চেয়ে ভাল। ১৯নং কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর বাড়ী
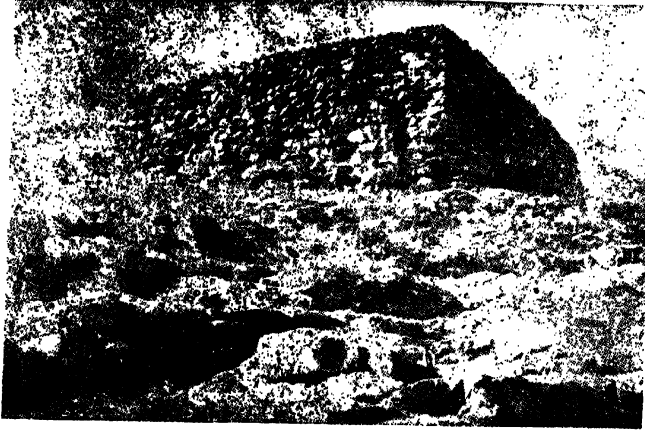
পিপ্পল পর্বতস্থ পাষাণ সৌধ

এই "সপ্তপর্ণী"। নামটি এখানকার এক ঐতিহাসিক পবিত্র স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত।

সপরিবারে রাজগীরে এসেছি আমরা। সঙ্গে স্ত্রী, কন্যা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, 'রাম' নামে একটি কম্বাইণ্ড-হ্যান্ড্, অর্থাৎ একাধারে ঠাকুর-চাকর এবং দিদির পুরাতন ঝী 'বিনি'—যিনি বর্ত্তমান যুগের পরিচারিকা মহলে একটি মহার্ঘ রত্ন বিশেষ, কারণ আজকের এই সাম্যবাদের দিনে এ ধরণের ঝী দ্রুত লোপ পেয়ে আসছে। আরও একটি প্রাণী আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল, সে হ'ল নবনীতার ককার-স্প্যানিয়েল—'দুষ্টু!'

হাওড়া থেকে বক্তিয়ারপুর ৩১০ মাইল পথ। রাত্রি ৯টার পর দিল্লী একস্‌প্রেস ছেড়ে পরদিন ভোর সাড়ে ছ'টায় বক্তিয়ারপুরে এসে নামলুম। বক্তিয়ারপুরে রাজগীর যাবার গাড়ী যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মার্টিন কোম্পানীর বক্তিয়ারপুর বিহার লাইট রেলওয়ের ছোট গাড়ী। বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগীর মাত্র ৩০ মাইল পথ। শুনলুম মোটর বাসেও যাওয়া যায়। আগের দিনে যখন এই ছোট রেল হয়নি তখন যাত্রীরা এখান থেকে গরুর গাড়ী চড়েই রওনা হ'তেন। আমাদের রাজগীর পর্যন্ত রেলের টিকিট কেনা ছিল। কাজেই একখানি খালি সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট বেছে নিয়ে উঠে পড়া গেল। আর সমস্ত লাগেজ বিনি ও রামের জিম্মায় পাশের এক থার্ড ক্লাসে ঠেসে দেওয়া গেল। ফাঁকা গাড়ী পেয়ে বেশ আরামে গুছিয়ে বসেছি; এমন সময় জুঁই ফুলের মতো ফুটফুটে সুন্দর তিনটি শিশু নিয়ে একটি গৌরবর্ণ প্রিয় দর্শন যুবক দুটি তরুণী বধূকে নিয়ে আমাদের গাড়ীতে এসে উঠলেন। দেখে বেশ ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব'লেই মনে হ'ল।

গাড়ী ছাড়বে শুনলুম বেলা আটটায়। কারণ, রাজগীর থেকে সকাল ৬টায় যে গাড়ী ছেড়েচে সে এসে না পৌছলে এ যাবে না, যে হেতু—পথের মাঝে নাকি সিংগল লাইনের হাঙ্গামা আছে। প্রিয়দর্শন যুবকটির সঙ্গে আলাপ শুরু করা গেল। তাঁর নাম কেদারবাবু। গ্রেটইস্টার্ণ হোটেলের একজন পরিচালক ইনি। রাজগীর চলেছেন। সেথানকার 'সর্ব রোগ-হর' উষ্ণ প্রস্রবনের জলপান করিয়ে ভগ্নীর ডিস্‌পেপশিয়া আরোগ্য করবার চেষ্টায় মাসখানেক সেখানে থাকবেন। দুটি যাত্রিণী বধূর মধ্যে একজন তাঁর ভগ্নী এবং অন্যজন তাঁর পত্নী! আমাদের পরিচয় পেয়ে তিনি ভগ্নী ও পত্নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁরা খুব মিশুক! গল্প করতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে।

কেদারবাবুর ভগ্নীপতি কালিবাবু খাবার জল, দুধ পাঁওরুটি চা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে নিয়ে গাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। এঁর রং গৌরবর্ণ নয় বটে, কিন্তু, মনটা একেবারে সাদা। ফূর্তিবাজ মানুষ। চখে মুখে একটা সহজ ভদ্রতার লাবণ্য ভাসছে। ভাল লেগে গেল এঁদের শালাভগ্নীপতি' দুটিকেই। আমরা স্টেশনের পূবে লাইনের ধারেই 'সপ্তপর্ণী' বাড়ীতে থাকবো জেনে ওঁরা বললেন যে স্টেশনের পশ্চিম ধারে পোস্ট অফিসের পিছনে রেখাব-চাঁদবাবুর যে দোতলা লাল বাংলো আছে ওঁরা সেখানে উঠবেন। 'সপ্তপর্ণী' বা 'লাল বাংলো' কোনটাই আমরা কেউ চিনিনি, তবে অনুমানে বুঝতে পারলুম ভাগ্যদেবতা উভয় পরিবারকে হয়ত কাছাকাছি ঠাঁই দিয়েছেন।

(ক্রমশঃ)
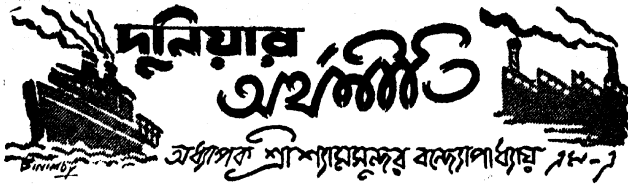
ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নতিসাধন

আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ভারতে এখনও প্রসার লাভ করে নাই এবং করে নাই বলিয়াই ভারতের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী শতকরা ৮৫ জন এখনও নিরুপায় হইয়া গ্রাম্য মহাজনদের কবলে গিয়া পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩,০০০, ব্রিটেনে ৫,০০০ এবং জাপানে ৯,৫০০ অধিবাসীর হিসাবে যখন একটি করিয়া ব্যাঙ্ক আছে, তখন ভারতে আছে ১,৩৩,০০০ জন পিছু একটি করিয়া ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের মধ্যে আবার ছোট বড় সর্বশ্রেণীর ব্যাঙ্কই আছে। অবশ্য ভারতে যে গুলিকে আমরা বৃহদাকার ব্যাঙ্ক বলি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বা ব্রিটেনের বৃহদাকার ব্যাঙ্কের সহিত তাহাদের তুলনাই চলে না। ব্রিটেন আমেরিকার হিসাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে, তবু ব্রিটেনের পাঁচটি প্রধান ব্যাঙ্কের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের যে আমানত, তাহা ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের আমানতের (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ২৮০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা) তিনগুণের মত।

যাহা হউক, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন যখন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, তখন এই বিপুল সম্ভাবনাময় দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অগ্রগতির ভিত্তি স্বরূপ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ভারতে এখন যেটুকু জাতীয় ব্যাঙ্কিং কারবার চলিতেছে, তাহার সবটাই চলিতেছে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের টাকা জমা রাখে সামান্য সুদের প্রতিশ্রুতিতে এবং সেই টাকা আর একটু বেশী সুদের হিসাবে সরকারী ঋণ পত্রে বা নির্ভরযোগ্য স্বল্প মেয়াদী ঋণের হিসাবে লগ্নী করে; মোটের উপর আমানতের টাকা নগদ বা সহজে নগদে পরিবর্ত্তন যোগ্য অবস্থায় থাকিবে না, এমন কোন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় (ইহার বাস্তব মূল্য যাহাই হউক) ব্যাঙ্ক সহজে যাইতে চায় না। অবশ্য ব্যাঙ্কের এই রক্ষণশীলতা এ দেশের আমানতকারীদের ভাব-প্রবণ মনোবৃত্তিরই একটা অনিবার্য্য ফল। এখানে আমানতকারীরা বাজে গুজবে হঠাৎ 'রাণ' ঘটাইয়া অনেক ভাল এবং বড় ব্যাঙ্কেরও পতন ঘটায়।

কিন্তু এই প্রকার ব্যাঙ্ক কারবারে সত্যকার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করা যায় না। ভারতের মত পশ্চাৎপদ দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য জাতীয় শিল্প-ব্যাঙ্ক বা ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক এবং একচেঞ্জ বা বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। জনসাধারণের মধ্যে ভালভাবে প্রচারকার্য্য চালানো হইলে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির মর্য্যাদা অনুধাবন করিয়া উদারভাবে ঋণদানে প্রস্তুত থাকিলে ভারতের বৃহদাকার ব্যাঙ্কগুলিই এইরূপ কাজ আরম্ভ করিতে পারে। বাস্তবিক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ন্যায় প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় ব্যাঙ্ক ১৩২ কোটি টাকার বেশী আমানত (১৯৪৮) লইয়া শিল্প-ব্যাঙ্ক হিসাবে যদি জাতীয় আর্থিক সমৃদ্ধি সাধনে অগ্রসর না হয়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং সমগ্রভাবে এতদিন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলিতে-ছিল। আগেকার পিপলস্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অফ সিমলা, ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বড় বড় ব্যাঙ্কের পতনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ১৯৪৬-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলায় যে উপর্য্যুপরি ব্যাঙ্ক সঙ্কট ঘটিয়া গেল, তজ্জন্য আনাড়ী বা দুর্নীতিমূলক ব্যাঙ্ক পরিচালনা এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের জনস্বার্থ উপেক্ষার দুঃসাহস, দুই-ই তুল্যাংশে দায়ী। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের টাকা জমা রাখে, এই টাকার মূল্য শুধু টাকার হিসাবেই হয় না। যাঁহারা ব্যাঙ্ক পরিচালনা করেন, সাধারণের অর্থ নাড়াচাড়া করিবার দায়িত্ব গ্রহণের সময় নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও তাঁহাদের সচেতন হওয়া উচিত। এই সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষের বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত ব্যাঙ্কগুলি ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ কারবার চালাইতেছে কি না, সে সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখা। বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক সঙ্কটে উভয় দিক হইতেই কর্তব্য-ভ্রষ্টতা দেখা গিয়াছে বলিয়া অসহায় দেশবাসীর কষ্টার্জ্জিত বহু টাকা জল হইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত ব্যাঙ্ক সঙ্কটে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত যে ছয়টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে, শুধু তাহাদেরই আমানতের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা।

আশার কথা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে তাহার কার্য্যধারা সম্প্রসারিত করিয়াছে এবং যে সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত নয়, সে গুলির পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতেছে। তার চেয়ে বড় কথা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখন অধিকতর সহানুভূতি ও দ্রুততার সহিত বিপন্ন ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। এ ছাড়া সমগ্র ভাবে ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নতির জন্য দীর্ঘকাল হইতে একটি বলিষ্ঠ ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্ত্তনের জন্য সরকারের উপর যে চাপ দেওয়া হইতেছিল, তাহা এতদিনে কার্য্যকরী হইয়াছে এবং গত ১৬ই মার্চ্চ হইতে একটি ব্যাপক ব্যাঙ্ক আইন ভারতে চালু হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক আইনে ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালাইতে হইলে কত টাকা নিম্নতম মূলধন লইয়া কাজে নামা যাইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে (২নং ধারা) এবং ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ যাহাতে নিজ স্বার্থে বা খেয়াল ও খুসীমত জনসাধারণের আমানতী টাকা লইয়া ছিনিমিনি না খেলিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা (১৯ ও ২০নং ধারা) হইয়াছে। যাহাতে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কার্য্যাদির

উপর নজর রাখার সুবিধা থাকে, তজ্জন্য ব্যাঙ্ক আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন ব্যাঙ্ককে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কিং কারবার চালাইতে দেওয়া হইবে না বলা হইয়াছে (২১নং ধারা)।

এ দেশে ব্যাপক একটি ব্যাঙ্ক আইনের সত্যই প্রয়োজন ছিল এবং সেই প্রয়োজনের বিবেচনায় একটু অসম্পূর্ণ হইলেও আলোচ্য ব্যাঙ্ক আইন ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নতির অনুরূপ হইবে বলিয়া মনে হয়। আমানতের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যাঙ্ক আইনে কিছুটা ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য দেশের জনসাধারণের মনে যতদিন ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীলতা আর একটু না বাড়িবে, ততদিন ভারতীয় ব্যাঙ্কের বিপদ একেবারে কাটিবে না। এরূপ অবস্থা আসিতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্ক আমানতের নিরাপত্তার জন্য ভারতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে আমানত বীমা করিবার প্রতিষ্ঠান বা ডিপজিট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন গঠনের চেষ্টা করিলে অনেক সুফল আশা করা যায়।

এই সব ব্যবস্থা ছাড়াও ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নতি আর একটি জিনিষের উপর নির্ভর করে এবং তাহা হইতেছে ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের কর্ম্মদক্ষতা বৃদ্ধি। এদিক হইতে ভারতে কার্য্যরত বিদেশী ব্যাঙ্ক গুলির সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির তুলনা করিলে হতাশ হইতে হয়। কি চেক ক্যাশ করার ব্যাপারে, কি টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারে, কি প্রশ্ন থাকিলে উত্তর লাভের সময়, প্রায় ক্ষেত্রেই বাহিরের লোককে ব্যাঙ্ক ঘরে শুষ্ক হইতে দেখা যায়। এই সব বাহিরের লোকই অথচ ব্যাঙ্কের প্রাণ এবং ইহাদের সন্তুষ্ট রাখার উপর ব্যাঙ্কের আত্মরক্ষা নির্ভর করে। এইরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ঘটিবার প্রধান কারণ ভারতীয় ব্যাঙ্কে যেসব কর্ম্মচারী থাকেন, আপন আপন কঠিন কর্ত্তব্য পালনের উপযোগী শিক্ষা না লইয়াই অধিকংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা ব্যাঙ্কের চেয়ারে আসিয়া বসেন। একবার বসিতে পাইলে তো কথাই নাই, এখন ট্রেড ইউনিয়নের যুগ, প্রতিষ্ঠানের উন্নতির সহিত নিজেদের উন্নতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কটুকু বেমালুম ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা নিজেদের ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী হইবার নিম্নতম যোগ্যতাটুকু অর্জ্জন করিবার প্রয়োজন আর অনুভব করেন না; তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা এবং চেষ্টা চলিয়া যায় ইউনিয়নের শক্তিবৃদ্ধি বা নিজেদের আর্থিক উন্নতিসাধনের দিকে। এই অভিযোগ নূতন কর্ম্মচারীদের সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রয়োজন। ভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের বন্ধু শ্রী কে পি ঠাকুর ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং জার্ণালের জুন সংখ্যায় একটি চমৎকার প্রবন্ধ (**Service Efficiency in Indian Banks—Indian Banking Journal, June, 1949**) লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের পড়িয়া দেখা উচিত। শ্রীযুক্ত ঠাকুর এই প্রবন্ধে বিলাতের মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক, নর্থ অফ স্কটল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক বা লয়েডস্ ব্যাঙ্ক ষ্টাফ ট্রেনিং কলেজের মত ভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় খোলার কথা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য এভাবে চেয়ারে বসিবার আগে কর্ম্মচারীরা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে কাজ-কারবারের অনেক সুবিধা হইবে।*

ভারতের জনস্বাস্থ্য

ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য অত্যন্ত শোচনীয় এবং স্বাস্থ্যের এই শোচনীয়তার সহিত ভারতবাসীর আর্থিক দুরবস্থাও বিজড়িত। পরাধীনতার যুগে বরাবর জনস্বাস্থ্যের অবনতিকে আর্থিক অবস্থা হইতে পৃথক করিয়া দেখা হইয়াছে, এখন এই সমস্যা যুক্তভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। শুধু অর্থাভাব বা পুষ্টিহীনতার জন্যই ভারতবাসী হৃতস্বাস্থ্য নয়। শিক্ষার প্রচণ্ড অভাবও তাহাদের স্বাস্থ্যবোধের বিকাশ হইতে দেয় নাই। দেহ সুস্থ থাকিলে তবেই মন সুস্থ থাকে এবং মন সুস্থ থাকিলে কর্ম্মোৎসাহ জন্মায়। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য হইতে যেমন অস্বাস্থ্যের উৎপত্তি তেমনি অস্বাস্থ্য হইতে দারিদ্র্যের উদ্ভব।

ভারতে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, জ্বর, আমাশয় ও উদরাময়, শ্বাস রোগ ইত্যাদি নানাপ্রকার রোগে বৎসরে ৬২ লক্ষের মত লোক মারা যায়। ইহার মধ্যে কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি পেটের রোগে মারা যায় ৫ লক্ষের বেশী লোক। এই সব রোগ কিছুটা অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার জন্য হয় সন্দেহ নাই, তবে কিছুটা অসাবধানতার জন্য সামান্য কারণে হয়। আর রোগ যে কারণেই হউক, এই সব রোগের আধুনিক যেসব চিকিৎসা ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা খুব কম ক্ষেত্রেই আছে। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে এই আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা সহর অঞ্চল ছাড়িয়া গ্রামে প্রবেশের পথ পায় নাই। এই সব রোগ কিন্তু গ্রামেই বেশী হয়, কাজেই চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রামে না পৌছাইবার অর্থ ভারতবর্ষের এই চিকিৎসাব্যবস্থার সুবিধা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়া। প্রতি হাজার ভারতবাসীর হিসাবে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা মাত্র ০·২৪ (ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭·১৪ ও ১০·৪৮); ইহা হইতেই ভারতের গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসাব্যবস্থার অপ্রাচুর্য্য উপলব্ধি করা যাইবে। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের স্বাস্থ্যসচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর বলেন যে ভারতে যখন প্রয়োজন ২০ লক্ষ

---

* আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এইরূপ একটি নিজস্ব ষ্টাফ ট্রেনিং কলেজ খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এই কলেজে উপস্থিত ২০জন করিয়া এক একবারে শিক্ষা পাইবে। শিক্ষার সময় হইবে তিন হইতে ছয় মাস। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল অপেক্ষাকৃত নূতন ব্যাঙ্ক হইলেও বৃহদাকার প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক হিসাবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ষ্টাফ ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের এই প্রথম প্রয়াস ব্যাঙ্কটিকে নিঃসন্দেহে আরও জনপ্রিয় করিয়া তুলিবে। আমরা আশা করি ভারতের ছোট বড় সব ব্যাঙ্কই সম্মিলিতভাবে অথবা এককভাবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের এই প্রচেষ্টাকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

চিকিৎসকের—তখন এদেশে সবশুদ্ধ মাত্র ৫০,০০০ চিকিৎসক আছেন। সহরে উপার্জ্জনের সুযোগ বেশী, রুচি ও শিক্ষাসংস্কৃতির দিক হইতে সহরের জীবন অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক, কাজেই উপরিউক্ত চিকিৎসকদের অধিকাংশই যে সহরে থাকেন, তাহা বলা বাহুল্য।

সুতরাং ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের যে কোন পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের প্রশ্নটিকে অবশ্যই বড় করিয়া দেখিতে হইবে। বোম্বাই পরিকল্পনায় মোট ১০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে ৪৫০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। চিকিৎসকরা যাহাতে গ্রামে যাইতে উৎসাহবোধ করেন, তজ্জন্য আন্দোলনতো দরকারই, তাছাড়া তাঁহাদের আর্থিক সুবিধা-অসুবিধা দিকটিও দেখিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে সরকারী চিকিৎসাব্যবস্থা যতই প্রসারিত হইবে, ততই এদিক হইতে কাজ হইবার আশা থাকে। গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থার ও শিল্পব্যবস্থার উন্নতির সহিত তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্পর্কের কথা আগেই বলা হইয়াছে। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে প্রচারকার্য্য চালাইলেও উপস্থিত কিছুটা ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। ভারতের জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পরামর্শদানের জন্য ভারতসরকার স্যার জোসেফ ভোরের নেতৃত্বে যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই কমিটি তাহাদের রিপোর্টে ৪০ বৎসর প্রসারী এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের অভিমতানুসারে কাজ হইলে প্রথম দশবৎসরে ১,০০০ কোটি টাকা খরচ হইবে। বলা বাহুল্য, ভোর পরিকল্পনাটি মূল্যবান হইলেও ইহার আর্থিক দায়িত্ব বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারের পক্ষে বহন করা কঠিন। ভারতের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী এখনও দেশীয় চিকিৎসাব্যবস্থায় চিকিৎসিত হইয়া থাকে। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা সুলভ ও কার্য্যকরী। ভারতসরকার ইহার উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য স্যার রামনাথ চোপরার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কমিটি গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত রিপোর্টে ডাক্তারী, কবিরাজী ও ইউনানী এই তিনপ্রকার প্রথার সমন্বয় সাধন করিয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন যে এই চিকিৎসাব্যবস্থা খরচের দিক হইতে দেশের সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে এবং ইহার উপকারও পাইবে সকলে। চোপরা কমিটির সুপারিশে এই নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের জন্য মূলধন খাতে ২০ হইতে ২৫ লক্ষ টাকা এবং পৌনঃপুনিক খাতে বার্ষিক ১০ হইতে ১৫ লক্ষ টাকা খরচ অনুমান করা হইয়াছে। কমিটি আরও অনুমান করিয়াছেন যে, প্রত্যেক প্রদেশে ৬০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়ার হিসাবে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন খাতে ৫ লক্ষ টাকা ও পৌনঃপুনিক খাতে বৎসরে ২২ লক্ষ টাকার বেশী খরচ হইবে না।

যাহা হউক, মোটের উপর ভারতের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যাপক একটি পরিকল্পনা লইয়া ভারতসরকারকে যথাসত্বর অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের জনস্বাস্থ্যের শোচনীয়তা সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এসময় ভারতসরকারের দিক হইতে আগের মত উদাসীনতা লজ্জার কথা হইবে। বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (World Health Organisation) ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের যে কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গলাদেশ হইতে কলেরার প্রকোপ কমাইবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক বিশেষজ্ঞের দুইটি দল পাঠান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এজন্য ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ৬ লক্ষ টাকা।

পাতকী

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

যে বলে বলুক পাতকী আমারে
আমি যে পাতকী নহে গো,
চিরসুন্দর মাঝারে যে আমি,
পাতকী কেমনে হবো গো ?

(আমি) করেছি আমারে পাতকী আপন,
তুমি হবে ব'লে পাতকীতারণ,
তা না হ'লে যে গো সদা নিমগন,
তুমিই থাকিতে তোমাতে।

পাপ পুণ্য আদি আছে যতগুণ
তোমাতে নাহি হে, তুমি যে নির্গুণ
সত্ত্ব, রজ, তম, মায়ায় আগুন
জ্বালায় এ মন মাঝেতে।

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

২রা জুলাই—আমাদের গাড়ী Niagara নদীর ধারে ধারে চলেছে। শান্তসলিলা নদী ক্রমশঃ স্রোতসঙ্কুল হয়ে ছুটে চলল; কানে এল অদূরে নদীর স্রোত ঝপ ঝপ শব্দে পাথরে আছড়ে পড়ছে; দেখতে দেখতে নদী যেন সর্প গর্জ্জনের মত ফণা তুলে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল; শেষে এক বিরাট গহ্বর-বক্ষে ঝাঁপ দিয়ে সাদা ফেণার মত ফুলে উঠল। জলপ্রপাতের সামনে কুয়াশার মত জলকণা উর্দ্ধে উত্থিত হয়ে স্থানটিকে অন্ধকার করে ঢেকে দিচ্ছে। প্রায় ২০০ ফিট উঁচু হতে জলধারাগুলি গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এই জলপ্রপাতের একধার আমেরিকার সীমানার এক শেষপ্রান্ত এবং অপর পারে Canadaর সীমানা আরম্ভ। পাশাপাশি দু'টি বৃহৎ জলধারার একটির নাম American জলপ্রপাত এবং অপরটি Canadian জলপ্রপাত। আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম এক জায়গায় লেখা আছে "Wind Cave"; সেখান দিয়ে লোকেরা দলে দলে জলপ্রপাতের পাদদেশে নামছে। স্থানটি ভীষণ বিপজ্জনক জেনেও আমাদের নামতে কৌতুহল হল। এখানে নামতে হলে নিজেদের কাপড়চোপড় বদল করে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা একপ্রকার রবারের পোষাক (নাম Monkey dress) পরতে হয়। আমরা সেই পোষাক পরে lift এ করে ১৭০ ফিট নীচে নেমে—সেই ভীষণ জলপ্রপাতের সামনে এলাম। সামনেই দেখলাম কাঠের সেতুগুলি জলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে; সেতুগুলির হলেই বহু রঙের রামধনু জলপ্রপাতকে ঘিরে জ্বল জ্বল করে উঠছে। এ হেন বৈচিত্র্যের ভিতর ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পিচ্ছিল সেতুর উপর এগিয়ে চললাম। জলের ঝাপটা যখন আসে

নায়গ্রা জলপ্রপাতের তলদেশে 'উইণ্ডকেভ' এর মধ্যে। 'মন্‌কী ড্রেস' পরে আমরা।
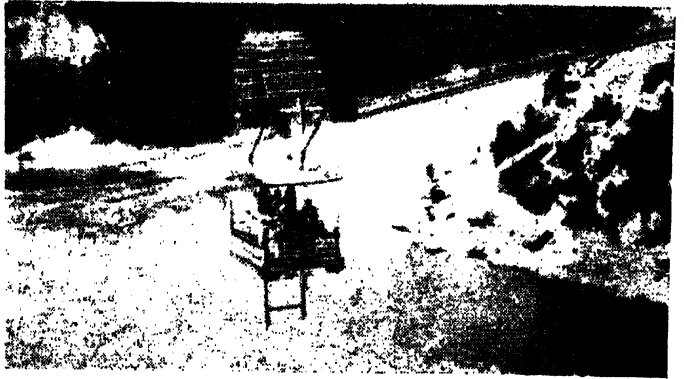
তারে ঝোলানো দোল্‌না গাড়ী—(নায়গ্রা নদীর জল এখানে গোল হ'য়ে ঘুরছে। এই ঘূর্ণী জলের উপর এপার—ওপার যাতায়াতের জন্য এই তারে ঝোলানো দোল্‌না গাড়ী চড়তে হয়।)

উপরে দাঁড়ালে জলপ্রপাতের আরো নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপটা এসে জলকণা ছিটিয়ে স্থানটি ভিজিয়ে অন্ধকার করে ঢেকে দিচ্ছে; আবার সে কুয়াশা সরে গিয়ে একটু পরিষ্কার তখন শক্ত করে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, আবার একটু এগোনো হয়। ভয় এবং দুঃসাহসিকতার উন্মাদনায় বেশ এক নূতন অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা উপরে উঠে এসে Nigara নদীর উপর বড়

আমেরিকার দিকের নায়গ্রা জলপ্রপাত।
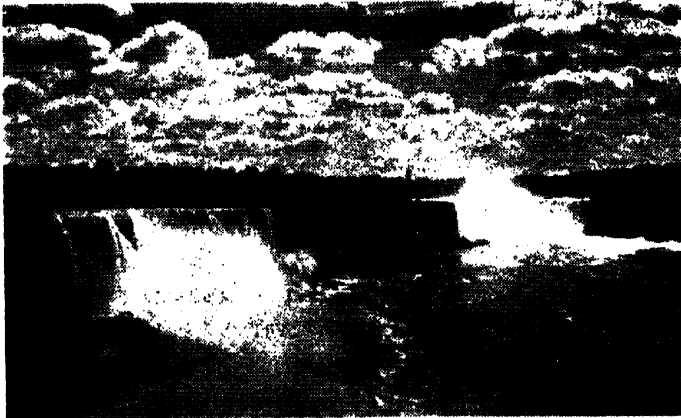
জ্যোৎস্না রাত্রে নায়গ্রা (ডানদিকেরটি আমেরিকান, বাঁ দিকেরটি ক্যানেডিয়ান)।

জলপ্রপাতের নীচের এই কাঠের সেতুগুলির উপর 'মন্‌কী ড্রেস' পরে যাওয়া যায়।

ব্রীজটি মোটরে পার হয়ে, Canadaর জমিতে নামলাম। এই ব্রীজ পার হবার সময় প্রবেশদ্বারে Passport দেখাতে হল। Canadaর
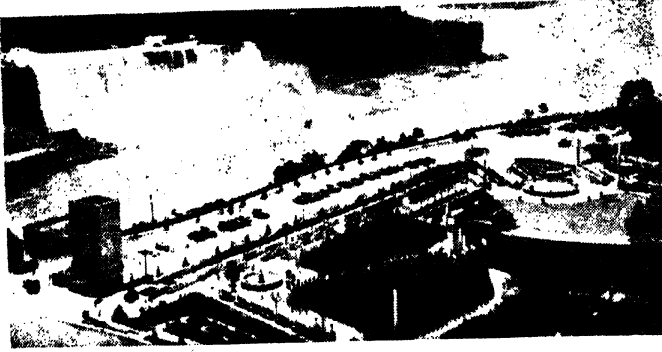
কানাডার দিকের নায়গ্রা জলপ্রপাত।

দিক থেকে জলপ্রপাতের দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব। জলধারাগুলির ভিতর হতে নানা রঙের রঙীণ আভা ফুটে উঠে সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমরা

নায়গ্রা জলপ্রপাতের এই অংশকে বলে—'অশ্বখুর প্রপাত'

সামনের একটি রেস্টুরেন্টের ছাদে বসে আহারাদি করলাম, তারপর জলপ্রপাতের অপরদিকে বেড়াতে বেড়াতে Niagara নদীর ধারে এসে পড়লাম। দেখলাম একস্থানে গভীর খাদের ভিতর দিয়ে জলতরঙ্গ উন্মাদের মত ঘূর্ণিপাক দিয়ে ছুটেছে। আবার তার উপর, এক পাহাড় হ'তে অপর পাহাড় অবধি তারে-ঝোলানো এক রকম দোলনার গাড়ী (Aerial Cage) এ-পার ও-পার করে যাত্রী নিয়ে বেড়িয়ে আসছে। দুঃসাহসিকতার চূড়ান্ত ব্যবস্থা দেখে আমরা আবার জলপ্রপাতের ধারে ফিরে এলাম। তখন আকাশ সূর্য্যের ম্লান আলোয় ঢেকে গেছে, ধীরে ধীরে পূর্ণিমার চাঁদ জলপ্রপাতের উপরে উঠে দাঁড়াল; অন্ধকারের মধ্যে চাঁদের আলোয় জলধারা রূপোর মত ঝক ঝক করে উঠল।

আমরা অভিভূত হয়ে চাঁদের আলোয় জলপ্রপাতের অপূর্ব্ব খেলা দেখছি এমন সময় পিছন দিক থেকে বড় বড় ফ্লাড লাইটের ডগমগে গাঢ় রঙ জলের উপর ফেলে জলপ্রপাতটিকেই কৃত্রিম আলোয় রঙীণ করে তোলা হল। অপূর্ব্ব-অপরূপ, চমৎকার সে দৃশ্য!

৩রা জুলাই। আমরা Buffalo সহর থেকে নিউইয়র্কে এলাম। হোটেল প্লাজাতে এসে দেখি চারিদিক জনশূন্য, কোথাও একটি লোকের দেখা মেলে না। অফিসের সামনে অপেক্ষা করে করে যাহোক শেষে একটি ঘরে তো ওঠা গেল। লিফ্‌টে ওঠার সময় দেখি মদ্যপায়ী লিফ্‌টম্যানটি দাঁড়িয়ে টলমল করছেন।

আগামী কাল ৪ঠা জুলাই শুক্রবার আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। সহরশুদ্ধ লোক এই তিনদিনের ছুটীতে সহর ছেড়ে চলে গেছে—সমুদ্রের ধারে, নদীর তীরে, পল্লীবাসে, বাগানে ও খোলা মাঠে তাঁবু মেলে থাকতে। সেখানে তারা হৈ চৈ করে মহানন্দে দিন কাটাবে। আজই অর্দ্ধেক সহর খালি হয়ে গেছে। এদেশে আবার শনি ও রবি দুদিনই পুরো ছুটী থাকে।

আজকের দিনটি মাত্র অফিস ও দোকানপাট খোলা আছে দেখে আমরা তাড়াতাড়ি কাজ সারতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই Pan American Air officeএ যাওয়া গেল; আমাদের Dublin যাত্রার জন্য বিমানের যথাযথ বন্দবস্ত হয়েছে কিনা জেনে নিশ্চিন্ত মনে সহর ঘুরতে বেরোলাম। Dr Taylorএর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমরা তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। আমাদের দেখে ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী ভারি খুশী। আমাদের আমেরিকা ভ্রমণ শেষ হল শুনে তখনই আবার নিমন্ত্রণ করে রাখলেন পরের বারে আসার জন্য এবং তাঁর গৃহে অতিথি হবার জন্য। আমরা কিছুক্ষণ বসে গল্প করলাম। কথা প্রসঙ্গে উনি একবার Dr Taylorকে বল্লেন যে আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমেরিকা সত্যই শীর্ষস্থান লাভ করেছে এবং আমাদের এই বাস্তব-

জগতের এক অভাবনীয় উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এটা তো সমগ্র মানবজীবনের একটা দিক মাত্র ; জীবনের আরেকটি দিকে—যেখানে মানুষ তার জগতের উর্দ্ধে সেই অধ্যাত্মিক জ্ঞান বা আত্ম-জ্ঞানের চিন্তা ক'রে, এক বিস্ময়কর আনন্দ আস্বাদ করে গেছেন তার সন্ধান আজও আমেরিকা পায়নি। হয় তো একদিন এই ভোগ উপশমের পর এ দেশেও তার অনুসন্ধিৎসা জাগবে। Dr Taylor গভীরভাবে সমস্ত কথা শুনে বল্লেন "তুমি যে বলছ ভোগ পরিতৃপ্তির পর আমেরিকার বিতৃষ্ণা আসবে, তা আমার মনে হয় না। তা যদি হত তা' হ'লে Christ প্যালেষ্টাইনের একটি ছোট্ট অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ না করে বিশ্বের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নগর Romeতেই জন্মাতেন।" কথাগুলি শুনে বড় ভালো লাগল। ভগবান কোথায় আবির্ভাব হবেন কে তা বলতে পারে?—Dr Taylor শুধু বিশ্ববিখ্যাত ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ নন্ তিনি একজন চিন্তা জগতেরও মনিষী ও বিশিষ্ট অন্তর্মুখী দার্শনিকও।

নায়গ্রা জলপ্রপাতের সামনে বিখ্যাত "রেন্ বো ব্রীজ"

কুয়াশাচ্ছন্ন নায়গ্রা

৪ঠা জুলাই আজ আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। সকালে উঠে জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখি রাস্তা জনমানবহীন ;—ট্রাম নেই, বাস নেই, Skyscraperএর ফাঁকা ঘরগুলি যেন মহাশূন্যে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কি ক'রে কোথায় আহারাদি করা যাবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে পথে নামলাম। খুঁজতে খুঁজতে একটি ছোট রেষ্টুরেন্ট খোলা দেখে—ভিতরে গেলাম, সেখানে অল্প কিছু আহার করে বেড়াতে বেরোলাম। Empire State Building দেখতে যাওয়া গেল। এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটির ভিতরে Express Elevatorএ করে আমরা একদমে ৭৪ তলায় উপস্থিত হলাম। এই Express Elevatorএর নিয়ম হচ্ছে কোনো তলায় না থেমে একেবারে একদমে ৭৪ তলায় গিয়ে দাঁড়াবে।

৭৪ তলার খোলা ছাদে আমরা গিয়ে দেখি ভাষণ কনকনে হাওয়া বইচে, চারিদিক কুয়াশাচ্ছন্ন ; কোথাও কোথাও কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে skyscraperএর বাড়ীগুলি একটু উঁকি মারছে। আমরা নিজেদেরই খানকয়েক ছবি তুলে ঘরের ভিতরে Cafeteriaতে গিয়ে আইসক্রীম খেতে বসলাম। তারপর আরেকটি Elevatorএ করে আরো ২৮ তলা উপরে উঠে ১০২ তলার ঘরে এলাম। এখান থেকে সহরের দৃশ্য দেখে এমন কিছুই নূতন লাগল না। কারণ আমরা বিমান হতে দেশ দেশান্তরের ও সহরগুলির যে বিপুল ছবি দেখেছি তার তুলনা নাই।

(ক্রমশঃ)

—দুই—

ধানসিঁড়ির দেশ এই বরিন্দ্।

দূর থেকে মনে হয় যেন অতি বিশাল একটা বৌদ্ধ প্যাগোডা। ঢেউ-তোলা মাটি চলেছে দিক থেকে দিগন্তে—যতদূর চোখ চলে উঁচু নীচুর খেলা। ঢেউ-তোলা এই মাঠের বুকে লক্ষ্মীর আঁচল-ঝাড়া ধানের সমারোহ। আলের রেখাগুলো দিয়ে বাঁধা ধানক্ষেতগুলি এক একটা সিঁড়ির মতো নেমে এসেছে। ফসল যখন বাড়-বাড়ন্ত হয়ে ওঠে—শরতের রোদ মেখে হিরণ্যশীর্ষগুলি নুয়ে নুয়ে পড়ে আলের ওপর, তখন মনে হয় বরিন্দের মাঠ জুড়ে কে যেন একটার পর একটা সোনার স্তূপ সাজিয়ে গেছে। আকাশ থেকে এক এক ছড়া পান্নার মালা কে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ওপর—উড়ে পড়ছে গাঢ়-সবুজ নল-টিয়ার ঝাঁক।

এই ধানসিঁড়ির ভেতর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে নেমেছে একটা ফালি পথ। মানুষের পায়ে পায়ে মসৃণ—সূর্যের আলোয় প্রোজ্জ্বল। কোথাও কোথাও পুরু লাল ধুলোর স্তর পড়ে আছে, তার ওপর সরু সরু সর্পিল রেখা জড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে। ওর অর্থ বুঝতে গেলে আসতে হবে সন্ধ্যার পরে—যখন তালবনের মাথার ওপর চাঁদটা ভালো করে উঠে আসবে—যখন অল্প অল্প স্নিগ্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াবে বহু দূরে ফোটা কোনো ফুলের গন্ধ; সেই সময় জুড়িয়ে যাবে দিনের দাবদাহ—মাটির ফোকরের ভেতর থেকে একটি একটি করে মুখ বার করবে গোখরো আর কেউটের শিশুরা, বায়ু সেবন করবে, খেলে বেড়াবে খোলা পথটুকুর ওপরে। আর তখন যদি মাটিতে টের পায় কোনো দূরাগত পদশব্দের স্পন্দন, তাহলে আত্মগোপন করবে ধানক্ষেতের আড়ালে।

সাইকেলের ব্রেকটা চেপে ধরে এই ঢালু পথ দিয়ে নামছিল রঞ্জন। লক্ষ্মীর আঁচল-ঝাড়া ক্ষেত দুধারে বিস্তীর্ণ; কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাবে ধান এবারে হৃতশ্রী। অসময়ে কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়ে পোকা লেগেছে ধানে। শুক্তির বুকে আঁকড়ে রাখা মুক্তোর মতো ধানের স্নেহ-কোষে সঞ্চিত শস্যকণাটি কেটে খেয়েছে কীটেরা—এলো মেলো বাতাসে যেন তুঁষ উড়ে যাচ্ছে। ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রঞ্জন চিন্তিত হয়ে উঠল। গত বছর বন্যায় ফসল গেছে, এবারে যদি পোকায় সর্বনাশ করে তাহলে মানুষের দুর্গতির কিছু আর বাকী থাকবে না। গেল বার আগাগোড়াই আধিয়ারদের কর্জের ওপর চালাতে হয়েছে; এবারে যদি শোধ না করতে পারে তা হলে না খেয়ে মরতে হবে দেশশুদ্ধ লোককে।

ধানের ক্ষেতে সবটাই সোনা নেই—তাতে কলঙ্কের দাগ পড়েছে। অথবা কোনো দিনই সোনা ছিল না—ওর ভেতরে সবখানিই খাদ, সবটুকুই কলঙ্ক। দূর থেকে দেখেছে বলেই সেটা বুঝতে পারেনি। মনে হয়েছিল, রৌদ্রপীত স্বর্ণাঞ্চল বুকে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন বঙ্গলক্ষ্মী। অনেক কবিতা লেখা হয়েছে তা নিয়ে—অনেক উচ্ছ্বাসে মুখর হয়েছে শহরের বক্তৃতামঞ্চ। কিন্তু ক্রমাগত বর্ষা আর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় ফিকে হতে শুরু করেছে গিলটির রং; একটা দুর্ভিক্ষে-মরা মানুষের বিশীর্ণ পাঁশুটে দেহ আত্মপ্রকাশ করছে···বাইরে উঠে আসছে কবিতার সোনালি কাপড়ে মোড়া কবরের ভেতর থেকে।

কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেমন সন্দেহ হয় একটা আকাল নামছে। আকাশের ওই দিকটাতে মেঘ জমে উঠছে—হয়তো ফাঁকা, হয়তো শেষ রাতের দিকে খানিক বৃষ্টি হতেও পারে। কিন্তু মনে হল ওটা যেন একটা বিশাল গিন্নী শকুন ;—সামনের দিকে মেঘের যে অংশটুকুর ওপর রোদ জলছে তা ওরই শানানো ঠোঁট। শবদেহের মতো পৃথিবী পড়ে আছে দিকে দিকে—শুকনো কুঞ্চিত চামড়ায় বলিচিহ্নের মতো সাপের রেখা।

এখনই তো তার কাজ। জমি তৈরী হচ্ছে—সময়

আসছে এগিয়ে। খাটুনিও বড় বেশি পড়েছে কিছুদিন যাবৎ। কুমার ভৈরবনারায়ণের ওখান থেকে বাস এবার তুলতে হল। গীতা পাঠের অভিনয়টা আর চলছে না। কুমার বাহাদুরও এর মধ্যে সন্দেহ করেছেন বলে মনে হয়।

সেদিন সবে যখন কুমার বাহাদুরের আফিঙের মৌজটা বেশ জমে উঠেছে, ডেক চেয়ারটায় লম্বা হয়ে গড়গড়ার নল নিয়ে তিনি চোখ বুঝেছেন—আর বালাখানা তামাকের আমেজে ভারী হয়ে গেছে ঘর, তখন রঞ্জন খুব দরদ দিয়ে তাঁকে গীতা বোঝাচ্ছিল।

কুমার বাহাদুরের ডায়বেটিজ আছে। শরীরের কোথাও ইল্‌সে গুঁড়ির ফোঁটার মতো একটা ফুস্কুড়ি দেখলে আতঙ্কে লাফিয়ে ওঠেন তিনি—চেঁচিয়ে ওঠেন: ডাক্তারকো বোলাও। মৃত্যুভয় তাঁর নিত্য সঙ্গী। সেই জন্য রঞ্জন তাঁকে কিছুটা আশ্বাস দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিল।

গলার স্বরে যথাসাধ্য আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করেই সে পড়ে যাচ্ছিল:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোপরাণি—শরীরাণি তথা বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।... অর্থাৎ কিনা, হে কৌন্তেয়, জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মানুষ যেমন নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে থাকে, তেমনি জীর্ণ শরীরকেও ত্যাগ করে মানুষ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্লোকটা কুমার ভৈরবনারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ মৃত্যুর দুর্ভাবনা এতে অনেকটা যেন লাঘব হয়ে আসে। আত্মা অজরামর—এই সত্যটা অধিগত হলে সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও আসে যে মরে তিনি পত্রপাঠ ফুরিয়ে যাবেন না; তাঁর জমিদারীর স্বত্ব স্বামীত্ব ভোগ করবার জন্য আবার দিব্যি দেহধারণ করে মর্ত্যে ফিরে আসবেন।

কিন্তু ডায়বেটিজ্ ভীত কৌন্তেয়—অর্থাৎ কুমারবাহাদুর আজ এমন মনোরম আলোচনাতেও গদ গদ হয়ে পড়লেন না। ফরশীতে একটা টান দিয়ে কেমন মিটি মিটি চোখে তাকালেন। যেন চুরি করবার আগে হুঁশিয়ার দৃষ্টিতে দেখে নিলেন—আশে-পাশে গৃহস্থ সজাগ কিংবা সচেতন হয়ে আছে কিনা।

বললেন, আচ্ছা ঠাকুরবাবু!

একদিকে বাবু, অন্যদিকে ঠাকুরমশাই—এই দুই মিলিয়ে হিজলবনীর রাজবাড়িতে এই বিচিত্র নামকরণ হয়েছে রঞ্জনের—ঠাকুর বাবু! কুমারবাহাদুর যেদিন রাত্রে একটু বেশি কারণ করেন সেদিন কখনো কখনো ঠাকুর বাবাও বলে থাকেন। রঞ্জনও পিতৃস্নেহে তাঁকে মোহ-মুদ্গর শোনাতে আরম্ভ করে। আজ কিন্তু আফিঙের এমন জমাট নেশার পরেও ঠাকুরবাবু সম্ভাষণের মধ্যে কেমন একটা দূরত্ব ঘনিয়ে রইল।

—বলুন।

ভৈরবনারায়ণ গড়গড়ায় মৃদুমন্দ চুম্বন করলেন। তারপর:

—কাল বুঝি জয়গড় মহলে গিয়েছিলেন আপনি?

রঞ্জন চমকে উঠল। ত্রস্ত চোখে তাকালো ভৈরবনারায়ণের দিকে।

কিন্তু তাঁর চোখ তো ততক্ষণে আবার নেশার আবেগে অর্ধনিমীলন হয়ে এসেছে। মুখে একটা নির্মল নির্লিপ্ততা—গীতাপাঠের নগদ নগদ ফল কিনা কে জানে। শিথিল ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলেন: বেরিয়ে এলেন বুঝি জয়গড় থেকে?

রঞ্জন অত্যন্ত সাবধানে উত্তর দিলে। আত্মপ্রকাশ করলে সংক্ষিপ্ততম শব্দে: হুঁ।—আরো কিছু বলবার আগে কুমারবাহাদুরের মনোগত অভিপ্রায়টা জেনে নিতে চায়।

কুমারবাহাদুর কিন্তু বেশি কিছু ভাঙলেন না। তেমনি নির্মল নির্লিপ্তভাবে বললেন, তাই শুনলাম। তা জয়গড় বেশ ভালো জায়গাই বটে। যেমন ওর মহুয়া বনটি, তেমনি ওর নদীর ধার। খাসা জায়গা!

—ও।

কুমারবাহাদুর যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছেন, এইভাবে বললেন, নিন, শুরু করুন তা হলে আবার।—হ্যাঁ—কী যেন পড়ছিলেন? বাসাংসি জীর্ণানি—মানে পুরোনো বাসা ত্যাগ করে—

—বাসা নয়, বাস। মানে শরীর।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—শরীর।—গড়গড়ার নলটি আবার চুম্বন করেই ছেড়ে দিলেন কুমারবাহাদুর: তবে জয়গড়ে কয়েকটা বেয়াড়া প্রজা আছে—ব্যাটাদের উচ্ছেদ করব এইবার। সে যাক, আপনি পড়ুন। মানে পুরোনো শরীর ত্যাগ করে—

যন্ত্রের মতো পড়েছে রঞ্জন, যন্ত্রের মতোই ব্যাখ্যা করে গেছে। শুনতে শুনতে ফরশীর নল মুখে করেই ঘুমিয়ে গেছেন ভৈরবনারায়ণ। কিন্তু ঘরের মধ্যে স্বস্তি পায়নি রঞ্জন। কুমারবাহাদুরকে সে যতটা চালাক ভেবেছিল, তিনি তার চাইতে ঢের বেশি চালাক। যা বলবার মাত্র একটি কথাতেই পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। রঞ্জনের উদ্দেশ্যও যে অনেকখানিই অনুমান করে নিয়েছেন সেটাও তাঁর ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে গেল।

অতএব বেশিদিন থাকা চলবে না আর। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা চালাবারও একটা সময় আছে। এখন থেকে হুঁশিয়ার না হলে নিজেই জালে পড়ে যাবে। তবু দেখা যাক—!

চিন্তাটা থমকে গেল হঠাৎ। বেশ রূঢ়ভাবেই। ভাবতে ভাবতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে—ধানসিঁড়ির ভেতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পথটা সম্পর্কে যে আরো একটু সচেতন থাকা উচিত সে কথা তার মনে ছিল না। অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সাইকেলটা একটা মাটির চাঙাড়ে টক্কর খেলো, তার-পর সোজা ওকে নিয়ে পাশের ধানক্ষেতে কাত হয়ে পড়ল।

ধানসিঁড়ি সাজানো সোনার 'পালার' মতো বরিন্দের মাঠ শব্দ-সুরভিত হয়ে উঠল। আধখানা ভরা কলসীর জলের মতো আওয়াজ তুলে হেসে উঠল একটি মেয়ে। ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দে আর্ত কর্কশধ্বনি তুলে গোটাকয়েক নলটিয়া ডানা মেলল আকাশে।

হাসছিল কালোশশী।

প্রথম বর্ষায় প্রাণ পেয়ে ওঠা নতুন লতার মতো চেহারা। উজ্জ্বল—পল্লবিত। বরিন্দের রোদ-বাতাস আর বৃষ্টিতে সঞ্জীবিত, রসায়িত মেয়েটি।

রঞ্জন সাইকেল টেনে লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়াতে কালোশশী এগিয়ে এল।

—পড়ে গেলি?

—গেলাম তো। তার জন্যে হাসবি তুই?

কালোশশীর মুখ আবার আলো হয়ে উঠল হাসিতে: অমন করে পড়ে যাবি তুই—হাসব না?

—আচ্ছা, আচ্ছা—মনে থাকবে।—রঞ্জন গম্ভীর হয়ে উঠল: যাবি তো রাজবাড়িতে—দেখা যাবে তখন। বলে দেব কুমারবাহাদুরকে—টের পাবি।

হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কালোশশী। কুমারবাহাদুরের নাম শুনেই যেন তার মুখের আলোটা ফিকে হয়ে এল। উজ্জ্বল দৃষ্টির ওপর নামল আশঙ্কার স্তিমিত ছায়াভাষ।

—আর আমি হাসবনা বাবু।

ব্যথিত বোধ করল রঞ্জন। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা শিশুকে একটা ভুতুড়ে মুখোস পরে ভয় দেখানোর অপরাধ বোধটা স্পর্শ করল মনকে। সঙ্গে সঙ্গে কুমার ভৈরবনারায়ণের মুখখানা স্মৃতির ওপরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একবার। সাধারণ মানুষের মুখের চাইতে প্রায় দেড়গুণ বড়—টকটকে রাঙা তার রঙ; পুরু একজোড়া ঠোঁটের ভেতর থেকে দাঁতগুলো এমন ভঙ্গিতে বেরিয়ে থাকে যে অকারণ পুলকে সে মুখে এক আঁটি বিচালি গুঁজে দিতে ইচ্ছে করে। হাসির বালাই সেখানে নেই—শুধু খামোকা মনে হয় লোকটা বুঝি মাথার ওপর থেকে এক জোড়া শিং বের করে এখুনি কাউকে গুঁতিয়ে দেবে। সুতরাং কালোশশীর দোষ নেই।

সদয় কণ্ঠে রঞ্জন বললে, আচ্ছা—এ যাত্রা ক্ষমা করা গেল। কিন্তু কী নিয়ে যাচ্ছিস তুই? ঝাঁপিতে কী ও?

—একটা মজার জিনিস আছে—দেখবি? কালোশশীর মুখে আবার প্রাণের ছায়া পড়ল।

—মজার জিনিস? দেখি—

কিন্তু 'দেখি'—বলে দু-পা এগিয়ে গিয়েই 'বাপ রে' বলে দশ পা পেছনে লাফিয়ে পড়ল সে। ঝাঁপির ঢাকা খুলতেই ভেতর থেকে তীব্র গর্জন উঠল একটা। পরক্ষণেই চাপ-সরে-যাওয়া স্প্রীঙের মতো অসহ্য ক্রোধে ফণা দোলাতে লাগল নীলকৃষ্ণ রঙের বিশাল একটি গোখ্‌রো সাপ—তার ফণার ওপরে পদচিহ্নটা রোদে ঝলমল করে উঠল।

—কী সর্বনাশ! সাপ।

কালোশশী ততক্ষণে ক্ষিপ্র হাতে ঝাঁপি বন্ধ করে দিয়েছে। বললে, এখুনি ধরলাম কিনা—তাই এত তেজ। কামিয়ে দিতে পারলে আর অত মেজাজ থাকবে না।

—সেকি! এখনো ওর বিষদাঁত আছে তা হলে!—সভয়ে রঞ্জন বললে, যদি কামড়াতো?

—কামড়াবে কেমন করে?—সগর্বে কালোশশী বললে, আমি আছি না? বেদের কাছে কি সাপের চালাকি চলে বাবু? ওর মতন গণ্ডা গণ্ডা সাপ নিয়ে আমার

কারবার।—কালোশশী মৃদু হাসল : চারটে পয়সা দিবি বাবু ? তা হলে এখনি ওকে নিয়ে খেলা দেখাতে পারি।

—দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে।—তেমনি আতঙ্কে রঞ্জন বললে, তোকে চার পয়সা দিতে যাব কেন ? আমাকে কেউ চারশো টাকা দিলেও আমি ওর খেলা দেখতে রাজী নই !

কালোশশী তেম্‌নি হাসতে লাগল : কিন্তু মরা সাপ নিয়ে খেলা করে কি সুখ আছে বাবু ? এম্‌নি তাজা সাপ নিয়ে খেলতেই তো আরাম। হাতের তালে তালে নাচবে—ছোবল মারতে চাইলেও পারবে না, তারপর মাটি ঠুকরে ঠুকরে নিজেই কাহিল হয়ে পড়বে !

হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে কালোশশী তাকালো রঞ্জনের দিকে। ছিলে-টেনেধরা ধনুকের মতো তার ভ্রু রেখা চকিতে প্রসারিত হয়ে গেল ; নিস্তরঙ্গ দীঘির কালো জলে হঠাৎ একটা পাতা উড়ে পড়ার মতো আলো-ভাঙা হাল্‌কা ঢেউ যেন খেলে গেল দৃষ্টিতে। আর তখনি কালোশশীর জীবনের যতটুকু ওর জানা, তা মনে পড়ে গেল।

আলোচনাটা তখনি থামিয়ে দিল রঞ্জন। সাইকেলে ওঠবার উপক্রম করে বললে, নে পথ ছাড়, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু আমি কাল একবার তোর কাছে যাব বাবু।

—আমার কাছে ? কেন ?—রঞ্জনের স্বরে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

—ভারী বিপদে পড়ে গেছি বাবু—কালোশশী বিশীর্ণ হয়ে গেল : পরশুরাম ফিরে এসেছে।

—পরশুরাম ? তোর আগের স্বামী ?

কালোশশী লজ্জিতভাবে মাথা নামাল : হাঁ। আর বলছে, আমাকে খুন করবে।

—খুন করা মুখের কথা কিনা ! আইন আছে না ? তুই ভাবিস্‌নি—রঞ্জন আশ্বাস দিতে চেষ্টা করল ওকে : আচ্ছা, যাস তা হলে কাল।

পথ ছেড়ে দিয়ে ধানক্ষেতে নেমে দাঁড়িয়েছে কালোশশী, রঞ্জন সাইকেলে প্যাড্‌ল করল। উজ্জ্বল মহাপথ দিয়ে সাইকেলটা আবার সবেগে এগিয়ে চলল। পেছনে তাকিয়ে দেখল রৌদ্রভরা মাঠের ভেতরে তরুণী সাপুড়ে মেয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে—তার গলার রূপোর হাঁসুলীতে একখানা বাঁকা তলোয়ারের মতো রোদ ছলকাচ্ছে।

অদ্ভুত এই মেয়েটা ! এ দেবী নয়—বাড়ি ওর বাংলা-বিহারের কোনো সীমান্তে। অথবা আসলে ওর কোনো দেশই আছে কিনা সন্দেহ। একটা বেদের দলের সঙ্গে ঘুরত, সেখান থেকে একজনের সঙ্গে পালিয়ে আসে লোকালয়ের জীবনে। হয়তো কোনো দূরযাত্রী বনহংসীর মতো সীমানাহীন চলার অবসরে নীড় বাঁধতে চেয়েছিল পথপ্রান্তের কোনো আরণ্য-নীড়ে। কিন্তু দুদিন পরেই সে নীড়াশ্রয় ক্লান্ত করে তুলেছে ওকে। তাই একটির পর একটি মানুষের সঞ্চার হচ্ছে ওর জীবনে। কিন্তু ওর সঙ্গে সমানগতিতে পা ফেলে তারা কেউই চলতে পারছে না—একটা বিশাল দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যেন একের পর এক পিছিয়ে পড়ছে তারা। বেদের মেয়ের মতো অত প্রাণ—অত প্রাচুর্য তারা পাবে কোথায় ?

দয়াল দাস, পরশুরাম, লক্ষ্মণ সর্দার। আরো কত আসবে কত যাবে, কে জানে। এ হাঁসের পাখায় ক্লান্তি নেই—এক দিগন্ত ছাড়িয়ে আর এক চক্রবাল তাকে ডাক দেয় ; এক অরণ্য থেকে আর এক অরণ্য—এক সীমান্ত থেকে আর এক সীমান্ত।

এত কথা রঞ্জনও কি জানত ? একটা চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করে পরশুরামকে ধরে আনা হয়েছিল কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছারীতে—সেই সঙ্গে বিলাপ করতে করতে এসেছিল কালোশশী। বুনো লতার পল্লবিত আরণ্য-সৌন্দর্য চমক লাগিয়েছিল তার চোখে—ভারী অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

কালোশশী তার মনের ওপর নেপথ্য-প্রভাব বুলিয়েছিল কিনা আজ সে কথা সে বলতে পারে না। কিন্তু এটা ঠিক যে অনেকটা তারই চেষ্টায় সে যাত্রা অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যায় পরশুরাম। মাত্র দরোয়ানের কড়া হাতে গোটাকয়েক থাপ্পড় খেয়েই নিষ্কৃতি পায়—হাজত পর্যন্ত আর যেতে হয়নি। সেই থেকেই তার ওপর কৃতজ্ঞ কালোশশী। পরশুরামের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবশ্য চুকে বুকে গেছে অনেককাল—এখন বরং পরশুরাম কালোশশীকেই খুন করবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কিন্তু রঞ্জনের ওপর শ্রদ্ধাটা অবিচল আছে কালোশশীর।

জেলাবোর্ডের বড় রাস্তার ধার থেকে জাম কুড়িয়ে ফেরবার সময় প্রায়ই ভেট দিয়ে যায় রঞ্জনকে।

বাস্তবিক, অদ্ভুত মেয়েটা। কেমন যেন প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

চলতে চলতে কানের কাছে কথাটা বাজতে লাগল: তাজা সাপ নিয়ে খেলতেই তো আরাম।—তাই বটে! প্রতি মুহূর্তেই টাটকা গোখরো সাপ খুঁজে ফিরছে কালোশশী। পরশুরামের মতো বিষধরেরা এসে জুটবে তার ঝাঁপিতে—ফণা দুলিয়ে দুলিয়ে খেলা করবে তার রূপোর কাঁকণ পরা হাতের তালে তালে, ছোবল মারবার ব্যর্থ চেষ্টায় আহত হয়ে হয়ে শেষকালে আত্মসমর্পণ করবে নির্জীব পরাজয়ে। আর তখনি সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তাকে—আবার শুরু হবে নতুন ক'রে সাপ খোঁজার পালা। নিষ্প্রাণ সাপ নিয়ে খেলতে ভালো লাগে না কালোশশীর।

ধান-সিঁড়ি পার হয়ে সাইকেলটা এতক্ষণে নেমেছে সমতলে। পেছনে টিলার ওপরে কালোশশী কোথায় গেছে মিশিয়ে। সাঁওতালদের নেমন্তন্নের কথাটাও মনে পড়ল। সন্ধ্যায় ওদের নাচের আসরে শূয়োরের মাংস আর পচাইয়ের আয়োজন।

কিন্তু ফেলে-আসা-পেছনের পৃথিবীটাকে হঠাৎ যেন ঢেকে দিলে সামনে হিজলবনীর জমিদার বাড়িটা। সুদূর মাঠের মধ্য দিয়ে মালিনী নদীর ছোট আঁকাবাঁকা রেখাটি থেকে থেকে ঝলক দিয়ে উঠছে। তারই একটা বাঁকের মুখে একপারে হিজলবন, অন্যপারে কুমার ভৈরবনারায়ণের দৌলতখানা।

ফাঁকা মাঠের ভেতর লাল-শাদা ওই বাড়ীটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো জন্তুর একটা রক্তাক্ত পাঁজর পড়ে আছে ওখানে। আশেপাশের দশখানা গ্রামের মালিক—বহু মানুষের দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় অধিপতি কুমার ভৈরব-নারায়ণ বাস করেন ওই বাড়ীতে। ধানসিঁড়ির দেশে, খোলা আকাশ আর অবারিত মাঠের মাঝখানে যারা মাটি কাটে আর ফসল ফলায়—ওই বাড়িটা তাদের হৃৎপিণ্ডের ওপর একটা ছোরার মতোই বিঁধে আছে সব সময়।

আর আপাতত ওই বাড়িতেই রঞ্জনের আশ্রয়।

চাকরিটা জুটে গেছে বিচিত্র উপায়ে। জেল থেকে বেরিয়ে বেকারের মতো ঘুরছিল এদিক ওদিক, এমন সময় কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ছেড়ে দিয়েছিল—পেয়ে গেল এটা। নামে প্রাইভেট সেক্রেটারী, কিন্তু কাজ হল গীতাপাঠ করে শোনানো। আফিং খেয়ে ঝিমুবার সময় গীতার শ্লোক না হলে কুমার বাহাদুরের নেশা জমেনা। আহা—গীতার মতো কি আর জিনিস আছে! মৃত্যুভয় ভুলিয়ে দেয়—আশা হয় বাহাল-তবিয়তে আবার এই পৈত্রিক জমিদারীতে আসীন হওয়া যাবে। কেননা আমার বিনাশ নেই:

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক:"—

অর্থাৎ কিনা—হে কৌন্তেয়, আত্মা অবিনশ্বর। অস্ত্র দ্বারা এ ছিন্ন হয়না, অগ্নিতে এ দগ্ধ হয়না—

আকুল হয়ে পড়ে রঞ্জন, বিভোর হয়ে শোনেন কৌন্তেয়। শুধু মধ্যে মধ্যে নাকের ডগায় দু একটা মাছি এসে বসাতে যখন তন্ময়তার কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটে কুমার বাহাদুরের।

ঘোঁৎ করে গলায় একটা আওয়াজ বের করে বলেন: অ্যাঁ—কী বলছিলেন? অগ্নি? কোথায় আবার আগুন লাগল?

মুখে আসে: তোমার ল্যাজে—কিন্তু প্রকাশ্যে বললে চাকরী থাকে না। সুতরাং বেশ ভদ্র ভাষায় জানাতে হয়: আজ্ঞে না, না, আগুন কোথাও লাগেনি। ওই গীতায় বলছে আর কি—মানে আত্মা কখনো দগ্ধ হয়না—

—যাক্, বাঁচালেন—সাধারণ মানুষের দেড়া মুখখানায় নিশ্চিন্ত একটা ভঙ্গি ছড়িয়ে আবার ঝিমুতে থাকেন ভৈরব-নারায়ণ। তোতাপাখির মতো রঞ্জন শুরু করে: হে পাণ্ডুপুত্র—

কিন্তু এতদিন ধরে সে বোধ হয় অবিচার করছিল খানিকটা। যতটা ঘুমন্ত ভেবেছিল ভদ্রলোককে তিনি তা নন্। নেশার ঘোরেও চোখ মেলে রাখতে জানেন।

হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল: পাঁচটা। সর্বনাশ—এখনি চায়ের টেবিলে তার ডাক পড়বে। রঞ্জন দ্রুত সাইকেলটাকে চালিয়ে দিল। (ক্রমশ:)

কলিকাতায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

কেন্দ্রীয় ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২৫শে জুন ৪ দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি ২৬শে জুন হাওড়ায় আরতী কটন মিলের উদ্বোধনে ও ২৭শে ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা নানাকারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—পৃথিবীর সকল দেশের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িতেছে ও দ্রব্যমূল্য কমিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় ভারতে কারখানার মালিক, শ্রমিক ও গভর্ণমেণ্টকে একত্র সমবেত হইয়া এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের কারখানাসমূহে অধিকতর পরিমাণে ভাল জিনিষ সুলভে উৎপন্ন হয়। তাহা না হইলে পৃথিবীর সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। ভারতে সহসা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় কারখানারও সকল ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে—অথচ লোকের ক্রয় শক্তি কমিয়া যাওয়ায় বেশী দাম দিয়া লোকের জিনিষ কিনিবার ক্ষমতা নাই, সে কারণে কারখানার উৎপন্ন জিনিষের বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে। নিত্য ব্যবহার্য্য কাপড়ও লোক দাম বেশী বলিয়া কিনিতে পারে না—দোকানে কাপড় জমিয়া গিয়াছে—ক্রেতা নাই। যে পরিমাণে কারখানায় জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে, সে পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা না হওয়ায় বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই বিষম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যে ভাবে ১৯৪৭ সালের পর ১৯৪৮ সালে এবং ১৯৪৮এর পর ১৯৪৯ সালে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—খাদ্য দ্রব্যের দাম এইভাবে বাড়িয়া চলিলে, সকলের উপার্জ্জনের সকল টাকা শুধু খাদ্য ক্রয় ব্যাপারেই শেষ হইয়া যাইবে, অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিবার টাকা থাকিবে না—ফলে একদিকে ভারতের কারখানাগুলি অচল হইয়া পড়িবে, দেশে বেকার-সমস্যা বাড়িবে ও সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী জিনিষে বাজার পূর্ণ হইয়া যাইবে। কলকারখানা ও শিল্পাগারগুলি বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাহার মালিকগণকে সমবেত ভাবে খাদ্য-উৎপাদনে মনোযোগী হইয়া শ্রমিক ও কর্ম্মীদিগকে সুলভে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় অবহিত হইতে হইবে। যুদ্ধের সময় সরকারী তাগিদে কারখানার মালিকরাও খাদ্য-উৎপাদনে মনোযোগী হইয়াছিলেন, দেখা গিয়াছিল। এখন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রীর চেষ্টায় যদি আবার তাহা আরম্ভ হয় ও সে বিষয়ে ধনী কারখানা-মালিকরা অবহিত হন, তবেই সুলভে খাদ্য পাইয়া দেশবাসী উপকৃত হইবে এবং সুলভে খাদ্য পাইলেই উদ্বৃত্ত অর্থে তাহারা কারখানায় উৎপন্ন অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে সমর্থ হইবে। আমরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে সচেষ্ট দেখিলে সত্যই আনন্দিত হইব।

চারিদিকে বিশৃঙ্খলা—

প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলিলে দেখা যায় যে কম্যুনিষ্টরা প্রত্যহ বহু স্থানে ডাকাতি বা হাঙ্গামা করিয়া লুঠতরাজ করিতেছে। কলিকাতা সহরের মধ্যেও প্রত্যহ ঐরূপ ঘটনা ঘটিতেছে এবং এমন সহসা ঘটে যে পুলিসের পক্ষে তাহাতে বাধাদান করা সম্ভব হয় না। সরকারের পক্ষে ইহা বন্ধ করা সম্ভব নহে; কারণ দেশের এত অধিকসংখ্যক লোক বর্ত্তমান শাসকদের কার্য্যে অসন্তুষ্ট যে তাহাদের বলপ্রয়োগ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা এখন আর সম্ভবপর নহে। কয়েকজন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী একত্রিত হইয়া অতি সহজে লুণ্ঠনকারী দল তৈয়ার করে—সে দলে লোক জুটিতে বিলম্ব হয় না। দেশে খাদ্যাভাব সকল মানুষকে এত অধিক বিব্রত করিতেছে যে দেশের জনসাধারণ যে কোন উপায়ে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ কামনা করে। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের পরিচালকগণ যে এখন আর দেশবাসীর আস্থাভাজন নাই তাহা বহু

ঘটনায় দেখা গিয়াছে ও যাইতেছে। এ অবস্থায় কি গ্রামে কি সহরে কম্যুনিষ্ট-কর্ম্মীরা সামান্য চেষ্টার ফলেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। তাহা এত আকস্মিক ও অতর্কিত ভাবে ঘটে যে, তাহা রোধ করা বা নিবারণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য সরকারকে এখনও পর্য্যন্ত আদৌ অবহিত হইতে দেখা যায় না। দেশের এই সকল শত্রু যে অচিরে ভারতের অবস্থা চীন বা ব্রহ্মের মত করিয়া ফেলিতে পারে, সরকারী কর্ত্তারা যে কেন তাহা মনে করেন না, তাহা বুঝা যায় না। সত্য কথা, দেশে খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব খুব বেশী—জিনিষ থাকিলেও কিনিবার টাকা লোকের হাতে নাই। সে দিক দিয়া কোন ব্যবস্থা করা এখনই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিলে দেশের লোকের মনে গভর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস বৃদ্ধির উপায় অতি সহজেই অবলম্বন করা যায়। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অল্প চেষ্টাতেই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারেন। দেশে গণ-সংযোগের কোন ব্যবস্থা নাই। বর্ত্তমান শাসকগণও হয় ত বিদেশী শাসকগণের মত নিজেদের সাধারণ লোক হইতে পৃথক শ্রেণীর জীব মনে করেন। শাসন-ব্যবস্থার সকল পর্য্যায়ের কর্ম্মীর মধ্য হইতে যাহাতে সে মনোভাব চলিয়া যায়, এখন তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শাসক-সম্প্রদায় যদি দেশবাসীর সহিত মিশিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই একদল লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। দেশবাসীর সহযোগিতা ও সাহায্য ছাড়া যে গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু করা সম্ভব নহে—শুধু এইটুকু বুঝাইয়া দিতে পারিলেই দেশের ব্যাপক অশান্তি কমিয়া যাইবে।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু—

গত ১১ই জুন দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ১৯ হাজার ৩০ ভোট পাইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসকে পরাজিত করিয়াছেন। সুরেশবাবু মাত্র ৫ হাজার ৭ শত ৮০ ভোট পাইয়াছেন। শরৎবাবুর অগ্রজ সতীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে ঐ সদস্যপদ খালি হইয়াছিল। অন্যান্য ৩ জন প্রার্থী মাত্র কয়টি করিয়া ভোট পাইয়াছিলেন। এই নির্ব্বাচনের ফল নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সুরেশবাবুর সমর্থনে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া প্রভৃতি হইতে সকল কংগ্রেস-নেতা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা সত্বেও কংগ্রেস কেন ঐ নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছে, তাহা আজ সকল নেতার চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। শরৎবাবু খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, এককালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ছিলেন, তাঁহার দেশসেবা ও স্বার্থত্যাগ অসাধারণ। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ—সবই সত্য কথা। কিন্তু তিনি কংগ্রেস পক্ষ গ্রহণ করেন নাই। তথাপি তিনি কেন এত অধিক ভোট পাইলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে দেশবাসী আজ নানা কারণে কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা হারাইতেছে। তাহারা যে কংগ্রেসকে আর বিশ্বাস করে না, তাহা জানাইয়া দিবার জন্যই গত নির্ব্বাচনে সকলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস দেশের শাসন কর্তৃত্ব পাইয়া গান্ধীজির আদর্শ হইতে বিপথে গিয়াছে। মুখে কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজীর নাম যতই করুন না কেন, কাজের বেলায় দেখা যায় যে নেতারা জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় আর অবহিত নাই। জনগণ অন্নবস্ত্রের অভাবে দারুণ ক্লিষ্ট হইলেও তাহাদের সুলভে অন্নবস্ত্র জোগাইবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই—পক্ষান্তরে ধনীরা কংগ্রেস-নেতাদের সকল প্রকার সাহায্য, সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিতেছেন। দেশে চোরাবাজার চলিতেছে, বলা বাহুল্য দেশের ধনীরাই সেই চোরাবাজারের সহিত সংশ্লিষ্ট—কিন্তু সেই চোরাবাজার বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেস-নেতারা হাতে ক্ষমতা পাইয়াও কোন চেষ্টা করেন না। ফলে দেশে চোরাবাজার বন্ধ না হইয়া তাহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেজন্য লোকের দুরবস্থাও বাড়িয়াছে। কংগ্রেস-নেতারা হাতে ক্ষমতা পাইয়া সব সময়ে গুণের আদর করেন না—আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অধিক অনুরাগ দেখাইতেও কার্পণ্য করেন না। দেশের লোক ভাত-কাপড়ের অভাবে কষ্ট পায়, অথচ বিদেশে দূতাবাস রক্ষা করিতে, বিদেশে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যাপারে ও ঐরূপ নানা কার্য্যে কংগ্রেস-চালিত গভর্ণমেণ্টকেও প্রয়োজনের অধিক অর্থ ব্যয় করিতে

দেখা যায়। গভর্ণর-জেনারেল, গভর্ণর প্রভৃতি রক্ষার ব্যাপারে দরিদ্র ভারতবর্ষে যে অত্যধিক ব্যয় করা হইতেছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন, অথচ সে ব্যয় কমাইবার কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। এই সকল কারণে জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি বিরক্ত হইয়াই কংগ্রেস-প্রার্থীর বিরুদ্ধে দক্ষিণ কলিকাতা নির্ব্বাচনে ভোট দিয়াছে। কংগ্রেস-নেতারা তথা গভর্ণমেণ্ট যদি এখনও সচেতন না হন, তবে দেশে অরাজকতা দেখা দিবে ও কংগ্রেস দেশবাসীর বিশ্বাস হারাইবে।

কংগ্রেসে নির্ব্বাচন—

গত বৎসর আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচনে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গত ১৪ই জুন কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকদের বিরুদ্ধে এক অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সেই নির্ব্বাচন সভার কে সভাপতি হইবেন, তাহা লইয়াও ভোট হয় এবং মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়কে পরাজিত করিয়া শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী (ভূতপূর্ব্ব মেয়র) ঐ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীকালা ভেঙ্কট রাও উভয় পক্ষে আপোষের চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই—তিনি ঐদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই দলাদলিকে একদল লোক পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের দলাদলি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। পূর্ব্বে সভাপতি ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের লোক, সম্পাদক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের। এখন সভাপতি পূর্ব্ববঙ্গের লোক ও সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গের লোক হইলেন। ভোটের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর মোট সদস্য	৩১৪
তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের লোক	১৪৯
পশ্চিমবঙ্গের লোক	১৬৫
সেদিন সভার বিরোধী দল	১৭২
পূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তাদের সমর্থক দল	১২১
নিরপেক্ষ	১৩
বিরোধী দলে ছিলেন—	
শ্রীসুরেন্দ্র ঘোষের দল	৯০
ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের দল	৫৫
স্বতন্ত্র	২৭
	১৭২
বিরোধী দলে পশ্চিম বঙ্গের লোক	৭৯

সমর্থক দলের নেতা ছিলেন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—উভয় দলে মিলিয়া ১২১ জন। ঐ দলে পশ্চিম বঙ্গে লোক ছিলেন ৮৬ জন। বিরোধী দলে নিম্নলিখিত পশ্চিম বঙ্গীয় নেতারা ছিলেন—শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী, শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য্য, ডাঃ নৃপেন্দ্র বসু। কাজেই এই বিবাদকে পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের বিবাদ বলা যায় না। মন্ত্রিত্ব-লোভীর দলের বিবাদ বলাই সঙ্গত হইবে। শ্রীকালা ভেঙ্কটরাওএর মত লোকও এ বিষয়ে ভুল বুঝিয়াছেন দেখিয়া আমরা সত্যই দুঃখিত। পশ্চিমবঙ্গ অতি ক্ষুদ্র প্রদেশ, ইহার মধ্যে ঐরূপ দলাদলি আসিলে দেশ ধ্বংস হওয়া অনিবার্য্য।

গান্ধী হত্যা মামলা—

পূর্ব্বে দিল্লীর লালকেল্লার বিশেষ আদালতের বিচারে মহাত্মা গান্ধী হত্যার মামলায় নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপ্তের প্রাণদণ্ড এবং মদনলাল, করকরে, গোপাল গডসে, ডাঃ পারচুরে ও শঙ্কর কৃষ্ণায়ার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছিল। বীর সাভারকর ও দিগম্বর বাগসে বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয়। পূর্ব্ব পাঞ্জাব হাইকোর্টে ৩ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত ফুল বেঞ্চে বিচার হয়—গত ২১শে জুন তাহার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। রায়ে নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপ্তের প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল আছে এবং মদনলাল ও করকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল আছে। ডাঃ পারচুরে ও শঙ্কর কৃষ্ণায়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। গোপাল গডসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ্রাসের জন্য গভর্ণরের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ডাদেশ কেহই সমর্থন করিবেন না—তাহার উপর

নাথুরাম গডসে যেরূপ নির্ভীক ভাবে সত্য কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি যত বড় অপরাধই করিয়া থাকুক না কেন, তাঁহার বিশ্বাস ও সাহসের প্রশংসা করিতে হয়।

শ্রীমাণিকলাল দত্ত—

কলিকাতার বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী মেসার্স রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্সের শ্রীমাণিকলাল দত্ত গত ১৫ই জুন বিমান-যোগে জাপান যাত্রা করিয়াছেন। গত ১৯৪৬ সালে ভারত গভর্ণমেণ্টের আহ্বানে তিনি জার্ম্মাণীতে কাগজের

শ্রীমাণিকলাল দত্ত

কল ও ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে গিয়াছিলেন। সেবার তিনি ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতে কাগজ আমদানী সম্পর্কে এবার তিনি জাপানস্থ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিবেন। আমরা তাঁহার সাফল্যময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কুটীর—

মিঃ এ-এম-ম্যাক্‌সিউনী নামে এক ভদ্রলোক সান্‌-ফ্রানসিস্কো সহরে একটী "কুটীর" নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই আবাসে একসঙ্গে ৪ লক্ষ লোক বাস করিতে পারিবে। বাড়ীতে ৮০০ লিফ্‌ট, ২০টী গির্জ্জা, ৫০টী নৈশ ক্লাব, ১০টী হাসপাতাল, ১০০০ দোকান এবং একসঙ্গে ৮০,০০০ মোটরগাড়ী রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। দুঃখের বিষয় জীবনান্ত হইলে বাড়ীর মধ্যে দাহ বা কবরস্থ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে না। বাঁচিয়া থাকিতে বাহির হইতে হইবে, মরিলে গৃহত্যাগ করিতে হইবে। কুঁড়েখানির নাম "ম্যাক্‌সিউনী কুটীর" রাখা সমীচীন।

রাজগীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—

রাজগীর বিহারের পাটনা জেলায় স্বাস্থ্যকর ও মনোরম স্থান। সেখানকার উষ্ণ প্রস্রবণ বহু গুণের আকর। ভগবান বুদ্ধের জীবনের স্মৃতি জড়িত বলিয়া ঐ স্থান পবিত্র। প্রতি বৎসর বহু বাঙ্গালী রাজগীরে স্বাস্থ্যান্বেষণে যান বটে, কিন্তু স্থানাভাবে তাঁহাদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সে জন্য স্বামী কৃপানন্দ মহারাজ তথায় ২ বিঘা জমী ক্রয় করিয়া

স্বামী কৃপানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা দ্বারা জনসেবা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি দেড় লক্ষ ইট প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহা দ্বারা আশ্রমে মন্দির, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইবে। সব কাজ শেষ করিতে লক্ষাধিক টাকা প্রয়োজন। স্বামীজি অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। সহৃদয় ব্যক্তিগণের দানে শীঘ্রই স্বামীজির পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। স্বামীজির ঠিকানা—রাজগীর পোঃ, জেলা পাটনা, বিহার।

পাকিস্তানে শিক্ষা-ব্যবস্থা—

পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান সাহেব বলিয়াছেন ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তানের শিক্ষাসৌধ গড়িতে হইবে। এতাবত হিন্দু ও খ্রীশ্চান শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্ররিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ইসলাম সংস্কৃতির ক্ষতি হইয়াছে। এখন স্বাধীন মুশলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সর্ব্বতোভাবে, মুশলিম ভাষা, সাহিত্য, মনোভাব, আবহাওয়া গড়িয়া তুলিবে। পাকিস্তানের ভাষা উর্দ্দু বা উর্দ্দু বাঙ্গালা খিচুড়ি না করিলে পাকিস্তানের একত্ব গঠন সম্ভব হইতেছে না। এই সকল উক্তি শুনিয়া মনে হয়—অমুসলমান পাকিস্তানীর প্রতি কিরূপ ন্যায্য সদয় ও সহৃদয় আচরণ পালিত হইবে। বাঙ্গালার অধিবাসী বাঙ্গালী; পূর্ব্বই হউক, আর পশ্চিমই হউক। তাহাদের ভাষা বাঙ্গালা। যদি বাঙ্গালী মুসলমান উর্দ্দু না শিখিলে তাহার ধর্ম্মরক্ষা বা রাষ্ট্রচেতনা লাভ করিতে অসমর্থ হয়, তাহাদের জন্য উর্দ্দু শিক্ষা ভাল! কিন্তু অমুসলমান যে দুই কোটীর অধিক অধিবাসী আছে তাহাদের জন্য যদি জবরদস্তি উর্দ্দু চালাইবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যাচারের নামান্তর বলিয়া পরিচিত হইবার কথা। জনাব ফজলুর রহমান নিজে বাঙ্গালী, সুতরাং তাঁহার পক্ষেই এই 'কালাপাহাড়ী' মনোবৃত্তি শোভন।

"চাচা আপন প্রাণ বাঁচা"—

পাকিস্তান, বিশেষতঃ পূর্ব্ব পাকিস্তানের নানা অংশে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। চাউল দুষ্প্রাপ্য, কোথাও কোথাও প্রতি মণ ৫০৲।৬০৲। অন্নাভাবে দেশত্যাগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়? পাকিস্তানের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় জনাব লিয়াকৎ আলি সাহেব নাকি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে কাশ্মীরের ভারতীয় ইউনিয়ন কর্ত্তৃক অধিকৃত অঞ্চলে তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। জনাব লিয়াকৎ আলি সাহেবের সদয় হৃদয় ইহাতে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং কাহারও আপত্তি না থাকিলে তিনি পাকিস্তান হইতে সেখানে চাউল পাঠাইতে পারেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে যে ভারতীয় ইউনিয়ন অধিকৃত অঞ্চলে অন্নাভাববশতঃ অশান্তি হইলে পাকিস্তানের সুবিধা; সেক্ষেত্রে জনাব সাহেব কেন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য করিতে চাহিতেছেন। প্রকাশ থাকা ভাল, কাশ্মীরীদের মত তাহাদের অন্নকষ্ট নাই এবং তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু আলি সাহেব প্রমাণ করিতে চান নিছক "প্রপাগাণ্ডা", ভারতীয় ইউনিয়ন অধিকৃত অঞ্চলের অন্নকষ্ট দূর করে না এবং পাকিস্তান রাজ্য এত দয়ালু যে অপরের দুঃখে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যাহারাই পাকিস্তানের সংস্পর্শে আসিবে, তাহারাই অভাবমুক্ত হইবে এবং অপরকে সাহায্য করিয়া "খোদার দোয়ার" অধিকারী হইবে। "চাচা, পাকিস্তানের অভাব দূর কর"—ইহাই পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের নিবেদন।

শিক্ষায় মহিলার সাফল্য—

কলিকাতা শ্যামপুকুর নিবাসী শ্রীসূর্য্যপ্রকাশ চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী গৌরী চৌধুরী এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া

শ্রীগৌরী চৌধুরী

শিক্ষায় মহিলাদের মধ্যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দ—

সম্প্রতি কলিকাতা আলিপুরে ২৪ পরগণার জেলা জজের আদালত গৃহে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মানিকতলা বোমার মামলায় অব্যাহতি লাভের পর শ্রীঅরবিন্দের ঐ চিত্র গৃহীত হইয়াছিল (আমরা এখানে সেই চিত্রখানি প্রকাশ করিলাম)।
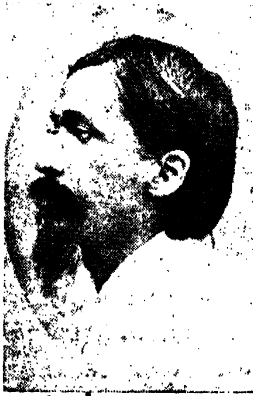
শ্রীঅরবিন্দ

সে দিনের দেশকর্ম্মী অরবিন্দ আজ পণ্ডিচেরীর ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন কালে শ্রীঅরবিন্দকে 'ঋষি' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। আজ সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা—মানুষকে দেবতায় পরিণত করার সাধনা—তাহা সাফল্য মণ্ডিত হউক।

নূতন গৃহহারা—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সম্প্রতি দলে দলে মুসলমান সপরিবারে ও মালপত্রসহ পশ্চিম বঙ্গে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের সকলেই যে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই; যেমন হিন্দু আসিয়াছিল, সেইভাবে ইহারাও আসিতেছে। উপার্জ্জনের পথ নাই, খাদ্যদ্রব্যের দারুণ অভাব ও অত্যধিক দাম, অপরাপর দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি ভিটাত্যাগের কারণ বলিয়া প্রকাশ করা লইয়াছে। যাহারা রক্তের স্রোতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালাকে ভাগ করিয়া নূতন রাজ্যলাভের আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন, এই নূতন গৃহহারাদের অবস্থা তাঁহাদের মনে কোনও বিশেষ চিন্তাধারা সৃষ্টি করিবে কিনা জানি না। অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রত্যেক লোকের প্রয়োজন, যেখানে তাহা মিলে না তাহা স্বধর্মীর রাজ্য হইলেও লোকে পরিত্যাগ করে। কারণ, মানুষে মানুষে আসল প্রয়োজনে কোনও পার্থক্য নাই। যাহা লইয়া ভাইকে ভায়ের গলায় ছুরি দিতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহা স্বার্থপর নেতৃস্থানীয় লোকের স্বার্থপ্রণোদিত ঈর্ষ্যা বা লোভ। আমরা মনে করি বাঙ্গালী বাঙ্গালী, হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়। পরস্পরের মধ্যে যে কাল্পনিক ব্যবধান সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা দূর হইলে প্রাণরক্ষার জন্য ভিন্ন রাষ্ট্রে যাওয়ার হাঙ্গামা থাকিবে না।

পরলোকে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ—

খ্যাতনামা চিত্র-শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ বাগচী গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বৎসর বয়সে লেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রাজসাহী বলিহারের

সুরেন্দ্রনাথ বাগচী

অধিবাসী ছিলেন—মানুষের তৈল-চিত্র অঙ্কনে তিনি বিশেষ যশ অর্জন করিয়াছিলেন। গত প্রায় ৩০ বৎসরকাল ভারতবর্ষে তাঁহার অঙ্কিত বহু চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙ্গালায় কৃষি কলেজ—

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রামে একটি কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। সে জন্য ঝাড়গ্রামের বদান্য জমীদার রাজা নরসিংহ মল্লদেব ৪৩০ বিঘা জমী ও নগদ ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বারাকপুরে একটি কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল—কিন্তু ঠিক সেই সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাহা সফল হয় নাই। বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ—তথায় কৃষিকলেজের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। কিন্তু যে সকল ছাত্র তথায় শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা যাহাতে কৃষি কার্য্যকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার ধ্বংসোন্মুখ কৃষি ব্যবস্থাকে পুনর্জ্জীবিত করার চেষ্টা করে, প্রথম হইতে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত।

বাঙ্গালার শিক্ষা-ব্যবস্থা—

বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা খিচুড়ি পর্য্যায়ে উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট না কি বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বুনিয়াদী শিক্ষা বা শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা নয়, প্রচলিত শিক্ষার সহিত একটা শিল্পের শিক্ষাদান ব্যবস্থা হইতেছে। যাহা হইতেছে, তাহার তোড়জোড়ও বিশেষ উৎসাহদায়ক নয়। কোথায়, কাহাদের লইয়া আরম্ভ হইবে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে না। গভর্ণমেণ্টের নিজের শিক্ষার পরীক্ষামূলক কারখানায় দুই শ্রেণীর শিক্ষাপদ্ধতির গবেষণা চলিতেছে; আজ পর্য্যন্ত কোন্ নীতি গৃহীত হইবে তাহা স্থির হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সর্ত্ত অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। পঃ বাঙ্গালা সরকার তাহাতে সম্মত নহেন, অথচ অর্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; সুতরাং 'বুনিয়াদী' কথাটী তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে বজায় রাখিতেছেন। অকৃত্রিম বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কোনও পক্ষপাত নাই। বাঙ্গালীর ছেলে যাহাতে যথার্থ শিক্ষালাভ করে, তাহার ব্যবস্থা হওয়াই একান্ত কাম্য। কিন্তু হালচাল দেখিয়া মনে হইতেছে পঃ বাঙ্গালা সরকার আজও মন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই আর সেই কারণে শিক্ষার্থীরও বিশেষ অসুবিধা হইবে।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মোৎসব—

কলিকাতা সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে ৪১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত শান্তশীল দাশ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র লাহা, শ্রীযুক্ত রাণা বসু প্রমুখ অনেকে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান যে "দ্বিজেন্দ্রলাল সমিতি" গঠিত হইয়াছে এবং এই সমিতি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবধারা প্রচার উদ্দেশে মিউজিয়ম তৈয়ারী করিবেন। এ বিষয়ে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য বাঞ্ছনীয়।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

গত ১০ই এপ্রিল আরিয়াদহ (২৪ পরগণা) অনাথ ভাণ্ডারের অন্তর্গত শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃ-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের নবনির্ম্মিত হলে এক প্রীতি সম্মেলনে বারাকপুরের মহকুমা-

আড়িয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে মেটা সম্বর্দ্ধনা ফটো—রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শাসক শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতিত্ব করেন এবং মতকুমার নানা স্থান হইতে মহকুমা সমিতির বহু সদস্য সম্মেলনে যোগদান করেন। ৫ই জন রবিবার সকালে মেসার্স জার্ডিন হেণ্ডারসনের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীগিরিধারিলাল

মেটা পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ শাস্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া অনাথ ভাণ্ডার পরিদর্শন করেন। সে দিনও তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ভাণ্ডারে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল ও সভায় ৮ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক কালীন দান ২৭ হাজার টাকা

মহকুমা-শাসক সম্বর্ধনা ফটো—রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ছাড়াও মাতৃ-মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় এখন আশা করা যায় সত্বর তথায় মাতৃমঙ্গল কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে। কর্ম্মী শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এ অঞ্চলের একটি প্রয়োজনীয় অভাব দূরীভূত হইবে।

হিন্দী প্রতিশব্দ—

যুক্তপ্রদেশ প্রাদেশিক সরকার আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে সরকারী কাগজপত্রে হিন্দী ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু এতকাল ইংরাজিতে কাজ চালাইয়া হঠাৎ হিন্দী প্রতিশব্দ অধিকার বা সৃষ্টি করিতে অসুবিধা হইবার কথা। গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি অধ্যাপক ধরমভীরের উপর "আদেশ" দিয়াছেন যে সেপ্টেম্বরের মধ্যে শাসন, আইন এবং শিল্পকলা সংক্রান্ত অন্ততঃ বিশ হাজার প্রতিশব্দ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। অধ্যাপক ধরমভীর, দ্বাদশটী ভাষাবিদ্ সহকারী লইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন; এ পর্য্যন্ত পাঁচ সহস্রাধিক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা মন্থন করিয়া এই কার্য্যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করিবেন বলিয়া আশা করেন। কৌটিল্য প্রণীত "অর্থ-শাস্ত্র", মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি হইতে রাজশাস্ত্র সংক্রান্ত অন্ততঃ ছয় সহস্র শব্দ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। যাঁহারা স্বর্গীয় অশোক শাস্ত্রী লিখিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত শব্দের আলোচনা "ভারতবর্ষ"এর পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন রাজ্যশাসন সংক্রান্ত শব্দে পুস্তকখানি কত সমৃদ্ধ। সেইরূপ অপরাপর সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে সহজেই অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। উদ্ভট শব্দ-রচনা করা অপেক্ষা সংস্কৃতমূলক শব্দ উদ্ধার করিয়া প্রচলনের চেষ্টা সমর্থনযোগ্য। আশা করি অধ্যাপক ধরমভীর ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের চেষ্টায় যে প্রতিশব্দমালা সৃষ্টি হইবে, তাহা সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হইবে। পঃ বাঙ্গালায় একবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহার অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলেও তাহার পরিবর্ত্তে যে শব্দ গ্রহণযোগ্য তাহা বিশেষ পাওয়া যায় নাই। অপরের লেখা সম্মুখে থাকিলে ত্রুটী ধরা খুব সহজ। সেই হিসাবে আমরা পঃ বাঙ্গালা সরকারের পরিভাষা পুস্তিকা বা অধ্যাপক ধরমভীরের আগামী পুস্তক জনসাধারণ ও সরকারের কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করি।

অখণ্ড পৃথিবী—

'অখণ্ড পৃথিবী'—কবির কল্পনা-বিলাস বলিয়া লোকে ধরিয়া রাখিয়াছিল; মাঝে মাঝে কথাটা উঠিত, আবার চাপা পড়িয়া যাইত। এত বিরাট পৃথিবী 'সাত সমুদ্র, তেরো নদী,' সমুদ্র পারাপারে, দূরদূরান্তরে লোকের বাস। বিবিধ জাতি, বিবিধ ভাষা, সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মানুষের অবস্থান, মানুষে মানুষে দেহের বর্ণ, বুদ্ধির প্রখরতায় কত বিভেদ। লোকাভাবে, জীবনযাপনের ধারায়, জীবনের আদর্শে এমন কি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবহারের তারতম্যে এক দেশের লোক হইতে অপর দেশের লোক বিভিন্ন। ঘটনার আবর্ত্তে একজাতি একশ্রেণী যেন অপরের উপর প্রভুত্ব করিতে জন্মিয়াছে। প্রভু ভৃত্যে, বিজেতা ও বিজিতে আবার সামঞ্জস্য কোথায়? বিভেদের দিক দিয়া যতই ভাবা গিয়াছে, বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর রূপ ততই স্বাভাবিক চিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা অখণ্ড পৃথিবীর কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা উন্মাদ আখ্যা লাভ করিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই মনে হয়, পৃথিবীর একত্ব সম্বন্ধে লোকমত গড়িয়া উঠিতেছে। দেশে দেশে মনীষীরা একথা ভাবিয়াছেন, কিন্তু শ্বেতকায় জাতি

কৃষ্ণজাতি সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকায় কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার রাজনীতিবিদ্ ওয়েণ্ডেল উইল্কি একবার পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন। আকাশপথে যাতায়াত দ্বারা দেখা গেল অখণ্ড পৃথিবীর যে প্রধান অন্তরায় তাহা দূর হইয়াছে ব্যোমযানের কৃপায়। আজ সসাগরা ধরা নাতি বৃহৎ ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। যাতায়াত সহজ হওয়ায় দেশে দেশে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। লোকের আধুনিক প্রয়োজন মিটাইতে পরস্পরের উপর দেশে দেশে নির্ভরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রমাণিত হইয়া গেল, শ্বেতকৃষ্ণ বলিয়া জাতির কোনও প্রভেদ নাই, শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, শ্বেতের কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের শ্বেত জাতি একান্ত প্রয়োজন। অন্ন বস্ত্রর কথার আলোচনায় কাজ নাই—একের অন্ন, একের বস্ত্র অপরে না যোগাইলে আর চলে না। একের প্রাণরক্ষা করিতে অপরে না আসিলে উপায় নাই। একের সেবা না পাইলে অপরে অস্বস্তি ভোগ করে; চাষী মজুর কাজ না করিলে ধনিক বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির দিন অচল। মানুষে মানুষে বিভেদ কমিতেছে; যে সকল কারণে এক অপর হইতে নিজেকে প্রধান মনে করিত, তাহা দূর হইয়া যাইতেছে। আজ আবার জোর করিয়া অখণ্ড পৃথিবীর আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সকল জাতির সকল শ্রেণীর মধ্যে মানুষসত্ত্বা আজ নিজরূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে। আজ সারা পৃথিবীতে এক অখণ্ড রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্ম ছুটাছুটী পড়িয়াছে! ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য মিঃ অসবোর্ণ পৃথিবীর নানা অংশে ভ্রমণ করিয়া ইহার স্বপক্ষে মত সৃষ্টি করিতেছেন। বিভিন্ন দেশের নাগরিক নয়। সারা পৃথিবীর এক নাগরিকত্ব প্রমাণ করিবার জন্ম ছাড়পত্র (passport) উঠাইয়া দিবার জন্ম আন্দোলন সুরু হইয়াছে। যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার চলিতেছে, তাহাতে পৃথিবী যদি অখণ্ড বলিয়া গৃহীত না হয়, তাহা হইলে যে কোনও মুহূর্তে এক দেশ অপর দেশকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে। আজ সেই কারণে, অপর কারণ না থাকিলেও, পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানবের পৃথিবীর সকল সুযোগ সুবিধার সমান অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। আমরা এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করি এবং ইহার সাফল্য কামনা করি।

বংগীয় সাহিত্য সমিতি—

চিরন্তনকালের অখণ্ড বাংলা ভৌগলিক ছুরিকাঘাতে আজ শুধু জীবনের দিক হইতেই নয়, সাংস্কৃতিক দিক হইতেও নিশ্চিহ্নতার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু রামমোহন, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বাংলা যে কোন দিনই অন্তরের দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না সেই কথাস্মরণ করাইবার জন্য বাংলার বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও সাংবাদিকদের লইয়া বংগীয় সাহিত্য সমিতি গঠন করা হইয়াছে। গত ৫ই আষাঢ় রবিবার কলিকাতার ২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে বিশিষ্ট সুধী, সাহিত্যিক ও শিল্পীবৃন্দের উপস্থিতিতে ইহার কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডক্টর কালিদাস নাগ এই সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং সমগ্র বাংলার পক্ষ হইতে স্থায়ী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীঅনিলকুমার সাধু কাব্যভারতী, সাহিত্যশ্রী। সহ-সম্পাদক শ্রীজলধিনাথ সাধু বার-এ্যাট্-ল এবং কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। অন্যান্যদের মধ্যে নিখিল ভারত বংগভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীসরস্বতী, শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতিকার্য্যকরী সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহাছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক-বৃন্দ ও শিল্পীরা এই সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ বংগীয় সাহিত্য সমিতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন—"যেবাংলাকে আমরা এতদিন ধরে দেখে এসেছি, হঠাৎ একদিন দেখলাম তার রূপ বদলে গেছে। ভৌগলিক বাংলা আমাদের মনে যে দাগ কেটেছে তা আত্মার নয়। তাই বৃহত্তর বাংলায় আজ আমাদের সংস্কৃতির বাণী বহন করে নিয়ে যেতে হবে। বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ বাংলার পরিবর্ত্তে প্রকৃত বাংলার প্রত্যেকটি জেলার সংগে অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করাই হবে এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। আমি আজকের এই খণ্ডিত বাংলাকে স্বীকার করিনা। বাংলার যে চিরন্তন সত্ত্বা তাকে পুনরায়জাগিয়ে তুলবার জন্ম এবং খণ্ডিত নয়—বৃহত্তর বঙ্গের আত্মাকে সবার মনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্মই আজ এই সমিতির প্রতিষ্ঠা।" এর পর শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এই গুরুদায়িত্বের অর্থকরী সমস্যার দিক আলোচনা করেন।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল প্রসঙ্গ

খেলার মাঠে অরাজকতা

ফুটবল খেলার স্ট্যাণ্ডার্ডের আজ যেমন অধোগতি লক্ষিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে এক শ্রেণীর দর্শকদের মনের অবনতিটাও বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে, খেলার মাঠে তাঁদের অশিষ্ট আচরণের ভিতর দিয়ে। এই মানসিক অবনতির প্রকাশ বেশ ভালভাবেই লক্ষিত হয়েছে ইষ্টবেঙ্গল বনাম এরিয়ান্সের খেলার দিন। এই দিন খেলা শেষ হবার ছয় মিনিট আগে যখন ইষ্টবেঙ্গল দল এরিয়ান্সের নিকট ২-১ গোলেহারছিলেন সেই সময় ইষ্টবেঙ্গলক্লাবের সদস্যদের গ্যালারি থেকে কয়েকজন লোক রেফারীকে তাঁর তথাকথিত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেন এবং গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে সেইখানেই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেন। হতভাগ্য, লাঞ্ছিত রেফারীকে পরে অজ্ঞান অবস্থায় দেখা যায়। মানসিক অবনতির এই প্রকাশ যে শুধু ফুটবল খেলার মাঠেই পরিলক্ষিত হচ্ছে তা' বললে ভুল বলা হয়। আসলে এই মানসিক বিকৃতির স্বরূপ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অল্প-বিস্তর বিস্তার লাভ করছে এবং তারই ঢেউ এসে খেলা-ধূলার স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়াকেও করে তুলছে বিষাক্ত, বিকৃত। এই বিষময় আবহাওয়ার দূষিত স্পর্শ থেকে যে সহজে আমরা মুক্তি পাবো তা' আজ মনে হয় না; তবে খেলা-ধূলার ক্ষেত্র থেকে এই অরাজকতার বিষকে বিনষ্ট করতে আজ সুস্থমনা, শিষ্ট দর্শকবৃন্দ, ক্লাব কর্তৃপক্ষগণ ও আই-এফ-এর পরিচালক মণ্ডলীকে এক যোগে দণ্ডায়মান হ'তে আহ্বান জানাচ্ছি। ক্রীড়াক্ষেত্রের এই দুর্নীতিমূলক অশিষ্ট আচরণকারীদের বিরুদ্ধে আজ সকলকে একত্র হ'তে হ'বে, সমূলে উৎপাটিত করতে হবে এই বিষ বৃক্ষকে, বিনষ্ট করতে হবে এই জঘন্য প্রবৃত্তিকে মানুষের মন থেকে।

কোচিং সেণ্টার

গতবারে বাঙ্গালা দেশের ফুটবলের উন্নতিমূলক কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, বাংলার উঠতি ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতি করবার জন্য আই-এফ-এ কে একটি ট্রেনিং সেণ্টার স্থাপন করবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। জেনে খুসী হলাম যে এইরূপ একটি কোচিং সেণ্টার খুলবার ব্যবস্থা আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ করছেন। বাংলার ফুটবল খেলার উন্নতিমূলক এই প্রচেষ্টার জন্য আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সূত্রে আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আই-এফ-এ'র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে এই কোচিং সেণ্টারের ট্রেনার মনোনয়ন। আমার মনে হয় আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত নন—গতানুগতিক পন্থাই তাঁরা অনুসরণ করে চলেছেন। আমার মনে হয় নিজেদের দেশের ট্রেনারদের পারদর্শিতার উপর বিশেষ নির্ভর না করে, ভারতের বাইরের ফুটবল ক্রীড়াকৌশলী কোন পাশ্চাত্য দেশ থেকে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ট্রেনার আমদানি করাটাই সমীচীন হবে এবং তাতে বিশেষ সুফল পাবার আশাও আছে। এই ট্রেনার মনোনয়ন বিষয়টির উপর বিশেষ করে জোর দিচ্ছি এই জন্যে যে, ট্রেনারএর যোগ্যতার উপরেই নির্ভর করে কোচিং সেণ্টারের সাফল্য। ট্রেনার যদি উপযুক্ত না হয় তা'হলে কোচিং সেণ্টার থেকে বিজ্ঞানসম্মত উন্নত ধরণের ট্রেনিংও শিক্ষার্থীরা পাবেন না এবং তা' হ'লে কোচিং সেণ্টার স্থাপনের উদ্দেশ্যও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। তাই উপযুক্ত ট্রেনার নিয়োগের উপর আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ নজর দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এর জন্য গভর্ণমেণ্টের সাহায্যেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং সে সাহায্য নিতে হবে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী, ক্রীড়াক্ষেত্রের কলঙ্ক এই মুষ্টিমেয় দুর্বিনীতদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে। আশা করি জনসাধারণ এর তাৎপর্য্য বুঝে এই দুর্নীতি নিবারণে সচেষ্ট হবেন। এই সূত্রে আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন কঠোর হস্তে এই দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা করেন। যদি কোন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ তাঁদের প্রিয় দলের পরাজয় সহ্য করতে না পেরে ক্রীড়াক্ষেত্রের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অরাজকতা সৃষ্টির দ্বারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে' পূর্ণ সময়ের পূর্ব্বেই খেলার অবাঞ্ছিত সমাপ্তি ঘটায় এবং যদি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় তা' হ'লে সেই অভিযুক্ত ক্লাবকে সেই অসমাপ্ত খেলায় পরাজিত বলেই আই-এফ-এ কে রায় দিতে হবে। তার ওপর সেই অভিযুক্ত ক্লাবকে সতর্ক করে দিতে হবে যে ভবিষ্যতে যেন এরূপ নিন্দনীয় আচরণ তাঁদের ক্লাবের সভ্যরা না করেন এবং করলে আরও কঠোর শাস্তি দিতে আই-এফ-এ বাধ্য হবেন। এইরূপ সতর্কীকরণের পরও যদি সেই ক্লাবের সভ্যরা পুনরায় কোনদিন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন তা' হ'লে আই-এফ-এ'র একমাত্র কার্য্য হবে সেই ক্লাবকে তৎক্ষণাৎ সাস্‌পেণ্ড করা। এই সঙ্গে আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষকেও জানাচ্ছি যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে খেলার মাঠের সুস্থ আবহাওয়াকে নষ্ট করা, হতভাগ্য রেফারীকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করা, বিপক্ষের খেলোয়াড়দের লাঞ্ছিত করা, এই রকম সব জঘন্য অপরাধের কঠোর শাস্তিবিধান করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি যদি আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষের না থাকে তা' হ'লে তাঁদের ও গভর্ণমেণ্টের উচিত এইখানেই কলিকাতার ফুটবল খেলার সমাপ্তি ঘটিয়ে এই সব গুণ্ডাগোষ্ঠীর নিষ্পত্তি করে নিরীহ, ভদ্র দর্শক ও রেফারীদের অহেতুক লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি দান করা।

ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজন

এই সঙ্গে সেই অতি পুরাতন, বহুবার আলোচিত ও সমবার প্রত্যাখ্যাত, স্থানাভাবে নির্য্যাতিত ফুটবল দর্শকদের স্বপ্ন, সেই ষ্টেডিয়ামের কথা আবার আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পথে আনবার জন্য উল্লেখ করছি। ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধান নগরী ও ভারতীয় ফুটবলের প্রধান কেন্দ্রে একটি ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা বিশদ ভাবে আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র—বিশেষ করে অতীতে বহুবার আলোচিত হয়ে যখন এই আলোচনা প্রায় তিক্ত হয়ে উঠেছে। ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজন যে কতটা তা ভুক্তভোগী দর্শক মাত্রই জানেন। আর শুধু দর্শকগণই বা কেন? খেলোয়াড়গণ, আই-এফ-এ'র কর্ম্মকর্ত্তাগণ ও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষও এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত আছেন। মাঠের অর্দ্ধেক গোলমাল ঢুকতে না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট দর্শকেরাই অনেক সময়ে করে থাকেন এবং তার যথেষ্ট কারণও আছে। সারাদিন রোদ বৃষ্টি সহ্য করে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও হয়ত শেষ সময়ে টিকিট পাওয়া গেল না, কিংবা পাওয়া গেলেও ভেতরে ঢুকে ভিড়ের চোটে হয়ত খেলা ভাল রকম দেখাই গেল না—নিজেদের মধ্যে গালাগালি, হাতাহাতি, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্য দিয়েই খেলা দেখার উত্তেজনার পরিসমাপ্তি হল! অবশ্য আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষকে খেলার ব্যবস্থা করতে ততটা ভুগতে হয় না—যতটা ভুগতে হয় সাধারণ দর্শকদের প্রবেশ করতে গিয়ে এবং পুলিশকে শৃঙ্খলা রাখতে গিয়ে। তাই বোধ হয় ষ্টেডিয়ামের একান্ত প্রয়োজনায়তাটা ফুটবল কর্ণধারগণ ঠিক মত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না বলে মনে হয়। যাই হোক কর্ত্তব্যের খাতিরে ও প্রয়োজনের তাগিদে আমরা আবার তাঁদের ও গভর্ণমেণ্টকে মনে করিয়ে দিচ্ছি অবিলম্বে ষ্টেডিয়াম প্রস্তুতের একান্ত আবশ্যকতা। বাধা যদিও কিছু থাকে তা অলঙ্ঘনীয় বলে মনে হয় না এবং প্রয়োজন যেখানে বড় সেখানে বাধাকে পথ থেকে সরাতেই হবে—বিশেষ করে জনসাধারণের সুবিধার দিকে চেয়ে। স্থানাভাবের অজুহাতও টিকতে পারে না ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন বিরাট ময়দান, প্রশস্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড ও উপযুক্ত ইডেন উদ্যান রয়েছে বলে। আশা করি আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষ ও গভর্ণমেণ্ট তাঁদের চিরাচরিত আলস্য ছেড়ে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের [illegible] অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল ঃ

প্রথম বিভাগের লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। লীগের প্রথমার্দ্ধে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১৩টা খেলায় ২৩ পয়েণ্ট পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আজ পর্য্যন্ত সেইস্থানেই আছে। লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় তাদের হার একটা, মোহনবাগানের সঙ্গে ১-০ গোলে পেনাল্টিতে এবং একটা খেলা গোলশূন্য ড্র ছিল, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে। দ্বিতীয় স্থানে ছিল গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং ; ২১ পেয়েণ্ট ; খেলা ড্র ৩, হার ১ রেঞ্জার্সের সঙ্গে। প্রথম বিভাগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় মহমেডান-রেঞ্জার্সের খেলার ফলাফলই ক্রীড়ামহলে একমাত্র বিস্ময়ের বস্তু ছিল। লীগের তালিকায় রেঞ্জার্সের স্থান ১৩, অশুভ সংখ্যার জন্য খেলার ফলাফলও মন্দ ; কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে খেলায় জয়লাভ ক'রে এই দলটি ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই জয়লাভটা যেন খারাপ অবস্থার মধ্যে হঠাৎ রেঞ্জার্সের টিকিট পাওয়ার মতই। ইষ্টবেঙ্গলের থেকে ৪ পয়েণ্ট এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের থেকে ২ পয়েণ্ট পিছিয়ে মোহনবাগানের স্থান ছিল তৃতীয়। ভবানীপুর ক্লাব খেলার প্রথম দিকে অপরাজিত অবস্থায় লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে ছিল। কালীঘাটের কাছে ৪-০ গোলে শোচনীয় ভাবে পরাজয়ের পর থেকেই তাদের খেলার অবনতি ঘটেছে। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাই এর মূল কারণ। লীগের প্রথমার্দ্ধে ২টি চ্যারিটি খেলা হয়েছে। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ; ইষ্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং। দুটি খেলাতেই বিপুল জনসমাগম হয়েছিলো। খেলার দিক থেকে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলাটি ভাল হয়েছিলো তবে খেলায় তেমন উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় চ্যারিটি ম্যাচের ফলাফল খেলার সমতা রক্ষা করেছে কিন্তু খেলা দেখে দর্শকরা হতাশ হয়েছেন। দুই দলই আড়ষ্ট হয়ে খেলেছে ; গোলের সহজ সুযোগের যথাসময়ে সদ্ব্যবহার না ক'রে অযথা বল ড্রিবল ক'রে বিপক্ষদলকে আত্মরক্ষায় সময় দিয়েছে। ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের এ দুর্ব্বলতা সেদিন বেশী চোখে পড়েছে।

লীগের ফিরতি খেলায় ক্যালকাটা ৪-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত ক'রে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। অপর দিকে ক্যালকাটা গ্যারিসন করেছে ভবানীপুরকে ৪-০ গোলে হারিয়ে। নতুন খেলোয়াড় আনিয়ে ক্যাল: গ্যারিসন নিজ দলকে ঢেলে সাজিয়েছে। লীগের খেলায় যে এরকম হবে গত মাসে তার আভাস দিয়েছিলাম। খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলতে কিছু নেই। যেমন লীগের প্রথমার্দ্ধে স্পোর্টিং ইউনিয়ন-মহমেডান দলের খেলা ১-১ গোলে ড্র যায়। ফিরতি খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ভাল খেলে রেলওয়ে স্পোর্টসকে ২-১ গোলে হারায়। মহমেডান-রেল দলের ফিরতি খেলা ড্র যায়। সেই হেতু ক্রীড়ামোদীরা ধারণা করেছিলেন স্পোর্টিং ইউনিয়ন-মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ফিরতি খেলায় মহমেডান দলকে জয়লাভ করতে বেশ বেগ পেতে হবে। কিন্তু দেখা গেল মহমেডান স্পোর্টিং সহজেই ৬-০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়ে দু'পয়েণ্ট পেল। এ পর্য্যন্ত লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। ১৯টা খেলায় ৩৫ পয়েণ্ট। গোল 'এভারেজ' খুবই ভাল ৫৮টা গোল দিয়ে মাত্র ৪টে গোল খেয়েছে। ড্র ১টা হার ১টা। ইষ্টবেঙ্গল-এরিয়ান্সের ফিরতি খেলায় এরিয়ান্স খেলা শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে পর্য্যন্ত ২-১ গোলে অগ্রগামী ছিল। একদল উচ্ছৃঙ্খল দর্শক রেফারিকে আক্রমণ করায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৬ মিনিট পূর্ব্বে খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই খেলা সম্পর্কে আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষ এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। ইষ্টবেঙ্গলের বাকি খেলার মধ্যে বড় খেলা ২টো, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে। যদি ধরা যায়, এই দুটো খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের হার হয় এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে অসমাপ্ত খেলার সে দিনের ফলাফলকে স্বীকার ক'রে নিতে হয় অথবা দু' একটা খেলা ড্র যায়
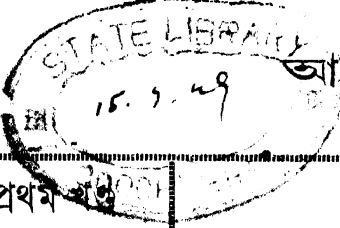
আশ্বিন—১৩৫৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও "বন্দেমাতরম"

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের অনিবার্য্য দাবী

রিশালের প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মেলন ; বাংলা দেশের জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ ভায় উপস্থিত, বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিগণের অপূর্ব্ব সমাবেশ ইয়াছে,—সারিবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্য দিয়া নির্ব্বাচিত সভাপতি র্ব্বজন-প্রিয় নেতা বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ সভামঞ্চের নিকট আসিয়া াড়াইলেন, চারিদিকের জনসমুদ্র নি উথলিয়া উঠিল—সমবেত কণ্ঠে ধনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"বন্দেমাতরম্।"

সম্মেলনের চারিদিকে লাল-পাগড়ীর বহর ও 'রেগুলেশন' লাঠির ক ঠক শব্দে সন্ত্রাসিত জনতা একবার আগাইয়া আসিতেছে, একবার পেছনে হটিয়া যাইতেছে। চারিদিকে যেন কেমন একটা থমথমে ভাব। স্মেলনের কাজ আরম্ভ হইল "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর। কিছুক্ষণের মধ্যে কোথা হইতে কি হইল কে জানে—পুলিশের লাঠিতে প্যাণ্ডেল ভাঙিল—নরনারী শিশু নির্ব্বিশেষে অধিকাংশ লোক আহত হইল ; কিন্তু সেই বিধ্বস্ত-সভা-প্রাঙ্গণে সমবেত দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল—বন্দেমাতরম। সে ধ্বনি মুহুর্মুহু চারিদিক হইতে উত্থিত হইয়া সমগ্র পুলিশবাহিনীকেও যেন সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

দেখা গেল, স্বেচ্ছাসেবক চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতাকে পুলিশ প্রহার করিতেছে —এবং পুষ্করিণীতে নাকানি চুবানি খাওয়াইতেছে। ইংরাজ শাসনের কড়া আইনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত প্রহরী বাঙালী ও বিহারী পুলিশ পুঙ্গবের দল সত্যই সেদিন ইংরাজ সরকারের নিমকের মর্য্যাদা রাখিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যতবার মুখ বন্ধ করিবার জন্য পুলিশ চিত্তরঞ্জনকে জলে ডুবাইতে লাগিল—বাংলাদেশের অত্যাচারিত যুবশক্তির প্রতীক কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক চিত্তরঞ্জন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় জলের উপরে মাথাটা তুলিতে পারিলেই পরিশ্রান্ত কিন্তু নির্ভিক কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—"বন্দেমাতরম"! "বন্দেমাতরম" !!

তাহার পর অর্থাৎ ১৯০৫ সাল হইতে ১৯৪৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত "বন্দেমাতরম" ধ্বনির তাৎপর্য্য ও সার্থকতা আমরা নানাভাবে নানা ক্ষেত্রে উপলব্ধি করিলাম। দেশের স্বাধীনতা লাভের দুর্দ্দমনীয়

আকাঙ্ক্ষায় বাংলার বিপ্লবীগণ হাতে হাত-কড়া পরিবার সময় অনির্দিষ্ট যাত্রার পথে নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারণ করিল "বন্দেমাতরম,"—কারাগারের দুর্ভেদ্য লৌহ কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একান্ত অপরিচিত কারাজীবনের নির্ম্মম কঠোরতা ও নির্য্যাতনের কথা তাহারা ভাবিল না—বন্দীজীবনের পরম গৌরব অর্জ্জন করিয়া প্রবেশপথে ধ্বনি তুলিল—"বন্দেমাতরম"। কারাগৃহের অর্গল বন্ধ হইয়া গেল—প্রাচীরের অন্তরাল হইতে কাণে আসিতে লাগিল—"বন্দেমাতরম"—কারাবাসী সহকর্ম্মী বিপ্লবীর দল রুদ্ধ কক্ষ হইতে সানন্দে নূতন বন্দীকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিতেছে—"বন্দেমাতরম"; ফাঁসির মঞ্চে উঠিবার সময় সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজের হাতে ফাঁসির রজ্জু লইয়া আপনার গলায় পরিতে পরিতে বলিয়া উঠিল "বন্দেমাতরম"; সেই মৃত্যুঞ্জয়ী নাম 'বন্দেমাতরম' শুনিয়া জেলার সাহেব এক পা পিছাইয়া গেল, ফিরিঙ্গি ওয়ার্ডার মাথা নীচু করিল, জহ্লাদের হাতের মধ্যে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎবহ্নি খেলিয়া গেল—তাহার বুকও যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল—মুখোস পরিতে পরিতে মৃত্যুকে একেবারে মুখোমুখি দেখিতে পাইয়াও বীর বিপ্লবী বাঙালীর কণ্ঠে অকুতোভয়ে ধ্বনিত হইল—"বন্দেমাতরম।"—চিতাভস্ম হাতির দাঁতের কৌটায় রাখিতে রাখিতে আমাদের ঘরের মা-বোনেরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "বন্দেমাতরম"—কুলবধূ মাথায় ছোঁয়াইয়া "বন্দেমাতরম" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নারায়ণের সিংহাসনের তলে সেই ভস্ম শ্রদ্ধাভরে স্থাপন করিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন। সে যুগের স্মৃতি এখনও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই।

দেশের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক মাঙ্গলিক মন্ত্র "বন্দেমাতরম"—সভাগৃহে হর্ষধ্বনিতে "বন্দেমাতরম"—নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে "বন্দেমাতরম"—বক্তৃতা আরম্ভে "বন্দেমাতরম" এবং শেষে "বন্দেমাতরম"। শহীদ বরণে—"বন্দেমাতরম",—শোকযাত্রায় "বন্দেমাতরম"। এমনি ভাবে স্বদেশীযুগের সঞ্জীবনী মন্ত্র ছিল বন্দেমাতরম, বিপ্লবীরা বুকের রক্ত দিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরের সময় উচ্চারণ করিতেন "বন্দেমাতরম"—এক কথায় দেশের প্রতি ধূলায়, দেশবাসীর প্রতি অণুপরমাণুতে এই "বন্দেমাতরম" ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে—এই পবিত্র মন্ত্রধ্বনি স্বকীয় মাহাত্ম্যে এমন একটি ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছে যে তাহাকে বাদ দিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হইতেই পারে না। স্বাধীনতা লাভের পরও নূতন যে ইতিহাসের আজ সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে—বন্দেমাতরমকে বাদ দিলে তাহারও সার্থকতা বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে—বহুজীবনের শোণিত ধারায় অভিষিক্ত এই মহামন্ত্রটি ভুলিয়া গেলে মাতৃপূজার অঙ্গহানি হইবে—শুভকর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিবে—সন্তানের সে পূজা মা কখনই গ্রহণ করিবেন না।

তাই বলিতেছিলাম বন্দেমাতরম ছাড়িয়া বাংলা দেশ বাংলা নহে, বাঙালীও বাঙালী নহে—ভারতবর্ষও ভারতবর্ষ থাকিবে না—তাহার যুগ যুগান্তরের ঐশ্বর্য্য, গৌরব, ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বন্দেমাতরম—বাঙালীর জীবনের পরমায়ু—ভারতবাসীর প্রাণস্পন্দন—তাহাকে বাদ দিয়া বাঙালী বাঁচিবে না, ভারতবাসীও বাঁচিতে পারে না—তাহার বৈপ্লবিক আদর্শ ও চিন্তাধারার উৎস রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত

সম্প্রতি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে "বন্দেমাতরম"কে গ্রহণ করিবার পক্ষে দ্বিমত হইয়াছে দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। বিশেষ আশার কথা এই যে এক পূর্ব্ব-পাঞ্জাব ছাড়া ভারতের সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস বন্দেমাতরম সঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ করিয়াছেন এবং এই কার্য্যের অগ্রণী হইয়াছে—যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। আমরা বাঙালী—আমাদের মনে আনন্দ হয় যখন দেখি, ভিন্ন ভাষা-ভাষী প্রদেশও "বন্দেমাতরম"এর ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে তাহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু বাঙালী হইয়া ইহার জন্য আমরা কি করিয়াছি? কাগজে কাগজে অল্পাধিক লেখালেখি করিয়াছি সত্য—তাহাও সম্পাদকীয় হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য নহে—খবরের কাগজের চিঠিপত্রের কলমে পত্রাঘাত করিয়া অর্থাৎ ভিড় পাড়িয়া দেবতার মাথায় ফুল দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তেমন তীব্রভাবে আন্দোলন করি নাই—ঘরে ঘরে প্রতিবাদ উঠে নাই—সভাসমিতিতে জনসাধারণের দৃঢ় মতকেও মুখর হইয়া উঠিতে দেখা যায় নাই। 'হইলে ভাল হইত'—ভাবটা আমাদের এইরূপ।

আমরা অবশ্য বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সম্পূর্ণ অংশকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী নহি। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেস যে অংশটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই অংশটুকু গৃহীত হইলেই আমরা সুখী হইব। তাহা হইলে অন্য কোনও সম্প্রদায়ের আপত্তির কোনও কারণ থাকিবে না।

আপত্তি উঠিয়াছে, উহা সমবেত কণ্ঠে বা রুট মার্চ্চের অর্থাৎ সামরিক সুরতাল সমন্বয়ে গীত হইতে পারে না।

এ আপত্তির মধ্যে যৌক্তিকতা কতখানি আছে তাহার বিচার করিবেন সুরজ্ঞেরা—তিমিরবরণের সঙ্গত-পরিষদ হয়ত ইহার একটা নিষ্পত্তি করিতে পারেন। তবে ইহা দেশ-প্রীতি জাগাইবার পক্ষে কার্য্যকরী নহে—এ কথার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই। কারণ আমরা দেখিয়াছি কোনও অনুষ্ঠানে বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি সুষ্ঠুভাবে গীত হইলে দেশমাতৃকার প্রতি স্বভাবতই ভক্তিপূর্ণ অনুভূতি জাগে, বন্দেমাতরম'এর ইতিহাসের কথা মনে পড়িয়া অন্তরে উদ্দীপনা আসে। "যুদ্ধং দেহি" "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া মাল কোঁচা আঁটিয়া লাফাইয়া উঠিবার ইচ্ছা না হইলেও—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের গুণে প্রয়োজন হইলে—সুযোগ ঘটিলে মানুষ যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হইতে পারে—। প্রয়োজন হইলে ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প একদিন যেমন প্রয়োজনেই জাগিয়াছিল—তেমনই সংকল্প পুনরায় গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও অনায়াসে জাগিতে পারে। প্রশ্ন সেখানে নহে—যাঁহারা 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত বর্জ্জন করিতে চাহেন—তাহাদের কল্পনাশক্তি ও মুক্তি-সাধনার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার একান্ত অভাব ঘটিয়াছে—সেইখানেই এ সকল অবান্তর প্রশ্ন উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে কৃষ্ণ উদয়ভারকার তাঁহার একটি প্রবন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন :—

"Bankim Chandra Chatterjee is in a deep slumber today—in a sleep of eternity * * * but his "Vandemataram" is the trumpet-Call of the Nation to awake into national consciousness, political unity and integration, social and economic solidarity and international fraternity. The message he has left behind in his Song, echoes and re-echoes in the patriotic hearts of the people, while their pulses throb with convergent life and inspiration every time it is sung."

অর্থাৎ আজ বঙ্কিমচন্দ্র অন্তিমশয়ানে চিরনিদ্রায় রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহার বন্দেমাতরম আজ জাতিকে স্বজাত্যবোধে জাগ্রত হইতে, রাজনৈতিক ঐক্যে ও সংঘবদ্ধতায়,সামাজিক ও অর্থ নৈতিক একত্বে এবং আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র্যে মিলিত হইবার জন্য ভেরী নিনাদে আহ্বান করিতেছে। এই সঙ্গীতে তিনি যে বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, জাতির দেশপ্রীতিপূর্ণ অন্তরে তাহাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।—এবং যখনই এ সঙ্গীত গীত হয় তখনই নবজীবনের উন্মাদনা ও প্রেরণায় তাহাদের ধমনী নাচিয়া উঠে।"

এই 'বন্দেমাতরম' গান সারা দেশেময় জাতীয় জীবনের উন্মাদনা জাগাইয়াছে, —আজিকার এই স্বাধীন জাতি-গঠনের মূলে রহিয়াছে বঙ্কিমের এই গান—সেই গানের শব্দ-তরঙ্গ বায়ুস্তর ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠে, ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হইয়া আমাদের গর্ব্বের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

বিংশ শতকের প্রাক্কালে, বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ছিল বঙ্কিমের—তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, ধর্ম্মগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন অবদান ছাড়া তিনি অমর সঙ্গীত বন্দেমাতরমের স্রষ্টা বলিয়া অভিনন্দিত হইবার যোগ্য। তাই স্বাধীনতার অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে শুধু এই গানের জন্যই তাঁহার স্থান হওয়া উচিত পুরোভাগে। স্বর্গীয় প্রেরণা হইতে এ গানের উদ্ভব—ভারতের সেই দুর্দ্দিনে বুকের রক্ত ও চোখের জলে লেখা এই গান—ভারতবাসীর অন্তরে ও মনে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছে। ঐক্য ও দেশপ্রীতিতে বিশ্বজাতির সঙ্গে একত্ববোধে—'বন্দেমাতরম'কে স্বাধীন ভারতের 'মার্সাই' (**Marseiles**) বলিয়া অভিহিত করা যায়।

"বন্দেমাতরম"এর উৎপত্তি ও প্রভাব

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিম ছিলেন ব্রিটিশ নীতির বিরোধী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন (Permanent Settlement) বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। সেদিন দরিদ্র ভারতের কাঙাল কৃষকদিগকে পল্লী-ধ্বংসের হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী উদ্যত হইয়া উঠিল। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বে-আইনী ও ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষণা করিলেন, সমগ্র জাতিকে এই প্রথা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে বলিয়া বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে উহার সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ বৈপ্লাবিক ভাব—সাধনা হইতেই "বন্দেমাতরমে"র উদ্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ"এ। দেশের মুক্তি সাধনার এই মন্ত্র লোকলোচনের অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ মঠের সন্তানগণ গাহিতে লাগিলেন; সেই সঙ্গীতের ভাষায় ও ভাব-ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিল বিপ্লবী সন্তানগণের মাতৃপূজার স্বরূপ।

ইহার পর বন্দেমাতরম সঙ্গীত প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ লুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় সভায় বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি গীত হইলে সভাস্থ সকলে তাহার সুরে সুর মিলাইয়া সমবেত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলে সেখানে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হইত। এই সঙ্গীত সেদিন বাংলার যুবশক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিল, কারাগারে রাজবন্দীরা সে সঙ্গীতে তাহাদের ক্লান্তি, অবসাদ ও নৈরাশ্য ভুলিল,—গৃহে গৃহে জননী ভগ্নীরা সে সঙ্গীতে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ—বেদনায় সান্ত্বনা লাভ করিল।

সে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বঙ্গদেশ হইতে অন্য প্রদেশে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল—ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সুরু হইল সেদিন 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে।

১৯০৬ সালে দাদাভাই নওরোজির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় মহাসভার উদ্বোধন হইল এই বন্দেমাতরম সঙ্গীতে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসের সূচনা হইল 'বন্দেমাতরম'এর পটভূমি ও আদর্শে। ১৯০৬ সাল হইতে সেদিন পর্য্যন্ত জাতীয় মহাসভায় জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ইহাই গীত হইয়াছে—দেশসেবকগণ এই সঙ্গীতকেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি সকলের মনে, বিশেষতঃ বাঙালীর মনে নানা কারণে সন্দেহ জাগিয়াছে—হয়ত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গণপরিষদে গৃহীত হইবে না। অথচ এতদিন আমরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'বন্দেমাতরম'কে প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।

কিছুকাল পূর্ব্বে 'বন্দেমাতরম'কে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী বলিয়া কলঙ্কিত (?) করা হইয়াছিল এবং কেহ সে গান গাহিলে তাহাকে কারারুদ্ধ করা হইত। বন্দেমাতরম এদেশের খেলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনে বিপুল উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল—ইহা আমরা সকলেই জানি। সেদিনও উহা হিন্দুধর্ম্মভাবাপন্ন বলিয়া মুসলমান ভাইদের তরফ হইতে কোনও আপত্তি উঠিতে শুনা যায় নাই। বন্দেমাতরম সঙ্গীতে সেদিন আমরা মনে নূতন বল পাইয়া নূতন ভরসায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছি। 'বন্দেমাতরম' ত শুধু গান নহে, ইহা যে মন্ত্র, তাই বন্দেমাতরম অশেষ অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করিবার ক্ষমতা দিয়াছে, অভাবিত অসম্ভব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সাহস দিয়াছে,—বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কত দেশসেবক অকাতরে সানন্দে মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন। ধর্ম্ম ও ভাষার প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, বন্দেমাতরম ক্রমশঃ সকল প্রদেশকে একসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে জাতীয় সংস্কৃতি [illegible]

করিয়া তুলিয়াছে একথা আজ কে অস্বীকার করিবে? "বন্দেমাতরম"এর স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই কারণে জাতীয় সঙ্গীতের জনক বলা যাইতে পারে।

বন্দেমাতরম ও জাতীয় পতাকা একই পদকের দুইটি দিক—অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য। সেদিন পর্য্যন্ত ভারতের সকল প্রদেশ গর্ব্বের সহিত বন্দেমাতরম সঙ্গীত গাহিয়াছে—আজ কিন্তু সেই অপ্রতিহত অফুরন্ত ধারায় আমরা তালভঙ্গ হইতে শুনিতেছি—ইহা খুবই দুঃখের কথা।

জাতীয় সঙ্গীত নির্ব্বাচনে মতদ্বৈধ

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কোনটি হইবে তাহা লইয়া এ পর্য্যন্ত বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম', মহম্মদ ইকবালের "হিন্দুস্থান হমারা" এবং রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন-অধিনায়ক"—। রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীতটিকে ডাঃ কাজিনস্ (Dr. Couzins) ভারতের প্রভাত সঙ্গীত ("Morning song of India") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইকবালের "হিন্দুস্থান হমারা" সঙ্গীতটি এমনি দেশাত্মবোধক ও উচ্চাঙ্গের যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উহা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গাহিয়াছে। পরে হিন্দু মহাসভা এই গানখানির উর্দ্দু ভাষার জন্য বোধহয় ইহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। তাই এই গানখানি তাহাদের সমর্থন পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। এ সঙ্গীতটিও অমরত্বের দাবী করিতে পারে।

আজ খরগস ও কচ্ছপের পাল্লাপাল্লি হইতেছে—"বন্দেমাতরম"ও "জনগণমন"এর মধ্যে। একই প্রদেশে এই দুইখানি গানের জন্ম এবং দুইখানিই বিশেষ জনপ্রিয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ইহাদের মধ্যে কোনখানি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গৃহীত হইবে। দুইখানি গানের গুণ বিচার করিলে দেখা যায় "জনগণ" সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে, ইহার সুরও খুব আরোহী—উচ্চগ্রামে হৃদয়-উন্মাদক। কবিতা হিসাবেও ইহা অনবদ্য—ইহাতে উন্মাদনা আছে, স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা আছে, এবং ইহার দৃষ্টিও সুদূর প্রসারী—স্বদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। সুরটিও যে কোনও ভাষাভাষী সহজেই ধরিতে পারে।

"জনগণ"এর সুরে পাশ্চাত্য আরোহ অবরোহের মাত্রা বা 'গ্রাম' আছে। ইহার উচ্চারণে বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য থাকাই স্বাভাবিক এবং ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিটিও একান্ত বাঙালীর। ইহার কথাগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে গাহিতে পারা কঠিন হইলেও ইহার মধ্যে যে আধুনিক মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে ইহা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে এবং দেশের লোকের চিত্ত অধিকার করিয়া লইবার মত ইহার আবেদনও যথেষ্ট আছে বলিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রধানতম কবি—তিনি কবিগুরু বলিয়া আখ্যাত ও পূজিত—তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাইয়া আসিতেছি, অন্তর দিয়া তাঁহাকে আমরা ভালবাসিয়াছি। তাঁহার স্মৃতির সৌরভে আমাদের দেশ আমোদিত হইয়া আছে। হয়ত তাঁহার সঙ্গীত বন্দেমাতরম অপেক্ষা আমাদের উপর অধিকতর প্রভাবও বিস্তার করিয়াছে।

দেশের যুবকগণ হয়ত "জনগণ"কেই অধিক পছন্দ করিবে এবং হয়ত তাহারা "বন্দেমাতরম"এর শ্রেষ্ঠত্ব, ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে আমোল দিবে না। কিন্তু কোনও সঙ্গীতের জনপ্রিয়তাই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃত হইবার দাবী রাখিতে পারে না।

সুখের বিষয় কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি 'বন্দেমাতরম'এর দুইটি চরণ মাত্র রাখিয়া ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ফ্রান্সের মার্সাই সঙ্গীতের মত দেশ ও জাতির অতীত ইতিহাসের সহিত সম্পর্কিত সঙ্গীতই কোনও দেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইতে পারে। কাজে কাজেই রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ' অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হইবার পক্ষে কোনও বাধা নাই। কিন্তু এই 'বন্দেমাতরম' এর কথা স্বতন্ত্র। দেশের অতীতের গৌরবময় ইতিহাসের সহিত ইহার সুগভীর সম্পর্ক—"অতীত গৌরবময়ী" ইহার বাণী। বিপ্লবী ভারতের সমর-ধ্বনি ছিল এই "বন্দেমাতরম"। আজাদ হিন্দ ফৌজের 'দিল্লী চলো' গানের পর্য্যায়ে না পড়িলেও—"জনগণে"র আবেদন কতকটা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিকট আবেদন—কিন্তু জনগণের কাছে ইহার সুনির্ব্বাচিত বাক্যাবলি ও উচ্চাঙ্গের কাব্য-সম্পদের বিশেষ কোনও আবেদন না থাকাই সম্ভব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "বন্দেমাতরমে"র মধ্যে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য বেশী—সংস্কৃত ভারতের ভাষা হইলেও সাধারণ সে ভাষা বুঝিতে পারে না। কিন্তু 'বন্দেমাতরম'এর সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অন্যান্য ভাষার এমনই একটা মিল আছে যে তাহারই জন্য এ পর্য্যন্ত আন্ধ্রার দিক দিয়া কোনও আপত্তি কোনও প্রদেশ হইতেই উঠে নাই। কেহ কেহ এমনও বলেন যে সেই কারণেই অর্থাৎ ভাষার সুবোধ্যতার জন্যই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিন্দুস্থানীতে রচিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ হিন্দুস্থানী ভাষা যেন আমাদের দেশের আপামর সাধারণ জানে এবং বুঝে। অন্ততঃ বাংলা মাদ্রাজ উড়িষ্যার ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। অবশ্য সর্ব্ব-ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা—দুর্ব্বোধ্য হওয়া উচিত নহে এবং তাহার মধ্যে জয়-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার মত আহ্বান ও আবেদন থাকা দরকার! আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে অরকেষ্ট্রার সুর সংযোগের অবসর থাকা চাই—এ দাবীও উঠিয়াছে। অরকেষ্ট্রা ভারতীয় সুর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায় না—উহা সম্পূর্ণ বৈদেশিক। ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে ভারতীয় বাদ্য যন্ত্রের সুর সংযোগে গীত হইবার সুযোগ থাকা একান্ত দরকার এবং তাহার পটভূমি যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বর্জ্জিত হইবে ইহাও কল্পনা করিতে কষ্ট হয়। পণ্ডিত নেহের বলিয়াছেন—ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কোনটি হইবে তাহা এখনও পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদিগকে "জনগণ" গানটি অভ্যাস করিতে দেখা যাইতেছে। 'বন্দেমাতরম'কে অনুবাদ করিবার চেষ্টাও আমরা দেখিতেছি। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে গীত হইবার জন্য কোনও জাতীয় সঙ্গীতের উদ্ভব হয় না। মার্সাই'এর মত যে গান বিপ্লবের মধ্যে অন্তর হইতে জাগিয়া উঠে—তাহাই দেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে আত্ম প্রকাশ করে। কেবল রাজনৈতিক নেতৃবর্গ লইয়া নহে—দেশের বিখ্যাত কবি, ও সুরশিল্পী—গীতকার ও সাহিত্যিকদের লইয়া অবিলম্বে একটি সমিতি গঠন করা উচিত। তাঁহারা সঙ্গীতের ভাষা, ভাব, ও সুরের সমতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—এমন একটি সঙ্গীতের নির্ব্বাচন করিবেন যাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইয়া ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। আমাদের বিশ্বাস উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইলে এই সমিতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতটিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না। "বন্দেমাতরম"!

শ্রীপঞ্চমী

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত সংকল্পটা স্থিরই হ'য়ে গেলো। আমার দিনপঞ্জিকার মোটা খাতাখানা পুড়িয়ে ফেলব। ইতিপূর্বে এ চেষ্টা যে করিনি তা নয়, কিন্তু শেষ অবধি মমতার দুর্বলতায় পেছিয়ে এসেছি। আমার যে সব কাহিনী কারোর কাছে প্রকাশ হয়নি, কোনোদিন হবেও না, যে বেদনা কারোর কাছে ব্যক্ত করিনি এবং যা চিরদিন অব্যক্তই থেকে যাবে, সে সব উজ্জ্বল ও জীবন্ত হ'য়ে আছে এই ডায়ারীর বুকে। কালের যে দুর্নিবার প্রবাহ অন্তর্জীবনের সঞ্চয়কে নিরন্তর সীমাহীনতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, একমাত্র শব্দের অব্যর্থ বাঁধন ঠেকাতে পারে কালের সেই অমোঘ নিয়তি নিয়মকে, তার প্রবাহকে পারে গ্রন্থিচ্যুত ক'রে বর্তমানের মধ্যে শাশ্বত ক'রে রাখতে। জীবনের বহুমূল্যে অর্জিত সেই সব পরম সঞ্চয়গুলিকে আগুনের বুকে আহুতি দেবার আগে একটিবার তার গভীর স্পর্শ পাবার জন্যে মনটা কেমন লোভাতুর হ'য়ে উঠল।

বাড়ির ত্রিতলের একটি টেরে আমার ঘরটি। বৈকালে খাতাখানি নিয়ে আবার পড়তে বসি টেবিলে। এই দু'দিনে শেষের দিকে এসে গেছি।

ওদিকে নিচের তলায় ছোট ছেলেমেয়েদের কলরব ছুটোছুটি। কিছুতেই আর ভুলে থাকতে পাচ্ছিনে, আগামী কাল বাড়িতে শ্রীপঞ্চমী উৎসব। গতবারের উৎসবের কথাটা কেবলই পাক খাচ্ছে মনে। পড়তে পড়তে একবার ক'রে থেমে যাই, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে অল্পক্ষণ বসি, তারপর একসময় গা-ঝাড়া দিয়ে বিক্ষিপ্ত মনটাকে কঠোরভাবে সংহত করি দিনপঞ্জিকার বুকে :

'আজ বাড়িতে এসে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম, জাড়তুতো দাদার বড় মেয়ে মায়ার স্বামী মারা গেছে। এই দু'বছর হ'লো তাদের বিয়ে হ'য়েছে। রূপে গুণে কী জামাই পেয়েছিলো বড়দা…পঙ্কিদির অমন উপযুক্ত ছেলের মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিছুদিন আগে সে জামসেদপুর থেকে এসে আমাদের বাড়িতে না ঢুকে সারারাত্রি গলিতে ঘোরাফেরা ক'রেছে। সকালে তাকে বাড়িতে আনা হ'লো, সম্পূর্ণ উন্মাদ। কিছুদিন কাছে রেখে বড়দা লোক দিয়ে তাকে জামসেদপুরে পাঠিয়ে দিলে মা বাবার কাছে…রেল ভাগ হওয়ায় দাদা কলকাতা থেকে বদলী হ'য়ে বহুদূর প্রদেশে নির্বাসিত হ'লো। দাদা বাইরে চ'লে যাওয়ায় বড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হ'লো আমাদের। দাদার ছেলেমেয়েরা থাকল কলকাতায় আমাদের কাছে—বুলু প্রণব ওঙ্কার মঞ্জু। বৌদির মৃত্যুর পর সেই শিশু অবস্থা থেকে ওঙ্কার ও মঞ্জু আমারই কাছে মানুষ…আজ জামসেদপুর থেকে চিঠি এলো, কদিন প্রবল জ্বরভোগের পর পঙ্কিদির উন্মাদ ছেলেটি মায়ের কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। চিকিৎসার গুণে ছেলেটি ক্রমশঃ আরোগ্যের পথেই যাচ্ছিল এবং ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করত।…ওঙ্কার স্কুলে পড়ছে, মঞ্জু বাড়িতে। মঞ্জুটার একদম পড়ার চাড় নেই। কেবল হাতমুখ নেড়ে পাকা-পাকা কথা আর তার ছোড়দা ওঙ্কারের সঙ্গে ঝগড়া। দু'পক্ষের নালিশ শুনতে শুনতে আমার প্রাণান্ত। লেখাপড়ায় ওঙ্কার আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। এবারেও ডবল প্রমোশন পেয়ে ক্লাশে উঠেছে। সে ক্লাসের মনিটার, খেলায় দলপতি। লেখা-পড়ায় গানে মূর্তিনির্মাণে এবং নানারকম ছোটবড় কর্মের পরিকল্পনায় তার কৃতিত্ব আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি তার মমতা ও নিষ্ঠায়। এই লেলিহান হিংসা ও দৈন্যভরা পৃথিবীতে এমন অপূর্ব জীবন-নিষ্ঠা ঐ বালক পেলো কোথা থেকে? এ বংশে ঐ একটি মাত্র ছেলে—যার প্রাণ ও প্রতিভা আমাকে তার বড় বিকাশ সম্বন্ধে আশাবাদী ক'রেছে। ভগবানের কাছে ওঙ্কারের দীর্ঘায়ু কামনা করি…'

পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখের মধ্যে একেবারে মগ্ন হ'য়ে পাতার পর পাতা প'ড়ে যাচ্ছি, সহসা একটা প্রচণ্ড সোরগোলে চমকে মুখ তুলে তাকাই। কাণে আসে বিশু মঞ্জু বাবলু প্রভৃতির সমবেতকণ্ঠে হৈ হৈ রব 'ঠাকুর এসেছে' 'ঠাকুর এসেছে, শিগ্‌গির'। সঙ্গে সঙ্গে দুম দুম শব্দে বাড়ি কাঁপিয়ে সকলে বাইরে ছোটে, অন্দরটা স্তব্ধ হ'য়ে সদরটা কোলাহলে মৌমাছির ব্যস্ততায় হাঁকডাকে ধমকে একেবারে সরগরম। তারপরই সমস্ত বাড়ি কাঁপিয়ে মুহুর্মুহু শাঁখ বেজে ওঠে। বাড়িতে দেবীর আগমন, তাই বরণ করা হচ্ছে। পড়া বন্ধ ক'রে চেয়ারে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে বসে একটুখানি কাণ পেতে শুনি, তারপর একসময় আস্তে আস্তে উঠে গেলা দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিজের আসনে এসে বসি।

এবার কিন্তু আর তেমনভাবে পড়া হয়না, পাতাগুলি উল্টে-উল্টে শুধু চোখ বুলিয়ে যাই এবং একসময় ৩০.১০.৪৮ তারিখে লেখা পাতায় এলে হাতের আঙুল যেন অবশ ও নিশ্চল হ'য়ে যায়। চোখের উপর মসীবর্ণ অক্ষরগুলি যেন জ্বলে ওঠে স্ফুলিঙ্গের মতো :

'পরশু উত্তরপাড়ার গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ওঙ্কার শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হ'য়েছে। দু'দিনের জন্যে সে ওখানে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলো।

মহাপ্রান্তরের শূন্যতায় হা হা ক'রে আগুনের হল্কা ছুটছে যেন, আমার বুকে তেমনি একটা অনুভূতি। এ বেদনা নয়, শোক। মৃত্যুর বেদনা জীবনে অনেকবার অধীর ক'রেছে আমাকে কিন্তু শোকের সঙ্গে পরিচয় এই প্রথম। পরমায়ু সম্পদ বঞ্চিত ওঙ্কারের জন্যে যখন কাঁদি,

তার মূলে বেদনা। বেদনা কাঁদায় কিন্তু আশ্রয় দেয়। শোকের মতো মৃত্যুর বর্ণহীন রূপহীন অতলান্ত শূন্যতায় সমগ্র অস্তিত্বকে এমন আশ্রয়হীন ক'রে ফেলে দেয় না।

শুধু মনে পড়ে, জলের টানে অতলে তলিয়ে যাবার আগে হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গীটির পেনটুলুন ধ'রে তার বাঁচবার সেই শেষ প্রয়াস এবং তার কাছ থেকে সজোরে ধাক্কা খেয়ে তার অতলে তলিয়ে যাওয়া…'

রুদ্ধ দ্বার সহসা যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে। আহত হ'য়ে মুখ ফেরাই। দেখি সশব্দে দরজা খুলে মঞ্জু ঘরে ঢুকছে, তার পেছনে বেলি। মঞ্জুর খেলার সাথী, তার দাদা গোপাল ওঙ্কারের ছায়ার মতো সঙ্গী ছিলো।

আমার সামনে এসে মঞ্জু দাঁড়ায়, তার মুখে চোখে আনন্দের প্রখর উত্তেজনা। কাছে দাঁড়িয়েই হাত-মুখ নেড়ে চোখ বড় ক'রে ব'লে যায়: 'উঃ কী সুন্দর ঠাকুর এসেচে মেজুকাকা! ওবারের চেয়েও ভালো, না রে বেলি? দাদা তানুদা বিশুদা গোপাল সবাই মিলে ঠাকুর নিয়ে এলো। বিশুদা গোপাল আমার কাছে চাল মারছিলো। বলে, কি রকম ঠাকুর কিনে এনেচি দেখচিস! আমি বললুম, ইস্ তোমরা কিনেচো না কলা। দাদারা কিনেচে বলে। আমার কাছে ধাপ্পা মারতে ঢের দেরি!'

মঞ্জুর মুখ দিয়ে কথার স্রোত বইতে থাকে: 'জানো মেজুকাকা এবার সন্ধ্যায়ের বাড়ি পুজো, ঠাকুর এসেচে। আমাদেরটা কিন্তু সব চেয়ে ভালো। সামনের বাড়ির ঐ রবিটা তাদের বাড়ির ঠাকুর নিয়ে ভারি জাঁক করছিলো, এমন রাগ হ'চ্ছিল তখন। এখন রবিটা যেই এসেচে আমি বলেচি, তোদের বাড়ির চেয়ে আমাদেরটা কত ভালো ভাখ্; চোখ বড় ক'রে ভাখ্। মুখটি চুণ হ'য়ে গেছে বাছাধনের। নারে বেলি?'

বেলি সলজ্জে ঘাড় নাড়ে। মঞ্জু তেমনি ক'রে ব'লে চলে, তারা সবাই মিলে আজ রাত জেগে ঠাকুর, পুজোর দালান, সব সাজাবে। সাজানো হ'লে তার কী রূপ খুলবে, দেখে সব তাক লেগে যাবে। আজ দিদিদের সঙ্গে সে কত কাপড় ছুপিয়েছে বাসন্তী রঙে। কাল সকালে চান ক'রে উঠে সেই রঙিণ কাপড় প'রে অঞ্জলি দেবে। বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।

শ্লোকটা শুনিয়েই মঞ্জু টেবিলের ড্রয়ারের সামনে বসে পড়ল। আমার টেবিলের তলার ড্রয়ারটিতে সে তার জিনিষ পত্র রাখে। এক-টানে সেটা খুলে সেভিং-ষ্টিকের লম্বা কৌটো থেকে পয়সা বার করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে: 'আমি এই চার আনা চাঁদা দিচ্ছি। তোমায় কিন্তু পাঁচ টাকা চাঁদা দিতে হবে, চালাকি নয়। বাড়ির সবাই চাঁদা দিয়েচে, এত্তো টাকা উঠেচে। কাল আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যাবেলা কি রকম ঘটা হবে জান মেজুকাকা?'

জানবার জন্যে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতে পারিনে, খোলা পাতাটার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকি। সমস্ত কালো অক্ষর-গুলি যেন বুকের শোণিতে রাঙা হ'য়ে চোখের উপর জ্বলছে। মঞ্জু কাছে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলতে থাকে: 'কাল উঠোনে ঠিয়েটারের মতন এস্টেজ খাটানো হবে, নাচ গান বাজনা ম্যাজিক কমিক সব দেখানো হবে। উঃ কী ঘটা! কত লোক বাইরে থেকে আসবে। সব্বাইকে খাওয়ানো হবে! দিদি মান্তিদি শান্তিদি আমি উমু—কি রে?'

মুখ ফেরাই। মানু রুনু দুর্গা প্রভৃতি বালিকার দল এক ঝাঁক পাখির মতো ঘরে এসে ঢুকে সমস্বরে মঞ্জুকে বলে: 'মঞ্জুদি এতো দেরি করচো কেন, আজ বুঝি খেলতে হবেনা। উমুদি কখন থেকে যে ডাকছে তোমাকে আর বেলিকে।'

উমুদি ওরফে উমা পঙ্কিদির ছোট মেয়ে। কাল তার মা বাবার সঙ্গে এসেছে জামসেদপুর থেকে।

মঞ্জু ফিরে দাঁড়িয়ে চক্ষের পলকে তাদের সঙ্গে মিশে পাখির ঝাঁকের মতোই যেন উড়ে চ'লে গেলো। দরজা খোলা, তার মধ্যে দিয়ে আসন্ন উৎসবের আনন্দময় কলরব ঘরে এসে ঢুকছে। সহসা উঠে গিয়ে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ করে ফিরে আসি। নিজের এই রূঢ়তা ও উত্তেজনা নিজের কাছেই অস্বস্তিকর মনে হয়। অশান্ত মনটাকে শান্ত ক'রে ডায়ারীর বুকে নিবিষ্ট করি…

'ওঙ্কার চ'লে যাওয়ার ক'দিন পরের ঘটনা।

বেলা দশটায় বাইরে থেকে বাড়ি ঢুকছি। ঢুকেই যার সঙ্গে মুখোমুখী দেখা সে বিশু। বই হাতে স্কুলে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে মনে হ'লো, ও, আজ যে পুজোর ছুটির পর বিশুদের স্কুল খুলেছে। বিশু তাকাল আমার দিকে, আমিও তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। কি যেন দেখলুম দু'জনে দু'জনের মুখে। তারপর আস্তে আস্তে সে পাশ দিয়ে চ'লে গেলো। বিশু আজ থেকে রোজ একাই স্কুলে যাবে। আজ স্কুলের নিঃসঙ্গ পথ চলতে চলতে বিশুর মনটা কি রকম করছে? অন্দরে ঢোকবার আগে কাঠের-পার্টিশান দেওয়া ওদের পড়বার ঘরটির সামনে এসে একবার দাঁড়াই। টেবিলের দু'দিকে দুটি চেয়ার—একটার পিঠ ভাঙা। বিশু এখন রোজ একাই এই ঘরে ব'সে পড়ে। যে পড়ার ঘর থেকে সকাল সন্ধ্যা পড়ার প্রাণময় কণ্ঠ শোনা যেতো, এখনও হয়তো যায় কিন্তু সে কণ্ঠে সেই রব্ সেই সুর বাজে কৈ? বিশু একা ব'সে অস্পষ্ট স্বরে পড়ে যায়, পড়তে পড়তে একবার করে অভ্যাস মতো চোখ তুলে তাকায় সামনের পিঠ-ভাঙা চেয়ারের দিকে। কেউ নেই। শূন্য চেয়ার শূন্য পিঞ্জরের মতো প'ড়ে আছে।'

রুদ্ধদ্বারে ঘন-ঘন আঘাত।

মুহূর্তে সমস্ত মনটা তিক্ত ও কঠোর হ'য়ে ওঠে। মঞ্জুর আনন্দময় কণ্ঠের ডাকে সাড়া দিইনা। দরজা না খুলে সর্বাঙ্গ শক্ত ক'রে নিরুত্তরে বসে থাকি, তীব্র অসন্তোষ ও উত্তেজনায় ভেতরটা কাঁপতে থাকে। শেষকালে মঞ্জুর কণ্ঠ কাণে আসে: 'একবারটি দরজাটা খুলে দাও মেজুকাকা, আমি এখ্খুনি চ'লে আসব দেরাজ থেকে একটা জিনিষ নিয়ে। দাও মেজুকাকা!'

আমি আর কি করি। আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুলে দিয়েই সহসা যেন চমকে উঠি। নিচের ঘর থেকে হারমোনিয়াম ও বাঁশীর সহযোগে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অপূর্ব সুর ঘরে ঢুকে আমাকে যেন বিহ্বল ক'রে তোলে। সব কিছু ভুলে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

মঞ্জু দেরাজ থেকে কি একটা বার ক'রে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। তার চালচলনে তেমনি ব্যস্ততা, মুখে চোখে উৎসবের মত্ততা। তাকে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার কথা আর বলতে পারিনে, তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। মুক্তদ্বার দিয়ে বায়ুতরঙ্গে অবিরাম সুর ভেসে এসে আমার সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়ে যেন ব'য়ে যাচ্ছে। মঞ্জু আমার মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, দোতলার ঘরে কালকের উৎসবের রিহার্সাল বসেছে। বাড়ির সবাই ঐ ঘরে জমা হ'য়ে রিহার্সাল শুনছে। দিদিরা একে একে সবাই গান গাইবে। গানের পরই তার নাচ। কাল তার দু'দুটো নাচ হবে। একটা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে একা, আর একটা হর-পার্বতীর নৃত্য—উমার সঙ্গে। উমা হর, সে পার্বতী। উমা কী সুন্দর নাচে। জামসেদপুরে নাচের স্কুলে সে নাচ শিখেছে কি না। আজ উমা আর সে দু'তিনবার একসঙ্গে নেচেছে, উমা তাকে চমৎকার শিখিয়ে নিয়েছে।

আমি বললুম: 'তুই রবীন্দ্রনাথের কোন্ গানের সঙ্গে নাচবি রে মঞ্জু?'

মঞ্জু বললে গানের প্রথম চরণ। আবার জিগেস করি, তার দিদিরা কোন্ কোন্ রবীন্দ্র-সঙ্গীত নির্বাচিত করেছে কালকের জন্যে? মঞ্জু বললে: 'তা আমায় বলেনি। আমি শুধু আমারটা জানি। একটু পরেই আমার নাচ হবে, তুমি ঠিক যেয়ো!' ব'লে নিমিষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরেই সুরের বিহ্বলতা একটা মর্মান্তিক আঘাতে দূর হ'য়ে গেলো। পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে প্রচণ্ড শব্দে দ্বার পুনরায় অর্গলবদ্ধ করতেই আমার জগৎ থেকে মদির ফেণোচ্ছল সুরলোক নির্বাসিত হ'লো নির্মমভাবে। স্বস্থানে এসে বসি, নিজের প্রতি নিজের বিরূপতা ও তীব্র বিতৃষ্ণাকে শান্ত ক'রে দিনপঞ্জিকার অসম্পূর্ণ অংশের উপর মনকে সংহত করি:

'ওঙ্কার ও বিশুর পড়বার ঘরের দরজা থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসি। নিজের ঘরে ঢুকতেই যতীন এসে দাঁড়ায়—বিষণ্ণ সঙ্কুচিত ভঙ্গী। জিজ্ঞেসার উত্তরে সে ধরাগলায় বললে: 'মা বললেন—'

কি? যতীন একটু থেমে বললে: 'ওঙ্কার-দাদাবাবুর ইস্কুলে একটা চিঠি দিতে হবে খবরটা জানিয়ে।'

ঘাড় নেড়ে তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াই ওদিকে মুখ ক'রে।

পুজোর ছুটির পর আজ স্কুল খুলেছে। ক্লাসে বালকদের হৈ চৈ আনন্দ, পরস্পরের মধ্যে ছেলেমানুষি কোলাকুলি, পুজার উৎসবের ও নতুন জামা কাপড় জুতো কেনার গল্প। বিশু বোধ হয় এতোক্ষণ স্কুলে পৌঁছে গেছে। সহপাঠীদের উদ্দাম আনন্দ কলরবের মধ্যে বিশু আজ কি করছে? ঢং ঢং ঢং। ঐ স্কুল-বসবার ঘণ্টা পড়ল। মাস্টার মশাই ক্লাসে ঢুকলেন সহাস্যমুখে। তাঁকে প্রণাম করবার জন্যে হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি ছেলেদের মধ্যে। মাস্টার মশাই আজ সবায়ের মাথায় হাত দিয়ে দীর্ঘজীবী হবার আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। একটানা ছুটির পর আজ প্রথম স্কুল, তাই আজ পড়া হবেনা। আজ-যে মিলনের দিন, আনন্দের দিন। প্রণামের পালা সাঙ্গ ক'রে দীর্ঘায়ু হবার আশীষ মাথায় নিয়ে যে যার জায়গায় গিয়ে বসেছে। এইবার মাস্টার মশায়ের তৃষিত দৃষ্টি বেঞ্চের মধ্যে কাকে বুঝি খুঁজে খুঁজে ফিরছে। তাঁর ক্লাসের মধ্যে যে ছেলেটি রত্ন, যার সম্বন্ধে তাঁদের সকলের মস্ত আশা, সেই অপূর্ব প্রাণময় ছেলেটিকে খুঁজে না পেয়ে যখন তিনি তার কথা জিজ্ঞাসা করবেন, তখন বিশু উঠে দাঁড়িয়ে বলবে, সে আর নেই। এ কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে তো বিশু?

য়্যাটেণ্ডেন্স-রেজিস্টারে একটি ছাত্রের নাম লাল কালী দিয়ে কাটবার সময় মাষ্টার মশয়ের হাতের কাঁপন হয়তো বালক ছাত্রদের দৃষ্টি এড়াবে না।

ওঙ্কার তো চলে গেলো। তার যাওয়াটা বুদ্ধি দিয়ে জেনেছি, প্রাণের গভীরে কিন্তু সে বার্তা এখনো পৌঁছয়নি। তাই তার ফিরে আসা সম্বন্ধে এখনো সব অসম্ভব আশা কল্পনা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। জীবনে কত তো কল্পনাতীত অলৌকিক ঘটনা ঘটে, তেমনি ওঙ্কারের ক্ষেত্রে ঘটা বিচিত্র কি? বর্ষায় প্রবর্ধমান ঘাসের মতো জীবনের লাবণ্যে উচ্ছ্বসিত সেই ছেলেকে দু'দিন আগে তো আমি তার মামার বাড়ি রেখে এসেছি, দু'দিন পরে সে আমার সঙ্গে ফিরবে এই কথা সে আমাকে বলেছিলো। হঠাৎ শুনি সে আর নেই। এমনতরো অসম্ভব কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি? তাছাড়া তার সব শেষ হওয়া আমি তো চোখে দেখিনি। আমার চক্ষুর অন্তরালে এমন অলৌকিক কিছু তো ঘটতেও পারে যাতে সে আবার ফিরে আসে! কে বলতে পারে? মনের এই সব অসম্ভব আশা কল্পনাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে, ওঙ্কারের নির্বাণ এখনো প্রাণে পৌঁছয়নি, পৌঁছতে সময় লাগবে। শোকের সেই বিনিদ্র রাতটিতে মার একটি আশার কথা আজও আমার বুকে শাণিত ছুরির ফলার মতো বিঁধে আছে। সেদিন সারারাত্রি অশান্ত-উচ্ছ্বসিত কান্নার মধ্যেও মা আশা করেছিলো কোনো একটি সংবাদ পাবার। এমন তো কত ঘটেছে, ডুবে-মরা ছেলে আগুনের আঁচে বেঁচে উঠেছে। সেদিন সারারাত্রি আমারও প্রাণে ঐ শেষ আশা......'

টুক টুক টুক।

শিরায় শিরায় রক্তস্রোত উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, মুখ দিয়ে কথা বার হয় না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখবার প্রয়াস করি।

বাইরে থেকে উচ্চকণ্ঠের আহ্বান তপ্তশলার মতো দু'কাণ চেপে ধরে: 'মেজুকাকা এখ্খুনি মঞ্জুদির নাচ হবে, শিগ্গির এসো। তোমায় সবাই নিচের ঘরে ডাকচে। দেরি করো না।' কথা শেষ হতেই চঞ্চল পদধ্বনি ঘরের সামনে থেকে ওদিকে চলে যায়।

মনের আলোড়ন শান্ত হ'তে এবার অনেকখানি সময় লাগে। তারপর আবার ডায়ারীর উপর ঝুঁকে পড়া সুরু করি!

'সেদিনের সেই শীতরুক্ষ দুপুরটি আজও আমার বুকে কেটে কেটে বসে আছে।

বেলা একটা তখন। বাইরে যাবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় থমকে দাঁড়ালুম। উপরের ঘরগুলির দরজা বন্ধ, এরই মধ্যে সবাই শুয়ে পড়েছে। কোথাও কারোর সাড়া শব্দ নেই। বৃহৎ সংসারের কাজের চাকাটা যেন বিকল হয়ে থেমে গেছে অসময়ে। নিমিষে সমস্ত বাড়িটা এক অদ্ভুত শূন্যতায় বুকের মধ্যে হা হা ক'রে উঠল। আজ স্কুল বন্ধ, তথাপি বাইরে থেকে ছেলের দল খেলা করতে আসেনি। ছুটির দিনে এই বাড়ির উপরতলা তাদের খেলায় মাতামাতিতে সর্বদা কাঁপত। বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যে কত ভৎর্সনা, কত তাড়না, তবু কেউ তাদের সে খেলা বন্ধ করতে পারেনি। আজ বিনা তাড়নায় তারা সেই খেলা ভেঙে দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে। শত কাকুতি মিনতিতেও আর তারা এখানে খেলতে আসবে না। এই বাড়ির যে প্রাণের উৎসটি শত প্রাণ উৎসারিত করত, সেই কলস্বরা উৎস চিরদিনের মতো কোন্ অদৃশ্য মরুর বুকে বিলীন হ'য়ে গেছে। আস্তে আস্তে বারান্দার শেষের ঘরটিতে ঢুকি। মঞ্জু পুতুল ছড়ানো, খেলাঘরে একা বসে কি একটা নাড়াচাড়া করছে। মনে পড়ল, ছুটির দিনে মঞ্জু ও তার ছোড়দার দুটি দলে খেলার প্রতিযোগিতা হ'তো, প্রতি মুহূর্তে ছোড়দার সঙ্গে লাগত ঠোকাঠুকি, মঞ্জু এসে তীব্রকণ্ঠে নালিশ করত তার বিরুদ্ধে। আজ সে আসামী তো পলাতক। সেই পলাতকের শূন্য পরিত্যক্ত খেলাঘরে আজ এমন ক'রে একা ব'সে মঞ্জুর প্রাণে তার বিরুদ্ধে কি নালিশ গুমরে গুমরে উঠছে? মঞ্জু আমার দিকে তাকাতেই তাড়াতাড়ি বললুম: 'গোপাল বেলি আসেনি? কখন আসবে!'

মঞ্জু ঘাড় নেড়ে বললে: 'গোপাল আর তো আমাদের বাড়ি আসে না। বেলি সেই বিকেলে মণিমেলায় যাবার সময় আসে।'

আমি শুধু বললুম: 'ও।'

মঞ্জু একবার ঢোঁক গিলল, তারপর আস্তে আস্তে বললে: 'ছোড়দার নাম কাল মণিমেলা থেকে কেটে দিয়েছে মেজকাকা!'

কাজের ব্যস্ততার ভাণ ক'রে তাড়াতাড়ি মঞ্জুর সামনে থেকে পালিয়ে নিচে নেমে আসি। একতলার অন্দরের উঠোনে কার্নিসে চতুর্দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই বিচিত্র চঞ্চলতায় কিচির কিচির শব্দে উড়ে উড়ে খেলে বেড়াচ্ছে। শূন্য পরিত্যক্ত বাড়িতে বাসা বেঁধে যেমন নিরুপদ্রবে খেলে বেড়ায় চড়ুই। অন্দর থেকে বাইরে যাবার সময় রান্নাঘরে দৃষ্টি পড়তেই একবার শুধু থমকে দাঁড়াই:

রান্নাঘরে মা খেতে বসেছে, সামনে সেই কালো পাথরের থালাটি। চোখে পড়ল, থালার উপর হাতখানি রেখে মা চুপ ক'রে বসে। অমন ক'রে মা এখনো বসে কেন? বেলা যে অনেক হ'লো! সেই যে ছেলেটি রোজ এই সময় বিশুর সঙ্গে বাড়িতে টিফিন খেতে আসত এবং মার কাছে বসে মার হাতে মাখা-ভাত পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে স্কুলে চ'লে যেতো, ছুটির দিনেও মার সঙ্গে যার খাওয়া বাদ যেতো না, সে তো আর আসবে না! তবু মা অমন ক'রে ব'সে কেন? তার কথা বুঝি মনে পড়ছে? না আগুনের আঁচে তার বেঁচে ওঠার আশার মতো মার মনে এখনো কোনো অসম্ভব আশা হানা দিচ্ছে? পা টিপে টিপে বাইরে যাবার সময় শুধু মনে পড়ল, মা রোজ আগের মতোই এই সময় খেতে বসে, খেতে খেতে কার গলা শুনে মা রোজই একবার চমকে উঠে রান্নাঘরের বাইরে তাকায়, বিশু টিফিন খেতে এসেছে কিন্তু সঙ্গে আর কেউ আসেনি। আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন অবস্থায় বাইরের উঠোনটা অতিক্রম করি, সদর দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে চলার মন্থর গতি আর একবার থেমে যায়:

বাড়ির ঠিক সামনে গলির রাস্তায় মঞ্জুরই বয়সী দুটি বালিকা খেলা করছে। রাস্তার উপর ইঁট দিয়ে চতুষ্কোণ কয়েকটি ঘর কেটেছে পাশাপাশি। এক একজন পালা ক'রে এক পা তুলে ঘরের রেখাগুলি লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। বালিকাদের সেই চিরন্তন খেলা। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটু দূরে আমাদের বাড়ির রোয়াকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গোপাল উদাসভাবে তাদের খেলার দিকে চেয়ে আছে। আমি বার হ'তেই সে আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি তাকালুম একবার। শীতের হাওয়া সহসা হু হু হু করে উঠল পরক্ষণেই আমি রাস্তায় নেমে পা টেনে টেনে চলতে লাগলুম। গোপাল ঠিক তেমনি করে দাঁড়িয়ে অপরের খেলা দেখতে লাগল।

আমার শুধু মনে হ'তে লাগল, এ পথ যেন আর আমি চলতে পাচ্ছিনা, পাচ্ছিনা। আমার পথের পাথেয় যেন লুণ্ঠিত হ'য়ে গেছে।'...

দুম দুম দুম।

রুদ্ধ দ্বারের করাঘাত হাতুড়ির মতো বুকে এসে পড়ে। সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে প্রচণ্ড জ্বালায় ব্যর্থতায়। পরক্ষণেই কানে আসে, মঞ্জুর নৃত্য-উৎসবে যোগদানের জন্যে মার আহ্বান। আস্তে আস্তে উঠে দরজার দিকে যাই—মাকে শুধু এই কথাটি বলতে, আমাকে তোমরা বাদ দাও। দরজা খুলেই মুহূর্তে একেবারে নির্বাক বিহ্বল হ'য়ে যাই। মনে হয়, বালুবেলায় পূর্ণিমার উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ দলের মতো বাঁশী ও কণ্ঠ সঙ্গীতের সহযোগে ঘুঙুরের গুঞ্জরণ আমার বুকের উপর এসে যেন শতধারায় ভেঙে পড়ল। এই পুঞ্জীভূত সুররাশি নির্মমভাবে আমার জগৎ থেকে নির্বাসিত হ'য়ে এতোক্ষণ বাইরে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলো, ষড়যন্ত্র ক'রে রুদ্ধ দ্বার খুলিয়েই হুড়মুড় ক'রে ঢুকে সব একাকার লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে। কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। মনে হয়, জীবনের রহস্যরঞ্জিত কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে কে যেন বার বার আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। দুটি চরম বিরুদ্ধ অনুভূতির মধ্যে মুহুর্মুহু করাচ্ছে গতায়াত। কে গান গাইছে? শান্তি না? হাঁ শান্তিই তো! কী মিষ্টি গলা! কাণ পেতে শুনি: 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয় আয়।' মাঠের গানের সঙ্গে বাঁশের বাঁশীর মেঠো সুরটি কী সুন্দর খাপ খেয়েছে। এই বর্ণময় গীতিনিস্বনের সঙ্গে মঞ্জুর পায়ের ঘুঙুর বাজছে ঝুন ঝুন ঝুন। দ্রুত মধ্য বিলম্বিত লয়ে চলছে সুরের আবর্তন বিবর্তন। বারে—মঞ্জু

বেশ তালে নাচছে তো। এক দুই তিন, এক দুই তিন, আমি সমানে তার সঙ্গে তাল দিয়ে যাচ্ছি, কৈ একবারও তো তাল ভঙ্গ হ'চ্ছে না। একবার কিন্তু ভারী দেখতে ইচ্ছে করছে মঞ্জুর নৃত্যের রূপভঙ্গীটি। অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিচের ঘরে গিয়ে একপাশে বসলুম।

ঘরে আর জায়গা নেই। সমস্ত পরিবারবর্গ মিলিত হয়েছে এই ঘরে। মা, বৌদি, বৌমারা, বড়দার ছেলেমেয়ে মায়া শান্তি বিশু, দাদার ছেলেমেয়েরা। মায়ের কাছে পঙ্কিদি। কী চেহারা হ'য়েছে পঙ্কিদির, আহা। উমা বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে দলটির সামনের দিকে বসেছে, তাদের সঙ্গে গোপাল আর বেলি। বর্ষিয়সীরা কৌতুক হাস্যে, বালকরা রহস্য কৌতুহলে এবং শিশুরা মুগ্ধ বিস্ময়ে মঞ্জুর গীতোচ্ছল নৃত্য দেখছে। মুখ ফিরিয়ে মঞ্জুর দিকে তাকাই। গানের সুরের সঙ্গে মঞ্জু তার দুটি প্রসারিত বাহু লীলায়িত করে নাচছে। আমার মনে হলো, তার বাহুর অপূর্ব লীলায়নে ঈথারের উপর দিয়ে অবিরাম ঢেউয়ের পর ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর প্রতি পদক্ষেপে ভেসে উঠছে ঢেউগুলির গীতধ্বনি। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে সেই নৃত্য-রূপের দিকে চেয়ে থাকি।

প্রাণের এই বিস্ময় ও তন্ময়তা সহসা কেটে গেলো ফিশফিশানি ও চকিত হাসির শব্দে। দেখি বিশু বাবলু গোপাল পরস্পরের মুখের কাছে মুখ নিয়ে ভারী কৌতুকে ফিসফিস করে কি বলাবলি করছে এবং মুখে হাত চেপে উচ্ছ্বসিত হাসি ঢাকবার চেষ্টা করছে। প্রাণ কূল ছাপিয়ে যেন উথলে উঠতে চাইছে। ঠিক সেই সময় পেছন থেকে একজন গম্ভীরকণ্ঠে তাদের উদ্দেশে 'ফের' বলতেই নিমিষে সবাই সোজা হ'য়ে ভালোমানুষটি সেজে নাচ দেখতে লাগল। একটু পরেই চোখে পড়ল, মঞ্জু নাচতে নাচতে যেই তাদের দিকে ফিরেছে অমনি বিশু বাবলু গোপাল একই সঙ্গে অদ্ভুত মুখভঙ্গী ক'রে, বক দেখিয়ে, জিভ ভেংচে মঞ্জুকে হাসিয়ে দেবার চেষ্টা করলে এবং ব্যর্থ হ'য়ে তিন মাথা এক ক'রে মুখে হাত চেপে সেই হাসি। পেছন থেকে তাদের উদ্দেশে পুনরায় সতর্ক বাণী, এবারের কণ্ঠ আরও কঠোর। নির্বাক দর্শকের মতো দেখছি সব।

হঠাৎ খেয়াল হ'লো, ডায়ারীর খাতাখানা টেবিলের উপর অরক্ষিত অবস্থায় প'ড়ে। যে দুটি পাতা পড়া শেষ করেই চলে এসেছি, সেই দুটি পাতা এখনো তেমনি খোলা আছে। ডায়ারীর খাতাখানা দেরাজে বন্ধ ক'রে রেখে আসার জরুরী প্রয়োজন কিন্তু হঠাৎ কি যেন হ'লো আমার, আর উঠতে পারিনে। সুরের উচ্ছলিত আবহাওয়ায় আনন্দ উৎসবে মত্ত পরিবারবর্গের মধ্যে ব'সে হঠাৎ চোখের সামনে ডায়ারীর বুকে আঁকা ছবির পর ছবি আলোর পটে তিমিরের গভীর বর্ণে যেন ফুটে উঠতে লাগল। মায়া পঙ্কিদি মা মঞ্জু বিশু গোপাল আরও কত জনের কত ছবি।...

বুকের মধ্যে কেমন যেন ক'রে ওঠে। এই তো সেদিনের আঁকা ছবি, কিন্তু আজকের সঙ্গে তার এতোখানি প্রভেদ কেন? এ কী অসামঞ্জস্য? অমন জীবনের ঐ রকম মর্মান্তিক অপচয় উৎসবকে তিমিরময়ী না ক'রে তাকে দীপ্ত গীতোচ্ছল করে কোন্ নিয়মে?

ঘর থেকে বেরিয়ে আসি নিঃশব্দে। এ ঘরে সমস্ত মেয়েরা নাচ গানে মগ্ন, বাইরের পুজোর দালানে প্রতিমার কাছে মঞ্জু বিশুর দাদারা, রূপসজ্জার পরিকল্পনায় তারা মত্ত। সমস্ত বাড়িতে উৎসবের আয়োজন দেখে মন্থর পদে ঘরে এসে আমার মনে হ'তে লাগল, মৃত্যু বা মৃতজন সম্বন্ধে বালকের যে মনোভাব তা নির্মম কিন্তু অকপট। তার মধ্যে ভাণ নেই। আমাদেরও মনোভাব অবিকল ঐ, শুধু ভাণ করি ব'লে বালকের চেয়ে তাকে স্বতন্ত্র মনে হয়।

অন্যমনস্কভাবে দিনপঞ্জিকার পঠিত পৃষ্ঠা উল্টেই একবার চমকে উঠি। ডায়ারীর শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে গেছি যে! এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেলো! আর তো পুরো দু'পাতাও নেই। যেখানে লেখা শেষ হ'য়েছে তার তলায় এখনো একটুখানি শাদা জায়গা প'ড়ে আছে। যাক, আগুনের বুকে আহুতি দেবার আগে শেষ বিদায়ের বাণীটি লিখে দেওয়া চলবে। প্রাণের গভীর আবেগ ও মমতা নিয়ে শেষবারের মতো শেষ পৃষ্ঠাটি পড়ি:

'বাড়ি থেকে আর বার হই না। বাইরে গেলেই শূন্যতা দ্বিগুণ হ'য়ে বুকে চেপে ধরে। মনে হয়, শোকের দিনে মানুষ একমাত্র আশ্রয় পায় পরিবারবর্গের মধ্যে, বাইরের জগতে তখন তার আশ্রয় থাকে না। তা ছাড়া শোকের মধ্যে রিক্ততার একটা গভীর লজ্জা প্রচ্ছন্ন থাকে, তাই মানুষ তখন বহির্জগৎ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।

• •

আজ লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এলুম। মার ঘরে নিঃশব্দে ঢুকে দেখি, মা খাটে চোখ বুজে শুয়ে, বুকের উপর একখানা বই। মায়ের শিয়রে খাট ও দেয়ালের সংকীর্ণ যাতায়াতের স্থানটুকুর মধ্যে মঞ্জু ব'সে কি যেন আঁকছে শ্লেটের উপর। মায়ের মুখের চেহারায় এক রকম তো অভ্যস্তই হ'য়ে গেছি তথাপি আজ সে মুখের ভাব যেন কেমন লাগল। এ ভাবান্তর কিসের জন্যে? মনে পড়ল, ওঙ্কারের রেশন কার্ড আজ রেশনিং অফিসে জমা দিয়ে তার নাম কাটিয়ে এসেছে যতীন। কাঁকরভরা কয়েক ছটাক চাল, পাথর গুঁড়ো মেশানো আটা, ধুলো-বালি দেওয়া ডাল, এই খেয়েও যে বালক পরিপূর্ণ জীবন-প্রীতি ও নিষ্ঠায় পূর্ণ হ'য়ে উঠছিলো, সেটুকু থেকেও সে বঞ্চিত হ'লো, এই অনুভূতি বুঝি মায়ের ঐ ভাবান্তর ঘটিয়েছে? খাটের একপাশে বসতেই মা চোখ মেলে তাকাল।

দু'জনে নীরব। আর কিছু যেন বলবার নেই, সব বলা শেষ হ'য়ে গেছে। একটু পরে মা জানাল, আজ উত্তরপাড়া থেকে রবিন এসেছিলো। এইটুকু বলেই মা থেমে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা অসহ্য যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল। মা কি বলবে আমি জানি, পুজোর সময় নিজে পছন্দ ক'রে কেনা যে পোষাক পরে ওঙ্কার দু'দিনের জন্যে উত্তরপাড়ায় বেড়াতে গিয়েছিলো, আজ সব অবসান হ'য়ে যাবার পর তার সেই পোষাক রবিন এসে ফেরৎ দিয়ে গেছে, যা নিজের হাতে আনতে কিছুতেই আমরা মনকে রাজি করাতে পারিনি।

মা যেন কথা বলতে পাচ্ছিল না, একটু একটু ক'রে থেমে থেমে

বলতে লাগল, রবিন বলতে এসেছিলো শেষ পর্যন্ত সিমেন্ট অতি কষ্টে পাওয়া গেছে যার অভাবে কাজ আটকে ছিলো এতো দিন। উত্তর-পাড়ার বাড়িতে মজুর মিস্ত্রি লাগানো হ'য়েছে, নতুন গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর বাড়ির যে অংশ পড়েছে, সেই অংশে দোকান ঘরগুলি তাড়াতাড়ি তৈরী করা হ'চ্ছে, ওগুলি শেষ হ'লেই বাড়ি মেরামত ও চুণকাম করা হবে। ঐ দোকান ঘরগুলি ও বাড়ি থেকে মাসে বহু টাকা আয় হবে, এর উপর মোটা টাকার সেলামি।

শাণিত ছুরির টানের মতো মার কথাগুলি বুকের ভেতর কেটে দিয়ে চ'লে গেলো। সেই মুহূর্তে শুধু মনে পড়ল, মাতৃহারা ওঙ্কার কিছুদিন আগে দিদিমার মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ি ও সম্পত্তি পেয়েছিলো যার মূল্য লক্ষ টাকার বেশি। তার বিষয় পাওয়ায় মার ও বাড়ির সকলের কত আনন্দ। আরও মনে পড়ে, সেই অপূর্ব জীবন নিষ্ঠা ও বিকাশোন্মুখ প্রতিভার সঙ্গে ঐ ঐশ্বর্যকে যুক্ত ক'রে তার পূর্ণ বিকাশ সম্বন্ধে আমার সেই স্বপ্ন দেখা, মনে মনে কত জল্পনা কল্পনা। সব, সব কোন অতল জলে তলিয়ে গেলো।

মা কাঁদে কিন্তু আমি আর কাঁদি না। আমার বেদনা আজ প্রাণস্তর থেকে মনের কোঠায় আশ্রয় নিয়েছে, মনস্তরে পৌঁছে তার রূপান্তর ঘটেছে জিজ্ঞাসায়। সব গভীর বেদনারই স্বাভাবিক পরিণতি এই। আজ সে জীবনের এই শোকাবহ ঘটনা, এই নির্মম অপচয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা ক'রে ঘুরে ঘুরে ফিরছে। হয় তো চিরদিন এমনি অর্থ সন্ধান করেই ফিরবে, জিজ্ঞাসার গ্রন্থিমোচন আর হবে না কোনো দিন। তবু সেই চির-নিরুত্তরের সামনে সে কখনো থেমে যাবে না।'

সহসা রুদ্ধদ্বার ভেদ ক'রে একটা হৈ চৈ উল্লাস কানে এলো। নাচ গানের রিহার্সাল শেষ হবার পর সবাই ঘর থেকে বার হ'চ্ছে। এ আনন্দ কলরব তারই। ডায়ারী শেষ করে শূন্যতায় শ্রান্তিতে চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিলুম।

মানুষের কথা কখনো শেষ হয় না, তথাপি মানুষকে শেষ কথাটি ব'লে যেতেই হয়। এই দিনপঞ্জিকার শেষ পাতাটির ফাঁকটুকুতে আমি শেষ লেখা লিখে বিদায় নিচ্ছি :

আজ এইমাত্র শ্রীপঞ্চমীর উৎসব শেষ হ'লো। একটি পরিবারের কতকগুলি ছেলে-মেয়ের উৎসবের মধ্যে দিয়ে আমি সুচিরকালের উৎসবের অন্তর্নিহিত তত্ত্বরূপকে দেখতে পেয়েছি, যা আমার জিজ্ঞাসার মূলে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে।

আজ দেখলুম, উৎসবের সর্বপ্রধান অঙ্গ তার অপচয়। যেখানেই বিপুল উৎসব, সেখানেই বিরাট অপচয়। তুষারের সঙ্গে তার শুভ্রতার মতোই, উৎসবের সঙ্গে অপচয়ও অপরিহার্য। আজ মনশ্চক্ষু ভরে শাশ্বত উৎসবের রূপলীলা দেখতে দেখতে কেবলই মনে হ'তে লাগল, চরাচর-ব্যাপী প্রাণের যে বিরামহীন মহোৎসব চ'লেছে, সেই মহোৎসবে ওঙ্কার, আমার ওঙ্কার—অপচয়ের মধ্যেই পড়ে গেলো।

মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের যুগের রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যে মনীষীবৃন্দের চরণতলে বসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদিগের অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত আমার পরিচয়ের একটী গল্প বলি :—কবির বাড়ীতে গিয়া আমি একদিন তাঁহার টেবিলে একখানি "ঝরাফুল" রাখিয়া আসি। বইখানিতে আমার ঠিকানা লেখা ছিল। পরদিন অতি প্রত্যূষে ডাকাডাকি শুনিয়া আমি বাহির হইয়া দেখি, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং আমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আহা! কি অপূর্ব্ব! তোমার "ঝরাফুল" প'ড়লাম। "নোনা আতার সোণার গায়ে রবির কিরণ পিছ্‌লে পড়ে"—কী সুন্দর! সত্যিই কবিত্ব"। এইরূপে তিনি ঝরাফুলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন এবং আমাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তাহার পর কতবার আমি তাঁহার পদপ্রান্তে গিয়া বসিয়াছি এবং তাঁহার স্নেহ ও উপদেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, গান ও কবিতার সমালোচনা আমি করিব না, সে সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। কোনও এক মনীষী বলিয়াছেন যে কবি ও সাহিত্যিকগণ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। বর্ত্তমানে দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেই আমি শুধু এইটুকুই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে—বিশেষ করিয়া আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর, দেশ যখন অতি দ্রুত অবনতি এবং ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, জাতির নৈতিক চরিত্র যখন কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কালোবাজার, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতিতে দেশ যখন ছাইয়া গিয়াছে, স্বার্থ লইয়াই যখন সকলে মত্ত—স্বামিজীর কর্ম্মযোগ, সেবাব্রত, পরহিতব্রতের কথা যখন কেহ মনেও আনে না, সেই যুগের উদ্দেশে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কবিতা, গান ও নাটকের মধ্য দিয়া স্বামিজীর বাণী প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিলেন :—

৩। রসসম্প্রদায়

৪। ধ্বনিসম্প্রদায়

প্রতি সম্প্রদায়েই সুপ্রসিদ্ধ কাব্যসমালোচক অগণিত আছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ে ভামহ, উদ্ভট ও রুদ্রট, দ্বিতীয়ে দণ্ডী ও বামন; তৃতীয়ে লোল্লট, শঙ্কুক ও ভট্টনায়ক এবং চতুর্থশ্রেণীতে অভিনবগুপ্ত এবং আনন্দবর্ধনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে অলঙ্কারবাদীরা অলঙ্কারের, রীতিবাদীরা রীতির, রসবাদীরা রসের এবং ধ্বনিবাদীরা ধ্বনির কাব্যে সর্বপ্রাধান্য ঘোষণা করেছেন। অল্প সময়ের মধ্যে এ চারিটী সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিভেদ সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। তজ্জন্য ঐ বিষয়ে আমি কোনও প্রচেষ্টা করবো না। আজ আমি অলঙ্কারসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় কুন্তকের বিষয়েই সামান্য কিছু বল্‌বো।

কাব্যে অলঙ্কারেরই সর্বপ্রাধান্য, স্বকীয় যুক্তিবলে এটী প্রমাণিত করার জন্য কুন্তক বক্রোক্তিজীবিত নামক বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এ গ্রন্থে তিনি ভামহের মতবাদই বিশেষভাবে প্রপঞ্চিত করেছেন।

কুন্তক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর ধ্যভাগ সময়ের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন; এবং খুব সম্ভবতঃ ৪ঠা। অভিনব গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। ধ্বনিমতবাদ কুন্তকের সমভ ট অপরিজ্ঞাত না হলেও তাঁর উপর এর কোনও বিশেষ প্রভাব এক রলক্ষিত হয় না।

ভ কুন্তকের কুন্তল বা কুন্তলক নামও পাওয়া যায়। তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক ছিলেন এবং তাঁর মতবাদ যে বিশিষ্ট সম্মান অর্জন করেছিল, সাহিত্যচূড়ামণি-প্রণেতা বিখ্যাত আলঙ্কারিক শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভৃতির উক্তি থেকেই তা' প্রমাণিত হয়। শ্রীগোপাল ভট্ট তাঁকে আলঙ্কারিকদের মধ্যে তৃতীয় স্থান প্রদান করেছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

> বক্রানুরঞ্জনীমুক্তিং চঞ্চুমিব মুখে বহন্।
> কুন্তকঃ ক্রীড়তি সুখং কীর্তি-স্ফটিক-পঞ্জরে॥

অর্থাৎ চঞ্চুর মত বক্রানুরঞ্জনী উক্তি মুখে বহন করে কুন্তক কীর্তির স্ফটিকপঞ্জরে সুখে বিহার করছেন।

কুন্তক তাঁর "বক্রোক্তি-জীবিত" নামক গ্রন্থে কীদৃশ মতবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন, তা' বলবার আগে "বক্রোক্তি" কথাটার অর্থ কি, এ বিষয়ে আপনাদের কাছে আমি একটু বল্‌তে চাই।

দণ্ডীর মতে বক্রোক্তি স্বভাবোক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত অলঙ্কারের সমষ্টি। বামনের মতে বক্রোক্তি অর্থালঙ্কার বিশেষ এবং রুদ্রটের মতে ইহা একটী শব্দালঙ্কার মাত্র। কিন্তু কুন্তক সহজ উক্তি বা সরল দৈনন্দিন উক্তি এর বিপরীত রূপেই বক্রোক্তি কথাটীর ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ভামহেরই মতাবলম্বী। ভামহ বলেছেন, সূর্য অস্ত গেছে, চন্দ্রোদয় হচ্ছে, পাখীরা বাসায় ফিরে চলেছে, এ জাতীয় রচনা কাব্য নয়, এগুলিকে "বার্তা" বলা চলে, অর্থাৎ এগুলি সাধারণ কথাবার্তারই সামিল। এ রচনা কাব্য-পদবীতে তখনই উন্নীত হয়, যখন ইহা বক্রোক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। বক্রোক্তির অর্থ এখানে সৌন্দর্য বা রমণীয়তা; বাংলা অর্থে বাঁকা বাঁকা বা ট্যারা ট্যারা কথা নয়। অর্থ প্রকাশ করার সাধারণ যে উপায়, সে উপায় পরিত্যাগ করে যখন সৌন্দর্যসৃষ্টি করার জন্য কবি অন্য উপায় অবলম্বন করেন, তখনই তিনি বক্রোক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই মহিম ভট্ট কুন্তকের মত ব্যাখ্যায় স্বকীয় গ্রন্থে বলেছেন—"শাস্ত্রাদি-প্রসিদ্ধ-শব্দার্থোপনিবন্ধ-ব্যতিরেকি যদ্ বৈচিত্র্যং তন্মাত্রলক্ষণং বক্রত্বং নাম কাব্যস্য জীবিতমিতি"। এই বক্রোক্তি, বিচ্ছিত্তি, বা রমণীয়তার কোনও একটা সংজ্ঞা প্রদান করা সহজ নহে। কুন্তক নিজে বলেছেন—বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি-রুচ্যতে", অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিজনিত ভঙ্গিবিশিষ্ট কবির উক্তিকে বক্রোক্তি বলা হয়। এই উক্তি বৈচিত্র্য বাস্তবিক পক্ষে কবির প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও কৌশলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কবির প্রতিভার অনন্ততাহেতু বক্রোক্তিও, ফলতঃ অনন্তপ্রকারের। তবে মুখ্যতঃ ইহা পাঁচ প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে।

১। বর্ণবিন্যাস।

২। পদ।

৩। বাক্য।

৪। প্রকরণ।

৫। (সম্পূর্ণ) প্রবন্ধ।

এর মধ্যে প্রথম প্রকারের বক্রতা বা সৌন্দর্য বর্ণসম্মেলনের উপর নির্ভর করে, অন্যান্য আলঙ্কারিকেরা একেই যমক ও অনুপ্রাস নাম দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপে আমাদের অতি প্রিয় "গীতগোবিন্দ" থেকেই উদ্ধৃত করছি—

> "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
> মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে" ॥

অথবা—"চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী
> কেলিচলন্মণিকুলমণ্ডিতগণ্ডযুগলস্মিতশালী ॥

কুন্তকের মতে, দ্বিতীয় প্রকারের বক্রতা পদ-বক্রতা। এই পদ-বক্রতা দুই প্রকারের—পদপূর্বার্ধ-বক্রতা ও পদপরার্ধ-বক্রতা। পদ-পূর্বার্ধ-বক্রতায় পর্যায় বা সমার্থক শব্দ, রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধার্থক শব্দ, উপচার বা সাদৃশ্যমূলক সম্বন্ধনির্ণয়, বিশেষণ, সংবৃতি বা সহস্তভাষণ (covert expression), বৃত্তি (সমাস ও তদ্ধিত), ভাব (roots of words), লিঙ্গ ও ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ এবং পদ-পরার্ধ-বক্রতায় কাল, কারক, সংখ্যা, পুরুষ, উপগ্রহ বা বাচ্য (Voice) এবং অব্যয়ের বিশিষ্ট প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে।

এই পদবক্রতার উদাহরণস্বরূপে মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূত থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি। মন্দাক্রান্তা ছন্দে এই শ্লোকটী উপচারবক্রতা হেতু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

> গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং

সৌদামিন্যা কণকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥

(মেঘদূত—পূর্ব ৩৮)

মেঘদূতে যক্ষ তাঁর বন্ধু মেঘকে অনুরোধ জানাচ্ছেন, অলকায় যাওয়ার পথে আম্রকূট, চিত্রকূট প্রভৃতি পার হয়ে অবন্তীতে মহাকাল শিবকে দর্শন করে তার যাওয়া উচিত, তবে সেখানে প্রেয়োদ্দেশ্যে যে সব রমণী আলোকহীন রাজপথে সূচিভেদ্য অন্ধকারে চলেছেন, তাঁদের যেন সে বিদ্যুচ্চমকে আলো প্রদান করে, বর্ষণ বা গর্জন করে যেন এঁদের ভয় দেখানো না হয়, কারণ এঁরা বড়ই ভীতিপরায়ণ। পদবক্রত্বের দিক থেকে এ শ্লোকের "সূচিভেদ্য" পদটী অনবদ্য। এই একটী কথায় অন্ধকারের নিবিড়ত্ব মূর্তিমান হয়ে পাঠকের কাছে ধরা দিয়েছে। মূর্তিহীন অন্ধকারের এই যে নিবিড়তা হেতু মূর্তিপরিগ্রহ, যা সূচি দিয়ে ভেদ করা যায়,—তাতে মূর্তিহীনে মূর্তিপরিগ্রহের ধর্ম উপচার করা হয়েছে। এ যে উপচারজনিত সৌন্দর্য, এটীই কুন্তকের উপচার-বক্রত্ব।

বাক্যবক্রতায় কুন্তক অর্থালঙ্কারসমূহের পর্যালোচনা করেছেন; তবে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে বস্তুর যথাযথ রূপ বর্ণনা করা হয় বলে এবং ইহা বক্রোক্তিবিহীন বলে এ অলঙ্কারকে কুন্তক অলঙ্কার বলে স্বীকার করেন নি।

কুন্তকের মতে অলঙ্কার দুটী জিনিষের উপর নির্ভর করে—(১) চমৎকারিত্ব*; (২) কবি-প্রতিভা। কবি-প্রতিভার বলে এ চমৎকারিত্ব অলঙ্কারের সহায়তায় বাক্যে কীদৃশভাবে প্রকাশ পায়, তার উদাহরণ শকুন্তলা থেকেই দিচ্ছি। একটী বস্তুকে বোঝাতে গিয়ে অপর একটী বস্তুকে যখন উদাহরণস্বরূপে প্রদর্শন করা হয়, তখন আমরা "দৃষ্টান্ত" নামক অলঙ্কার পাই; এবং কবি যখন একটী বিশেষ বাক্য সমর্থনের জন্য একটী সামান্য বা সর্বসাধারণ বাক্যের প্রয়োগ করেন, তখনই অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়। এই শ্লোকটী দৃষ্টান্ত ও অর্থান্তর ন্যাসেরই উদাহরণ।

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥

অর্থাৎ পদ্ম শৈবালের দ্বারা পরিবৃত হলেও সুন্দর দেখায়; চন্দ্রের কৃষ্ণ চিহ্ন উহার সৌন্দর্যই বর্ধিত করে। এই তন্বী শকুন্তলা বল্কল-পরিহিতা হলেও অত্যন্ত মনোহভিরামা; সুন্দর আকৃতি যাঁদের, তাঁদের সব কিছুতেই সুন্দর দেখায়। এই উদাহরণে প্রথম দুই পংক্তিতে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার এবং শেষ পংক্তিতে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার থাকায় এ কবিতা অত্যধিক চমৎকারিতা লাভ করেছে।

* এই চমৎকারিত্ব বিচ্ছিত্তি, বৈচিত্র্য, চারুত্ব, চমৎকার, সৌন্দর্য, হৃদ্যত্ব প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয়েছে।

ব্যাজস্তুতির একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

পুংসঃ পুরাণাদাচ্ছিদ্য শ্রীস্ত্বয়া পরিভুজ্যতে
রাজন্নিক্ষ্বাকুবংশস্য কিমিদং তব যুজ্যতে॥

হে রাজন্! তুমি ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেও পুরাণ পুরুষ নারায়ণ থেকে লক্ষ্মীকে অপহরণ করে নিয়ে যে উপভোগ করছ, তা কি তোমার উপযুক্ত কাজ হচ্ছে? এ বাক্য শুনতে নিন্দার মতই শোনাচ্ছে; কিন্তু আসলে এ রাজার প্রশংসা—যেহেতু রাজা ধন-দৌলতের অধীশ্বরী লক্ষ্মীদেবীকে নিজের বশে রেখে দিয়েছেন এবং সমগ্র পৃথিবী উপভোগ করছেন। এটী ব্যাজস্তুতি।

এ ভাবে কুন্তক অধ্যায়ে ও সমগ্র প্রবন্ধে বক্রত্ব বা সৌন্দর্য প্রতিপাদিত করেছেন।

কুন্তকের আর একটী মত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তিনি দেশভেদ অনুসারে বিভিন্ন রীতির নামকরণে বিশেষ আপত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, একই দেশের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রণালীর রচনায় অভ্যস্ত। গৌড় দেশে জন্মগ্রহণ করলেই গৌড়ী রীতি, আর বিদর্ভে জন্মগ্রহণ করলেই বৈদর্ভী রীতিতে কবি সুদক্ষ হবেন, এমন কোনও স্বাভাবিক নিয়ম নাই। তাই কবির শক্তি, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস অনুসারেই রচনার রীতি স্থিরীকৃত হয়, তখন দেশের অংশবিশেষের সঙ্গে কো- রীতিকে চির-সংবদ্ধ রাখলে চলতে পারে না।

রস সম্বন্ধে কুন্তকের বক্তব্য এই যে রস বিশেষপ্রকারের বক্রত্ব পুষ্ট করে তোলে বলে ইহা কাব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ইনি ভামহ ও দণ্ডীর "রসবৎ, প্রেয়ঃ, উর্জস্বী এবং সমাহিত" এই চারটী অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলেই স্বীকার করেন না। এই চারটী অলঙ্কার কুন্তকের মতে অলঙ্কার্য, অলঙ্কার নয়। তবে কুন্তক রচনায় রসের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রবন্ধ ও প্রকরণবক্রতায় রসের অত্যধিক গুরুত্ব তিনি ঘোষণা করেছেন। কুন্তক ধ্বনির গুরুত্বও স্বীকার করে নিয়েছেন; তবে ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ—তা' তিনি স্বীকার করতে রাজী নন। অবশ্য মম্মটের কাব্যপ্রকাশ রচনার পরে "ধ্বনি"-বাদ এমন প্রসার লাভ করে যে তারপরে অন্য কোনও মতবাদ আলঙ্কারিকেরা স্বীকার করতে চান নি। ফলে কুন্তকের অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যাখ্যানকৌশল সত্ত্বেও তাঁর মতবাদ পরবর্তী যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করে নি। পরবর্তী যুগের আলঙ্কারিকেরা কেবল খণ্ডনের জন্যই কুন্তকের মতবাদ স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

যাহা হোক্, কুন্তকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি মতবিশেষ স্থাপনের অপূর্ব কৌশল, নির্ভীকতা এবং যুক্তির দৃঢ়তা, ফলতঃ তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভূত সমুন্নতি সম্পাদন করেছে, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। *

* অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর "সাহিত্য-বাসরে" পঠিত এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

লণ্ডন থেকে ফিরবার পথে

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লণ্ডন থেকে বেলা ১০টায় রেলগাড়িতে চড়ে প্রায় দু ঘণ্টায় উলউইচ পোতাশ্রয়ে পৌঁছি। সেখানে টেমসের একটি কাটা খাড়ির মধ্যে 'মালোজা' জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। বেলা ১২টায় জাহাজে উঠি। উঠামাত্রই দুপুরের খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে। সরুচালের ভাত পেয়ে বাঙালী যাত্রীরা খুব উৎফুল্ল হল। অবশ্য এর পরে জাহাজে আর দুদিন মাত্র ভাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। জাহাজখানি বড় হলেও (২৩ হাজার টন) পুরাতন—গতিও ২৪ ঘণ্টায় ৩৬০-৩৭০ মাইল মাত্র ছিল। যাত্রী সংখ্যা ছিল বার তের শত। সবই এক ক্লাস—টুরিষ্ট ক্লাস—ভাড়াও অনেক সস্তা। লণ্ডন থেকে বোম্বাই এর ভাড়া ৫২ পাউণ্ড মাত্র—অবশ্য খাই খরচা সমেত। পাউণ্ডের দাম এ সময় ছিল সওয়া তের টাকা। যাবার সময় গিয়েছিলাম বিখ্যাত জাহাজ ষ্ট্রাথেয়ার্ডে (২৭ হাজার টন) —প্রথম শ্রেণীতে—ভাড়াও নিয়েছিল ৯২ পাউণ্ড। অবশ্য কামরায় একক ছিলাম। এবার আসতে হল অপর পাঁচজনের সঙ্গে এক কামরায়। শ্রেণী বিভাগ না থাকাতে এ জাহাজে যে কোনও তলাতে গিয়ে পরস্পর দেখা শুনা বা আলাপ আলোচনা করবার কোনো বাধা ছিল না। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভোর থেকেই ছিল ভীষণ কুয়াশা। সারাদিন প্রায় সমভাবেই ছিল। আমি যে কয়মাস ওদেশে ছিলাম—সূর্য্যের মুখ বড় একটা দেখতে পাই নি। অধিকাংশ সময়ই ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকত—জার্মানি সুইজারল্যাণ্ডে ত বরফই পড়ত প্রায়শঃ। সুতরাং বারমাস উজ্জ্বল সূর্য্য দেখার অভ্যাস যাদের—তাদের কাছে এ অবস্থা যে কষ্টদায়ক হবে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তাই মালোজা জাহাজ ভূমধ্য সাগরে আসার পর যখন নির্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল আকাশ ও সমুদ্র এবং শুক্লপক্ষের শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত প্রকৃতির সাক্ষাৎ পেলাম তখন সত্যিই বড় ভাল লাগল। অজ্ঞাতসারেই একটি কবিতায় এই উচ্ছ্বাস হল প্রকাশিত। আপনাদের বিরক্তি উৎপাদনে বিরত হবার জন্য এর প্রথম ৪ ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করলাম—

> মালোজা ফুল্ল সরোজিনী সম ভাসিয়া জলে
> আঁধারের দেশ পিছনে ফেলিয়া—
> সাগর দোলায় দুলিয়া দুলিয়া
> চির সুন্দর আলোকের দেশে হাসিয়া চলে।

কবিতাটির ইংরেজী করে সহযাত্রী জার্মান ও ইংরেজ বন্ধুদের দেখানোতে তারাও এর খুব তারিফ করেছিল। নীচে প্রথম চার ছত্র উদ্ধৃত করলমে।

> **Like a full blown lotus on the Sea**
> **The Maloja floats all gay and free,**
> **Leaving the land of fog and mist**
> **Onward She moves to the Sunny East.**

আবার কিছু সময়ের জন্য সেই আঁধারের দেশে—উলউইচ জাহাজ-ঘাটে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি। লাঞ্চের পর জাহাজের অনেক অলিগলি ভেঙে নিজের কামরায় গিয়ে মালপত্র গোছগাছ করে ডেকে উঠলাম। তখন বিকাল হয়ে গেছে। চাটগেঁয়ে মাল্লারা—'জিগির' দিয়ে নোঙর তুলছে। যাঁরা প্রিয়জনদের বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁরা সজল চক্ষে বিদায় নিয়ে নেমে যাচ্ছেন। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে অনেকের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব; তাঁরা একদৃষ্টে জাহাজের দিকে চেয়ে আছেন; জোরে কথাবার্তাও দুএকটি বলছেন। ক্রমে জাহাজ চলতে সুরু করল। টুপি রুমাল প্রভৃতি নেড়ে চলমান এবং স্থির জনতার মধ্যে বিদায়ের পালা শেষ হল। এই সময় ডেকে দেখা হ'ল একজন খর্বাকৃতি, কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে। ইনি শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গুপ্ত। ইনি ওরিয়েণ্টাল লাইফ ইনসিওরেন্সের ঢাকা শাখার ম্যানেজার ছিলেন। অবসর গ্রহণ করেছেন অনেকদিন—সত্তরের কাছে বয়স। প্রায় এক বৎসর ইনি ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করে ফিরছেন। বৈষ্ণব ধর্মের মহিমা প্রচার করাও নাকি তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীযুক্ত গুপ্তের সাহিত্যানুরাগ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের দখল অসাধারণ। এই বয়সেও তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং শারীরিক শক্তি যথেষ্ট। শ্রমসাধ্য খেলাতেও তিনি সমভাবে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। এঁর লিখিত গোবিন্দদাসের কড়চার প্রতিবাদ পুস্তক দেখালেন। রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী গ্রন্থেও এঁর লেখা দেখালেন। ফলতঃ শ্রীযুক্ত গুপ্তের সাহচর্য্য জাহাজের একঘেয়ে দিন কাটানোর পক্ষে মূল্যবান হয়েছিল আমার কাছে। এঁর তাগিদেই জাহাজে কবিতা লিখতে বাধ্য হই। একটির উল্লেখ করেছি—আর একটিতে উপসংহার করব।

আমার কামরায় ছিল দুটি পাঞ্জাবী যুবক। এদের দলের আরও কয়েকটি পাঞ্জাবী যুবক ছিল পার্শ্ববর্তী অন্য কামরায়। বাঙালী আমরা বিলাতে যাই টাকা খরচ করতে, কিন্তু পাঞ্জাবীরা ইংলণ্ডে টাকা উপার্জন করে—তা নিয়ে দেশে ফিরছে। এদের সবারই কাটা কাপড়ের ব্যবসায় —লিভারপুল, মানচেষ্টার প্রভৃতি শহরে। নিজেদের জ্ঞাতি ভাইদের হাতে দোকানের ভার দিয়ে তারা কয়মাসের জন্য দেশে ফিরছে। এদের মধ্যে শান্তি নামে যুবকটির কথা বড়ই বিস্ময়কর। সে লেখাপড়া জানে না; কোনও রূপে নিজের নাম স্বাক্ষর করা মাত্র শিখেছে। আঠার বৎসর সে লিভারপুলে আছে। এখন বয়স হবে ছত্রিশের কাছাকাছি। অবিবাহিত, স্বাস্থ্যবান, সুদৃঢ় গঠন। তবে চরিত্র বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি—সে বালাই এর নেই। লিভারপুলে এর মস্ত দোকান—নিজে নানা হাট ও লণ্ডন প্রভৃতি সহর থেকে পাইকিরী দরে কাপড় কিনে নিয়ে যায়। দোকানে হিসাব রাখার জন্য কর্মচারী রেখেছে একজন ইংরেজকে

—একে নাকি সপ্তাহে ৬ পাউণ্ড মাইনে দিতে হয়। সপ্তাহে শান্তির দোকানের লাভ হয় কুড়ি পঁচিশ পাউণ্ড। অবশ্য এই টাকার অধিকাংশই সে করে অপব্যয়। অক্ষর জ্ঞানহীন এই সরল পাঞ্জাবী যুবক মাঝে মাঝে তার বিচিত্র জীবনকাহিনী অসঙ্কোচে বলে যেত আমাদের সামনেই—শিশুর মত সহজ সরল ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে। আমার কামরায় যে দুটি পাঞ্জাবী যুবক ছিল, তাদের মধ্যে একজন মোটামুটি শিক্ষিত এবং বেশ মার্জিতরুচিসম্পন্ন। বীর্য্যের সঙ্গে কমনীয়তার সুন্দর সমাবেশ দেখেছি তার মধ্যে। এই যুবক ছিল এদের চালক ও উপদেষ্টা। অপর পাঞ্জাবীটি ছিল খুব হিসাবী, সরল, অনাড়ম্বর প্রকৃতির; মদ দূরে থাক, সিগারেট পর্য্যন্ত সে স্পর্শ করত না। সদা হাসি মুখ এই যুবকের প্রাণ-খোলা ব্যবহারের কথা অনেকদিন মনে থাকবে।

জাহাজ দুই তিন দিন চলার পর আমাদের একজন বাঙালী যুবক আমায় বলল—ডেকে একজন জার্মান বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সে দেখেছে—ভদ্রলোক ইংরেজী প্রায় বলতে পারেন না কাজেই কথা বলার সঙ্গী খুঁজছেন। আমি পরদিন এঁকে খুঁজে বের করে জানলাম—ছেলেমেয়ে বার্লিনে রেখে পেটের দায়ে ইনি (হের হাইনরিখ কাপস) মহীশূরের একটি চিনির কলের কেমিষ্ট হ'য়ে ভারতে আসছেন। বেঁটেখাটো চেহারার এই বৃদ্ধ জার্মান ভদ্রলোকের উদাস অসহায় করুণ দৃষ্টি আমাকে বড়ই আনমনা করত। তিনি আমার কামরায় এসে জার্মান প্রাইমার দেখে কয়েক দিন উহা পড়লেন এবং মহীশূরে গিয়ে এই বইএর সাহায্যে ইংরেজী শিখতে চেষ্টা করবেন, বললেন। কয়েক দিনের মধ্যে দেখি হের কাপস অনেক জার্মান সহযাত্রী আবিষ্কার করে ফেলেছে। এদের কেউ আসছে কেমিষ্ট হয়ে বম্বের সাবানের কলে, কেউ টাটায় ইঞ্জিনিয়ারের পদে, কেউবা ব্যাঙ্গালোরে যাচ্ছেন অধ্যাপক হয়ে। কয়লা খনির মালিক কলিকাতার একজন মাড়োয়ারী বণিকের চাকরী নিয়েও একজন আসছেন দেখলাম। এদের সবার সাথেই আমার বেশ আলাপ হয়েছিল এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে চিঠিপত্রও লিখেছেন আমাকে। কয়েকজন সপরিবারে এলেন। তার মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে যিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে এলেন তাঁর চার পাঁচটি কাচ্চাবাচ্চা। তাঁর কথা যা শুনলাম তাতে পেটের পিলে চমকে ওঠে। তাঁকে মোটা মাইনে যা দিতে হবে তা ছাড়াও তাঁকে এখানে আসবার অনুমতি দেবার জন্য দৈনিক নাকি ৫০ ডলার ক'রে সেলামি দিতে হবে মার্কিন মিলিটারী সরকারকে। অথচ গবেষক হিসাবে তাঁর এমন কোনও খ্যাতির কথা ত পূর্বে শুনিনি। সুইজারল্যাণ্ডে বিজ্ঞানের নোবেল লোরিয়েট অধ্যাপকগণ যেখানে বড় জোর দু' হাজার টাকা বেতনে সন্তুষ্ট—সেস্থলে এরূপ একজন বিজ্ঞানীর জন্য ভারতের এই গুরুভার বহনের কি মানে হ'তে পারে তা বুঝে উঠতে পারলাম না। ব্যাপারটি বড় রহস্যময় ঠেকল।

কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না—ভারতীয়েরা বহুদিন বিলাতে থাকলেও যে তাদের চরিত্রের উৎকর্ষ তেমন সাধিত হয় না—তার প্রমাণ মিলল কয়েকটি পাঞ্জাবী যুবকের ব্যবহারে। একটি কামরায় দু'জন পাঞ্জাবী ও বোধ করি তিনজন বাঙালী ছিলেন। সবাই উচ্চ-শিক্ষিত। যুক্তপ্রদেশ নিবাসী প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক যুদ্ধের গোড়া থেকেই লণ্ডনে ছিলেন—তিনি ডক্টর কি ডাক্তার হবেন, ঠিক জানা নেই। এঁর সাধারণ চালচলন খুব সুরুচিসঙ্গত ছিল না, তারপর একদিন রাত্রে কামরায় মুখ ধোবার জন্য যে সিঙ্ক থাকে তাতে তিনি প্রস্রাব করেন। টের পেয়ে তাঁর সহগামী বাঙালী ও পাঞ্জাবীরা এই কাজের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁর পয়সায় মদ খেতে চায়। ভদ্রলোক উহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় পাঞ্জাবী যুবকদ্বয় প্রৌঢ়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর বিছানায় প্রচুর মূত্রোৎসর্গ করে। এই ব্যাপার শেষে এতদূর গড়ায় যে, একদল ক্যাপটেনের কাছে গিয়ে নালিশ করে এবং ক্যাপটেন উভয় পক্ষকেই ডেকে যারপরনাই তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে দেন। ক্যাপটেনের ঘর থেকে লাউডস্পিকারে যখন উভয়পক্ষের ডাক পড়ে তখন ব্যাপারটি বেশ রাষ্ট্র হয়ে যায় এবং ইহা সুরুচিসম্পন্ন ভারতীয় মাত্রেরই মনে গভীর রেখাপাত করে।

বোম্বাই সহরে তার স্বামীর কাছে আসছিল একজন ইংরেজ যুবতী। একজন ভ্যাগাবণ্ড পাঞ্জাবী যুবক নিজেকে অক্সফোর্ডের ডক্টরেট উপাধিধারী বলে পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে এমন বেশী ঘনিষ্ঠতা জমায় যাতে করে জাহাজের ইংরেজ এবং পাঞ্জাবী মহলে বেশ চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। মাদ্রাজের এবং পাঞ্জাবের কয়েকটি আমেরিকা-ফেরৎ ছাত্র জাহাজে ছিল। এম, এস প্রভৃতি ডিগ্রী নিয়ে ফিরছে। এদের দাম্ভিকতা এবং 'মেমসাহেবচাটা'-স্বভাব দেখে আদৌ ভাল লাগেনি। জাহাজে দুএকটি বাঙালী পরিবার এবং বাঙালী মধ্যবিত্ত অবস্থার ছাত্র অনেকগুলি ছিল। এদের কয়েকজন বিলাতের লোহালক্কড়, কাপড়ের কল প্রভৃতিতে ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরছে। এদের মধ্যে অবশ্য পাঞ্জাবী-মাদ্রাজীদের মত কামজ-চাপল্য দৃষ্ট হয়নি। মিতব্যয়িতা, শিষ্টাচার প্রভৃতিও এদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দেখে মনে হল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ, অশ্বিনী দত্ত, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাংলা দেশে জন্ম বিফলে যায়নি। আমি নিজে বাঙালী বলে নয়, পরন্তু ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যা দেখেছি তারই উল্লেখ করলাম মাত্র। বোম্বাই এবং উড়িষ্যার যুবক ছাত্র সহযাত্রীদেরও চারিত্রিক দার্ঢ্য এবং চরিত্রমাধুর্য্য দেখে খুসী হয়েছি।

জাহাজে ছোট ছেলেমেয়েসহ যে পনর কুড়িজন জার্মান ছিল তারা সবাই বোম্বাই বন্দরেই নামল। প্রায় তিনচার শত ইংরেজ যুবক যুবতীও সেখানে নেমে অধিকাংশই গেল পশ্চিম পাকিস্তানে। এছাড়া মিশনারী স্ত্রীপুরুষ ছিল ত্রিশ চল্লিশজন। শিশুসন্তান এবং ছেলেমেয়েও এদের ছিল অনেকগুলি। এরা বিভিন্ন দলে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে যাচ্ছে শুনতে পেলাম। এদের যিনি চাঁই—তিনি বিরাটকায় পুরুষ, পঞ্চাশের কাছে বয়স, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। ইনি আগেও অনেকদিন ভারতবর্ষে কাটিয়ে গেছেন। অপর একজন মিশনারী যুবক আমার খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বয়স এর সাতাশ, আটাশ বৎসর। সুঠাম কমনীয় চেহারা—বিলাতের ডাক্তারী পাশ—

সঙ্গে শিশুপুত্রসহ স্ত্রী। ভদ্রলোক যেরূপ সুশ্রী ও দীর্ঘকায়—স্ত্রী ঠিক তার উল্টো—নিতান্ত বেঁটে, ক্ষীণাঙ্গী এবং সাদামাটা চেহারা। এই দম্পতিকে প্রায় সময়ই হিন্দী পড়তে দেখা যেত। এরা যাবে যুক্তপ্রদেশের গ্রাম-অঞ্চলে। মাঝে মাঝে এরা সহযাত্রী হিন্দীজানা লোকের কাছে পাঠ নিত। অথচ মনোযোগের সঙ্গে পড়ত এবং একখানি বোর্ডে হিন্দী হরফ ও বানান লিখত। যে চাঁই মিশনারীর উল্লেখ করলাম, তিনি মাঝে মাঝে ভারতগামী এই সব মিশনারীদের একত্র ডেকে আচার ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। একদিন তাঁর বক্তৃতা শুনলাম। তাঁর বক্তৃতার কয়েকটি কথা বলছি—

"তোমরা নর্তন কুর্দন যা করবার এই জাহাজেই সেরে নাও ; কারণ কর্মস্থলে গিয়ে নৃত্যগীতাদি করলে 'নেটিভরা' তোমাদের কথায় আস্থা স্থাপন করবে না। হিন্দীও যথাসম্ভব শিখে লও—কারণ স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা না বললে তোমরা তাদের হৃদয় জয় করতে পারবে না। বাবুগিরিও তোমাদের ছাড়তে হবে। গরীব চাষীর বা কুলীর ঘরে গিয়ে তাদের দাওয়ায় মাদুর বা মাটিতেই তোমরা বসবে—তাহলে তোমাদিগকে তারা বেশী আপনার জন মনে করবে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির কাছে যেও না। স্কুল কলেজের ছাত্র বা শিক্ষিত 'নেটিভদের' কাছে ঘেঁসবে না! সিটিফায়েড (citified) লোকেদের সর্বদা এড়িয়ে চলবে। কারণ তারা তোমাদের কথা বিশ্বাস করবে না, বরং তোমাদের কার্য্যের তারা বাধা সৃষ্টি করবে।" পাদরী পুঙ্গবের ভণ্ডামির এই চূড়ান্ত পাঠ দিতে দেখে মোটেই ভাল লাগল না। ধর্মের নামে কী ভয়ানক ভণ্ডামিরই না এরা প্রশ্রয় দিতে চলেছে! ধর্মপ্রচারকে রাজনীতির কুটিলতা এবং বণিকের ব্যবসায়ের চেয়েও হীন পর্য্যায়ে নামিয়েছে এরা। বহুদিন পরে নাকি এরা বেশী দলেবলে আসা আরম্ভ করেছে। হতভাগ্য খণ্ডিত-ভারতে 'খৃষ্টস্থান' করার দুরভিসন্ধি এদের পশ্চাতে আছে কিনা কে বলতে পারে?

পূর্বেই বলেছি, শ্রীযুক্ত গুপ্তের নির্বন্ধাতিশয্যে জাহাজে বসে কবিতা লিখতে বাধ্য হই—

দ্বিতীয় কবিতার কয়েকটি ছত্র নীচে দিলাম—

নোয়ার নৌকা বুঝিবা আবার ভাসিল সুখে
সারা দুনিয়ার জীবজানোয়ার লইয়া বুকে।
ঐ দেখ বক চেয়ে আছে বসে সাগর পানে
মন তার ঘোরে কার পিছু পিছু কেইবা জানে!
নিমীলিত চোখে পেচক হোথায় রয়েছে বসি
বক্ষে তাহার সাহারার ঝড় যেতেছে খসি।
বুলবুল বসে মনোসুখে গায় মধুর গান
কপোত-কপোতী নিরালায় করে অধর পান।
বাঘিনীরা ঘোরে রক্ত ওষ্ঠে শিকার আসে
কত কালো ছাগ গলা বাড়াইয়া যেতেছে পাশে।

কোন্ দুর্ভাগা দেশে গিয়ে শেষে ভিড়িবে তরি
উদ্বেগে তাই ঘুম নাই চোখে ভাবিয়া মরি!

এতক্ষণ টুরিষ্ট জাহাজ মালোজার কথা আপনারা যা শুনলেন ও জানলেন, তাহাতে এইরূপ কবিতাই যে আপনারা শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে প্রত্যাশা করবেন—তা আমি হলফ করেই বলতে পারি।

কাব্যিক পৃথিবী

শ্রীবটকৃষ্ণ দে

আমার স্বপ্নেরা সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যায়
পরশ্রীকাতর দিন ঝড় তোলে সমুদ্রের কোণে,
স্থাবর আকাশ, দেখি, বার বার নির্মোক হারায়
ছায়ার মিছিলগুলি পশ্চাতী আহ্বান নাহি শোনে!

অশ্রান্ত যাত্রার তীরে ছায়াম্বিত কল্পনার নীড়ে
পাখীদের গান-ঢালা উৎসীর মায়াবী লগনে,
যখন সূর্যাস্ত-মুগ্ধ মৌন মন ভরে আসে ধীরে
রঙের রূপসীরাজি খেলা করে অপূর্ব স্পন্দনে!

আবছা কুহেলী ছুঁয়ে দূরদেশী তারার আলোক
হয় তো লুটাবে তব লীলায়িত তনুর তনুতে,
অভিসারী ভীরু হাওয়া খুলে দেবে মায়া স্বর্গ লোক
দিবসের দগ্ধ স্বর ভয় পাবে তার প্রান্ত ছুঁতে!

আজ্‌কে যান্ত্রিক বিশ্ব, জানি হ'বে একদা কাব্যিক—
সেদিনের সে-আশ্বাসে ভরে মোর প্রাণ কল্পান্তিক!

অভিযান

শ্রীঅমরবন্ধু রায়চৌধুরী

১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলন যখন সমগ্র ভারতবর্ষকে এক অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত করে দিয়েছিল অমলের বয়স তখন এগারো। সেই বৎসরই অমলকে তার মাতৃভূমি প্রথম ছাড়তে হয়। অপেক্ষাকৃত একটি বড় গ্রামের বিদ্যালয়ে তাকে যোগ দিতে হয় তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। অমল কোনদিন তার বাবা মাকে ছেড়ে থাকে নি। দিদিমার অপরিমিত আদর ও মামীমার সস্নেহ যত্ন তাকে তার ছোট্ট গ্রামটির কথা আর মা বাবার কথা ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার মন বার বার উড়ে গেছে তার প্রিয় গ্রামটির কাছে। ভেসে এসেছে তার মনে—তার শৈশবের মধুর স্মৃতি। মায়ের স্নেহ, দাদা ও বৌদির আদর, ছোটদিদির সাহচর্য্য, বন্ধুদের ভালবাসা—এ সব স্মরণ করে অমল প্রায়ই উন্মনা হয়ে উঠেছে। দিদিমা মামীমারা অনেক চেষ্টা ক'রেও তার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে পারেননি।

ইতিপূর্ব্বে অমল কোনদিন বিদ্যালয়ে পড়ে নাই। সাহিত্যে তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। অল্প বয়সেই বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরাজী রচনার জন্য তার খুব সুনাম হ'ল। ক্লাশের সকল ছেলেরাই এই শান্ত ও বিনয়ী ছেলেটিকে ভালবেসেছিল। কিন্তু অমলের মন সুস্থির হ'তে পারেনি এই যত্ন ও প্রশংসা পেয়েও, কবে সেই ছোট্ট গ্রামটিতে ফিরে যাবে, কবে তার স্নেহময়ী জননীর সঙ্গে মিলিত হবে নির্জ্জনে এই তার ভাবনা ছিল। গ্রামের নূতন কাটা দীঘির বালি দিয়ে কত মন্দির গড়েছে ভেঙেছে, তার জলে কত সাঁতার কেটেছে, আমের দিনে ভাঙা স্কুলঘরের পাশের গাছের কত আম কুড়িয়েছে, কতদিন মায়ের-দেওয়া কমলালেবু দিয়ে বন্ধুদের আপ্যায়িত করেছে—এ সব মনে করে তার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। বাবা মা কেন তাকে বাড়ী থেকে দূরে পাঠিয়ে দিলেন এই ভেবে অভিমানে ক্ষুব্ধ হ'য়েছে।

দু'মাস না যেতেই অমল অসুস্থ হয়ে পড়ল। জ্বরের বিকারে কেবল মাকে ডেকেছে। খবর পাঠানো হ'ল তাদের বাড়ীতে। পরদিন পাল্কী করে অমলের মা তাদের পুরাতন ভৃত্য নীলমণিকে নিয়ে এলেন। অমল তার মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে অনেকক্ষণ। মা যখন বললেন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, তখন সে শান্ত হ'ল।

কয়েকদিন পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হলে অমলকে নিয়ে তার মা বাড়ী ফিরে এলেন। মা বার বার সাবধান করে দিয়াছেন পাল্কী থামলেই যেন সে নাবতে চেষ্টা না করে। তার শরীর দুর্ব্বল; তাতে অনিষ্ট হতে পারে। পাল্কী যখন তাদের গ্রামের নূতন দীঘির পাড়ে এল, অমল মুখ বাড়িয়ে দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে চোখের জল রাখতে পারেনি। পাল্কী মাটীতে রাখতেই মায়ের কথা ভুলে গিয়ে সে নিজেই নাবতে চেষ্টা করল। দুর্ব্বল শরীরে অবসন্ন হ'য়ে পড়ল। বৌদি তাকে তাদের বড়ঘরের নীচের তলায় সুন্দর করে বিছানা করে দিলেন। খবর পেয়ে পাড়ার লোক ও বন্ধুরা এল, অমল তাদের দেখে কত খুসী হ'ল। মা ও বৌদির সস্নেহ যত্নে অমল শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠল।

এবার ঠিক হ'ল কয়েক মাস পরে তাকে তার মেজদাকে দিয়ে তাদের সহরের বাড়ীতে পাঠানো হবে। শুনে অমল কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'ল। ভাবলে সহরে দাদার কাছে থাকবে, দিদিদের সঙ্গে দেখা হবে, গ্রামের কত লোক মোকদ্দমা করতে যাবে তাদের সঙ্গেও দেখা হবে, আর প্রতি মাসে অন্তত কয়েকদিন করে বাবা নিশ্চয়ই সেখানে থাকবেন। বড়দিন, গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে অনেকদিন বাড়ীতে থাকতে পারবে শুনে আরও সাহস হ'ল। তা'ছাড়া ইতিমধ্যে অমলের বাবা তার মনে অনেক উচ্চাশা জাগিয়ে তুলেছেন। লেখাপড়া শিখলে তার ভবিষ্যত কত উজ্জ্বল হ'তে পারে তিনি তাকে সবিশেষ বুঝিয়ে বলেছেন। সব কথা শুনে অমল এবার মনে মনে স্থির করে নিয়েছে যে বিদেশে না গিয়ে উপায় নেই। গ্রামের জন্য তার কষ্ট হবে, কিন্তু লেখাপড়া না শিখলেই বা চলে কি করে?

বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে একটি ছোট সহরে তাদের পৈতৃক বাড়ীতে তার মেজদা ও ছোড়দার কাছে অমলকে পাঠান হ'ল। অসংখ্য পরিজনের মধ্যে অমল এবার শান্তি বোধ করল এবং নিবিষ্টমনে পড়াশুনা আরম্ভ করে দিল।

ছোট সহর হ'লেও আইন-অমান্য আন্দোলনের ঢেউ তাকে স্পর্শ করেছিল। সরকারী স্কুলের সুন্দর বাড়ীতে তাদের ক্লাশ হত। উজীর-দীঘির পাড়ে অবস্থিত পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের বাড়ীর পাশ দিয়ে অমল তার তিন চারজন সহপাঠীকে নিয়ে রোজ স্কুলে যেত। সে পথের নির্জ্জনতা ও সৌন্দর্য্য তাদের আকৃষ্ট করেছিল। স্কুলের পশ্চিমদিকে বিস্তীর্ণ দীঘি ধর্ম্মসাগর; তার জল থেকে কত পদ্ম তারা তুলেছে। বিশ্রামের সময় উত্তর দিকের বিরাট বটগাছের উপর বসে কত অদ্ভুত গল্প তারা বলেছে ও শুনেছে। যেদিন ঘণ্টা পড়ার পূর্ব্বে স্কুল পৌচেছে সেদিন কামিনা গাছের ছায়ায় মার্ব্বেল পাথর দিয়ে তারা কিছুক্ষণ খেলা করত। কোনদিন হয়ত ছাদের সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অমল অন্যমনস্কভাবে দশটার গাড়ীর আসা-যাওয়ার শব্দ শুনেছে।

কোন কোন দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাদের পাড়ায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ব্যায়াম চর্চ্চাতেও অমল যোগ দিয়েছে। কিন্তু ভাল লাগেনি তার কাছে সেই বাঁশের লাঠি নিয়ে লাইন করে চলা। মাঝে মাঝে সহরে বিপর্য্যয় ঘটে যেত। বিপ্লবাত্মক কাজের অভিযোগে কত বাড়ী পুলিশের লোক এসে খানাতল্লাস করেছে। ঘুম থেকে উঠে অমলও এ সব শুনেছে, কোন কোন দিন নিজেও দেখেছে। বন্ধুরা সকলেই নানা রকম মন্তব্য করেছে; কিন্তু শান্ত গম্ভীর এই ছেলেটি চুপ করে কি যেন মনে মনে ভেবেছে।

মেধাবী ছেলে বলে ইতিমধ্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে সে। সকলেই ভেবেছে বড় হয়ে সে কোন সরকারী কাজে ঢুকবে। তার মনেও ক্রমে উচ্চাশা জেগে উঠেছে। কিন্তু চারদিকে যখন অত্যাচার ও উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি, তখন তার মনে ব্যক্তিগত সুখের প্রতি ধিক্কার এসেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অথবা মৃদু জ্যোৎস্নালোকে তাদের বাড়ীর পাশে নাহুয়ার দীঘির পাড়ে বসে সে নিবিষ্ট মনে দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছে। গান্ধীজী ও জওহরলালের জীবনের ঘটনাবলী মনে করে সে মুগ্ধ হয়েছে। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের যে দুর্জ্জয় ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল ভারতের নানা স্থানে, তার কাহিনী স্মরণ করে সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। কতদিন বসে বসে ভেবেছে সে—দেশের প্রতি তার কর্ত্তব্যের কথা। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভেবে সে নিজকে হীন বোধ করেছে। এই তার পরিবারের স্নেহের বন্ধনকে ছাড়িয়ে, নিজের আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়ে সে যেতে পারে নি দেশের কাজে যোগ দিতে। নিজের এই অক্ষমতাকে সে ধিক্কার দিয়েছে বারবার।

ইতিমধ্যে অমল স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে উঠেছে। কলেজের সব চেয়ে ভাল ছেলে বলে তার খুব সুনাম হ'ল। এবার সে তার চিন্তাধারাকে ভাষায় রূপ দিতে আরম্ভ করে দিল। প্রতি সন্ধ্যায় তার সেদিনকার শ্রেষ্ঠ চিন্তাকে ভাষায় রূপান্তরিত করার মোহ তাকে পেয়ে বসল। দেশের ভবিষ্যৎকে সে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করেছে, মুক্তি আন্দোলনের নেতাদের প্রতি তার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছে, অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে তার লেখনী ওজস্বী হয়ে উঠেছে। দেশের মর্ম্মান্তিক অবস্থা তার ভাবপ্রবণ মনকে নিষ্পিষ্ট করেছে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস নির্ব্বাচনে যোগ দিয়েছে, কোন কোন প্রদেশে শাসনকার্য্যও গ্রহণ করেছে। দেশের অবস্থা ক্রমে শান্ত হয়ে এল। সংগ্রামের শেষে যেন একটা অবসাদ এল।

অমলের পরীক্ষার ফল খুব ভাল হ'ল। ব্যক্তিগত জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দিয়ে তার মনকে স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে আত্মীয়স্বজন সকলেই সচেষ্ট হলেন। বন্ধুদের পরামর্শে তাকে কলকাতায় স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে পাঠান হ'ল। সেখানে নূতন পরিবেশে তার মন ক্রমে শান্ত হয়ে এল। ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে এবার অমল নিবিষ্টমনে পড়া আরম্ভ করে দিল। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তার মনে যে অনুপ্রেরণা এসেছিল তাকে তার কর্ম্মমুখর জীবনও শুব্ধ করে দিতে পারে নি। সাময়িকভাবে সুপ্ত হয়ে পড়ল মাত্র।

অমল কলেজের ভাল ছাত্রদের অন্যতম, তার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। ছাত্রাবাসে সকলেই তাকে স্নেহ

করে। ক্রমে সাহিত্যচর্চ্চায় তার মন আকৃষ্ট হ'ল। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দেশ সেবার ইচ্ছা তার মনে জেগে উঠল।

ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী অমলের মনের গোপনতম স্থানে তার সহপাঠী সুহাসের বোন যূথিকার মানসী রূপ দেখা গেল। যূথিকার বাবা উমাশঙ্কর জেলাজজ। যূথিকাদের বাড়ীতে আইন-অমান্য আন্দোলনের ক্ষীণতম সাড়াও পড়েনি। কনষ্টিটিউশানের মধ্যেই উমাশঙ্কর দেশের শান্তি ও মঙ্গলকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। সুহাস এম-এ পাশ করেই অক্সফোর্ডে পড়তে যাবে পূর্ব্বেই স্থির ছিল। যূথিকা ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশানে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ে। সুহাস প্রায়ই অমলকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে আসে। বহুক্ষণ বহুবিষয়ে তাদের আলোচনা হয়। মাঝে মাঝে উমাশঙ্করও যোগ দেন। যূথিকা অহিংস আন্দোলনে মোটেই বিশ্বাস করে না। তার ধারণা উমাশঙ্কর এবং অমল দু জনেই সমানভাবে ভুল করছেন। দেশকে স্বাধীন করতে হলে সংগ্রাম করতে হবে, তাতে রক্তপাত যদি হয়ও তাকে ভয় করলে চলবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে অহিংস আন্দোলনের সাফল্যের কোন সাক্ষ্য নাই, এত বড় ক্ষমতাকে বিনা যুদ্ধে তাড়ান যায় না—এ সমস্ত মতবাদ প্রকাশ করতে যূথিকা কুণ্ঠিত হয় নি। অমল গান্ধীজীর জীবন-দর্শন তাকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের আধুনিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেছে। যূথিকার কাছে তার স্নিগ্ধ সুমধুর ভাষায় অহিংসার নীতিকে বিশ্লেষণ করেছে, নিজের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার জন্য। অনেক তথ্যসংগ্রহ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার বাণীতেই পৃথিবী মুক্তির সন্ধান পাবে। যূথিকা তাতে মত পরিবর্ত্তন করতে পারে নি। অমল নিরাশ হলেও রুষ্ট হয় নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এসে অমল কি করবে সহজে স্থির করতে পারে নি। নিজের আদর্শবাদকে অক্ষুন্ন রাখতে হ'লে তার ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। শিক্ষা ও সাহিত্য ছাড়া দেশ সেবার সুবিধামত পথ খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধের প্রভাব পরিলক্ষিত হল। দেশের অসহায় অবস্থা দেখে অমল ক্লিষ্ট হল। অনেক ভেবে সে স্থির করে নিল যে ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন না দিলে প্রকৃত দেশ-সেবা হ'তে পারে না।

সুহাস ইতিমধ্যে অক্সফোর্ডে চলে গেছে। একদিন যূথিকার সঙ্গে অমলের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। যূথিকা তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারে নি। অমল ব্যথিত হলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। আশা করেছিল যূথিকার কাছে সে পাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকে সে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে নি। উমাশঙ্কর অমলের কথা শুনে বিচলিত হলেন। অমলের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য থাকলেও তিনি তাকে তার আদর্শ ও নিষ্ঠার জন্য মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন।

অমল স্থানীয় একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করল এবং অবসর মত তার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করতে আরম্ভ করে দিল। অল্পকাল মধ্যেই দেশের লোক তার আদর্শ ও নিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হল। পুলিসেরও নজর পড়তে বিলম্ব হল না।

একদিন রাজদ্রোহের অভিযোগে অমলকে পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বিচারে চার বছরের জেল হল। যথাসময়ে এই খবর যূথিকা পেল। রাজনৈতিক মতানৈক্যের অন্তরালে যূথিকা যে অমলের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তা কোনদিন তার মনে হয় নাই। অমলের অভাব ক্রমেই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করল। তার আনন্দময় জীবন হঠাৎ বিষাদ ও রিক্ততায় ভরে উঠল।

যূথিকার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে উমাশঙ্কর বিচলিত হলেন। মনে করলেন যূথিকার বিয়ে দেওয়াই তার এক-মাত্র সমাধান। ব্যারিস্টার সমীর রায় অনেকদিন থেকেই আনা গোনা করছিলেন। যূথিকার মনোযোগ আকর্ষণ করতেও চেষ্টার ক্রটি করেন নাই।

অমল জেলে যাওয়ার পর হতে যূথিকার জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন এল। ক্রমে সে বহুমূল্য অলঙ্কার ও আভরণ ত্যাগ করে সহজ সাধারণ বেশভূষা গ্রহণ করল। আজ-কাল যূথিকা মোটরে কলেজে না গিয়ে ট্রামে বাসেই যাওয়া পছন্দ করে। উমাশঙ্করের প্রশ্নের উত্তরে বলে—সবই

অভ্যাস রাখতে হয়। যূথিকার এই মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে তিনি চিন্তিত হলেন। অমলের প্রভাব যে তার উপর কত গভীর ভাবে পড়েছে এতদিনে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সমীর রায়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব সে শান্ত অথচ দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করল।

সাহিত্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে বই পড়া ছাড়া কারান্তরালে অমলের কোন কাজ ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পর হতে এপর্য্যন্ত ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসকে সাহিত্যে রূপ দিতে অমল সচেষ্ট হ'ল! কারাগারের নির্জ্জনতায় যূথিকার কথা তার বারবার মনে পড়েছে। ভেবেছে তার লেখনী দেশের অসংখ্য লোককে জাগিয়ে তুলেছে, অথচ যূথিকার মত একটি সামান্য মেয়ের উপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি কেন। যূথিকা সুন্দরী নয়; অথচ তার সপ্রতিভ কমনীয় স্নিগ্ধ রূপ দূর থেকে তাকে যেন দুর্ব্বারভাবে আকর্ষণ করছিল। কত সন্ধ্যায় তার কাছে যেতে ইচ্ছা করেছে। আর জেলে বসে বসে মনে পড়েছে তার শৈশবের লীলাভূমি তার গ্রামকে, তার আত্মীয় পরিজনকে, প্রতিবেশী সকলকে, আর সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়েছে যখন তার বৃদ্ধ পিতামাতার কথা মনে হয়েছে। তাঁদের কাছে আবার ফিরে যেতে, আবার কলেজে ছাত্রদের পড়াতে তার কত ইচ্ছা করছে।

চার বছর পর আলীপুর জেল থেকে বেরিয়ে এসে অমল দেখতে পেল—একদিকে ছোড়দা তার বাবা মাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর একদিকে সুহাস যূথিকাকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। বাবা, মা ও ছোড়দাকে প্রণাম করে উঠতেই সুহাস হাসিমুখে তাকে অভিনন্দন জানাল। সুহাস বিদেশ থেকে বলিষ্ঠ মন নিয়ে ফিরে এসেছে দেখে অমল সুখী হল। যূথিকা নারবে তার পাশে দাঁড়িয়েই রইল। কি বলবে সে এতক্ষণেও স্থির করতে পারে নি। যূথিকার সাধারণ সুশ্রী বেশ দেখে অমলের মুখ স্নিগ্ধ আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সস্নেহে সে সকলকে পরস্পরের সহিত পরিচয় করিয়ে দিল। সন্ধ্যায় তাদের বাড়ী যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অমল সুহাস ও যূথিকার নিকট বিদায় গ্রহণ করল।

অমলকে কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই সাদরে অভ্যর্থনা জানাল, মুক্তিকামী ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে সে সম্মান সে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করল। দেশের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার ব্যাকুল আগ্রহ দেখে অমল প্রীত হ'ল।

প্রথম পরিচয়েই সুহাস ও যূথিকাকে অমলের বাবার ভাল লেগেছিল। সুহাসের নিকট তিনি অমলের সঙ্গে যূথিকার বিয়ের প্রস্তাব করলেন। উমাশঙ্কর তাঁর ভুল বুঝতে পেরে এবং দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা ভেবে খুসী হয়েই এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। অমল ধনী না হলেও তার মনের সম্পদের পরিচয় তিনি পূর্ব্বেই পেয়েছেন।

যূথিকাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেয়ে অমল সুখী হ'ল। কিন্তু যূথিকা ভাবে সংগ্রামের শেষ নেই। কবে আবার অমলকে যেতে হ'বে কে জানে?

আশাবাদী

শ্রীগোপলচন্দ্র দাস

আগেকার মত আজো হেরিয়াছি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে
আকাশের গায়ে আবীর ছিটায়ে রবিটি ডুবেছে হেসে।
ভোরের আকাশে দেখেছি আবার শুক-তারকার পানে,
কি জানি কেমন বেদনা-কাতর ছলছল আঁখি হানে।
আগেকারি মত রহিয়াছে সব, তবু ঘুরিয়াছে চাকা,
বিধাতা কি জানি কোন্ লীলাটির ভিত্তি করিল পাকা!
দেখেছি বন্ধু, দোষীর পাপেতে নিরীহ পেয়েছে সাজা,
আমীরে দেখেছি ফকির হইতে, ভিখারী হ'য়েছে রাজা।
কি কথা লিখিব! কাল হেরিয়াছি যে-মুখে উজল হাসি,
বিষাদের মেঘ আজ ঘনায়েছে, দুচোখে অশ্রুরাশি।
এও থাকিবে না জানি গো বন্ধু, দুদিনের ছায়াবাজি
মিলাবে দুদিনে। কোন্ যাদুকর খেলিছে কারসাজি।
আবার আসিবে ধরায় শান্তি, অশিব নাশিবে কাল,
প্রভাতের আলো টুটিবে আবার নিশির তিমিরজাল।
তথাপি বন্ধু, থাকিবেই চির সুখ ও দুঃখ বোধ,
হাসি ও অশ্রু, ভাঙাগড়া আর ঋণ ও ঋণের শোধ।
বিষাদে হরষে বিরহে মিলনে প্রীতি ও প্রেমের ছবি
একদা আঁকিবে নিখুঁত করিয়া আগামীকালের কবি।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

গঠন ও দহন

মতঙ্গ মুনির কল্পনায় এই চিত্রই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার আশ্রমে আসিতেছেন, মহামানবের পদরেণুস্পর্শে আশ্রম ধন্য ও আশ্রম-সেবিকা শবরী হইবে জীবন্মুক্ত। উৎফুল্ল ত্রিকালজ্ঞ ঋষি আদেশও দিলেন অনুরূপ।

একাকিনী দিবস রজনী অনন্যমনা শবরী আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ ও আগন্তুক পথিকদের পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছিলেন। ঋষির ঐ শেষ আদেশ ও আশীর্বাদ ব্যর্থ হয় নাই। শবরীর সাধনা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল মহাজীবনের পদরেণু স্পর্শে। রাত্রির এই তপস্যা উদ্‌যাপিত হইয়াছিল জ্যোতির্ময়ের উদার অভ্যুদয়ে। প্রভাত সূর্য্যের পুণ্য-পরশ-পুলকে শবরীর বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিস্নান এ জীবনেই সম্ভব হইয়াছিল। দুঃসহ ধৈর্য্যের অবসানে মুক্তির সুধা তাহাকে মৃত্যু যন্ত্রণা বিস্মরণে সাহায্য করিয়াছিল।

কবে, কোন যুগে সাধনার এই পবিত্র হোমানল পম্পা নদীর উভয় তীর আলোকিত করিয়াছিল কে জানে? রামায়ণকাব্যের অমর লেখনী আজও ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যুগে যুগে ঘোর বিপদবহ্নির মধ্যে প্রতিদিনের সুখ-আহ্লাদ জলাঞ্জলি দিয়া যাঁহারা নূতন দিনের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাঁহারা অমর, তাঁহারা প্রণম্য, সুখ-দুঃখের হাসি কান্নায় ভরা এই বসুধা তাঁহাদের বরমাল্য লাভ করিয়াই সমৃদ্ধ হয় এবং নিত্য চলার পদক্ষেপে নূতন ইতিহাস রচনা করিয়া চলে।

পরাধীন ভারতে দীর্ঘ তমিস্র রজনীর কাহিনীও অনুরূপ। বহু শব-সাধকের দুশ্চর সাধনায় এই মসীঘন রজনীর প্রভাত আসিয়াছে, দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে। বিমল প্রভাতকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে দেখা দরকার কোন কোন শবরীর দুঃসহ সাধনায়, বুকের ফেনিল তপ্তরক্তে এই দীর্ঘ রজনীর অবসান হইল। কাহাদের চরম দুঃসাহসিকতা, অনমনীয় দৃঢ়তা, অতুলনীয় ত্যাগ হইবে এই নূতন পথের পাথেয়। একটার পর এক বিদেশী জাতি তাহার রকমফের লুণ্ঠনের পাশবিকতায় যখন সমস্ত জাতিটাকে দরিদ্র, নিবীর্য্য ও অমানুষ করিয়া তুলিতেছিল, আকণ্ঠ-পঙ্কে নিমগ্ন সমস্ত জাতির অস্তিত্বই যখন বিলীয়মান হইতে চলিয়াছিল, তখন শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় যাঁ হারা-আপনি জ্বলিয়া নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও পথরেখার নির্দেশ দিয়া যাইতেছিলেন আজ দিবসের আলোকে তাঁহাদের বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। প্রতিবিধানের প্রচেষ্টাহীন, অক্ষমতার শুষ্ক, নিস্পেষণে ভগ্ন মেরুদণ্ড, কাপুরুষতার জগদ্দল পাথরে নিষ্পিষ্ট জাতির চরম প্রকাশের সামনে মনে হইয়াছিল বুঝি ঐ সকল দীপ-শলাকা নীরবে ভস্মসাৎ ও নিঃশেষে ফুরাইয়া হারাইয়া গেল। আজ মনে হয় না কি বিদেশী শাসন, শোষণ ও তাহার সহস্রমুখা আয়ুধ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এই বীর্য্যমুক্ত সাধনার নিকটে, ঐ পবিত্র মুষ্টিমেয় ভস্মরাশি পঞ্চভূতে বিলীন হয় নাই—সসাগরা ভারতকে দুর্জ্জয় সাহস ও স্বাধীনতা অর্জনের কঠিন সাধনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে বলা যায়।

চৈতন্যোত্তর বাংলা সমাজ সহস্র পরাধীনতার মধ্যেও বিদেশী শাসক-গণের সহিত সংস্কৃতির যুদ্ধে বিজয়লাভ করে। তাই দেখা যায় কিছু-কালের জন্য বাংলার জেতা ও বিজেতা উভয়েই পারস্পরিক সমঝোতায় এগাইয়া চলিয়াছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজের সাধকের প্রেম সঙ্গীতে বাংলাভাষার গোড়াপত্তন দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যের এই বিপ্লবী অবদান আমাদের দূরদৃষ্টিতে উত্তরোত্তর ব্যাপক না হইয়া শিথিল হইয়া যায়। বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ পুনরায় স্তিমিত হইয়া পড়িল, মাঝে মাঝে খদ্যোতের আলো অন্ধকারকে বরং নিবিড় করিয়া তুলিত। মেরু-দেশের বন্য হরিণের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে যে সকল যাযাবর পাহাড় পর্বত ডিঙ্গাইয়া এ দেশের শাসন বল্গা দখল করিল তাহারাও ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল, যাহারা তাহাদের ক্ষুদ্রতায় রূঢ়তায় দেশের আপামর সকলকে অপমানিত করিল—প্রকৃতির অভিশাপে ক্রমে তাহারাও এক সঙ্গেই অপমানিত হইতে লাগিল।

[ভারতের রত্নসম্ভার যুগে যুগে বিদেশীকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার রন্ধ্রপথে এবার আসিল নূতন ধরণের লোক, সপ্তডিঙ্গায় পাল চড়াইয়া সাত সাগরের ওপার থেকে, এর আগে যাহারা পাহাড় ডিঙ্গাইয়া আসিত তাহারা ছিল বৈরীত্বেও হিংসায় প্রবল। কিন্তু এবারের অভিযাত্রীদের রকম কিছু পৃথক ছিল, এরা ছিল প্রকৃতির পূজারী কাজেই জড় জগতের ব্যবহার এদের জানা ছিল, পোষ্টাফিস, বাষ্পীয় রেলগাড়ী, বাষ্পীয় পোত, নূতন ধরণের কামান বন্দুক, গোলাগুলি তৈয়ার ও ব্যবহার এদের জানা ছিল। আর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এদের মজ্জাগত, তাহা হইল অত্যাচারের মধ্যে ও একটু শোভনতা এবং শালীনতা, হিংস্রতার তীব্রতা এতে পুরোপুরি ছিল—হয়তো বেশী তীব্রই ছিল, কেবলমাত্র ধারাল ছুরিকার ফলা মোলায়েম মখমলের খাপে ঢাকা থাকিত। লুণ্ঠন ও অত্যাচার বরং বেশীই ছিল কিন্তু ব্যক্তিগত প্রকাশ্য লুণ্ঠন ইহারা অপছন্দ করিত, বিচারের নামে, খাজনা আদায়ের নামে, শুল্ক আদায়ের অজুহাতে, দেশীয় শিল্পের উন্নতির জিগীরে, দেশীয় শিক্ষা সংস্কারের নামে, শিল্পের ধ্বংস, সংস্কৃতির সংহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিত। বরং একশ্রেণী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় খাড়া করিতে সমর্থ হইলেন যাঁহারা তাহাদের ভাষায় কথা বলিত, বিদেশী ভাষায় স্বপ্ন দেখিত এবং দেশীয় সকল কিছুকেই ঘৃণা করিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রকাশ্যে অস্পৃশ্য খাদ্যগ্রহণ, নির্বিচারে মদ্যপান ও এদেশীয় রীতিনীতিতে

অশ্রদ্ধা প্রকাশ রাজকীয় সমর্থন লাভ করিত। তাহাদের ধর্ম-প্রচারকেরা ধর্মের নামে এ দেশীয় রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশই কর্ত্তব্য মনে করিত। ঠিক এই সময়ে এ দেশীয় জনসাধারণের মধ্য হইতেই আসিল প্রতিবাদ।

রাজর্ষি রামমোহন দুই সভ্যতা তরঙ্গের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন—বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রমাণিত না হইলে বৈদেশিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করা যাইতে পারে না। দেশীয় জনসাধারণকে প্রাচীন বেদ, উপনিষদসম্মত জ্ঞান এবং আধুনিক বিচারগ্রাহ্য বিজ্ঞান উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। উভয়ের সামাজিক রীতিনীতি শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া গ্রহণ কিম্বা বর্জন করিতে হইবে। যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের পুরাতন সংস্কৃতির সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন অজানা শিক্ষা-সংস্কার গ্রহণে দেশের উপকার হইবে না। স্বাধীন মতবাদ স্বাধীন আবহাওয়া ব্যতীত পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বৈদেশিক কুশাসনে প্রপীড়িত জনসাধারণের মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইল, ভারতে পুনরায় নবজাগরণের স্পন্দন দেখা দিল। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস প্রধানতঃ এই মুক্তি আন্দোলন, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিবিজড়িত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বহু সাধকের দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায়, জানা ও অজানা বহু মহাজনের রোমাঞ্চকর মনীষায়, অমিত তেজ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তায় নূতন বাংলার জন্ম হয়।

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?

অসংখ্য ত্যাগ ও আত্মাহুতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা সম্মিলিত হইয়া পদ্মার উত্তাল জলতরঙ্গের ন্যায় বিপুল জনস্রোতের সৃষ্টি হইয়াছে। ধ্যান নেত্রে সাধক দেখিলেন, মায়ের ছন্নছাড়া ভৈরবী মূর্ত্তি। উদাসিনী, পাগলিনী, কঙ্কালময়ী ভৈরবীর বন্দনা কবির কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল, মা কি ছিলেন ও মা কি হইবেন? আশার আলোও কবি ধ্যান নেত্রে দেখিতে পাইলেন। সেই মাতৃবন্দনা সম্বল করিয়া গোটা দেশ জাগিয়া উঠিল। এই মহাসঙ্গীত ফিরিঙ্গি হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিল। কিন্তু সেই উন্মত্ত জলতরঙ্গ রোধিবে কে? বিদেশী বুঝিতে পারিল, উদ্বেল জলতরঙ্গের উপরে তাহার জাহাজের খোল এবার চুরমার হইবার পালা, তাই সময় থাকিতে সরিয়া পড়িল কিন্তু যাওয়ার কালে তক্ষকের শেষ বিষদাঁত হানিতে ভুলিল না। যাক সে কথা!

যাঁহাদের ত্যাগে ও মানসিক দৃঢ়তায় আমরা আজ স্বাধীনতা পাইয়াছি তাঁহাদের আলেখ্য নূতন বাংলার সামনে তুলিয়া ধরাই হইল এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তাঁহাদের অমিততেজ এবং রোমাঞ্চকর জীবনবেদ শতধা বিচ্ছিন্ন এই দেশে আজ বেশী স্মরণীয়। উনবিংশ শতাব্দীর বহু মহাজনদের মধ্যে আপন ভোলা ব্রহ্মবান্ধব অন্যতম। তাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগ ও বিপ্লবী-সাধনা ভারতের আদর্শ হউক। জাতির একটী ক্ষুদ্র অংশও যদি তাঁহাদের মত শক্তিশালী, মনীষাসম্পন্ন, চরিত্রবান এবং ব্যক্তিগত, দলগত, স্বার্থবুদ্ধিলেশশূন্য হয় তবে ভারত যে পুনরায় 'মহাভারত' হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ১২৬৭ সালের ১লা ফাল্গুন) হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খন্নেন গ্রামে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতা দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনি কনিষ্ঠ পুত্র। উত্তর কালে এই ভবানীচরণই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবান্ধবের সমসাময়িক অনেকেই ছিলেন ভারত-বিখ্যাত। লাঞ্ছিতা দেশজননীর মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য অনেকেই আপন সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। কেহ কেহ সংসার আশ্রম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের বৎসরেই স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়, ঋষি অরবিন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বয়সে অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ ছিলেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও স্যার নীলরতন ২।১ বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী, বিশেষতঃ এই দশককে শতাব্দীর স্বর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। দেশ আজ অনেককেই ভুলিতে বসিয়াছে,

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
আপন সোনার ধানে গিয়াছে ভরি—

জাতির অগ্রগতি যাহাদের নিঃশব্দ দানে সমৃদ্ধ ও দ্রুত হইয়াছে, শতাব্দীর গৌরবময় ঠাসা বুননের এই ইতিহাস—সাধারণ মানুষের ছোট্ট স্মৃতি আজ তাঁহাদের ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

শিশুকালেই ভবানীচরণ মাতৃহারা হন। পিতৃদেব কার্য্যব্যপদেশে বিদেশে থাকিতেন। পিতামহীর স্নেহযত্নে তিনি মানুষ হন। শ্রুতিধর ছিলেন বলিয়া বাল্যকালেই গ্রাম্যছড়া, হেঁয়ালি, রামায়ণ ও মহাভারত মুখে মুখেই শিখিয়াছিলেন। বালক কাল হইতেই খেলাধূলা ও দুষ্টামির তিনি প্রিয় ছিলেন। এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই সমবয়স্ক বালকদের তিনি দলপতিত্ব করিতেন; তাই বলিয়া পড়াশোনায়ও তিনি পশ্চাদপদ ছিলেন না। চুঁচুড়ার হিন্দুস্কুলে ও হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রতিবৎসরই তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। কলিকাতার জেনারেল এসেম্বলী স্কুলে পড়িবার সময় তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া ইংরেজ শিক্ষককে বিস্মিত করিয়া তুলিতেন। ত্রয়োদশ বৎসরে তাঁহার উপনয়ন হয়। ইহার পরেই খাদ্যাদিতে তিনি নিরামিষাশী হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই গঙ্গার আড়পারে ভাটপাড়ায় গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকিলেও আমাদের সাধারণ ছেলেদের মতন শরীর চর্চায় অমনোযোগী হন নাই। মস্তিষ্ক-চর্চার সহিত কুস্তি, জিমন্যাষ্টিক, লাঠি ও ক্রিকেট খেলায় তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল, বস্তুতঃ তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ও দৃঢ় মাংসপেশীর দিকে চাহিলে অনেকেই তাঁহাকে উত্তর ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া ভ্রম করিত। এই সময় চুঁচুড়ায় তাঁহার শারীরিক শক্তির প্রয়োগ এক আলোড়ন তুলিয়াছিল।

কতকগুলি আর্মেনিয়ান ও ফিরিঙ্গি ছেলে স্নানের ঘাটে নারীদের প্রতি অভদ্র আচরণ ও ইতরামি করিত, প্রতিকারের উপায় ছিল না বলিয়া সকলেই এই অত্যাচার সহ্য করিত। সহ্য করিল না কিশোর ভবানীচরণ ও তাহার কিশোরদল। ঠ্যাঙ্গানির চোটে ফিরিঙ্গির দল আর গঙ্গার ঘাটের দিকে এগোয় নাই।

সুরেন্দ্রনাথের আবেদন নিবেদন ও কেবল বক্তৃতা তাঁহাকে কখনও আকর্ষণ করে নাই। তরুণ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল শিবাজীর আদর্শ, রাণা প্রতাপের ত্যাগ ও অধ্যবসায় এবং গুরু গোবিন্দের ক্ষাত্র শক্তি। একদিন সোজা মটলেনের বাড়ীতে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আনন্দমোহন বসুর নিকট উপস্থিত। প্রশ্ন করিলেন—স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপায় কি? মসী না অসি? 'Not with pen but the sword' ভারতকে রক্ষা করিতে হইলে কলম দিয়ে কিছুই হইবে না—অসির বিরুদ্ধে অসির ব্যবহার দরকার হইবে। আনন্দমোহন ভবানীচরণের খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন। সেই পরিচয় পাইয়া সস্নেহে তাঁহার শ্বশুর ভগবানবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "বাবাজী দেখ্‌ছ না সরকারী হাকিম সামনে"। তারপরে মিষ্টভাষায় তরবারীর অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু তরুণ বালক বুঝিল না, একই চিন্তা—"তাইতো কি করা যায়, এখন কি করি"। তখন তিনি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর সতর বৎসর বয়স্ক তরুণ কিশোর মাত্র।

এই সময় (খৃঃ ১৮৭৭) আফ্রিকার জুলু যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার আগ্রহে তিনি সৈনিকবৃত্তি লইতে চলিলেন। কিন্তু এক আত্মীয়ের বাধায় ফিরিতে হইল—তত্রাচ ক্ষান্ত হইবার পাত্র তিনি ছিলেন না। যুদ্ধবিদ্যা অর্জন করিতেই হইবে। কলেজের দুই মাসের বেতন ১০৲ দশটাকা হাতে ছিল। সঙ্গী ছিল আত্মভোলা আর তিনটী তরুণ, অবস্থা প্রায় একই প্রকার। লক্ষ্য—গোয়ালিওর সরকারে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিবেন এবং অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্তে আসিলেই ভারত বিজয় আরম্ভ করিবেন। যখন তাঁহারা যমুনা নদী অতিক্রম করিলেন তখন সকলেই প্রায় কপর্দকশূন্য। তারপরে পদব্রজে যাত্রা, খাদ্য কেবলমাত্র ছোলা ভিজা। 'লস্কর' পর্য্যন্ত যাত্রা কাহিনী গল্পের মতই অভিনব এবং রোমাঞ্চকর, কিন্তু অদৃষ্টক্রমে এত করিয়াও সৈনিক হওয়া হইল না। কোন ক্রমে ঠিকানা জানিতে পারিয়া সঙ্গীদের একজনের পিতা 'লস্করে' গিয়া হাজির এবং শ্রীমান্ দিগের বাধ্যতামূলক কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। আত্মীয়স্বজনদের নির্বন্ধাতিশয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্ত্তি হইলেন কিন্তু তখন তাঁহার বৈরাগ্য আসিয়াছে—কিছুই ভাল লাগে না, পড়াশোনায় মন বসে না। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ইংরাজী পড়াইতেন। তাঁহার বাগ্মিতা তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা ফিরাইতে সাহায্য করিল। ম্যাটসিনি হইবার প্রলোভন জাগিল। কোনক্রমে ৩০৲ টাকা জোগাড় করিয়া পুনরায় গোয়ালিওর-এ পৌঁছিলেন। কিন্তু সেখানকার রাজনৈতিক দারিদ্র্যে বিক্ষুব্ধ হইয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই সময় তাঁহার মনে দুইটী প্রতিজ্ঞা,—বিবাহ করিব না, উপাধি পরীক্ষা দিব না। তাঁহার ধারণা সংসারে টানিবার পক্ষে এই দুই অস্ত্রই প্রশস্ত। মানসিক অস্থিরতা দূর করিবার জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। জব্বলপুর হরিদ্বার, বেণারস প্রভৃতি ভ্রমণান্তে খন্নেনে ফিরিয়া আসিলেন। এ সময় তাঁহার খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর খুব নাম যশ তিনি ছিলেন একাধারে খ্রীষ্টিয়ান পাদরী, বিরাট পণ্ডিত এব দেশহিতব্রতী। যদিও সেকালের প্রটেষ্টান্ট সমাজের নামজাদা লোক কিন্তু বাড়ীতে একেবারে মিতাহারী, সদাচারী ব্রাহ্মণসুলভ বিনয় ও পাণ্ডিত্য এক অদ্ভুত যোগাযোগ। ভবানীচরণের চরিত্রে ছিল তাঁহা এক সুত্রহীন আধিপত্য। ভবানীচরণ স্বীকার না করিলেও উত্তর জীবনে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টানের আধিপত্যই প্রমাণিত হয়।

ভবানীচরণ যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন নগরীতে তীব্র ধর্মান্দোলন চলিতেছে। তখনও রাজনীতি ধর্মান্দোলন হইতে পৃথক হয় নাই, বরং একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে এক বিশুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে রাজনীতি ফল্গুনদীর ধারার ন্যায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে প্রবাহিত হইতেছিল। এই যুগের বাণী ছিল স্বাধীনতা—মনের স্বাধীনতা, সমাজের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা। তখনও অর্থ নৈতিক সমস্যা তীব্র হয় নাই। ছাত্র আন্দোলন ও যুব আন্দোলন সবে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ধর্মান্দোলনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন আপোষহীন নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধিয় উঠিতেছিল। কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষ করিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর নেতৃত্বে বিরোধ উপস্থিত হইল। আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন অগ্রসর দলের নেতা। শ্রীকেশবের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে যুব আন্দোলনের এক প্রধান অংশ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনে যোগদান করে। ভবানীচরণও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনে ভিড়িয়া পড়িলেন। এখানে নরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই মিলন কিছুকাল পরে ঘনিষ্টতায় পরিণত হয়, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে থাকা সত্ত্বেও দুই বন্ধুই 'নববিধান' সমাজে যাতায়াত করিতেন। উভয়েই কেশববাবুর প্রিয়পাত্র হন ১৮৮১ সালে শ্রীকেশবের নেতৃত্বে 'নববৃন্দাবন' নামক এক ধর্মমূলক নাটক অভিনীত হয়। উক্ত নাটকে নরেন্দ্রনাথ 'যোগীর' ভূমিকায় অভিনয় করেন। ভবানীচরণ টিকেট বিক্রয় এবং অন্যান্য উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন। 'নরেন' পরে পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ভারতে 'বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত হন। ভবানীচরণ শ্রীকেশবের সহিত যুক্ত রহিলেন। কেশবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ ভবানীচরণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বিশেষতঃ কেশবের ব্রহ্মবাদ ও বাইবেলীয় যুক্তিবাদের সংশ্লেষণ তাঁহার পছন্দ হইত। কেশবের সতীর্থ, বাল্যবন্ধু ও সহচর ভাই প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার বাইবেলের সহিত বেদান্তের অচ্ছেদ্য নৈকট্য অনুভব করিতেন। ভবানীচরণও খৃষ্টীয় যুক্তিবাদের সহিত বেদান্তের প্রত্যক্ষ সহচারবাদের যৌক্তিকতায় বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন। কেশবের অনেক উপদেশে বাইবেলোক্ত পাপবোধভাব মূলতঃ খ্রীষ্টীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় ভাবধারা এই উভয় স্রোতের মিলিত সঙ্গমে অবগাহন করিয়া ভবানীচরণ ভক্ত ও যোগী হইয়া উঠিলেন।

প্রতাপচন্দ্রের সন্তানাদি ছিল না। অনুপ্রাণিত ভবানীচরণকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্যেও ভবানীচরণ নিজকে বৈদান্তিক খৃষ্টিয়ান বলিয়া দাবী করিয়া গিয়াছেন, প্রতাপচন্দ্রের মানসিক আধিপত্য সম্ভবতঃ দ্বিতীয় অন্যতম কারণ।

শ্রীকেশবের সহিত ভবানীচরণের পরিচয় হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, কেশববাবুর তিরোভাবের পরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী আচার্য্য ভাই গৌরগোবিন্দের নিকটে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় দুইখানি পত্রিকার সহিত তিনি যুক্ত হন। ১৮৮৬ সালে কন্‌কর্ড (concord) কাগজ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্টার প্রিটার' কাগজের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। সাধু হীরানন্দ নামক সিন্ধীসাধু হায়দরাবাদে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে ভবানীচরণ হায়দরাবাদ (সিন্ধু) আসেন এবং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় প্রচার উদ্দেশে 'ইউনিয়ন একাডেমী' নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত বিচ্ছেদের পূর্বে শাখা পরিশাখাযুক্ত এই বিদ্যালয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল এবং সাধু হীরানন্দের নামানুসারে "হীরানন্দ একাডেমী" নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভবানীচরণের পিতৃদেব এই সময়ে মূলতানে চাকুরী করিতেন। পিতার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া তিনি মূলতানে যান এবং সেখানে পিতার শুশ্রূষার ফাঁকে পিতৃদেবের সংগৃহীত 'ক্যাথোলিক বিলিফ' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া "ক্যাথোলিক" মতবাদে আকৃষ্ট হন। সিন্ধু দেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ব্যতীত ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা, বক্তৃতা ও বিবাহে আচার্য্যের দায়িত্ব তাঁহাকে লইতে হইত। ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক থাকা স্বত্বেও জীবনে তাঁহাকে গোড়ামীর ছায়া কখনও স্পর্শ করে নাই। সিন্ধু দেশের সকল সমাজেই—হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং 'আমিল' সম্প্রদায়ের সভায় তিনি যাতায়াত করিতেন। সিন্ধু দেশে 'দশেরা' উৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত নিষ্পন্ন হইত, এই সকল দশেরা উৎসবে তিনি 'আর্য্য বিজয়' প্রসঙ্গে ভাষণ দিতেন। ছাত্র সমাজে গতায়াত ও তাহাদের উপরে তাঁহার মানসিক আধিপত্য অত্যন্ত বেশী ছিল। ছাত্রগণের খেলাধুলায় তিনি সঙ্গী, সন্তরণ শিক্ষায় তিনি শিক্ষক এবং নুতন তর্কমূলক আলোচনা সভায় তিনি আচার্য্য, নূতন ছাত্র আন্দোলনে তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই সময়ে সিন্ধু দেশে বিশেষতঃ করাচী প্রভৃতি নগরে 'প্লেগ' মহামারীরূপে প্রকাশ পায়। কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে তিনি নিরাশ্রয় প্লেগ-রোগীদের শুশ্রূষা ও পথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত হন এবং এতদুদ্দেশ্যে 'সেবা-বাহিনী' গঠন করেন। হায়দারাবাদ ও সুকুরেও তিনি 'সেবা বাহিনী' গঠন করেন। সুকুরে তাঁহার অন্যতম সহকর্মী দৌলত সিং রাম সিং সেবা করিতে আসিয়া আক্রান্ত হন এবং পরলোকগমন করেন, এই নিঃস্বার্থ জীবনদানে সমস্ত সিন্ধু দেশে এক প্রবল ভাববন্যা প্রবহমান হয়। এই সমস্ত কারণে সিন্ধু দেশে তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া সম্বোধন করিত।

ক্যাথোলিক মতবাদে দৃঢ়তা তাঁহার ক্রমেই বাড়িতে থাকে। সিন্ধু দেশে ব্রাহ্ম সমাজের ভাবণে গোঁড়া 'ক্যাথোলিক' মত প্রকাশের জন্য— বিশেষতঃ যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিকত্ব প্রচার করিবার জন্য কতিপয় সিন্ধু ব্রাহ্মের সহিত তাঁহার মতভেদ হয়। অবশেষে ১৮৯১ সালে হায়দরাবাদে চার্চ অব্ ইংলণ্ডের পাদরী হিটনের নিকটে তিনি ক্যাথোলিক ধর্মে দীক্ষিত হন। এই সংবাদে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মর্মাহত হইয়া পত্র লিখেন; কিন্তু যখনই যে বিষয়ে তিনি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতেন কোন বাধাই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিলে খ্রীষ্টীয় সমাজ হইতে তাঁহাকে অনেক প্রলোভন দেখান হয়, পাদরী হইবার জন্য অনুরোধ আসে, অনেক সুবিধার কথা তাঁহাকে জানান হয়; কিন্তু জাগতিক সুখসুবিধার জন্য তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন নাই বরং ভারতীয় খ্রীষ্টান দিগকে বৈদেশিকী মতবাদের তিক্ত তর্কে বিজড়িত হইতে নিষেধ করেন এবং আর্য্যোচিত পটভূমিকায় বাইবেলের পবিত্র ধর্মে বিশ্বাসী হইতে বলেন তিনি যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার মতে যীশুর স্মরণ লওয়া সদ্‌গুরুর নিকটে আত্মসমর্পণ তুল্য। মতের দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আরও পরিবর্ত্তন আসে। আগুনে ছোঁয়া-ভাষায় "জোত" ও "সোফিয়া" কাগজে তাঁহার এই পরিবর্ত্তিত মতবাদ প্রচারিত হইতে থাকে। সিন্ধু দেশের যুবক সমাজে চাঞ্চল্য উঠে, গোঁড়া পাদরীদের মধ্যেও গুঞ্জরণ আরম্ভ হয়। অন্যান্য প্রদেশের মতনই ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে 'আমিল' যুবকদের মধ্যে নিষিদ্ধ মাংস ও মদ্যপানের প্রভাব বাড়িতেছিল। ব্রাহ্ম সমাজে সংশ্লিষ্ট থাকিতেই ভবানীচরণ মদ্যপান বিরোধী হইয়াছিলেন এবং "আশা বাহিনীর" (BAND OF HOPE) কর্মী ছিলেন এবং এখানেও 'আশা বাহিনীর' শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ভবানীচরণের নেতৃত্বে 'আশা বাহিনী' মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান সুরু করে। ঠিক এই সময় অ্যানি বেশান্ত থিয়োজফীয় ব্রহ্মবাদ প্রচার করিতেছিলেন, ভবানীচরণ থিয়োজফীয় মতবাদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন এবং উত্তর ভারতের সর্বত্র অ্যানি বেশান্তের পিছনে পিছনে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে থাকেন, অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সহরেই বেশান্ত মহোদয়া যাইবেন সেখানে প্রতিবাদ জানাইতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসিবেন শ্রোতাদের এই রকম একটী ধারণা দাঁড়াইয়া যায়। আর্য্যসমাজীদের সহিতও তাঁহার তর্ক যুদ্ধ হয়, বন্দ্যোপাধ্যায়জী থাকাকালীন সিন্ধু দেশে আর্য্যসমাজীদের কার্য্যকলাপ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র বেদান্তের প্রভাব তাঁহার মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল, অথচ ভগবানের অলৌকিক মানবত্বও তিনি বিশ্বাস করিতেন। দেবপুত্র যীশু তাঁহার পথপ্রদর্শক গুরু ও নিয়ামক। তিনিই সৎচিৎ আনন্দময় ব্রহ্মের প্রেরিত প্রতীক। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি উপায়ে ভারতীয় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদিগকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আওতায় আনা যায়। তিনি মন স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি নিজেই সনাতন সন্ন্যাসীর পোষাক গেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং পিতৃদত্ত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনা ঘটে ১৮৯৪ সালে। খ্রীষ্টিয়ান সমাজেও প্রবল ঢেউ উঠিল,

অধিকাংশই তাহাকে বর্জন করিল, আবার দুই একজন এই গেরুয়াকে অবলম্বন করিয়া ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের প্রচার সুবিধাজনক হইবে কল্পনা করিয়া ভীষণ উৎসাহিত হইল। উপাধ্যায়জী কিন্তু অটল, তিনি কখনও লাভ লোকসানের হিসাব করিতেন না এবং সুবিধাবাদীদের তোয়াক্কা রাখিতেন না। ভারতীয় ঋষিদের অনুকরণে ধ্যান-ধারণার জন্য তপোবন প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইলেন। গির্জা কিম্বা ভজনালয় নাম তাঁহার ভাল লাগিল না। নির্জনে নীরবে 'ঠাকুরের' আরাধনা করিতে হইলে 'মঠ' স্থাপনই প্রয়োজন। যেই সিদ্ধান্ত, অমনি কাজ। জব্বলপুর নর্মদানদীর তীরে 'মঠ' প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন সমাপ্ত হইল। 'মঠ' নির্মাণ ও খ্রীষ্টীয় ভাবধারায় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের পূজার জন্য সারা পৃথিবীর নরনারীকে আহ্বান করিতে ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে গমন করিলেন এবং সর্বত্র বক্তৃতা দিলেন। প্রচার ও বক্তৃতায় দুই রকম সাড়া মিলিল। ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের অনেকে ক্রুদ্ধ হইল, ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারায় যীশুর অপূর্ব প্রেমধর্মের ব্যাখ্যা অনেকেই বুঝিতে পারিল না—বরং অনেকেই ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হিন্দুয়ানী দেখিতে পাইয়া ক্যাথোলিকদিগকে তাঁহার কাগজ "সোফিয়া" পাঠ করিতে নিষেধ করা হইল। উপাধ্যায়জী প্রধান ধর্মযাজকের নিকটে বিচারপ্রার্থী হইলেন কিন্তু বিশেষ কিছু ফললাভ হইল না। তাঁহাকে পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করিতে বলা হইল। উপাধ্যায়জী ইহাতেও দমিলেন না, সুযোগ পাইলে রোমে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুর নিকটে দেখা করিবেন ঘোষণা করিলেন। এই ঘটনার পরে তিনি 'মঠ' তুলিয়া দিলেন। ১৯০০ সালে চিরকালের জন্য তিনি সিন্ধু পরিত্যাগ করিয়া বিডন ষ্ট্রীটে (কলিকাতায়) এক বাসায় উঠিলেন। তাঁহার সহিত খেমচাঁদ ও রেওয়াচাঁদ প্রমুখ সিন্ধু দেশীয় কয়েকজন ভক্ত চলিয়া আসিলেন। খেমচাঁদের শিশু কন্যা 'অ্যাগনেস' এই সঙ্গে ছিল। উপাধ্যায়জী সাধু অ্যাগনেসের নামানুসারে এই কন্যার নামকরণ করেন। এই অ্যাগনেস খেমচাঁদ বি-এ পাশ করিবার পরে হায়দ্রাবাদে কুন্দনমল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। শিশুকালে পিতৃ-গুরুকে যেমনটী দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার লেখার মধ্যে জানিতে পারা যায়।

উপাধ্যায়জী কলিকাতায় আসিয়া নবকলেবরে সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' প্রকাশ করেন। রেওয়াচাঁদ কাগজের কর্মসচিব হইয়াছিলেন (এই রেওয়াচাঁদই পরে স্বামী অনিমানন্দ নামে খ্রীষ্টিয়ান সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।) অনিমানন্দের ন্যায় শিষ্য ও অনুচর দুনিয়ায় খুব দুর্লভ। ঝড়বাদলের মধ্যেও বহুবৎসর তিনি গুরুর সকল কাজে ঐকান্তিকতার সহিত যুক্ত ছিলেন। উপাধ্যায়জী সাপ্তাহিক 'সোফিয়ার' উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিলেন, "শ্রদ্ধার সহিত বিভিন্ন ধর্মের আলোচনাই হইল আমাদের উদ্দেশ্য। সহজ, সরল, ভাব ও ভাষায় ধর্মের আলোচনা না হইলে সাধারণ লোকে কখনও বুঝিতে পারে না। কাজেই আমাদের ভাষা হইবে সহজ, সাধারণের বোধ্য"।

অ্যাগনেস লিখিতেছেন—উপাধ্যায়জী ব্যাঘ্রচর্মের আসনে "আসন" করিয়া বসিতেন, ধ্যান ধারণা, পড়াশুনা, প্রবন্ধ লিখা, আলোচনা, সব কাজই হইত এই আসনে, বহু রাত্রি পর্য্যন্ত কাজ করিতেন হয়তো কাজ করিতে করিতে এই আসনেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। তাঁহার ধারণা পাশ্চাত্যভাব ও পোষাক প্রাচ্যে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে প্রকাণ্ড বাধা। প্রাচ্য দেশের লোক হয়তো সহজেই বাইবেল ও বেদান্তের সংশ্লেষণ বুঝিতে পারিত, কিন্তু হ্যাট, কোট ও টাই এর বাঁধনে ইহা আষ্টে পিষ্টে আটকাইয়া গিয়াছে। য়ুরোপীয় ভাবধারার বজ্রবাঁধন হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্মকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। ঠিক এই সময়ে চীন দেশে কয়েকজন পাদরী নিহত হয় ও ইংলণ্ড এই উপলক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ব্রহ্মবান্ধব কম্বুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—চীনকে য়ুরোপের পদানত করিবার জন্যই এই যুদ্ধ, যীশুর পদানত করিবার চীৎকার নিছক ভণ্ডামী। ১৮নং বেথুন রো'র গৃহে তিনি পুনরায় এক বিদ্যালয় খোলেন। এই গৃহের মালিক কার্ত্তিকবাবু ছিলেন তাঁহার ছাত্র ও সুহৃদ। ব্রহ্মবান্ধবের শিক্ষাদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বেতন লওয়া হইবে না। বেতন লইয়া বিদ্যাদান করা আর ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা একই কথা। এই গৃহেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আসিতেন। কবিকে বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া হইত এবং ব্রহ্মবান্ধব আসনে বসিয়া আলোচনা করিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আদর্শের বিনিময় হইত। মহর্ষিদেব এই সময় বোলপুরে একটী বিদ্যালয় খুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মবান্ধবের নিকটে কবি প্রস্তাব করেন যে উক্ত বিদ্যালয় বোলপুরে লইয়া যাওয়া হউক। কবির সহিত ব্রহ্মবান্ধব স্থান নির্বাচন করিতে বোলপুর আসেন। এখানকার খোলা উঁচু নীচু মাঠ এবং ছায়াঘন বৃক্ষরাজি ব্রহ্মবান্ধবের কবি মনকে মুগ্ধ করে। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মবান্ধবের সহিত রেওয়াচাঁদ ও বোলপুরে আসেন এবং শিক্ষকতাব্যতীত বোর্ডিংএর পরিচালক হন। উপনিষদের পরিভাষা এবং অনুবাদ সম্পর্কে এইখানে কবির সহিত ব্রহ্মবান্ধবের দীর্ঘ আলোচনা হইত। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন শঙ্করের মতানুবর্ত্তী অদ্বৈতবাদী, কবি রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ ভালবাসিতেন। দীর্ঘ সময় শাস্ত্র আলোচনায় তাঁহারা ব্যস্ত থাকিতেন। অসীম ধৈর্য্যের সহিত উপাধ্যায়জী শঙ্কর ভাষ্যের ব্রহ্মবাদ কবিকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেন। এই সময় গুজব রটে যে রেওয়াচাঁদ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ক্রীশ্চান ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছে। ব্রহ্মবান্ধব রূঢ় ভাষায় রেওয়াচাঁদকে পত্র দেন ফলে রেওয়াচাঁদ তাঁহার দলবল লইয়া সিমলা ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে উঠিয়া আসেন। ১৯০২ সালে এই ঘটনা ঘটে। উপাধ্যায় এই সময় 'টয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' ও 'আতুর আশ্রম' নামক সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেন। উক্ত দুই কাগজে ব্রহ্মবান্ধবের নিজস্ব লেখা তাঁহার সহীযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত। "টয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী" কাগজে সকল ধর্মের আলোচনা ব্যতীত রাজনৈতিক প্রবন্ধও স্থান পাইত। উপাধ্যায়জী ধর্মমূলক প্রবন্ধে 'নরহরি দাস' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন। যীশু ছিলেন একাধারে মানুষও ভগবান তাই নরশ্রেষ্ঠ দেবপুত্র প্রেমিক যীশুর দাস ইহাই ছদ্মনামের বৈশিষ্ট্য।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব ইংলণ্ড যাওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি লিখিতেছেন—৪ঠা জুলাই হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই তিনি বিবেকানন্দের তিরোভাবের কথা শ্রবণ করেন। সেখান হইতে এক রকম দৌড়াইয়া বেলুড়ে যান। তাঁহার ধারণা হইল বিবেকানন্দের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব তাঁহার উপরে বর্ত্তিয়াছে। বিদেশে ভারতের বাণী প্রচার করিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, কম্বল ও তাম্রপাত্র সম্বল এই সাধু প্রাণের আবেগে বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহার এই 'আর্ত্তি' দেখিয়া কয়েকজন বন্ধু ট্রেণের টিকিট ও কিছু অর্থ সাহায্য দেন। বোম্বাইতে গিয়া বন্ধুদের টাকায় এক ইতালীয়ান জাহাজে জেনোয়া পর্য্যন্ত টিকেট কেনেন। সেই জাহাজে কয়েকজন সিন্ধী ভদ্রলোকও ছিলেন, তাহারা তাঁহার নাম জানিতেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহার রোমের পত্রাবলীতে জানা যায় "জাহাজে ঠাণ্ডা লাগিয়া গায়ে অসহ্য ব্যথা হইয়াছে তত্রাচ আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি"। জাহাজে তিনজন "বুয়র" বন্দীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় তন্মধ্যে একজন 'বুয়র' সৈন্যদের অধিনায়ক ছিলেন। এই 'বুয়র' অধিনায়ক তাম্রপাত্র দেখিয়া অনেক আগ্রহ প্রকাশ করেন, ব্রহ্মবান্ধব বন্দীকে তাম্রপাত্রটী দান করিয়া দেন। ৪ঠা নভেম্বর লণ্ডনে পৌঁছিয়াই জ্বরে আক্রান্ত হন। ভারতে সন্ন্যাসীদের নানা স্থানে আশ্রম আছে। পরিব্রাজকেরা বিদেশে, বিভুঁয়ে বিপাকে পড়িলে এই সকল আশ্রমে কিছু দিনের আশ্রয় পাইয়া থাকেন। অনেক গৃহী ও বিপদগ্রস্ত সাধুদের আশ্রয় দিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডের নিয়ম কানুন আলাদা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রধান এই দেশে তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। স্থানাভাবে, অর্থাভাবে এক এক সময় অবসন্ন হইয়া পড়িতেন, পরক্ষণেই নরহরি যীশুর নির্য্যাতনের কথা স্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিতেন, অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে কোন কলকারখানায় কাজ লওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় রহিল না। ঠিক এমন সময় এক খৃষ্টীয় ধর্মগুরুর নিকট হইতে কিছু অর্থ সাহায্য আসে। অতঃপর তিনি অক্সফোর্ডে যান; সেখানে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ডের সহিত "টয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী" মারফৎ পরিচয় ছিল। অধ্যাপক মহাশয় ভারতীয় একেশ্বরবাদ, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই সকল বক্তৃতায় অনেক প্রশংসা হয়। সংবাদ পত্রে কয়েকটী প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। এই সকল নানা কারণে কিছু অর্থও সংগৃহীত হয়; ঐ দেশের মতন ব্যয়বহুল স্থানে তাঁহার খুবই কষ্ট হইতে থাকে কিন্তু উপাধ্যায়জী চিরদিনই এই সকল বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। অক্সফোর্ড হইতে কেম্ব্রিজ এবং কেম্ব্রিজ হইতে মানচেষ্টার যান। সর্বত্রই তাঁহার বক্তৃতা সভায় প্রচুর লোক সমাগম হইত। কেম্ব্রিজে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়া আসেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থও সংগ্রহ করেন এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে পাঠাইবার কথা স্থির হয়। কিন্তু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্য্যন্ত পিছাইয়া পড়ে। কেম্ব্রিজে থাকাকালীন তাঁহার অর্থকষ্ট লাঘবের জন্য কতিপয় ইংরেজ বন্ধু টিকেট বিক্রয় করিয়া ধর্মসভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, ভারতীয় সন্ন্যাসী জ্ঞান দান করে বিক্রয় করে না। এই দরিদ্র সন্ন্যাসীর দারিদ্র্যের দম্ভ তাঁহাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিল। বিলাতে থাকিতে তাঁহার আর এক বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়। তিনি দেখিলেন প্রাসাদের পার্শ্বেই দারিদ্র্যের নিষ্করুণ বীভৎসতা। একদিন একটী রমণীকে গভীর তুহিন শীতল রাত্রে পুষ্প বিক্রয়ের ছল করিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিলেন। এই দৃশ্যে তাঁহার কোমল হৃদয় বিচলিত হইল। ভিখারী রমণীকে ভগ্নী সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "মুদ্রাটী লও তোমার প্রয়োজন আমার চেয়েও বেশী।" এই বলিয়া তাঁহার শেষ শিলিংটী দান করিয়া দিলেন। কেবল ইহাই শেষ নহে সর্বত্র অতি দ্রুত, অতি ব্যস্ত ঐহিক ভোগ সুখ পরায়ণ খৃষ্টিয়ান সভ্যতার চাপে দীনবন্ধু নরহরির নাভিশ্বাস তাঁহাকে ঘরমুখো করিল। ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।*

(ক্রমশঃ)

* উপাধ্যায়জীর যে সকল বাণী উল্লিখিত হইয়াছে তাহার বেশীর ভাগ ইংরাজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ। তাঁহার নিজস্ব ভাষার বৈশিষ্ট্য পাঠকগণকে কল্পনা করিয়াই সাধ মিটাইতে হইবে। প্রবন্ধ লিখিবার সময় উপাধ্যায়জীর আজীবন সহচর ও শিষ্য ব্রহ্মচারী ৺অনিমানন্দের সদ্য প্রকাশিত "BLADE" পুস্তক হইতে এবং অন্যত্র প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকী হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়ায় প্রবন্ধ লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতচন্দ্র ও বাঙ্গালা প্রবচন

শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি তখন অস্তমিত ; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাই প্রকৃত-পক্ষে স্বাধীন নবাবের ন্যায় বাঙ্গালাদেশ শাসন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রশক্তি শ্যেন দৃষ্টিতে বাঙ্গলার দিকে চাহিয়া আছে, আর বিদেশী বণিকেরা সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় বাঙ্গালার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছেন! পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাঙ্গালাদেশে যে পরিবর্ত্তন আসিল, তাহা বাঙ্গালার রাষ্ট্র ও সমাজকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। পুরাতন যাহা ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গেল এবং সেই ধ্বংসের উপর যাহা গড়িয়া উঠিল তাহার সহিত পুরাতনের যোগসূত্র খুব কমই রহিল। রাজনীতি, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন যুগ দেখা দিল।

রায়গুণাকর প্রাচীনপন্থী বাঙ্গলার শেষ মহাকবি। সে-সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত বিদ্যোৎসাহী পৃষ্ঠপোষক না থাকিলে আমরা ভারতচন্দ্রকে কখনই পাইতাম না। কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারও তখন চটুল আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। নতুবা "বিদ্যাসুন্দরের" কাহিনী রাজ-দরবারে স্থান পাইত না। ফার্সী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ভারতচন্দ্রের কাহিনীর বিষয় বস্তুর অভাব হইত না এবং শব্দ, অলংকার ও ছন্দের উপর অদ্ভুত দখল থাকা সত্ত্বেও কালোপযোগী জনপ্রিয়তালাভের জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ও অশ্লীলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। চাঁদের কলঙ্কের ন্যায় এই অশ্লীলতা ভারতচন্দ্রের একমাত্র কলঙ্ক।

উনবিংশ শতক পর্য্যন্ত বাঙ্গলা-সাহিত্য-দেব-মহাত্ম্য কীর্ত্তনেই পরিপুষ্ট হইয়াছে। দেবলীলা ও দেব মাহাত্ম্যই লেখকগণের কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ভারতচন্দ্রও সেই পদ্ধতি অনুযায়ী বিদ্যাসুন্দরের মত আদিরসাত্মক কাব্যকে দেবী-মাহাত্ম্যের ছলে লিখিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যেই আমরা প্রথম মানবিকতার বিকাশ দেখিতে পাই। ঈশ্বরী পাটনী মোক্ষ চায় নাই, স্বর্গ চায় নাই,—চাহিয়াছে শুধু "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" ভারতচন্দ্রের প্রভাব বাঙ্গালীর উপর এক সময়ে খুবই পড়িয়াছিল এবং তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যের কতক কতক পংক্তি এক সময়ে প্রবচন হিসাবে ব্যবহৃত হইত। আমরা এখনও ইহাদের কতকগুলি, যেমন, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন", "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার" প্রভৃতি ব্যবহার করি। অশ্লীলতার ভয়ে যাঁহারা ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়েন না, তাঁহারা নিজেরাই বঞ্চিত হন। অনুপ্রাস, যমক, উপমা ইত্যাদি অলংকার, ছন্দ ও শব্দ-বিন্যাসে ভারতচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। আমি ভারতচন্দ্রের প্রবচনগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠক-সমাজে উপস্থিত করিলাম। কাহিনীর সূত্র অবলম্বন করিয়া কি উপলক্ষে সেই গুলি ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

গ্রন্থসূচনায় কবি নবাব আলীবর্দ্দীকৃত উড়িষ্যা-বিজয় প্রসঙ্গে নবাব আলীবর্দ্দী-কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরে অত্যাচারের দৃশ্য বর্ণনা করেন। সেই অত্যাচারের জন্য নন্দী ত্রিশূল দ্বারা আলীবর্দ্দীকে সসৈন্যে বধ করিতে উদ্যত হন। শিব বাধা দান করেন, এবং তাঁহার আদেশে নন্দী গড়-সেতারায় শিব-ভক্ত বর্গীরাজকে স্বপ্নাদেশ করেন। সেই স্বপ্নাদেশ পাইয়া রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিতকে বাঙ্গলা আক্রমণ করিতে বলেন। সেই সময়ের বাঙ্গালায় যে বর্গী-হাঙ্গামা হয়, তাহাতে বহু ধার্ম্মিক ব্যক্তিও দুঃখ ভোগ করেন। ইহাতে কবি মন্তব্য করিতেছেন—"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?"

শিবের "ললাট—লোচন বহ্নির" দ্বারা মদন ভস্ম হইবার পর রতি বিলাপ করিয়া বলেন—

একের কপালে রহে আরের কপালে দহে
আগুনের কপালে আগুন।

নারদ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

পাখা নাই তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কোন্দলে জড়ায়॥

শিবের সংসারে অনটন চলিয়াছে। গৌরী সেজন্য শিবকে অনুযোগ করায় হরগৌরীর বিবাদের সূচনা হইল। শিব তখন আক্ষেপোক্তি করিতেছেন—

(১) সরম ভরম গেল উদরের লেগে।
(২) নীচলোকে উচ্চ ভাষে রহিতে না পারি।
(৩) পরম্পরা পরম্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রী-ভাগ্যে ধন আর পুরুষ-ভাগ্যে পুত্র॥

"ভবানীর কটুভাষে" কৈলাস ছাড়িবার সময় ভবানীপতি

"নারী যার স্বতন্তরা সে যেন জীয়ন্তে মরা
তাহার উচিৎ বনবাস"—

বলিয়া কৈলাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতীর সহিত কলহ করিয়া শিব কৈলাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলে পার্ব্বতী পিত্রালয়ে যাইতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার সখী জয়া বলিলেন—

বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।

শিব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, কিন্তু অন্ন ভিক্ষা পাইতেছেন না। সেই প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

যে জন চেতনামুখা সেই সদা সুখী।
যে জন অচিন্ত চিত্ত সেই সদা দুখী॥

অন্নপূর্ণার মায়ায় শিব কোথাও অন্নভিক্ষা না পাইয়া বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর নিকট যান। সেখানে লক্ষ্মীও অন্ন দিতে না পারায় শিব খেদোক্তি করিতেছেন—

(১) হাবাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া।
(২) ঘরে অন্ন নাই যার, মরণ মঙ্গল তার
(৩) অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কাঁদে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ।

শিব তপস্যা করিতেছেন। সেই উপলক্ষে বারমাসের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি মাঘমাস সম্বন্ধে বলিতেছেন—

বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।

একদা ব্যাসদেবের সহিত কথোপকথন করিয়া শিব ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কাশী পরিত্যাগ করিতে বলেন। ব্যাসদেব অন্নদার কারণ লইয়া বলিলেন—

জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মা'র কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া।

শিবের সহিত বিবাদ করিয়া ব্যাসদেব দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং গঙ্গার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গঙ্গা ব্যাসদেবকে শিবের সহিত বিবাদ করিতে বারণ করিলেন এবং সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন। ব্যাসদেব তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে বলিলেন—

মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে।

গঙ্গা, বিশ্বকর্ম্মা ও প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে কাশী নির্ম্মাণে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলে ব্যাসদেব অন্নপূর্ণার শরণ লইতে মনস্থ করিলেন। সেই উপলক্ষে কবি বলিতেছে—

যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন॥

ব্যাসদেবের কঠোর তপস্যায় অন্নপূর্ণার টনক নড়িল, কিন্তু ব্যাসদেবের মন্দভাগ্যের জন্য অন্নপূর্ণা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। সেজন্য কবি বলিতেছেন—

দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভালকর্ম্ম মন্দ করে—

অন্নদার ছলনায় ব্যাসকৃত কাশীতে মরিলে গর্দ্দভ হইবে এই বর যখন ব্যাসদেব লাভ করিলেন, তখন—

ভবিতব্যং ভবত্যেব গুণাকর কয়।

অন্নদার ছলনায় অকৃতকার্য্য হইয়া ব্যাসদেব ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে শিবের সহিত বিবাদ করিতে মানা করিলেন। শিবের সহিত ব্যাসদেবের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য কবি বলিতেছেন—

অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥

দরিদ্র হরিহোড়কে সাহায্য করিতে আসিয়া দেবী ভবানী তাহার দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া মন্তব্য করিলেন—

গৃহিনীর পাপপুণ্যে ঘর থাকে মজে।

কুবেরের পুত্র বসুন্ধর দেবীর শাপে হরিহোড় রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধনবান হইয়া তিনটি বিবাহ করেন। দেবীর নিকট বসুন্ধরের স্ত্রী বসুন্ধরা উপস্থিত হইয়া এই অভিযোগ করেন যে, তাঁহার স্বামী মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া তিনটি বিবাহ করায় তাঁহার তিনটি সতীন হইয়াছে এবং ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছে! এই প্রসঙ্গে সতীনের প্রতি নারীদের যে কিরূপ বিদ্বেষ, তাহা কবি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

বরঞ্চ শমনে লয় তাহা লয় গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥

ভবানন্দ মজুমদারের ভবনে গমন-কালে দেবী 'ঈশ্বরী পাটনী'কে কৃপা করিয়া বর দিতে চাহিলে ঈশ্বরী পাটনী যে বর প্রার্থনা করিল, তাহা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে অভিনব। পাটনী মোক্ষ চাহিল না, দেবীর পূর্ণমূর্ত্তি দেখিতে চাহিল না, স্বর্গ বা ইন্দ্রত্ব চাহিল না। চাহিল শুধু—

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মানবিকতার বিকাশ এই কয়েকটি কথার মধ্যে নাই। এ যেন Wordsworthএর True to the kindred points of Heaven and Homeএর ভারতীয় রূপ! বিদ্যার রূপ বর্ণনায় সুন্দরের মনের যে বিকার ঘটিয়াছিল, কবি অতি সুন্দরভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—

খুলিল মনের দুয়ার না লাগিল কপাট।

সুন্দর বর্দ্ধমাননগরে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সুন্দর নিজেকে "বিদ্যাব্যবসায়ী" বলিয়া পরিচয় দেন। দ্বারী তাহাতে সন্দিহান হইয়া বিদ্রূপ করিলে সুন্দরের যে মনোভাব হয়, কবি এই ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—

নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে

হীরা মালিনী অত্যন্ত কোঁদলপ্রিয় ছিল এবং কোনও কারণ না থাকিলেও সে লোকের সহিত ঝগড়া করিতে ভালবাসিত। কবি তাই বলিতেছেন—

বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।

সুন্দরের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনিতে স্বীকৃত হইয়া হীরা দ্রব্য ক্রয়ের জন্য কড়ি চাহিল। সে সময়ে তাহার স্বভাবানুযায়ী কৌতুকের সহিত কড়ির যে মহিমা সে বর্ণনা করিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কড়ির মহিমা বোধহয় এখনও সত্য!

কড়ি কটকা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে॥

বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় ভারতচন্দ্র যে শব্দ ও ধ্বনি-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা মেলে না। উপমা এবং অনুপ্রাসে কবি সিদ্ধহস্ত। এই অতুলনীয় রূপবর্ণনার কয়েকটি পংক্তি প্রবচন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।—

(১) কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা॥
(২) কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।
(৩) মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া।

সুন্দর মালার সহিত পত্র গাঁথিয়া দিয়া বিদ্যার মন জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। সে জন্য তিনি হীরাকে অনুরোধ করিতেছেন যেন সে একদিন সুন্দরের গাঁথা মালা বিদ্যার নিকট লইয়া যায়। সুন্দর এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, এ যেন—

বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা।

হীরার জবাবটিও চমৎকার—

গাঁথিনু বঁড়িশে মাছ আর কোথা যায়।

হীরা ফুল ও মালা লইয়া দেরীতে আসিলে বিদ্যা তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—

বাঁড় হয়ে যেন বাঁড়ের নাট!

হীরা তখন কান্না জুড়িয়া দিল। ও আক্ষেপ আরম্ভ করিল। সেই আক্ষেপের ভিতর কবি দুইটি সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব—

যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে।

আর দ্বিতীয়টি হইতেছে সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা—

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥

সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সুন্দর "বিদ্যার মন্দিরে" আসিয়াছে। বিদ্যা তখন সুন্দরের বিরহে কাতর। সুন্দর বিদ্যার সহিত বিচার করিতে চাহিলেন ও সখীগণকে সাক্ষী হইতে অনুরোধ করিলেন। একজন সখী আপত্তি করিয়া যে উত্তর দিলেন, তাহা এখনও আমরা ব্যবহার করি—

উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে॥
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার॥

বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম মিলন উচ্ছ্বাসে সখীগণ পলায়ন করিলেন। কবি তাহা এই ভাবে বর্ণনা করিলেন—

লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাঙ্গে ভয়।

বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম মিলন বর্ণনা করিবার সময় কবি সাংসারিক অভিজ্ঞতা হইতে দুইটি উক্তি করিয়াছেন—

(১) রসলাভ হইবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে॥
(২) ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস কি ইক্ষু দেয় দয়া করিলে॥

সুন্দরের সহিত প্রথম মিলনের পর বিদ্যা সখীগণকে সাবধান করিতেছেন যে, তাহারা যেন হীরাকে সে খবর না দেয়। কেননা, হীরা যদি রাণীর নিকট এ কথা বলিয়া দেয়, তবে বিপদ ঘটিবে। ভবিষ্যতে ভয়ের যথেষ্ট কারণ থাকা সত্বেও লোকে বর্ত্তমান লইয়া মত্ত হইয়া উঠে। কবি তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন—

ভবিষ্যতে ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।

হীরার বাড়ীতে থাকিয়াই সুরঙ্গ খনন করিয়া সুন্দর বিদ্যার আবাসে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা হীরার নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। বরং বিদ্যার সহিত দেখা করিবার কোনো সুযোগ বা উপায় বাহির করিতে না পারার জন্য হীরাকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন—

সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥

মিলন প্রসঙ্গে বিদ্যা সুন্দরকে যে অনুযোগ করিয়াছিলেন তাহা আমরা, অর্থাৎ পুরুষেরা স্বীকার করি না—

করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।

বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা বিদুষী ছিলেন। বীরসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, বিচারে যিনি বিদ্যাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তাঁহারই নিকট তিনি কন্যা সমর্পণ করিবেন। সুন্দর গোপনে বিদ্যার সহিত মিলিত হইবার পর সন্ন্যাসীর বেশে বীরসিংহ রাজার দরবারে গিয়া বিদ্যার সহিত বিচার করিবার প্রস্তাব করিলেন। সন্ন্যাসীর বেশ থাকায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য ছাপাইয়া সন্ন্যাসীর রুক্ষতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজা ঘোর সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—

হারিলে ইহাকে নাকি বিদ্যা দেওয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়॥

রাজাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া সুন্দর ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

বিদ্যা ও সুন্দর নিভৃতে মিলিত হইলে বিদ্যা সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ তুলিলেন। সুন্দর প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বিদ্যাকে রহস্য করিয়া বলিলেন যে,

সন্ন্যাসীর সহিত বিবাহ হইলে বিদ্যা নূতন পতি লাভ করিবেন। ইহাতে বিদ্যা পুরুষের চপলতা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষ যেমন পারে নারী কি তেমন॥

বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন প্রসঙ্গে কতকগুলি উক্তি আছে। সেই সব বিশেষ পরিবেশের উল্লেখ না করিয়া কেবল উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিলাম—

(১) বুঝে লোক যে জানে সন্ধান।
(২) আদর কাজের বেলা তারপর অবহেলা
(৩) আমি হৈনু বাসী ফুল ফুরাইল মধু।
কেবল কথায় নাকি রাখা যায় বঁধু॥
(৪) মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়।

বিদ্যাকে যখন ভাবী জননীরূপে তাহার সখীরা জানিতে পারিল, তখন তাহারা কহিল—

লোকে বলে পাপ কাজ ক'দিন লুকায়।

বিদ্যার ঐরূপ অবস্থা জানিতে পারিয়া বিদ্যার মা তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং এই পাপের সহায়তা কে করিয়াছে তাহা প্রশ্ন করিয়া তাহার দুঃসাহসিকতা সম্বন্ধে বলিলেন—

সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায়
কেমন কুটিনী সে বা।

বিদ্যার অবস্থা রাজাকে জানাইয়া, তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া রাণী নিজের মরণ কামনা করিলেন :—

যে জন আপন বুঝে পর দুঃখ তারে সুঝে
সকলে আপন ভাবে জানে।

সুন্দর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া বিদ্যা যে আক্ষেপ করিয়াছে, তাহা সমস্ত বাঙ্গালী মেয়েদের প্রতি প্রযোজ্য—

যুবতী জনম কালামুখ
পরের অধীন সুখ দুখ।
পর ঘরে ঘর করে পরের মরণে মরে
পরে সুখ দিলে হয় সুখ॥

বিচার সভায় আত্মসমর্থনে হীরার উক্তি বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে :—

নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন॥

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহ যখন ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন অন্নপূর্ণা আপন মহিমা প্রকাশের জন্য মানসিংহকে বিপদে ফেলিলেন। কারণ—

বিনা ভয়ে প্রীতি নাই জয়া বলে বটে।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের আজ্ঞায় ভবানন্দ মজুমদার বন্দী হইলেন। তাঁহার দুই ভৃত্য তখন বিদেশে যাওয়ার জন্য খেদ করিতে লাগিল। সেই খেদোক্তির মধ্যে চিরকালের প্রবাসীর আক্ষেপ লুকাইয়া আছে :—

দিবসে মজুরী করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তার বড় কেবা আছে দুখী॥

ভবানন্দ মজুমদার দিল্লী হইতে সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দুই স্ত্রী বর্ত্তমান। আগে কাহার সহিত দেখা করিবেন ভাবিতেছেন। দুই স্ত্রীর দাসীরাও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন—আগে কাহার সহিত দেখা করেন। শুধু কবি দৃঢ়চিত্তে সত্য কথাটি বলিয়া গেলেন—

দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভবানন্দ মজুমদার কর্ত্তব্যের খাতিরে মাতার নিকট বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া আছে দুই স্ত্রীর ঘরে। তাঁহার মা তাঁহাকে নিজ ঘরে যাইতে অনুমতি দিলেন। কবি মাতা ও সন্তান সম্বন্ধে উক্তি করিলেন—

মায়ের পোয়ের ভাব রহে নাকি ছাপা।

যে গৃহে দুই সতীন—সেখানে অশান্তি লাগিয়াই আছে। তাহার উপর তাহাদের দাসী থাকিলে সে অশান্তি আরও অধিক হয়। তাই ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রীর দাসীদের লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

দু সতিনী ঘরে, দাসী অনর্থের ঘর।

বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় তৎকালীন সমাজে অনেকেই দারান্তর গ্রহণ করিতেন। প্রায়ই দেখা যাইত যে, বেশীর ভাগ লোকেই নূতন স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেন। ভবানন্দ মজুমদারের প্রথমা স্ত্রী সেজন্য তাঁহার সতীনকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীর পক্ষপাতিত্বের প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিয়াছেন—

সুয়া যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥

বাঙ্গালার নূতন পরিস্থিতিতে জাতীয় জীবনের উন্নতির সহিত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর উন্নতি ঘটিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইয়া একাধিক বিস্মৃতপ্রায় কবির কাব্যও আবার সমাদর লাভ করিবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতচন্দ্রের কাব্যেরও নূতন করিয়া আলোচনা সুরু হইবে এবং ভারতচন্দ্রের প্রবচনগুলি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

মালকোশ—তেতালা

কে জানে তোমার মহিমা অপার, যুগে যুগে তুমি
কত যে দেখাও অসীম লীলা অন্ত নাহি তার।
জীবের জনম হলে মরণ নিশ্চয়, গোপেশ কহিছে কেহ হয় না কভু অমর
নীর সম বহিছে জীবন নিরন্তর মৃত্যুর পারাবার হতে নাহি নিস্তার॥

রচনা—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি—গীত-সরস্বতী শ্রীমতী সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ১ ২´ ৩
{মা জ্ঞা সা সা | ণ্ সা ণ্দা ণ্ | সা সা মা মা | মা -া -া মা} |
{কে জা — নে তো মা র ০ ম হি মা অ পা র}

০ ১ ২´ ৩
মজ্ঞা মজ্ঞা -া মা | দা দা মা জ্ঞা | মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | মা দা মা দা |
যু গে - যু গে তু মি ০ ক ত যে দে খা ০ ০ ও

০ ১ ২´ ৩
ণা র্সা র্সা ণা | র্সা র্সা দা ণা | দা মা -া র্সা | র্সা র্সণা দা মা ||
অ সী ম লী ০ লা অ ০ ০ ন্ত - না হি তার ০ ০

০ ১ ২´ ৩
র্সা র্সা র্সা র্সা | ণা ণা দা মা | মজ্ঞা মা দা ণা | র্সা র্সা র্সা -া |
জী বে র জ ন ম হ লে ম র ণ নি ০ শ্চ য় -

০ ১ ২´ ৩

র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা ণা ণা | দণা র্সা ণা র্সা | ণা দা মা মা |
গো পে শ ক হি ছে কে হ হ০ য় না ক ভু অ ম র

০ ১ ২´ ৩

ণ্া সা সা মা | মা মা মা মা | জ্ঞা মা দা ণা | র্সা -া র্সা র্সা |
নী ০ র স ম ব হি ছে জী ব ন নি র - ন্ত র

০ ১ ২´ ৩

দণা র্সজ্ঞা র্সা র্সা | ণদা -া মা জ্ঞা | মা দা ণা র্সা | ণা দা মা -া ||
মৃ০ ০০ ত্যু র পা রা বা র হ তে না হি নি স্তা র

তান ঃ—

২´ ৩

১। দ্ণা সজ্ঞা মদা ণণা | দমা জ্ঞসা জ্ঞসা ণ্সা ||
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২´ ৩

২। ণণা দণা ণদা মজ্ঞা | মদা ণণা দমা জ্ঞসা ||
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ ২´ ৩

৩। দ্ণ্া সসা ণ্সা জ্ঞজ্ঞা | সজ্ঞা মমা জ্ঞমা দদা | মদা ণণা দণা র্সর্সা | দণা র্সণা দমা জ্ঞসা ||
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

শিল্পী*

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

শিল্পী, তোমার রূপের তুলিকা ডুবে থাকে রঙে রসে।
কত কী যে ছায়া রূপ লভিবারে তোমার হৃদয়ে পশে॥
তোমার চোখের গভীর চাহনি ধ্যান করে অবিরত
চোখের আড়ালে রয়েছে যাহারা যত।
তাইত রঙের মায়া—
স্বপ্ন মাখান ছায়ারে পরশি জাগায় অরূপ কায়া॥

হৃদয় তোমার ভরে আছে জানি পরাণ রাঙাণ রসে।
বর্ত্তিকা তব বার্ত্তা যে আনে সৃষ্টির হরষে॥
অন্তবিহীন নিরুদ্দেশের অসীম প্রান্ত পারে
সে যে নিয়ে যায় একান্ত একধারে।
সেথানে বসিয়া আঁকো—
স্পর্শ অতীত ভুবনেরে তুমি স্পর্শ মাঝারে রাখো॥

তোমারে ঘেরিয়া শত শ্রদ্ধা অন্তর তলে জাগে
তুমি বেঁচে আছ আপনার অনুরাগে॥
তোমার জগৎ কল্পনালোক সেথায় নিভৃতে চুপে
সৃজিছ আপন ধেয়ানের ধনে রূপে।
নাহি সেথা বিষ বায়ু—
তাই মরে নাক তোমার শিল্প, কমেনা তোমার আয়ু॥

তোমার হাতের তুলিকা নাচনে মূক রেখা মুখরিত
রঙের মিলনে মর্ম্মরি ওঠে গীত।
রূপ গিয়ে মেশে ভাবের ভুবনে, ভাব গিয়ে মেশে সুরে—
সেই সুর থাকে ভিতর বাহির জুড়ে।
হে মোর চিত্রকর—
তাই ত তোমারে প্রণাম জানাই, ভরে ওঠে অন্তর॥

---

* অবনীন্দ্র-জয়ন্তীতে পঠিত

একসিডেণ্ট

শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

একসিডেণ্ট!—স্রেফ্ একসিডেণ্ট!!

একরাশ ছেঁড়া কাগজ—মলাট খোলা বই—প্যাকিং বাক্স—কতকগুলো মরা আরশুলা, ভাঙ্গা কাঁচের গ্লাস—ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত এমনি বহু অবান্তর দ্রব্য সম্ভারের মাঝে মাথায় হাত দিয়ে বসে অপূর্ব্ব এই কথাই ভাবছিল। সেদিন কোথা থেকে যে তার মাথায় এক দুর্ব্বুদ্ধি আশ্রয় করলে।—সাধারণের চলতি পথ ছেড়ে—প্রায় কারো না-চলা উঁচু-নিচু পথে বেড়াতে গিয়ে একটা বড় শিমূল গাছের তলায় ছোট ছাতাটার উপর ভর দিয়ে মিস্ মু-ট্রাকে ছন্দময়ী ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আশ্চর্য্য ফরওয়ার্ড মেয়ে মিস্ মু-ট্রা, সোজা সামনে এসে বল্লে—আপনিও দেখছি টায়ার্ড হ'য়ে পড়েছেন—what a nasty road, but how pleasant···

সূক্ষ্ম ইংরেজী উচ্চারণ—বাংলা শব্দগুলির উচ্চারণ ভঙ্গিও ইংরেজী ছাঁচে ঢালাই করা। অপরিচিত মেয়ের সপ্রতিভ গায়ে-পড়া আলাপে থতমত খেয়ে যায় অপূর্ব্ব!

—এগিয়ে আসে মিস্ মু-ট্রা,—"চলুননা আরও একটু উপরে যাই—মিঃ···মিঃ···"

অপূর্ব্বকে আত্মপরিচয় দিতেই হয়, বলে—"আমার নাম অপূর্ব্ব ঘোষ।"

"Wait"—মিস্ মু-ট্রা থমকে দাঁড়ায়—তারপর টেনে টেনে বলে "—অ-পূ-র্ব্ব গা-উ-স্ The name seems to be rather familiar to me—" ভ্রূ-কুচকে আরও একটু ভেবে বলে—"আচ্ছা মিঃ গাউস, আপনিই কি কিছুদিন আগে একটা Weekly-তে Freaks of Nature বলে কতকগুলি সিরিজ ওফ্ আর্টিকেল লিখেছিলেন।"

লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে অপূর্ব্ব। কোনরকমে ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ···

"ওঃ মিঃ গাউস—They were simply charming—আমার কী অসীম সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেয়েছি। ড্যাডি আর আমি যে আপনার ঐ লেখাগুলির কত প্রশংসা কোরেছি—wonderful—simply wonderful! আশ্চর্য্য—who ever thought that I would meet you··· চলুন ফেরা যাক, আপনাকে আমার সঙ্গে বাসায় যেতে হবে—ড্যাডি আপনাকে দেখলে কা খুশীই না হবেন।"

অপূর্ব্ব কোনরকমে আমতা আমতা কোরে বলে—"আজ থাক মিস্···"

"মু-ট্রা—আমার নাম লিলি মু-ট্রা" নামটা চট কোরে ধরিয়ে দেয় লিলি। অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে—"না, না, আজ থাকবে কেন—আপনার কি কোন engagement আছে?"

"এনগেজমেণ্ট! না ঠিক তা নয়···মানে···"

"না, না—তবে আপনার কোন আপত্তিই শুনবো না মিঃ গাউস"—তাকে কথা শেষ কোরতে না দিয়েই লিলি স্বচ্ছন্দ আবদারের সুরে বলতে থাকে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপূর্ব্বকে ওর সাথী হতে হয়। পথের মাঝে লিলি তার হাতব্যাগ খুলে একটি মিনে-করা মাদার অফ্ পার্লের সিগারেট কেস বার কোরে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—"Please···"

অপূর্ব্ব চমকে উঠে একটু সরে গিয়ে বলে—"ধন্তবাদ"

"Don't you smoke মিঃ গাউস!!"—কণ্ঠে একরাশ বিস্ময়।

অপূর্ব্ব আবার থতমত খায়—মনে হয় সিগারেট না খাওয়াটাই একটা মস্ত অপরাধ। ওরা ইতিমধ্যে পাকা রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ায়। ঝকঝকে উর্দ্দিপরা সোফার এসে সেলাম কোরে একটী নীল মটরের দরজা খুলে দেয়।

তারপর অপূর্ব্বকে পাশে বসিয়ে লিলি নিজে ড্রাইভ কোরে যে সুন্দর বাগানওয়ালা বাড়ীর সামনে এসে থামে—সেই বাড়ীটার সামনে দিয়ে এমনি বহুবার বেড়াতে গেছে অপূর্ব্ব।

মাথায় হাত দিয়ে বসে অপূর্ব্ব এই ঘটনাটাকেই তার জীবনের মস্তবড় একটা একসিডেণ্ট ভাবছিল। কারণ—তার Freaks of Nature—বৃদ্ধ আর তার তরুণী কন্যাকে

এমনভাবে মুগ্ধ কোরেছে যে এই সাতদিনের মধ্যে তিনদিন চায়ের নিমন্ত্রণ কোরে মোটর পাঠিয়ে তাকে নিয়ে গেছে—আর গতকাল কী কুক্ষণে সেও হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় তাদের চায়ের নিমন্ত্রণ কোরেছে আজ—আর তার চেয়েও মারাত্মক সকন্যা বৃদ্ধ সানন্দে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরেছে।

এত বিরাট—এতখানি গভীর সমস্যায় অপূর্ব্ব এর পূর্ব্বে আর কখন পড়েনি। ছুটি ছোট ছোট ঘরের—ভাঙ্গা তেপায়া টেবিল, হাতলভাঙ্গা একখানা চেয়ার, একটা নড়বড়ে খাট—একগাদা বই—আর রাশীকৃত কাগজপত্র সমেত তার এই হাস্যকর অবস্থানের মাঝে কোন দুঃসাহসে মিঃ ও মিস্ মু-ট্রার মত কড়া বিলেতি ফ্যাসনের পরিবারকে নিমন্ত্রণ কোরলে কাল সন্ধ্যাবেলায়—আজ সকালে কিছুতেই সে কথাটা মনে কোরতে পারেনা। কিন্তু মনে কোরতে পারুক আর না পারুক—ঠিক বেলা চারটার সময় ঘন নীলরংএর অষ্টিনটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াবে—ঝকঝকে উর্দ্দিপরা লোকটা আগে আগে নেমে দরজা খুলে দেবে—কন্যা লিলি চঞ্চল নৃত্যভঙ্গিতে নামবে নিজে—নামাবে বৃদ্ধ পিতার হাত ধরে। তার পরে অন্ধকারে সরু কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে উঠতে হয়ত বলবে—"What a horrible place Mr. Ghose!"...

আর ভাবতে পারেনা অপূর্ব্ব—বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে ওর কপালে।

ভোর থেকে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে শার্শির কাঁচ মুচেছে—তেপায়া, ভাঙ্গা টেবিলটাকে কোনরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে ঠিক কোরেছে, খাট বিছানা বইপত্তর সাধ্যমত একটা ঘরে পোরবার চেষ্টা কোরেছে। শ্রীশবাবু খানতিনেক চেয়ার আর যতীশবাবু একটা টেবিলক্লথ দেবেন বলেছেন—ফুলদানীর সাধ্যমত চেষ্টা কোরেও মনের মত একটাও না পেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। বেলা ১২টার সময় অপূর্ব্বর খেয়াল হ'ল উপলক্ষের দিকে নজর দিতে গিয়ে আসল লক্ষ্যই তার দৃষ্টি এড়িয়েছে—চায়ের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। ঝুলমাখা হাতে পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে অপূর্ব্ব বেরিয়ে পড়ে।—"এক পাউণ্ডের একটা কেক্ আর এক ডজন স্যাণ্ডউইচ!"—"না মশাই বেলা ১২টায় অর্ডার নিয়ে ৩া০টায় ডেলিভারী দেওয়া অসম্ভব।"—কনফেকসনার অর্ডার নিতে নারাজ। অপূর্ব্ব সেখান থেকে পাগলের মত দৌড়োয় কপালের ঘাম মুছতে মুছতে।

"সন্দেশ রসোগোল্লা তৈরী আছে মশাই—তবে একেবারে টাটকা হবেনা তা আপনাকে আগেই বলে রাখছি—ছোট টাউন কজনই বা খদ্দের। আর নিমকি সিঙ্গাড়া সকালের—শুধু গরম কোরে দিতে পারি।"

নিরুপায় অপূর্ব্ব তারই কিছু তৈরী রাখতে বলে বাসায় ফিরে আসে। বারটা পঁয়তাল্লিস্! ফিরে এসে ছোট ঘড়িটার দিকে চেয়ে অপূর্ব্ব শিউরে ওঠে—ঘড়িটার আজ হ'ল কী? এইমাত্র ১২টা দেখে বেরিয়েছে অপূর্ব্ব—আর এর মধ্যে ৪৫ মিনিট কি কোরে হয় অপূর্ব্ব বুঝতে পারেনা।

"হ'রি—হরে—" চিৎকার করে অপূর্ব্ব।

কিন্তু কারো সাড়া পাওয়া যায়না। চাকরটা কি পালাল নাকি! অপূর্ব্বর চিন্তা শক্তি আচ্ছন্ন হয়ে আসে—ও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে কাঠের সিঁড়িটার উপর হরিহরের পায়ের শব্দ পেয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত অকারণে গর্জ্জে ওঠে অপূর্ব্ব।

"কোথায় গিয়েছিলি হতভাগা?—আমার এই বিপদ—আর তুমি ফুর্ত্তি কোরে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছ, শুয়ারকি..."

হরিহর বলে—"যোতীশবাবুর বাসা থেকে টেবিলকেলাথ আনতে গিয়েছিলুম, গিন্নী বল্লেন, কি ব্যাপার রে হরিহর—আজ কি..."

বাধা দিয়ে অপূর্ব্ব খেঁকিয়ে ওঠে—"থাক খুব হ'য়েছে—আর গাজীর পট আওড়াতে হবে না।—চেয়ার এনেছিস?"

"চেয়ার?"—হরিহর কথাটাকে একটু টেনে বলে।

"চেয়ার—চেয়ার—কুরশী। শুয়ার, বেলা ছুটোর সময় তোমার এখনও খেয়াল হ'লনা! যত সব লক্ষ্মীছাড়া হতভাগার পাল্লায় পড়েছি।"

টেবিলক্লথ রেখে হরিহর দৌড়োয়।

কিন্তু ঘড়িটা! এরই মধ্যে একটা পঁচিশ। না নিশ্চয়ই বিগড়েছে—কাণের কাছে এনে শোনে তেমনি টিক্‌টিক্ কোরছে—ছবার ঝাঁকানি দিয়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে

অপূর্ব্ব, কিন্তু থামে না। হরিহর আসে কৈ? অপূর্ব্ব একবার ঘর একবার বার করে। কিছুক্ষণ পরে দু'বগলে দুখানা চেয়ার নিয়ে হরিহরকে আসতে দেখা যায়। সিঁড়ির কাছে গিয়ে অপূর্ব্ব বলে—"ঐ দুটো ওখানে রেখে তুই ছুটে যা—আর একখানা আন।"

"আর ত মিলবি না বাবু।"

"মিলবেনা কী রে? শ্রীশবাবু আমায় নিজে বলেছেন…" রাগে আর ক্ষোভে কাঁপতে থাকে অপূর্ব্ব।

"হিঁ—কিন্তু বাবুর দস্যি ছেলেটা আজ সকালেই তার একটা পায়া ভেঙ্গেছে।"

"উঃ"—অপূর্ব্বর মনে হয় তার নিজের পাখানা ভাঙ্গলে এর চেয়ে অনেক ভাল হত।

"উপায়!"—হতাশার সুরে বলে অপূর্ব্ব।

"আমি দেখছি বাবু" বলে হরিহর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

পাকা আড়াইটার সময় হরিহর আর একখানা চেয়ার ঘাড়ে কোরে ফেরে। এই সময়টুকুর মধ্যে অপূর্ব্ব কিছু করেনি—কিছু ভাবেওনি বোধ হয়। দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল। হরিহরের পায়ের শব্দে মাথা তুলতে—সে মনিবের চেহারা দেখে বিস্মিত হ'য়ে যায়। এরই মধ্যে অপূর্ব্বর চোখদুটো কোটরে ঢুকেছে—চুলগুলো উস্কোখুস্কো—সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ।

হরিহর হঠাৎ সক্রিয় হ'য়ে ওঠে, চেয়ার রেখে বলে—"কি হ'য়েছে বাবু আপনি উঠুন ত—চলুন আমি সব ঠিক কোরে দিচ্ছি।"

"আর হ'ল না হরি…" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অপূর্ব্ব বলে। মনে হ'ল, ঠিক পাশের ঘরে তার সব চেয়ে পরমাত্মীয়ের কঠিন রোগে জীবনের শেষ আশ্বাসটুকু হারিয়ে কথাগুলি বললে।

তবু তাকে উঠতে হয়—টেবিলের উপর টেবিলক্লথ বিছিয়ে তিনদিকে চেয়ার সাজিয়ে অপূর্ব্ব ভ্রূকুঁচকে একবার ভাবে—টি-পট, কাপ, প্লেট, চামচ এগুলো!! এগুলোর কোন ব্যবস্থা তো হয়নি। কাপ গোটা তিনেক হয়ত মোড়ের মাথায় চায়ের দোকান থেকে চাইলে দেবে—কিন্তু টি-সেট কে তাকে দেবে? সেওতো এখানে প্রায় নতুন আগন্তুক—কদিনের জন্ম হাওয়া বদলাতে এসেছে। সেই বা কাকে চেনে, আর তাকেই বা চেনে কে? জিওলজিষ্ট বলে যতই তার সুনাম থাক না কেন—তার Freaks of Nature ওরা কেউই পড়েনি…

"উঃ—মা—"

হরিহর বলে—"কা হল বাবু"

"অসম্ভব হরি—অসম্ভব!! আমায় সুইসাইড কোরতে হবে—কিছুতেই হবে না"—ব্যাপারটা সংক্ষেপে জেনে তবু হরিহর বেরিয়ে যায়।

অপূর্ব্বর চিন্তা হুহু কোরে এগিয়ে চলে—বেশ—যেন ওগুলো পাওয়াই গেল, কিন্তু সার্ভ কোরবে কে? হরিহর! যার গায়ের গন্ধে এতদিন অভ্যস্থ হয়েও অপূর্ব্বর বমি আসে। ময়লা শতচ্ছিন্ন একটা গেঞ্জি আর জনুর্দ্ধ পর্য্যন্ত একখানা ধুতি সমেত হরিহরের চেহারাখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নাঃ—অসম্ভব!! কি কোরবে অপূর্ব্ব—সুইসাইড। একবার ফ্যালফ্যাল কোরে চেয়ে দেখে ঘরটার চারদিকে—নিজের উপর অসহ্য আক্রোশে তার চোখ দুটো জ্বালা কোরতে থাকে।—কি দরকার ছিল ওই মেকী সাহেব মেমদের সঙ্গে তার অত বেশী মেলামেশা করবার। তার ত প্রথম দিন থেকেই ওদের একটুও ভাল লাগেনি। মেয়েটা গায়ে-পড়া স্মার্ট—অথচ না আছে রূপ—না আছে শরীরের কোন, মানে একটু লালিত্য। কাল মুখখানাকে পাউডার—আরও কি কি যেন মেখে একেবারে পাঁশুটে কোরে তুলেছে। আর সবচেয়ে বিশ্রী কথাগুলো—ইংরেজীর মাঝে ইংরেজী সুরে বাংলার টাকনা দিয়ে কথা—ইমিটেশন, ফল্‌স, মেমসাহেব!! মুট্রা-গাউস, যত সব ননসেন্স! রাগে অপূর্ব্ব হাত দুটো মুঠো কোরে পায়চারী করে—কপালের দুপাশের শিরদুটো ফুলে উঠে দপদপ কোরতে থাকে।

হরিহর অনেকক্ষণ পরে ফিরে আসে—অপূর্ব্ব সে দিকে চেয়েও দেখেনা। তেমনি পাইচারী কোরতে থাকে। এবার আর Illustrated weeklyতে Freaks of Nature নয়—এবার Fancies of a sham European Grill! মনে মনে একটা প্লট ঠিক কোরতে থাকে—হুঁ—গ্রাণ্ড!! If I could take a snap of that monkey।

হরিহর ভয়ে ভয়ে বলে—তিনটে কাপ আর একটা

:কটলি পেলাম বাবু কিন্তু ঐ যে কি বলছিলেন চা ভিজাবার গাটি—তা কোথাও মিলল না।—"ফেলে দে হরে, দূর কোরে দে—" অপূর্ব্ব গর্জ্জন কোরে ওঠে।

অকস্মাৎ নিজেই একটান দিয়ে টেবিল ক্লথটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেয়—সামনের চেয়ারটাকে সজোরে পদাঘাত করে, সেটা ছিটকে গিয়ে এক কোণে পড়ে।

চারটে বাজতে কুড়ি! অর্থাৎ ঠিক কুড়ি মিনিট পরে গাঢ় নীল রংএর ছোট অষ্টিনটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াবে—ঝকঝকে উর্দ্দিপরা শোফার নেমে সেলাম কোরে দরজা খুলে দেবে—ঐ লালিত্যহীন ছাইরংএর ঠোঁটে লিপস্টিক ঘসা মেয়েটা নামবে—হাতদুটো যে পর্য্যন্ত ঘসে ঘসে ছাইরং কোরেছে—তার উপরে একটু অসতর্ক মুহূর্ত্তে জামার হাতাটা উঠলেই ভিতরের কদর্য্য রং আত্মপ্রকাশ কোরবে। পরণে থাকবে হয়ত গাউন—আজ শাড়ী থাকতেও পারে—হাতে থাকবে ভ্যানিটী ব্যাগ—হাঁা ভ্যানিটিই বটে! গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়ি পর্য্যন্ত যা কিছু দেখবে—তাতেই বাপ আর মেয়েতে মিলে গ্রাণ্ড, ডিলাইটফুল, চার্মিং প্রভৃতি বিলেতি বিশেষণের ছড়াছড়ি কোরবে, তারপর হয়ত ঐ পালিশ করা ঠোঁট দুটোর পাশে ঘৃণা ফুটে উঠবে—বলবে—Horrible!…অপূর্ব্বর আর ভাবা হয় না। সারা গা তার ঝিমঝিম করিতে থাকে। কি করা যায়? নড়বড়ে নেয়ারের খাটটায় শুয়ে পড়বে নাকি লেপ গায়ে দিয়ে? হরিহর চেপে ধরুক—কিংবা মাথায় হুড় হুড় কোরে জল ঢালতে থাকুক! ম্যালেরিয়া—ম্যালিগন্যাণ্ট টাইপ। কিন্তু ঐ বিলেতি ভাইপার এগিয়ে আসবে টেবিলের উপর হাতের ব্যাগটা রেখে,—মুখে একমুখ ছদ্ম উৎকণ্ঠা টেনে। তারপর কপালে হাত দিলেই বুঝতে পারবে। অপূর্ব্বর মনে পড়ে ছোটবেলায় সে যেন শুনেছিল শরীরের কোথায় রসুন রাখলে উত্তাপ বাড়ে। কিন্তু তাও যেন হ'ল—তারপর মোটর ছুটিয়ে ডাক্তার ডেকে এনে হয়ত একটা কাণ্ডই বাঁধিয়ে বসবে। তখন সব ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া ঐ খাট আর বিছানাগুলো—অসম্ভব, ওদের সামনে তা কোনমতেই বার করা চলে না—কিছুতেই না। তার চেয়ে বরং সিঁড়ির উপর থেকে তর্জ্জনী তুলে সোজা "গেট আউট" বলা ঢের সহজ। তাই বলবে নাকি অপূর্ব্ব। ও মরিয়া হ'য়ে ওঠে একবার—পরক্ষণেই ভেঙ্গে পড়ে—দূর! তাই কখন সম্ভব—সে ত আর সত্যিই পাগল হ'য়ে যায়নি।

চারটে বাজতে দশ মিনিট।—ওঃ কী করা যায়। হঠাৎ বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত সে চমকে ওঠে—হাঁ ঠিক হয়েছে—রাইটলি সার্ভড—ওরা আজীবন সকলকে ওদের মেকীপনা দিয়ে ঠকিয়ে এসেছে—আর আমি—আমি না হয় একদিন ঠকালুমই। আর চা?—চা না খেলে কেউ মরে যায় না, আর মরলেও ওদের মত লোকগুলোর মরাই ভাল—হাঁ ঠিক হয়েছে। যাও—ফিরে গিয়ে নিজের বাড়ীতে চা খাওগে—আর বাপবেটীতে মিলে—গ্রাণ্ড ডিলাইটফুল করোগে। সহসা ঘড়ির দিকে চেয়ে অপূর্ব্ব দেখে চারটে বাজতে পাঁচ। তাড়াতাড়ি একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস কোরে কী কতকগুলো লিখতে থাকে—হাতটা থরথর কোরে কাঁপে। চিঠিখানা একটা খামে এঁটে হরিহরের হাতে দিয়ে বলে—"সাহেব আর মেমসাহেব এলে এই চিঠিখানা তাঁদের হাতে দিয়ে বলবি একটা জরুরী তার পেয়ে বাবুকে……"

কথা শেষ হয়না—দোরের গোড়ায় মোটরের হর্ণ বেজে ওঠে। অপূর্ব্ব কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারের হাতল ধরে বসে পড়ে। তার মনে হয় এক্ষুণি সে অজ্ঞান হ'য়ে যাবে। অনড় অশক্ত দেহখানার উপর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ শোনা যায়। প্রত্যেকটা শব্দ তার বুকের উপর হাতুড়ি পিটতে থাকে। সিঁড়ির মুখে উর্দ্দিপরা শোফারের ভারী গলার আওয়াজ ভেসে আসে—"সাহাব! চিঠ্ঠি"

এবার অপূর্ব্ব ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়ায়—"চিঠি!!"

কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এসে বারাণ্ডার রেলিং ধরে দাঁড়ায়—জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—"সাহাব—মেমসাহাব!!"

শোফার সেলাম কোরে বলে—"একসিডেণ্ট সাব—বহুত আফশোষকি বাত—বুড্ডা সাব আনেকো বখৎ সিড়িমে গির পড়া—আউর উনকে ঘটনামে বহুত চোট আয়ি" কম্পিত হাতে চিঠিখানা নিয়ে সামনে মেলে ধরে অপূর্ব্ব। কিন্তু একবর্ণও বুঝতে পারেনা। বৃদ্ধের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে যে অপরিসীম তৃপ্তির জোয়ারে তার দেহমন কানায় কানায় ভরে ওঠে—তাকে কিছুতেই যেন সামলাতে পারেনা। সেইখানেই ঝুপ কোরে বসে পড়ে। চাপবার সাধ্যমত চেষ্টা কোরেও পারেনা। চোখের জল ঝর ঝর কোরে ঝ'রে পড়ে। শোফার হাঁ কোরে কিছুক্ষণ সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে থাকে—তারপর সেলাম কোরে নেমে যায়।

নন্দীর পুকুর

যমদত্ত লিখিত

কলিকাতা চিৎপুর রোড হইতে বাহির হইয়া বাগবাজারের খাল পার হইয়া বর্ত্তমানের কাশীপুর রোডের আরম্ভ; কাশীপুর রোড যেখানে শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ বরাহনগরের তেমাথার কালিতলা হইতে গোপাললাল ঠাকুর রোডের আরম্ভ (পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গীয় গোপাললাল ঠাকুরের বাগানবাটী এই রোডের উপর একশত বৎসর আগে অবস্থিত ছিল—তিনি তাঁহার বাগানে আসিবার সুবিধার জন্য এই সড়কটী সর্ব্ব প্রথমে পাকা বাঁধাইয়া দেন); গোপাললাল ঠাকুর রোড বড় রাস্তায় (বারাকপুর যাইবার ট্রাঙ্ক রোডকে ইতর ভদ্র সকলেই 'বড় রাস্তা' বলে; আমরা এই জন্য ইহাকে ইহার প্রকৃত সরকারী নাম জানা সত্বেও 'বড় রাস্তা' বলিলাম) শেষ হইয়াছে। বড় রাস্তা পার হইয়া টেরচা ভাবে পূর্ব্বদিকে দৈঁতের খালের (যে দৈঁতের খালের পঙ্কোদ্ধারের সময় হাজার মড়ার খুলি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া কণ্ট্রাক্টরের বাবু বনমালি ঘোষ আমাদের বলিয়াছিলেন; যে দৈঁতের খালের পাড়ে বসিয়া মদনমোহন দত্তের ship-সরকার রামদুলাল সরকার—যিনি মৃত্যুকালে ১ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা রাখিয়া যায়েন—তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপুরের বৈকুণ্ঠ ঠাকুরকে কলার পাতায় তামাক খাওয়া পোড়া টিকে দিয়া 'আমি যদি লক্ষপতি হই তাহা হইলে তোমাকে বা তোমার ছেলেদের এক হাজার টাকা দিব' বলিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যত জীবনে ধনী হইলে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন) কিছু উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের বেলঘরিয়া পুলিস আউট-পোষ্ট বা ফাঁড়ির (পূর্ব্বেকার বড়লাট সাহেব যখন শনিবার শনিবার বারাকপুরের লাট-বাগানে চৌ-ঘুড়ি করিয়া যাইতেন গাড়ীর ঘোড়া বদল করিবার আড়গড়া বা আস্তাবলের) পূর্ব্বদিক ঘেঁসিয়া বর্ত্তমানের আধামেটে আধাপাকা বারাকপুর 'রাথাল' বোর্ডের (এখন নাকি দেশের সব 'রাথাল' বোর্ড উঠিয়া গিয়াছে) নীলগঞ্জ রোড গিয়াছে। এই রাস্তা নবাবী আমলের বহু পুরাতন রাস্তা। কেহ কেহ এই রাস্তাকেই গৌড় বঙ্গের বাদসাহী সড়ক্ বলেন—আবার কেহ কেহ ইহাকে গৌড় বঙ্গের বাদসাহী সড়কের একটী শাখা বলেন। সে যাহাই হউক না কেন, এই রাস্তা দিয়াই বাঙ্গালার সুবেদার রাজা মানসিংহ লোক-লস্কর লইয়া বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জগদ্দলের ও কাউগাছির দুর্গ জয় করেন ও কালিঘাট পার হইয়া ধুমঘাট আক্রমণ করিতে যায়েন। (প্রমাণ দাদুর মুখে শুনা লোক-প্রবাদ—আপনাদের বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় করুন; ইচ্ছা না হয় করিবেন না; আমি কিন্তু বিশ্বাস করি)। আর রাজা মানসিংহকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান ভবানন্দ মজুমদার ও বিশ্বনাথ নস্কর। এই পথ দিয়াই নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা স-সৈন্যে বাংলা সন ১১৬৩ সালে কলিকাতা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়েন।

সোদপুর রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে রামভদ্রবাটী গ্রাম। এই গ্রামে নবাবী ছাউনী পড়ে—নবাবী ও নবাবী সৈন্যদের অত্যাচারে গ্রামের গৃহস্থগণ উৎসন্ন যাইতে বসিল; তিন দিনে গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইল। রামচন্দ্র ভদ্র বা রামকুমার ভদ্র (ঠিক নাম জানি না) বলিয়া এক দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ ধনী এই গ্রামের পত্তন করিয়া সর্ব্বপ্রথম পাকা বাটী করেন বলিয়া এই গ্রামের নাম রামভদ্রবাটী। নবাব যখন এই গ্রামে ছাউনী করেন তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষী বা আষাঢ়ের প্রথম। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম—কাঁটাল পাকানো গুমোট্; জলের নাম গন্ধ নাই; তাহার উপর নবাব রমজানের রোজা করিয়াছেন; রোজা খুলিবার কালে হঠাৎ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার খুব কচি কচি জলভরা সাদা তাল শাঁস খাইবার ইচ্ছা হইল। খেয়ালী নবাবের খেয়াল—চারিদিকে লোক লস্কর দৌড়াইল; গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল যে নবাব খুব কচি সাদা তালশাঁস খাইবেন। পানিহাটীর দরবেশ গাজীর (এই দরবেশ গাজীকে মহীউদ্দীন মৈজুদ্দীন আলমগির পাদসাহ গাজী তাঁহার গোঁড়ামী ও পাণ্ডিত্যের জন্য পানিহাটী গ্রামে কাজীপাড়ায় বাসস্থান ও দশ-কাজাই অর্থাৎ দশটী কাজির এলাকা ও বিচার করিবার ক্ষমতা একত্রে দিয়াছিলেন) প্রপৌত্র কাজী নসরৎ উল্লার (?) (আমার নামটি ঠিক স্মরণ হইতেছে না) তলব পড়িল। তিনি খুব কচি সাদা তাল শাঁসের সন্ধান দিতে পারিলেন না—তাঁহার সব কাজই নবাব কাড়িয়া লইলেন। কাজি মহম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইহাদের বংশধর। বেঙ্গল কেমিক্যালের পানিহাটীর কারখানার জমীর Land acquisitionএর দরুণ পানিহাটিতে একটী কাজিও নাই—কাজীপাড়াও নাই—সবই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

খবর নন্দী বুড়ির কানে গেল। নন্দী বুড়ি হইতেছে নীলকণ্ঠ নন্দীর মা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নীলকণ্ঠ নন্দীর বয়স ১৬।১৭। গায়ে খুব জোর। নন্দী বুড়ি খুব চালাকী করিয়া ভোরের আলো হইতে না হইতে ছেলেকে দো-ফলা তাল গাছের উপর তুলিয়া দিল এবং কোমরের থলিতে তাল কাটিয়া লুকাইয়া ফেলিতে লাগিল। নন্দী বুড়ি সারাদিন সেই তাল পুকুরের পাঁকের ভিতর পুঁতিয়া তাল ঠাণ্ডা করিল। সূর্য্য পড় পড় হইতে সেই তাল কাটিয়া তাল শাঁস বাহির করিয়া কলা পাতার ঠোঙ্গায় করিয়া নবাবের কাছে লইয়া গেল। নবাব এই রকম কচি সাদা তাল শাঁস খাইয়া খুব খুসী—নন্দী বুড়িকে বখশিস করিলেন ১০ আস্রফী।

এই দো-ফলা তাল গাছের বাগান আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। সোদপুরের "কয়লার খনির" মালিক অর্থাৎ নিকটস্থ সাত গাঁয়ের কয়লার একচেটিয়া ব্যবসাদার কৈলাসচন্দ্র সরকার ও সাতকড়ি মোদক এই তাল বাগান কাটিয়া বিক্রয় করিয়া দেন। দো-ফলা তাল গাছ তখন দেড়ায়

বুড়ো হইয়াছে; ফল দেয় না, তালের গুঁড়ি পাকিয়া কাল হইয়াছে; গাছও মাত্রা ছাড়াইয়া উঁচু হইয়াছে। এই রকম তালের গুঁড়ির নাকি দাম খুব বেশী। তবল্দারের হাতে পড়িয়া কুড়ুলের ঘায়ে এই তাল বাগান মাঠে পরিণত হইল। এখনও ঐ অঞ্চলে ২১২টি দো-ফলা তাল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আষাঢ় মাসেও কচি তাল শাঁস খাওয়া যায়। উপস্থিত ১৫।১৬ বৎসরের* খবর বলিতে পারি না। কারণ আমরা দেশ-ছাড়া।

নবাবের প্রদত্ত আস্রফী কয়টিই হইল নন্দী বুড়ির লক্ষ্মীর ঝাঁপি। নীলকণ্ঠ নন্দী এই আস্রফী কয়টি সম্বল করিয়া ব্যবসা ফাঁদিল ও প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া বড় মানুষ হইল। নন্দী বুড়ি তখন "বুড়ী থুড়থুড়ী"; মা নিত্য গঙ্গা স্নান করিবেন বলিয়া নিকটস্থ গঙ্গা তীরবর্ত্তী গ্রামে (এই গ্রাম থানা এঁড়িয়াদহের অন্তর্গত, রেভিনিউ সার্ভের ৩২নং গ্রাম) বাগান ও বাটী করিল। মাকে দিয়া পুষ্করিণী ও তুলসী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করাইল। এখনও "নীলু" নন্দীর মায়ের প্রতিষ্ঠিত পুকুর "নন্দীর পুকুর" নামে খ্যাত। বিগত মন্বন্তর পর্য্যন্ত নন্দী প্রতিষ্ঠিত তুলসী মঞ্চ, তুলসী গাছ না থাকিলেও দাঁড়াইয়াছিল। নন্দী বাগানের বর্ত্তমান মালিকেরা সাহেবী ভাবাপন্ন বলিয়া ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।

নন্দী-বুড়ী ১১০ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে তীরস্থ হইয়া জাহ্নবীজলে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্র সত্য হইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গিয়াছেন। নীলু নন্দীও বহুকাল হইল গত হইয়াছে। কালক্রমে নীলু নন্দীর বংশে এক নিলমণি নন্দী—আর এক "নীলু নন্দী" নন্দীর বাগান, বাড়ী ও পুকুরের মালিক হয়েন। নিলমণি নন্দী বড় বাবু; 'বাবু' হইলে যে সব দোষ বা গুণ হয় নিলমণির তাহা সবই ছিল। শুনিয়াছি সোদপুরের ঈশ্বর শুঁড়ির পিতার নিকট স্ত্রীর মুক্তার নথ বাঁধা দিয়া ধাণ্যেশ্বরীর সেবা করিয়াছিলেন। এই ঈশ্বর শুঁড়ি গঙ্গার তীরে একটী বাঁধা ঘাট ও চাঁদনী করিয়া দেয়—আজিও তাহা বর্ত্তমান। নিলমণি নন্দী ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধাণ্যেশ্বরীর কৃপায় হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া এক ব্রাহ্মণ কন্যার সর্ব্বনাশ সাধন করে—ফলে ব্রাহ্মণকন্যা নন্দীর পুকুরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন ও সাঁপ দেন যে নীলু নন্দীর 'ভিটামাটি চাটি' হইবে এবং নন্দীর পুকুর ও বাগান কাহারও ভোগে হইবে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় জলে ডুবার বৎসরেই 'নীলু' নন্দীর ভিটায় বাজ পড়ে; পর বৎসর ভুমিকম্পে—সামান্য ভুমিকম্প, পাড়ার অন্য বাড়ীর কিছু হইল না—"নীলুর" বাড়ীর নাচঘর পড়িয়া গেল; তার পর ঝড়ে নারিকেল গাছ পড়িয়া লক্ষ্মীর ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রাহ্মণ কন্যার মৃত্যুর তারিখ জানিনা; তবে বয়নামা দৃষ্টে জানিতে পারা যায় যে "নীলু" নন্দীর বিষয় আশয় সব ইংরাজী ১৮৬৬ সালের মধ্যে নীলাম হইয়া যায়। ৫৫৲ টাকা মূল্যে নন্দীর পুকুর ও ২২ বিঘা বাগান মধু মান্না কিনেন। কিনিবার অল্পদিনের মধ্যে মধু মান্নার এক ছেলে—সে মারা যায়। শোকে মধু মান্না তাঁহার ভিটা (যেখানে বিখ্যাত পাখোয়াজ বাজিয়ে কলিকাতার "মিরজা" শিবচন্দ্র ঘোষের পৌত্র ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বাস করিতেন) এবং নন্দীর পুকুর ও বাগান বিক্রয় করিয়া কাশীবাসী হয়েন। বাগান ও পুকুর কেনেন চুঁচড়ার (চুঁচুড়া বলিলে বাঙ্গালরা বুঝিবেন না, ইহা E I Railএর Chinsurah – স্বাধীনতা পাইবার পর Cawnpur—Kanpur হইয়াছে; Benares—Banaras হইয়াছে; কিন্তু পোড়া বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান এখনও Burdwan! মেদিনীপুর এখনও Midnapore! চন্দননগর এখনও Chandernagore; আর পুর্ব্ব বঙ্গের বাঙ্গালরা বলিতেছে বডওয়ানের মিহিদানা; মিডনাপোরের কেওট; চাঁদেরনগরের পণ-ভোট হইয়াছে) মল্লিকরা কিনেন। যে বছরে মল্লিকরা দখল লয়েন সেই বৎসরই মল্লিকদের বড় ভাই মারা যায়েন ও অতি শীঘ্রই উহাদের মধ্যে সরিকাণি বিবাদ পাকিয়া উঠে। পরে তাঁহারা নন্দীর পুকুর ও বাগান গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম বাবুকে বিক্রয় করেন। গঙ্গানারায়ণবাবুর তখন খুব বোলবোলা; নুতন পাঁচ ফোকরের ঠাকুর দালানে ঘটা করিয়া দুর্গাপূজা করিতেন; ১০৮ পাঁঠা বলি হইত; অষ্টমীর দিনে মেষ ও মহিষ বলি হইত—সে যে সে মহিষ নহে, শিংওয়ালা সাদা মহিষ। ৩২টী ঢাক্ বাজিত—নারিকেলবেড়িয়ার ঢাকীরা ঢাকের অনেক রকমের বোল বাহির করিতে জানে ও তাহা বাহির করিত। মহিষ বলির সময় বাজাইত :—

মোষ ব্যাট্যা; বড় ঠ্যাটা
মাথায় দুটো সিং;
উঁচিয়ে ল্যাজ, নাড়ছে সিং;
নড়ছে ব্যাট্যা তিড়িঙ্ তিড়িঙ্;
হাড়কাটেতে ফেলে মাথা
ছ্যাড্যাং, ড্যাড্যাং, ড্যাং
মায়ের কৃপায় হইল বধ
ছ্যাড্যাং, ড্যাড্যাং, ড্যাং
পাব্দা মাছের দুটো ঠ্যাং
পাব্দা মাছের দুটো ঠ্যাং
ছ্যাড্যাং, ছ্যাড্যাং, ড্যাং।

আরও কত রকমের বোল বাজাইত তাহা কে শুনিয়া মনে রাখিয়াছে? মেজ গিন্নি—আমাদের পাড়ার মেজগিন্নি—আমাদের জেলে-জেঠাইমার মুখে যাহা শুনিয়াছি ও তাহার যেটুকু মনে আছে তাহাই ওপরে লিখিলাম।

নন্দীর পুকুর ও বাগান খরিদের দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মারা যায়েন ও তাঁহার সৌভাগ্যে ভাঁটা ধরে। পূজার ধুমধাম ক্রমশঃ কমিতে থাকে; মৃত্যুকালে তিনি প্রত্যেক পুত্রকে ১০,০০০৲ টাকা করিয়া দিয়া যায়েন। ব্যবসাদি করিতে তাঁহারা এই টাকা লোকসান করিয়া ফেলেন। চাকুরী না করিলে তাঁহাদের দিন চলিত না। কিছুদিন বাদে তাঁহারা এই নন্দীর পুকুর ও বাগান ঐ গ্রামের "তাসুবাবু"কে বিক্রয় করেন। তাসুবাবুর মতন দানশীল, ক্রিয়াবান, সদাশয় পুরুষ কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি স্নানের পাকা সান বাঁধান ঘাট, চাঁদনী, পঞ্চরত্ন কালীমন্দির, শিবমন্দির, বাঁধান

গঙ্গাবাসীর ঘর ও শ্মশান ঘাট, স্কুলবাড়ী ইত্যাদি করিয়া দিয়াছেন। গিরিশ ভট্টাচার্য্য তানুবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন যে আমাদের গ্রামের কি সুখ; টাকা ধার চাহিলেই পাওয়া যায়—শোধ দিতে হয় না। তানুবাবু কখনও কাহারও নামে বন্ধকের নালিশ করেন নাই—তামাদী হইলে খত ফেরৎ দিতেন। কখনও নীলামে কাহারও ভিটা খরিদ করেন নাই। যে বৎসর তানুবাবু নন্দীর পুকুর ও বাগান খরিদ করেন সে বৎসর তাঁহার কারবারের আয় তখনকার দিনের ৪০,০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকা। এছাড়া তাঁহার সম্পত্তির আয়ও ছিল। বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কৈলাসবাবু মারা গেল। তাহার পর বৎসর কারবারের একটা বৃহৎ অংশ অন্য লোকের হাতে চলিয়া গেল। এই সময়েই তাঁহার একমাত্র জামাতার কটকের জমীদারী নীলাম হইয়া গেল এবং পরবৎসর তিনি দেউলিয়া হইয়া শ্বশুরের আশ্রয়ে আসিলেন। ইহার কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। এই সময়ে কারবারে মনোযোগ না দেওয়ায় তাঁহার দেনা হইতে সুরু হয় এবং তিনি তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের ৩ বৎসরের মধ্যে মারা যান। নন্দীর পুকুর ও বাগান খরিদের তারিখ হইতে তানুবাবুর মৃত্যুর ব্যবধান মাত্র দশ বৎসর।

তাঁহার বংশধরেরা ক্রমশঃই হীনবল ও গরীব হইতে থাকেন। আজ এ তালুক বিক্রয় করিলেন, কাল সুন্দরবনের লাট বিক্রয় হইয়া গেল; পরশু কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় করিতে হইল। এই রকম করিয়া কিছু দিন চলিবার পর তাঁহারা নন্দীর পুকুর ও বাগান "নেপেন-নরেন" ফারমের কাছে বন্ধক রাখেন। পরে বন্ধকের দায়ে ইহা বিক্রয় হইয়া যায়। তানুবাবুর মৃত্যুর ঠিক ২৫ বৎসরের মধ্যে তাঁহার ভিটা বাড়ী অবধি নীলাম হইয়া যায় এবং তাঁহার বংশধরগণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া দূরদেশে বসবাস করেন।

যে বৎসর "নেপেন-নরেন" ফারম এই নন্দীর পুকুর ও বাগান বন্ধক রাখেন, তাহার আগের সনে তাঁহাদের Super-tax দিতে হইয়াছিল; অর্থাৎ তাঁহাদের আয় ৫০,০০০৲ টাকার ওপর ছিল। "নেপেন-নরেন" ফারমের বড়বাবু কোচোবাবু দুর্গোৎসবের সময়ে তিন দিনই একসঙ্গে যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক ও বৈঠকীগানের মহড়া ও বাইনাচ দিতেন। যাঁহার যেটা রুচি তিনি সেইটা শুনুন—আর খাওয়া দাওয়ার ত কথা নাই। পাড়ার কাহারও বাড়ীতে উনান জ্বলিত না। এই সম্পত্তি বন্ধক রাখার সঙ্গে সঙ্গে Exchange fluctuation এর দরুণ তাঁহাদের অনেক টাকা খেসারত দিতে হয়। বোম্বাই হাইকোর্টের এক ডিক্রীতেই তাঁহাদের ১,৮০,০০০৲ টাকা দিতে হয়। কোচোবাবুর শরীর ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে; যে বৎসর বন্ধকী নন্দীর পুকুর ইত্যাদি নীলাম ডাকিয়া খাসদখল লয়েন সেই বৎসরেই তাঁহাদের ফারম ভাঙ্গিয়া যায় ও সরিকাণী মামলার সূত্রপাত হয়। বিবাদ এতদূর অবধি গড়াইয়াছিল যে তাঁহাকে ফৌজদারী মামলার আসামী হইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয় এবং ইহার অল্পদিন বাদে তিনি হাঁসপাতালে নীত হইয়া মারা যায়েন।

উহার সম্পত্তির মধ্যে শ্যামবাজারের সুরেনবাবু নন্দীর বাগান ও পুষ্করিণী খরিদ করেন। ইচ্ছা ছিল যে এইখানে একটি বৃক্ষ-বাটিকা প্রস্তুত করিয়া মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি খরিদের দুই বৎসরের মধ্যেই মারা যান। তাঁহার পুত্রেরা ইহা বিখ্যাত জাহাজী ধনী আমিরচাঁদ বাবুকে বিক্রয় করেন। নূতন খরিদ্দার মহাশয় খরিদের অল্পকালের মধ্যে নানা প্রকার পারিবারিক দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েন ও মারা যায়েন। তাঁহার একমাত্র পুত্র নিঃসন্তান। তাঁহার তাঁহার বংশ নির্ব্বংশ হইবে এইজন্য স্থানীয় লোকে এই নন্দীরপুকুর ও বাগানকে "হানা" সম্পত্তি বলে এবং এখনও সেই আত্মহত্যাকারী ব্রাহ্মণ-কন্যার শাপ-মুক্তি হয় নাই বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি কাশীর এক মহাপণ্ডিত, নারায়ণ ভট্টের (যিনি সম্রাট আকবরের সময় কাশীতে বিশ্বনাথের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রপৌত্র গাগা-ভট্ট শিবাজীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করায় শিবাজী ছত্রপতি-মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন) এক বংশধরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি—যে কবে এই সম্পত্তি ব্রাহ্মণ-কন্যার শাপ-মুক্ত হইবে ও কবে তাঁহার উদ্ধার হইবে। তাহাতে তিনি বলেন যে ব্রাহ্মণ-কন্যার শাপের তারিখ হইতে ১২০টি চান্দ্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে এই সম্পত্তি শাপ-মুক্ত হইবে এবং গয়ায় প্রেতশীলা পর্ব্বতে মদন দত্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সিঁড়ি দিয়া আরোহণ করিয়া সাদা তিলের পিণ্ড দিলে তিনি উদ্ধার পাইবেন।

এই পর্য্যন্ত ত নন্দীর পুকুরের জন্ম-বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দীর পুকুরের পর পর মালিকগণের যতটা পারা যায় ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া গেল। কিন্তু একজন বিখ্যাত ইতিহাস-বেত্তা বলিয়াছেন যে;—The history of a Country is not the history of its Kings and the wars they have waged or the loves they have made; but the history of its people in all its aspects—social, cultural, political and religious. আমরাও সেইজন্য যতটা সম্ভব পারি—নন্দীর পুকুর ও বাগানের সামাজিক ইতিহাস দিবার চেষ্টা করিব। আমরা আমাদের এই সামাজিক ইতিহাসের প্রচেষ্টায় যাঁহারা নন্দীর বাগানে বসবাস করিতেন বা ইহার ফল পাড়িয়া খাইতেন তাহাদের ত ধরিবই; এমনকি যাঁহারা নন্দীর পুকুরের জল সরিতেন তাঁহাদেরও ধরিব এবং নন্দীর পুকুরের ধারে যে সব বিশিষ্ট ঘটনা হইয়াছিল তাহারও একটা বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। তবে আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্র বলিয়া পাঠকগণ কিছু মনে করিবেন না, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

নন্দীর পুকুরের পূর্ব্ব ধারে নন্দীর বাগানের এক কোণে সন্ন্যাসী ঘোষ ওরফে সন্ন্যাসী ডাকাতের চালা ছিল। আমরা সন্ন্যাসী ঘোষকে দেখিয়াছি—লম্বা, বাঙ্গালীরপক্ষে খুব লম্বা, তামাটে রং, দোহারা পাকান চেহারা। নৌকার মাঝিগিরি করিত। নিজের পান্সী ছিল—৩ জন দাঁড়ি সন্ন্যাসীর অধীনে কাজ করিত। সুখচরের বাজার ঘাট হইতে

নৌকা ছাড়িয়া বড়বাজারের জগন্নাথ ঘাট অবধি যাইত—ভাড়া যাত্রী পিছু ৬ পয়সা। ভোর পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটার সময় নৌকা ছাড়িত; ফিরিবার সময় মালপত্র লইয়া আসিত—ঘাটে ঘাটে নামাইয়া দিত। ১০টা—১১টার মধ্যে বাড়ী ফিরিত। খাওয়া দাওয়ার পর যদি বিশেষ সোয়ারী থাকিত ত লইয়া যাইত। আমরা মামার বাড়ী যাইবার জন্য সন্ন্যাসীর নৌকা ভাড়া করিতাম—এঁড়েদায় মামার বাড়ী, যাতায়াত এক টাকা ভাড়া; আর সন্ন্যাসীকে দিতে হইত ছিলিম কয়েক তামাক বা এক ছিলিম 'বড়' তামাক্। নৌকা ভাড়া যাহা হইত, তাহা সাড়ে পাঁচ ভাগ হইত; প্রত্যেক দাঁড়ি এক ভাগ, সন্ন্যাসী মাঝি বলিয়া এক ভাগ; নৌকার মালিক বলিয়া এক ভাগ; আর আধ ভাগ থাকিত নৌকার সরঞ্জাম ও মেরামতী খাতে জমা। ফাল্গুন, চৈত্র বা বৈশাখ মাসে যে সময়ে সন্ন্যাসীর নৌকার কাজ কম থাকিত সেই সময়ে সন্ন্যাসী নৌকায় গাব দিত; রং করিত; নৌকার 'পাট' করিত। ১০।১২ দিনে সব কাজ শেষ হইয়া যাইত।

সন্ন্যাসীর নৌকা ভাড়া করিলে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যাইত। চাঁপদানীর শরৎবাবু বাচ্ খেলায় দক্ষিণেশ্বরের প্রসন্ন বাঙ্গালকে হারাইয়া দিয়া সন্ন্যাসীকে ডান হাতে সোনার তাগা বখশিস্ করিয়াছিলেন। দাঁড়ের ১৫৬ ঘায়ে গঙ্গা পার হওয়া যায়। আজকাল নৌকার গলুই উঁচু করা হয়—পানসীতে নৌকার গলুই 'রুজু রুজু' থাকিবে, তবে ত জল কাটিবে। দাঁড়ের পাতা তেজপাতের মতন হওয়া চাই—আরও কত কথা বলিত, সেসব কথা কেই বা মন দিয়া শুনিত; আর কেই বা মনে করিয়া রাখে। যে দুই একটী কথা মনে আছে তাহাই বলিতেছি। সন্ন্যাসীর মতন পাকা হুঁসিয়ার মাঝি সচরাচর দেখা যাইত না। গঙ্গার কোথায় কি আছে, সব নখ-দর্পণে। কুলীন-পাড়ায় গিরিশ ঘোষের বাগানের সামনে গঙ্গার চড়ার মাঝখানে একটী সোঁতা আছে। ভাঁটার সময় সেইখান দিয়া সোজা নৌকা বাহিয়া গেলে শীঘ্র শীঘ্র মাহেশে পৌছান যায়। কাল-বৈশাখীর ঝড়ে সন্ন্যাসী বহুবার গঙ্গাপার করিয়া বহু সোয়ারীকে রেল ধরাইয়া দিয়াছে। কোন্নগরের রাইমোহন সেন সন্ন্যাসীর নৌকা পাইলে অন্য নৌকায় চড়িতে চাহিতেন না। তক্ষকতলার ঘাটের কাছে গঙ্গার জলে এক 'ঘুরণী' আছে; সেইটে পার হইতে অনেক সময় যায়; সন্ন্যাসী কিন্তু 'ঘুরণী' এড়িয়ে যায়। টীটাগড়ে বিশালাক্ষীতলায় যে দহ আছে তাহা আগে খুব গভীর ছিল, এখন (অর্থাৎ সন্ন্যাসীর সময়ে) বুজিয়া আসিতেছে। এই দহে চাঁদ সদাগরের এক নৌকা ডুবিয়া যায়। ডুবুরী নামাইলে এখনও নাকি নৌকার কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়; নৌকার ভিতরে অনেক পাথরের খোদাই মূর্ত্তি আছে; নাথু পালের মহাশ্মশানে এক সাধু এই রকম একটা মূর্ত্তি তুলিয়া অশ্বত্থ তলায় রাখিয়াছিল—আদি কত গল্প যে সন্ন্যাসী করিত। বিশালাক্ষীর দহে এক জোড়া মকর বাস করে। মকর মা গঙ্গার নাম করিয়া ডুব দিলে মানুষকে কিছু বলে না। দেখিতে কুমীরের মতন কাল নহে—সাদা। সন্ন্যাসীর এই উক্তিটী তাহার মৃত্যুর পরে আংশিক ভাবে Verified বা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। Sir Alexander Murray ঐ দহ হইতে আধ মাইলের মধ্যে গুলি করিয়া এক মদ্দা ঘড়িয়াল মারেন। ঘড়িয়াল দেখিতে কুমীর অপেক্ষা সাদা; আর সাধারণতঃ মানুষ খায় না; শুড়ের সামনের দিকটা কিছু উঁচু, তাহাতে মকর বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। বহু আগে খড়দহের খাল দিয়া জেলে ডিঙ্গী করিয়া ঘোলাগ্রামে যাওয়া যাইত। চেয়ারম্যান অম্বিকাবাবুর বাবা মাসে একবার পানিহাটীর চেলোপটী থেকে চাউল, ডাল ইত্যাদি কিনিয়া ডিঙ্গী বোঝাই করিয়া খড়দহের খাল দিয়া তাঁহাদের ঘোলার বাড়ীতে যাইতেন। রেলের লাইন যেবার ডবল করা হয়; সেইবার থেকে খাল ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে। এই খাল কাটা-খাল নহে; মা গঙ্গার খাল। এই খাল দিয়া ফিরিঙ্গী ডাকাতরা গঙ্গায় পড়িয়া লুটপাট করিয়া যাইত। সর্দ্দারের নাম Roda (বা রড়া) হইতে রহড়া গ্রাম হইয়াছে—এইখানেই Roda (বা রড়া) থাকিত। নিকটেই বন্দীপুর; বন্দীপুরে বন্দীদের রাখিত; টাকা পাইলে ছাড়িয়া দিত।

লোকে কিন্তু বলত যে সন্ন্যাসী আগে ডাকাতি করিত। সন্ন্যাসীর কব্জীর খুব জোর; তরওয়ালের এক ঘায়ে মহিষের মাথা উড়াইয়া দিতে পারিত। সন্ন্যাসীর যখন বয়স ৬৫র উপর, তখন সন্ন্যাসীকে এক কোপে ধাড়ি খাসীর মুণ্ডচ্ছেদ করিতে দেখিয়াছি। হেঁসো দিয়া এক কোপে সুপারি গাছ কাটিতে দেখিয়াছি। Sir Stuart Hogg পুলিস বিভাগের একজন বড় সাহেব; তিনি নিজে সন্ন্যাসীকে ডাকাত বলিয়া গ্রেপ্তার করেন ও হাতে হাতকড়া লাগান। সন্ন্যাসীকে নৌকা করিয়া যখন কলিকাতায় চালান দেওয়া হইতেছিল—সন্ন্যাসী সাহেবকে বলিল যে দাঁড়িদের একটু সরিয়া আসিতে বলুন আমি নৌকার গলুইয়ে বসিয়া প্রস্রাব করিব। সাহেব হুকুম দিলে সন্ন্যাসী প্রস্রাব করিবার ছলে নৌকার গলুই হইতে জলে পড়িয়া গিয়া হাত বাঁধা অবস্থায় ডুব সাঁতার দিয়া একেবারে গঙ্গার ওপারে উঠিল। হগ সাহেব ভাবিলেন যে ডাকাতটা বোধ হয় জলে ডুবিয়া মারা গেল। এই ভাবে ডাকাতের লিষ্টি হইতে সন্ন্যাসীর নাম কাটা গেল। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসী কেবল হাসিত—হাঁ বা না কোনও উত্তর করিত না।

যেদিন সন্ন্যাসী মারা যায়েন, সেই দিন আমাদের পাড়ায় একটি বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই ঘটনার কথা এইবার বলিব। সকাল বেলায় শুনিলাম যে সন্ন্যাসী আজ মারা যাইবে; পাড়ার মাতব্বরেরা বলিতেছেন যে উহাকে "তীরস্থ" করা হউক—সন্ন্যাসীও নাকি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর এক মাত্র কন্যা নেড়ী গোয়ালিনী রাজি হইতেছে না। সন্ন্যাসীকে দেখিতে গেলাম, শুধু হাতে যাইতে নাই বলিয়া এক পোয়া মিশ্রি লইয়া গেলাম। দেখিলাম সন্ন্যাসী খুব দুর্ব্বল; কিন্তু আজই যে মারা যাইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী দুর্গা নাম জপ করিতেছে।

ভুতির বোন "মানী"—ভাল নাম বোধ হয় মোহিনী বা ঐ রকম একটা কিছু হইবে। মানী বাল্য-বিধবা; ভাইয়ের সংসারে বাসন মাজে; কাপড় কাচে; খায়-দায়; থাকে। মানী নন্দীর পুকুরে বাসন

মাজা ইত্যাদি শেষ করিয়াছে। সকাল সকাল স্নান করিতে আসিল; নন্দীর পুকুর পাড়ে শুক্‌না কাঁপড় ও গামছা রাখিল। পাড়ার লোকে এই অবধি দেখিয়াছে। তাহার পর সন্ন্যাসীকে 'তীরস্থ' করা হইবে স্থির হইল, সন্ন্যাসীকে দাওয়ায় বাহির করা হইল; গঙ্গা মৃত্তিকায় হরিনাম সর্ব্বাঙ্গে লেখা হইতে লাগিল—সকলেই সন্ন্যাসীকে লইয়া ব্যস্ত। মানির কি হইল কেহ লক্ষ্য করে নাই। বেলা ২টার সময় মানির খোঁজ হইল; গঙ্গার তীর ইত্যাদি সব খোঁজা হইল।

মানিকে পাওয়া গেল না। পুকুর পাড়ে শুক্‌না কাপড় ও গামছা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল যে মানি নন্দীর পুকুরের জলে ডুবিয়া গিয়াছে। জেলেদের বড় টানা জাল দিয়া নন্দীর পুকুর এপার ওপার টানা হইল; ডুবুরী নামাইয়া পুকুর তোলপাড় করা হইল; জল ঘোলা হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু মানির কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

একটী তেওরদের ছেলে, পাড়া থেকে কিছু দূরে থাকে, মানিকে ভাল করিয়া চেনে না, বলিল যে মোল্লার হাটের কাছে এক থার্ড ক্লাস গাড়ীতে "ভূ" মাষ্টারের সঙ্গে মানির মতন একটী মেয়েকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। "ভূ" মাষ্টারকে শুঁড়ির দোকান থেকে বিলাতী মদ কিনিতেও দেখিয়াছে। "ভূ" মাষ্টার আমাদের ও অঞ্চলের বিখ্যাত কাপ্তেন বাবু; তাহার পক্ষে সবই সম্ভব; শুঁড়ির দোকানে খোঁজ করিতে বলিল যে হাঁ ভূ বাবু এক বোতল বিলাতী কিনিয়াছেন। গাড়ীতে মেয়েছেলে ছিল; গাড়ীর নম্বর ৭৭—কলিকাতার গাড়ী। যাহা হউক মানির একটা হদিস্ মিলিল; মানি জলে ডুবে মারা যায় নাই। সে রাত্রিতে মানির আর কোনও খোঁজ হইল না। পরদিন পাড়ার বেণীবাবু কলিকাতা কর্পোরেসনের গাড়ীর খাতা দেখিয়া ৭৭নং গাড়ীর ঠিকানা বাহির করিলেন; পুলিস সাহায্যে কোথায় গত কল্য মেয়ে সোয়ারী আসিয়াছে—গাড়োয়ান তাহা দেখাইয়া দিল। মানিকে পাওয়া গেল; কিন্তু "ভূ" মাষ্টারের পাত্তা মিলিল না। অনেক বলা কওয়া সত্ত্বেও মানি বাড়ি ফিরিতে রাজি হইল না। বলিল বাড়ী ফিরিলে "ছি! ছি!" নিন্দা হইবে! সপ্তাহ খানেক সেই খানে থাকিয়া মানি কলিকাতায় বৈষ্ণব চরণ শেঠের গলিতে চলিয়া গেল। নিমতলার কাঠ-গোলায় দেশের লোক কাঠ কিনিতে যাইলে মানি ডাকিয়া পাড়ার খবর লইত এইরূপ বছরখানেক চলিল—তাহার পর মানি ঠিকানা বদল করিল। আর মানির খবর কেহ পায় নাই। ৩০।৩২ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ আঠারবাড়ীর জমীদারদের এক কাজে আমাকে পুরী যাইতে হয়। কোর্টের কাজেই কয়দিন কাটিয়া গেল। ভাবিলাম পুরী আসিয়াছি একদিনও জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিলাম না—কি পাপী আমি! সেই দিনই সন্ধ্যার সময় ৺মন্দির হইতে ভগবদ্দর্শন করিয়া ফিরিতেছি এমন সময় আমার ছেলে-বেলার ডাক্-নাম ধরিয়া চেনা চেনা গলায় যেন কে ডাকিল। ফিরিয়া দেখিলাম, একটী বৃদ্ধা আমার মুখপানে চাহিয়া আছে। বলিল "তুমি ত নারাণ বাবুর ছেলে।" আমি বলিলাম যে আপনি কে আমি চিনিতে পারিতেছি না। বলিল—আমার পরিচয় জানিয়া লাভ নাই। তবে পাড়ার এত detailed প্রশ্ন করিল ও ভুতির বাড়ীর প্রত্যেক লোকের খবর এত খুঁটি-নাটী করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে আমার সন্দেহ উদ্রিক্ত করিল। তার পর যখন বলিলাম যে ভুতি মারা গিয়াছে; খাঁদা মারা গিয়াছে, তখন কাঁদিয়া ফেলিল—স্বীকার করিল যে সে মানি! তাহার পর আরও দশবৎসর কাটিয়া গিয়াছে; মানির খবর কেহ জানে না। আত্মীয়স্বজনেরাও জানে না। Indian Evidence Act অনুযায়ী মানিকে মৃতা ধরিয়া লইতে পারা যায়। স্বাভাবিক কারণেও মানি এতদিনে মরিয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা অনুমানও করিতে পারি। আজ এই পর্য্যন্ত।

আমার মাতাপিতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দরিদ্র পূজারী যেমন বড় বড় দেবতা অপেক্ষা তাহার গৃহ দেবতার কথা বলিতে ও মহিমা প্রচার করিতে উল্লসিত হয়, আমিও আমার মাতা পিতার কথা বলিতে আনন্দ পাই। সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা আমার এ দৌর্ব্বল্য ক্ষমা করিবেন।

আমার মাতা ঠাকুরাণী তাঁহার পিতার প্রথমা কন্যা এবং অত্যন্ত আদরিণী ছিলেন। এগারো বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, খুব সমারোহের সহিত। আমার বাবার বয়স তখন একুশ বৎসর। বাবার যখন তিন বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতা এবং যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন তাঁহার মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন। অল্প বয়সেই তিনি সব ল্যাটা চুকাইয়াছেন। তাঁহার মাসিমা-দ্বয় তাঁহাকে মানুষ করেন। শুনিতে পাই আমার পিতা-মহী ঠাক্‌রুণ তাঁহার ভাবী পুত্রবধূর জন্য তাঁহার সমস্ত গহনাপত্র, সাজানো পুতুলের বাক্স, এমন কি খেলিবার শাঁখের ঘুটিং ও কড়ি রাখিয়া যান। মৃত্যুকালে বলিয়া যান যেন এসব তাঁহার ভাবী পুত্রবধূ পান। পাঁচ বৎসরের পুত্রের জন্য এ চিন্তা অভাবনীয় আনন্দজনক বটে। আমার মাতাঠাকুরাণী তাঁহার শাশুড়ী দত্ত গহনা গাঁটী পাইয়া-ছিলেন কিনা ঠিক জানিনা, তবে সাজানো পুতুল বাক্স ও

কড়ি, ঘুটিং পাইয়াছিলেন। আমার জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত তাহা ছিল—সেগুলির প্রতি মাতৃদেবীর এতই মমতা।

আমার মায়ের রূপসী বলিয়া যেমন খ্যাতি ছিল, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী বলিয়া ততোধিক খ্যাতি ছিল। সর্ব্বদা দেবকার্য্যে ও গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহের অবিশ্রান্ত সেবা শুশ্রূষা করিয়া তিনি বহু আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সমভাবে মা ব্রতাদি পালন করিতেন। তাঁহাকে ভক্তিমতী ও পুণ্যময়ী বলিয়া সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করিতেন। প্রতিদিন তুলসীতলে এমনভাবে প্রণাম করিতেন যে মনে হইত প্রত্যেক প্রণাম শ্রীভগবানের চরণে গিয়া পড়িতেছে—রাঙা চরণ আরো রাঙা হইয়া উঠিতেছে।

মায়ের হৃদয় বড় কোমল ছিল, তিনি আত্মীয় পরিজনের সামান্য অসুখ বিসুখে কাতর হইতেন। গ্রামের কাহারো কোনো দুঃখে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তাঁর ভগ্নীদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল অসাধারণ—তাঁহার এক ভগ্নী বিধবা হইলে তিনি একমাস শয্যাশায়ী ছিলেন—জননী ও ভগিনীর সহিত সর্ব্বদা রোদন করিতেন। বাড়ীর গৃহ-পালিত পশুপক্ষীর জন্য তাঁহার যত্নের সীমা ছিল না। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিয়োগে তিনি একবৎসর পাগলিনীর ন্যায় থাকিতেন। তাঁর এই ভাব দেখিয়া আমি ভীত হইতাম এবং মনে মনে ভগবানকে বলিতাম আমার মা, 'যেন আমি মারা যাবার আগে মারা যান। তাঁকে এমন নিদারুণ ব্যথা দিয়ে গেলে স্বর্গেও আমি শান্তি পাব না।'

মা দীর্ঘকাল বাবার কাছে কাশ্মীরে ছিলেন—জম্মু ও কাশ্মীরের প্রত্যেক বাঙ্গালী ও সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করিত। পরকে তিনি এমন ভাবে আপন করিয়া লইতে পারিতেন যে জম্মু কাশ্মীরের সব বাঙ্গালী ও কয়েকঘর সেই দেশীয় লোক আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইয়া গিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের নিকট অনুরূপ ব্যবহার পাইয়া আসিতেছি। কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর বীরেন্দ্রবাবু, সান্যাল মহাশয়, লালা শঙ্করলাল প্রভৃতির নাম তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধক পাগল হরনাথ বাবাকে 'দাদা' বলিতেন। আমরা সকলেই তাঁহার অজস্র আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

মা আমাকে খুব শাসনে রাখিতেন, তাঁকেই খুব ভয় করিতাম। তিনি অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন, আত্মীয় প্রভৃতির নিকট কোনো কিছু সামান্য জিনিষ লইলেও তাহা ফেরৎ দেওয়ার একটা নিষ্ঠা ছিল—ভুল হইবার উপায় ছিল না। তাঁহার গোপন দান অনেক ছিল।

আমার শৈশবে একটী ঘটনা মনে পড়ে—একজন পশ্চিমার আমাদের নিকট দুই টাকা পাওনা ছিল—সে হঠাৎ মারা যায়, সে টাকা পরিশোধ করার কোনো উপায় রহিল না। মা অতিশয় চিন্তিত হইলেন—খোঁজ করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের ঠিকানা পাওয়া গেল না। দুই তিন জায়গায় চিঠিও লেখা হইল, কিন্তু কোনো উত্তর আসিল না। মা একজন দুঃস্থ পশ্চিমাকে দুই টাকা দিলেন,—একটী দেবালয়ে দুই টাকা উহার ঋণ শোধ করিয়া দিলেন তবুও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। একবার একটী লোক আসিয়া বলিল তাহার বাড়ী নাগপুর এবং সেই পশ্চিমার আত্মীয়। মা তাঁকে দুটী টাকা দিয়া ঋণ মুক্ত হইলেন।

মা একবার জম্মু যাইবেন—সেখানকার একটী বাঙ্গালী নাম রায় সাহেব ললিতকুমার সপরিবারে জম্মু ফিরিতেছেন, তাঁর সঙ্গেই যাওয়া ঠিক হইল—তিনি আমায় লিখিলেন—আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা আছে—টিকিট করিতে হইবে না বর্দ্ধমানে তুলিয়া দিবেন। মা বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গিয়াই প্রথমে আমাকে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিতে বলিলেন—আনিয়া দিলে মা সেটা খুঁটে বাঁধিয়া আমাকে বলিলেন—'তিনি সঙ্গে লইয়া যাইবেন এই যথেষ্ট। তাঁদের টিকিটে আমি যাইব না।'

পাঞ্জাব মেল আসিলে মাতাঠাকুরাণীকে কামরায় উঠাইয়া দিলাম। টিকিট করা হইয়াছে শুনিয়া ললিতবাবু বলিলেন—"অনেকগুলা টাকা অনর্থক ব্যয় করিলেন।"

মাকে আমি যেমন ভয় করিতাম তেমন ভক্তি করিতাম। তাহাতে আমি জগজ্জননীর ছায়া দেখিতাম তাই লিখিয়াছিলাম—

মাগো আমার পুণ্যময়ি, তুমিই আমার জগন্মাতা,
জনম জনম পেলাম তোমার এই করুণা, এই মমতা।
গুল্ম হয়ে বসুন্ধরে শুল্ক তোমার টেনেছি গো,
পূর্ণিমা তোর সুধার আদর চকোর হয়ে জেনেছি গো।

পক্ষিণী মা বুঝতে পারি এই বুকেতে তা দিয়েছ,
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি জনম জনম যা দিয়েছ।
বৎস হয়ে শ্যামলী তোর সাথে সাথে ছুটেছিলাম,
হরিণ শিশু তোমার সাথে কোথায় তৃণ খুঁটেছিলাম।
তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী, তুমি আমার ডাকিনী মা,
উষ্ণতা এই রক্তে দিলে দুগ্ধ তোমার বাঘিনী মা।
শবরী মা, আঁচল দিয়ে বুকে আমায় বেঁধেছ গো,
দুঃখিনী মা আমায় নিয়ে ভিক্ মাগিয়া কেঁদেছ গো।
দোলনাতে মা জনম জনম তুমিই আমায় দোল দিয়েছ,
আমি যখন কুসুম কোরক লতা হয়ে কোল দিয়েছ।
আমার লাগি প্রাসাদ রচি আপনি থাকো শ্মশানে মা,
চণ্ডী হয়ে আমার লাগি তুমিই ছোটো শ্মশানে মা।
তোমার ডাকে চাঁদ আমারে টিপ্ দিয়ে যায় বরণ করি,
সাঁজের প্রদীপ লয় মা আমার 'আলাই' 'বালাই'
হরণ করি।

জনম জনম মা হয়েছ, জনম জনম হবেও মা
ডাকবে আমায় শুন্য তোমার, তোমার কাজল,
তোমার চুমা।

মাতাঠাকুরানী যখনই কাশ্মীর হইতে আসিতেন আমি বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গিয়া গোটা দিন রাত অপেক্ষা করিতাম। মা বাবার আগমনে ষ্টেশন যেন নব শোভা ধারণ করিত—তাই একটী কবিতায় লিখিয়াছিলাম।—

সে দিন এমনি শরৎ প্রভাত, স্মরণ হতেছে বেশ,
প্লাট ফর্ম্মেতে আসিয়া দাঁড়ালো ডেরাডুন একসপ্রেস।
নামিলেন মোর জনক জননী বহু বর্ষের পর,
দেবতা আসিয়া উজল করিল শূন্য আমার ঘর।
উল্লাসে সব পোঁটলা পুঁটুলী নামাইতে যাই ভুলি,
শুধু বারবার আমি তাঁহাদের লই চরণের ধূলি।
এনেছেন আহা কতই দ্রব্য—অতরল স্নেহরাশি,
বর্দ্ধমানের ষ্টেশনটী বড্ডই ভালবাসি।

একটী বেলা যে কাটায়েছি ওই ওভারব্রিজের ছায়,
পঞ্চবটীর বনেই পেয়েছি আমার অযোধ্যায়।
কৈলাস মোর নামিয়া এসেছে রেলের এ প্রাঙ্গণে,
আমার কমলে কামিনী উদয় হেথায় শুভক্ষণে।
ক্ষণিকের এই পূজা মণ্ডপ—আজ মনে পড়ে সব
অনন্ত সেই আনন্দমেলা—বোধনের উৎসব।
এই ঠাঁই মোর মাতৃতীর্থ—এই ঠাঁই মোর কাশী,
বর্দ্ধমানের ষ্টেশনটী বড্ডই ভালবাসি।

আজিকে আমি যে আশ্রয়হীন মাতৃ-পিতৃহারা,
কাতর কণ্ঠে মা বলিয়া ডাকি—আর ত পাইনে সাড়া।
আসে যায় ট্রেণ ব্যাকুল নয়নে তেমনি তাকায়ে থাকি,
হয় ত হেরিব সে পুণ্যছবি—স্নেহ ছল ছল আঁখি।
জ্ঞান ত এখন অনেক বেড়েছে—বেড়েছে বয়ঃক্রম,
এখানে এলেই ছেলে হয়ে যাই—করি যে তেমনি ভ্রম।
দেখিয়া হাসেন মাতা পিতা মোর—আজিকে স্বর্গবাসী
বর্দ্ধমানের ষ্টেশনটী বড্ডই ভালবাসি।

মা আমার বহু তীর্থ করিয়াছেন। বাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুর্গম 'অমরনাথ'ও দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কত দেবতার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য যে তিনি আমার ও আমার পত্নীর জন্য পাঠাইতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জপ, তপ ও পাঠ করিতে তাঁহার বহু সময় লাগিত। শ্রীশ্রী৺মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা তিনি প্রতি শনি মঙ্গলবার পাঠ করিতেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'জয়মঙ্গলবার' ব্রত অতীব নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত পালন করিতেন।

১৩৪২ সালের ৯ই পৌষ 'বড় দিনে'র দিন সত্তর বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন—তাঁহার শেষ চিঠি ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার পাই—তাই লিখিয়াছিলাম।

চিঠিখানি মায়ের হাতের লেখা
শুক্রবারে পেয়েছিলাম কবে,
গভীর স্নেহ অমৃতের সে রেখা
ভাবি নাই ত শেষ চিঠি যে হবে।

২

বুড়া খোকার তৃষিত এই মুখে
মায়ের বুকের শেষ দুধের এ ধার,

শেষের কাজল জলভরা এই চোখে,
এ জনমে মিলবে না ত আর।

৩

পরের কাছে মূল্য ইহার নাই,
অমূল্য এ আমিই শুধু জানি,
বাৎসল্যের সাম্রাজ্যের এ-ভাই
মায়ের দেওয়া দানপত্র খানি।

৪

দুধ সাগরের মানচিত্র এ গোটা
শেষ আশীষের দূর্ব্বা এবং ধান,
ললাটে শেষ দই-হলুদের ফোঁটা
মায়ের লেখা শেষ চিঠি এইখান।

আমার বাবা ছিলেন উদাসীন, সরল সবল প্রকৃতির লোক। হৃদয় কোমল হইলেও—বাহিরে একটা কঠিন আবরণ ছিল। দুর্ব্বলতাকে পছন্দ করিতেন না। কীর্ত্তন গান শুনিতেন না, হরিনাম সংকীর্ত্তন ভালবাসিতেন। সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন—প্রতিদিন নিয়মিত শিবপূজা করিতেন। ভক্তির বহিঃপ্রকাশ একেবারেই ছিল না। বাড়ী তাঁহার শ্রীখণ্ডে, কিন্তু বৈষ্ণবতার বড় ধার ধারিতেন না। সঙ্গীত শুনিয়া কখনো তাঁহার চক্ষে জল দেখি নাই—কেবল একবার একজন বাজিকর নীলকণ্ঠের "হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার"—এই গানটী সুমধুর স্বরে গান করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেছিল—যখন সে বার বার ফেরতা দিয়া—"ওই বদন ভরা মা কথাটির তুল্য কথা নাই হে আর।" তখনি দেখিয়াছিলাম তিনি চক্ষের জল চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর বয়সেই ত তাঁর 'মা' বলা শেষ হইয়াছিল—তবুও কি টান, কি ব্যথা!

বাবা ইংরাজী, হিন্দি, উর্দ্দু, পুস্ত খুব ভাল জানিতেন এবং মাতৃভাষার ন্যায় বলিতে পারিতেন। তিনি সুদীর্ঘকাল কাশ্মীর রাজষ্টেটে কাজ করিয়া সুপারিনটেনডেণ্ট হইয়াছিলেন। কাজে তাঁহার খুব সুনাম ছিল, স্পেশাল পেনসেন পাইয়াছিলেন। তিনি তামাক সর্ব্বদা খাইতেন—গয়া কাশীর উৎকৃষ্ট তামাক সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত। আমি যত বার তামাক কিনিয়া আনিয়াছি বিষম ঠকিয়াছি—বিক্রেতারা অনধিকারী জানিয়া নকল ও খেলো জিনিষ দিয়া সেরা জিনিষের দাম লইত। আমি তামাক খাই না শুনিয়া বাবার জনৈক বন্ধু বলিয়াছিলেন—'তোমার বাবা যে তামাক খান, তাহার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তোমাদের তিন পুরুষ কাটিয়া যাইবে।'

বাবা কবিতা লিখিতেন, তাঁহার 'কাশ্মীর' নামক একটী সুন্দর কবিতার চার লাইন আমার মনে আছে—

"স্বর্ণলঙ্কা জনশ্রুতি সোনার প্রাচীর
স্বচক্ষে দেখিনু শীতে রজত কাশ্মীর।
কোথা শোভা মনোলোভা ব্রহ্মাণ্ড মাঝার
মরুভূমি—জন্মভূমি—সৌন্দর্য্য আগার।"

তিনি দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। ভগবানে তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল—লিখিয়াছিলেন—

চরণে মিনতি—এই করো দয়াময়।
যেন প্রাচীন বয়সে উপেক্ষি' শুশ্রূষা
সহজ মরণ হয়।

হইয়াছিলও তাহাই। তিনি ১৩৪৪ সালে দশহরার দিন রাত্রি ৯টায় হঠাৎ হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া বিরাশি বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁহার দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি মাতৃদেবীকে হারাই। মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—'ছেলেকে বলো আমি চল্লাম—সে ঘরে আমার সহোদরা ও অন্যান্য বহুলোক ছিলেন—হতভাগ্য আমিই তখন উপস্থিত ছিলাম না।

মাতাঠাকুরাণী সব ব্রতকথার শেষে প্রায়ই বলিতেন—এ ব্রত যে করে, ব্রতকথা যে শোনে, সংসারে দীর্ঘকাল অতুল সুখ ভোগ করে—অন্তিমে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে রথ এসে তাঁদিকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়।" বাবার যন্ত্রণাহীন মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর উজ্জ্বল দেহ ও সহাস্য মুখ দেখিয়া রথে করিয়া স্বর্গে যাওয়ার কথাই মনে হইয়াছিল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এদিকে যাঁহারা গ্রেপ্তার হইলেন, তাঁহাদের লইয়াই বিচারপর্ব্ব সুরু করার ব্যবস্থা হইল। **Chittagong Armoury Raid Ordinance** নামে গভর্ণমেণ্ট এক আইন জারি করিলেন। চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ ইউনিকে চেয়ারম্যান করিয়া রায় বাহাদুর ডি. পি. ঘোষ (১৩-১০-৩০ তারিখ হইতে ইঁহার পরিবর্ত্তে রায় নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বাহাদুর) ও খান বাহাদুর মৌলভী আব্দুল হাই-কে লইয়া গঠিত হইল একটি স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যাল। বিচার আরম্ভ হইল—১৯৩০ সালের ২৪শে জুলাই তারিখ হইতে। চন্দননগর হইতে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতিকে তখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই, সুতরাং তখন কেবলমাত্র অনন্ত সিংহ ও অন্যান্য ধৃত বিপ্লবীদেরই বিচার আরম্ভ হইল। ইহার কিছুদিন পরে যখন চন্দননগর হইতে অপর কয়জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হইল, তখন তাঁহাদিগকে চট্টগ্রামে লইয়া গিয়া ধৃত অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত একত্র করিয়া আবার নূতন করিয়া বিচারকার্য্য আরম্ভ করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় জন ত্রিশ বিপ্লবী তখনকার মত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় অভিযুক্ত হইলেন। সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি বহু বিপ্লবীর নামই তখনও কিন্তু ফেরারি আসামীর নামের তালিকাতেই রহিয়া গেল।

আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, সন্তোষকুমার বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অখিলচন্দ্র দত্ত, কামিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবিগণ। পূর্ব্বে যাঁহারা স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই বিচার চলিবার সময় উহা প্রত্যাহার করিলেন। এই ঐতিহাসিক মামলার বিচার দেখিবার জন্য আদালতে এবং আদালতের বাহিরে প্রত্যহ বহু জনসমাগম হইত। মামলার শুনানীর সময় মধ্যে মধ্যে আসামীগণ এবং বিচারক অথবা সরকারী উকীলের মধ্যে এরূপ তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হইত যে পুলিশকেও কখনও কখনও শান্তিস্থাপন কল্পে আহ্বান করিতে হইত। বিপ্লবীদের সঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করা হইলে তাঁহারা ভীষণ হট্টগোল সুরু করিতেন—যাহার দ্বারা বিচারকার্য্য পরিচালনা মোটেই সম্ভব হইত না। হয়তো বা কখনও তাঁহারা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে থাকিতেন—অথবা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির সহিত নানাবিধ শ্লোগান দিতে থাকিতেন। একদিন পাবলিক প্রসিকিউটর অভিযুক্ত বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অপমানজনক মন্তব্য করায় লোকনাথ তাঁহাকে সেই উক্তি প্রত্যাহার করিতে বলিলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর তাহা না করায় লোকনাথ বজ্রকণ্ঠে উহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান মিঃ ইউনি পর্য্যন্ত তাঁহাকে থামিতে বলিলেও তিনি নিরস্ত হইলেন না।

অগত্যা নিরুপায় মিঃ ইউনি ইংরাজ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ স্যুটারকে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং আদালতের আদেশ পাইয়া মিঃ স্যুটার আরও কয়েকজন সার্জ্জেণ্টকে সঙ্গে লইয়া লোকনাথকে শায়েস্তা করিবার জন্য আসামীদের কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলেন। উত্তেজিত পুলিশ কর্ম্মচারিগণ লোকনাথের দিকে অগ্রসর হইতেই অন্যান্য বিপ্লবীগণও গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সঙ্কট এইরূপ ঘনাইয়া উঠিল যে, যে কোন মুহূর্ত্তে একটা ভয়ঙ্কর কিছু সংঘটিত হইবার আশঙ্কা হইতে লাগিল। বিপ্লবীদের ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে লাগিল যে, পুলিশ কর্ম্মচারিগণ লোকনাথের কেশাগ্র স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা একযোগে তাঁহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করিবেন।

ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মিঃ ইউনি তখন মিঃ স্যুটারকে সঙ্গিগণসহ বাহির হইয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এইভাবেই ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটিল। বিপ্লবীরা বিজয়োল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

একদিকে যখন এইভাবে বিচারকার্য্যপরিচালিত হইতেছে, তখন নেতা সূর্য্য সেন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। পলায়িত অবস্থায় যে সকল বিপ্লবী তখনও জেলের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই সাহায্যে তিনি বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ চালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে বাংলার তৎকালীন ইন্‌সপেক্টর জেনারল অফ পুলিশ মিঃ ক্রেগ ১লা ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন পথে চাঁদপুরে ট্রেণ হইতে ষ্টীমারে আরোহণ করিবেন। পুলিশের বড় কর্ত্তাকে এই সুযোগে হত্যা করিবার লোভ চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নিকট দুর্ণিবার হইয়া উঠিল এবং এই কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্ত্তী।

১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর শেষ রাত্রে চট্টগ্রাম মেলে মিঃ ক্রেগের চাঁদপুরে পৌছাইবার কথা এবং তাঁহার মত একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী যে ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরাতেই ভ্রমণ করিবেন—তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। ট্রেণখানি আগমন করিলে চাঁদপুরের ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামকৃষ্ণ ও কালীপদ ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলির মধ্যে মিঃ ক্রেগকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহারা একখানি কামরার মধ্যে ফর্সা ও লম্বা চেহারার সাহেবী পোষাকে সজ্জিত জনৈক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিলেন। দেখিয়াই তাঁহাদের মনে হইল যে ঐ ব্যক্তিটিই নিশ্চয় মিঃ ক্রেগ হইবেন। মনে হওয়া মাত্রই তাঁহারা সেই লোকটির উপরই বর্ষণ

করিলেন রিভলবারের গুলি এবং নিমেষ মধ্যে স্থানত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আততায়ীদিগকে ঘটনাস্থলেই ধৃত করা সম্ভব হইল না।

যাঁহার উপর এইভাবে গুলি বর্ষিত হইল, তিনি কিন্তু আসলে মিঃ ক্রেগ্ নহেন—তিনি ছিলেন ইন্‌সপেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায়। মিঃ ক্রেগের রক্ষী হিসাবে তাঁহার চাঁদপুর পর্য্যন্ত আসিবার কথা ছিল। মিঃ ক্রেগ্ ভ্রমে বিপ্লবীরা কিন্তু তাঁহারই উপর গুলি চালাইলেন। গুলিবিদ্ধ হইয়া তারিণী মুখোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে সমগ্র চাঁদপুর ষ্টেশন সহসা অতিশয় চঞ্চল ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। চাঁদপুরের পুলিশ ঘাঁটিতে এবং আশ-পাশের অন্যান্য বড় বড় সহরগুলিতে অতি দ্রুত এই সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। চাঁদপুর সহর হইতে যে সকল রাস্তা বিভিন্ন দিকে গিয়াছে—পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিল সেই পথগুলির উপর।

চাঁদপুর হইতে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে মেহের কালীবাড়ী নামক ষ্টেসন। সেই ষ্টেসনের নিকট পৌছিয়া ক্লান্ত রামকৃষ্ণ ও কালীপদ যখন একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বি, সি, দাশগুপ্ত তাঁহার দলবল লইয়া মোটরে করিয়া সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। দুইজনকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহাদের সন্দেহ হইল এবং তাঁহারা রামকৃষ্ণ ও কালীপদর দিকে অগ্রসর হইলে তাঁহারাও পলায়নের চেষ্টা করিলেন। পুলিশের দলটিতে বহু লোক থাকায় পলায়ন করা তাঁহাদের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। রামকৃষ্ণ ও কালীপদ উভয়েই ধৃত হইলেন। তাঁহাদের শরীর তল্লাস করিয়া যে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়—চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হইতেই তাহা লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

আলিপুরের স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে মিঃ গার্লিক, মিঃ এন, কে, বসু ও খান আদিলজুমান চৌধুরীর নিকট ১৯৩১ সালের ৩রা জানুয়ারি হইতে রামকৃষ্ণ ও কালীপদর বিচার আরম্ভ হয়। বিচার শেষে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং বয়স অল্প বিধায় কালীপদ চক্রবর্ত্তীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল। রামকৃষ্ণ ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন মেধাবী ছাত্র। চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের তিনি ছিলেন একজন প্রধান কর্ম্মী। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্ব্বে বোমা তৈয়ারী কার্য্যে লিপ্ত থাকাকালে একবার তাঁহার গুরুতররূপে আহত হওয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভাবে তাঁহার ফাঁসি হইয়া যাওয়ায় বিপ্লবী দলটির খুবই ক্ষতি হইল।

বিপ্লবীদিগের কার্য্যকলাপ কিন্তু চলিতেই লাগিল। বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদার ও বীরেন্দ্র দে-র অনুসরণরত থাকাকালে ১৯৩১ সালের ১৬ই মার্চ্চ বরমা নামক স্থানে পুলিশ ইন্‌সপেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্য তারকেশ্বরের নিক্ষিপ্ত রিভলবারের গুলিতে আহত হইলেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা উপলক্ষে যে সকল বিপ্লবী জেলখানার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত বাহিরের বিপ্লবীদের শীঘ্রই যোগাযোগ স্থাপিত হইল। বিচারাধীন বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ইহার পর আরম্ভ হইল এক ব্যাপক ষড়্‌যন্ত্র। বন্দিগণকে মুক্ত করিবার দুইটি উপায় ছিল। যখন তাঁহাদিগকে বিচারার্থ কোর্টে হাজির করা হইত, তখন সুবিধামত কোনও এক সময় বিস্ফোরণ ও ধ্বংস কার্য্য ঘটাইয়া আগ্নেয়াস্ত্র সহ রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করার সম্ভাবনা ছিল; অথবা জেলখানার অভ্যন্তরে বিস্ফোরক পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রেরণ করিয়া উহার সাহায্যে জেলখানার অংশ বিশেষ উড়াইয়া দিয়া বিপ্লবীদিগের পলায়নের পথ প্রশস্ত করা যাইত। দুইটি পরিকল্পনা লইয়াই কার্য্য সুরু হইল এবং ইহার মূলে রহিলেন নেতা সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি। আদালত-গৃহের প্রবেশ পথের নিকট ডিনামাইট স্থাপনের ব্যবস্থা হইল; কিন্তু বিপ্লবীদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ষড়্‌যন্ত্রটি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না—অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। ১৯৩১ সালের ২রা জুন আদালত-গৃহের নিকটে অতি প্রত্যূষে বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ একটি আধারসহ একটি বালক সন্দেহবশে ধৃত হইল। ইহার পর পুলিশ ষড়্‌যন্ত্রের আভাষ পাইয়া তল্লাসী চালাইল বহু স্থানে এবং তাহার ফলে উদ্ধার করিল বৈদ্যুতিক তার, বাল্‌ব, বিস্ফোরক দ্রব্যপূর্ণ আধার প্রভৃতি। আদালতগৃহ এবং গোয়েন্দা পুলিশের কার্য্যালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে মারাত্মক রকমের বিস্ফোরকদ্রব্যপূর্ণ আধার আবিষ্কৃত হয়। এই উপলক্ষে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া যে মামলা রুজু হয়, তাহাই ডিনামাইট ষড়্‌যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত।

ডিনামাইট ষড়্‌যন্ত্র মামলাতে আসামী ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর গুহ, অনিল রক্ষিত, নিবারণ ঘোষ, রবীন্দ্র সেন, সুশীল সেন, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় এবং অপূর্ব্ব সেন। ১৯৩১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর এই মামলার যে রায় প্রদত্ত হয় তাহাতে অর্দ্ধেন্দু, নিবারণ ও রবীন্দ্রের প্রতি তিন বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডের আদেশ হয় এবং সুশীল ও প্রফুল্লের কারাদণ্ড হয় দুই বৎসর হিসাবে। অনিল রক্ষিতও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অপূর্ব্ব সেন কিন্তু পলাতক হইয়া রহিলেন।

উপরোক্ত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হইয়া গেলেও বিপ্লবীরা মোটেই হতাশ হইলেন না। অসীম অধ্যবসায় ও সতর্কতা সহকারে তাঁহারা অপর পরিকল্পনাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জেলখানার ভিতর হইতে উহার অংশ বিশেষ বিস্ফোরণ ঘটাইয়া উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। জেলখানার মধ্যে তখন কঠোর সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। সেই ব্যবস্থাকে এড়াইয়া জেলখানার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না, কিন্তু অন্যে যাহা কল্পনাও করিতে পারে না—তাহাই বাস্তবে রূপায়িত করা চট্টগ্রামের বিপ্লবীগণের বৈশিষ্ট্য। তাই এই অসম্ভবও সম্ভব হইল। কুশলী নেতা সূর্য্য সেনের পরিচালনায় বিপ্লবীরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং জেলখানার কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিবার জন্য উহা ব্যয়ও করিতে লাগিলেন অকাতরে। বহু কর্ম্মচারীকে

এই ভাবে গোপনে বশীভূত করিয়া অতি সন্তর্পণে ও সাবধানতার সহিত বিবিধ দ্রব্য সম্ভার জেলখানার মধ্যে বিপ্লবীদিগের নিকট চালান যাইতে লাগিল; কিন্তু ভবিতব্যকে কে খণ্ডন করিবে? তাই সফলতার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াও এই পরিকল্পনাটিও শেষ পর্য্যন্ত বানচাল হইয়া গেল।

১৯৩১ সালের জুন মাসেরই শেষাশেষি। জেলখানার কয়েদীদের প্রকোষ্ঠেরই সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের সংস্কার কার্য্য চলিতেছিল। অল্প মৃত্তিকা খননের পরই সহসা মাটির তলা হইতে একটি ইলেকট্রিক বাল্‌ব পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন এবং সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ জেলখানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জানান হইল। সন্দেহ সকলেরই দৃঢ় হইয়া উঠিল। অতিশয় সাবধানতার সহিত আরও মৃত্তিকা খনন করিয়া যাহা পাওয়া যাইতে লাগিল—তাহাতে সকলেই হতবাক্ হইয়া গেলেন। মাটির তলা হইতে বাহির হইতে লাগিল ছোরা, তরবারি ও আগ্নেয়াস্ত্র—ইলেকট্রিক তার, বাল্‌ব ও বিস্ফোরক দ্রব্য। ষড়যন্ত্রটি মধ্যপথেই এই ভাবে নষ্ট হইয়া গেল এবং কড়াকড়ির ব্যবস্থা আরও ভালভাবেই করা হইল।

পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার চট্টগ্রামের অধিবাসীদিগের উপর চলিতেছিল সমানেই। এক দণ্ডও জনসাধারণের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার উপায় ছিল না। খানাতল্লাসী, অত্যাচার ও গ্রেপ্তারে তাহাদের জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছিল। এই পীড়নের প্রতিবাদকল্পে এইবার ফেরারি বিপ্লবিগণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

খান বাহাদুর আসানুল্লা ছিলেন তৎকালে চট্টগ্রামের গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কিত ব্যাপারের তদন্তকার্য্যে তিনি ছিলেন গভীরভাবে লিপ্ত। চট্টগ্রামে বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁহার দক্ষতা নেহাৎ কম ছিল না। বিপ্লবীদের ক্রোধ এইবার তাঁহার উপর গিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার সুযোগ তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুযোগও শীঘ্রই মিলিল। ১৯৩১ সালের ৩০শে অক্টোবর নিজাম পল্টনস্থ খেলার মাঠে চট্টগ্রামের ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠান এবং সেই উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণের দিন ধার্য্য হয়। বিপ্লবীরা স্থির করিলেন যে ঐ দিবসেই আসানুল্লা সাহেবের জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিতে হইবে। এই গুরু দায়িত্বের ভার অর্পিত হইল হরিপদ ভট্টাচার্য্য নামক একটি তরুণ বালকের উপর। হরিপদর সহিত সূর্য্য সেনের মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল। হরিপদ ছিলেন একটি টোলের ছাত্র।

ফুটবলের ফাইন্যাল খেলার দিন চট্টগ্রামের প্রায় সকল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীই খেলার মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পাহারা দিবার জন্য সেদিন পুলিশ ও মিলিটারির ব্যবস্থাও খেলার মাঠে রীতিমতই হইয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালক হরিপদ আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

খেলা শেষ হইয়া গেল—পুরস্কার বিতরণও নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সমবেত দর্শকবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা একে একে তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। খান বাহাদুর আসানুল্লাও খেলার মাঠ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং গেটের নিকট কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত দাঁড়াইয়া আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিকটেই গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় সহসা উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলিবর্ষণের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আসানুল্লা সাহেব রক্তাক্ত কলেবরে মাটির উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সঙ্গের রক্ষীরা সেই হট্টগোলের মধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্রসহ হরিপদকে ধরিয়া ফেলিল। কেবল মাত্র তাঁহাকে ধরিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইল না—প্রহার করিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিল। আসানুল্লা সাহেবের শবদেহ এবং হরিপদকে লইয়া ইহার পর পুলিশ স্থান ত্যাগ করিল।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন—তাহা যেন সীমা ছাড়াইয়া গেল। শাসন ক্ষমতা যাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত, তাঁহাদেরই দ্বারা যে এইরূপ নিষ্ঠুর নারকীয় উৎপীড়ন সম্ভব হইতে পারে, চট্টগ্রামের তৎকালীন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ না করিলে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনী চট্টগ্রামের প্রতিটি গৃহস্থের বাটীতে বিভীষিকার ছায়াপাত করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল ধ্বংস ও লুণ্ঠনকার্য্য। কেবলমাত্র তাহাই নহে। আসানুল্লা সাহেবের হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকতারও সৃষ্টি করা হইল এবং পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনীর সহিত একদল গুণ্ডাও অবাধে লুঠতরাজ ও খুন-জখম করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার হাত হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই রেহাই পাইল না।

আর কিশোর হরিপদ? তাঁহাকে লইয়া পুলিশ কি করিল? পুলিশের নারকীয় নিষ্ঠুরতার যত রকমের প্রক্রিয়া থাকিতে পারে, তাহা সমুদয়ই বালক হরিপদর উপর প্রযুক্ত হইতে লাগিল। হরিপদর কার্য্যের পশ্চাতে যে সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেনের পরিকল্পনা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইল না; সুতরাং তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থান, পরবর্ত্তী পরিকল্পনা এবং তাঁহাদের দলটির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের আশায় হরিপদর উপর বিবিধ প্রকারের নির্য্যাতন চালান হইতে লাগিল। তাঁহার অঙ্গুলীর নখের পার্শ্বে সূচ ফুটান হইতে লাগিল, চার্জ্জ দেওয়া হইতে লাগিল ইলেকট্রিক ব্যাটারির—আবার আদর্শ শাস্তির নমুনা দেখাইয়া জনসাধারণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিবার জন্য এক বিরাট পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী হরিপদকে লইয়া প্রহার করিতে করিতে পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহার ফলে কখনও বা হয়তো তাঁহার চক্ষু, মুখ অথবা নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকে—আবার কখনও বা প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফুলিয়া উঠে। সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে; কিন্তু হরিপদ কি এই অত্যাচারের নিকট নতি স্বীকার করিলেন? এত

নির্য্যাতন চালাইয়াও কি পুলিশ তাঁহার নিকট হইতে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে একটি কথাও আদায় করিতে পারিল? তাহা পারিল না। একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার চরম ও পরম বিকাশ সেদিন দেশবাসী হরিপদর মধ্যে দেখিয়া ধন্য হইল। সমস্ত অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যেও তিনি রহিলেন—একইভাবে দৃঢ়, নির্ভীক ও অনমনীয়।

উপর্য্যুপরি চারিটি গুলির আঘাতে খান বাহাদুর আসানুল্লা মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে হরিপদর বিচার শেষ হইল। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন আই-সি-এস বিশেষ জুরির সাহায্যে বিচার করিয়া হরিপদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হইলে মৃত্যুদণ্ড রদ্ হইয়া হরিপদর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলটি ইতিমধ্যে আশ-পাশের কয়েকটি জেলাতেও তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিতেছিলেন। জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ-গ্রহণকারী বিনোদ দত্ত দলের নেতাদের নির্দ্দেশে কুমিল্লায় গিয়া সেখানকার বিপ্লবী দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সময় কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিসন সেখানকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্ম্মীদিগের উপর এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগের উপর দমননীতি চালাইয়া অতিশয় কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিনোদ দত্তের পরিচালনাধীন কুমিল্লার বিপ্লবী দলটি মিঃ এলিসনের প্রাণ সংহার করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর হইতে বিপ্লবীরা মিঃ এলিসনের গতিবিধির উপর নজর রাখিতে লাগিলেন। হত্যার ভার অর্পিত হইল দলের অন্যতম কর্ম্মী শৈলেশ রায়ের উপর। হত্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে একটি পথের ধারে শৈলেশ রায় রিভলবার লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে মিঃ এলিসন সাইকেলে চাপিয়া সেই স্থানে আসা মাত্র তাঁহার উপর গুলি বর্ষণ করিয়া চকিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। কাহার দ্বারা যে হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল, তাহা কেহই তখন জানিতে পারিল না। বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ আততায়ীর কোনও সন্ধান পাইল না।

সরোজ গুহ ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অন্যতম নিরুদ্দিষ্ট আসামী। চট্টগ্রাম হইতে তিনি ঢাকায় চলিয়া যান। সেখানে গিয়া তিনি রমেন ভৌমিক নামক নোয়াখালির অপর একজন বিপ্লবীর সহিত ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্ণোকে একদিন হত্যা করিবার চেষ্টা করিলেন। ঘটনার দিন অপরাহ্নকালে সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিক একটি দোকান হইতে মিঃ ডুর্ণোকে একটি মদের দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। ইহারই অল্পকাল পরে মিঃ ডুর্ণো যখন মদের বোতল লইয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বাহিরে অপেক্ষমান আপনার গাড়ীতে আরোহণ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার উপর রিভলবারের গুলি বর্ষিত হইল। মিঃ ডুর্ণো আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং আততায়ী দুইজন অতিশয় তৎপরতার সহিত মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ঢাকায় ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় ও খানাতল্লাস হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত আক্রমণকারীদের কোনও সংবাদই পুলিশ সংগ্রহ করিতে পারিল না।

এদিকে পটিয়া মহকুমার কচুয়াই গ্রামের এক গুপ্ত কেন্দ্র হইতে পুলিশ অম্বিকা চক্রবর্ত্তীকেও গ্রেপ্তার করিল। তাঁহাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তিনি পীড়িত ছিলেন। ১৯৩২ সালের ২৬শে আগষ্ট কলিকাতার মাণিকতলা ষ্ট্রীটের একটি মেস হইতে বড়তলা থানার সাব্‌ইন্‌সপেক্টর যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী হেমেন্দু ঘোষ দস্তিদারকে গ্রেপ্তার করেন। হেমেন্দুর ভ্রাতা অর্দ্ধেন্দুই জালালাবাদ যুদ্ধে আহত হইয়া পরে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। নোয়াখালি জেলার ধবলপুর গ্রামে সরোজ গুহ ধরা পড়েন। তাঁহাদের লইয়া অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বিচার আরম্ভ হয়। তাঁহাদের বিচারার্থ গঠিত স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালের কমিশনার ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ এ. ডি. উইলিয়ামস্, মিঃ এ. এফ. এম. রহমান ও শ্রীনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়। মিঃ এ. ডি. উইলিয়ামস্ এই ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

অশ্রু-অর্ঘ্য

শ্রীবীণা দেবী

নয়নের জলে অর্ঘ্য রচিনু
হে কবি তোমার আঙিনা 'পরে,
আবিলতা সব ধুয়ে গেল আজ
শ্রাবণ-সন্ধ্যা অঝোরে ঝরে!
আনি নাই ফুল, গাঁথি নাই মালা
জ্বালি নাই ধূপ, নাই দীপ জ্বালা,
ভগ্ন-হৃদয় শূন্য-ধরণী

অশ্রু-সলিলে ভরাই ডালো
তাইতো সিক্ত তোমার আঙিনা
বকুলের তলে স্মৃতির আলো।
কবিতার রসে ভরা ও হৃদয়
দিয়েছ মেলিয়া আকাশে ছুঁয়ে,—
কবি-দেহ আজ অস্ত হ'য়েছে—
কবি-প্রাণ আছে ধরণী ছুঁয়ে।

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

Rotunda হাসপাতালের ছাত্রাবাসে আমাদের জন্য দু'টী ঘর ঠিক করা হয়েছিল। সেখানকার Lady House Keeper আমাদের যথাযথ বন্দোবস্ত করে ঘরে মালপত্তর তুলে দিয়ে Breakfast পাঠিয়ে দিলেন প্লেনের গোলমালের দরুণ আমাদের পৌঁছতে একটু দেরীই হয়েছিল,

সেক্সপীয়রের সহধর্ম্মিণী এ্যান হ্যাথওয়ের গৃহ

তাই উনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন মিটিংএ যোগদান করতে। বাইরে ঝপ্ ঝপ্ বৃষ্টি পড়ছে, মেঘে ঢাকা আকাশ; আমরা আর বেড়াতে না গিয়ে ঘরেই বিশ্রাম করলাম।

সেক্সপীয়র সহধর্ম্মিণীর শয়ন কক্ষ
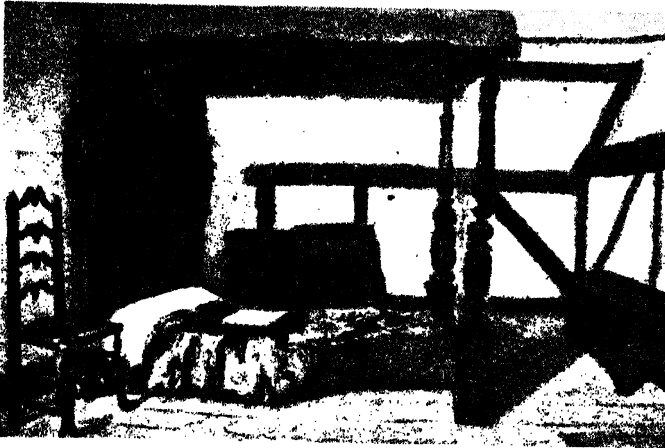
বিশ্ব বিখ্যাত Rotunda হাসপাতাল আজ ২০০ বৎসরে পদার্পণ করল, সেই উপলক্ষেই এখানে এই International Medical Congress আহ্বান করা হয়েছে। দেশবিদেশের বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক আহুত হয়ে এসেছেন। আমাদের বাড়ীটিতেও অনেক বিদেশী অতিথি আছেন এবং বাকি ঘরগুলি কলেজের ছাত্রছাত্রীতে ভরা।

আজ রাত ৯টায় ইউনিভারসিটির তরফ থেকে অতিথিদের জন্য একটি Receptionএর ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে সকলের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হল; তারপর ছবি তোলার পালা শেষ হলে ঘরে ফিরলাম।

৮ই জুলাই। সকাল ৮টায় উনি Medical Congressএ চলে গেলেন। আমার জ্বর-ভাব হওয়াতে সারাদিন ঘরেই রইলাম। Lady House Keeper আমার সেবা যত্ন খুবই করছেন। তিনি খুকুকে একলা থাকতে দেখে তাঁর অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বইএর গোছা দিয়ে বসিয়ে দিলেন।

৭ তারিখ হ'তে ১২ তারিখ অবধি এই কংগ্রেসের অধিবেশন চলল; রোজই রাতে অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য নানাস্থানে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মধ্যে আমার সব চেয়ে ভালো লাগল ১০ই তারিখে বিকেলের Garden Partyটি।

এখানে অনেকের সঙ্গেই বেশ সহজ এবং সুন্দরভাবে আলাপ পরিচয় হয়েছিল বটে, তবে আইরিশদের দেশ-প্রতীক De Valeraর কথাটাই আজ বেশী করে মনে পড়ছে।

চমৎকার লোক। ওঁর সঙ্গে অনেক কথাই তিনি বল্লেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ De Valera জিজ্ঞাসা করলেন—"সত্যই কি তোমাদের দেশে হিন্দুমুসলমানের problem খুব acute?"

উনি বল্লেন—"একটুও না। আমরা বহুবছর একসঙ্গে এক-জায়গায় বাস করছি; এ problem কখনও ওঠেনি। এটি সম্পূর্ণ manmade problem এবং তুমি আমার চেয়ে ভালো জান কারা এটা করেছে।"

De Valera শুনে বল্লেন—"ঠিক বলেছো ডাঃ মিত্তির। আমি জানি—এটা ইংরাজদের একটা প্রকৃতিগত কুটিল স্বভাব। আমরাও 'আলস্টার' নিয়ে সেইজন্য অনেক কষ্ট পাচ্ছি।"

এমন খোলাখুলিভাবে কথা বলতে লাগলেন দেখে তো আমরা অবাক্।

শেষকালটায় De Valera বললেন—"যদি পার ত হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের ভিতর একটা কিছু Common link রাখতে চেষ্টা কোরো—নইলে পরে মুস্কিল হবে। আমিও সেইজন্য ইংরাজদের সঙ্গে কিছু যোগ রেখেছি—নইলে Northern Ireland আমাদের একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

তিনি আরো বল্লেন—"গান্ধীকে Christএর মত সম্মান করতে পারি বটে, কিন্তু তাঁর policyতে কোনও দেশ স্বাধীন হ'তে বা সে নীতি Civil war বন্ধ করতে পারবে না। সেখানে হাতের জোর থাকা চাই এবং দরকার হলে সে জোর কাজেও লাগাতে হবে।"

উনি বল্লেন—মহাত্মাজী তো তার বিরোধী নন। Do or Die তাঁর নীতি। প্রয়োজন হ'লে জোর দেখাতে হবে বৈকী।

ভদ্রলোক শুধু চিন্তাশীল ভাবুক নয়, অদ্ভুত কর্ম্মীও বটে। এই মুক্তি মন্ত্রের কৃচ্ছ্র সাধকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি।

১৩ই জুলাই। আজ এখানকার India Leagueএর শুভ

রোটাণ্ডায় ইন্টারন্যাশান্যাল মিডিক্যাল কংগ্রেসের গার্ডেন পার্টি

উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতীয়গণ এক অধিবেশনের আয়োজন করেছেন; চায়ের নিমন্ত্রণে সকলকে ডাকা হয়েছে। ওঁকেই গ্রহণ করতে হল Guest in chiefএর আসন। বহু বিশিষ্ট আইরিশ ভদ্রলোক উপস্থিত হয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে একজন আইরিশ বক্তা বল্লেন যে আয়ারল্যাণ্ড দীর্ঘ সাত শত বৎসর ধরে বৃটিশের করায়ত্তে থেকে যে দুঃখ দুর্দ্দশা বহন করেছে তা অবর্ণনীয়। কিন্তু বহুকাল ধরে এই নিদারুণ দুঃখদুর্দ্দশার মধ্য দিয়ে এসেও তারা "মুক্তিপাগল ভাঙবো আগল" হয়ে স্বাধীনতার আলোক পেয়েছে। ভারতও দুই শত বৎসর এই পরাধীনতার দুঃখ ভোগ করে আসছে, কিন্তু তার মুক্তি আসন্নপ্রায়। (তখনও ভারত

রোটাণ্ডায় ইণ্ডিয়া লীগের সম্বর্দ্ধনা সভা

[স্বাধীন হয় নাই]। ভারতের ও আয়ারল্যাণ্ডের ভাগ্য যেন এক অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা।

তাঁরা সবাই ভারতের প্রতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানালেন

বহুদূরে মাঠের শেষপ্রান্ত ধরে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি প্রাচীরের মত দেশটিকে ঘিরে আছে।

চাষের ফসল ও পশুপালন গৃহস্থের শ্রীবৃদ্ধি করেছে; দেশে খাদ্যের অভাব নেই। যদিও সম্প্রতি এই যুদ্ধবিগ্রহের ফলে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হেতু অল্পবিত্তের অনটন ঘটেছে। এ দেশে শীতের প্রকোপ যেমন সারা বছর ধরে, বৃষ্টির অত্যাচারও তেমনি।

আমরা মদ তৈরীর কারখানার পাশ দিয়ে Derbyর ঘোড় দৌড়ের মাঠ পেরিয়ে সহরের অপরদিকে চললাম। কিছু দূর গিয়ে ড্রাইভার একটি বাড়ী দেখিয়ে বলল সেই বাড়ীটিতে নাকি মৃতদেহকে 'মমি'তে রূপান্তরিত করা হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মিত্রকে অভিবাদন জানাচ্ছেন

আমরা Rotundaয় ফিরে Lady House Keeperএর হিসাব চুকিয়ে বিদায় হলাম। Air Officeএর সামনে এসে দেখি আমাদের পরিচিত সেই Air Officerটি তাঁর ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে করে এসেছেন আমাদের বিমানে তুলে দিতে।

এদেশের লোকেরা যেমন অমায়িক, তেমনই ভদ্র; এদের ব্যবহারে প্রত্যেক ভারতীয়ই অতিশয় তুষ্ট। কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রদের কাছে শুনলাম যে তাদের কলেজের সহপাঠী আইরিশ বন্ধুগণ ভারতীয়দের সকল সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকে এবং তাদের কাজের সুযোগ সুবিধা ও বন্দোবস্ত করে দেয়।

এ্যাভন নদী তীরে লেখিকা ও কন্যা জয়শ্রী

বেলা ৩টের সময় Air Lingusএর বিমানখানি আকাশে উড়ল। ছোট বিমান বেশ নীচে দিয়ে চলেছে। নীচে তাকালে মনে হচ্ছে এই বুঝি গাছের ডগায় আটকে গেলাম। আমরা সাগর পেরিয়ে ইংলণ্ডের উপরে চলে এলাম। ছোট ছোট মেঘের স্তবক

১৪ই জুলাই। সকালে একটি ট্যাক্সিতে করে সহরের বাইরে বেড়াতে গেলাম। সহরের বাইরে সবুজ মাঠের দৃশ্য অতি অপূর্ব। শস্তশ্যামলা বঙ্গভূমির মতই দেশটি উর্বরা; ক্ষেতগুলি শস্যে পরিপূর্ণ।

ভেদ করে বিমান মাটির দিকে নেমে চলল। আমরা লণ্ডনের ইটরো এরোড্রমে এসে দাঁড়ালাম। তারপর আবার সেই Baileys Hotelএ গিয়ে মালপত্তর নিয়ে ওঠা।

আমাদের ঠিক ছিল আয়ারল্যাণ্ড থেকে Glasgow হয়ে Amster- ও Paris সহর দেখে লণ্ডনে ফিরব ; সেই মত টিকিট ও হোটেলের dam ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, কিন্তু এতটা ঘোরার পর আমার ও খুকুর শরীর বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার উপর আবার যাত্রার শেষ দিকটায় দেশের জন্য মনটাও বড় উন্মুখ হয়েছিল, তাই এবারকার মত ওটুকু বাদ দিয়েই সরাসরি লণ্ডনে চলে এলাম। এখানে পৌঁছে যেন একটা স্বোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললাম। জানি না কেন লণ্ডন সহরটা এবার একটু বেশীই ভালো লাগছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে এখানে Skyscraperগুলি মুক্ত আলো বাতাসের পথ রুদ্ধ করে সারি সারি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। চারিদিকের এই খোলা আলো হাওয়া যেন বিশ্রামের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

এখন ঘরমুখী মন। প্রতিদিনই উৎসুক আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে কবে স্বদেশে ফিরব। আমরা প্রায় ১০দিন এখানে রইলাম। একদিন Oxford বেড়িয়ে এলাম। খুকুর ইচ্ছায় Shakespeareএর আবাসভূমি দেখতে Avon নদীর উপকূলে Stratford সহরে আর একবার গেলাম। Shakespeareএর বাড়ীর প্রত্যেক কোনটি খুকুর জানা, সে Loreto স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েছে। কোথায় সেই চেয়ারখানা যেখানে বসে তিনি অমুক বইখানা লিখেছিলেন, কোথায় সেই Statueটি যেটা Shakespeareএর বসবার ঘরে ছিল ইত্যাদি। এই সব দেখেশুনে মনে হচ্ছিল শিশুদের দেখবার এবং জানবার কত সাধ। আজ যে Shakespeare সম্বন্ধে সে এত সজাগ তার কারণ স্কুলে সে Shakespeareএর বিষয় অনেক কিছু পড়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছে। কেন খুকুর মত ছেলেমেয়েরা এ দেশেও কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের খুটীনাটী সম্বন্ধে এই রকমভাবে অনুপ্রাণিত হবে না? কোথায় আছে সেই ধরণের বই এবং কেইই বা আমাদের ছেলেমেয়েদের এই সব মহাজ্ঞানীদের কথা শেখাবে।

আমরা ২৮শে জুলাই রাত ৯টায় লণ্ডন ছেড়ে ভারতের দিকে যাত্রা করলাম। আমাদের এই যাত্রার উদ্যোগ পর্ব্বটা খুব নির্বিঘ্নে হয়নি। কেননা Pan American Planeএর ইঞ্জিন খারাপ হওয়ার জন্য আমাদের যাত্রার তারিখ দু'দিন পিছিয়ে গেল। পথে বিশেষ কিছু কষ্ট হয়নি বটে কিন্তু ইস্তাম্বুলে আবার সেই ইঞ্জিনের গোলমাল হওয়ায় জন্য পুরো একদিন এরোড্রোমেই বসে থাকতে হল।

পরদিন বেলা ১টায় আমরা কলিকাতায় পৌঁছলাম। বাংলার মাটী, বাংলার গাছপালা, বাংলার রাস্তা, বাংলার ঘরবাড়ী যে এত সুন্দর এত মধুর তা সারা পৃথিবী ঘুরে এসে আজ প্রথম অনুভব করলাম। বন্দেমাতরম্!

সমাপ্ত

কলিকাতা বন্দরের প্রচ্ছন্ন বিপদ ও নাগরিকগণের কর্ত্তব্য

শ্রীরবীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

কি প্রকারে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগর ও বন্দর ও পূর্ব্বভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতা—পূর্ব্বকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-ব্যপদেশে স্থাপিত সামান্য উপনিবেশ হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান সমৃদ্ধিশালী মহানগরের অবস্থায় পহুঁছিয়াছে,—এ ইতিহাস বাঙ্গালার স্বাধীনতা লোপের ক্লেশদায়ক বিবরণে পরিপূর্ণ। তবে একথা সত্য যে কলিকাতার ক্রমবর্দ্ধমান সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বহুলপরিমাণে হুগলী নদীর তীরে এ নগরের বন্দররূপে অবস্থিতির উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে এবং একথাও সত্য যে ঐ নদীর উপর দিয়া সর্ব্বকালে ও সর্ব্বসময়ে সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল করিতে পারে এইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় সুগভীর জলপ্রবাহ—বিশিষ্ট নদীর অবস্থার উপর কলিকাতার বর্ত্তমান শ্রীসমন্বিত অবস্থার স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। নদীর ঐরূপ অবস্থার অবনতি ঘটিলে, কলিকাতা বন্দরের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এখন, আমরা স্বাধীনতালাভ করিয়া সেই কলিকাতা বন্দরকে অবহেলায় ও স্বল্প বুদ্ধিবৃত্তির দোষে বিশিষ্ট ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিব,—ধারণারও অতীত এই দুর্মতি যেন আমাদের কখন না হয়। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা উচিৎ হইবে।

পদ্মা নদী হইতে উদ্ভূত নদীয়ার নদী গোষ্ঠী (Nadia River System) নামে খ্যাত ৩টী শাখানদী যথা ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথা-ভাঙ্গার জলধারা মিলিত হইয়া হুগলী নদী সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ নদী-গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল শাখা নদীগুলিই পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট ও নির্ভরশীল, এরূপ স্থলে ঐ শাখানদীসমূহের জলপথের সহিত হুগলী নদীর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। বর্ত্তমানে ভাগীরথীর উৎস বালিবদ্ধ অবস্থায় বুঁজিয়া যাওয়ায় উক্ত নদীর উর্দ্ধাংশের জলধারা বর্ষাকাল ব্যতীত সর্ব্বকালে ও সর্ব্বসময়ে শুষ্ক অবস্থায় থাকে। ইহার উপর অদৃষ্টের পরিহাসক্রমে হুগলী নদীর প্রবাহ পরিবেশকারী অবশিষ্ট দুইটী শাখানদীর মধ্যে প্রধান মাথাভাঙ্গা নদী, পদ্মানদী হইতে বহির্গত হইবার উৎস সমেত বাঙ্গলা বিভাগ সম্বন্ধীয় অবৈধ, অন্যায় ও ভ্রমাত্মক রোয়েদাদমূলে পূর্ব্ববঙ্গের অংশভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

ঐরূপ রোয়েদাদ বলবৎ থাকিলে হুগলী নদীর প্রবাহপোষণকারী

অতি আবশ্যকীয় মাথাভাঙ্গা নদীর জলধারা চিরতরে লোপ পাইবে এবং হুগলী নদীর অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে অতীব ক্ষীণ ও হীন হইবে। এইরূপ ভাবে ঐ নদীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে উহার উপর দিয়া জাহাজ চলাচলের পথ বন্ধ হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বন্দরও ধ্বংসের মুখে ধাবিত হইবে। ঐরূপ ঘটনা কি ভাবে ঘটিতে পারে, নিম্নে বর্ণিত হইল। বাটোয়ারা কমিশনের চেয়ারম্যান র‍্যাডক্লিপ্ সাহেব যে ম্যাপ্‌খানির উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন মতলব সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সঙ্কলিত বাঙ্গালা দেশের মানচিত্রে আসল মাথাভাঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল ও ঐ নদীর আবশ্যকীয় পথ ও অবস্থিতি সম্পূর্ণ লুপ্ত করিয়া দিয়া তৎস্থলে পদ্মানদী হইতে উদ্ভূত জলঙ্গী নদীর প্রকৃত উৎস হইতে ৫ মাইল দূরে কাল্পনিক মাথাভাঙ্গার নদীরেখার কাল্পনিক উৎস বা (পদ্মা হইতে উদ্ভূত) কাল্পনিক উৎপত্তি বিন্দু দেখান হইয়াছে এবং ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত ভৈরব নদী নামে প্রচলিত একটা মরা নদীর—মাথাভাঙ্গা নদী নূতন নামকরণ করিয়া সেই মরা নদীকে মাথাভাঙ্গা নদী নামে চালান হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে আসল মাথাভাঙ্গা নদীর উৎস জলঙ্গী নদীর উৎস হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। জলঙ্গী নদীর উৎস হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী কৃত্রিম মাথাভাঙ্গা নদীর নদীরেখার কৃত্রিম উৎস পশ্চিম বাঙ্গালার প্রতিকূলে সকল প্রকার অনর্থের ও অনিষ্টের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। র‍্যাডক্লিপ্ সাহেব বিভ্রান্ত হইয়া প্রকৃত মাথাভাঙ্গা নদীর উৎস হইতে ৫ মাইল দূরে উত্তরে, মাথাভাঙ্গা নদীরেখায় কাল্পনিক উৎসবিন্দু স্থাপন করিয়া ঐ কৃত্রিম নদীরেখার

দ্বারা উভয়বঙ্গ মধ্যস্থিত সীমানা রেখা করিয়া প্রকৃত মাথাভাঙ্গা নদীর জলপথ হইতে পশ্চিমদিকে বহু দূরে,—থানাওয়ারি সীমারেখা টানিয়া বঙ্গবিভাগ করিয়াছেন এবং এই উপায়ে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রকৃত জলধারা উৎসসহিত পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে ঐ আসল নদীর উৎস ও আসল নদী পূর্ব্ব পাকিস্থান রাষ্ট্রের ভুমির উপর অবস্থিত হইয়া ঐ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধীন ও করায়ত্ত হইয়াছে। এইরূপ কৃত্রিমতা একটী তাজ্জব ব্যাপার। এক্ষণে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে আসল মাথাভাঙ্গা নদীর মুল প্রবাহ-নিয়ন্ত্রণ পূর্ব্ব পাকিস্থান রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার। উক্ত রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই এবং ঐরূপ ইচ্ছা করাই স্বাভাবিক, পূর্ব্ববঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত আসল মাথাভাঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ পূর্ব্ববঙ্গ এলাকাভুক্ত মিরপুর, দৌলতপুর, গাঙ্গনি ও আলমডাঙ্গার থানার সীমানার সংযোগ বিন্দুতে যেখানে মাথাভাঙ্গা নদীর মূল জলপ্রবাহ সর্ব্বপ্রথম দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বশাখা, কুমার নদী নামে পূর্ব্ববঙ্গের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, ঐ দ্বিধা বিভক্ত হইবার বিন্দুতে মাথাভাঙ্গা নদীর মুল জলপ্রবাহের গতি কুমার নদীর ভিতর দিয়া ফিরাইয়া দিলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন বাধা বা আপত্তি খাটিবেনা। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে মাথাভাঙ্গা নদীর অবশিষ্ট জলধারা যাহা চুর্ণি-শাখানদীর ভিতর দিয়া হুগলী নদীতে মিলিত হইতেছে, ঐ জলধারা জল অভাবে মরা নদীতে পরিণত হইবে। যাঁহারা ১৯৪৪ সালে সংকলিত বলিয়া প্রচলিত কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৪ সালে প্রস্তুত বলিয়া চিহ্নিত করিয়া ১৯৪৭ সালে প্রস্তুত হওয়া কি অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে?) বাঙ্গালার মানচিত্র দেখিয়াছেন তাঁহারা ঐ কৃত্রিমতার ব্যাপারটী বেশ বুঝিতে পারিবেন। ঐ ১৯৪৪ সালের মানচিত্রই র‍্যাড্‌ক্লিপ্‌ সাহেব অবলম্বন করিয়া বঙ্গ বিভাগের কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে নদীর এইরূপ শেষ পরিণতিতে হুগলী নদীর সুগভীর জলপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল বন্দরও ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে। আশা করি, কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ, বঙ্গীয় কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ও বাণিজ্যপতিগণ এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। খবরে প্রকাশ উভয় বাঙ্গালার মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত এই ব্যাপারটী দীর্ঘকাল পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মারফতে ইণ্টার-ডোমিনিয়ন কনফারেন্সের নয়াদিল্লীর

বিকৃত মানচিত্র　(প্রকৃত মানচিত্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠায়)

প্রথম অধিবেশনে উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং ঐ বিষয়টী ট্রাইবিউন্যাল নিযুক্ত করিয়া বিচার করান হইবে সেই অধিবেশনে এইরূপ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও ৬মাস পূর্ব্বেকার কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের পরবর্ত্তী নিষ্ক্রিয়তার দরুণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ভিতর নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে। এক্ষণে অনুরোধ উভয় গভর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে তৎপর হইবেন।

এখানে বলিতে বাধ্য হইলাম, যে উভয় সরকারেরই পরস্পরের হিতের জন্ম মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিবৃতি র‍্যাডক্লিপ্‌ সাহেবের রোয়েদাদ নির্দ্দেশিত মূল নীতি অনুসারে—উভয় সরকার মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি হওয়া সমীচীন হইবে। আশা করি, পূর্ব্ববঙ্গ সরকার অনুধাবন করিয়া দেখিবেন যে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎস হইতে মাত্র ১৬।১৭ মাইল দূরে হার্ডিং-ব্রীজ অবস্থিত ; ঐ ব্রীজের নিরাপদ অবস্থা রক্ষা করিবার জন্ম অস্থিরগতি পদ্মার জলের চাপ কমান আবশ্যক এবং তজ্জন্ম মাথাভাঙ্গা নদীর পদ্মানদীস্থিত মূল উৎস সংস্কার করিয়া মাথাভাঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ চূর্ণা শাখানদীর ভিতর দিয়া গতিশীল রাখাই সুবিবেচনার কার্য্য হইবে। মাথাভাঙ্গা নদী আপোষ সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অংশে নির্দ্দিষ্ট হইলে, ঐ জলস্রোত পরিপুষ্ট রাখা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তব্য হইবে।

কন্যাকুমারী

শ্রীবাসন্তী দেবী

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী দাক্ষিণাত্য তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন আমাদের গুরুদেব, কয়েকজন গুরুভ্রাতা, আমার মা এবং স্বামী। এই তীর্থ ভ্রমণে দাক্ষিণাত্যের বহু বিশিষ্ট স্থান এবং দেবদেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি। তন্মধ্যে নিম্নে শুধু কন্যাকুমারীর কথাই উল্লেখ করিলাম।

১।৩।৪৯ তারিখে মাদুরা হইতে আমাদের রিজার্ভ বগি ত্রিবেন্দ্রমে পৌঁছিল। সেদিন গাড়ী লেট থাকায় বৈকাল সাড়ে তিনটার স্থলে সন্ধ্যা ছয়টার সময় ত্রিবেন্দ্রামে আসিল। ২রা তারিখ সকাল ৮টার সময় আমরা কন্যাকুমারী দেবীকে দেখিবার জন্ম রওনা হইলাম। ত্রিবেন্দ্রম্‌ হইতে কন্যাকুমারিকা যাইবার কোন রেলপথ নাই। ট্যাক্সি বা বাসে করিয়া যাইতে হয়। আমাদের জন্ম ৪খানি ট্যাক্সি ভাড়া করা হইল। ত্রিবেন্দ্রম্‌ হইতে কন্যাকুমারিকার দূরত্ব ৫৫ মাইল। ট্যাক্সি ভাড়া যাতায়াতে প্রতিখানা ৩৫৲ টাকা করিয়া পড়িল। প্রশস্ত পিচ্‌ ঢালা রাস্তায় যাইতে কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। এখানে ভারতমহাসাগর আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর মিলিয়া এক হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের সর্ব্বত্রই ঘন বসতি, তাহার তুলনায় এই স্থানে বাড়ীঘর বেশী নাই। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার একখানা বেশ ভাল বাড়ী আছে। দুইটি ধর্ম্মশালাও আছে। কন্যাকুমারিকাতে যাইতে পথের শোভা অতি মনোরম। পথের দুইধারে ছবির মত বহু বাড়ীঘর এবং অসংখ্য নারিকেল গাছের সারি, কোথাও বা গগনচুম্বী পাহাড়শ্রেণী নানাবিধ ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে জলাশয়ে পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। এই গুলির দিকে তাকাইলে চোখ আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না।

আমাদের পাণ্ডা ঠাকুর আমাদেরই গাড়ীতে ছিলেন, তিনি কন্যাকুমারীর গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

পূর্ব্বে বানাসুর নামক এক অসুর দীর্ঘদিন তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার দেখা পাইল। ব্রহ্মা অসুরের একাগ্র তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে অসুর বলিল—কোন পুরুষে যেন আমার বধ না করে। ব্রহ্মা বর দেওয়ার সময় এর ফল কি হইবে তাহা চিন্তা করিলেন না। তিনি বলিলেন "তথাস্তু"। আর কি! অসুররাজ বর পাইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইল। ক্রমে ক্রমে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। ক্ষোভে দুঃখে ইন্দ্ররাজ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। নারায়ণ বলিয়া দিলেন তুমি পৃথিবীতে যাইয়া দুহিতারূপে পার্ব্বতীকে পাইবার জন্ম তপস্যা কর। তিনি যদি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে পিতৃরূপে গ্রহণ করেন, তবে এই অসুরকুল ধ্বংস হইবে। নারায়ণের বাক্যে ইন্দ্ররাজ পৃথিবীতে যাইয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্ররাজের কঠোর তপস্যায় মুগ্ধা পার্ব্বতী যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূতা হইয়া ইন্দ্রদেবকে ভয় নাই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন। অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা দেবরাজের গৃহ আলোকিত করিয়া রহিলেন। ক্রমে কন্যার বয়স ৯ বৎসর হইল। বানাসুর লোকপরম্পরায় জানিতে পারিল যে ইন্দ্র তাহাকে বধ করিবার জন্ম তপস্যা করিয়া কন্যা লাভ করিয়াছেন। বটে! ত্রিলোক কম্পিত যাহার ভয়ে, দেবতারা যাহার প্রবল প্রতাপে স্বর্গচ্যুত হইয়াছে তাহাকে বধ করিবে ক্ষুদ্র বালিকা! মদগর্ব্বে গর্ব্বিত অসুররাজ ত্রিলোক কম্পিত করিয়া যুদ্ধে আসিল। এই যুদ্ধই তাহার শেষ যুদ্ধ, সে আর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিল না। দেবকার্য্য সমাধার পর কুমারী কন্যা মহাদেবের তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

কুমারীর তপস্যায় অসাধারণ নিষ্ঠা দেখিয়া মহাদেব প্রকাশিত হইলেন। আরাধ্য দেবকে সম্মুখে পাইয়া কুমারী একবার চাহিয়া দেখিয়া চক্ষু নত করিলেন। অন্তর্য্যামী পুরুষ কন্যার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—আমি তোমার অভিপ্রায়ে সম্মত আছি কিন্তু একটি সর্ত্তে। কুমারী মুখ তুলিয়া চাহিলেন মাত্র। চাহনীর অর্থ হইতেছে, সেটি কি? মহাদেব বলিলেন—"বিবাহের যে লগ্ন স্থির হইবে, সে লগ্ন ভ্রষ্ট হইলে আর বিবাহ হইবে না।" ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। কুমারীর অধিবাস হইয়া গেল। তিনি আরাধ্যদেবের প্রতীক্ষায় রহিয়া রহিলেন। এদিকে মহাদেবও ঠিক সময় মত বিবাহের আসরে পৌঁছিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বাধ সাধিলেন নারদ ঋষি আসিয়া। পথিমধ্যে তিনি মহাদেবকে একটি কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা

করিয়া দিতে বলিলেন। ঐ প্রশ্নের সমাধান শেষ করিয়া দিতে রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল। প্রশ্নের সমাধান শেষ করিয়া মহাদেব যখন বাহির হইলেন ঠিক সেই সময় নারদ মুনি বন হইতে কা কা রব করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া মহাদেব আর কুমারীর বিবাহ বাসরে উপস্থিত হইলেন না। যে স্থানে তিনি রহিয়া গেলেন সেই স্থানের নাম—সুচিন্দ্রম্। এদিকে কুমারী কন্যা আশায় বসিয়া বসিয়া প্রহরের পর প্রহর কাটাইলেন। এলেন না আরাধ্য দেবতা, লগ্নভ্রষ্ট হইল দেখিয়া কুমারী তখন বিবাহের সাজশয্যা খুলিয়া ফেলিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

গল্প শুনিয়া মন ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। আমাদের ট্যাক্সি আসিয়া কন্যাকুমারীতে পৌঁছিয়া গেল। একে একে আমরা সকলেই মটর হইতে অবতরণ করিলাম।

কন্যাকুমারী

গুরুদেব মটর হইতে নামিয়া মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সোজা সমুদ্রের তীরে জল মধ্যে নামিয়া বাঁধান একটি জায়গায় ধ্যান গম্ভীর হইয়া বসিলেন। ক্রমে ক্রমে আমরা সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে সমুদ্র স্নানের জন্য বড় বড় পাথর দিয়ে ঘেরা দুইটি বাঁধান ঘাট আছে। প্রফেসার শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাসের বইতে পড়েছি যে এই দুইটি বাঁধান ঘাট পিতৃ তীর্থ ও মাতৃ তীর্থ নামে পরিচিত। এইখানে নাকি পরশুরামের মাতৃহত্যা পাপ দূরীভূত হইয়াছিল, পিতৃ আজ্ঞায় পরশুরাম যে কুঠারের দ্বারা মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন ঐ কুঠার তাঁহার হাতে আটকাইয়াছিল। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদে লাঙ্গলবন্ধ ঘাটে স্নান করিয়া ঐ কুঠার তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু মাতৃহত্যা পাপ ওখানেও দূর হইল না। এই স্থানে আসিয়া স্নান করায় সেই মাতৃহত্যা পাপ বিমোচন হয়। সে কারণে এই স্নান-ঘাটের নাম মাতৃতীর্থ হইয়াছে। কথিত আছে পরশুরামজী এই কুমারীদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ঘাট অতিক্রম করিয়া আমরা সমুদ্র গর্ভস্থিত একটী পাহাড়ে যাইয়া বসিলাম। ডাক্তারবাবু এখানকার ফটো তুলিয়া লইলেন। কি মনোহর দৃশ্য—ভারতমহাসাগর, আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর এই তিনের মিলন স্থান এই কন্যাকুমারিকা—ভাষায় বোঝান যায় না, এখানে মহানে মহানে মিলনের মাধুর্য্য।

গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে ঢেউগুলি আসিয়া মাতা কন্যাকুমারীর পদতল যেন ধৌত করিতেছে। মনে হইতে লাগিল কুমারীর অশ্রুবারিতে এই তিনের উৎপত্তি হইয়াছে। যেন ইঁহারা বলিতেছে—মাতার ব্যর্থ জীবনের সাক্ষীস্বরূপ আমরা এখানে আছি। কিন্তু মা! তুমিত ব্যর্থকাম হও নাই। যদি তুমি সেদিন মহেশের সহিত মিলিত হইতে তবে ত সবই ফুরাইয়া যাইত, অবশিষ্ট কিছুই থাকিত না।

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন॥

আর তোমার বিরহ ব্যথার ভার সকলেই গ্রহণ করিয়াছে। অনন্ত কাল হইতে মহাসমুদ্র জলদগম্ভীর মন্ত্রে তোমার এই বিরহ গীতি গাহিতেছেন। প্রভাতের তরুণ রবি নবরাগে রঞ্জিত হইয়া যেন তোমার পদ বন্দনা করিয়া যাইতেছেন। মহা-মিলনের অধিবাসের সিন্দুর-রূপে তোমাকে রাঙ্গিয়ে দিয়ে যান। আবার অস্তরবি তোমার কপোলে অনুরাগ চন্দন নিত্য মাখাইয়া দেন। সন্ধ্যারাণী আসিয়া কৃষ্ণবর্ণের শাড়ীতে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দেন। গৌরীকে করেন মহাকালের বক্ষে সমর্পণ। মায়ের বিরহ বেদনা আমাকে বিমনা করিয়া দিল। আমি সেদিনের কথা ভাবিতে লাগিলাম, যেদিন কুমারীকন্যা সাজ শয্যা করিয়া বসিয়াছিলেন, আর কান পাতিয়াছিলেন রথের চাকার ধ্বনি শুনিবার জন্য, বাতায়ন পথে দেখিতে-ছিলেন সোণার ধ্বজা দেখা যায় কিনা, বাঁশীর তান আসে কি না বাতাসে। এই ভাবে বিভোর হইয়া আমরা সমুদ্র স্নানে নামিলাম। বলিলাম—এই ত্রিসঙ্গমে যেমন করে তোমার মন প্রাণ জ্ঞান দিয়াছিলে গুরু মহাকালের পায়ে বিসর্জ্জন, তেমনই আজ আমি, আমার ক্ষুদ্র মন প্রাণ জ্ঞানকে গুরু মহাকালের বক্ষে অর্পণ করিলাম। আর যেন ক্ষুদ্রত্বের পরিধিতে জড়াইয়া না পড়ি। ক্রমে স্নান সারিয়া মন্দিরে গেলাম। এখানে আসিয়া বাবা কোন কথাই কহেন নাই। মন্দিরে আসিয়াও ধ্যান গম্ভীর শিবের মত বসিয়া রহিলেন। এখানে দেবীর কুমারী মূর্ত্তি। কি সুন্দর মূর্ত্তি—নয়ন আর ফেরে না। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিংড়াইয়া কুমারী নয়নে অঞ্জন পরিয়াছেন। সমস্ত রং গলাইয়া পদতল অলক্ত রাগে রঞ্জিত করিয়াছেন। জগতের সব কিছু সুষমা দেবীর শ্রীঅঙ্গে শোভা পাইতেছে। ভাষাহীন অন্তরের গভীরে শুধু মা, মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মা ছাড়া আর কিছুই মনে আসিল না।

এখানে আসিয়া দেবীর অভিষেক দেখিলাম। অন্যান্য মন্দিরে মায়ের অভিষেক দেখা নিষিদ্ধ কিন্তু এই স্থানে দেবী কুমারী বলিয়া অভিষেক দেখিতে কোন বাধা নাই। মন্দিরে দেবীর অতি নিকটে আমরা বসিয়াছিলাম। এখানেও প্রথমে মাকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইল। শেষে কলসি কলসি দুধ ও সমুদ্র জলে স্নান হইতে লাগিল। স্নান অন্তে দেবীর গাত্র মুছাইয়া, ফুল সাজে সাজান হইল। পরে আরতি হইল। বাবা (গুরুদেব) আরতির সময় আমাদিগকে ভাব বিহ্বল গদগদ কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করাইলেন—

তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্ম ফলেষু জুষ্টাং
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে।
সুতরসি তরসে নমঃ॥

জীবের কর্ম্মফলের দ্বারা সেবিতা হইয়া যিনি দীপ্তিহীন হন, এবং তপস্বীর তপস্যা প্রভাবে যিনি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠেন এবং স্বরূপতঃ যিনি অগ্নিবর্ণা অর্থাৎ প্রকাশ শীলা জ্ঞানময়ী সেই দেবীকে—দুর্গাকে পরিত্রাণের জন্য আমি আত্মনিবেদন করি—প্রণাম করি।

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি! বিশ্বার্ত্তি হারিণি।
ত্রৈলোক্য বাসিনী মীড্যে! লোকানাং বরদা ভব॥

হে দেবী! হে বিশ্বের আর্ত্তিহারিণী (জগৎ দুঃখ নাশিনী) মাতা তুমি প্রণতগণের প্রতি প্রসন্না হও। হে ত্রিলোকবন্দিতা তুমি পুত্রের দুঃখ দুর্গতি হরণ কর।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে।

তুমি সর্ব্ববিধ মঙ্গলেরও মঙ্গলরূপিনী এবং কল্যাণদায়িনী এবং জগতের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন তোমা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। তুমি আশ্রিত পালিকা এবং ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান এই তিনকাল যুগপৎ তোমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। হে গৌরী, তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপা, তোমাকে প্রণাম।

দক্ষিণান্তে আবার প্রণাম করিয়া দেবীর দিব্যরূপ অন্তরে ধ্যান করিতে করিতে আমরা বাবার সহিত বাহির হইলাম। সকলের অন্তর মায়ের রূপে আলোকিত, প্রেমে পূর্ণ। ওখান হইতে বাহির হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের সাধনার স্থান, গণেশের মন্দির, মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম বিসর্জ্জনের স্থান দেখিলাম। পাণ্ডাজীর মুখে শুনিলাম, অভিমানে দেবী যেখানে বরণ ডালা ফেলিয়া দিয়াছিলেন সেই স্থান বিচিত্র রঙে রঙিণ হইয়া আছে। এই স্থানও দেখিলাম, আরও দেখিলাম বিবাহের রাতের বরণ-ডালার অর্ঘ্য সমুদ্র উপকূলে যে স্থানে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন ঐ স্থানের বালির দানাগুলি চালের মত। ঐ চাল আবার টুকরিতে করিয়া মেয়েরা বিক্রয় করিতেছে। কন্যাকুমারিকায় ছবির দোকান আছে। উহাতে মা কুমারীর ছবি কিনিতে পাওয়া যায়। আমরা কন্যাকুমারীর ছবি এক একখানি করিয়া কিনিলাম, তারপর ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু যাইতে প্রাণ চায় না। ডাক্তারবাবু বলিলেন—কিছুই দেখা হ'লো না। তাঁহারও দেখিলাম ঐদিন ঐখানে থাকিবার ইচ্ছা। কিন্তু হইল না। শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইল। মোটর ত্রিবেন্দ্রমে ফিরিয়া চলিল। ওখান হইতে ফিরিবার পথে শুচীন্দ্রমে নামিলাম। ওখানেই মহাদেব লগ্নভ্রষ্ট হইয়া থাকিয়া যান; কিন্তু সব ফাঁকা বোধ হইল, কুমারী জননী ছাড়া আর কিছুই হৃদয়ে স্থান পাইল না। শুনিলাম এই স্থানের নাম পূর্ব্বে জ্ঞানারণ্য ছিল। ইন্দ্র, ঋষি গৌতমের পত্নী অহল্যাকে হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্র সহস্র যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানে আসিয়া ইন্দ্রের সহস্র যোনির পরিবর্ত্তে সহস্র লোচন হইয়াছিল, তাহাতেই এই স্থানের নাম হয় শুচি-ইন্দ্রম্। আবার রিজার্ভ ট্রেনে ওখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; কিন্তু—প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মন প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। নিকটে একখানি খালি ট্রেণ ছিল, বিকালে তাহার পাশে বসিয়া, মা, মাগো বলিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলাম। যেন মা কেবলই আমাকে বুকে তুলিয়া লন এবং আমার সমস্ত মুখে চোখে দেন তাঁহার স্নেহ চুম্বন, আমি আত্মহারা হইয়া যাইতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, আমি ত্রিসঙ্গমেই রহিয়াছি। আমার শরীর ত্রিবেন্দ্রম থাকিলেও ব্যাকুল মনপ্রাণ কেবলই ত্রিসঙ্গম সাগর উপকূলে কুমারী জননীর বক্ষে অনুক্ষণ স্তনামৃত পান করিতে লাগিল। রাত্রে কামুদার নিকট শুনিলাম শেষ রাত্র সাড়ে তিনটার সময় শ্রীশ্রী বাবা (জেঠামহাশয় ও কামুদা সঙ্গে যাইবেন) আবার যাবেন কন্যাকুমারিকায় মায়ের চিন্ময় রূপে ও ভাবে অবগাহন করিবার জন্য। ধ্যানমগ্ন পিতা সেদিন আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিয়া অধিকক্ষণ যে চিন্ময়ীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন নাই। তাই আজ আমাদিগকে সঙ্গে লইবেন না। আমার ক্ষুধিত মন নিমেষের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, সমস্ত দেহেন্দ্রিয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কিন্তু না তাঁহার কাজে অসুবিধা ঘটাইব না। মীণাক্ষী দেবীর মন্দির ঘুরিয়া আসিয়া বাবা বলিয়াছিলেন, মীণাক্ষী দেবীর শ্রীচরণ যখন মস্তকে ধারণ করেছিলাম তখন ইচ্ছা হয়েছিল এই চরণ তোমাদের মস্তকেও স্পর্শ করাই। কিন্তু বড় ভুল হ'য়ে গেল। যেদিন সম্পূর্ণ নির্বিকার হইয়া জবাব দিয়াছিলাম কোন প্রয়োজন ছিল না; আপনার মস্তকে দেবী চরণ দেওয়ায় আমরা সকলেই পূর্ণকাম হইয়াছি, আংশিক ভাবে না হইলেও কোন ক্ষতি হয় নাই।

মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোপ্রাণোমদ্দেহো গুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহির্বৈব তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এ কথা তাহা হ'লে আমাদের জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়—আর আজ তাঁহার তৃপ্তির জন্য, শান্তির জন্য নিজের যদি কিছুই ত্যাগ করিতে না পারি তবে সকলই বৃথা। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট এই মহাবাক্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে আমাদের জীবনে। আমি যাইবারকালীন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম—যাও দেব তোমার অভিলসিত স্থানে, পূর্ণ হোক তব গোপন বাসনা, তোমার নিকট তোমারই জন্য প্রার্থনা করিতেছি আমি। আমি সেই নির্জ্জন অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যতক্ষণ দেখা যায় দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে বলিলাম—পিতঃ! কন্যারূপে তোমার কাছে এই প্রার্থনা—যেন আমরাও শুদ্ধ

হৃদয়ে ফিরিয়া না যাই। মায়ের দিব্য আলোকে যেন জীবন আলোকিত থাকে নিরবধি।

বেলা দুইটার সময় তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। কানুদার নিকট শুনিলাম—ভোর ৫।টায় তাঁহারা কন্যাকুমারিকাতে পৌঁছিয়াছিলেন। আজ বাবা কন্যাকুমারিকায় যাইয়া মন্দিরে যান নাই। তিনি সমুদ্র উপকূলে যে বাঁধান স্থানটি আছে তাহাতে ধ্যানে বসিলেন। কারণ মন্দিরে যাইয়া দেবদর্শন করিবার প্রয়োজন আমাদের জন্য। আমাদের এই সসীমের মধ্যে অসীমকে ধরিবার বুঝিবার প্রয়োজন। তিনি যে মহাযোগী, তাই সাধক রামপ্রসাদের সুরে সুর মিলাইয়া বলা যায় তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটি অজাকে তুচ্ছ খোঁটায় বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদাই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিতে সম্যকভাবে সংস্থাপিত রহিয়াছে। তাই তিনি ইচ্ছা মাত্রই সমাধি অবস্থা লাভ করেন। এই স্থানেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। সূর্য্যোদয়ের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি সমাহিত হইয়া পড়িলেন।

সমাধির নাম আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ে ছোট বড় সকলেই জানেন বা শুনিয়াছেন। তবুও গুরুমুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিতেছি। আমাদের এই জীবাত্মা সাধনাবলে ও গুরু কৃপায় যখন মহান চৈতন্যে অখণ্ড চিৎ সমুদ্রে পরমাত্মায় নিজের বিশিষ্টতা পরিচ্ছন্নতা হারাইয়া ফেলে তখন তাহাকেই নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। ইহা ভিন্ন সবিকল্প সমাধির চারিটি অবস্থা আছে। সবিকল্প সমাধি লাভ হওয়ার পরই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। যদিও অনন্তকাল ধরিয়া প্রতিনিয়ত আমাদের ভিতর জীব ও পরমাত্মার মিলন বিচ্ছেদ অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে কিন্তু আমরা ইহাকে ধরিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়া জন্ম-মৃত্যু শোক-তাপ জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাই না।

ভোর হইতে বেলা প্রায় বারটা পর্য্যন্ত ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহারা মটরযোগে বেলা প্রায় ২টায় ত্রিবেন্দ্রম্ ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও ভাবের নেশা কাটে নাই। তাঁহার সেই ভাবগম্ভীর অবস্থা দেখিয়া আমরা দূর হইতে প্রণাম করিলাম।

কথা প্রসঙ্গে বাবা (গুরুদেব) পরে একদিন বলিয়াছিলেন—অবসর পাইলে কন্যাকুমারীর তত্ত্বকথা তিনি লিখিবেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন—অন্য স্থানে ধ্যান করিয়া তিন বৎসরে যাহা লাভ হয়—এখানে তিন মাসে এমন কি তিন দিনেও তাহা লাভ হইতে পারে। এমন অনুকূল স্থান কন্যাকুমারিকার এই সমুদ্র তীর। শুনিয়াছিলাম স্বামী বিবেকানন্দও এখানে আসিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তন্ময় হইয়া যান এবং গভীর সমাধিতে বহুক্ষণ ছিলেন।

৪।৩।৪৯ তারিখে বেলা ৯টায় আমাদের রিজার্ভ বগীকে বহন করিয়া ট্রেণ চলিল ত্রিচিনাপল্লী ও ভিল্লীপুরম্ হইয়া তিরুমেমলয়ম্। আজ কন্যাকুমারিকা হইতে বহু দূরে আসিয়াছি কিন্তু হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া মা অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। শরীর প্রায় দুই সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করিলেও মন ও প্রাণ চিন্ময়ী মায়ের অঞ্চল ধরিয়া অনেক সময়ই লুকোচুরি খেলে, কখনও কখনও সমুদ্রের বেলাভূমিতে মায়ের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা ভূলুণ্ঠিত হইয়া মায়ের চিন্ময় রাতুল চরণে প্রণত হয়। তাই আজ সাধক কবি রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে ইচ্ছা হয়:—

ধন্য হল জন্ম মম　　পূর্ণ হল অন্তর
তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করে লও গো মোরে
এ জীবনে ঘটাও গো মা জন্ম জীবন অন্তর,
সুন্দর গো সুন্দর।।

ওঁ শান্তি।
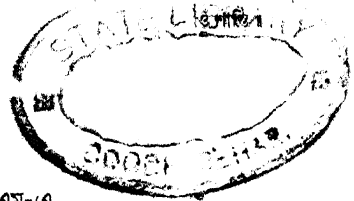
সাঁঝের পুরবী

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

সন্ধ্যা তখনো পড়েনি ঝরিয়া আকাশের পরপারে,
ছিন্ন মেঘের ম্লান হাসিটুকু কে জানে ভুলায় কারে।
আকাশের পথ শব্দবিহীন,
বিহগের গীতি হ'য়েছে বিলীন,
নীরব পল্লী, পথ জনহীন
সন্ধ্যা নামিছে ধীরে;
আলোকের মুখে ম্লান যবনিকা নামিছে পৃথিবী ঘিরে।
পুবালি বাতাস থাকিয়া থাকিয়া দিকে দিকে ব'য়ে যায়,
ঘন হ'য়ে আসে সন্ধ্যার ছায়া রাত্রির কালিমায়।
মেঘলা দিনের কাজল আকাশে,
শুভ্র তারকা আজ না বিকাশে,
ঝিল্লীমুখর আকাশে বাতাসে
একটি বিষাদ-রেখা;
ওপারের আলো নিভে গেছে হায়—কৃষ্ণ মেঘের রেখা।

মনে প'ড়ে যায় জীবনে আমার কা'রা এসেছিল সব
প্রভাতের পাখী প'শেছে কুলায় টুটিয়াছে কলরব
বিষাদ মলিন আজিকার সাঁঝে
অতীতের কোন কি যে মায়া রাজে
হারায়ে গিয়াছে তাহাদেরি মাঝে
গোধূলি আলোকসম;
পুরবী গীতির শেষ রেশটুকু হৃদয়ে নিবিড়তম।

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বামী কৃপানন্দজী প্রত্যহ একবার আমাদের 'সপ্তপর্ণা'তে পদধূলি দিতেন। আমাদের কুশল প্রশ্ন করে, কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জেনে যেতেন। কিন্তু তাঁকে বিরক্ত করবার আমাদের প্রয়োজন হ'ত না। 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' গড়ে তোলবার স্বপ্নে কৃপানন্দজী জীবন উৎসর্গ করেছেন। গত আট বৎসরের মধ্যে যত বাঙালী রাজগীর গিয়েছেন সম্ভবতঃ তাঁরা সকলেই আমার কথা সমর্থন করবেন। অদম্য উৎসাহী এই স্বামীজী তাঁর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের যে ধ্যানরূপ কল্পনা করেছেন এবং তার একখানি নক্সাও যা প্রস্তুত করেছেন,

স্বামী কৃপানন্দজী

আমাদের দেখিয়ে বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়েছেন। বাড়ী থেকে একদিন টেনে নিয়ে গিয়ে স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত হাই স্কুলের প্রায় বিপরীত দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমটি দেখিয়ে নিয়ে এলেন। বিঘে দুই জমীর উপর মাঝামাঝি বিন্দুতে স্থাপিত খোলার চাল দেওয়া কাঁচা মাটির দেওয়ালে গড়া কুটীর একখানি। একেই পাকা করবার জন্য তাঁর ইহজীবনের একমাত্র ঐকান্তিক সাধনা আজ সিদ্ধির পথে অগ্রসর। খবর পেয়েছি—ইট পোড়ানো হ'চ্ছে; ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম-মাহাত্ম্যে কৃপানন্দজীর আশ্রমের স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে।

আর একজন বাঙালী সন্ন্যাসীর সঙ্গেও এখানে পরিচয় হল। স্বামী বিশ্বানন্দজী। ইনি এখানকার জাপানী বৌদ্ধ মঠের তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু, জাপানী বৌদ্ধ মঠ ছাড়াও রাজগীরের ভাল মন্দ নানা ব্যাপারের সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন।

একদা প্রভাতে আমরা সপ্তপর্ণার বাইরের চত্বরে বসে আলাপ আলোচনা করছি, এমন সময় গৈরিকধারী দীর্ঘ আলখাল্লা-পরা মাথায় বৈরাগী টুপি, পায়ে জুতো মোজা আঁটা, মুখে একমুখ কাঁচা পাকা দাড়ী, একজন অপরিচিত পরিব্রাজক এসে উপস্থিত হলেন। সসম্মানে তাঁকে আসন দিয়ে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—তাঁর এ অহেতুক অনুগ্রহের উদ্দেশ্য কি? তিনি উচ্চহাস্যে অভয় দিয়ে বললেন—ভয় নেই, ভিক্ষা চাইতে আসিনি, আপনাদের গৃহে অতিথি হয়ে আশ্রমপীড়া উৎপাদন করতেও আসিনি। এসেছি একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে;
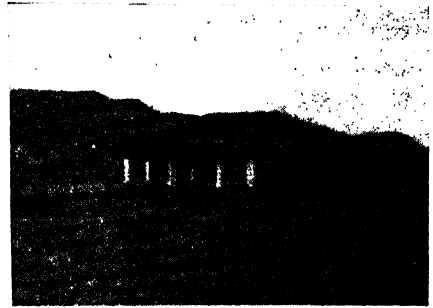
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে। আমার নাম—'বিশ্বানন্দ'—আমি জাপানী মঠের পূজারী। আমার নাম নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আপনাদের কানে এসেছে।

তাঁর এই নাটকীয় আবির্ভাব ও অকপট আত্মপ্রকাশে আমরা প্রীত হয়েছিলুম। প্রায় একঘণ্টা নানা বিষয়ে আলাপ ক'রে তিনি যখন চলে গেলেন, তখন আমাদের মনে এই ভাবটাই মুদ্রিত করে রেখে গেলেন যে—ইনিও বাঙালীদের একজন বন্ধু। স্বামী বিশ্বানন্দজীর যে বর্ণনা লোকমুখে পেয়েছিলুম, তাতে ওঁর সম্বন্ধে আমাদের একটু বিরূপ ধারণাই হয়েছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ না হ'লে কী ভুল ধারণাই না থেকে যেতো ওঁর সম্বন্ধে। লোকটি বলিষ্ঠ মনের স্বাভাবিক মানুষ। অসির মতো ধারালো। কোনও রকম

সাধুগিরির স্বর্গীয় রহস্যের মুখোস নেই তাঁর মুখে। ভণ্ডামী করেন না এবং ভণ্ডামী সইতেও পারেন না। পরিচয়ের পর প্রায়ই আসতেন আমাদের কাছে। আত্মনির্ভরতার পক্ষপাতী তিনি। দেশের রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। শিক্ষায় দীক্ষায় অনেকখানি অগ্রসর মনে হ'ল। একদিন তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছিলুম। শুনলুম তিনি গিরিপুরীদের অলস ভিক্ষুকজীবন ছেড়ে রামকৃষ্ণ মঠে ঢুকেছিলেন সন্ন্যাস আশ্রমেও যাতে লোকসেবার কাজে নিযুক্ত থাকতে পারেন। পরে বৌদ্ধদর্শন ও তন্ত্রবাদে আকৃষ্ট হয়ে তিনি বৌদ্ধমন্দিরে যোগ দেন। কলকাতার জাপানী লেক্ টেম্প্‌লে তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী সন্ন্যাসীদের বন্দী করায় এই জাপানী মঠের তত্ত্বাবধানের জন্য ধনী মহাজন বিড়লা ব্রাদার্স কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন। কারণ, জাপানী বৌদ্ধমঠগুলি ওঁদেরই হাতে রয়েছে।

জাপানী বৌদ্ধ মন্দিরটি আমরা একদিন দেখতে গেলুম। দেখি,

জাপানী মঠের ভিতরে বিগ্রহ পীঠ

স্বামী বিশ্বানন্দ মন্দিরের বেদীর উপর ভগবান তথাগতের মূর্ত্তির সঙ্গে সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি। তাঁর এরূপ আচরণের অর্থ জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন—বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বাইরের কোনও নতুন তত্ত্ব নয়। বেদ উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে তিনি বুদ্ধদেবের উপদেশ উদ্ধৃত করে আমাদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন—বৌদ্ধদর্শন হিন্দুদর্শনের বিরোধী নয় বরং অনুপূরক। এই জন্যই বুদ্ধদেব হিন্দুর দশ-অবতারের অন্যতম বলে গ্রাহ্য হ'য়েছেন। কৃপানন্দজী সম্বন্ধে বিশ্বানন্দজীর ধারণা মোটেই উচ্চস্তরের নয়। বিশ্বানন্দজী সম্বন্ধে কৃপানন্দজীর ধারণা ও তদনুরূপ। এঁদের উভয়ের সঙ্গ লাভে ধন্য হ'য়ে আমার বারবার কেবল এই কথাই মনে হয়েছে, এই দুই সংসারবিরাগী জনহিতকামী সন্ন্যাসী যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে একত্রে মিলে মিশে কাজ করতেন, তাহ'লে রাজগীরে হয়ত' বাঙালীদের একটা উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি এতদিনে স্থাপিত হতে পারতো। দুঃখের বিষয় ওঁদের পক্ষে মিলে মিশে কাজ করা সম্ভব হয়নি। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে সামান্য একটু চেষ্টা করেছিলুম এই উদ্দেশ্যে। সন্ন্যাসীদ্বয় হয়ত মিলতে পারতেন, কিন্তু তাঁদের পার্শ্বচরবৃন্দ থাকতে তা' সম্ভব নয়। কাজেই এদিকে আর অগ্রসর হইনি। পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন এই দুই সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিজের মৈত্রী ভাব অক্ষুণ্ণ রেখেই চলে এসেছি।

প্রস্রবণ উষ্ণই হোক আর শীতলই হোক, উৎসধারায় স্নান করবার লোভ মানুষ মাত্রেরই আছে। রাজগীরের 'সপ্তধারায়' স্নানে যেতে চাই শুনে নন্দ ওরফে নীরজভায়া আমাদের জন্য একখানি টম্‌টম্ ঠিক ক'রে দিলেন। কুণ্ডে যাতায়াত ভাড়া ১৲ টাকা। এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণটি 'কুণ্ড' নামেই খ্যাত হ'য়ে পড়েছে। কারণ, ধারা জলটি ধারণ ক'রে একটি কৃত্রিম 'কুণ্ড' সৃষ্টি করা হয়েছে। এই কুণ্ডটি

সপ্তধারা ও ব্রহ্মকুণ্ড

'ব্রহ্মকুণ্ড' নামে প্রসিদ্ধ। 'সপ্তধারা' দেখেও মনে হ'ল—একই পার্বত্য ধারার গতি নিয়ন্ত্রিত ক'রে তাকে সাতটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে—সম্ভবতঃ তীর্থযাত্রী ও পাণ্ডাদেরই সুবিধার জন্য। ষ্টেশন থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে বৈভার পর্বতের গায়ে এই 'সপ্তর্ষি উৎস' বা 'সপ্তধারা' ও 'ব্রহ্মকুণ্ড'। পূর্বেই বলেছি রাজগীর একটি ক্ষুদ্র জনপদ। একখানি গ্রামের চেয়ে বড় নয়। তবে নানান্ দেশের যাত্রী আসে বলে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী, হাইস্কুল এবং একটি পুলিশ আউট পোষ্টও আছে। রাজগীরে মাত্র তিনটি মেটাল রোড বা পাকা রাস্তা আছে। তার মধ্যে প্রধান রাস্তাটি ষ্টেশনের পিছন দিয়ে উত্তর দক্ষিণে রাজগীরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সোজা কুণ্ডর ধার ঘেঁসে পাহাড়গুলির ভিতর দিকে। এইটেই রাজগীরের বড় সড়ক্। পাটনা থেকে রাজগীর পর্য্যন্ত মোটর গাড়ী ও যাত্রীদের বাস চলাচল ক'রে এই রাস্তা ধরেই। রাজগীরের

হাট বাজার দোকানপাটও সবই এই রাস্তায়। এই রাস্তার ধারেই বর্মীদের বৌদ্ধ-মন্দির, জাপানীদের বৌদ্ধ-মন্দির, রেস্ট্ হাউস, ইনস্পেকশান বাংলো, গোশালা প্রভৃতি। এ ছাড়া মক্‌দুম কুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড এবং দুএকটি পাণ্ডাদের ধর্মশালাও ঐ স্থানে আছে। আর একটি রাস্তা গেছে—চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারীর উত্তর দিকে—প্রধান রাস্তা থেকে বেরিয়ে পশ্চিমমুখে হাইস্কুল ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দিকে। এই পথেই পড়ে পাঁচরুখিয়া কুয়া, দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর জৈন ধর্মশালা, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহারের প্রত্নতত্ত্বখ্যাত বাড়ী, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার সুদৃশ্য বাড়ী এবং আরও কয়েকজন ধনী জৈন মহাজনদের বাড়ী। কো-অপারেটিভ স্টোর, বাঙালী হোটেল এবং পাণ্ডা পাড়াও এই দিকে।

নব রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ

পূর্ব্বমুখী আর একটি রাস্তা রাজগীরের বাজার থেকে বেরিয়ে রেললাইন অতিক্রম করে মাঠ ও শস্য ক্ষেত্রের ধার দিয়ে বরাবর 'নওয়াদার' দিকে গেছে। এই রাস্তার উপরই য়ুনিয়ন বোর্ডের অফিস, শিখ-সঙ্গতের প্রশস্ত মন্দির এবং দু'চারঘর পাণ্ডাদের বাড়ীও আছে। রাজগীরে আরও অনেক প্রাচীন অলি গলি সরু মোটা আঁকা বাঁকা কাঁচা পথ আছে, যেগুলিতে কোনও যান বাহন যাবার উপায় নেই। শুধু পায়ে চলা পদাতিকেরাই যেতে পারে। রাজগীরের প্রধান রাজপথে কুণ্ডের দিকে যেতে রেলওয়ে ষ্টেসনের পরেই দেখা যায় একটি উঁচু টিলার উপর বর্মীদের বৌদ্ধ-মন্দির। এই মন্দিরটি খুব প্রাচীন নয়। মাত্র ১৯২৫ খৃঃ অব্দে একজন ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ ফুঙ্গী পুরোহিত এটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন।

এই বৌদ্ধ মন্দিরের বিপরীত দিকে প্রায় সামনাসামনি দেখা যায় অজাতশত্রু গড়ের প্রাচীর চিহ্ন। এই খানেই মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়ে তার নাম দিয়েছিলেন, নব রাজ-গৃহ'। অজাতশত্রু গড় পার হবার পর রাস্তা ক্রমে নীচের দিকে ঢালু হয়ে গেছে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর পথ আবার উচ্চগামী হয়ে উঠেছে। এইখানে পথের ডান দিকে 'ইন্‌স্‌পেক্‌শন্ বাংলো' এবং 'রেস্ট্ হাউস'। বাঁ দিকে জাপানীদের বৌদ্ধ মন্দির। জাপানী বৌদ্ধ মন্দিরের পরই রাস্তার বাঁ দিকে একটু উঁচু স্থানে একটি প্রাচীন

দিগম্বরী ধর্মশালা

ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। পাথরের তৈরী, কিন্তু মর্মর নয়। ডলোমাইট জাতীয় ঈষৎ নীলাভ প্রস্তরে প্রস্তুত। এটিকে ওঁরা বলেন—মহাকাশ্যপের ধ্বংসাবশিষ্ট সমাধি মন্দির। এখান থেকে অল্প দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হলেই চখে পড়বে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ। তলদেশ উচ্চ বেদীর আকারে বাঁধানো। লোকে এ স্থানকে বলে 'ধুনীবট'। এখান থেকে পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করলে যে জায়গাটি চোখে পড়ে, ইনস্পেকসান বাংলোর সামনে সেই স্থানটি নাকি ছিল বৌদ্ধ যুগের সেই বিখ্যাত 'বেণুবন'। দক্ষিণে আর একটু অগ্রসর হলেই পর্ব্বতপুঞ্জ। অবশ্য তার আগেই বাঁ দিকে পড়বে 'মক্‌দুম্ কুণ্ড' এবং পাহাড়ে ওঠবার মুখেই বাঁয়াতি বিপুল

পাহাড়ের কোলে সূর্য্য কুণ্ড। উষ্ণপ্রস্রবণ এখানকার প্রায় প্রত্যেক পাহাড়েই আছে। রাসায়নিকেরা কুণ্ডের এই গরম জল পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে দেখে বলেছেন যে এর মধ্যে Iron Sulphates Nitrates এবং Chlorine আছে। এই জলে নিয়মিত স্নান করলে নাকি পুরাতন বাতব্যাধি ও চর্ম্মরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয় এবং এই জল পান করলে উদরাময় ও অতিসার নিরাময় হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরাও নাকি এই জলে অবগাহন করলে তাঁদের অবশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শৈথিল্য দূর হয়ে পুনরায় স্বাভাবিক বল ফিরে আসে।

আমরা যে ক'দিন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে গেছলুম, সেখানে সর্বপ্রকার রোগীরই প্রচুর সমাবেশ দেখে ভীত হয়েছি। কারণ 'ব্রহ্মকুণ্ড' নাম হলেও কুণ্ডটি ব্রহ্মাণ্ড জোড়া নয়—একটি বড় রকম 'চৌবাচ্চা' মাত্র! তার মধ্যে পাশাপাশি সর্বাঙ্গে দূষিত ক্ষত বা চর্মরোগগ্রস্ত সহস্নানার্থী সমাবেশ কার না ভীতি উৎপাদন করে বলুন? তা'ছাড়া নারী ও পুরুষ

স্বামী বিশ্বানন্দজী

কারা এ গর্হিত কাজ করেছেন খবর নিয়ে জানা গেল এখানকার পাণ্ডা ঠাকুরেরা একটি কমিটি করেছেন। সেই কমিটি থেকে তাঁরা বড় বড় যজমানদের ধ'রে চাঁদা তুলে এই সব কুকীর্ত্তি করেছেন। শুনলুম আমাদের যুবরাজ পাণ্ডা এই কমিটির সেক্রেটারী!

ব্রহ্মকুণ্ডের তলদেশ ভেদ করে উষ্ণ জলের উৎস উৎসারিত হ'চ্ছে কিন্তু তার গতি বড় মৃদু ও উৎক্ষেপণ অতি ক্ষীণ, তাই বিশেষ লক্ষ্য করে না দেখলে চোখে পড়ে না। একটি 'চৌবাচ্চা' গেঁথে এটিকে কুণ্ডে পরিণত করা হয়েছে এবং সেই চৌবাচ্চার চারি পাশে দেওয়াল একতলার সমান উঁচু করে এর মধ্যে একটা রহস্য আরোপের চেষ্টা হয়েছে। দেওয়ালের গায়ে বিষ্ণু মূর্ত্তি, গণেশ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতির মূর্ত্তি এনে
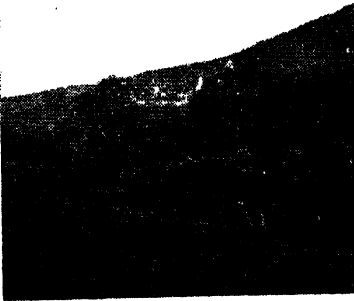
কুণ্ডে যাবার পথে—ধুনীবট

স্নানার্থীর নিত্য এত ভীড় হয় সেখানে যে ধারার নিচে মাথা পাতে কার সাধ্য? সাতটি ধারা আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে দুটি অব্যবহার্য্য অর্থাৎ এত নীচু যে তার তলায় মাথা পেতে বসা যায় না। গামছা কাপড় কাচা চলে মাত্র! দুটি ধারা বেশ উঁচু এবং তোড়ে জল পড়ে। সমস্ত স্নানার্থীর ভীড় সেই দুটির নীচে। বাকী তিনটি জলের ধারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এবং তলায় আরামে বসে স্নান করবার মতো যথেষ্ট উঁচু নয়। ছেলে-পুলেরা সেখানে দল বেঁধে জোটে বটে, কিন্তু বড়রা বড় একটা সেদিকে ঘেঁসেন না।

এই সপ্তধারায় স্নান করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই হতাশ হ'য়ে পড়ি এর কৃত্রিম রূপান্তর দেখে। প্রস্রবণের জল পাহাড়ের কোথা দিয়ে উৎসারিত হ'চ্ছে কিছুই দেখা যায় না! তাকে প্রাচীর গেঁথে লোকচক্ষের অন্তরালে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং সেই প্রাচীর গাত্রে সাতটি কৃত্রিম নল-মুখ তৈরী করে তার ভিতর দিয়ে জলধারা কলের মুখের মতো ক'রে এনে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে সিন্দুক-বন্দী ক'রে প্রয়োজনকে অসৌন্দর্য্যের পীঠে বসানো হয়েছে।

ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যে স্নানার্থীরা

সেঁটে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক যাত্রীকে এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করবার আগে শ্রাদ্ধ তর্পণ, গঙ্গাপূজা বা পাণ্ডা পূজা করানো হয়। ফুল তুলসী এখানেই কিনতে পাওয়া যায়। এখানে আবার একটা ম্যাজিকও দেখানো হয়। যাত্রীদের বলা হয় গরম জল বিষ্ণু পাদপদ্মে অঞ্জলি দাও, সেই জল মুহূর্তে শীতল হয়ে ঝরে পড়বে। মাথা পেতে সেই ঠাণ্ডা জল শিরে ধারণ করো। পরীক্ষা করে দেখেছি। এটা সত্যই হয়। (ক্রমশঃ)

কিসে বিশ্বাস? গঠনকর্ম্ম পন্থায়। দেশের কলুষিত হাওয়া নিষ্কলুষ সেবার দ্বারাই পরিশুদ্ধ হইতে পারে। আজ দুর্দ্দিনে সেই সেবারই আহ্বান আসিয়াছে আবার নূতন রূপে। বিশ্বাস করিবার বলিষ্ঠ মন আবার চাই।

বিশ্বাস ত' একদিন আমরা করিয়াছিলাম। ১৯০৫ সালের সেই অখণ্ড বিশ্বাস 'স্বদেশী'কে ধারণ করিয়া স্বাধীনতার পথ খুলিয়া দিয়াছিল। ১৯২০ সনে, ১৯৩০ সনে আমরা বলিষ্ঠ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলাম, তর্ক করিয়া আপনাকে নিষ্ফল ও ব্যর্থ করি নাই। আজ আবার নূতন করিয়া বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া ধরিবার সময় আসিয়াছে। বহু সাধনায় স্বাধীনতা লাভ হইয়াছে, বহু সাধনার দ্বারাই তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। সাধনা তর্কের ব্যাপার নহে, বিশ্বাসের ব্যাপার। আজ চাই বিশ্বাসী একদল যুবক, যাহারা দেশকে অব্যর্থ জানে ও বুঝে, যাহারা স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি ঠিকমত লক্ষ্য করিয়াছে, যাহারা গান্ধীর নেতৃত্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা, গান্ধীর ব্যক্তিত্বের অধ্যাত্ম শক্তি, গান্ধী কর্ম্মপন্থার সত্যরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাদেরই একদল আপন ঐকান্তিক আগ্রহে, অপরাজেয় কর্ম্মদ্যোতনায় দেশের মানসিক জড়তা, কর্ম্মবিমুখতা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সর্ব্বনাশা কুৎসাপ্রিয়তা ঘুচাইয়া নিষ্ফল তর্কের অবসান ঘটাইয়া নূতন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

'—রতনমণি' নির্ণয়

* * *

গত ২রা আগষ্ট কালনার সমবায় কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র কুমার সেচমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, আগামী বৎসরে নিশ্চয়ই বেহুলা খাল কাটা হইবে, তবে বেহুলা নদী বর্ত্তমানে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সে স্থান দিয়া না কাটিয়া বর্দ্ধমান হইতে সোজা একটী খাল গঙ্গায় মিশিবে। তিনি বলেন যে, আগামী ২।৩ বৎসরের মধ্যেই কার্য্য শেষ হইবে এবং খালটী এরূপভাবে কাটা হইবে যেন বারমাস ষ্টীমার চলিতে পারে। তিনি আশা করেন যে, তাহা হইলে খালের ধারে ধারে নূতন নূতন গ্রাম সৃষ্টি হইবে এবং বৈদ্যপুর অঞ্চল একটী ব্যবসায়ীকেন্দ্র হইয়া উঠিবে ; কারণ ভারতের পশ্চিমাংশ হইতে এই খাল দিয়াই পণ্য আমদানী রপ্তানী হইবে। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে, খাল কাটা হইলে দেশ হইতে ময়লা জল নিষ্কাশিত হওয়ার ফলে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইবে এবং কলিকাতা হইতে ধনী ব্যক্তিগণ বৈদ্যপুর অঞ্চলে স্বাস্থ্য নিবাস তৈয়ারী করিবেন। —'দৃষ্টি'

* * *

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল রোটারী ক্লাবের সভায় তিন সপ্তাহের গভর্ণর স্যার বি এল মিত্র বলিয়াছেন যে ভারতের জনগণ যখন অশিক্ষিত তখন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দ্বারা রাজ্য পরিচালনা উচিত হইবে না, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রেমিক-ডিক্টেটরের প্রয়োজন, গণতন্ত্র চলিবে না। মিত্র মহাশয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে নাম লিখাইয়াছেন কি না এখনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তবে গণতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য যে ভাবে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল হইতে প্রচার কার্য্য সুরু করিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড তাঁহাকে হয় গবর্ণর করিতে নতুবা জেলে পাঠাইতে বাধ্য হইবেন সন্দেহ নাই। —যুগবাণী

* * *

"আমার অভিমত যেমন তেমনই আছে। ভারতের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় গ্রামগুলি এখনকার মত আর সহরের উপর নির্ভর করিবে না, সহরগুলিই গ্রামের জন্য এবং গ্রামের কল্যাণে বাঁচিয়া থাকিবে। অতএব কেন্দ্রের গৌরব-স্থান অধিকার করিবে চরকা, আর তারই চতুষ্পার্শে আবর্তন করিবে সঞ্জীবনী গ্রামশিল্পগুলি।"

—মহাত্মা গান্ধী—হরিজন পত্রিকা

* * *

ব্যাপারটা আপনাদের চোখে পড়িয়াছে কি না জানিনা, পড়িলেও পড়িতে পারে। কংগ্রেসের নিন্দায় পঞ্চমুখ কাহারা? কংগ্রেসের নিজের লোক—অর্থাৎ কর্মী বলিয়া পরিচিতেরা ও পদাধিকারীরা। সরকারের নিন্দা করে কাহারা? তাহার নিজের লোকেরা ও সরকারি কর্ম্মচারিরাই। একেই বলে জ্ঞাতির শত্রু জ্ঞাতি! —বর্দ্ধমানের কথা

* * *

শারদীয় পূজা প্রায় দেড়মাস পরেই হবে। দিকে দিকে তার আয়োজন সুরু হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় কমিটিও গঠিত হয়েছে। বাঙ্গালীর এতবড় পূজার উৎসব আর নেই। উৎসবের সে আনন্দ আজ কোথায়? আজ অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, অর্থ নেই, নূতন কাপড় জামা সংগ্রহ করা কি দুরূহ ব্যাপার! উৎসবমুখরিত পূজাবাড়ীর সেই দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর আনন্দ আজ অদৃশ্য হয়ে গেছে। গৃহস্থবাড়ীর পূজার সংখ্যা, পূজার আয়োজন, পূজার জাঁকজমক ক্রমেই কমে আসছে। অন্যদিকে সর্ব্বজনীন পূজার মধ্য দিয়ে গ্রামের সকলে আমরা একত্রিত হচ্ছি, পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করছি, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেই সমভূমিতে নেমে পূজার মণ্ডপে উৎসবকে সার্থক করে তুলছি, কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে সর্ব্বজনীন পূজায় উদ্ভব হয়েছিল, আনন্দোৎসবগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্য থেকে বার করে এনে সর্ব্বজনীন করে তোলবার যে মহান আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা কি আজ আবার ধূলিসাৎ হতে চলছে না? আবার কি তা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে না? অকারণে একের জায়গায় কি বহু পূজার আবির্ভাব হচ্ছে না? মনে মনে আজ এই প্রশ্ন জাগছে। আজ আর্থিক সঙ্কটের দিনে বহু পূজার মধ্য দিয়ে বহু অর্থ অনর্থক অপব্যয়

হ'চ্ছে কি না? মধ্যবিত্তরাও আজ আর্থিক দিক দিয়ে সকলের চেয়ে সঙ্কটাপন্ন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলোর স্বল্পবিত্ত মধ্যবিত্তদেরই কি একের স্থলে পাঁচ যায়গায় একই সময়ে চাঁদা দিতে হ'চ্ছে না? তাছাড়া পূজার শ্রদ্ধা, গাম্ভীর্য ও আনুষ্ঠানিক দিকটার চেয়ে অজ্ঞাতে পূজাকে উপলক্ষ করে বাহ্যাড়ম্বরের উপর কি বেশি ঝোঁক দিচ্ছি না? —সাধারণী

* * *

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন কলিকাতা সহরের জন্য একটি স্বতন্ত্র কংগ্রেস কমিটি গঠিত হউক। কলিকাতাকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আনা হইবে এইরূপ একটা গুজব কিছুদিন আগে শোনা গিয়াছে এবং এই আশঙ্কার বিবরণ আমরা গত ফাল্গুন মাসে 'নূতন-প্রভাত' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ডাঃ গুহরায়ের প্রস্তাব এই আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। কংগ্রেস কমিটি স্বতন্ত্র করা হইলে আর সব কিছুও ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হইতে আরম্ভ হইবে এবং এই স্বাতন্ত্র্যবাদের সুযোগে কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গচ্যুত হইতে বিলম্ব করিবে না। ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্বের জল কোথা হইতে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা সম্ভবতঃ ডাঃ গুহরায় তলাইয়া দেখিতে চান নাই; যদি দেখিতেন তাহা হইলে এই আত্মঘাতী প্রস্তাব করিতে তিনি লজ্জা বোধ করিতেন। যাহাই হউক, একবার যখন প্রস্তাব করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন প্রত্যাহার করিয়া লইলে খানিকটা বিপদ কাটিবে বলিয়া মনে হইতেছে। —নূতন প্রভাত

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেচনা ও রিপোর্ট করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই কমিটির সুপারিশগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইবে না। নিম্নলিখিত হিসাবে মাধ্যমিক স্তরে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

(১) ইংরাজী ও বাংলা—৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে একাদশতম শ্রেণী পর্য্যন্ত।

(২) রাষ্ট্রভাষা—৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত।

(৩) প্রাচীন ভাষা—৮ম শ্রেণী হইতে একাদশতম শ্রেণী পর্য্যন্ত। অষ্টম শ্রেণী হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি চারি শাখায় শিক্ষাদান করিবে—(১) কলা বিভাগ (২) বিজ্ঞান বিভাগ (৩) টেকনিক্যাল বিভাগ (৪) কমার্শিয়াল বিভাগ। অষ্টম শ্রেণীতে আসিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে স্থির করিতে হইবে—সে কোন্ শাখায় প্রবেশ করিবে।

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশই হইবে ইহার লক্ষ্য, আর ছাত্রেরা যাহাতে সামাজিক ও নাগরিক পরিবেশের যোগ্য হইয়া উঠিতে পারে—তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। —কৈশোরক

* * *

বাঙ্গালীর প্রদেশ-বিদ্বেষ জাগিবার অনেক কারণ আছে। বাংলার প্রায় সমস্ত প্রধান শিল্প এবং বড় বড় বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অবাঙ্গালীর এবং বিদেশীর পরিচালনাধীনে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শ্রমিক বাংলার লোক নয়। সুতরাং বাংলার আর্থিক অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য নাই। বাঙ্গালী মনে করে যে, রাজনৈতিক কারণে একদিন ইংরাজ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির দল বাঙ্গালীকে সায়েস্তা করিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল অবাঙ্গালী ধনীরা সেই কারসাজীতে যোগ দিয়া আজ এ দেশে এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার প্রতিকার হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবসায় সংগঠনের উদ্দেশ্যে সরকারী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে এই সমস্যার কতকটা প্রতিকার হইতে পারে। বোর্ড অযথা কেন্দ্রীকরণ এবং একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন যাহাতে না হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

ভারতের বাহিরে রাষ্ট্রদূতের পদে বা বৈদেশিক বিভাগের চাকুরীতে বাংলা দেশের লোকের নাম শোনা যায় না—হয়ত বাঙ্গালীদের মধ্যে ক্ষমতাবান লোক কম, কিন্তু তবু পণ্ডিতজীর কর্ত্তব্য ভারসাম্য রক্ষণের জন্য অল্প কয়েকজনকেও এই বিভাগে গ্রহণ করা। —সমাজ

* * * *

পাকিস্থানীয় কার্য্য কলাপ দূর হইতে যতই মন্দ বলিয়া ধারণা করা হউক—উহা যে ক্রমেই ভাল হইতে আরও ভালর পথেই চলিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী অনায়াসেই বলিবে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ব হইতে সত্যই হ্রাস হইতেছে। যে সকল মুসলমান পাকিস্থান হইতে পশ্চিম বঙ্গে অথবা আসামে আসিয়া জড় হইতেছে—তাহার মূলে আছে প্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট সঙ্কেত। পেটের দায়ের চেয়ে ভারত সাম্রাজ্যে এইরূপ মুসলমানের ভিড় উদ্দেশ্য-মূলক বলিয়া আমাদের ধারণা। পাকিস্থানের হিন্দুরাই ক্রমেই বলিতে সুরু করিয়াছে আমরা পাকিস্থানের উন্নতি চাহি, হিন্দুস্থানের নহে। এই সকল হিন্দু পাকিস্থানেই বসবাসের সুযোগ পাইতেছেন। যাঁহারা বাস্তুত্যাগী তাঁহাদের দুঃখের কথা অবধারণ করিয়া পাকিস্থানের হিন্দু অধিবাসীবর্গ ক্রমেই সতর্ক হইয়া বাস্তুত্যাগে আর ইচ্ছুক নহেন। —নব সংঘ

* * * *

যুক্তপ্রদেশের মীরাট জেলার পিলসুয়া গ্রামের চাষী শ্রীগঙ্গাশরণ বিঘা প্রতি ১৫০/০ মণ আলুর ফলন ফলাইয়া দেশের চাষীদের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে। জাতীয় সরকার গঙ্গাশরণকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া খুবই ভাল কাজ করিয়াছেন। আমাদের দেশের চাষীরা যদি গঙ্গাশরণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারে, তবে বাংলার যে সত্যসত্যই সোনা ফলিতে পারে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। —পল্লীবাসী

জাহানার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মুরাদ জেগে দেখলেন তার পদদ্বয় গুরুভার শৃঙ্খলাবদ্ধ। হস্ত প্রসারিত ক'রে মুরাদ তার অস্ত্রের সন্ধান ক'রে দেখলেন, তার অস্ত্র নেই। পরিশেষে নিজের অবস্থা অনুভব করলেন। তিনি প্রতিশোধের কোন চেষ্টাই করেন নি। অবনত মস্তকে শান্তস্বরে মুরাদ ব'ললেন,—কোরাণ স্পর্শ ক'রে আমার কাছে এই শপথই করা হয়েছিল।

সঙ্গীত নূতন সুরে বেজে উঠল। মুরাদের অনুচরবর্গ মনে ক'রল যে অভিষেক উৎসব তখনও চলেছে। সন্ধ্যাসমাগমে দুটী হস্তী চ'লেছে—একটী আগ্রার দিকে, অন্যটী দিল্লীর পথে—দুটী হস্তীই প্রহরীবেষ্টিত। দিল্লীর পথে হস্তীপৃষ্ঠে চ'লেছে দুর্ভাগ্য মুরাদ।

ক্রমশঃ মুরাদের অনুচরবর্গ চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সৈন্যাধ্যক্ষদের আদেশ দেওয়া হ'য়েছিল—যেন তখন মুরাদের সেনাপতিগণ শিবির ত্যাগ ক'রতে না পারে। তারা জানত সে কৌশল। * * *

রাত্রিতে হঠাৎ ঔরঙ্গজেবের সৈন্যদল আনন্দধ্বনি ক'রে উঠল "জালা জালালুল্লাহ" (ঔরঙ্গজেব দীর্ঘজীবী হউন)। তার সঙ্গে ঘোষণা করা হল যে, শাহ্‌জাহান এবং মুরাদের অধীনস্থ সৈন্যগণ দ্বিগুণ বেতন পাবে। মুরাদের সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রথমে পলায়নের চেষ্টা ক'রেছিল এবং সৈন্যদল ভীষণ ভীত হ'য়েছিল। কিন্তু পরের দিন দেখা গেল মুরাদের সমস্ত সৈন্য আওরঙ্গজেবের দলে যোগ দিয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের দরবেশের আলখাল্লার নীচে তাঁর শিরায় চেঙ্গিসের রক্তধারা প্রবাহিত হ'ত। চেঙ্গিস সমস্ত পৃথিবীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিল। শক্তি সংগ্রহের আকুলতায় যখন সে রক্ত উষ্ণ হ'য়ে উঠত, রক্তধারায় মুছে যেত কোরাণের অক্ষরগুলি।

মুরাদ চ'লেছে দিল্লীর রাজপথে, অত্যন্ত অপমানিতভাবে। তার পশ্চাতে হস্তীপৃষ্ঠে অনুসরণ ক'রে চ'লেছে ঘাতক—পলায়নের চেষ্টা মাত্রই মুরাদের শিরচ্ছেদ ক'রবে। এই অবস্থায় তাকে কারাগারে নিয়ে গেল, সেখানে তাকে পান করতে হল "পশীর"—সরবৎ।

তারপর ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আমি দারার ইতিহাস লিখছি—আমার কপোল আমি পত্রের উপর ন্যস্ত করলাম, আমার অশ্রুধারা কালির অক্ষরের সঙ্গে মিশে যাক।

মাঝে মাঝে দারার ইচ্ছাশক্তি দুর্দমনীয় হ'য়ে উঠত। সেই শক্তির আবেগে দারা লাহোরে প্রায় ত্রিশ সহস্র সৈন্য সমাবেশ ক'রলেন—লাহোরের পার্শ্ববর্ত্তী একজন রাজা দারাকে সৈন্য সাহায্য ক'রবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দারা তার কথার উপর অত্যন্ত বেশী নির্ভর ক'রলেন। আমার সহোদরদের মধ্যে দারার মতন হৃদয় জয়ের ক্ষমতা আর কারো ছিল না। তার ছিল মুখে সরল হাসি, কণ্ঠে সঙ্গীতের সুর। দারা এই হিন্দুরাজার হৃদয় জয় করার বাসনা ক'রলেন। তাকে রাজানুগ্রহের বহু নিদর্শন এবং যথেষ্ট অর্থ উপহার দেওয়া হ'ল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের গুপ্ত পত্রাবলি রাজ্যের প্রতি কোণে ছড়িয়ে গেল।

হিন্দু রাজা দারাকে পরিত্যাগ ক'রল, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের প্রেরিত অর্থ ত্যাগ ক'রতে পারল না।

ঔরঙ্গজেব সৈন্যদের পুরোভাগে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। তিনি জানতেন যে বহু বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ দারার পক্ষপাতী। তাদের অনেকেই দারার সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। তন্মধ্যে দায়ুদখান অন্যতম। ঔরঙ্গজেব অনেকগুলি জাল পত্র তৈরী ক'রলেন—পত্রের মূল কথা ঔরঙ্গজেব ও দায়ুদখানের পত্র বিনিময় এবং সেই পত্রগুলি দারার হস্তগত হওয়ার ব্যবস্থাও করা হ'ল। ক্রমাগত বিপদ পাতে দারার চিত্ত সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। হতভাগ্য দারা তার বিশ্বাসী সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে অবিশ্বাস ক'রতে লাগলেন। দারা দায়ুদখানকে আদেশ করলেন, আমাকে ত্যাগ কর। আমার সৈন্য পরিত্যাগ ক'রে চলে যাও। দায়ুদখান শিশুর মতন ক্রন্দন ক'রলেন। তার পর দায়ুদখান উত্তর দিলেন—"দুর্ভাগ্য দারাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাচ্ছে"—দায়ুদখান দারাকে পরিত্যাগ করে গেলেন।

অতি দ্রুতগতিতে দারা লাহোর ত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে আশ্রয় অন্বেষণ করলেন। ভাক্কারের দুর্গে তাঁর বহু সুশিক্ষিত সৈন্য পশ্চাতে রেখে গেলেন—অবশ্য তাঁর অনেক সৈন্য তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে গেছে। পরিশেষে দারা গুজরাটে উপস্থিত হ'লেন;—সেখানে সৈন্য সংগ্রহ করলেন।

ইত্যবসরে ঔরঙ্গজেব সংবাদ পেলেন শাহ্‌সুজা বাংলাদেশ পরিত্যাগ ক'রে বহু সৈন্য নিয়ে অভিযান আরম্ভ করেছেন। সুজা দারার অনুসরণ ত্যাগ ক'রে তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ অভিমুখে অভিযান করলেন। তার লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হওয়ার জন্য ঔরঙ্গজেব দ্রুত অশ্বচালনা ক'রে অনেকবার সৈন্যদের অতিক্রম ক'রে একাকী বহুদূর চ'লে যেতেন, কখনও একাকী বৃক্ষতলে বিশ্রাম করতেন। কখনও নিজের ঢালের উপর মস্তক ন্যস্ত ক'রে নিদ্রা যেতেন।

অতর্কিতে ঔরঙ্গজেব একদিন বনপথে রাজা জয়সিংহের সম্মুখীন হ'য়ে পড়লেন। জয়সিংহ সুলেমান শুকোর সৈন্য পরিচালক। তিনি দারাকে ঘৃণা করতেন—কারণ দারা তাঁকে একদিন "গায়ক" ব'লে উপহাস ক'রেছিলেন। কিন্তু জয়সিংহ শাহাজানের প্রিয় পাত্র ছিলেন। জয়সিংহের সৈন্যগণ-ঔরঙ্গজেবকে হত্যা ক'রে সম্রাট শাজাহানকে মুক্ত

করবার জন্য অনুরোধ করল। যদি তাহা করা হ'ত জয়সিংহের প্রশংসায় পৃথিবী মুখর হ'য়ে উঠত।

ঔরঙ্গজেব বিপদের গভীরতা অনুভব করলেন। তিনি একাকী জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে উপস্থিত হলেন—যেন তাঁর প্রত্যাশাই ঔরঙ্গজেব করেছিলেন। তৈমুরের ভাষায় রাজা জয়সিংহকে প্রশংসা করলেন। তারপর নিজের কণ্ঠ থেকে বহুমূল্য মুক্তাহার খুলে রাজার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "আমি আপনাকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করলাম···সাম্রাজ্যের প্রয়োজন—আপনি এই মুহূর্ত্তে দিল্লীর পথে যাত্রা করুন"।

ভাগ্য নিজের পথ রচনার জন্য কতকগুলি অস্ত্র ব্যবহার করে—সে অস্ত্র সৎ হউক আর অসৎ হউক। কিন্তু আমাদের পথের গতি কোন দিকে?

রাজা জয়সিংহ অবিলম্বে দিল্লী যাত্রা করলেন।

আগ্রার তীব্র উত্তাপ কণ্ঠরোধ করে দেয়। প্রায়ই আমি বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি—আমার মনে হত যেন আমার স্বর্ণ শয্যার উপরিভাগে কক্ষের ছাদ আমার শবাধারের আবরণে পরিণত হয়েছে। আমার পিতা ও আমি যেন সমুদ্রে এক নির্জ্জন দ্বীপে জলমগ্ন যাত্রী—আমাদের কাছে আগত সংবাদগুলি যেন একটী বিরাট নৌবাহিনীর বাত্যাবিক্ষুব্ধ ধ্বংসীভূত নৌকার ভগ্ন অংশ। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ঘৃণা যেন আমার পিতার দেহে নূতন জীবনী-শক্তি সঞ্চার করেছিল।

অদূরে খাজুয়ার প্রান্তরে নবীন সম্রাট ও শাহ্ সুজার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল—কি ভীষণ সংগ্রাম! ঔরঙ্গজেবের হস্তীর চতুর্দ্দিকে তীর বৃষ্টি চলেছে! সামুগড়ের প্রান্তরের মত মৃত্যুর সম্মুখীন—সেখানেও বিজয়ী শত্রুদলের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতকের অভাব হ'ল না। যখন ঔরঙ্গজেব হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করছিলেন—মীরজুমলা চিৎকার করে উঠল—"হস্তীপৃষ্ঠে অপেক্ষা করুন"। ঔরঙ্গজেব হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন না। সামুগড় ঔরঙ্গজেবকে সিংহাসনের পথে চলা শিক্ষা দিয়েছিল। সেই বিশ্বাসঘাতক সুজাকে পরামর্শ দিল—হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করুন, যদিও দারার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস সুজা অবগত ছিলেন। তবু ভাগ্যহীন সুজা হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। তাতে তার সৈন্যদলের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হ'ল। সৈন্যদল পলায়ন আরম্ভ করল। জয়ের চরম মুহূর্ত্তে সুজা ঔরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হ'ল।

আমার লেখনী শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। এই কয়েকটী ঘটনা শাহ্জাহানের সাম্রাজ্যের ভিত্তি চিরতরে শিথিল করে দিয়ে গেল, পিতা শাহ্জাহান পুত্রদের বিশ্বাস করতেন—সেই পিতা-পুত্রের সংগ্রামের ধ্বনি হল, "হয় সিংহাসন, না হয় সমাধি।" শাহ্ সুজার ভাগ্যে সমাধিলাভও হয় নি। আশ্রয়ের জন্যে শাহ্ সুজা বর্ম্মাদেশে পলায়ন করেছিলেন, সেখানে রাজা তাকে পশ্চাদ্ধাবন ক'রে বনে নিয়ে গেল। রাজার অনুচরের ছুরিকাঘাতে সুজাকে হত্যা হতে হ'ল। তার মৃতদেহ বন্যজন্তুর আহার্য্যে পরিণত হয়েছিল। রাজপুত্র সুজাই প্রথম সাম্রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করেছিলেন।

খাজুয়াতে সুজার পতনের পর আবার আরম্ভ হল দারার কাহিনী। এখানে আমার কাহিনী আমার প্রারম্ভ দিনে এসে পহুঁছাল। * * *

সেদিন ছিল এক হাজার উনসত্তর হিজরী জমাদিউল-আওয়াল। (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ)। দারা পূর্ব্বব্যবস্থামত যশোবন্ত সিংহের সৈন্যের সঙ্গে আগ্রার পথে মিলিত হওয়ার জন্যে তাঁর নূতন সৈন্য নিয়ে গুজরাট থেকে অভিযান আরম্ভ ক'রলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের সাহায্য ব্যতিরেকে শাহজাদা দারার পক্ষে আওরঙ্গজেবকে প্রতিহত করার বা সিংহাসন উদ্ধার করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু আমার পিতার বিশ্বস্ত সামন্ত যশোবন্ত সিংহ প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করে নি। আওরঙ্গজেবের ইন্দ্রজালে ধরা পড়ে নি, এমন ত কেউ ছিল না।

দারা একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপত্যকায় আজমীরের অদূরে শিবির সংস্থাপন করলেন এবং সেখানে আত্মরক্ষার জন্য কয়েকটী পরিখা খনন করলেন। আওরঙ্গজেব উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন আক্রমণ অসম্ভব। আওরঙ্গজেব নূতন সূত্র অবলম্বন করলেন। অত্যন্ত বিশ্বাসী দিলওয়ার খান তাঁর পক্ষে যোগ দিল। দিলওয়ার খান দারার নিকট পত্র লিখলেন—সে পত্রে লিখিত ছিল, "আমি কোরাণ স্পর্শ করে বলছি যে যুদ্ধের সময় আওরঙ্গজেবের পক্ষ ত্যাগ ক'রে শাহজাদার সঙ্গে যোগ দেব।" সুতরাং দারা সেই পত্রে বিশ্বাস ক'রে তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিলেন যেন তা'রা দিলওয়ার খাঁনের সৈন্যদের আক্রমণ না করে।

যুদ্ধের পূর্ব্বদিন আওরঙ্গজেবের জ্যোতিষ ভবিষ্যদ্বাণী ক'রল যে আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষমণ্ডলীর দুর্ভাগ্য সূচনা করছে। আওরঙ্গজেবের সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁদের গোপন মন্ত্রণা সভায় এই সংবাদ শুনে শেখমীর সম্রাটের হস্তী আরোহণ ক'রে সম্রাটের জন্য জীবন উৎসর্গ করবার অনুমতি প্রার্থনা ক'রলেন। প্রত্যূষের প্রথম প্রহরে সৈন্যগণ যুদ্ধযাত্রা ক'রেছে। শেখমীর আওরঙ্গজেবের হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন, আওরঙ্গজেবের ভূষণ-পরিহিত। প্রভাতের অস্পষ্ট আলোকে সৈন্যগণ নিশ্চিত ছিল যে তাদের অধিনায়ক স্বয়ং পুরোভাগে। যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে। দারার গোলন্দাজবাহিনী শত্রুকে বিক্ষিপ্ত ক'রেছিল। শেখমীর গুলীর আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। কিন্তু তাঁর শরীর-রক্ষী মৃতদেহ যথাস্থানে নিবদ্ধ ক'রে সৈন্যদের উৎসাহিত ক'রছিল। আওরঙ্গজেবের সৈন্যগণ অধিনায়ককে জীবিত মনে ক'রে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রতে লাগল। আওরঙ্গজেব এবারও তাঁর হস্তীপৃষ্ঠ ত্যাগ করেন নি।......

দিলওয়ার খানের সময় এসেছে। তিনি দারাকে ইঙ্গিত ক'রলেন যেন তাঁর সৈন্যদের অতিক্রম ক'রতে দেওয়া হয়। তারপর তিনি দ্বাদশ সহস্র সৈন্য নিয়ে আক্রমণ ক'রলেন। কিন্তু দারার পক্ষে যোগ না দিয়ে দারার সৈন্যদের ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন। দারার সমস্ত সৈন্য পলায়ন করল। সুতরাং দারা দ্বিতীয়বার পরাজিত হ'লেন। হতভাগ্য দারার দুর্ভাগ্য আরও ঘনিয়ে এল। গুজরাটের যে নগর থেকে দারা শুকো

অভিযান আরম্ভ করেছিলেন, সেই নগর নিজের গৃহ মনে ক'রে প্রত্যাবর্তন ক'রলেন। সেই নগরে তৃষ্ণার্ত, ধূলিধূসরিত দারার প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে দারার সমস্ত আশা নির্মূল হ'য়ে গেল। শিবির হ'তে উত্থিত নারীকণ্ঠে আকাশ বিদীর্ণ করে দিল। সে কণ্ঠস্বরে ছিল বিধাতার করুণা যাচ্ঞা!

কেন, কেন ভগবান মানুষের সত্তাকে অবনমিত করেন? অথচ সেই আত্মাকে আবার ভগবান নিজের কাছে টেনে নেন। শাহ্‌জাদা দারার পুরাতন বন্ধুগণ তাঁকে ত্যাগ করে গেল; তাঁর পরাজয়ের পরেও যে সমস্ত সৈন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের অধিকাংশ আজ তাঁকে ত্যাগ করে গেছে। আজ দারা তার হীনতম অনুচরের সঙ্গেও আলাপ ক'রলেন,—যেন তিনি পৃথিবীতে রিক্ততম।

আওরঙ্গজেবের অনুচর কর্তৃক অনুধাবিত হ'য়ে দারা পারস্যের দিকে অগ্রসর হ'লেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তার তিন স্ত্রী, কন্যা জানি বেগম এবং কনিষ্ঠ পুত্র শিপার শুকো। দুই সহস্র অনুচর তখনও তার সঙ্গ ত্যাগ করে নি।

কেন দারা বিশ্রাম না ক'রে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করে যায় নি? এবার অদৃষ্ট তার সম্মুখে সর্ব্বশেষ বাধা সৃষ্টি করল। তাকে দুঃখের গভীরতম গহ্বরে টেনে নিল। পারস্য সীমান্তের অনতিদূরে অতি ক্ষুদ্র ধুণরাজ্য অবস্থিত ছিল। সে রাজ্যের আফগান রাজাকে দারা অতীতে তিনবার মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তার কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করে ধুণরাজ্য পরিদর্শনের ইচ্ছা ক'রলেন। আফগান রাজা তাঁকে সাহায্য না করে সপরিবারে কারারুদ্ধ ক'রল এবং সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রল। দারার খোজা ভৃত্য আফগানকে হত্যা ক'রে তার প্রভুকে রক্ষা করবার সংকল্প করল। কিন্তু তার বন্দুকের গুলি ব্যর্থ হ'য়ে গেল। দারার সমস্ত সৈন্য কারারুদ্ধ হ'ল। সংবাদ রটে গেল যে আওরঙ্গজেবের সৈন্য ধুণরাজ্য থেকে বেশী দূরে নয়। দারার প্রধান স্ত্রী নাদিরা বেগম ভয়ার্ত্ত, কম্পিত, নিরাশাহত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সুতরাং তিনি স্বামীর অবর্তমানে জীবনধারণের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। আওরঙ্গজেবের পার্শ্বচারিণীরূপে নিজেকে কল্পনা করে তিনি শিউরে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "প্রতিহিংসাপিপাসু আওরঙ্গজেব আমার স্বামী-পুত্রের রক্তে তার রক্তপিপাসা নিবারণ করবে। সে অত্যাচারীর জয়যাত্রার পথে আমার মৃত্যু হবে তার জয়চিহ্ন।" তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর অঙ্গুরীর বিষ লেহন করলেন; মুহূর্ত্তে তাঁর মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত। এমন দুর্ভাগ্য আর দারার জীবনে কখনও উপস্থিত হয় নি। নাদিরা বেগম ছিলেন নারী-কুলমণি। মৃত্যু-শিবিরে তখনও ক্রন্দনবিলাপ শেষ হয় নি, অস্ত্রের ঝণঝণা বেজে উঠ্‌ল দুর্গদ্বারে। আওরঙ্গজেবের অনুচর দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল, "বন্দী কর"। যে স্বর ধুণের সমস্ত দুর্গে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ল। দারা তরবারি উত্তোলন করলেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা পত্নীর পার্শ্বে সংগ্রাম ক'রে নিহত হবেন। কিন্তু শত্রুগণ তাঁকে বন্দী করল। তাঁর হস্তপদ শৃঙ্খলিত করল। তার অন্য দুই স্ত্রী, সন্তানগণ এবং ক্রীতদাসীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য চারিটী হস্তী দুর্গদ্বারে নীত হ'ল। একাকী দারা যে হস্তীতে আরোহণ করলেন, তার সন্ধান গোপন রাখা হ'ল। প্রত্যেক হস্তীপৃষ্ঠে উন্মুক্ত বর্শা ও তরবারি নিয়ে ঘাতক উপবিষ্ট ছিল। সে বন্দীর শোভাযাত্রা বাক্কার দুর্গের দিকে অগ্রসর হ'ল। বাক্কার দুর্গরক্ষীগণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল; উৎকোচ গ্রহণে তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করে নি, আক্রমণেও তারা পরাভূত হয় নি। তারা দারার আদেশ ভিন্ন অন্য কোন মানুষের আদেশ—পালন ক'রবে না। এই দুর্গবাসীর বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে বন্দী দারাকেও বাধ্য হয়ে তাদের প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুর নিকট দুর্গদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিতে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করতে হ'ল।

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

যুগের পূজা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নব প্রভাতের অমল আলোকে
উজ্জ্বল তপোবন,
অতুল ছন্দে অমর মন্ত্র
কে করে উচ্চারণ?
হে দেবী দুর্গা, সত্যযুগের
ঋষি ও দ্রষ্টা যারা
করিল তোমার অর্চনা বুঝি
শ্বেত-শতদলে তারা।
অম্বর নীল, অম্বুধি নীল,
নীলাম্বুরাশি-তীরে
জলদ-মন্দ্র— গম্ভীর স্বরে
মন্ত্র পড়িল ধীরে।
সেই সীমাহীন শারদ সুনীল
চন্দ্রাতপের তলে
ত্রেতায় তোমারে শ্রীরামচন্দ্র
পূজিল নীলোৎপলে।

কেশব-কণ্ঠে অনুচ্চারিত
তখনো গীতার শ্লোক,
পুর-দেউলের কনক-কলসে
ঝলিছে স্বর্ণালোক।
দ্বাপরের বীর স্বর্গ হইতে
সুবর্ণ—কোকনদে
শর—সন্ধানে আহরিয়া, দিল
পুষ্পাঞ্জলি পদে।
কাল আবরণে আবরি অঙ্গ
এল যুগান্তে কল্কি,
শুধু থেকে থেকে ঝলকি তিমির
আলেয়া উঠিছে জ্বলি।
নাচে উত্তাল প্রলয়—পয়োধি
প্লাবি' তট-তীর ভাঙা,
রক্ত-কমল নিবেদিনু দেবী,
হৃদয়-রক্তে রাঙা।

পাট ও পীঠ

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

বাঙলার বাহিরে মঞ্চাভিনয়ের অভাব

একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্য কোন প্রদেশে কোন চিরস্থায়ী জাতীয় রঙ্গালয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্য সৌখীন মঞ্চাভিনয় এবং নৃত্যগীতাদি সমন্বয়ে জলসা-জাতীয় অনুষ্ঠান সব স্থানেই প্রচলিত। বহুকাল পূর্বে বোম্বাইয়ে বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় নট ও নাট্যাচার্য বাল-গন্ধর্বের প্রযোজনা ও সুঅভিনয়ে অনেকগুলি সমাজ-শিক্ষা-মূলক সামাজিক নাটক উপভোগ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মারাঠি ভাষায় লেখা এই সব নাটক তদানীন্তন কালের রঙ্গমঞ্চে স্থায়ীভাবে অভিনীত হ'ত এবং দর্শক-মহলে তার অধিকাংশই প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একখানি নাটকের স্মৃতি আমার আজও মন থেকে বিলুপ্ত হয় নি। সে নাটকখানির নাম : "একচ পিয়ালা"। স্বর্গত দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নামক বিখ্যাত নাটকের আদর্শে মদ্যপানের বিষময় পরিণাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই নাটকখানি লিখিত হয়। নারী-চরিত্রে বালগন্ধর্বের অতুলনীয় অভিনয় এই নাটকখানিকে স্মরণীয় করে তোলে।

সম্প্রতি স্বনামধন্য চিত্রাভিনেতা পৃথ্বীরাজ কাপুরের উৎসাহ ও চেষ্টায় বোম্বাই সহরে অনেকগুলি দেশাত্মবোধক নাটকের সহজবোধ্য হিন্দি ভাষায় অভিনয় বিপুল জন-প্রিয়তা অর্জন করেছে। তথাপি স্থায়ী রঙ্গালয়ের অভাবে বাঙলার বাহিরে কুত্রাপি কোন নাট্য-প্রচেষ্টা জাতীয়-শিল্প হিসাবে স্থায়িত্ব লাভ করে নি। ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত কোন কোন নাটকের অভিনয় সাময়িকভাবে বাঙলার বাহিরে, দর্শকবৃন্দের তৃপ্তি বিধান করতে সক্ষম হ'লেও, তা মঞ্চ-রসিকের নাট্যপিপাসা নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়।

বাঙলার মঞ্চ-শিল্পের অবস্থা

বাঙালীর রঙ্গালয় তার সামাজিক ও জাতীয় জীবনের দর্পণস্বরূপ। মনে-প্রাণে নাট্যানুরাগী বাঙালীর সার্থক নাট্য-প্রচেষ্টার পরিচয় বহন করছে শতাব্দীর ইতিহাসে। গৈরিশী যুগের প্রারম্ভ থেকে প্রাক্তন কাল পর্যন্ত অবৈতনিক এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের রচনা নাটকাকারে মঞ্চস্থ হবার সুযোগ লাভ করে। সমাজ-সেবা ও জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধনে আমাদের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকাদির অভিনয়, পরম সার্থকতায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

গিরিশচন্দ্রের অভিনয় প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কিন্তু পরিণত বয়সে, রসরাজ অমৃতলাল বসু, অমর দত্ত, তারাসুন্দরী ও কুসুমকুমারীর অভিনয় দেখে যে আনন্দ পেয়েছি, বোধ করি তার স্মৃতি মন থেকে কখনও অবলুপ্ত হবে না। দানীবাবু গৈরিশী যুগের অভিনেতা। অপরেশচন্দ্রও অগ্রবর্তীদের অন্যতম। বর্তমান শিশির যুগেও তাঁদের প্রতিভা ছিল অম্লান।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আবির্ভাব ১৯২২-২৩ সালে। আর্ট থিয়েটারের অভ্যুদয়ও প্রায় এই সময়। শিশিরকুমার, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতাদের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদানের পর থেকেই, আবার নতুন করে বাঙালার স্তিমিতপ্রায় রঙ্গালয়ের জীবন-দীপ উজ্জল হ'য়ে ওঠবার সুযোগ লাভ করে। এঁদের মধ্যে অভিনয়-কৃতিত্ব ছাড়াও, নবযুগের প্রবর্তক হিসাবে, একাধারে নট, নাট্যাচার্য ও প্রয়োগ-শিল্পীরূপে, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দাবী অনস্বীকার্য। এই স্বীকৃতি ও সম্মানের স্মারণিকা হিসাবে, পরবর্তী যুগকে 'শিশির-যুগ' নামে অভিহিত করার যোগ্য।

রঙ্গালয়কে নব আভিজাত্য দান করে তাকে পরিপুষ্ট করে তোলবার দাবীও শিশিরকুমারের। প্রায় ৩০ বৎসরকাল একাধিক্রমে রঙ্গালয়ের সেবা করেও তিনি আজও ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি। শুধু নাট্য প্রযোজনায় নয়, শিক্ষক ও আচার্য হিসেবে এ যুগে শিশিরকুমার অপরাজেয়

বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর শিষ্য ও শিষ্যাদের মধ্যে কৃতি শিল্পীর সংখ্যা অপরিমেয়।

কথক-ছবির প্রতিযোগিতায় মঞ্চ-শিল্পের স্থিতি ও গতি

যারা মনে করেন, কথক-ছবির প্রবল প্রতিযোগিতার ফলে মঞ্চশিল্পের ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের এ ধারণা সত্য নয়। গত কয়েকবৎসর রঙ্গালয়গুলি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে অন্য কারণে। মঞ্চশিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে, মূলত ভাল নাটকের অভাবে এবং অংশত প্রয়োগ-যোগ্যতার দুর্বলতায় ও উৎকৃষ্ট শিল্পীর সাক্ষাৎ না পাওয়ায়। গিরিশ-চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ বিগত নাট্যকারদের বহু অভিনীত নাটকের পৌনঃপুনিক অভিনয় দর্শনে দর্শকের মন আর তেমন ভাবে আকৃষ্ট হয় না। কারণ যাঁরা এই সব নাটকে অতীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অভিনয় উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা আর হালে-আমদানী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখে পুরো আনন্দ পান না। শিশির কুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী বা নরেশ মিত্র মঞ্চাবতরণ করলেও, নব ব্রতীদের সঙ্গে তাঁদের 'টিম-ওয়ার্ক' সামঞ্জস্য রাখতে না পারায়, সমগ্রভাবে অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয় না।

নতুন নাটকের অভাবে আমাদের রঙ্গালয়গুলি যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হবার পর, স্বাধীন ভারতের মঞ্চ প্রচেষ্টা জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনেক বলিষ্ঠ ও সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। স্বাধীনতা-যুদ্ধে আত্মবলির বিনিময়ে আজ যাঁরা স্মরণীয় এমন দু' একটি শহীদের জীবনী অবলম্বনে রচিত কয়েকটি নাটকের অভিনয় সময়োপযোগী হয়েছে। নট-নাট্যকার শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের কয়েকটি দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় জাতির শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছে।

গণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ নব আদর্শে সত্যিকারের জাতীয় রঙ্গালয় গোড়ে তোলবার এই ত সময়।

বাঙালী কথক-ছবির ভক্ত, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু দুধের স্বাদ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনি খাঁটি নাট্য-রসিকের রস-পিপাসা, সিনেমার কায়াহীন সচল ছবি দেখে মেটবার নয়। বস্তুহীন নাটক যেমন নির্দোষ প্রয়োগ-নৈপুণ্যে উৎরে যেতে পারে না, তেমনি ভাল নাটক সার্বজনীন্ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হ'লে চাই—প্রথম শ্রেণীর নাট্য-শিক্ষক, প্রতিভাবান ও সুদর্শন শিল্পী এবং আধুনিক রুচিসম্মত প্রয়োগ-কৌশল এবং উন্নততর সঙ্গীতের আবেদন। এককালে রঙ্গমঞ্চে কণ্ঠ-সঙ্গীতের আকর্ষণ ছিল প্রবলতর। আজকাল মঞ্চাভিনয়ে সঙ্গীতের নামে যা সচরাচর পরিবেশিত হয়, তা অনভিজ্ঞের কাছেও দুঃসহ।

হিন্দি ও বাংলা বাণী-চিত্রের তুলনামূলক আবেদন

প্রতিযোগিতায় হিন্দি বাণী-চিত্রের তুলনায় বাংলা কথক-ছবি যে পরাজয় স্বীকার করছে, বাঙলার চিত্র-শিল্পের পক্ষে এটা লজ্জার কথা। বাঙলা দেশে, দেখা যাচ্ছে, প্রথম শ্রেণীর হিন্দি ছবিগুলি অবলীলাভরে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ সপ্তাহ চলে যাচ্ছে। কিন্তু গড়পড়তা প্রাদেশিক ছবির আয়ু দশ-বারো সপ্তাহের বেশী নয়। হিন্দি ছবির আমরা বিরোধী নই। কিন্তু এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঙলা ছবি যদি না সমতালে পা ফেলে চলতে পারে, তবে সেটা নিশ্চয়ই খুব গৌরবের কথা নয়।

বোম্বাই বা দিল্লীতে বাঙালীর সংখ্যা বর্তমানে খুব উপেক্ষা করবার মত নয়। এই দুটি শহরে অর্ধ সপ্তাহের জন্যও কোন বাঙালা ছবি চলতে দেখা যায় না কেন? অথচ এই বাঙলাতেই মাঝে মাঝে প্রদর্শিত হয়, তামিল, তেলেগু ও পাঞ্জাবী বাণী-চিত্র।

সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রেখে বাঙলার প্রডিউসারগণ ছবির জন্ম দিয়ে চলেছেন। ফলে ছবির বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু গুণের দিক দিয়ে বিচার করলে, শতকরা দশখানিও ধোপে টিকছে না। আমাদের চিত্র-নির্মাতাদের এ বিষয়ে অবিলম্বে সচেতন হওয়া কর্তব্য।

আমাদের দাবী

নিউথিয়েটার্স বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। একই স্থানে এত গুণী, টেকনিশিয়ান্, কর্মী, সঙ্গীত-পরিচালক ও প্রয়োগ-শিল্পীর যোগাযোগে ঘটেছে, যা অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। হিন্দি ছবির পরিবেশনাতেও এঁদের সর্বভারতীয় খ্যাতি সুবিদিত।

একমাত্র 'রামের-সুমতি'র চিত্ররূপদান ছাড়া গত কয়েক বৎসর নিউ থিয়েটার্সে'র অন্য কোন ছবি তাঁদের অতীতের খ্যাতি ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। তথাপি উন্নত শ্রেণীর রুচিপূর্ণ ছবি দেখতে পাবার আশাই এঁদের কাছ থেকে স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন-সঙ্গিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনী অবলম্বনে সদ্য-গৃহীত বাণী-চিত্রটি খুব সম্ভবত আগামী শারদীয়া অবকাশে মুক্তি লাভ করবে। 'প্রতিশ্রুতি'-চিত্রের খ্যাতনামা পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র এই ছবিখানির পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং বাণী-চিত্রে সন্নিবেশিত গানগুলিতে সুরযোজনা করেছেন—ভারতীয় চিত্ররাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক, রাইচাঁদ বড়াল।

এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম চিত্র-শিল্পী ও পরিচালক বিমল রায় 'উদয়ের পথে'-চিত্রের পরিচালনায় প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর শেষ ছবি 'মন্ত্রমুগ্ধ' আমাদের পুরোপুরি খুশি করতে না পারলেও, ভবিষ্যতে তাঁর কাছে আমরা প্রথম শ্রেণীর এবং সর্বগুণসম্পন্ন ছবি পাবার আশা রাখি।

সাহিত্যিক-পরিচালকের উল্লেখযোগ্য দান

'উদয়ের পথে'-র সুখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায় তাঁর স্বলিখিত উপন্যাস অবলম্বনে সম্প্রতি যে সমস্যা-মূলক সমাজ-চিত্রটির পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন, তার মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ, সৌন্দর্যজ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ছবিটি "দিনের পর দিন" নামে বহু নামজাদা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে।

চিরাচরিত প্রেমের কাহিনী জমাবার বাঁধা রাস্তা এড়িয়ে, রায় মহাশয় এমন পথ দিয়ে গল্পটিকে টেনে নিয়ে গেছেন, যার দুধারে চোখে পড়ে ফণী-মনসা ও কাঁটা-গাছের সমারোহ। এই পথে এগিয়ে চলেছেন যে কটি পথিক, তাঁদের বুকে আছে সাহস, চোখে আছে অবিচল আত্ম-বিশ্বাসের ইঙ্গিত। এমন কয়েকটি নরনারীর পরিচয় পাই এই ছবিতে, যারা বেঁচে—মরে নেই; বরং মরণকে জয় করতেই এরা ছুটে চলেছে দুর্গম-পথে।

দিনের পরদিন যারা অন্যায় সহ্য করে বিনা প্রতিবাদে, শাস্তির ভয়ে লুটিয়ে পড়ে দণ্ডদাতার পায়ে, তাদেরই আসন্ন-কাতর, শিথিল মেরুদণ্ডকে খাড়া করে তুলতে, কতখানি শক্তি, সাহস ও একতার প্রয়োজন—আলোচ্য ছবিখানি তারই ইঙ্গিত বহন করছে। আধুনিক যুগের তরুণ-তরুণীর প্রতিক্রিয়াশীল মনে সাড়া জাগিয়ে তুলতে এই ছবিখানির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার নয়।

সংলাপ-রচয়িতা হিসেবে জ্যোতির্ময়বাবু যে তাঁর সমসাময়িক চিত্রনাট্যকারদের পশ্চাতে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, এটা কম আশার কথা নয়।

নাটকোপযোগী সংগীত-রচনায় তরুণ কবি দানেশ দাসের যোগ্যতা স্বীকার করি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর-সংযোজনায় প্রায় প্রত্যেকটি গান উপভোগ্য হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে।

সাধারণ দর্শককে খুশী করবার প্রচলিত ও চিরন্তন 'ফরমুলা' থেকে বঞ্চিত হ'লেও, "দিনের পর দিন" সাহিত্য ও কাব্যরসিক দর্শককে পরিতৃপ্ত করবার দাবী রাখে। ছোট-বড় প্রায় সকল চরিত্রেই শিল্পীরা সু-অভিনয় করেছেন। এঁদের আতিশয্য-বর্জিত অভিনয়ে নিষ্ঠা ও সংযমের ছাপ বিদ্যমান।

৪২-চিত্রের পরিণাম ও বাতিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

গত মাসে উল্লিখিত, ফিল্ম ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় গৃহীত "৪২" ছবিখানি, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ফিল্ম সেন্সার বিভাগের "Full Board" কর্তৃক প্রদর্শনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ায় বাতিল করা হয়েছে। ছবিখানির বিরুদ্ধে বোর্ডের অভিযোগ যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তার যুক্তিকে সুস্থ মনে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু "৪২" ছবির অংশ বিশেষকে অশ্লীলতার অপরাধেও এঁরা অভিযুক্ত করায়, সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

'আগামী সাহিত্য সঙ্ঘের' বিশিষ্ট সভ্যগণ সম্প্রতি মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য-সভায় সরকারী দমন-নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী ও সমালোচকদের দ্বারা সরকারী অভিযোগগুলি বিশ্লেষিত হবার উদ্দেশ্যে একটি অপ্রকাশ্য

প্রদর্শনীর দাবী করেন। এ দাবী যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সংগত বলে আমরা মনে করি।

অশ্লীলতা-অভিযোগের সপক্ষে সেন্সারের কর্তৃপক্ষ কোন যুক্তি দেন নাই। সুতরাং তার সারবত্তা সম্বন্ধে সরকারের নির্দেশ চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা চলে না।

সহ-শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী বাংলা ছবি

সুখ্যাত কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্যের সত্যলিখিত একটি মৌলিক কাহিনীকে আপাততঃ "সাগরিকা" নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আধুনিক কালের একটি সহ-শিক্ষা কেন্দ্রকে পটভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করে, বাংলা মুখর ছবির জন্য নাট্যরচনার প্রচেষ্টা এই প্রথম।

প্রখ্যাত প্রয়োজক-পরিচালক দেবকীকুমার বসু তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'চিত্র-মায়া'-র দ্বিতীয় অবদানের জন্য এই নতুন ধরণের কাহিনীটিকে গ্রহণ করায় তিনি রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এই গল্পটি চিত্র-নাট্যাকারে শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দেশ-প্রেমের প্রচলিত বাণী, 'শ্লোগান্', বহু-আলোচিত সমস্যা-বিবর্জিত এই রসাল কাহিনীটি প্রেম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মত্যাগের মহৎ আদর্শকে কেন্দ্র করে নাটকাকারে শাখাপল্লবিত হয়েছে। শিক্ষা-ব্রতী তরুণ-তরুণীদের কাছে সে আদর্শের আবেদন ব্যর্থ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

সমুদ্র তটে

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার

নামিছে সন্ধ্যার ছায়া। অশ্রান্ত ক্রন্দন
সৃষ্টির আদিম ক্ষুধা, প্রাণের স্পন্দন
গর্জিছে অতল সিন্ধু। সাগর সৈকতে
জনস্রোত হ'তে দূরে মোদের জগতে
ব'সে আছি আজি মোরা। পশ্চিম গগনে
কাঁপিছে রহস্য শিখা।

আজি পড়ে মনে
পৃথিবীর জন্মকথা—অপূর্ব কাহিনী
মহাশূন্য মাঝে চির অগ্নি-প্রবাহিনী,
অসহ উত্তাপ জ্বালা। তাহারি আভাস,
প্রাণময়ী পৃথিবীর উন্মত্ত উচ্ছ্বাস
হেরি শুভ্র ফেনপুঞ্জে দীপ্ত নীলিমায়
অন্তহীন তরঙ্গ লীলায়। অসহায়
আর্ত বায়ু বহি' আনে বিস্মৃত বারতা
সুগোপন মর্মব্যথা, তীব্র আকুলতা।

মুছে গেল শেষ রশ্মি। ঘনকৃষ্ণ মেঘে
আঁধারে ভরিল ধরা। প্রলয় উদ্বেগে
স্তব্ধ আজি মহাকাশ। ভরিয়া শর্বরী
জ্বলে যেই দীপশিখা—অনন্ত প্রহরী
নিভিয়া সে গেছে নর্ভপটে।

মনে হয়
এখনো জাগেনি, নব সূর্যোদয়,
তারি লাগি' প্রতীক্ষিয়া আছি দুইজনে
সৃজনের পরপারে। এই মহাক্ষণে
ঘুচে গেছে সর্ব দ্বন্দ্ব, সর্ব অনুভূতি,
তুচ্ছ মান অভিমান, করুণ কাকুতি,
বিরহ বেদনা। রূপহীন, তনুহীন,
মোরা যেন পরমাণু আঁধারে বিলীন,
মোরা যেন মৌন ব্যথা সৃষ্টি কামনার,
নিস্তরঙ্গ পারাবার, অতল, অপার।

স্মরণ উৎসব—

গত ১৫ই আগষ্ট ভারতের সর্ব্বত্র ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির দ্বিতীয় স্মরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ২ বৎসর অতীত হইয়াছে, আমাদের অন্নবস্ত্র সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই, নানাপ্রকারে আমরা অধিকতর বিপন্ন হইয়াছি—তথাপি ২ বৎসর পরে ঐ দিনটি আনন্দের সহিতই স্মরণ করা কর্ত্তব্য। দেশের দুর্দ্দিনে নেতারা ঐ দিন অধিক তামাসা না করিয়া ঐ দিন গঠনমূলক কাজে সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেজন্ত ঐ দিন সর্ব্বত্র বৃক্ষ রোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নানা-কারণে দেশ আজ কৃষি বিমুখ ও শ্রম বিমুখ হইয়াছে—সে জন্ত দেশপাল চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই এখন কৃষির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। কাজেই স্বাধীনতা উৎসবের দিনে সকলের 'অধিক ফসল উৎপাদনে'র চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় এক দল বিপথগামী লোক স্বাধীনতাকে 'ভুয়া স্বাধীনতা' আখ্যা দিয়া সে

লাটপ্রাসাদে স্বাধীনতা উৎসবে মহিলাবৃন্দ। ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

লাটপ্রাসাদে স্বাধীনতা উৎসবে মাঙ্গলিক নৃত্য। ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপালের গৃহে স্বাধীনতা উৎসবে মঙ্গলানুষ্ঠান। ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশপালের গৃহে বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান। ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

সম্বন্ধে অবহিত হই নাই এবং কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হই নাই—ইহা সত্য কথা। তাহা করিলে আমরা অবশ্যই স্বাধীনতার সুখ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। যাঁহারা আজ শাসন যন্ত্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে সকল সমস্যার সুসমাধান করিয়া দেওয়াও সম্ভবপর নহে। তাঁহারা দেশকে মুক্তি সংগ্রামে পরিচালিত করিয়া জয়ের পথে লইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। কাজেই নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে কাজে অগ্রসর হইতে হইতেছে। এ অবস্থায় যদি আমরা নিজেদের কর্ত্তব্য না করিয়া শুধু শাসকবর্গকে

দিনও লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিয়াছিল। স্বাধীন ভারতে আমরা যে এখনও নিজ নিজ কর্ত্তব্য

গালি দিই, তাহা হইলে দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইব না। একদিকে ইহাও যেমন সত্য, অন্য দিকে কংগ্রেস-নেতারা ক্ষমতালাভের পর যে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়াছেন, সে কথা তেমনই সত্য। দেশের সর্ব্বত্র যে ধনিক-শ্রমিক বিদ্বেষ ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইলে শাসনযন্ত্রকে সুবিবেচনার সহিত পরিচালনা করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার উৎসবের মধ্য দিয়া যদি আমরা উভয় পক্ষই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি—তবে স্বাধীনতা উৎসব সম্পাদন সার্থক হইয়াছে।

কলিকাতার ময়দানে রাষ্ট্রদূতগণের পতাকা অভিবাদন ফটো—পান্না সেন

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতিতে স্বাধীনতা উৎসব —পঞ্চশস্যের আলিপনা

প্রাদেশিকতা—

শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ বর্ত্তমানে আসামের গভর্ণর। তিনি কাশীর সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও পণ্ডিত বংশের সন্তান, কৃতী পিতা ডাঃ ভগবান দাসের পুত্র এবং নিজেও অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন। আসামে প্রাদেশিকতার ফলে তথায় ভীষণ বাঙ্গালী বিদ্বেষ দেখিয়া তিনি বিব্রত হইয়াছেন। শুধু আসামে নহে,

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতিতে স্বাধীনতা উৎসব

উড়িষ্যা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশেও প্রাদেশিকতা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। এ ৪টি প্রদেশ হইতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের তাড়াইবার জন্য তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। কি করিয়া এই প্রাদেশিকতা দূর করা যায়, সে জন্য শ্রীযুত

শ্রীপ্রকাশ নানা উপায় চিন্তা করিয়া সে বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন—বাঙ্গালী যখন অন্য কোন প্রদেশে যাইয়া বাস করিবে, তখন তাহাকে সেই প্রদেশের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। তিনি আন্ত-প্রাদেশিক বিবাহও সমর্থন করেন। বিবাহের দ্বারা মিলনের বন্ধন সুদৃঢ় হইবে। উড়িষ্যার বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব উড়িষ্যায় বাঙ্গালী বিদ্বেষ কমাইবার জন্য বাঙ্গালী উড়িয়া বিবাহে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন। সহসা এ বিষয়ে পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। তবে গভর্ণর ও প্রধান মন্ত্রীর মত পদস্থ ব্যক্তিরা এই প্রাদেশিকতা দূরীকরণে সচেষ্ট হইলে উহা যে লুপ্ত হইবে, সে বিশ্বাস অবশ্যই আমরা করিতে পারি।

জাপান যাত্রার পথে ইন্দিরার (হস্তী-শাবক) কলিকাতা আগমন ও স্নান ফটো—পান্না সেন

বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ—

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকার ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। মন্‌ট্রিলে ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি-এল উপাধিও দান করিয়াছেন। ক্যানাডাতে ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—তাহার কতকগুলি বৃটিশ, কতকগুলি আমেরিকান ও কতকগুলি ফরাসী আদর্শে পরিচালিত হয়। তিনি বোষ্টনের ম্যাসাচুসেট্‌ ইনিষ্টিটিউটের অধ্যাপক চালমার্সের নিকট শুনিয়াছেন যে সর্ব্বদাই ভারতীয় ছাত্রগণ তাঁহার প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে। যাহা হউক, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৯০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ও কৃতী-ছাত্র দান গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। বাঙ্গালার ছাত্ররা বিদেশে যাইয়া ব্যবহারিক জ্ঞান লাভে সমর্থ হইলে তাহার দ্বারা দেশ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দলে দলে বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া তাহাদের শিল্প ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে বিষয়ে আগ্রহশীল হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন।

সাহানগর শ্মশানঘাটে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু বার্ষিকী দিবসে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত প্রতিমূর্ত্তি ফটো—পান্না সেন

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের চাকরী—

আমাদের কংগ্রেসী শাসনবর্গ যে সর্ব্বত্র আত্মীয়-পোষণের জন্য নূতন মোটা বেতনের পদ সৃষ্টি করিতেছেন, সে কথা 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের মত সাংস্কৃতিক সাময়িক পত্রেও আলোচিত হইয়াছে। চাকরীর সংখ্যা কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

পদ	১৯৩৯	১৯৪৯
সেক্রেটারী	৯	১৯
অতিরিক্ত ঐ	০	৫
সহকারী ঐ	৮	৪০
ডেপুটী ঐ	১২	৮৯
আণ্ডার ঐ	১৬	৪৪
সুপারিটেণ্ডেণ্ট	৬৮	২৯৪
ভারপ্রাপ্ত সহকারী	৮	১৪৮

এখনও সেক্রেটারী ও অতিরিক্ত সেক্রেটারীরা মাসিক ৪ হাজার টাকা এবং সহকারী সেক্রেটারীরা মাসিক ৩ হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন। পূর্ব্বে আমরা এই উচ্চ বেতনের জন্ম বৃটিশকে নিন্দা করিয়াছি। এখনও এরূপ অধিক বেতন দানের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া এত অধিকসংখ্যক মোটা বেতনের কর্ম্মচারীর বেতন দিবার পর দেশের মঙ্গলজনক কাজের জন্ম আর সরকারী তহবিলে টাকা পাওয়া যাইবে না। কেন্দ্রের অনুকরণে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিও কাজ করে—তাহারাও যে এই ভাবে চলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী—

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উৎসবের সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের জন্মদিবস উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ১২৭৯ সালে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম। বর্ত্তমানে তিনি পণ্ডিচারীর ঋষি শ্রীঅরবিন্দ হইলেও বাঙ্গালার লোক তাঁহাকে দেশ-সেবক, শিক্ষা-ব্রতী, বিপ্লবী, সাংবাদিক বলিয়াই জানে। ১৯০৮ সালে বোমার মামলার আসামী অরবিন্দের কথা বাঙ্গালী ভুলে নাই। কারামুক্ত হইয়া তিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্মযোগীন নামক বাংলা ও ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করিতেন। সামসুল আলামের হত্যার পর পুলিস তাঁহাকে সেই হত্যার ষড়যন্ত্রে গ্রেপ্তার করিবে বলিয়া ভগিনী নিবেদিতার নির্দ্দেশে তিনি আত্মগোপন করেন। প্রথমে চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সংঘের গুরু শ্রীমতিলাল রায়ের নিকট থাকিয়া, পরে তিনি পণ্ডিচেরীতে যাইয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা

শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব মহোৎসব ফটো—পান্না সেন

করেন। বহু বৎসর তথায় তিনি যোগ-সাধনায় মগ্ন আছেন। আজ ভারতবাসী সকলে তাঁহার জন্ম দিনে তাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই পূজা শ্রীঅরবিন্দকে উপলক্ষ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির আরাধনা। যে যোগ সাধনায় ভারত তাহার ঈপ্সিত লাভ করিবে, দেশবাসী শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে সেই যোগ সাধনা গ্রহণ করুক—আমরা তাঁহার শুভ জন্ম দিনে এই প্রার্থনাই করিব। তিনি

শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব মহোৎসবে কলিকাতার রাজপথে শ্রীঅরবিন্দের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি সহ দীর্ঘ শোভাযাত্রা —ফটো পান্না সেন

মানুষকে দেবতায় পরিণত করার জন্য যে সাধনা করিতেছেন তাঁহার পূজা দ্বারা আমরা যেন সেই সাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে কলিকাতায় ৭ দিন ধরিয়া আলোচনা-সভা ও উৎসব হইয়াছিল। বিচারপতি

শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব মহোৎসবের হোতাগণ ফটো—পান্না সেন

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগ, লালগোলার রাজা শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রভৃতির চেষ্টায় সে উৎসব সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীদিলীপকুমার রায় এই উপলক্ষে পণ্ডিচেরী হইতে কলিকাতায় আসিয়া সেই উৎসবকে সঙ্গীত-মুখর করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

কংগ্রেসের বিরোধী দল—

বাঙ্গালায় কংগ্রেসের বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র বসু কয়েক মাস ইউরোপ ভ্রমণের পর গত ২রা আগষ্ট কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আসিবার পর হইতে ভারতের সকল বাম-পন্থী দলকে একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীজয়-প্রকাশ নারায়ণও ২রা আগষ্ট কলিকাতায় আসিয়া ২০ দিন এখানে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময় ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীযুত আর-এস-রুইকর প্রভৃতিও কলিকাতায় ছিলেন। সকল বামপন্থী দলকে একত্র করিয়া আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কার্য্য করার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাঁহাদের পরিস্থিতিতে কলিকাতার রাজনীতিক আবহাওয়া গত ২০ দিন খুব গরম ছিল—কিন্তু একদল যুবককে বামপন্থী করার নামে উচ্ছৃঙ্খল করা ছাড়া তাঁহারা কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিতে পারেন নাই। শরৎবাবুর নেতৃত্বে বামপন্থী দল সংঘবদ্ধ হইলে হয় ত তাহাদের দ্বারা দেশ উপকৃত হইতে পারিত। আলোচনায় দেখা দিয়াছে—সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য বজায় রাখিয়া চলার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করিয়া দেশকল্যাণে মনোযোগী হইতেন, তবে মিলনের পথে কোন বাধা থাকিত না।

আচার্য্য রায় স্মৃতিভাণ্ডার—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতে বিজ্ঞান, শিল্প, জনসেবা, মুক্তি-সংগ্রাম প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আমাদের যে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা তাঁহার স্মৃতি রক্ষার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করি নাই। ভারতীয় রাসায়নিক সমিতি সম্প্রতি ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া রসায়ন-বিজ্ঞানের ছাত্রগণকে উৎসাহ দানে অগ্রসর হইয়াছেন। ঐ টাকার শতকরা ২৫ ভাগ পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট দান করিবেন। ভাণ্ডারে মাত্র ৪২ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষে আচার্য্য রায়ের দ্বারা উপকৃত কৃতী লোকের সংখ্যা কম নহে—তাঁহারা সকলে অবহিত হইলে রসায়নিক সমিতির

পক্ষে এই অর্থ সংগ্রহ করা আদৌ কষ্টকর হইবে না। আচার্য্য রায়কে কি আমরা এত শীঘ্রই ভুলিয়া যাইব ?

পুলিনবিহারী দাস—

ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা—বাঙ্গালার বিপ্লববাদের অন্যতম নেতা, খ্যাতনামা ব্যায়াম-শিক্ষক পুলিনবিহারী দাস গত ১৭ই আগষ্ট বুধবার বিকালে ৭৩ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। কলিকাতা বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি প্রত্যহ তথায় শিক্ষার্থীদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। মৃত্যুর দিনও বৈকালে তিনি কৈলাশ বসু ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে রিকসায় করিয়া তথায় গমন করেন ও তথায় যাইয়াই সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা যান। ১৯০৫ সালে তিনি সারা বাঙ্গলাদেশে অনুশীলন সমিতি করিয়া প্রায় ৩০ হাজার যুবককে বিপ্লব-

পুলিনবিহারী দাস

বাদে দীক্ষা দান করেন। ১৯০৯ সালে কৃষ্ণকুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতির সহিত তিনিও বন্দী হন—কিন্তু মুক্তি লাভের পর পুনরায় ধৃত হন। তাহার পর পুনরায় ধৃত হন ও ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়া আন্দামানে প্রেরিত হন। তাঁহার বিচারের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মুক্তির পর তিনি গান্ধীজির আন্দোলনে যোগদান করিয়া শান্তভাবে দেশের যুবকগণকে শরীর চর্চ্চা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করেন। গত ৩০ বৎসর কাল তিনি নিষ্ঠার সহিত সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বিপ্লবীদের গুরু হিসাবে তাঁহার নাম মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

বাঙ্গালায় দলাদলি—

বাঙ্গালা কংগ্রেসে দলাদলি ক্রমে চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে পরাজিত দল তাঁহাদের প্রভাব পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বত্র আন্দোলন করিতেছেন। বিজেতা দলকে সকল প্রকার কার্য্যে বাধা প্রদানের চেষ্টা চলিতেছে। বিজেতা দল কাজ চালাইবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক ছাড়া শ্রীঅমর কৃষ্ণ ঘোষ, ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ বসু ও ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় এই ৫ জনকে লইয়া ওয়াকিং কমিটী গঠন করিয়াছেন। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ হইতে কোন নির্দ্দেশ না আসিলে বাঙ্গালার দলাদলি আরও বাড়িয়া যাইবে ও তাহার ফলে বাঙ্গালা দেশের দুঃখদুর্দ্দশাও বাড়িবে। কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ এই বিরোধ বাড়াইবার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালায় দলাদলি থাকিলে লোক ব্যস্ত থাকিবে—মানভূম, কুচবিহার প্রভৃতি সমস্যার কথা স্মরণ করিবে না। বাঙ্গালার অধিবাসীরা যে বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের দাবী করিয়াছিল, সে বিষয়েও আর উর্দ্ধতন কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে না। এ সময়ে বাঙ্গালী দলাদলি ভুলিয়া সকলে একত্রিত না হইলে বাঙ্গালা দেশের ভবিষ্যতে আর কোন অস্তিত্ব থাকার আশা নাই।

কুচবিহারের শাসন ভার—

শুনা যাইতেছে, শীঘ্রই ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার কুচবিহার রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করিবেন। কুচবিহারের অধিবাসীরা অধিকাংশই বাঙ্গালী—তাহারা ঐ রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার জন্য আপ্রাণ আন্দোলন করিয়াছে—কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোন প্রকারে কুচবিহারের মহারাজাকে হাত করিয়া লইয়া তথায় অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আজ যদি কুচবিহার কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে অচিরে কুচবিহার পশ্চিম বাঙ্গালায় না আসিয়া আসামের সহিত সংযুক্ত হইবে। বাঙ্গালা দেশকে সকল প্রকারে ছোট করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে দাবাইয়া রাখাই এখন কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা বলিয়া মনে হয়। কুচবিহার, ত্রিপুরা ও মণিপুরে

বাঙ্গালীই অধিক সংখ্যায় বাস করে—আজ কুচবিহার বাঙ্গালা হইতে পৃথক করা হইল, কাল ত্রিপুরা ও মণিপুর আসামের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। পূর্ব্ব-পাকিস্থান পৃথক রাজ্য হওয়ায় আজ বাঙ্গালীর বসবাসের স্থান নাই—তাহার পর বাঙ্গালা আরও ছোট করা হইলে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে। বাঙ্গালার সংস্কৃতি একদিন সমগ্র ভারতে প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—আজ তাহা ভারতের সকল প্রদেশের লোকের অসহনীয় হওয়ায় এই ভাবে বাঙ্গালার প্রভাব নষ্ট করা হইবে।

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র—

গত ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার সময় খ্যাতনামা দেশসেবক ও প্রবীণ শিক্ষা-ব্রতী অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র

অন্তিম শয্যায় অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বৈদ্যবাটীস্থ বাস-ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থা হইতে তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। প্রথম জীবনে কিছুকাল জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়। তিনিই সর্ব্ব প্রথম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হইয়া ঐ পদ লাভ করেন। চট্টগ্রাম কলেজে সহকারী অধ্যক্ষ থাকার সময় তিনি ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া সহকারী চাকরী ত্যাগ করেন। কিছুকাল কারা-বাসের পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র সার্ভাণ্টের সম্পাদক হন এবং বঙ্গীয় কংগ্রেসের শিক্ষাবোর্ডের সম্পাদক হন। পরে কিছুকাল তিনি রেঙ্গুনে একখানি ইংরাজি দৈনিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৫ সাল হইতে তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক হন। ঐ সময় হইতে তিনি বৈদ্যবাটীতে (হুগলী) গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন ও বহুদিন বৈদ্যবাটী মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের কাজ করিয়া-ছিলেন। তিনি বহু বাংলা পুস্তক রচনা করিয়াছেন—তন্মধ্যে তাঁহার কয়েকখানি কবিতা পুস্তক বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তি দেখিয়াছি—তেমনই শিশু সুলভ সরলতা ও সকল মানুষের জন্য দরদ তাঁহাকে সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছে। চট্টগ্রামে সে যুগে তাঁহার আদর্শে বিরাট আন্দোলন সাফল্য লাভ করে এবং তাঁহারই ছাত্রদল সারা বাংলা দেশে এক সময়ে জাতীয় আন্দোলনের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা দেশোপযোগী করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে একজন অকৃত্রিম ও চির-উৎসাহী দেশ-প্রেমিকের অভাব হইল।

—চার—

বেশ নিপুণ হাতেই খুন করেছে লোকটাকে।

অতবড় জোয়ান হিন্দুস্থানীটার পাথুরে মাথাটাকেও গুঁড়ো করে ফেলেছে বাজের মতো নিষ্ঠুর লাঠির ঘায়ে। বীভৎস বিকৃত মুখে রক্ত আর কাদার প্রলেপ। শুধু লাঠি নয়—দু চার জায়গায় টাঙ্গিও চালিয়েছে মনে হয়। বক্রফলক সেই ধারালো টাঙ্গির আঘাত হাঁ করে আছে ঘাড়ের ওপর। কোনোমতেই বাঁচতে দেওয়া যাবে না—এই সংকল্প নিয়েই জটাধর সিংকে খুন করেছে নির্মম ভাবে।

দৃশ্যটার পৈশাচিকতা কয়েক মুহূর্ত পাথর করে রাখল সকলকে। এ হত্যা যেন মানুষে করেনি, এই নিধনের ভেতরে কোথাও যেন চিহ্ন নেই মানবিক কোমলতার; শুদ্ধ কোনো রক্ত সমুদ্রের মতো 'বরিন্দের' বন্ধ-মৃত্তিকায় এ যেন একটা প্রাকৃতিক-জিঘাংসা। যেন আচমকা ঝড়ের ঝাপটায় কোনো দিগন্ত-প্রহরী তালগাছ ধ্বসে পড়ে একটা মানুষকে নিষ্পিষ্ট করে ফেলার মতো—বুনো-শূয়োরের দাঁতে কোনো ছিন্নোদর অপমৃত্যুর অমানুষিক বিভীষিকার মতো। এদেশের মাটিতে এই মৃত্যুই যেন স্বাভাবিক, সব চাইতে যুক্তি-সঙ্গত।

খানিকক্ষণ কেটে গেল। দুঃসহ একটা স্তব্ধতা সকলের বুকের ওপর চেপে রইল জগদ্দল-পাথরের মতো।

রঞ্জনই কথা বললে তারপরে।

—একটু ভুল হয়েছে বোধ হয়?

—কী ভুল?—এমন একটা দৃষ্টিতে ভৈরবনারায়ণ তাকালেন যে তার ব্যাখ্যা হয় না।

কিন্তু ও দৃষ্টিকে ভয় পাবার বয়েস তার কেটে গেছে উনিশশো তিরিশ সালে। ওর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুধিত চোখে তাকে গিলে খেতে চেয়েছিল ধনেশ্বর—বিপ্লবী যুগে সেই আই বি ইন্‌সপেক্টার। একটা ছোট দলের মতো হাতের ওপর লোফালুফি করেছিল ছয় চেম্বারের লোড করা রিভলভারটাকে—রাইডারের হিংস্র চামড়াটা বাতাস কেটেছিল তীক্ষ্ণ শোঁ শোঁ শব্দে।

সমান দৃষ্টিতেই রঞ্জন তাকালো ভৈরবনারায়ণের চোখের দিকে।

—বডিটা তুলে আনা উচিত হয় নি। পুলিশে খবর দিলেই ভালো হত।

—পুলিশ!—তাচ্ছিল্যের ক্রূর ভ্রূকুটি ফুটলো ভৈরব-নারায়ণের মুখে। তারপর যেমন করে ম্যান্‌ইটার বাঘ তার 'মড়ি' আগলায়, মৃতদেহটার দিকে তেমনি আগ্নেয় দৃষ্টি ফেলে বললেন, সে খবর একটা দিলেও চলবে পরে। কিন্তু তার আগে—

ভৈরবনারায়ণ সমবেত জনতার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, যেন খুঁজলেন কাউকে। বললেন, দত্ত কোথায়?

—বাসায় গেছেন—একজন পাইক জবাব দিলে।

—এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আসবি। বলবি, জরুরি তলব। তারপর একবার ঘোষেদের আমার দেখে নিতে হবে।

—মুর্দা, বাবু?

—থাক ওখানেই। থানায় একটা খবর দিয়ে আ[illegible] তারা ওটা নিয়ে যা খুশি করুক। আমাদের কাজ আ[illegible] বুঝব।

পায়ের ভারী চটিটার শব্দ করে কুমারবাহাদুর ভে[illegible] চলে গেলেন।

* * *

রাত্রে নিজের ঘরে বসে কিছু একটা পড়বার করছিল রঞ্জন।

গুরুভার একখানা অর্থনীতির বই। লাল পে[illegible] দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে মার্জিনে নোট করে পড়বার বই। কিন্তু আজ আর ওই তর্ক তত্ত্বের অরণ্যে প্রবেশ করতে পারল না। মাথাটা কেমন ভারী আছে, পড়তে পড়তে বার বার ঝাপসা হয়ে অ[illegible]

দৃষ্টি। বইয়ের পংক্তি হঠাৎ যেন ছন্দ-শৃঙ্খলা হারিয়ে একটার এইটার ঘাড়ে এসে পড়ছে। অসম্ভব।

উঠে দাঁড়ালো সে। চারিদিকে ঘন হয়ে নেমেছে কালো রাত্রি। খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে সে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে।

তার ঘরখানা বিশাল বাড়িটার এক প্রান্তে। সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির। পুজোর মরশুমগুলো ছাড়া এ মহলটা অনাদরেই ম্লান হয়ে থাকে। নাটমন্দিরের চালার টিন পড়ে গিয়ে বর্ষার জল পড়ে, তার তলায় ছাগল গোরু অবসর বিনোদন করে। চণ্ডীমণ্ডপ মাকড়শার জাল আর রাশি রাশি ঝুলে আবৃত হয়ে যায়, বাঁধানো বেদীর ফাটলে বর্ষায় ডুবো মাঠ থেকে দু একটা গোখরো সাপ এসে বাসাও বাঁধে কখনো-কখনো। আর চাপ চাপ অন্ধকার-জড়ানো মণ্ডপের কোনায় আরো ঘন টুকরো টুকরো অন্ধকারের মতো চামচিকে ঝুলে থাকে—বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়ায়, আর দিনান্তিক পাণ্ডুরতা চারদিকে সঞ্চারিত হয়ে এলে কতকগুলো প্রেত সত্ত্বার মতো কদাকার ডানা ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে সামনের আম বাগান আর নদী পার হয়ে কোথায় উড়ে যায় কে জানে!

নিজের নির্জন ঘরটিতে বসে বসে রঞ্জন এক একটা সন্ধ্যায় তাদের ডানার শব্দ শোনে। কী একটা বিভীষিকা যেন সঞ্চয়মান সেই অন্ধকারকে মুখর করে তোলে। হঠাৎ যেন মনে হয়: দেবীসিংহের আমল, অথবা তারও অনেক আগে থেকে এই বাড়িতে বসে যারা জমিদারী করেছে, তারা এখনো এখানকার মায়া কাটাতে পারেনি; চাম্‌চিকে হয়ে যক্ষের মতো এ বাড়ির প্রতিটি ইট পাথরকে চলেছে পাহারা দিয়ে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে পুরোণো অভ্যাসের তাগিদে তারা বেরিয়ে পড়ে। নদী পার হয়ে, মাঠ পার হয়ে তারা চলে যায় গ্রামে গ্রামে—তমসার মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে—চাম্‌চিকে [illegible]—ভ্যাম্পায়ার হয়ে মানুষের রক্ত শুষে খায়।

[illegible] হঠাৎ ভয় করে। মনে হয় তারও চারদিকে যেন [illegible] দিয়ে ফিরছে এই চামচিকেরা। লণ্ঠনের বিমর্ষ [illegible]দে আলো পড়ে দেওয়ালে—নতুন জিনিস দেখতে পায় [illegible]কটা। পুরোণো বাড়ি, কতকালের পুরোণো এ দেওয়াল। তার গায়ে এলোমেলোভাবে অজস্র শ্যাওলার বিসর্পিল সবুজ রেখা পড়েছে। ওই রেখাগুলো হঠাৎ যেন কতগুলো মুখ হয়ে ওঠে—যেন চামচিকের ডানার শব্দে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে তারা। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক কতগুলো মুখ—এই মুমূর্ষু প্রাসাদের তারা মৃত প্রতিহারীর দল। ফিস্ ফিস্ করে তাদের কথা বলবার শব্দও যেন স্পষ্ট কানে আসে—বাইরের আমবাগানে বাতাস মর্মরিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে, এই সহজ প্রত্যক্ষ সত্যটাকেও যেন বিশ্বাস করা যায় না কিছুতে।

এই ভয়! একে ভাঙতে হবে। চুরমার করতে হবে এই প্রেত-পূজার বেদীকে। ছাদভাঙা খানিকটা তীব্র তীক্ষ্ণ সূর্যের আঘাতে মিলিয়ে ছায়া হয়ে যাবে এই চামচিকেরা। আজও মানুষের মনের ওপরে এরা ভর করে আছে—প্রেতের ভর! আজও কুমারবাহাদুরের আটটা বন্দুক আর আটত্রিশজন পাইক পাহারা দিচ্ছে এই পিশাচতন্ত্রকে। কিন্তু কতদিন আর?

কতদিন আর? ঘরের দেওয়ালে সরীসৃপ মুখাকৃতিগুলোর দিকে সে তাকালোনা—তাকালোনা সবুজ শ্যাওলায় আঁকা সেই বীভৎস প্রেতসত্ত্বাগুলোর দিকে—উড়ন্ত চামচিকের পাখার শব্দ যাদের জাগরণের সংকেত। এখন অনেক রাত। জানালা দিয়ে সে বাইরে সেদিকেই তাকিয়ে রইল—নদীর ওপারে যেখানে পূর্ব দিগন্ত; যেখানে আগুনের পদ্মের মতো সূর্য উঠে তার বিছানার ওপরেই সর্বপ্রথম তার আলো ছড়িয়ে দেয়।

প্রভাতী সীমান্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল।

পিশাচ মন্দিরের পাথর ধ্বসছে। তুরীদের পঞ্চায়েত বসেছে কালা পুখরিতে। কামারহাটির ডাঁড়ার মুখে জল নামতে দিয়ে তারা আর সর্বনাশ করবে না হাজার বিঘে ফসলী জমির। জমিদারের ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারীর জলচর না ভরলেও তাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—এবার রুখে দাঁড়িয়েছে তারা। ওদিকে সাঁওতালেরা বুনোশূয়োর মারতে শিখছে—ধীরু সাঁওতালের ছেলে বীরু সাঁওতাল ধান সিঁড়ির আল্‌পথে খেলা করে বেড়ানো কেউটের শিশুর মতো বিষ সঞ্চয় করছে আস্তে আস্তে। আর তাদের সঙ্গে আজ বাহু মিলিয়েছে 'তুরা'র ঘোষেরা—বাজের মতো লাঠির মুখে ভেঙে চুরমার

করে দিয়েছে লোহা পেটা জোয়ান জটাধর সিংয়ের ইস্পাতী মাথাটা!

একটা ছবি মনে পড়ল হঠাৎ।

হোই বাবু, সামাল।

সাইকেলে করে আসছিল। পেছন থেকে আবার ডাক এল: সামাল বাবু, সামাল।

কী ব্যাপার? এমন ভাবে সাবধান করে কে?

চারদিকে তাকাতেই ব্যাপারটা বোধগম্য হল তার কাছে।

চৈত্রের মাটি ফাটানো রোদে শুকিয়ে একেবারে খড় হয়ে গেছে চারদিকের বুক সমান উঁচু ইকড়, বিন্না আর শন ঘাসের বন। সেই বনে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সাম্‌নে, পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে ধূ ধূ করে জলছে শুকনো ঘাস, কালো ধোঁয়া কুণ্ডলিত হয়ে উঠছে আকাশে। যেন চারদিক থেকে একটা অগ্নিবৃত্ত আসছে ঘিরে ঘিরে।

—সামলে বাবু। আগুনের ভেতর গিয়ে পড়িস্ না।

সেই আগুনটা যেন আজও এগিয়ে আসছে অনিবার্য মূর্তিতে। কিন্তু ঘাসবন নয়। অরণ্যের দাবাগ্নি। এর হাত থেকে নিস্তার নেই এই প্রেতপুরীর। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—ঝোড়ো বাতাসে উড়তে থাকবে সেই ছাই—মহাকালের বুকে মিলিয়ে যাবে নিশ্চিহ্নতায়।

—মচ্—মচ্—মচ্—

নাগ্‌রা জুতোর শব্দ। কাঁচা চামড়ার আওয়াজ। ওদিকের লম্বা বারান্দাটা দিয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছে একটা লণ্ঠনের আলো। মুখ ফিরিয়ে দেখল। প্রহরী। জমিদার বাড়ি পাহারা দিয়ে ফিরছে। ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠির শব্দ পাওয়া গেল, বারকয়েক শোনা গেল কুঁই কুঁই করে খানিকটা কাতরোক্তি। দারোয়ানের লাঠির ঘা খেয়ে একটা ঘুমন্ত কুকুর পালিয়ে গেল বারান্দা থেকে।

আবার জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল নিশীথ দিগন্তের দিকে। একটা ভোঁতা ছুরির মতো তমসাস্তীর্ণ নদীটা বয়ে যাচ্ছে। ওপারের মাঠটার শেষপ্রান্তে একটা মস্ত বড় আলো—কারা একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছে যেন। ঠিক তারই ওপরে আকাশে একটা জলজলে প্রকাণ্ড তারা। ওই তারাটা থেকে খানিকটা আগুন মাটিতে ছিটকে পড়েই কি জ্বলে উঠেছে অমন দাউ দাউ শব্দে?

নক্ষত্রের আলো, না আগামী দিনের সংকেত আকাশের সীমান্তে সীমান্তে যেন ভবিষ্যৎ দিনের প্রত্যাশা যেন দলে দলে মানুষ মশাল হাতে আসছে এগিয়ে। পূ পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—প্রতিটি প্রান্ত থেকে পদক্ষেপ করে মশালধারী সৈনিকের দল। আসছে—এগিয়ে আসছে চারদিকের পুঞ্জ পুঞ্জ জঞ্জালে তারা আগুন ধরিয়ে দেবে।

আচ্ছা—ওই দিকে, নদীর ওপারে ওই অগ্নিকুণ্ডটা কাছাকাছিই কোথাও কি গোয়ালাদের সেই গ্রাম নয় সেই গ্রাম—যেখানে লাঠির ঘায়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গে জটাধারী সিংয়ের মস্ত শক্ত মাথাটা? আর শুধু তার মাথা নয়—সে চোটটা সোজা কুমার ভৈরবনারায়ণের ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে?

হ্যাঁ—ওদের দেখেছে রঞ্জন। বরিন্দের আরং মৃত্তিকায় চিনেছে আর একটি দুর্ধর্ষ শক্তিকে। মা নোয়ায় না—হার মানতে জানে না। খোলা মাঠ আ খোলা হাওয়ায়, পোষা মহিষের ক্ষীরের মতো ঘন দু খেয়ে খেয়ে দরজার কপাটের মতো চওড়া তাদের বু প্রতিটি পাঁজর যেন লোহার আগল। 'শাল-প্রাংশু মহাভু আর পুঁথির জগতে বেঁচে নেই, তা নেমে এসেছে জনগণে পৃথিবীতে—পৌরাণিক ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবান বিপুল সং আজ ওদের মধ্যেই সার্থক হয়েছে—পেয়েছে সর্বোত্ত পূর্ণতা।

আদিতে ছিল যাযাবর। ঘর ছিল পশ্চিমের মাটিতে রক্তের মধ্যে কোন্ আদিম যাযাবরী প্রেরণায়, কো জমিদারের অত্যাচারে গ্রাম-নগর-নদী-পাহাড়-বন পেরি এখানে এসে বাসা বেঁধেছে কে জানে। কিন্তু শুধু বাসা বাঁধেনি—শক্ত করে শিকড় মেলেছে মাটিতে—সাঁওতালদে মতো সহজে উৎপাটিত হয়ে যাবে এমন শিথিল মূল ন এদের। হাতে এদের দশ থেকে বারো হাত পর্যন্ত ল লাঠি; তার গিঁটে গিঁটে পিতলের তার জড়ানো, বছরে পর বছর সর্ষের তেলে সে লাঠি পাকানো। লোহার মতে তা দৃঢ় আর নির্মম—তার দণ্ড চরম দণ্ড।

রঞ্জনকে দেখে খুব অভ্যর্থনা জানিয়েছিল ঘোষেরা। অদ্ভুত ভাষা বলে। খানিকটা ভাষা হিন্দী, খানিক বাংলা। কিছু কিছু সাঁওতালী আর ওঁরাওঁ ভাষার খ তার সঙ্গে। রঞ্জনের মনে হয়েছিল বেশ চমৎকার এক

সর্বজনীন ভাষা তৈরী করে ফেলেছে এরা—রাষ্ট্রভাষার সমস্যা ফেলেছে মিটিয়ে।

—ঠাকুর বাবু, নমস্তে।

—নমস্তে। কী খবর তোমাদের?

—খবর খুব আচ্ছাই।—ঘোষেদের মুরুব্বি যমুনা আহীর বলেছিল: লেকিন্ থোরা থোরা গণ্ডগোল হচ্ছেন।

—কী গণ্ডগোল হচ্ছেন আবার?

—বলছি ঠাকুর বাবু। আপনি আচ্ছা আদমি আছেন, আপনি সমঝাবেন। তো আগে আসেন, একটু তামাকু খেয়ে যান।

—আমি তো তামাক খাই না।

—তো ভি আসেন—বসেন একটু—আবার অভ্যর্থনা করল যমুনা আহীর।

আমন্ত্রণটা আর উপেক্ষা করা গেল না। তা ছাড়া পথ চলতে চলতে সেও ভারী ক্লান্তি বোধ করছিল। সারাটা সকাল এই কড়া নগ্ন রোদ মাথার ওপর নিয়ে সাইকেল করেছে সে—শরীর যেন বইছিল না। একটু বিশ্রাম পেলে মন্দ হয় না—মনের ভেতর থেকে এই জাতীয় একটা তাগিদ ঠেলে উঠছিল বার বার।

তাকিয়ে দেখল আহীরদের বাগানের দিকে। এক জোড়া নিমগাছ এই টিলাটার ওপর ভারী স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়েছে। গাছ দুটো ওরাই লাগিয়েছে সম্ভব—নইলে লাল মাটির এই দেশে এমন করে প্রাকৃতিক খেয়ালে নিমগাছ জন্মায় না। কিন্তু নিজেরাই লাগাক আর মাটির খেয়ালেই হোক—এই রোদের মাঝখানে তাদের ঠাণ্ডা ছায়া যেন দূঢ় একটা মরুদ্যানের আভাস বয়ে আনে। সেখানে খান দুই দড়ির খাটুলি পাতা। ইচ্ছে করল ওই খাটুলি দুটোর ওপরে সেও খানিকটা গড়িয়ে নেয়, একান্ত করে জুড়িয়ে নেয় তার উত্তপ্ত শরীরের যা কিছু জ্বালাকে।

খাটুলিতে এসে সে বসল। যমুনা আহীর তাকে বসিয়ে ঘরে ঢুকল, তার একটু পরেই বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস হবে—স্বাস্থ্য আর যৌবন যেন সর্বাঙ্গে প্রখর হয়ে জেগে আছে তার। সুডোল নিখুঁত হাতে মোটা রূপোর বালা, কিন্তু সে বালা অলঙ্কার নয়—অস্ত্র। তার একটি ঘা লাগলে যে কোনো দুর্বিনীত লোভী মানুষের মুখ চোখ ভোঁতা হয়ে যাবে চক্ষের নিমেষে। উজ্জ্বল শ্যাম কান্তি—সারা শরীরে তার রূপ আছে কিনা কে জানে? কিন্তু বরেন্দ্র ভূমির জ্বলন্ত রৌদ্র যে বিচ্ছুরিত হয়ে আছে কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

যমুনা আহীরের মেয়ে। ঝুমুরি।

ঝুমুরি রূপোর বালা পরা নিটোল হাতে পরিচ্ছন্ন একটি কাঁশার গ্লাস বয়ে এনেছে। রঞ্জনের সামনে ধরে বললে, পীজিয়ে।

—কী এ?

যমুনা এসে বললে, ওটুকু খেয়ে লিন্ ঠাকুরবাবু। দুধ আছে।

—দুধ! দুধ খাবো?

হা হা করে হেসে উঠল যমুনা আহীর—মাঠের মধ্য দিয়ে হাসিটা দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে গেল যেন। বললে, দুধ তো পিবারই জন্যে। দেখবার জন্যে তো নয়।

মুক্তা-ধবল দাঁত বের করে হাসল ঝুমুরি। নিটোল হাতে গেলাসটি আরো কাছে এগিয়ে এল। আর প্রত্যাখ্যান করতে পারল না রঞ্জন।

খাঁটি মহিষের দুধ। মৃদু জ্বাল্ পড়ে তাতে সঞ্চারিত হয়েছে আরো খানিকটা সুমিষ্ট আস্বাদ। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করল সে। মনে হল, সে শুধু দুধই খেল না, তারও সর্বদেহে যেন 'বরিন্দের' মাঠ থেকে আহরিত হ'ল 'জল-বাতাস-রৌদ্র স্বাস্থ্য'—যেন কোনো পরিপূর্ণ জীবনের একটা বিশাল তরঙ্গ ভেঙে পড়ল তারও রক্তের গভীরে।

গ্লাসটা ঝুমুরিকে ফিরিয়ে দিলে। তারপর তাকালো যমুনা আহীরের দিকে।

—এইবার তোমার কথা শুনব ঘোষ। কী গণ্ডগোলের কথা বলছিলে?

(ক্রমশ)

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সন্তোষ ট্রফি ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম বাঙ্গালা ৫-০ গোলে হায়দরাবাদকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে বাঙ্গলার চতুর্থ জয়। ফুটবল খেলার একান্ত অনুরাগী হিসাবে আই এফ এ-র ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় মহারাজা সন্তোষের খ্যাতি ক্রীড়ামহলে সুবিদিত। ফুটবল খেলায় তাঁর দানের কথা স্মরণ ক'রে আই এফ এ-কর্তৃপক্ষ মহারাজা সন্তোষের নামে একটি ট্রফি অলইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের হাতে দান করেছেন। আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী দলকেএই ট্রফিটি উপহার দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন হয়েছে ১৯৪১ সালে। মাঝখানে ৩ বছর খেলা হয়নি। বাঙ্গালা দেশ প্রতিবারই ফাইনালে উঠেছে। ট্রফি বিজয়ী হয়েছে ৬ বছরের খেলার মধ্যে ৪ বার। ফাইনালে সব থেকে বেশী গোল ক'রে রেকর্ড করেছে বাঙ্গালা দেশই। এ বছরের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালা দেশ সি পি কে ৯-০ গোলে হারিয়ে নতুন রেকর্ড করেছে ; এত অধিক গোলে অপর কোন দলই এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়নি। বাঙ্গালা দেশ এ বছরের খেলায় মোট ২২টি গোল দিয়েছে, এটাও একদিক থেকে প্রতিযোগিতার রেকর্ড। ২২টি গোলের মধ্যে দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড মেওয়ালাল নিজেই দিয়েছে ১১টা, তার মধ্যে একটা 'Hat-Trick'। এত বেশী গোল ব্যক্তিগত ভাবে কোন খেলোয়াড়ই এই প্রতিযোগিতায় ইতিপূর্ব্বে

সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাঙ্গালা দল ফটো ঃ প্রভাত বসু (ভেগো)

দিতে পারেনি। এই খেলার আলোচনা প্রসঙ্গে, খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটির সভ্যদের খামখেয়ালীর উল্লেখ খুবই প্রয়োজন। প্রথমেই দলের অধিনায়ক মনোনয়ন সম্পর্কে ধরা যাক। প্রথম দুটি খেলায় মোহন-বাগান ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক এবং বর্ত্তমানবৎসরের ফুটবল সম্পাদক অনিল দে বাঙ্গলা দলের নেতৃত্ব করেন। এই দুটি খেলায় বাঙ্গলা দল ৯—০ গোলে সি পি কে এবং ৫—০ রাজপুতনাদলকে হারিয়ে দেয়। বাঙ্গলাদলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের চাপে পড়ে আগন্তুক দল যে বিপর্য্যস্ত হয়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের প্রয়োজন নেই, খেলার ফলাফলই তার সাক্ষ্য দেয়। এরূপ অধিক গোলের ব্যবধানে অগ্রগামী থাকলে শেষের দিকে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের গোল দেওয়ার আর উদ্দীপনা থাকে না, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের কোন সময়েই বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। ছেড়ে খেলার দরুণ কদাচিৎ বিপক্ষদলকে বাঙ্গালা দলের রক্ষণব্যূহ ভেদ করতে দেখা গেছে কিন্তু অব্যর্থ গোলের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। সুতরাং এই দু'দিনের খেলায় এমন কোন ত্রুটিই চোখে পড়েনি যার জন্য তাঁর স্থানে অন্য খেলোয়াড় দিয়ে দলের অধিনায়ক বদলের প্রয়োজন হয়েছিল। অধিনায়ক অনিল দের শূন্য স্থানে মান্নাকে অধিনায়ক নির্ব্বাচন করা হয়েছিল মাদ্রাজের বিপক্ষে। মান্নাকে এবছরের ফুটবল মরসুমে দু' একটা ম্যাচ খেলতে দেখা গেছে, সমস্ত লীগমরসুমই পায়ের আঘাতের ফলে অবসর নিতে হয়েছিল। সুতরাং প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় পূর্ব্ব খ্যাতিমত তিনি সে দিন যে খেলতে পারবেন না এ আমরা পূর্ব্বাহ্ণেই ধরে নিয়েছিলাম। হয়েছিলও তাই। ফাইনাল খেলায় যোগদান সম্পর্কে পূর্ব্ব থেকেই অক্ষমতা জানিয়ে তিনি সুবিবেচনার কাজই করেছেন। ফাইনালে এস নন্দীকে অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত অধিনায়ক নির্ব্বাচন পর্ব্বটা অত্যন্ত অশোভন ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল অথচ এই তিন জনের অধিনায়কত্বের দাবী সম্পর্কে কারও আপত্তি নেই। সচরাচর কোন প্রদেশ বা দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় প্রথম যে খেলোয়াড়কে অধিনায়ক নির্ব্বাচন করা হয় সেই ব্যক্তিই শেষ পর্য্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত থাকে, ক্রীড়াজগতে এই নীতিই আমরা দেখে আসছি। অবিশ্যি ক্যাপ-টেনের কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য ভাইস-ক্যাপ্টেনকে দলের ভার নিতে দেখা গেছে। টেষ্ট ম্যাচ ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ক্যাপ্টেনকে কতবার শূন্য রাণ করতে দেখা গেছে এবং খেলায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে কিন্তু আমরা সাত তাড়াতাড়ি খেলোয়াড় নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে এর জন্য দলের ক্যাপ্টেন বদলাতে দেখিনি। যে দেশের নামকরা সঙ্গতিপন্ন দলগুলির কর্ত্তৃপক্ষ লীগ-শীল্ড পাওয়াটাই সব থেকে বড় গৌরব বিবেচনা করেন এবং স্বদেশের প্রকৃত বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের খেলায় যোগদান থেকে বঞ্চিত ক'রে আধা-পেশাদারী অবাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে দল পুষ্ট করতে লজ্জাবোধ করেন না, তাঁদের নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে হাত থাকলে তাঁরা যে বাঙ্গলার ক্রীড়ামোদীদের কাছে একটা নতুন কিছু দৃষ্টান্তও প্রতিষ্ঠা

বিজেতা হায়দরাবাদ দল ফটো : প্রভাত বসু (ডেপো)

কার্ত্তিক—১৩৫৬

প্রথম খণ্ড	সপ্তত্রিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

বর্তমান

রাধারাণী দেবী

সুদীর্ঘ নিস্তব্ধ রাত্রি হোলো শেষ ; প্রত্যুষ উদয়।
অন্ধকার মসীলিপ্তি দিগন্তে আপনি হলো ক্ষয়
ঘূর্ণমান কালচক্রে। পূরব প্রত্যন্তে দিলো দেখা
ভাবীযুগ-আরম্ভের প্রথম-উদয়ারুণ-রেখা।

সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্ন অন্তে হে ভারত। সুপ্তিশয্যা ছাড়ি
বিলুপ্তির গ্রাস হতে জীবনেরে আনিয়াছো কাড়ি!
সে-জীবন হোক্ তব স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যরূপে স্বীয়,
কর্মে তব, ধ্যানে তব, জীবনের আদর্শে স্বকীয়।

আজিও তোমার বক্ষে বিরাট কৃচ্ছ্রের বহ্নি জ্বলে ;
অশান্তির বুভুক্ষার তুষানলে দহি পলে পলে
এখনও রয়েছো তুমি অগ্নিপরীক্ষায় সমাসীন ;
শেষ-ধৈর্য-মূল্যে তব দিবে দেখা আকাঙ্ক্ষিত দিন।

নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের সমস্যার জাল
নিকটের স্বার্থ যেন আচ্ছন্ন না করে দূরকাল।
তোমার জাগ্রত দৃষ্টি নিবদ্ধ হউক ভবিষ্যতে—
মানবে দেবত্ব যেথা বিলাইবে বিপুল জগতে।

স্বাধীন ভারতবর্ষ। পৃথিবীর হট্ট কোলাহলে
বিভ্রান্ত হোয়োনা তুমি। 'পরধর্ম' কভু ক্রীড়াচ্ছলে
লইয়োনা নিজে তুলি। 'ভয়াবহ' পরিণাম যার।
বিশ্ব-মানবের সেবা চিরন্তন স্বধর্ম তোমার।

স্মৃতি বিস্মৃতির চিহ্নে বিচিহ্নিত জীর্ণ স্বর্ণতরী
আবার ভাসিল জলে, নবীন কেতন উর্ধ্বে ধরি ;
বিক্ষুব্ধ সমুদ্র আজি উন্মত্ত তরঙ্গে সমুত্তাল,
ধ্রুবতারা লক্ষ্য রাখি দৃঢ় করে থাকো ধরে হাল।

আজিকার কৃষ্ণপটে দূরকালে হবে নাকি লিখা
মহত্তর-গৌরবের সমুজ্জ্বল আনন্দ-ভূমিকা ?
অনাগত ভবিষ্যের নব নব তোরণে তোরণে
বর্তমান এই দিন ঝকিবে কি অমর-কিরণে !

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-উৎসব উপলক্ষে নিখিল ভারত বেতার কেন্দ্রে রচয়িত্রী কর্তৃক পঠিত।

ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটেনের নিকট ভারতবর্ষের প্রভূত পরিমাণ ষ্টার্লিং পাওনা জমিয়া উঠিয়াছে। আগে ব্রিটেন ছিল ভারতের উত্তমর্ণ দেশ। ভারতে রেলপথ বসাইতে এবং যুদ্ধাদি নানা উপলক্ষে ভারতসরকার ব্রিটেন হইতে ঋণ হিসাবে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালীন সঞ্চিত ষ্টার্লিং হইতে এই ঋণতো শোধ হইয়া গিয়াছেই, অধিকন্তু যুদ্ধান্তে ভারতসরকারের নিকট ব্রিটিশ সরকারের দেনা থাকিয়া গিয়াছে ষোল শত কোটি টাকার বেশী। এই ভাবে যুদ্ধের দৌলতে বহির্জগতে দেনদার দেশ ভারতবর্ষ পাওনাদার দেশরূপে পরিগণিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

কিন্তু বহির্জগতে ভারতবর্ষের অধমর্ণত্ব ঘুচিয়া উত্তমর্ণত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই ষ্টার্লি ; পাওনার জন্য ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দুর্গতি ঘুচে নাই। বরং অন্তর্দ্দেশীয় অর্থনীতির হিসাবে ভারতের অবস্থা এখন যুদ্ধের আগের তুলনায় অনেক শোচনীয়। সকলেই জানেন, ব্রিটেনের নিকট ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা এত বেশী জমিবার প্রধান কারণ—১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আথিক চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের সমর ব্যয়ের একাংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি। এই হিসাবে ব্রিটেনের ভাগে এক হাজার সাত শত কোটি টাকার বেশী পড়িয়াছে। এই টাকা ব্রিটেন নগদ না দিয়া দিয়াছে ষ্টার্লিং প্রতিশ্রুতিপত্রে। ব্রিটেনের হিসাবে যে খরচ হইয়াছে, তা ছাড়া যুদ্ধের সময় ভারতের নিজের হিসাবেও প্রচুর খরচ হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ এই ছয় বৎসরে দেশরক্ষা খাতে ভারতসরকারের ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১৭৪০ কোটি টাকা। নানা ভাবে করনীতির সংস্কার করিয়াও ভারতসরকারের পক্ষে এতটাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই, কাজেই ঘাটতি পূরণ করিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে ঋণপত্রের উপর। এই ভাবে যুদ্ধের মধ্যে ভারতসরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বাজারে প্রচলিত নোটের পরিবর্তে সরকারের তহবিলে স্বর্ণ থাকাই বিধেয়, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৩৩ (২) ধারার সুযোগ লইয়া (এই ধারায় ভারতীয় মুদ্রার জামিন হিসাবে ষ্টার্লিং সিকিউরিটিকে স্বর্ণের সমান মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে) ভারতসরকার সঞ্চিত পাওনা ষ্টার্লিংয়ের জামিনে অবিরাম নোট ছাপিয়া গিয়াছেন এবং যুদ্ধের আগে ১৭৮ কোটি টাকার স্থলে ভারতের বাজারে প্রচলিত নোটের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে যুদ্ধাবসানে বারো শত কোটি টাকায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। এই নোটের বিপরীত দিকে ভারতসরকারের হাতে মজুত স্বর্ণের মূল্য ছিল মাত্র ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা।

নোট ও ঋণপত্র মিলাইয়া ভারতসরকারের এই পর্ব্বতপ্রমাণ আর্থিক দায়িত্বের একমাত্র আশাভরসা সঞ্চিত ষ্টার্লিংগুলি। সরকারী আয় ব্যয় অপেক্ষা যদি অধিক হয়, তবেই আর্থিক স্বাচ্ছল্য সৃষ্টির ফলে ভারতসরকার দেনা শোধ করিতে পারেন। এজন্য পূর্ব্বাহ্নে দরকার দেশবাসীর আর্থিক সচ্ছলতা। দেশে শিল্পবাণিজ্য যদি বাড়ে তবেই সে সচ্ছলতা সম্ভব। শিল্পাদি বাড়াইতে হইলে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন এবং যন্ত্রপাতি এদেশে তৈয়ারী হয় না বলিয়া বিদেশ হইতে তাহা আমদানী করিতে হইবে। এই আমদানীকৃত যন্ত্রের দাম দিবার ক্ষমতা ভারতসরকারের নাই, সঞ্চিত ষ্টার্লিংগুলির মূল্য এই জন্যই ভারতের কাছে এত বেশী। এছাড়া যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বহু বিস্তৃত এবং জটিল সমস্যা আছে। ভারতের এই অসহায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের নিকট হইতে পাওনা ষ্টার্লিং ফিরিয়া পাইবার জন্য ভারতে প্রবল আন্দোলন সুরু হয়। ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার ষ্টার্লিং দেনা অস্বীকারের বিশেষ চেষ্টা না করিলেও এই সময় ব্রিটেনের টোরি দল এবং কয়েকখানি সংবাদপত্র নানা অজুহাতে ষ্টার্লিং পাওনা বাতিল করিবার অথবা অন্ততঃ বহুলাংশে হ্রাস করিবার অনেক চেষ্টা করেন। অবশ্য ভারতের তৎকালীন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার (ইহাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলের সদস্যরাই ছিলেন) এ ব্যাপারে বিশেষ দৃঢ়তা দেখাইবার ফলে শেষ পর্য্যন্ত এই সব অপচেষ্টা নিষ্ফল হয়। তবে ষ্টার্লিং পাওনা আদায় সম্পর্কে ভারতবাসীর দাবী সর্ব্বাংশে পূর্ণও হয় নাই। এই সময় ভারতবিভাগের ফলে সারা দেশে

প্রভৃত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং দেশবাসীর দিক হইতে ষ্টার্লিং পাওনা পুরোপুরি আদায়ের আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হইয়া পড়ে। ব্রিটিশ সরকার অতঃপর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পৃথক ভাবে ষ্টার্লিং দেনা পরিশোধ সম্পর্কে যে চুক্তি করেন, তাহাতে ধীরে ধীরে আংশিক ঋণ পরিশোধেরই ব্যবস্থা হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন এ সম্পর্কে দুইটি মধ্যবর্ত্তীকালীন চুক্তি করে। এই চুক্তি দুইটিতে সঞ্চিত ষ্টার্লিং হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ব্রিটেন মোট ৮ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়। গত বৎসর বা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই লণ্ডনে ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ব্রিটেনের একটি পূর্ণাঙ্গ ষ্টার্লিং চুক্তি সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত ৮ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে ভারতসরকার (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষকেই অতঃপর ভারতসরকার বলা হইবে) ইতিমধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং খরচ করেন এবং ৮ কোটি ষ্টার্লিং অব্যয়িত থাকে। সম্ভবতঃ যন্ত্রপাতি সংগ্রহে অসুবিধার এবং ভোগ্যপণ্য আমদানী করিয়া ষ্টার্লিংগুলি নষ্ট করিতে ভারতসরকারের অনিচ্ছার জন্যই এই অর্থ খরচ হয় নাই। ৯ই জুলাইয়ের চুক্তিতে স্থির হয় যে আগেকার অব্যয়িত ৮ কোটি ষ্টার্লিং ছাড়া ব্রিটেন ভারতকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুনের মধ্যে আরও ৮ কোটি ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করিবে। এই ত্রৈবার্ষিক চুক্তি অনুসারে ভারতসরকার ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুনের মধ্যে আগেকার অব্যয়িত ৮ কোটি ষ্টার্লিং খরচ করিবার অধিকারী হন এবং স্থির হয় যে, এই আট কোটি ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং তাঁহারা ডলার-মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে পারিবেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুন এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন এই দুই বৎসরে ভারতসরকার ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে বৎসরে ৪ কোটি ষ্টার্লিং হিসাবে পাইবেন বলিয়াও স্থির হয়। এই নগদ পাওনা ছাড়াও আলোচ্য চুক্তিতে ভারতসরকার ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রস্থ উদ্বৃত্ত সমরসরঞ্জামসমূহ ১০ কোটি ষ্টার্লিং বা ১৩৩ কোটি টাকার কিছু বেশী মূল্যে (এইগুলির ক্রয়-মূল্য ছিল ৫০০ কোটি টাকা) কিনিয়া লইলেন এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চাকুরিয়া ব্রিটিশ প্রজাদের পেন্সন নিশ্চিত করিতে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং বা ২২৪ কোটি টাকার (কেন্দ্রের হিসাবে ১৯৭ কোটি টাকা এবং প্রাদেশিক হিসাবে ২৭ কোটি টাকা) স্থাপিত হইল একটি পেন্সন তহবিল।

যাহা হউক বিভক্ত ভারতের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য এবং যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনের অর্থ-নৈতিক অবস্থার বিবেচনায় এই ষ্টার্লিং চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতে বিশেষ কোন বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দেয় নাই। এই চুক্তিপত্রে ভারতসরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎকালীন অর্থসচিব শ্রীসমুখম্ চেট্টি। মোটামুটি অনেকেই ধরিয়া লন যে, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছে বলিয়া ইহার চেয়ে ভারতীয় স্বার্থের অধিকতর অনুকূলে চুক্তি সম্পাদন করা শ্রীযুত চেট্টির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই চুক্তির পরেই ভারতীয় বহির্বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে অকস্মাৎ গুরুতর পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র অভাবের জন্য এ পর্য্যন্ত ভারতসরকার বিদেশ হইতে মালপত্র আমদানী কঠোরভাবে সঙ্কোচ করিয়া আসিতেছিলেন, ষ্টার্লিং চুক্তি হইবার পর বিদেশী মুদ্রার আপেক্ষিক সচ্ছলতা আশা করিয়া তাঁহারা অন্ততঃ ষ্টার্লিং এলাকায় পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ নীতি অনেকটা শিথিল করেন। ইহার ফলে আবার বিদেশী মাল ভারতে প্রচুর আমদানী হইতে থাকে। ভারতের নিদারুণ খাদ্যসঙ্কটের জন্য বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীও এই সময় পুরোদমে চলে। এইভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিবার ফলে গত জুন মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, ব্রিটেনের নিকট প্রাপ্য সমস্ত ষ্টার্লিং খরচ হইয়াও ষ্টার্লিং এলাকা হইতে আমদানীকৃত যে বাড়তি পণ্যের দাম অপরিশোধিত থাকিয়া গিয়াছে, তাহা ৪ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের কম হইবে না। এই মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া শেষপর্য্যন্ত ভারতসরকার গত ১৯শে মে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন এবং অতঃপর এস্‌বেষ্টস্, চটকলের সরঞ্জাম, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি, সিমেণ্ট, খনিজ তৈল, কাঁচা ফিল্ম, ঔষধ, রঙ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কতকগুলি পণ্য বাদে ষ্টার্লিং এলাকা হইতেও কঠোরভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করেন।

এইভাবে বিদেশী পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারতসরকার ভবিষ্যত সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যা সমাধান কল্পে ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কিত পূর্ব্বোক্ত জুলাই চুক্তি সংশোধনে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে ভারতসরকারের বর্ত্তমান অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাইয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে যান। আশ্বাসের কথা ভারত সরকারের এই চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছে এবং ডাঃ মাথাই পরিচালিত প্রতিনিধিদল ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে গত বৎসরের জুলাই মাসের ষ্টার্লিং চুক্তি সংশোধন করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এ সম্পর্কে গত ৪ঠা আগষ্ট দিল্লী হইতে অর্থ সচিবের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

এই নূতন চুক্তি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থা গতিকে সত্যই সন্তোষজনক মনে করা যায়। এখনও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই চুক্তির কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হয় নাই, ভারতের অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া চুক্তি সংশোধনের যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, আর্থিক অসচ্ছলতার অজুহাতে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে সাড়া না দিয়াও পারিতেন। এবারের চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে ব্রিটেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত এই এক বৎসরে যে ৮ কোটি ষ্টার্লিং পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সে স্থলে এই সময়ের মধ্যে ৮ কোটি ১০ লক্ষ ষ্টার্লিং দিবে। এ ছাড়া আলোচ্য বৎসরে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ষ্টার্লিং এলাকার পণ্যের দরুণ যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং ঘাটতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ সেই ষ্টার্লিং ঘাটতি পূরণ করিয়া দিতেও সম্মত হইয়াছেন। গত বৎসরের চুক্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং ডলারে রূপান্তরিত করিবার অধিকার পাইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে

এই বৎসর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ডলার এলাকার সহিত বাণিজ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি ষ্টার্লিং ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই বিরাট ডলার ঘাটতি ভারত সরকারের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে পূরণ করা অসম্ভব। ভারত সরকার সম্প্রতি উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের হিসাবে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছে। ব্রিটেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত এই এক বৎসরের হিসাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ব্বোল্লিখিত ১ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং বা প্রায় ৬ কোটি ডলারের পরিবর্ত্তে আদায়ীযোগ্য ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার প্রদান করিতে রাজী হইয়াছে। গত বৎসরের চুক্তিতে ১০৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ এই দুই বৎসরের প্রত্যেক বৎসরের হিসাবে ব্রিটেনের ৪ কোটি ষ্টার্লিং করিয়া পরিশোধের কথা ছিল এবং এই ষ্টার্লিংয়ের কতখানি ডলারে রূপান্তরিত করা যাইবে সে সম্পর্কে কিছুই স্থির হয় নাই। এবার নূতন চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে ব্রিটেন ভারতকে উপরি উল্লিখিত দুই বৎসরের হিসাবে প্রতি বৎসর ৫ কোটি ষ্টার্লিং পরিশোধ করিবে এবং প্রথম বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডলারে রূপান্তরিত করিতে দিবে প্রায় ১৪ কোটি ডলারের অনুরূপ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং। বিশ্বজোড়া ডলার সঙ্কটের যুগে ভারতবর্ষ ডলারের হিসাবে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হিসাবে ব্রিটেনের অবস্থা যে কিছুমাত্র ভাল তাহা জোর করিয়া বলা যায় না (এ সম্পর্কে শ্রাবণের ভারতবর্ষে আমার লেখা "ষ্টার্লিং এলাকার ডলার সঙ্কট" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তবু ভারতের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বা নিদারুণ আর্থিক তথা ডলার সঙ্কট সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যে এইভাবে গত বৎসরের চুক্তি সংশোধনে সম্মত হইয়াছেন, ইহাতে সকলেরই আনন্দিত হইবার কথা। এইরূপ চুক্তি সংশোধন ব্রিটেনের পক্ষে ভারতের অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ সংরক্ষণের প্রচেষ্টামূলক বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বাজারের উপর ব্রিটেন বা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃত ভরসা রাখে। বাণিজ্যজীবি এই দুই দেশের পক্ষে পণ্যবাজার হারানো আত্মহত্যারই সমতুল। অথচ বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের যে অবস্থা হইতেছিল, তাহাতে ডলার এলাকার পণ্য আমদানী দূরে থাক, ষ্টার্লিং এলাকা ইহাতেও পণ্য আমদানী ভারতের পক্ষে হইয়া উঠিতেছিল অসম্ভব। এক্ষেত্রে ষ্টার্লিং চুক্তির সংশোধন দ্বারা পরিশোধযোগ্য ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং পূর্ব্বের তুলনায় সেই ষ্টার্লিংয়ের অধিকতর অংশ ডলারে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের অর্থ নৈতিক কাঠামো রক্ষার, বিশেষ করিয়া আমদানী বাণিজ্যধারা বজায় রাখিবার সহায়তা করিলেন। অনুরূপ উদ্দেশ্যেই বলিতে গেলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গরজ করিয়া ইয়োরোপে মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা চালু করিয়াছে এবং প্রাচ্য দেশগুলিতেও অনুরূপ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে। যাহা হউক, ষ্টার্লিং চুক্তি নূতন করিয়া সম্পাদন করিয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের ভবিষ্যত রক্ষার যে ব্যবস্থাই করুন, ইহাতে আর্থিক অনটন-ক্লিষ্ট ভারত সরকারের সুবিধা কম হয় নাই। এই ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের সহিত ব্রিটেনের সম্প্রীত কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশা করা যায়। অবশ্য ইহার পর ভবিষ্যতে আবার ডলার এলাকা হইতে যথেচ্ছভাবে পণ্য আমদানী করিয়া ষ্টার্লিং এলাকাস্থ দেশগুলি যাহাতে নিজেদের এবং ব্রিটেনকে বিপন্ন করিয়া না তোলে, তদুদ্দেশ্যে এই সব দেশকে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২৫ ভাগ ডলার এলাকার পণ্য আমদানী কমাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ষ্টার্লিং এলাকায় দেশ হিসাবে সাম্প্রতিক ডলার সঙ্কটের অজুহাতে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের এই অনুরোধ কার্য্যকরী করিতে সম্মত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতে যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন অত্যধিক এবং সেই সব যন্ত্রের অধিকাংশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা ডলার এলাকা হইতেই প্রাপ্তব্য। কাজেই ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ডলার এলাকা হইতে পণ্য আমদানী সঙ্কুচিত করিতে রাজী হইবার ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল ও বিলম্বিত হইবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। ষ্টার্লিং পাওনা অকেজোভাবে জমিয়া থাকা সত্ত্বেও এই ভাবে ডলার এলাকার পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণে সম্মত হওয়া ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে অসঙ্গত কার্য্য বলিয়াও কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন। তবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় গত বৎসরের চুক্তির সময় আমরা যেমন 'অবস্থাগতিকে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করা কঠিন' বলিয়া মোটের উপর শ্রীযুক্ত সন্মুখন চেট্টিকে সমর্থন করিয়াছিলাম, এবারও পরিস্থিতি বহুলাংশে অনুরূপ থাকায় বর্ত্তমান অর্থ সদস্য ও ষ্টার্লিং চুক্তিক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ডাঃ জন মাথাই সম্পর্কে আমরা একইরূপ মন্তব্য করিতে পারি। আমরা মনে করি খাদ্য ব্যতীত ভোগ্য পণ্যের আমদানী যতদূর সম্ভব কমাইয়া ভারতসরকার অতঃপর বিদেশ হইতে যে কোন উপায়ে যতখানি সম্ভব যন্ত্রপাতি আমদানী করিতেই সচেষ্ট হইবেন। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দাভাব এদেশে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে বলিয়া এবং সঞ্চিত ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া ভারতের দিক হইতে এই যন্ত্রপাতি আমদানী যত ত্বরান্বিত হয় ততই মঙ্গল।

তোড়ী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক্, দুই, তিন্—রাতশেষের পেটা ঘড়ির ঘণ্টা যেন হাতুড়ি পিটতে থাকে মেজবাবুর মাথার ভিতর। মগজটা আরো তপ্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে! পোড়াচোখে একে ঘুম ত নেইই বয়সের দোষে, তবু শেষপ্রহরে আধোঘুমন্ত নেশার আমেজ কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখতো, কিছুটা দেহের উত্তাপ ক্ষয়িত করে, ক্লান্তি কমিয়ে, স্নায়ুকে স্নিগ্ধ করে আনতো—আজ কি তাও হবে না। শুধু ভিড় করে আসবে—সিন্ধু, সাহানা, সোহিনী, ভৈরবী, ভেঁরো, তোড়ী—না না তোড়ী নয়।

ভয় করে কেমন্—ফেলে আসা দিনগুলো, নিষ্পেষিত কামনার ফুটে না ওঠা ছায়াগুলো গুলিয়ে দেয় মাথাটা। ভাঙা জানালার ফাঁকে চেয়ে দেখেন্ তিনি বাইরের দিকে—চোখের জোর ও জলুস কমেছে অনেকদিন, ছানি কাটিয়ে দুষ্ট দৃষ্টিশক্তিকে খানিকটা শোধন্ করিয়ে নিয়েছেন তিনি, তবু ঠিক ঠাহর হয় না—মনে হয় যেন কাকজোছনার পাণ্ডু রজত ধারা ঝাপটা দিচ্ছে প্রকৃতিকে কিছুটা প্রকৃতিস্থ করবার দুশ্চেষ্টায়। রাত্রি যখন ঢলে পড়ে, পুব দিগন্তে অরুণের একটু আভাস যখন আকাশে বাতাসে অনাগতের বারতা আনে, সেই সন্ধিক্ষণই ত স্বপ্ন দেখার সময়! ভোরের স্বপ্ন যে সত্যি—সে যে নতুন দিনের, নতুন আশার।

কিন্তু তাঁর ত সব ফুরিয়ে গেছে, অস্তাচলে এসে আর পূর্ব্বাচলের দিকে তাকালে হবে কি? ছিয়াশী বছর তিনি কাটিয়েছেন এই শক্ত মাটির আশ্রয়ে, কৃত কর্ম্মাকর্ম্মের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায়। বয়স বেয়ে বেদনার মজবুত্ ইমারৎ গড়ে উঠেছে বুকের ভেতর, চোখের জলের ইতিহাসে, বঞ্চিতের হাহাকারে।

এসব স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম, হাসি পায় কান্নাও আসে। চোখ বুজলেই ফরসা, কিন্তু তাঁর চোখ বোজে কই—অতলান্ত প্রশান্তিতে ডুবে যেতে পারেন কই গহিন্ অবলুপ্তির মহাসাগরে, বিস্মৃতির কুহেলিকায় মিলিয়ে যায় কেন ঐ স্মরণের আঁবরণগুলো—কিল্‌বিল্ করছে কালো হাত তুলে।

এক্ এক্ সময় রাগ হয় নিজের উপর, সৃষ্টির উপর, সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিকর্ত্তার উপর। কেন তিনি বেঁচে থাকবেন এতদিন্—কি সুখে অতীতের কঙ্কালকে বয়ে বেড়াবেন মৃত সতীদেহের মত—চক্রধারী কি কেটে কেটে টুকরো করে দিতে পারেন না দিকে দিকে।

হাঁপিয়ে ওঠেন্ তিনি, কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ হয়—পুরাণো হাড়গুলো যেন ব্যথায় মড়মড়িয়ে ওঠে—কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে। ডাকবেন্ নাকি রসিক্ মোহনকে—

রসিক্—মাষ্টার—

রাতে কি একটুও ঘুমোবেন না মেজবাবু—এখনও যে তিন পহর হয়নি—একটু জিরিয়ে নিন্ না—

আর জিরুনো—তার বিরক্তি মিশ্রিত কাতরতা দেখে চুপ করে যান্ মেজবাবু। বেঁচে থাকার এই প্রান্তিক্ অধ্যায়ে ঐ বেচারী রসিকই তাঁর শেষ ভরসা। কালের চলতি চাকার ঘূর্ণীতে সবাই তাঁকে ফেলে এগিয়ে গেছে—শুধু আজও তিনিই ধুঁকছেন্ অচল, অনড়, কেউ তাঁকে চেনে না, কেউ জানে না। কেন যে লোকে বেঁচে থাকে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পর।

ভারী হয়ে ওঠে বুকটা—বরাটীর একটা নতুন ঠাট যেন মনে পড়ে—রসিককে আর একবার ডাকবেন্ নাকি। মনে পড়ে রসিক্ মাষ্টারের প্রথম আসার কথা। জমজমাটি আসর—সঙ্গত করবেন স্বয়ং বিশুঠাকুর—বিষ্ণুপুরের সুরসেন্, সঙ্গে আছেন গোয়ালিয়রের শিরালী—লক্ষ্ণৌএর ফতে খাঁ যাঁকে দোস্ত বলে মেনে নেয়, যদু ভট্ট যাঁকে স্বীকার ক'রে গুরু ঘরাণা বলে। ইমনে বন্দনা সুরু হয়ে গেছে। আসল তবলচি, কিন্তু তখনও তরলিত সুধায় বেশ একটু নাজেহাল হয়ে গরহাজির।

মেজবাবুই কথাটা পেড়েছিলেন্—ফৈজখাঁকে আনতে জুড়ি গেছে—আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে, ততক্ষণ একটু

সঙ্গত চলুক্ না। এত বড় আসরের মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে ঠেকা দিতে পারে এমন কেউ নেই কি ?

এগিয়ে এসেছিলো শীর্ণ তরুণটি। অবাক্ হয়ে গিছলো সকলে, তিনি নিজেও অবাক হয়েছিলেন তার সাহসে। ফৈজখাঁকে আনতে যেখানে জুড়ি যায়, সেখানে সঙ্গত করবে একটা অর্বাচীন যুবক্।

—কি হে ছোকরা—পারবে ত, লোক্ হাসিয়ো না—

ছোকরা জোড়হাতে নমস্কার করেছিলো স্বরলক্ষ্মীকে, মনে মনে বলেছিলো—মান রেখো ওস্তাদ—

হাঁ, মানই রেখেছিল, যেমন গলার কাজ, তেমনি তবলায় হাত। সঙ্গত আরম্ভ হয়—তা না না দেরে দেরে তুম্, দেরে দেরে তুম্ দ্রে দ্রে না দেরে দেরে না তা দিম্।

আজও মনে পড়ে তবলার বোলে যেন আগুন ঠিকরে পড়লো, গান যেন এক চাঁটিতে জীবন্ত হয়ে উঠলো শিক্ষিত কলাবন্তের হাতে। ধ্রুপদ হয় ধ্রুবপদ, খেয়াল গিয়ে লুটিয়ে পড়ে সেই সেরা খেয়ালীর পায়ে।

বাহবা পড়ে যায়—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ !

ফৈজখাঁ শুধু শুধুই দুশো টাকা নিয়ে গেলো, বলেছিলো—কর্ত্তা, উনিই আজ বাজান্—

মেজবাবু সেই রাত্রেই মতলব ঠিক করে ফেলেছিলেন —ইংরাজী-পড়া শুনে বলেছিলেন—বেশ্ বেশ্, শুধু গুণী নয় জ্ঞানীও দেখছি—আচ্ছা সকাল বিকেলে ছেলেদের পড়াবে, রাতে গানবাজনা—মাহিনা খাওয়াপরা বাদ পঞ্চাশ—

গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে আনন্দে রাজী হয়ে গেলো।

মেজবাবু নিজে শিক্ষা পেয়েছিলেন ডিরোজিওর সেরা ছাত্রের কাছে। পড়ার দিকে ঝোঁক্ ছিল অদ্ভুত—কার্যকলাপও একটু গোঁয়ার ধরণের। আত্মীয়েরা বলতো —কালাপাহাড়—

খাদ্য-পানীয় সম্বন্ধে কোন বিচারই তিনি করতেন না —অগম্য স্থানও ছিল না—কিন্তু খাড়া সোজা মানুষ, দিল-দরিয়া মেজাজ, কন্দর্পকান্তি চেহারা। কোন নীচতা, কোন হীনতা যেন তাকে স্পর্শ করতে সাহস করতো না।

হো হো করে হেসে বলতেন—দরাজ সে হাসি—কি বলো হে মাষ্টার, মনে ময়লা না লাগলেই হলো—বাস্—তেজীয়সাং ন দোষায়—পৃথিবী চিরকালই ত বীর্য্যশুল্কা—

তাঁদের বংশের তখন জোর দব্‌দবা, প্রকাণ্ড তাঁদের বিষয় সম্পত্তি, প্রচণ্ড তাঁদের শাসন, বিরাট তাঁদের বোল-বোলা। যেন জলন্ত খসবুওয়ালা খাঁটি ঘিয়ের কড়ায় ফুটন্ত বুদ্‌বুদে আভিজাত্য ফুটছে টগ্‌বগ্ করে। তাঁদের নীলরক্ত তখনও পাকা নীল, লাল শুধু ধমনীতে, মনে নয়, চালে নয়, চলনে বলনে নয়। শুধু মেজবাবুই ছিলেন চলন্ত ব্যতিক্রম। পড়বার সময় বিধবা বিবাহ নিয়ে এতো মাথা ঘামাতে লাগলেন যে 'সম্বাদ রসরাজে' তাই নিয়ে গালাগালি। এমন সব সমাজে ঘুরতে লাগলেন যে বাপ নিজে গিয়ে ধরে নিয়ে এলেন। দেশে এসে অবশ্য একটু পবিত্র গোময় ঠেকাতে হয়েছিল প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মায়ের কান্নাকাটিতে। অন্য সরিকরা যখন সারারাতের ক্লান্তির পর বেলা দশটায় ঘুম ভেঙে উঠছেন ততক্ষণ মেজবাবুর কুস্তী ডন্ বৈঠক্ স্নান সারা হয়ে গেছে, পেস্তার সরবৎ ফলাদি জলযোগ করে আলবোলা মুখে তিনি কালিদাস ভবভূতিদের নিয়ে বসেছেন—কোথাও হংসপদিকা বীণা বাজাচ্ছেন, কোথাও ভাব রেভিল গান শোনাচ্ছে, শূদ্রক চারুদত্ত বসন্তসেনাকে। ওদিকে তাঁর বৈঠকখানায় ন্যায়রত্ন মহাশয় বেদান্ত উপনিষদের নতুন ভাষ্য করে নস্যাৎ করছেন তর্কচূড়ামণিকে। কোনদিন বা মৌলভী সাহেব ছাড়চেন রুমীহাফেজের বয়েৎ, বাদশাহী তক্ত-তাউসের গল্প, জাহানারা রোশেনারার আশনাই এর কাহিনী। মিশনের রেভারেণ্ড নাথও উপস্থিত হতেন্ মাঝে মাঝে। তাঁর নমঃশূদ্র বাপ অবশ্য কর্ত্তাদের আমলে ত্রিসীমানা মাড়াতে সাহস করতো না।

মেজবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠতেন, বলতেন—বলুন ত ফরাসী বিপ্লবের গল্প, ভারী ভালো লাগে—

ঐসব গল্প বলতে নাথ সাহেবও যেন অভিভূত হয়ে পড়তেন্। যেদিন আবার অধ্যাপক নন্দী আর মিঃ ব্যানার্জ্জী জুটতেন, সেদিন ত আর কথা নেই—রীতিমত ঝমাঝম লেগে যেত ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে—মাঝে মাঝে শোনা যেত কতকগুলো নাম শুধু—মিল, বেন্থাম, কাঁত কোঁত, ডারুইন্ ল্যামার্ক, শোপেনহায়ার, ম্যাক্সমুলর। তারই ভিতর কখনও বা কেরী মার্শম্যান্, রামমোহন, তত্ত্ব-বোধিনী, দেবেন ঠাকুর, কেশব সেন। দক্ষিণেশ্বর কৃষ্ণতত্ত্বও বাদ যেতনা।

বেশী বাড়াবাড়ি হলেই মেজবাবু থামিয়ে দিতেন—মাষ্টার ধরতো হে একটা গৌড়সারেঙ্গ—

কোন দিন বা কেউ পড়তো স্বপ্ন-প্রয়াণের দু এক ছত্র, মেঘনাদবধের একটা সর্গ, তর্ক হোত ম্যালথাস্ মেণ্ডেল নিয়ে।

একদিন অভিনয়ই হয়ে গেল নীলদর্পণ, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। কালীসিংহের মহাভারত একদিন কুরুক্ষেত্রই বাঁধিয়ে দিলে।

তাঁর জলসা-ঘরে পাঁচশো বাতি ঝাড়ের নীচে শুধু নামকরা বাইজীরাই নাচতো না, গুণীদেরও বিচার হতো—ভূপালীতে নি দিলেই বিভাস এসে যায় কিনা, ছায়ানটে কড়িমধ্যম দিলে কেমন ফোটে, টপ্পা ঠুংরীর চেয়ে ভৈরবী বেশী জমে কিনা, মিড়ের আরোহণ অবরোহণে কোথায় দরদ ফোটে বেশী, এরও মীমাংসা হোত।

কিছুদিন মেজবাবু ব্যবসাতেই মন দিলেন, বল্লেন—দেখো হে—জমিদারী কিছু নয়—বাণিজ্যেই লক্ষ্মী, দেখনা ইংরেজদের, সাতসমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে সারা পৃথিবীর রত্ন সঞ্চয় করছে—তাইত বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হলো—আর আমরা ভাবছি সবই মায়া—

নিজেকে অবশ্য বেশ কিছু দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হতে হলো—সেবার ব্যবসাসংক্রান্ত কাজ গুটুতে গিয়ে কিনে নিয়ে এলেন মস্ত বড় একটা টেলিস্কোপ্—ঘর বাঁধা হলো ছাদে—বসে থাকেন তিনি সারারাত আকাশের দিকে চেয়ে, আশ যেন মেটেনা। পূরবী, ইমন্ আড়ানা, ললিত কেঁদে কেঁদে ফিরে যায়। হেসে বলেন—আরে, এও ত নাচগান্—মিউজিক্ অফ দি স্ফিয়ার্স—কি খাম্বাজের তালে তালে নাচ চলছে ওখানে নটেশের—লচক্ লচক্ বিজলি ঝলক্—একটু ইদিক্ ওদিক্ হোক্ ত! চুরমার হয়ে যাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ছাতু বনে যাবে তোমাদের ঐ অতি-বুদ্ধিমানদের মাথার খুলিগুলো।

মেজগিন্নী এসে তাড়া দিতেন—কত রাত হলো বল দিকিন্!

এই যে যাই।

তারপর মুচকি হেসে বলতেন—বাবুদের রাত হলে গিন্নীরা ধরে নিয়ে যাবেন সে রেওয়াজত এ বাড়ীর ছিলনা—

মেজগিন্নী অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে চোখ মুছতেন্।

একবার এক ওস্তাদ এসে হাজির—কর্ত্তা, খাস আলমগীর বাদশার জন্য তৈরী টোড়ী ঝাঁপতাল আর মালশ্রী সুর ফাঁকতালের দুটো ঠাট্ আমার পূর্ব্বপুরুষেরা করেছিলেন—জানেন ত এককালে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন গুণীদের দরবার থেকে—আমাদের বংশ ছাড়া কেউ জানে না। বলেন ত হুজুর আপনাকে শুনিয়ে দিই, খুশী হলে ইনাম্ দেবেন হাজার টাকা—আলমগীর বাদশার আমলের কিনা—

লাফিয়ে উঠলেন মেজবাবু—মাষ্টার, শীগগির তুলে নাও—

লোকটী গুণী, সুরটাও নতুন! কিন্তু আলমগীর বাদশার গল্পটা স্রেফ্ ধাপ্পা কিনা মেজবাবু বুঝতেই চাইলেন না। আর একবার লোচনের রাগতরঙ্গিণীর 'জনক' রাগ-গুলোর চাটের জন্য খরচাই করলেন মবলগ্ টাকা—শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরের খোঁজে মাষ্টারকে পাঠালেন দ্রাবিড়ে কাশ্মারে।

এদিকে হাণ্টার হাঁকাতেও পটু। একবার এক মহালের কোন নায়েব গেরস্ত ঝিউড়ির দিকে কুনজর দিয়েছিল, ধরে এনে গাছে বেঁধে পিটের ছাল তুলেছিলেন তিনি—একটা দুষ্টু দারোগার কান মুলে নাকখত্ দিইয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন আর একবার।

বড়বাবু মাঝে এসে না পড়লে সেদিন আরো বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যেতো—খোদ শাসনযন্ত্রের সঙ্গে ঠোকাঠুকি।

সস্নেহে বড়বাবু বলতেন—ওটা একটা গোঁয়ার কালা-পাহাড়—ওর কথা গ্রাহ্যি করলে চলে, গানবাজনা নিয়েই থাকে ভালো—

শিকারে যেতেন মেজকর্ত্তা একেবারে রাজার কায়দায়, রাজসিক্ ভাবে—হাতীতে চ'ড়ে লোকলস্কর নিয়ে। বাঘ-ভাল্লুক ছাড়া মারতেন না কিছু—পাখী মারা, হরিণ মারা ছোঃ! কৃষ্ণের জীব। কারুর অনিষ্ট করেনি, শুধু শুধু তাদের মেরে মনের প্রবৃত্তিটাকে দুর্দ্দাম করে তোলা কেন বাপু? রসিকমোহন টিপ্পনী কাটতেন—তা যা বলেছেন মেজবাবু। হাহা করে হেসে জবাব দিতেন—পালাতে পারবে না রসিকমোহন, রক্তে রয়েছে যে মাংসের লোভ, অতি আদিম, অতি অকৃত্রিম, দলে মলে ছিঁড়ে খেতে চায়

ভেতরের মাংসাশীটা—নাও, চালাও ঘুম পাড়িয়ে দাও সেই বন্য বর্ব্বরটাকে সুরের ইন্দ্রজালে, না হলে যে কোন উপায়ে সে বেটা কোনদিন মাথা চাগাড় দেবেই, বুড়ো বয়সেও রেহাই নেই। এই রকম ছিল তাঁর কথা।

সাহেবরা এসে তাঁবু ফেল্লে—জারি জোব্বা সাতনরী হার পরে মুরেঠা মাথায় প্রভু সন্দর্শনে চল্লেন সরীকরা।

মেজবাবু হেসে বল্লেন—যেতে দাও মাষ্টার, তার চেয়ে ধরো দিকিন্ একটা মীরার ভজন—অনেকদিন শুনিনি—চোখের জলে ভাসিয়ে দাও শ্রীমতীর বিরহ।

মেজোগিন্নী মাঝে মাঝে চটে উঠতেন—তোমার কাণ্ড-কারখানা কি বলো ত—

তিনি জবাব দিতেন—গরীব কুলীন ঘরের মেয়ে রূপ আর কুলমর্য্যাদা দেখে বাবা জমিদার ঘরে নিয়ে এসেছিলেন—এত বড় বাড়ীর মেজোগিন্নী হয়েছো—আর চাই কি—তবু ত রাত একটায় হোক্ দুটোয় হোক্ কিছুটা ফিকে চোখে ঘরে ফিরি, সতীসাধ্বী দেখা পাও—

একদিন বলেছিলেন—মাষ্টার, প্রেমে পড়েছো কখনো?—কোথায় যেন ভেসে আসে একটু সুদূরের ইঙ্গিত, ঝড়ো হাওয়ার এক টুকরো। মেজবাবুর নাকি অপবাদ ছিল, তিনি খ্রীষ্টান্ মেয়েকে বিয়ে করবেন বলে খেপে উঠেছিলেন—দস্তুর মত পাইক্ সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ধরে এনে বাপ জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন মহাকুলীন বংশের হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে।

স্তব্ধ হয়ে থাকেন মেজবাবু—আলোর একটু রেখা যেন দিগন্তে—মনে মনে রোমন্থন করেন সে সব দিনের কথাগুলো—সময়ের স্রোত বেয়ে ভেসে আসে একটি নাম—অনুরাধা—অনু—আর—আর—বুকটা কেমন করে ওঠে—একটি ছায়া—শুধু ছায়া।

নামটি মন্ত্রের মত কাজ করে তাঁর মনে—ফুটে ওঠে শিশির-ভেজা শীতের রাতের সঙ্কুচিত পদ্মের মত—লাজনম্রা একটি তরুণী বালবিধবা—এয়োতীর চিহ্ন লুপ্ত—আয়ুষ্মতীও সে হয়নি—পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ কুলীনের উনপঞ্চাশী বধূ সে। কুলীনের কন্যাকে উদ্ধার করেই সজ্ঞানে তিনি গঙ্গালাভ করেন—উর্দ্ধলোকে বোধ হয় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো উর্ব্বশী মেনকা রম্ভার দল, কিছু কৌলীন্যের প্রণামী নিয়ে, এত বড় পুণ্যশ্লোক অক্লান্তকর্ম্মীকে অভ্যর্থনা করতে।

বাবুদের দূরসম্পর্কের ভাগিনেয়ী ছিল অনু—মেজবাবুই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বিধবা হবার পর। মেজগিন্নীর মহালেই সাংসারিক কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকতো—সবাই বলতো—কি লক্ষ্মী মেয়ে, নেহাৎ ভাগ্য খারাপ তাই। মেজ-বাবুর বইগুলো নিয়ে সে নাড়াচাড়া করতো সময় পেলেই, দূর থেকে শুনতো তাঁদের আলাপ-আলোচনা, গান সঙ্গীতের মহরৎ।

রসিকমোহন তত দিনে এসে গেছেন। অনু যেন হঠাৎ কি আবিষ্কার করলে—অন্ধকারে যেতে যেতে সে দেখতে পেলে—দূর-সন্ধানী লক্ষ লক্ষ ভোল্টের আলো যেন নেমে আসছে নীহারিকা থেকে—অতিবেগুনী রঙ্ মিলিয়ে যাচ্ছে নবজলদ-ঘনশ্যামে, একটি মানবীয় বিন্দুতে। রসিক যখন এক মনে তবলায় চাঁটি দিচ্ছে চৌতালে, দরজার আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখছে অনু। রসিক যখন আলাপ করছে কোমল রেখাবেতে আশাবরী, অষ্টাদশী কানাড়ার নায়েকীকে ধরবার জন্য গলা সাধাসাধি, হাঁ করে শুনছে অনু। রসিক যখন মেজবাবুর সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছে তাকে লুকিয়ে দেখছে সে ছাদ থেকে, আকাশ ও পৃথিবীর মিলনের মাঝে।

একদিন সকালে সে গুণ গুণ্ করে গান করছিলো, মেজকর্ত্তা চুপ করে শুনলেন এক মনে—আরে, এ যে ভৈরবী তোড়ী—পঞ্চম প্রবল—এ ঠাট্ তো নেই আজকাল—মাষ্টার সেদিন সাধছিলো বটে—

এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন—গান শিখবি অনু, খাসা গলা তোর—

হাঁ, মামা—

মেজগিন্নী ধমক দিয়ে ওঠেন—গেরস্ত ঘরের ধিঙ্গী মেয়ে, কপাল মন্দ—নইলে কোলে কাঁকালে ভর্ত্তি থাকতো—গান শিখবে, লজ্জা করে না।

মেজবাবু নিঃশব্দে চলে যান্। কিন্তু শত ধমকানীতেও অনুর ভ্রূক্ষেপ নেই—আস্তে আস্তে জেগে উঠছে তার মনে একটা অস্ফুট আলোড়ন, একটা অস্পষ্ট আন্দোলন। ফুটে উঠছে বিকশিত বিশ্ব-বাসনায় দল বেঁধে সুদাম মালীর ঘরের অকালপদ্ম। সমস্ত অন্তর ভরে ওঠে গানে। সে গান শোনাবে কাকে—ঠাকুর যে দিলেন না কিছু—

কি করবে সে খুঁজে পায় না, বেশী করে সংসারের

কাজে লেগে যায়, বুকের ব্যথা চাপা দেবার জন্য বই পড়ে; ব্রত-পুজো-আচ্চায় সময় কাটায়।

বড়গিন্নী মাতঙ্গিনী গদ্‌গদ্ হয়ে বলেন—সত্যি মেজো, মেয়ে বটে অনু—মানুষ করেছিস্ যা হোক্, এই বয়সেই এত ভক্তি—

—শুধু পুজো দিদি, কেমন রামায়ণ মহাভারত আরও কত কি পড়ে, কপাল পুড়েছে তবু পাঁচটা কাজ নিয়ে থাকুক—

মেজবাবু হাসেন—চেয়ে থাকেন নদীর দিকে, ওপারে বড় বাঁকটার কাছে জেগে উঠছে ছোট্ট একটী বালুচর, হয়ত ফুলে ফলে সবুজ ও শ্যামলে সোনা হয়ে উঠবে একদিন। না হয় ক্ষোভে ক্ষেপে নিজেকে তলিয়ে যাবে বড় গাঙের মধ্যে, কে জানে।

আর একদিন সকালে দস্তুর মত সভা বসেছে মেজবাবুর বৈঠকে। পণ্ডিত মহাশয় মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীর সাড়ম্বরে ব্যাখ্যা করছেন্—গহন নিবিড় বন, সূর্য্যের আলো ঢোকে না, বৃদ্ধ বনস্পতিদের জটিল জটাজাল জড়িত শিব-মন্দির, তারই অলিন্দে বসে গান ধরেছেন, তাপসী তরুণী সুন্দরী মহাশ্বেতা, দূরে শুধু চন্দ্রাপীড় নয়—বনের পশু-পক্ষীরাও হিংসা ভুলে একমনে শুনছে, আর শুনছে গন্ধর্ব্বের দল। হাতীর দাঁতে গড়া বীণা তার হাতে—ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে মনের সমস্ত নিবিড় আকুলতা—ব্যাকুল হয়ে আছড়ে পড়ছে, গান যেন বলছে—হে রুদ্র, হে বিরুপাক্ষ, হে শশাঙ্কমৌলি, প্রসন্ন হও দেব—বিশ্ব মাঝে যে প্রেমকে ছড়িয়ে দিয়েছো তাকেই আবার গ্রহণ করো গঙ্গাধর। বিশ্বের যৌবন তা না হলে ব্যর্থ হয়, সৃষ্টির আবর্ত্তন চক্র স্থগিত, যুগে যুগে উমারা কি শুধু তপস্যাই করবে, তাদের যোগ কি বিয়োগেই পর্য্যবসিত হবে, প্রসীদ যোগীশ্বর?

হঠাৎ অন্দর মহলের দিকে একটী ঝন্‌ঝন্ শব্দে পণ্ডিতের তাল কেটে গেলো। মেজবাবু গিয়ে দেখেন নিত্য শিবপূজার পুষ্পপাত্রটি বিমনা অনুর হাত থেকে পড়ে গেছে মাটিতে—লুটিয়ে পড়েছে পদ্মগুলি।

বলেন—কেন মা, শুনতে যদি ইচ্ছে করে, ভেতরে এসে বসলেই পারিস্—

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে অনু।

মেজবাবু সেইদিনই একান্তে কথাটী পাড়লেন্—বিয়ের কথা কিছু ভেবোছো, রসিকমোহন—মেঘে মেঘে বেলা হচ্চে যে—ঋতুপতি রাজবসন্ত যে আওল—লঘুগুরু একটা কিছু করে ফেলো—

—আমতা আমতা করেন রসিকমোহন্—একটা অস্পষ্ট ক্ষণিক্-দেখা ছায়া যেন মনের মণিকোঠায় উঁকি দেয়।

স্পষ্ট করেই কথাটী বলেন্ মেজবাবু—মাষ্টার বিয়ে করবে অনুরাধাকে—

—কাকে—

—অনুকে, তুমি যে শ্যাম সুনাগর গুণগণ আগর।

হতভম্ব হয়ে যান্ রসিক্‌মোহন্, মাথায় কিছুটা ঢুকলে বলেন্—

—ও যে বিধবা—

জ্বলে ওঠেন্ মেজবাবু—মাষ্টার, তুমি না সুরসাধক, তুমিও ও কথা বলবে—সুর মানেই ত মিল—

—কর্ত্তা—

—পটমঞ্জরীর নাম শুনেছো, রাগ বসন্তের যে সুর-সাধনায় নিষ্পত্রবৃক্ষে গজিয়ে উঠছিলো সৃষ্টির নতুন রূপ, এই পোড়া দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই বন্যাই আনতে হবে, পদ্মাবতী যার হোত্রী, জয়দেব যার উত্তরসাধক্—সব লঙ্ঘন্, সব বন্ধন্ ভেঙে দিয়ে—

—কি বলচেন্ মেজবাবু—

পেটে খিদে মুখে লাজ করো না, ছুটো জীবন যদি ফুটে ওঠে সেটা কি দোষের, আজকাল বিধবা বিবাহ চলছে—বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ত জানো—মহাপুরুষ বললে তাঁকে ছোট করা হয়, টাটকা জ্যান্তো জ্বলন্ত মানুষ—তিনি বলেন্ এটা শাস্ত্রসম্মত, হ্যাঁ বিয়ে ওর হয়েছিলো বটে, সেটা বিয়ে নয়, বিয়ের ভ্যাংচানী—

—কিন্তু—

—আবার কিন্তু রসিক্‌মোহন্, আচ্ছা ভাল করে ভেবে দেখো, শিকার থেকে ফিরে আসি, তারপর পাকাপাকি যা হয় করা যাবে, কিন্তু সাবধান্ কানাকানি না হয়, চুপিচুপি সারতে হবে।

মাতাল স্বপ্নে মাষ্টারের তাল কেটে যায় আর কি। বুকের ভেতর যেন বসন্ত বাহারের আসর বসে। ওপারে

চরটা চিক্‌চিক্ করে, প্রাণের অঙ্কুর জেগে উঠেছে কচি-ঘাসের সবুজে।

মেজবাবু ফেরবার আগেই কথাটা কি রকম রাষ্ট্র হয়ে পড়ে—বড়বাবু বড়গিন্নী মারমুখী হয়ে ওঠেন্। শতমুখী হাতে ছুটে আসে আত্মীয়স্বজনেরা।

—কালামুখী—

—মুখপুড়ী—

হতচ্ছাড়ী—পুকুরেও স্থান হয় না।

গঞ্জনা, অপবাদ চীৎকার কুৎসায় বড়বাড়ী ছোট হয়ে যায়। অনুরাধা হঠাৎ হকচকিয়ে ওঠে, মেজবাবুর মতলবের কথা, রসিকের মনের ভাব সে কিছুই জানতো না। কিন্তু তার গোপন মনের সত্যটি ত মিথ্যা নয়। নিজের অজ্ঞান্তে শঙ্কাতুর প্রত্যাশাকে সে গোপনে লালন্ করেছে, সেই পাপেই কি রুদ্র হলেন্ বাম।

সর্পিল নিঃশ্বাসে শুকিয়ে উঠে শুভ্র ফুলটি বিছানা নেয়।

ওরই মধ্যে মেজগিন্নী অনেক বকে ঝকে তাকে তুলে বললেন—কাঁদিস নি মা, হিন্দুর ঘরে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস্ তায় বিধবা, মনের কি কোন বালাই রাখতে আছে—ওরে কাঁদবার অনেক সময় পাবি, নে দুটো মুখে দে দিকিন্—মা আমার—

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলছিল অনুরাধা—শক্ত কাঠ হয়েছিল এতক্ষণ।

শিকার থেকে মেজবাবু আর রসিক্‌মোহন্ পরের দিন ভোরেই ফিরলেন্। হাতির হাওদায় বসে বসে রসিক্‌মোহন্ ভাঁজছিলেন বিলাসখানি তোড়ীর একটা করুণ আকুতি—তন্ময় হয়ে শুনছিলেন মেজবাবু, তারপর খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলে উঠলেন—মাষ্টার, আর কোন কথা নয়, এবারে তোড়ীকে মিলিয়ে দিতেই হবে ভৈঁরোর সঙ্গে—

বাড়ীতে ফিরে দেখেন, বিপর্য্যয় ব্যাপার—ভরা নদীতে ডুবেছে নাকি অনুরাধা—প্রচণ্ড বানে ওপারের চরও ডুবে গেছে। মেজবাবু শুনেই এগিয়ে গেলেন—অনুরাধার ঘোলাটে চোখ দুটোর দিকে চাইলেন, তারপর হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলেন। সাধে কি আর আত্মীয় স্বজনরা নাম দিয়েছিলো গোঁয়ার কালাপাহাড়।

হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন রসিক্‌মোহনকে, জোর করে মালা বদল করালেন, সিঁদুরের রক্তরেখা লাগিয়ে দিলেন অনুর সীমন্তে, পরিয়ে দিলেন লাল চেলী—

বল্লেন—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি—চালাও জয়-জয়ন্তী—

হাঁ হয়ে রইলো বাড়ীর লোকজনেরা—আচার শুচি-বায়ুগ্রস্ত সমাজধ্বজীরা—একী খ্রীষ্টানী কাণ্ড—অনাচার!

তবু মেজবাবুকে সবাই চিনতো, প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না, এমন কি বড়বাবু বড়গিন্নীও না।

বড়বাবু শুধু বল্লেন—পাগলামী ওর গেলো না—মেজগিন্নী গোপনে চোখ মুছলেন্।

রাত্রে উন্মাদের মত মাঝে মাঝে মেজবাবুর পিয়ানো ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—বীঠোভেনের ফিউনার্ল মার্চ।

রসিকমোহনও সেদিন সারা রাত পাইচারী করেছিলেন নদীর ধারে—অতিদূরে যেন তোড়ীর সুর মিলিয়ে যাচ্ছে বনের ভিতর। একটা হরিণ যেন কান খাড়া করে দাঁড়ালো, হ্যাঁ ঠিক তোড়ীই, ভ্যাঁরো বুঝি প্রসন্ন হলেন না, তাই তন্বী তোড়ী চঞ্চল হয়ে চলেছেন গান শোনাতে—হরিণদের নয়, মাছেদের! টলটলে জল, তলতলে স্রোতস্বতী—ঐ যে হিমকুন্দকান্তি সুন্দরী তোড়ী নামলেন শোনাতে তাঁর অভিমানের, আত্মসমর্পণের গান—ভৈরব দেখা দেবেন এবার—ভোর রাতের শেষ ছায়া পড়েছে তার মুখে।

সকালে উঠে মনস্থির করে বলেছিলেন রসিকমোহন—কর্ত্তা, এবার বিদায় দিন্।

হাতদুটো শক্ত করে ধরে মেজবাবু উত্তর দিয়েছিলেন—হয় না, রসিকমোহন, একই সূত্রে বাঁধা দুই মন।

কালে হৈ হৈ টা মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু দাগ মিলুলো না—না রসিকমোহনের, না মেজবাবুর। আস্তে আস্তে মেজবাবু সরে গেলেন সংসার থেকে—পাঁচজনরা সরিয়েও দিলে, বদনাম হলো খ্রীষ্টান্ নাস্তিক, মাথার ছিট্ আছে। দূরে নদীর ধারে বাগান বাড়ীতেই আস্তানা গাড়লেন তিনি, সঙ্গে রসিকমোহন। লোকে বলতো—মোসাহেব।

লেখাপড়া গানবাজনার মধ্যেই ডুবে গেলেন দুজনে—মাঝে মাঝে গুণীরা আসতো। পুরাণো রাগরাগিণীগুলোকে ভেঙে নতুন মিশ্র রাগ সৃষ্টি করবার অদ্ভুত পাগলামী যেন মেজবাবুকে পেয়ে বসেছিলো। বলতেন—রসিক গোঁড়ামি

ভেঙ্গে মিশিয়ে দাও রাগরাগিণীদের, না মিললে সৃষ্টি মিথ্যে, সব মিথ্যে।

শোরী মিয়াঁর টপ্পা সাজালেন তিনি নতুন ঢংএ। মিয়াঁ কি মলহার বেজে উঠলো—চলত পবন পুরবৈ সন্ নন্—মন হোল মেঘের সঙ্গী। নব নট নাচতে লাগলো নতুন ছন্দে। তানসেন, সদারঙ্গ, গোপাল নায়ক, বৈজুবাওরার বহু গান তাঁরা রূপান্তরিত করলেন—আমীর খসরুর ইমন্ ভূপালী পিলু, বারোয়া ঝিঁঝোটী নতুন রূপ পেলে। কর্ণাট গিয়ে মিশলো গুর্জ্জরীতে, পুরিয়া গিয়ে মধুমাধবীতে, বাগীশ্বরী জেগে উঠলেন। কৃষ্ণধন বাঁড়ুয্যের সঙ্গে চলতে লাগলো বাদানুবাদ, শৌরীন ঠাকুর দিলেন বাহবা।

মেজবাবু প্রায়ই বলতেন—মাষ্টার ঐ যে তোমাদের রবী ঠাকুর, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলে—আসল জাতগুণী, কত সুরই মিশিয়েছে—গান কি শুধু মিছে কথার ছলনা, না হাসিকান্না প্রমোদের মেলা? এ হচ্চে বিরাটের পূজো, মনের নিভৃতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়—তবেই ত নটনারায়ণ ফুটে ওঠেন! চাট্টিখানি কথা, শুধু তবলায় চাঁটি আর প্রিং প্রিং করে ম্যাও ম্যাও করলেই তাঁকে ধরা যায় না—ঢেলে দিতে হয় নিজেকে দরদ দিয়ে।

চেয়ে থাকেন তিনি নদীর দিকে—চরটা আবার জাগছে।

ওদিকে কিন্তু সরিকী আবদারে জমিদারী বিষয়সম্পত্তি লাটে চড়ে, ক্রোকী পরোয়ানায় মৌজাগুলো যায়—মেজবাবু নির্ব্বিকার। মেজগিন্নী দৌড়ে এসে কাঁদাকাটি করেন—সব যে গেল—

হেসে জবাব দেন তিনি—মেজগিন্নী অনেকদিনই তো সব গেছে।

—তোমার বাপপিতোমোর বিষয়, আমার সুধীর মনু খাবে কি?

—মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দাও, সবাই কি পৃথিবীতে পৈতৃক জমিদারী নিয়ে জন্মায়, বুকের রক্ত জল করে অর্জ্জন করিনি কিনা, তাই মায়াও কম, ভোগ করতেও লজ্জা করে—

বড়গিন্নী শুনে বল্লেন—একেবারে দৈত্যকুলের পেল্লাদ—

সেই খ্রীষ্টান মেয়েটাই যত নষ্টের মূল, জানলি মেজো—আবার বুকটা কি রকম করে, মনে পড়ে সেদিনই রসিক-মোহনকে বলেছিলেন—যাবার সময় বাপু একটা মালকোশ না হয় দীপক ধরে বিদায় দিয়ো, ভাল করে পোড়ে যেন সব ময়লা—শিকল-ভাঙা আগুন-রাঙা মূর্ত্তিটিকে একবার ধ্যানে নিয়ে এসো দিকিন্।

তারপর হেসে বলেছিলেন—বুঝলে না মাষ্টার, মুখাগ্নিটা গানেই করো—তুমিও শীগ্‌গির চলে এসো—হ্যাঁ, এবার আর অনুরাধাকে কেউ কাড়তে পারবে না আর মেরীকেও নয়—

কান্না যেন বুক ঠেলে আসে, ছিয়াশী বছরের ঝাঁঝরা করা বুকের কান্না, বরফের মত জমাট কান্না। আজও সন্ধ্যেবেলায় যে মালীর মেয়েটা কেঁদে গেল। ষোল সতেরো বছরের মেয়ে—হরিণীর মত আসে, ছুটে পালায়। কোথায় কোন ছোকরার সঙ্গে তার বুঝি ভাব হয়েছে—তারুণ্যের অভিশাপ আর কি—জাতভাইরা কি সব বলেছে—বাপ তাড়ি খেয়ে মেরেছে মেয়েটাকে বেদম্। ভয়ে ভয়ে তাঁর পায়ের কাছে এসে বসেছিল। মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি শুধু তানপুরোটা তুলে নিয়েছিলেন, তারগুলো মোচড় দিয়ে উঠেছিল—তুঁ কেউ রোঁদিয়া—কেন তুই কাঁদিস্, রোদনভরা পৃথিবীতে অনন্তকাল ধরে যে প্রশ্ন জেগেছে—কেন তুই কাঁদিস্।

বুকটি কেমন করে উঠলো বুকের, গলাটা যেন চেপে আসে। রসিকমোহন উঠে দেখেন, সারা রাত জেগে ঘুমিয়ে পড়েছেন মেজবাবু শান্ত হয়ে চিরকালের মত।

মহাব্যোমের আর একপ্রান্তে হাজার মাণিকজ্বলা জলসা-ঘরে আবার আসর বসছে—তোড়ীর গৎ বাঁধা হচ্চে—সেখানেও যে নতুন দিন—নতুন গুণী এলো।
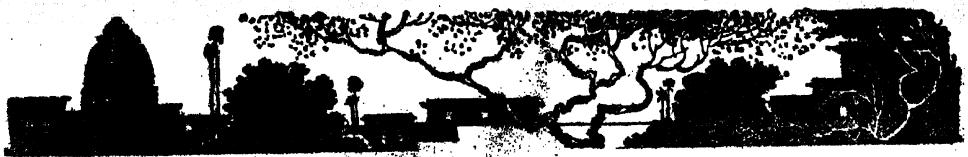
প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর কৃষক

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

এখন আমাদের দেখতে হয়, প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হ'তে এই মহাযুদ্ধের সুরু পর্যন্ত রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী কে কোন অভিনয়াংশ গ্রহণ করেছে। মার্কস পুঁজীবাদের (Capitalism) যে রূপ দেখেছেন ও তার উপর তিনি মত ও আদর্শ গঠন করেছেন, তা হ'ল প্রাক্-সাম্রাজ্য পুঁজীবাদ; তখনও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ দেখা দেয়নি। তাই তাঁর লেখায় সাম্রাজ্যবাদ বা Imperialism শব্দ প্রায় নেই। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্লেষণ ক'রে মার্কসের মত থেকে এগিয়ে গেলেন। তিনি পুঁজীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্যকে নিছক পরিমাণগত (quantitative) মনে করতেন না। এই দুইর মধ্যে একটা গুণগত (qualitative) পার্থক্যও আছে বলে তিনি মনে করতেন। Imperialist epoch as a continuation lent at the same time a qualitative by a new stage in the development of Capitalism. (Text book of Marxist Philosophy, P, 274-75). । ইতিহাসে এর পরও আর এক গাঁট (Knot) পড়েছে; সেটা হ'ল ফ্যাসিবাদ। পুঁজীবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদের যেমন অভ্যুদয়—কিন্তু যেমন উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনি সাম্রাজ্যবাদ থেকে ফ্যাসিবাদের উদয়, অথচ উভয়ের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্যও রয়েছে। এই ফ্যাসিবাদের উদয়ে ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবীর কার কতটুকু অংশ আছে, তা দেখা দরকার।

অত্যাধুনিক ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বিচার করার পূর্বে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীর আর্থিক জীবন-ব্যবস্থা ও তজ্জনিত বা তৎপ্রভাবিত মানসিক গঠনেরও বিচার করা দরকার।

আমাদের মধ্যে একটা খুব সহজ ধারণা আছে যে মানসিক গঠনে কৃষিজীবী বিপ্লববিরোধী এবং শ্রমজীবী বিপ্লব-অনুগামী। এর পিছনের যুক্তি হ'ল—কৃষকরা জমি নিয়ে পড়ে আছে; এই স্থূল বস্তুর স্থাবরত্বের মতো তাদের মনও ওতে স্থাণু হ'য়ে থাকে;—জমির মায়া কাটিয়ে তারা অনিশ্চিত ও বিপদশঙ্কুল বিপ্লবের পথে যেতে চায় না। কৃষিও জমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আদিম ধর্ম অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও বিধিনিষেধ এবং রাষ্ট্রিক শাসন ব্যবস্থা। এই সবই কৃষকের মনকে বেঁধে রাখে। নিশ্চিত মুষ্টিভিক্ষাকে ছেড়ে বিপ্লবের অনিশ্চিত ভূরিভোজের জন্য সে লালায়িত হয় না। এই যুক্তির পিছনে অনেকখানি সত্য আছে। এটা ঠিকই, জমির মায়া কৃষকের মনে অত্যন্ত প্রবল, ধর্মাচরণ তার মনে একটা প্রত্যক্ষ বোঝা ও বন্ধন, রাষ্ট্রের ও সমাজের শাসন মেনে চল্‌তেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু এই একটা দিক দেখে বিচার করলে তা হয় একদেশদর্শী। লেনিনের ভাষায় লক্ষকোটী ঘটনার সূত্র (billions of threads) জড়িয়ে থাকে এক একটা কার্যের সঙ্গে; আমাদের ন্যায়ের ভাষায় বলা যায় —কারণ-সমষ্টির যোগাযোগে কার্য সংঘটিত হয়। কাজেই কোন কার্য্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে হ'লে, ঐ সব ঘটনার বিচার করা দরকার।

বিপ্লব করার মতো মনের বল একেবারে দুস্থ ও নিঃস্বের হয় না;—এই নিয়ম স্বীকার ক'রেই যাদের বলা হয় rampen proletariat ভবঘুরে বাউণ্ডুলে, তাদের বিপ্লবী পর্যায় মধ্যে ধরা হয়নি। বাংলার গত দুর্ভিক্ষের তদন্তকারী কমিশনও এই তত্ত্ব কতকটা স্বীকার করেছেন। যখন এত বড় দুর্ভিক্ষের মধ্যেও লুটপাট ও বিদ্রোহোন্মুখতার অভাবের কারণ নির্দেশ করেছেন, তখন ঐ কমিশন প্রকারান্তরে ঐ কথাই বলেছেন যে অতর্কিতভাবে বাংলার দরিদ্রশ্রেণী দুস্থতা ও নিঃস্বতার এমন গভীর আবর্তে প'ড়ে গেল যে লুটপাট বা কোন প্রকার বিদ্রোহ করার স্পৃহা ও অবস্থা

* ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'—"কৃষক ও কৃষিবিপ্লব" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

এদের রইল না। যদি দীর্ঘ বৎসর ধীরে ধীরে এরা অনাহারের পথে এগুত তবে হয়ত এমন নীরবে এসব মেনে নিত না। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত বিপ্লব ও বিপ্লবপ্রয়াসী বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে একেবারে চরম নিঃস্বদের অংশ অতি সামান্য। ক্রীতদাসের বিপ্লব-প্রসারের কথা ইতিহাসে প্রায় নেই ;—একেবারে নেই কথাটা বড় বেশী ব্যাপক; সাধারণ নিয়ম ও ঝোঁকের বা গতির ব্যতিক্রম সব সময়ই স্বীকার্য। গ্রীক ইতিহাসে যে সামাজিক সংঘর্ষের পরিচয় পাই, তা হেলট্ (Helot) বা ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ নয়; তা হ'ল এককর্তৃত্বের (Tyranny) ও ধনিকতন্ত্রের (Plutocracy) বিরুদ্ধে Demos বা জনতার বিদ্রোহ—গণতন্ত্র (Democracy) প্রতিষ্ঠার বিদ্রোহ। রোমীয় ইতিহাসে যে সামাজিক সংঘর্ষের কথা পড়তে পাই, তাও ক্রীতদাসের (Slaves) বিদ্রোহ প্রায়ই নয়; তা' হ'ল অভিজাতদের বিরুদ্ধে জনতার বিদ্রোহ—Plebians against the Patricians। রোমের বাইরে ইটালীর দূর প্রান্তে বা সিসিলিতে বরং ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের চেষ্টা হয়েছে ; কারণ ঐ সব আত্মকর্তৃত্ব রহিত স্থানে পরাধীনতার ফলস্বরূপ—জনতার বিরাট অংশই ছিল ক্রীতদাস পর্যায়ে।

মার্কস্ ডাক দিয়েছেন—Proletarians of the world, have nothing to lose but their chain—বিশ্বের শ্রমজীবিগণের শৃঙ্খল ব্যতীত আর কিছুই তাদের হারাবার নেই। এই যাদের রূপ—যাদের হারাবার কিছুই নেই, তাদের বিপ্লবী মনোভাব হবার বিশেষ কোন কারণ নেই। যাদের অন্তরে কিছু হারাবার ভয় নেই, তাদের অন্তরে আশা উদ্রেক করারও কিছু নেই। ইউরোপীয় ইতিহাস নিয়েই আমরা নাড়াচাড়া করি—কোন তত্ত্বের ঐতিহাসিক অনুমোদনের জন্য আমরা সেখানেই নজির খুঁজি। ইউরোপীয় ইতিহাসেও ইংল্যাণ্ড, জার্মেণী প্রভৃতি দেশে পরপর কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু একেবারে হৃতসর্বস্ব যারা—উন্নতির আশা যাদের কাছে দুরাশা—তারা কখনও বিপ্লব প্রচেষ্টা করেনি।

কিন্তু কথা উঠবে আজকার শ্রমজীবী ত' তেমনভাবে নিঃস্ব নয়—হারাবার মতো তার কিছুই নেই, একথা আজ আর সত্য নয়। বাস্তবিকই তা ঠিক নয়। অভিজ্ঞ শ্রমিক আজ এক নূতন আভিজাত্য লাভ করেছে। অর্থের দিক দিয়েও সে সমাজে স্থান করে নিচ্ছে। সমবায় ও যৌথ কারবারে—যে কারখানায় সে কাজ করে, অনেক সময় সেই কারখানার মূলধনেরও তার হিস্যা হয়েছে। সেই হিসাবে পূর্বোক্ত আপত্তি তার সম্বন্ধে খাটে না। কিন্তু অভিজ্ঞ শ্রমিকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তাদের মধ্যেও বেকার-সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। কৃষকের পক্ষে বিদ্রোহের প্রধান অস্ত্র হ'ল, খাজনা বন্ধ করা ; শ্রমিকের পক্ষে তা হল সাধারণ ধর্মঘট। এই সাধারণ ধর্মঘট করার পক্ষে মস্ত'বড় অন্তরায় দেখা দিয়েছে বেকার শ্রমিকগণ একজনের পরিবর্ত্তে ৫জন গিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকের স্থান পূরণ করছে। কৃষক বিদ্রোহের যে প্রধান অস্ত্র—খাজনা-বন্ধের পক্ষে তেমন কোন অন্তরায় নেই। বেকার সমস্যা সমস্ত শ্রমিক জগতকে দুর্বল করে তুলেছে ; শক্তিমান রাষ্ট্রনায়ক বা ধন ও প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক দল সহজেই বেকার সমস্যার সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের স্বাধীনতা নষ্ট করেছে। বিলাতে ১৯২৬ সালে General Strike—সাধারণ ধর্মঘট—এই বিষয়ে নূতন দিক-দর্শন হিসাবে গণ্য হয়। ৯দিনের মধ্যেই সব ভেঙ্গে গেল—হাড়া আর বেলতলায় যাবে না—এই সঙ্কল্প করে—"Never again : Never again"—ব'লে শ্রমিকরা দলে দলে কাজে পুনরায় যোগ দিল ; হাজার হাজার শ্রমিক পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কারখানায় ফিরে এল। রাজনৈতিক ধর্মঘটকে বেআইনী ক'রে আইন পাশ হতে দেরী লাগল না।

এর পর আর ঐদিকে কোন বিশেষ চেষ্টা হয়নি। অথচ ব্রিটেন হ'ল গণস্বাধীনতা ব্যাপারে ইউরোপের মধ্যে অগ্রণী। শ্রমিক সংঘের (Trade Union) স্বাধীনসত্ত্বা ব্রিটেনে যতটা স্বীকৃত হয়, অন্য কোন দেশে তেমন হয়নি। সরকারী খয়রাতী মুষ্টি ভিক্ষার (dole) উপর লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবনযাত্রা নির্ভর করে। যারা কর্মে নিয়োজিত থাকে, তাদের মনের ও চোখের সামনে থাকে ঐ অনিয়োজিত বেকার শ্রমিকদের অপমানকর করুণ জীবনযাত্রা। আর বেকাররা সব সময়েই তাকিয়ে থাকে, কোন সুযোগে নিয়োজিতদের হটিয়ে তাদের স্থান দখল করবে—নিজের শ্রম-অর্জিত জীবিকার সম্মান ভোগ করবে। একই শ্রমজীবীশ্রেণীর একপ্রান্তের কখন-হারাই কখন-হারাই

ভাবজাত আতঙ্কিত মনোভাবও তার অপর প্রান্তের ভাগ্যবান লোকদের প্রতি ঈর্ষা ও লোলুপতা হ'তে উদ্ভূত মানসিক দুর্বলতা। দুই প্রান্তের এই দুই বিপরীত চাপে শ্রমজীবীশ্রেণীর প্রাণশক্তি ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়েছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় লেনিন বিশেষভাবে আশা করেছিলেন যে জার্মেণী প্রভৃতি ইওরোপীয় দেশে শ্রমজীবীরা নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হবে। কার্যতঃ তিনি এই সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলেন এবং এমনও বহুবার বলেছিলেন—যে নভেম্বরে রুশিয়ায় বিপ্লব না হ'লে পশ্চিম ইউরোপের বিদ্রোহোন্মুখ শ্রমজীবীদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধ বলশেভিকদের উপর বর্তাবে। লেনিন ইহাও বলেছিলেন যে জার্মেণী প্রভৃতি দেশে বিপ্লব না হ'লে —সমগ্র ইউরোপে (রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক হিসাবে যে ভূখণ্ডকে তারা বিশ্ব ব'লে মনে করত) বিপ্লব না হলে রুষের বিপ্লব সম্ভব নয়—কারণ সাম্যবাদী-বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করবে বিশ্বব্যাপকতার উপর। মার্কস-এঙ্গেলসের মত-অনুসারে তখনও তাদের বিশ্বাস ছিল বিশ্ব-বিপ্লবেই সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্য নিহিত আছে; মাত্র একদেশে সাম্যবাদী বিপ্লবের (Socialist revolution in one Country) সাফল্যে তখনও তাদের বিশ্বাস আসেনি। ইউরোপব্যাপী বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর ওই মতের উৎপত্তি।

জার্মেণী প্রভৃতি ইওরোপীয় দেশের শ্রমজীবীরা বিপ্লবে ত' যোগ দিলই না, বরং কিছুদিন পর তারা উল্টা রাস্তাই গ্রহণ করল। তখন জার্মেণীর কৃষকদের মধ্যে রুষ কৃষকদের মতো কোন বিপ্লবীর আগ্রহ ছিল না। কেন ছিল না—সে বিতর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তার কারণ অনেকটা ছিল শ্রমজীবীর চেয়ে কৃষকদের সংখ্যার অল্পতায়, কৃষকদের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ও নিয়ন্ত্রিত অর্থ ব্যবস্থায় এবং সমগ্র জার্মেণীর অর্থব্যবস্থায়। আর কতকটা কারণ ছিল জার্মেণীর ইতিহাসে লুথারীয় বিপ্লব, কৃষক বিদ্রোহ, নেপোলিয়ান-উত্তর যুগের জাতীয় ঐক্যসাধনের সংগ্রাম প্রভৃতিতে তাদের বিদ্রোহভাবের সাম্য ও উপসমতা লাভে এবং অবশেষে এর কতকটা কারণ নিহিত ছিল বিগত চার বছরের যুদ্ধের গতি ও তজ্জনিত আর্থিক ও রাজনৈতিক, অবস্থার মধ্যে রুষের থেকে পার্থক্যে। কারণ যাই থাক, কৃষকরা বিদ্রোহমুখী হয় নাই।

অপরদিকে লাইবনেক্ট ও রোজা লুক্সেমবার্গের চেষ্টা সত্বেও শ্রমজীবীরা কিছুই করলে না; নৌ ও স্থলবাহিনী (যারা লেনিনের ভাষায়—সামরিক পোষাক পরিহিত কৃষকের সন্তান) বরং কিছু করেছিল। ইটালী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মেণী প্রভৃতি দেশে কম্যুনিষ্টগণ ও বিভিন্ন রকমের সাম্যবাদীরা শ্রমজীবীদের দিয়ে কিছু করাবার অনেক চেষ্টা করেছিল—কিন্তু এই সময় শ্রমজীবীদের দ্বারা যে সমস্ত হুজ্জত-হাঙ্গামা, ধর্মঘট প্রভৃতি হয়েছে, তা প্রায় সবই অর্থনৈতিক;—হয় বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য, না হয় জীবনযাত্রার খরচের অনুপাতে তাদের মজুরীর অপর্য্যাপ্ততা পূরণের জন্য—তারা দাঙ্গা করেছে, ধর্মঘট করেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দিয়ে সামান্য কিছু করেছিল জার্মেণীতে স্পার্টাসিষ্ট (Spartaciste) দলের রোজা লুকসেমবার্গের নেতৃত্বে। লাইবনেক্ট ও লুকসেম-বার্গের (Luxemberg) ব্যক্তিগত প্রভাবএর মধ্যে অনেকখানি কার্যকরী ছিল।

সর্বত্রই এই চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল; এই ব্যর্থতার মূলে ছিল একদিকে শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল দৃঢ় সংকল্প প্রচেষ্টার অভাব, অপর দিকে কৃষিজীবীদের মধ্যে বিদ্রোহ ভাবের অনস্তিত্ব; বেকার হ'য়ে খয়রাতী মুষ্টি ভিক্ষার উপর নির্ভর করত বহু শ্রমিক; যারা কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদেরও মজুরীর হার বর্দ্ধিত-জীবিকা খরচের অনুপাতে অত্যন্ত কম ছিল। তা নিয়ে ছোটখাট দাঙ্গা, ধর্মঘট প্রভৃতি বহু হয়েছে। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের এই বিক্ষোভ ও উচ্ছ্বাসকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়নি। এই বিক্ষোভ ও উচ্ছ্বাস এর পরে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হ'ল উল্টা পথে—বিপ্লব-বিরোধী দিকে—ফ্যাসীবাদের প্রতিষ্ঠায়। ইটালীতে কম্যুনিষ্ট-ঘেষা সমাজতান্ত্রিক (Socialist) মন্ত্রিত্বের পর এল মুসোলিনীর ফ্যাসীবাদ। এর জন্ম মিলান সহরে। এটা শহরে আন্দোলন। শহরের বেকার শ্রমিক, বেকার মধ্যবিত্ত যুবক ও বাহিনীচ্যুত (demobilised) ভূতপূর্ব সৈনিকদের মধ্যে যারা শহরে ছিল—তাদের নিয়েই এই আন্দোলনের সুরু। কৃষকগণ বা গ্রাম্যজনতা এই আন্দোলনের আবর্তে আসে অনেক পরে। হাঙ্গেরীতে স্বল্পকাল-স্থায়ী কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংঘ (trade union) বিদ্রোহ করল; মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বিদ্রোহে যোগ দিল।

বেলাকুনের শ্রমজীবী তোষণ নীতির ও কৃষিজীবীর প্রতি বিরাগের ফলে কৃষকরাও তার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে পরে যোগ দেয়। জার্মেনীতে সমাজতান্ত্রিক (Socialist) শাসন কয় বছর চল্‌ল; কিন্তু ক্রমেই তারা জাতির আস্থা হারাতে লাগল। ১৯৩০ সালের নির্বাচনে নাজী দলের প্রতিনিধির সংখ্যা ১২ হ'তে ১০৭টী হ'ল। জার্মেনীতে কৃষিজীবীর চেয়ে শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশী। শ্রমশীল ব্যক্তির (working population) মধ্যে শতকরা ৩০ ছিল কৃষিজীবী; শতকরা ৫০ এর মতো ছিল শ্রমজীবী—এর মধ্যে যান বাহনের কাজে (transport) নিয়োজিত লোকের সংখ্যাও ধরা হয়েছে। এই শ্রমজীবীরাও তাদের পোষ্যবর্গ একত্র হ'লে এবং বিপ্লব প্রয়াসী হ'লে ভেইমার শাসন ব্যবস্থার (weimer constitution) নির্বাচনের বলেই তারা সমগ্র রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করতে পারত। অথচ—১৯২৪ সালের পর হতে রিখষ্টাগে (Reichstag) কম্যুনিষ্টদের সদস্য সংখ্যা ক্রমেই কমেছে। ১৯২৪ সালের মে মাসের নির্বাচনে—৬৩, ডিসেম্বরের নির্বাচনে—৪৬; ২৫ সালের মে—৫৪ এবং ১৯৩০—সেপ্টেম্বর—২৬। ঐ নির্বাচনে নাজীদের সংখ্যা হয়—১০৭; পূর্বে তা'দের সংখ্যা ছিল মাত্র—১২। কাজেই জার্মাণ শ্রমজীবীরা ঐ সময় বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে—এমন কথা বলা যায় না। বরং মিউনিক শহরে নাজীদলের জন্ম ও পরিপোষণে শহরে জনতার সমর্থন ও অনুমোদন ছিল। এই সহরে জনতার মধ্যে শ্রমিক ছিল প্রধান; তা'দের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। ইউরোপের সর্বত্রই এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ইউরোপব্যাপী যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, তার মধ্যে কৃষিজীবীদের তরফ হ'তে যে একটা বিপ্লব প্রচেষ্টা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করা দরকার। বুলাগরিয়া-ই—জার্মেনীর মিত্রদের মধ্যে প্রথম পরাজয় স্বীকার ক'রে সন্ধি প্রার্থনা করে। বুলগেরিয়া যখন প্রথম যুদ্ধে যোগদান করে, তখনই কৃষক-নেতা ষ্টাম্বুলিস্কী (Stambulisky) রাজা ফার্ডিনাণ্ডের মুখের উপর তীব্র ভাষায়—জনসাধারণের দারিদ্র্যের ও দুঃখের দোহাই দিয়ে যুদ্ধে যোগদানের বিরুদ্ধে বলেন। ফার্ডিনাণ্ড এতে বিরত হলেন না; বরং ষ্টাম্বুলিস্কীকে কারাগারে বন্দী করলেন। যুদ্ধাবসানের পর ষ্টাম্বুলিস্কী, জেল হ'তে মুক্ত নূতন রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হলেন। ইনি "সবুজ সাম্যবাদ" (Green Socialism) প্রচার করতে লাগলেন;—মস্কোর লাল সাম্যবাদের (Red Socialism) সঙ্গে তাঁর মতের তীব্র বিরোধ ছিল। ষ্টাম্বুলিস্কী কৃষক সন্তান, বুলগেরিয়া কৃষকদের দেশ; তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন—কৃষকদের সাম্যবাদ—কৃষকদের কর্তৃত্ব—শ্রমজীবীদের সর্বকর্তৃত্ব নয়। তিনি শ্রমকে সামাজিক অধিকারের ভিত্তি ব'লে গ্রহণ করলেন; প্রত্যেককে গায়-গতরে পরিশ্রম করতে হবে এই ছিল তাঁর নীতি।

তাঁর মতে কৃষকই হ'ল মৌলিক শ্রমিক, সংখ্যায়ও এরাই বেশী; গণতন্ত্রের দাবীতে, অর্থনীতির দাবীতে এবং সমাজকে নূতন ক'রে গড়বার একমাত্র উপায় হিসাবে—কৃষকদের অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিশেষ দরকার; তাদের হাতে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা সমীচীন। তিনি মনে করতেন কার্ল মার্কস ও তাঁর অনুগামী সাম্যবাদীরা যে শ্রমজীবী সর্বকর্তৃত্বের দাবী তুলছেন তা অন্যায় ও যুক্তিহীন।

১৯২১ সালে বুলগেরীয় কৃষক সম্মেলনে—ষ্টাম্বুলিস্কীর চেষ্টায় যে প্রস্তাব পাশ করা হয়—তার মধ্যে একটিতে বলা হয়—এই সম্মেলন বিশ্বের কৃষকদের আহ্বান জানাচ্ছে,—তারা সংখ্যায় বেশী, তারা সম্মিলিত হ'য়ে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করুক, সমগ্র রাষ্ট্রে ক্ষমতা নিজেরা আহরণ করুক। জার্মেনীর আন্তর্জাতিক সংঘের পাল্টা তারা এক আন্তর্জাতিক কৃষক-সংঘ স্থাপনের সঙ্কল্প ক'রল। এই সংঘ সমস্ত মনুষ্য জাতিকে নূতন ক'রে গড়বে। ষ্টাম্বুলিস্কী এই সবুজ সাম্যবাদের আদর্শে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করলেন—যে প্রত্যেককে কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু বিজেতা জাতিসমূহ এই আইন পাশ করতে দিল না। অগত্যা আইন হ'ল—বছরে অন্তত দশদিন প্রত্যেককে কায়িক পরিশ্রম ক'রতে হ'বে। কিন্তু এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা দিক হ'তেই বাধা আসতে লাগল। বলকানের অন্য সব রাজ্য—যারা ঐ যুদ্ধে বিজয়ীর দলে থেকে বুলগেরিয়ার অনেক অংশ কেড়ে নিয়েছে—তারা সবাই ষ্টাম্বুলিস্কীর এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছিল,—তাদের ইঙ্গিতে ইংরাজ ও ফরাসী-ও

অনুকূল ছিল না। কায়িক পরিশ্রমের বাধ্যতামূলক আইনে এরাই বাধা দেয়। দেশের মধ্যেও সুবিধা-ভোগী, পর-শ্রম-উপজাবী শ্রেণী—এর বিরুদ্ধে গেল এবং তারা সহজেই পার্শ্ববর্তী রুমানিয়া, গ্রীস ও যুগোস্লোভিয়ার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। ১৯২৩ সালে ষ্টাম্বুলিস্কীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই পর-শ্রম-উপজীবী অভিজাতরা এক সাময়িক রাষ্ট্র-দ্রোহ সংগঠন করে। ষ্টাম্বুলিস্কী উপস্থিত ছিলেন না; অপর সব মন্ত্রীরা ঐ অভিজাত সমর-পতিদের হাতে বন্দী হলেন। ষ্টাম্বুলিস্কী ফিরে এসে ৪।৫ দিনের মধ্যে সৈন্যদের হাতে নিহত হন।

এই যুদ্ধের পর, আবার বুলগেরিয়া ও বল্কানে ষ্টাম্বুলিস্কীর স্মৃতি ও তাঁর সবুজ সাম্যবাদের কথা লোকের মনে জাগছিল। বল্কান-মৈত্রী-সংঘ গঠনের প্রস্তাবে ষ্টাম্বুলিস্কীর অসমাপ্ত কাজের সূত্র টেনে আবার কথাও উঠছিল। ঘটনার চাপে এই নূতন গতি কতদূর এগুতে পারবে জানি না।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চল্লিশ দিন পরে বন্দীগণ দিল্লীতে উপস্থিত হ'লেন। সমস্ত পথ তারা বহু অশ্বারোহী সৈন্য পরিবৃত হ'য়ে এসেছিল। দারার পার্শ্বে ও পশ্চাতে উজ্জ্বল বর্ম্ম-পরিহিত কয়েকটী অশ্বারোহী বাহিনী প্রহরী নিযুক্ত হয়েছিল। এইবার আমার জীবন কাহিনী আরম্ভের দিনে এসেছে।

একটী উন্মুক্ত হাওদায় হস্তীপৃষ্ঠে শাহজাদা বুলন্দ্ একবাল দারা-শুকো! মানুষের করুণ দৃষ্টির সম্মুখে দিল্লীর রাজপথে একদা বিশ্রুত শক্তিমান দারা-শুকো এই অপমানাহত অবস্থায় চলেছে। একজন ফকির চীৎকার ক'রে উঠল, "দারা যখন তুমি স্বাধীন ছিলে, তুমি প্রত্যহ আমাকে ভিক্ষা দিয়েছ, আজ তোমার দেওয়ার মত কিছু নেই জানি, তবু!" সম্রাটপুত্র তাঁর ছিন্ন গাত্রাবরণ শাল ফকিরকে দান ক'রলেন। ইহলোকে তার শেষ দান অর্পণ করার লোভ সম্বরণ ক'রতে তিনি পারেন নি।

দারার বিচার শেষ হ'ল। "মূর্ত্তিপূজক, ইস্লামের শত্রু এই অপরাধে" তার শিরশ্ছেদ করা হবে। ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস তাকে ভীত ক'রেছিল। ঘাতকের আঘাতের পূর্ব্বে দারা চীৎকার ক'রে ব'লেছিল, "মহম্মদ আমার প্রাণ হরণ করেছে, ঈশ্বরের পুত্র আমাকে জীবন দান ক'রেছে"। (১)

মানুষ যত, ঈশ্বরের পথ তত। দারা বহু পথে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা ক'রেছিলেন কিন্তু ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন কি? মৃত্যুর মুহূর্ত্তে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল—জগতের সনাতন নিয়ম কোন মানুষ অতিক্রম ক'রে যেতে পারে না। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি বন্ধন আছে, যা কোন ভাষা পূর্ণ প্রকাশ ক'রতে পারে না।

হে আমার রাজভ্রাতা, পৃথিবীর শেষ দিন পর্য্যন্ত ঈশ্বর তোমায় করুণা বর্ষণ করুন।

দারার শিরশ্ছেদ করা হ'য়েছে। কিন্তু তাঁর দুই স্ত্রী ও পুত্রগণ তখনও জীবিত।

আওরঙ্গজেব উদীপুরী বেগমকে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ ক'রলেন। সে ছিল জর্জ্জিয়া দেশের খৃষ্টীয়ান কন্যা। উদীপুরী আওরঙ্গজেবের আদেশ পালন ক'রলেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে বিবাহ ক'রলেন। কিন্তু রাণা দিল নীচজাতীয়া নর্ত্তকী, পত্রোত্তরে আওরঙ্গজেবকে জিজ্ঞাসা ক'রল, জাহাপনা কেন আমাকে সাক্ষাতের জন্য ডেকেছেন? সম্রাট উত্তরে লিখলেন যে, তিনি রাণা দিল্‌কে বিবাহ ক'রতে চান। রাণা দিল্ লিখল—"আমার মধ্যে এমন কি আছে যা সম্রাটকে সন্তুষ্ট ক'রতে পারে?" সম্রাট উত্তর দিলেন, "তোমার ঘন কৃষ্ণ কেশদাম আমাকে মুগ্ধ ক'রেছে।" তৎক্ষণাৎ রাণা দিল্ তার কুন্তল দাম কর্ত্তন ক'রে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ ক'রে পত্র লিখল—"জাঁহাপনা এই সেই সুন্দর কেশদাম, যা আপনি পেতে চেয়েছিলেন। আমি শান্তিতে জীবন যাপন ক'রতে চাই।"

আবার আওরঙ্গজেব লিখলেন, "আমি তোমাকে বিবাহ ক'রতে চাই। কারণ তোমার রূপ অতুলনীয়। আমি তোমাকে আমার অন্যতম সাম্রাজ্ঞী ব'লেই মনে ক'রব। তুমি আমাকে শাহজাদা-দারা বলেই কল্পনা কর...।"

রাণা দিল্ একখানি ছুরিকাঘাতে তার সুন্দর মুখ ক্ষত বিক্ষত করে দিল। তারপর একখণ্ড বস্ত্র রক্ত-লিপ্ত ক'রে আওরঙ্গজেবের নিকট পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে একখানি পত্রে সে লিখল, "সম্রাট যদি আমার

---

(১) মহম্মদ মরা আন্ মি কুশাদ ইবন্ আল্লাহ্ মরা আন্ মি বখ্শাদ্।

সৌন্দর্য্য আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তবে সে সৌন্দর্য্য আর নেই। যদি সম্রাট আমার রক্ত আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে আমি আমার সমস্ত রক্তপাত করতে প্রস্তুত আছি।"

আওরঙ্গজেব রাণা দিলের দৃঢ়চিত্ততার সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করলেন। কিছুকাল শোকাবহ জীবন যাপন করে রাণা দিল্ মৃত্যুর অপর পারে তার দেবতার সঙ্গে মিলিত হ'ল। কারণ রাণা দিল্ ছিল ভারতবর্ষের দুহিতা হিন্দু কন্যা।

দারার কন্যা রূপসী জানি-বেগমকে আমার ভগ্নী রোশেন্-আরার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। রোশেন-আরা দারার মৃত্যুর পর এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেছিল। রোশেন-আরা এই পিতৃমাতৃহীন বালিকার প্রতি অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার করেছিলেন। জানি-বেগম প্রতিদিন শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছিল। তারপর একদা সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে আগ্রার দুর্গে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সেদিন ছিল আমার এক আনন্দের দিন। সেদিন আঙ্গুরীবাগের উচ্ছ্বসিত ঝর্ণা আমায় অতীত আনন্দের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। বিহগকুল বহুদিন বিস্মৃত সুর জাগিয়ে তুলেছিল। যতদিন পর্য্যন্ত মোগল রাজবংশের অগ্রজ ভ্রাতাদের একটী বংশধরও জীবিত থাকবে ততদিন আওরঙ্গজেবের স্বস্তি নাই। দুই বৎসরের মধ্যে সমস্ত মোগল বংশধর বন্দী হ'ল এবং গোয়ালিয়র দুর্গে তাদের হত্যা করা হ'ল। এই গোয়ালিয়র দুর্গে আওরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদকেও "পপীর" সরবৎ পান করান হ'য়েছিল। কোরাণের নির্দ্দেশ—কোন মানুষকেই বিনা দোষে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। ঘোষণা করা হ'ল মুরাদ একদা এক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা ক'রেছিলেন। অভিযোগকারী উপস্থিত হ'ল। মুরাদ হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মুরাদের দোষ অনুসন্ধান করা ও প্রমাণ করা যে আওরঙ্গজেবের প্রয়োজন ছিল।

পর্ব্বতে, বনে, জঙ্গলে বহু কষ্ট ভোগের পরে সুলেমান শুকো বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক প্রতারিত হ'য়ে আওরঙ্গজেবের সম্মুখে আনীত হ'লেন। এই সুগঠিত সুঠাম তরুণ যোদ্ধা যখন পিতৃহন্তার সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন তখন রাজদরবারে একটা অস্ফুট আলোড়ন সৃষ্টি হ'য়েছিল এবং অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনের মধ্যে বহু অশ্রুপাত হ'য়েছিল। সুলেমান এবং সম্রাটের একই রক্ত। তাকে কি হত্যা করার পূর্ব্বে পপীর সরবৎ পানের অপমান থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যেত না ?

এই বীরপুরুষ প্রার্থনা করেছিলেন, "চাচা ! আমাকে পপীর সরবৎ পান কর্ত্তে দিও না, তোমার কাছে এইটুকু অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।" আওরঙ্গজেব কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—তোমাকে পপীর বিষ দেব না। কিন্তু প্রথম দিনেই গোয়ালিয়র দুর্গে সুলেমানকে পান পাত্রে সেই বিষাক্ত সরবৎ দেওয়া হয়েছিল। একমাস পরে তাঁকে হত্যা করা হয়।

কে যেন আগ্রার উপর দিয়ে তীব্র উষ্ণ বায়ু শব-আচ্ছাদন বস্ত্রের মতন ছিঁড়িয়ে দিয়েছে। আমি কাশ্মীর পরিদর্শনের জন্ত কতবার আকাঙ্ক্ষা করেছি। সেখানে দেবদারু বৃক্ষ বনের রক্ষীর মত পর্ব্বত শিখরে দণ্ডায়মান। হরিদ্রাভ রক্তমুখী ওপেল বর্ণের বন-পুষ্পরাশি সমস্ত বনে ছড়িয়ে রয়েছে। সে বন কখনও মানুষের রক্ত পদক্ষেপে দলিত হয়নি। আমি যদি সেখানে ভায়োলেট ও গোলাপ-বীথি অতিক্রম ক'রে পল্লবাকীর্ণ বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে একটি সরোবর তীর স্পর্শ ক'রে পর্ব্বত হ'তে পর্ব্বতান্তরে ভ্রমণ ক'রতে পারতাম। পর্ব্বত যেন কোন বিরাট রহস্যকে গোপন করবার জন্য আকাশের প্রচ্ছদপটে এক বিরাট অর্গল রচনা করেছে। একটি মৃদুমন্দ বায়ু শুভ্র তুষারের দেশ থেকে ভেসে এসে পর্ব্বতের উপরে চিন্তার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের দেশে আমাকে নিয়ে যাবে।

আমার বিনিদ্র রজনীতে আমি কতবার জাগ্রত-স্বপ্নের মধ্যে ফতেপুর শিক্রিতে বেড়িয়ে এসেছি। আজ ফতেপুর শিক্রি সবচেয়ে বেশী পরিত্যক্ত—কিন্তু আমার স্মৃতিতে জড়িয়ে রয়েছে ফতেপুর শিক্রির গৌরবময় অংশগুলি। সম্রাট আকবরের নগর ফতেপুর শিক্রি আর কখনও তৈমুর বংশের অধিকারে উন্নতির সুযোগ পাবে না ! ধ্বংসের দেবতা শিব কখনও পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর স্তম্ভে আসন পরিগ্রহ করেন না। বোধহয় এমন একদিন আসবে যখন ভারতমাতার সন্তান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করবে এবং সেই নরপতি মন্দিরের দ্বারে আপনার যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগ করে মন্দিরে প্রবেশ করবে। সেই মহা-নরেশ উপলব্ধি করবেন........"একমেবাদ্বিতীয়ম্"

৪র্থ স্তবক

[পাণ্ডুলিপির অংশগুলি ছিন্ন ভিন্ন অসংলগ্ন, কোথায় বা সামান্য ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র। পত্রগুলি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে একত্র গ্রথিত ছিল না। মাঝে অনেকগুলি পাতা নাই। বোধহয় জাহানারা তাঁর জীবন কাহিনী নষ্ট কর্ত্তে ইচ্ছা করেছিলেন—এবং কিছুটা ধ্বংসও করেছিলেন, পরে হয়ত মত পরিবর্ত্তন করেন এবং অসংলগ্ন পত্রগুলি পাণ্ডুলিপির পার্শ্বে রেখে দেন।]

আমার যদি ঘৃণা করার শক্তি থাকত তবে সে ঘৃণা আওরঙ্গজেবের প্রাণহরণ করা পর্য্যন্ত শান্ত হত না—যেমন তিনি অন্যের প্রাণ হরণ করেছিলেন ! ওঃ, তিনি যে তার পিতার প্রাণ হরণ করতে চেয়েছিলেন।

একদা সম্রাট জাহাঙ্গীর নাসীরউদ্দিন খলেজার কবরে পদাঘাত ক'রেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন, "শতাব্দীর ব্যবধানেও এই পিতৃহন্তার শবদেহের যা' কিছু অবশিষ্ট আছে সমস্ত খনন কর এবং নদীর জলে নিক্ষেপ কর।" যে মানুষ প্রতিহিংসার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত, তার জীবন ধিক্‌ত। হে ভগবান, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রতে শিখিয়ে দাও।

সব নিঃশেষ হ'য়ে গেছে ; আলো নিভে গেছে ; ভোজের উৎসব শেষ হ'য়ে গেছে। সবাই চলে গেছে ; আমি একাকিনী র'য়েছি ; সঙ্গী আমার নেই, আমি যে রিক্ত।

আমার বাহিরে শূন্য, আমার অন্তরেও বিরাট শূন্যতা। এই সমস্ত

জগতে শূন্যতা ভিন্ন আর কি আছে? আমার মনে পড়ে আমার সহোদরগণ শৈশবে পুতুল-সৈন্য নিয়ে খেলা ক'রতেন। একদিন একটা "রবারের বলের" আঘাতে তাদের পুতুলগুলি ভূপতিত হয়ে গেল, কিন্তু কয়েকটা পুতুল সৈন্য তখনও দাঁড়িয়েছিল। কেউ প'ড়ে গেল, কেউ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? সে যে পুতুল খেলা!

আমাদের মধ্যে যারা পড়ে গেছে আর যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এ সব কি ভগবানের হাতের পুতুল খেলা নয়?

আমার জীবন—একটী ভগ্ন মুকুট। কিন্তু এর প্রতিটি অংশ পরিপূর্ণ।

……আনন্দ, প্রাচীর গাত্রে প্রতিফলিত অস্ত সূর্য্যের-রশ্মি মাত্র! নয় কি?

প্রত্যেক মসজিদই একটী কারাগার, প্রত্যেক রাজপ্রাসাদ একটী কারাগৃহ। যারা ঈশ্বরের পথে চ'লে বেড়ায়—তারাই পৃথিবী জয় করে।

আমার জীবন বর্ষা-বাত্যা-বিক্ষুব্ধ একটী বৃক্ষপত্র মাত্র, অবশিষ্ট রয়েছে কয়েকটী তন্তু। আজও স্বর্গের লালিমায় সেই তন্তুর মধ্য দিয়ে আলো স্ফুরিত করতে পারে?

সম্রাট আলমগীর পঞ্চপুত্রের পিতা। আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্র ভয়ভীত। সুলতান মহম্মদ ইতিমধ্যেই কারারুদ্ধ। যে মানুষ একদা যুদ্ধরত সৈন্যদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যে মানুষ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়েও হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করেন নি—আজ তার মেরুদণ্ড শাস্তির ভয়ে ক্রীতদাসের মত অবনমিত হয়ে প'ড়েছে।

একদিন আমি মীরাবাঈএর উদ্দেশ্যে রচিত তানসেনের একটী গান শুনে জেগে উঠেছিলাম। কোয়েল আঙ্গুরাবাগ থেকে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল আমায় উপহার দিয়েছিল, সেদিন ছিল আমার শান্তির মুহূর্ত্ত। হাজীর এসে আমাকে সংবাদ দিল যে বুন্দীরাজ ছত্রশালের পুত্র রাও ভাওকে মার্জ্জনা করা হয়েছে। মৃত পিতার প্রতি ঘৃণা-প্রণোদিত হয়ে আওরঙ্গজেব রাও ভাওকে বহু শাস্তি দিয়েছিলেন। আজ পুণ্যকীর্ত্তি রাও ভাও আওরঙ্গবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েছেন। আমি কখনও সে কথা ভুলব না! আমি ভুলতে পারব না এই অপমান।

আওরঙ্গজেব একদা ভালবেসেছিলেন। আমি সেকথা জানি। একদা জৈনাবাদীর মৃত্যুতে আওরঙ্গজেব অশ্রু বিসর্জ্জন করেছিলেন। জৈনাবাদী প্রেমের খেলা ক'রে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ঔরঙ্গজেবের হৃদয়ের গুপ্ততম কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন। জৈনাবাদী প্রেমের জন্য আওরঙ্গজেবের স্বার্থত্যাগের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য তাঁকে মদ্যপান পর্য্যন্ত করিয়েছিল। জৈনাবাদীর প্রেমে আওরঙ্গজেব অন্ততঃ কয়েকটী মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্বজগৎ ভুলে যেতে পারতেন, আমি জৈনাবাদীকে চিরকাল স্মরণ ক'রব।

পিতা অসুস্থ—একদিন পিতার মৃত্যু হবে। কিন্তু আমি আমার হস্তীগুলি এখনও দান ক'রতে পারছি না। আমি আমার ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে পারছি না; কারণ তারা হয়ত সম্রাটকে রোগমুক্ত করতে পারে, তা আমি হ'তে দিতে পারি না। এক্ষণে আমি মৃত্যুকে আত্মার মুক্তিদাতা ব'লে স্মরণ করি।

আমার সহোদর ভ্রাতা আওরঙ্গজেব প্রায়ই পিতার কাছে পত্র লিখতেন। তাঁর ইচ্ছা নয় যে প্রজাবর্গ তাঁকে কঠোরচিত্ত ব'লে আখ্যায়িত করে। বৃদ্ধ সম্রাট অনেক কিছুই ভুলতে পেরেছেন, কিন্তু তিনি কখনই আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা ক'রতে পারেন নি। কারণ, দারার রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড একদা তাঁর কাছে প্রেরিত হ'য়েছিল, তা' তিনি বিস্মৃত হ'তে পারেন নি। তারপর সেই মুণ্ড দুর্গের বিপরীত দিকে তাজমহলে প্রোথিত করা হ'য়েছে—সেই তিক্ত স্মৃতি আজও শাহজাহান তুলতে পারেননি। আওরঙ্গজেবের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সম্রাট তাঁকে মুকুটমণির সন্ধান দেননি।

এখন আমার মনে আসছে একদিন ফতেপুর শিক্রিতে ভারতের বুকে তৈমুর সন্তানদের রক্ত-পদচিহ্ন রেখার বিষয় চিন্তা ক'রেছিলাম। সেই পদচিহ্ন তারপর থেকে আরও কত বেশী রক্তাক্ত হ'য়ে উঠেছে।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মহম্মদ তুঘ্‌লক্ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। তিনি তাঁর নৃশংস কার্য্যের দ্বারা শ্রদ্ধার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার ক'রেছিলেন। শেষ বিচারের দিনে, মহম্মদ তুঘ্‌লকের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্তের কথা ভেবে ফিরোজ শাহ তুঘ্‌লক্ মহম্মদ তুঘ্‌লকের নির্য্যাতিত শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার ক'রেছিলেন এবং তাদের দ্বারা একটী মার্জ্জনা পত্র লিখিয়েছিলেন। সেই পত্র তিনি মক্কায় মহম্মদের সমাধি মন্দিরের গম্বুজের পার্শ্বে শেষ বিচারের দিনে আত্মরক্ষার জন্য রেখে দিয়েছিলেন। পত্রখানি এখনও সেখানে রক্ষিত আছে।

আমি যদি কখনও কারামুক্ত হই এবং আওরঙ্গজেব যদি কখনও আমার উপদেশ চান, তাহ'লে আমি তাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে উপদেশ দেব। তার নির্য্যাতিত শত্রুর মধ্যে অনেকেই আমার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয় ছিল। আমি তাকে ব'লব, "রাজ্যলাভের আশায় আর রক্তপাত করো না। দানবের দুর্গ মনে ক'রে হিন্দুর মন্দির ধ্বংস ক'রো না। বিজয়ী ইসলাম স্ফূর্ত্ত হ'য়ে উঠুক জ্ঞানের আলোকে। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ইসলামের বিজয় শকট পরিচালিত ক'রো না।"

আমি তাকে আনন্দে একটী জিনিষ দান করতাম, সেই জিনিষের শক্তি তাকে বিভীষিকার রাজ্য অতিক্রম করবার শক্তি দিত। যদি এই সম্রাটের চিত্তবৃত্তি অন্য প্রকার হ'ত, তবে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অদম্য-অধ্যবসায়ী রাজকুমার কি না হতে পারত? আমি তার অন্তরে দেখতে পাচ্ছি শুদ্ধ সত্তার অস্পষ্ট ছায়া, নীরব গভীর অনুতাপের ক্ষীণ আলোক-রেখা এবং সেই ক্ষীণ আলোকের উপর নির্ভর ক'রে তার হৃদয়ে ভ্রাতৃ-প্রীতি সঞ্চারিত করব।

আমার পিতার মৃত্যু হ'য়েছে। একটী আলোকশিখা পৃথিবী থেকে খসে পড়েছে, সেই আলোকশিখা অদৃশ্য লোকে আবার জ্বলে উঠবে। তার দেহ নিয়ে গেছে সেই শ্বেতমর্ম্মর প্রাসাদে যেখানে আমার মাতা তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁদের সমাধিতে দুজনের জন্য আলো জ্বলে উঠবে, দুজনের জন্যই কোরাণ আবৃত্তি করা হবে।

আমি আমার আত্মজীবনীর শেষ কয়েকটী ছত্র লিখে যাচ্ছি। এই আত্মজীবনী আমার রুদ্ধকারার দিনগুলির সখা। আমি আজ সম্রাট বাবরের কথাগুলি স্মরণ করছি,—"আমার আপন আত্মার মত বিশ্বস্ত কোন বন্ধু আমি পাইনি। আমার নিজ অন্তর ব্যতীত আমি কোন নির্ভরযোগ্য স্থান পাইনি।" বোধহয় কোন একদিন—যখন জেস্‌মিন প্রাসাদ ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তখন আমার এই আত্মজীবনী পাথরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মানবের অক্ষিগোচর হবে।

তাজমহল গমনের পথে আওরঙ্গজেব যে মসজিদে প্রার্থনা করেছিলেন তাকে আমি মূল্যবান ঝালর ও সতরঞ্চ দিয়ে শোভিত করেছি। আমি সেই দুর্গে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাত করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমি সঙ্গে নিয়ে যাব তার জন্য একটী স্বর্ণ পাত্র, মণি মুক্তায় পূর্ণ, সে তার বহুদিন বাঞ্ছিত ধন—আরও সঙ্গে নেব ক্ষমা—যে ক্ষমা সে বহুবার পিতার নিকট যাচ্ঞা করেছিল কিন্তু পিতা তাকে সে ক্ষমা ভিক্ষা দেননি। আমি পিতার হয়ে তাঁকে ক্ষমা করব। আমি তাঁর কাছে একখানি পত্র লিখেছি। সে পত্রে আমার মুমূর্ষু পিতার পুত্রের নিকট শেষ ইচ্ছার কথা আমার ভাষায় আমি লিখেছি।

আমি ভায়োলেট পুষ্পের নির্য্যাস দিয়ে আমার কেশদাম সিক্ত করে নেব। আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যূথির স্নেহ দিয়ে অনুলেপন করে নেব। তারপর আমি একখণ্ড শুভ্র শাড়ী পরিধান ক'রে আমার ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। সে হবে ভ্রাতা-ভগ্নীর পুণ্যমিলনের পুণ্য-দিবস। গোয়ালিয়র দুর্গে আমার পিতার বংশধরদের মস্তিষ্কের শক্তি বিলোপ করবার জন্য পানপাত্রে বিষ মিশ্রিত করা হ'য়েছিল। আমি কিন্তু অন্য একটী পানপাত্র দেব। সে পানপাত্রে থাকবে ঘৃণা ও বাসনা বিনষ্ট করবার অমৃত ধারা, সে পানপাত্র থেকে যে ধারা নিঃসৃত হবে তার নাম হবে "দুঃখ"। আমার দিক থেকে আমার ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের আর ভয়ের কোন হেতু নেই।

আমি আমার ভ্রাতার প্রদত্ত কোন বিষপানে আমাকে হত্যা করব না, অথবা আমি বিষপানে আত্মহত্যা করব না। আমার চারিপার্শ্বে নীরবতার রাজত্ব রচিত হবে। শান্তিকামীদের আমি বিতরণ করব শান্তি, যে শান্তি তারা আকাঙ্ক্ষা করে সমাধি পার্শ্বে। সে সমাধিতে আজও মর্ম্মর সৌধের পার্শ্বে গোলাপ গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

শারদোৎসবে ভারতের ললনা দেবতার অর্ঘ্যরূপে নদীর জলস্রোতে জীবন্ত প্রদীপ ভাসিয়ে দেয়—আমিও দিব্যশক্তি স্রোতে কালের নদীতে ভাসিয়ে দেব আমার অন্তরের আলোক শিখা।

* * * *

আমি জ্ঞানলাভ করেছি, সমস্ত জাগতিক জ্ঞান ব্যর্থ হয়ে গেলেও এই বিশ্বে যে একটী করুণার উৎস রয়েছে—যে উৎস কখনো নিঃশেষ হয় না। এখানে রয়েছে একটী প্রেমের উৎস—যা' সমস্ত বিশ্বে প্রাণ সঞ্চার করে, বিশ্বের সমস্ত রহস্যের উৎস সেই প্রেমধারা। একজন মানুষের জীবনের ধারা পরিবর্ত্তনের তুলনায় একটী পর্ব্বত উৎপাটন অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

আর পাঠ উদ্ধার করা যায় নি।

সমাপ্ত

বন্ধন

শান্তশীল দাশ

বারে বারে মনে হয় এ পৃথিবী বড় অকরুণ,
দয়া মায়া মমতার স্থান নাই অন্তরে তার ;
মানুষ ধরায় এসে পায় শুধু দুঃখ যাতনা,
সারাটি জীবন ভরে আঁখিজল ফেলে বেদনায়।
আকাশে বাতাসে ভাসে বিষাদের মূক হাহাকার,
দিকে দিকে শোনা যায় হতাশার কাতর বিলাপ ;
আশাহত জীবনের দিনগুলি ধূসর বরণ ;
এর মধ্যে বেঁচে থাকা, নিয়তির ক্রূর পরিহাস।

তবু এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে কারো নাহি চায় মন,
যতই আঘাত আসে, তত জাগে জীবনের নেশা,
প্রাণপণে ধরে থাকে ; দুঃসহ বেদনার মাঝে
জানি না কী খুঁজে পায়, তবু সয় দুঃখ অনিবার।
সকল বাসনা যার আঘাতে আঘাতে হয় লীন,
পূরে নাকো কোন আশা নির্ম্মম পৃথিবীর বুকে,
কেন তবু এ ধরণী ছেড়ে যেতে ব্যথা বাজে প্রাণে :
বুঝি, পৃথিবীর সাথে কোথা যেন বাঁধা আছে মন।

রোগের ভয়

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(১)

ডাঃ ললিত সেন বন্ধুত্বের দাবীতেই উকীল নরেন মণ্ডলকে বল্লে—নরঃ সর্বম অত্যন্ত-গর্হিতম্। অত চা খেয়োনা, যকৃত সহ্য করবেনা।

চিকিৎসকের এমন উপদেশ পাল্টা জবাবের অবকাশ হ'তে পারে না। কিন্তু নরেন চিকিৎসা ও দেহতত্ব সম্বন্ধে মাত্র একজনেরই নির্দেশ মান্‌তো, যার উপদেশ দেবার অধিকারের দুটো কারণ ছিল। সে নির্দ্দেশক ও উপদেষ্টা তার স্ত্রী শ্রীমতী সুষমা রাণী। শ্রীমতী বড় ডাক্তারের আদরের কন্যা এবং ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের জোরে নরেন্দ্রের অখণ্ড সশ্রদ্ধ সমাদর লাভ করেছিল। সুষমা স্বয়ং প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা নিজের পদ্ম হাতে স্বামীকে চা পান কর্ত্তে দিত। চা এবং লিভারের অহি-নকুল সম্পর্ক হ'লে সে কথা ব্যক্ত হ'ত তারই শ্রীমুখ হ'তে। আর যখন এ মন্তব্য প্রকট হ'ল তখনও তাদের পেয় চা পাঠিয়েছেন শ্রীমতী সুষমা মণ্ডল সুদৃশ্য চীনামাটির আধারে। তাই নরেন বন্ধু ললিতের চা-বিরোধ সস্তার পেশাদারী মন্তব্য ব'লে গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করলে না।

সে বল্লে—ললিত পদ্ম-লোচন নাম রাখলে কানা ছেলে দেখতে পায় না। তুমি ধন্বন্তরী বাটা খেলেও ভিষক-ভাস্ম ললিত বাঁড়ুজ্যে হবে না। যদিও তোমার নাম ললিত।

ডাক্তার বল্লে—তুমি নরেন বোস্ হ'তে পারবে আমাদের সেইটাই ভাবী গৌরবের পূর্বছায়া। আর উনি ভিষক-ভীষ্ম নন—দ্রোণাচার্য, যাঁর হাতের অস্ত্র কথা কয়।

এ মুখ-তোড় জবাবের পর আর ঝগড়া চলে না। বিশেষ যখন মহেন্দ্র ব'ল্লে—শোধবোধ।

কিছুক্ষণ ফুটবল, ট্রাম-পোড়া এবং কণ্ট্রোলের চালের গল্পর পর ডাক্তার আবার এক দফা লড়ায়ের মাদল বাজালে।

ডাঃ ললিত সেন বল্লে—ষ্টুপিড নরেন ডাক্তারের মেয়ে বিয়ে করেছিল ব'লে আজ মেম-সাহেবের চাকরের মত তেলচুকচুকে—যদিও কণ্ট্রোলের চালে লোকের পেট ভরে না।

তর্ক হল নরেন মণ্ডলের জীবন-সংগ্রামের গুলিবারুদ। প্রত্যেক ব্যবহারজীবী মনে করে তার বচনায়ুধ এটম্-বম্ব হ'য়ে তাকে অন্তিমে বিজেতার আসন দেবে। সুষমার সুখ্যাতি নরেন্দ্রের মুখ-রোচক। কিন্তু এক্ষেত্রে যখন মহেন্দ্র হেসেছে তখন এ কথার প্রতিবাদ আবশ্যক।

সে এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্লে—ব্রাদার-সকল গোলাপে কাঁটা আছে। বেশী মধু খেলে গলা জ্বলে।

এ মন্তব্যর পর গৃহ-বিবাদ অসম্ভব। বিশেষ তারা যখন শিশুকাল হ'তে চিরকাল অভিন্ন-হৃদয়। তারা ক্লাশে প্রশ্নের উত্তর বলা-বলি করেছে। ট্রামে কতবার টিকিট না কিনে সোয়ারী হয়েছে, আর তিনজনে একমত হ'য়ে পর-নিন্দা করেছে এবং কলেজের নিরপরাধ শান্ত শিষ্ট ছাত্রের জীবন অতিষ্ঠ করেছে।

মহেন্দ্র বল্লে—সে কি বন্ধু? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? তোমার সোনার সংসারে কাঁটা তো দূরের কথা—আরশোলা, ইঁদুর থাকতে পারে, এ চিন্তা অসহনীয়।

আজ দীর্ঘ এক বৎসর পরে তারা মিলেছে। ললিত চিকিৎসা করে মুর্শীদাবাদ জেলায় ইশলামপুরে। মহেন্দ্র বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। নরেন্দ্র এবং সুষমা মণ্ডলের সংসারে যেন মা লক্ষ্মী স্বয়ং বিরাজিতা। চকচকে তকতকে ঘর, বাছা বাছা সরঞ্জাম, নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ভোজ্য তিনবন্ধু একত্রে উপভোগ করবে দু ঘণ্টা পরে। তাদের নিজেদের পল্লীগ্রামে বাস, হাওয়া আছে, গাছ আছে, সম্মান আছে, কিন্তু মাত্র কষ্ট অন্নবস্ত্রের।

বন্ধুত্রয় অবগত ছিল যে সে সময় নরেন্দ্রের প্রেমময়ী স্ত্রী তিন তলায় রান্নাঘরে পাকশালা পরিদর্শনে প্রবৃত্ত। তবু মানুষের মন না মতি—বিশেষ মহিলার মন। এক বার নিচে এসেওতো পড়তে পারেন শ্রীমতী। নরেন উঠে ঘুরে তদন্ত ক'রে এল, অপ্রিয় কথা ব্যক্ত করবার পূর্ব্বাহ্ণে।

তারপর অতি মৃদু-স্বরে বল্লে,—সুষুর সব ভালো। কিন্তু ডাক্তারের মেয়ে কিনা—দুর্দান্ত রোগের ভয়।

মহেন্দ্র বল্লে—রোগের ভয় কার বা নেই। ফুঃ!

সত্য কথা এই যে গৌর-চন্দ্রিকার অনুপাতে গাওনা জম্‌লোনা। সমাচারের অনুপাতে তার বাঁধনীর আধিক্যতা হাস্যাস্পদ। তাই ডাঃ ললিত বল্লে—রোগের ভয় আছে বলেই তোমার সংসারে ভোগের জয়। তোমাদের বিজলী বাতি বা জল গ্যাস ড্রেণ মারিভয়ের বিলোপ কর্ত্তে পারে না। ঐ ভয়টা প্রতি গৃহস্থের থাকলে, জীবনের স্বচ্ছন্দতা বাড়ে, সুন্দর অধিক উপভোগ্য হয়—

—তোমার মুণ্ডুতে কবিতার লহর ছোটে। ওরে বাবা, মুখস্থ বিদ্যে ছাড়। কথাটা তলিয়ে বোঝ।

তার্কিক নরেন্দ্রের মগজের তর্ক-কেন্দ্রে বান ডেকে উঠলো। এরা মূর্খ। বাস্তবের পট-ভূমিতে না বুঝলে বিজ্ঞান হয় তোতা-পাখির ভোঁতা বুলি।

ললিত বল্লে—এ বচনগুল্যও রাধাকৃষ্ণ বুলি। পড় বাবা আত্মারাম।

শিক্ষক মহেন্দ্র ছেলে তাড়িয়ে খায়। সে জানে শিক্ষা দেওয়া মানে শেখানো নয়, পাশ করাবার আয়োজন। ছেলে ঝাঁকে ঝাঁকে পাশ করে বলেই জীবন সংগ্রামে ফেল হয়। কারণ শিক্ষাটা ঢাকের বাঁয়ার মত। সুতরাং ডাইরেক্টরের অনুমোদিত শিক্ষা-পুস্তকের মত এদের ছেঁদো কথাগুলা। কোন্ সত্যকে পরদায় ঢাকছে সেটা বোঝা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

সে বল্লে—বন্ধু বড় বড় বচন ছাড়ো, যেহেতু বচন-সুধা জ্ঞানের ক্ষুধাকে দাবাতে পারে না। কিসে তোমার গৃহ-লক্ষ্মীর রোগের ভয় ভীতিকর, সে কথা দৃষ্টান্ত এবং ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা প্রমাণ কর।

ললিত বল্লে—পণ্ডিত হ'লেই মানুষ মূর্খ হয়। জগদীশ্বরের কৃপায় হেডমাষ্টার হ'লেও মহেন্দ্র তেমন মূর্খ নয়, তাই একটা পাকা কথা দৈববশে ব'লে ফেলেছে। বল মণ্ডল, ব্যাধির ভয় কিসে?

নরেন্দ্র বল্লে—ওটা ঠাকুরমার সুচি-বাইয়ের মত। ধর গত মাসে সুমুকে সাতদিন বাসনী মাজতে হয়েছে, দাসী তাড়িয়ে।

ললিত বল্লে—দাসীরা মেনকা উর্বশীর মত। দীর্ঘ কাল স্বর্গ-ভোগ তাদের পক্ষে রোগ। তাই হাওয়া-বদল করতে কল্প-বৃক্ষের ছায়া ফেলে কিছুকাল স্যাওড়া-তলায় বিচরণ করে।

নরেন্দ্র বল্লে—না এ ক্ষেত্রে মানদা-দাসী নিরপরাধ। সুমু তাকে যে কারণে জবাব দিয়েছিল সেটা উনপঞ্চাশের একটি বায়ুর ঝোঁকে।

প্রকৃতপক্ষে উকীল নরেন্দ্র মণ্ডলের বন্ধুদ্বয় তার মনের এমন বিদ্রোহী ভাব কল্পনা করেনি। তবে কাল-মাহাত্ম্য এবং স্থান-মাহাত্ম্য সনাতন। যে যুগে নধর-দেহ নন্দেরচাঁদ ছেলে বাপের তিরস্কারের ফলে প্রতি-তিরস্কারের জন্য সঙ্ঘের ছেলে ডেকে আনে, সেকালে সুষমার সুষ্ঠু হাতে পুষ্ট নরেন মণ্ডল অশিষ্ট পথের গণ্ডগোলে উম্ন-মুণ্ড হবে সে আর আশ্চর্য্য কথা কিরূপে! আর তার উপর তাদের মনের পটভূমিতে যে কিঞ্চিত পরনিন্দা-রূপ বিমল আনন্দ উপভোগের চাহিদা ছিল না, এ কথা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। মৌচাকে খোঁচা না দিলে মধু-ক্ষরণ হয় না। সুতরাং হেডমাষ্টার বল্লে—মিসেস মণ্ডলের মত সাক্ষাৎ মানময়ী কমলা বিনা দোষে মানদাকে তাড়ায় নি।

মণ্ডলের রসবোধ কিছু কম ছিল না। সে উকীল—পরের দুর্বলতা এবং কলহ-প্রিয়তা তার জীবিকা ও বিলাসের উপায়।

সে বল্লে—খোষামোদ করলে যে সুমু তোদের একটা সন্দেশ বেশী দেবে তা' নয়। না শুনতে চাও তো বাস্।

ডাঃ সেন বল্লে—মাষ্টারের কথা পূর্ব্বযুগে গ্রহণ কর্ত্ত লোক। এখন এলো-মেলো পথিক হাওয়ার যা মর্য্যাদা আছে, মাষ্টারের কথার সে ইজ্জত নাই, বল ব্রাদার মানদার কর্ম্মচ্যুতি কাহিনী।

মণ্ডল বল্লে—তার ননদের ভাইপোর—

মাষ্টার বল্লে—তা' হলে তার স্বামীরও ভাইপো?

মণ্ডল বল্লে—না ভুল হয়েছে। মানদার ননদের স্বামীর মাসীর নাতির হাম বেরিয়েছিল। দাসী তার খবর আনতে গিয়েছিল। রোগীর ঘরেও ঢোকেনি। সে সমাচার পেয়ে সুমু মানদা দাসীকে সাতদিনের বেতন বেশী দিয়ে সরাসরি বিদায় করলে। আর দু টাকার ক্লোরিন ডি ডি টি, এবিসি কি সব ছাই-ভস্ম কিনে আমার মেহনতের টাকা বরবাদ করলে।

অবশ্য হাম কাণ্ডটা ভীতিকর। তার স্বামী-পুত্রের

কল্যাণে যদি ঘটা ক'রে একটা শুদ্ধি প্রকরণে শ্রীমতী আত্ম-নিয়োগ করে থাকে তো দোষ কি ?

মণ্ডল বন্ধুদের মতে মত দিতে পারলে না। এ নহে অকস্মাৎ।

এই অকস্মাতের প্রসঙ্গে তার স্মরণ পথ রাঙিয়ে তুললে কবির স্মরণ-কবিতা, আর পরক্ষণেই তার বিস্মৃতি অবলুপ্তির যোগাযোগ।

সে বল্লে—আমার শালা মণ্টুকে জানো। সে আমার সঞ্চয়িতা নিয়ে গিয়েছিল তাদের ক্লাবের সরস্বতী পূজায় আবৃত্তির জন্য। সেদিন বই ফেরত দিতে এলো। একটু গদগদ কণ্ঠে মিত্র গদাই মিত্রের সুখ্যাতি করলে। সহোদরার কাছে আদর কাড়িয়ে বল্লে—জান দিদি গদাইয়ের সেদিন জ্বর, আলজিভ ফুলেছে পিস্তলের টোটার মত। তবু বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তো মোর নয়—এমন দরদ দিয়ে পড়লে যে কোনো নবীন সন্ন্যাসী শুনলে লোটা কম্বল ফেলে, বেহালায় তান মেরে গাইতো—দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।

তিন বন্ধু হাঁসলে। তারা শ্যালক মণ্টুর রসবোধ ও সাহিত্য-সন্ধানের সুখ্যাতি করলে। পরক্ষণেই নরেন মণ্ডল সামলে নিয়ে বল্লে—দাঁড়াও ব্রাদার, গল্প ওখানে শেষ নয়। শ্রীমতী সুষমা মণ্ডল একটু জেরা ক'রে বল্লে—মণ্টু ও বইটা তুই নিয়ে যা। আর ডিডিটি দিয়ে হাত ধো।

এরা সমস্বরে বল্লে—সঞ্চয়িতা!

স্বরের অন্তরে লোভ ছিল, বিস্ময়বহিরাবরণ। মণ্ডল সামলে নিয়ে বল্লে—সঞ্চয়িতা। সে সারাদিনের পরের ঝগড়ার দুর্বিসহ ক্লেশ নাশ করতে অদ্বিতীয়। দিনের শেষে ঘুমের দেশে—

বাধা দিয়ে দরদী বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে, মণ্ডল একখানি কেনেনি কেন ?

—তাই জানতো। যুদ্ধের আগে পাঁচ সিকায় সমস্ত সেক্সপেয়ার পাওয়া যেতো। দশটাকার বার্ণার্ড স আমার কাছে আছে। কিন্তু আমরা মুখে রবীন্দ্রনাথের জয়গান করি, কজন তাঁর অমূল্য রচনাবলী মূল্য দিয়ে কিনতে পারে ? ওঃ ! কী দাম।

হেডমাষ্টার বল্লে—অমূল্য গ্রন্থ শস্তা হবে কেমন ক'রে ? বেশী দামে কেনা মানে স্বার্থত্যাগ। অন্যদিকে ব্যয় সংকোচ করতে হবে, সে রত্ন আহরণের জন্য। একখানা সামান্য টিক্‌টিকি নভেলের কি দাম একবার চিন্তা কর তো। তার তুলনায়—

ধৈর্য্য-চ্যুত চিকিৎসক বাধা দিয়ে বল্লে—মূর্খ ছাত্রদের মলাট-সাহিত্য শেখানো আর বড় কথায় অবুঝের মত মন্তব্য দেওয়া এক রকমই সুলভ কাজ। কিন্তু বুদ্ধি জিনিসটা শস্তা নয়।

মহেন্দ্র বল্লে—মানুষ-মারা বুদ্ধি-ফোয়ারার মনীষা-বরষণের একটু পরিচয় দাওনা ডাক্তার।

ললিত বল্লে—মমবাতি দিয়ে একটা ঘরকে আলোকিত করতে যে খরচ হয়, বিজলী বাতিতে সেই পরিমাণের আলো আরও শস্তায় পাওয়া যায়। আবার চাঁদের আলো বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়। আর আলোর রাজা রবি তাঁর কর ঝোঁপে ঝাঁপে পর্বতে কন্দরে ধনী ও দরিদ্রের প্রাঙ্গণে সমানভাবে বিতরণ করেন। কবি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থও ধনার কাছে চাঁদা তুলে ছাপিয়ে লোকের ঘরে ঘরে বিতরণ করা কর্ত্তব্য।

গল্পের স্রোত এখানে বহিবার পর আর তাদের ফিরিস্তি সংগ্রহ করা হলনা, শ্রীমতী সুষমা মণ্ডলের রোগের ভয়ে বেচারা উকীলকে কোন্ কোন্ পদার্থ হতে বঞ্চিত হতে হয়েছে।

(২)

পরদিন ললিত এবং মহেন্দ্র একত্র হ'ল হাজরা পার্কে। শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব উৎসব। লোকের মনকে ন্যায়ের দিকে, ধর্মের পথে, সাধনার উচ্চভূমিতে উঠিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন হ'য়েছিল বিপুল।

সভার শেষে দেখা গেল সাধনমার্গ দুরূহ। কারণ মহেন্দ্র মাষ্টারের নিত্য-কর্ম জ্ঞানাঞ্জনশলাকাসম্পর্কিত। তার মনের লোভ এবং চিটিংবাজী একটুও টোল খায়নি, ধ্বংশ প্রকাণ্ড কথা। সেদিন রাত্রে ঘরে ফেরবার প্রাক্কালে গগনে গরজে মেঘ, মুষলধারে বৃষ্টি, কোন সাগরের পার হতে এলোরে প্রবাসীর হাওয়া। সেদিন শ্রীমতী সুষমা তাকে চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় দ্বারা পরিতৃপ্ত ক'রে বলেছিল—আপনার গলা-খোলা হাত-কাটা সার্ট। এটা বিদেশ। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগতে পারে। একটা কোট নিয়ে যান্।

আজ তার মনে যে বে-ইমানী ভাব হুকার দিলে তার

জন্ম দায়ী নরেন্দ্রের কথা। এ সিদ্ধান্ত হ'ল তার বিবেকের চোখের ঠুলি। নরেন্দ্র বলেছিল—না, না, মুমু তুমি মাথা ঘামিয়ো না। ও পল্লীগ্রামের মানুষ, অত শীঘ্র ওদের ঠাণ্ডা লাগে না।

আজ ধর্মস্থান থেকে বেরিয়ে মহেন্দ্র ললিতকে বল্লে—ডাক্তার, এ কোট্‌টা আমাকে কৈমন মানিয়েছে?

বিজলীর আলোতে দেখে চিকিৎসককে স্বীকার কর্তে হ'ল যে কোট এবং তার অঙ্গ যেন কাশ্মারী আপেল ও তার খোসা। বেশ ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। তার পর ডাক্তার বল্লে—তাতে তোমার কি বন্ধু? ও পরের জিনিস। দশ মিনিট বাদেই ফেরত দিতে হবে।

শিক্ষক বল্লে—নরেন্দ্র পর নয় এবং জামাও ফেরত দে'বনা।

ললিত বল্লে—এ দুটো কথাই সত্য। তোমার গায়ে এমন কাপে কাপে বসেছে, এবং তোমার বাসনা হ'য়েছে, ও জামাটা নিজস্ব করবার, এ সংবাদ পেলে নিশ্চয়ই নরেন্দ্র আর জামা ফেরত নেবেনা।

মহেন্দ্র বল্লে—বল কি ডাক্তার? ভুলছ কেন এদিন আমাদের মন বস্তুভারশূন্য। আমাদের জীবনটা দশ বৎসর পেছিয়ে গেছে। তা' হ'লে তখনকার নীতি স্মরণ কর। কেউ আদর ক'রে সোনার চাট্‌নী বা মুক্তার ঘুঘনীদানা দিলে আমাদের রুচি হত না। কিন্তু খেলার মাঠে চিনেবাদাম কেড়ে নিয়ে খেলে তবে সুখ হ'ত। এ কোট চিটিংবাজি করে আত্মসাৎ করলে তবে সোনামুখী বিত্যালয়ের ছাত্ররা বুঝবে হেডমাষ্টার মশার ইথে বড় ই নয়।

—কিন্তু আজকের দিনটা? ধর্মসভা, মোক্ষের পথ, বিশ্ব-চেতনা—

—জগাই-মাধাই অন্তে তো উদ্ধার হ'য়েছিল। যখন প্রথম জীবনে—

—থাক।

যখন তারা নরেন্দ্রের বাড়িতে পৌছিল, তখন মহেন্দ্রের শরীর হ'তে ইউক্যালিপ্টসের গন্ধ নির্গত হ'চ্ছে। তার চুলগুলা উস্কোখুস্কো। সে এক একবার কাস্‌ছে।

তারপর যে কাণ্ড হ'ল সেটা নৃশংস। কারণ তাদের দেখে যেমনি সাতবছরের পরী খুকু ছুটে এলো, মহেন্দ্র বল্লে—সরে যাও মা। সরে যাও। কাল কথার গল্প বল্‌ব। আজ ভীষণ সর্দ্দি হ'য়েছে। কেমন খুকু? কাল। কাঁকড়া কেমন খ্যাঁক্‌শেয়ালের নেজ কামড়েছিল সে গল্প বল্‌ব। লক্ষ্মী মা। সোনা মা।

একটু অপ্রস্তুত ও অভিমানের ছায়া দেখা দিল শিশুর কমল-মুখে। ডাঃ ললিত সেন বুকের মাঝে একটা আঘাত পেলে। নরেন্দ্রের দুরদৃষ্টি দেখলে, অন্ততঃ খুকুর পোষাকটা বেঁচে গেল, কিন্তু বুঝলে এ সর্দ্দির তলে বিরাজিত শয়তানী।

তারা গল্প করলে। আনন্দের কথা, সুখ দুঃখের কথা, পুরাতন দিনের বন্ধু বান্ধবের কথা এবং অবশ্য রাজ-নীতির কথা। শেষে শ্রীমতী সুষমা এলেন। তখন গল্পের খাদ বদ্‌লালো।

সুষমা বল্লে—মহেন্দ্রবাবু আপনার সর্দ্দি হয়েছে। অবশ্য ললিতবাবু রয়েছেন। না হ'লে একবার বাবাকে ডাকতাম।

মহেন্দ্র বল্লে—কী সর্বনাশ। মশা মারতে কামান দাগা। আমরা গেঁয়ো লোক এ-সর্দ্দি নাইতে খেতে সেরে যাবে।

তার পর ধর্ম-সভার কথা হ'ল। শেষে মহেন্দ্র বল্লে—ওঃ! ভুলে যাচ্ছিলাম। নরেন ভাই তোমার কোট্‌টা।

সে দ্রুত হাতে দুটা বোতাম খুল্‌লে।

সুষমা বল্লে—ছিঃ! ছিঃ! করেন কি! করেন কি! সে কাল চলে যাবে। আর জামা ফেরত দিতে সময় পাবে না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? না হয় বন্ধুর একটা স্মৃতি তার মাঝে রহিল। এই সব আলোচনার পর শ্রীমতী সুষমা মণ্ডল বল্লেন—এ-ক'দিন আমার কী আনন্দে কেটেছে কি আর বলব? ইনি সারাদিন পরিশ্রম করেন। পুরানো দিনের বন্ধু পেয়ে একেবারে যেন ভিন্ন মানুষ।

ললিত বল্লে—সেটা উভয়তঃ।

শেষে তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল যে পূজার ছুটিতে আবার কলিকাতায় এসে আনন্দ করতে হ'বে।

সুষমা আবার বল্লে—কিন্তু আমার বোনদের আনবার চেষ্টা করুন। তাহ'লে আমার বড় আনন্দ বাড়বে।

ললিতের স্ত্রী পিত্রালয়ে হুগলি যাবে। মহেন্দ্রের স্ত্রী বীরভূমিতে না গেলে মাতৃ-সন্দর্শন হবে না। সেন-জায়া নিশ্চয়ই একদিন হুগলী থেকে এসে শিখে যাবে গৃহ-সজ্জা ও রন্ধনের মোচ্‌কোফের।

—আবার আমাকে পরিহাস করছেন ললিতবাবু?

ললিত বল্লে—ভগবান হাতীর চোখ ছোট করেছেন।

সে তার দেহের বৃহত্ত দেখ্‌তে পাবে না বলে। আপনার গুণ-পনা, সৌজন্য—

বাস্‌ বাস্‌—ব'লে এক মুখ হেঁসে, নমস্কার ক'রে ললিত রণে ভঙ্গ দিয়ে পিট্‌টান দিলে।

সদর দরজায় এসে মহেন্দ্র বল্লে—নরেন পূজার সময় এক জোড়া ভালো জুতা কিনে রাখিস্‌। যাক্‌ একেবারে বিনা ব্যয়ে তোর কোট্‌টা নিইনি। নগদ চার আনার ইউক্যালিপ্টাস কিন্‌তে হয়েছে। জুতাটা যেন ভাল হয়।

নরেন্দ্রর মুখে আসছিল তার পিঠ্‌ শক্ত করবার উপদেশ। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল—সর্বত্রভ্যাগতো গুরু। সুতরাং মাত্র বল্লে—শয়তান।

পরের মিলনে তাদের শুনতে হয়েছিল, গল্পের বাকীটুকু। কারণ সুষমা ভোলবার পাত্র নয়। সে রাত্রে নরেন্দ্রকে লিষ্টারিন দিয়ে মুখ ধুতে হ'য়েছিল, আর গলায় ক্লোরিটোনের হাওয়া দিতে হ'য়েছিল।

৩

পূজা অবধি অপেক্ষা করতে হ'ল না। মুর্শীদাবাদের এক ধনী রোগীর সঙ্গে ডাঃ ললিত সেনকে কলিকাতায় আস্‌তে হল ভাদ্রে। সে সময় তার শ্যালক গিয়েছিল ইশলামপুর। তার সঙ্গে ললিত সেনের স্ত্রী সাত দিনের ছুটিতে এলো হুগলি।

সেদিন শনিবার। নষ্টচন্দ্র দর্শন নিষেধ। শ্রীমতী রেবাকে তার স্বামী বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেল। সোনামুখী থেকে মহেন্দ্র এসেছিল রবিবার কলিকাতায় কাটাতে।

সুষমা ও রেবার এই প্রথম মিলন। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে উঠলো যে কাহারও পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভবপর হল না যে তারা মাত্র তিন দিনের পরিচিত। মোট কথা বন্ধুরা নিজ নিজ স্ত্রীর কাছে সদাই পুরাতন কথা বলত, তাই পরস্পরের জীবনের বহু রহস্য কথা লুকানো ছিল না এদের নিকট। শ্রীরেবা সেন শুনেছিল—শ্রীসুষমার রোগ ভীতির বার্ত্তা। কিন্তু নতুন বান্ধবীর হাব-ভাব কথা বা কাজে তার চরিত্রের সে দিকটা আত্মপ্রকাশ করলে না। অথচ সকল মহিলা স্ত্রীলোক। গোপন সমাচারের ভাণ্ডার লুট করার প্রবৃত্তি তাদের চেঙ্গীজ খাঁ বা সুলতান মামুদের বিজিত রাজার ধন ভাণ্ডার লুটের তৃষার সমান।

রেবা বল্লে—আমি যদিও ডাক্তারের স্ত্রী, তোমার মত ঘরকরনা এতো পরিষ্কার রাখতে পারিনি। ডাক্তারের মেয়েরা এ-বিষয় ভালো।

সুষমা হেঁসে বল্লে—কলিকাতায় সুবিধা আছে, কারণ ঘরের মেজেগুলো প্রায়ই পেটেণ্ট পাথরের। তারপর সাফ করবার ওষুধ সহজে পাওয়া যায়। আর আমার মনে হয় পল্লীগ্রামে ভিড় কম, তাই বাতাস পরিষ্কার।

রেবা এবার সুবিধা পেলে। সে বল্লে—হ্যাঁ যদি পর্ণ-কুটীরে বন্ধ হয়ে কেহ তপোবনে বসে থাকে, তার সংক্রামক রোগের ভয় থাকে না। কিন্তু মোটেই ভুলো না যে আমার স্বামী ডাক্তার। তাঁর কাছে যক্ষ্মা রোগী থেকে ম্যালেরিয়া রোগী দলে দলে আসে। আর ভাই ভয় করে ছেলেটাকে নিয়ে। ছুটে ছুটে ডাক্তার থানায় যায়। ডাক্তারকে তুষ্ট করবার জন্য লোকে তাকে কোলে করে। সে-দিন এক ইনফ্লুয়েঞ্জার রোগীর কোলে দেখি খোকাকে।

সুষমা বল্লে—বাবা বলেন, লোকের মধ্যে এমন প্রতিরোধের সহজ শক্তি আছে যে সংক্রমণ সহজে কিছু করতে পারেনা।

রেবা সেন একটু অপ্রস্তত হল। ভাবলে পুরুষদের পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা অল্প। তাই তারা তার নবার্জিত বান্ধবীর বদনাম দিয়েছে।

ঠিক সেই সময় মেঘ সরে গেল। কাস্তের ফলার মত চাঁদ দেখা দিল পশ্চিম আকাশে। রেবার পক্ষে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, সীমার মাঝে অসীমের নানা বর্ণ, নানা ছন্দ ইত্যাদির বিশেষ সমাদর ছিল না। কারণ তারা দৈনন্দিন জীবনের সাথী।

সে বল্লে—তোমরা কলকাতার লোক জান না। আজ সৌভাগ্য-চতুর্থীর ব্রত। কিন্তু নষ্টচন্দ্র দেখলে নামে কলঙ্ক রটে।

সুষমা বল্লে—নামটা অজ্ঞাতবাস করার চেয়ে কলঙ্ক কাঁধে নিয়ে বেড়ালেও সার্থক। এই কলঙ্কর কথায় মনে পড়লো বাবার বন্ধুর গান। আমরা শিশুকালে পাশের ঘর থেকে শুনতাম—প্রেম সুখে হয় সে সুখী কলঙ্কে ভূষণ করিলে।

দুজনে হাঁসলে। রেবা বল্লে—আজকের দিনে ও গান

গাহিলে লোকের নাকের ডগা কিম্ভুদকিমাকার মূর্ত্তি-ধারণ করে।

কিন্তু পরক্ষণেই শ্রীরেবা সেন চাক্ষুস প্রমাণ পেলে সেই কথার—যা জানবার জন্য তার চিত্ত হ'য়েছিল ব্যাকুল। হঠাৎ শ্রীসুষমা মণ্ডলের দৃষ্টি পড়লো একটা প্লেটে রক্ষিত দুটি পুষ্ট আতা ফলে।

সে উত্তেজিতভাবে ডাকলে চাকর সীতারামকে। তার পর বল্লে—সীতারাম তোমায় কি বলেছিলাম—ঐ আতা দুটা কোনো গরু বা অন্য জানোয়ারকে খাওয়াতে।

সে বল্লে—না মায়িজি।

—এখনি নিয়ে যাও, তোমরাও খেয়োনা। আমি বলছি কেন? যে স্ত্রীলোকটি ঐ ফল বেচে গেল, পরে দেখলাম তার হাতের তিনটে আঙ্গুলে, গলার কণ্ঠির কাছে আর কানের পিছনে সাদা দাগ। ও ব্যারামটা মোটে ভালো নয়—শ্বেত-কুষ্ঠ।

রেবা হেঁসে বল্লে—তাকে ফেরত দিলেই পারতে।

সুষমা বল্লে—ছিঃ ভাই। ওর যে মন আছে। ওর মনে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আর ও গরু টরু না। ও সীতারাম কোনো গরীবকে দেবে। নিজে খেতে সাহস করবে না।

রাত্রি আটটার সময় ললিতবাবু ও মহেন্দ্রবাবুর আগমন-বার্ত্তা এনে দিলে সীতারাম। দুজন বান্ধবী তাদের সঙ্গে গল্প করতে নিচে নেমে গেল।

৪

ঠিক্ এখানে আসবার পূর্বে কালীঘাটের মোড়ে মহেন্দ্র দেখতে পেলে তাদের বন্ধু পশুপতিকে। সে চিরদিনই সূক্ষ্ম দেহ, তাই মিত্র মহলে তার নাম ছিল—চিমৃরে। পশু ক্রমশঃ তাও সংক্ষিপ্ত হ'লে তার নামকরণ হল—চিমুপশু। তবে সময় সংক্ষেপের জন্য অনেক সময় ওকে লোকে বলত—চিমু।

তিন বৎসর পরে দেখা। কলেজের নাম লোকে ভুলেছে। তার নিজেরই সব সময় স্মরণ হতনা নিজের পরিহাসের নাম। সুতরাং যখন সে হঠাৎ শুনলে পুরাকালের অধুনা-বিস্মৃত ডাক—চিমু, একটা লহর খেলে গেল পশুর মাথায়। কী কাণ্ড! যমালয়ের ফেরতা মানুষ।

দুই বন্ধুতে পূর্ণ সাতাশ মিনিট গল্প হ'ল। প্রারম্ভে, মাঝে এবং শেষে তাদের হাসির রোল পথের-যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। অবশেষে উভয়ে সমস্বরে বল্লে—দশটা।

মণ্ডল গৃহে ভোজের পূর্বে ওদের পাঁচজনের যে সব প্রসঙ্গ গল্পের বিষয়, হ'ল, তার মধ্যে নিজেদের জীবনে দৈনন্দিন পথ-চলার সুবিধাঅসুবিধার কথাই হ'ল অধিক। কিন্তু যেহেতু সৌভাগ্য-ক্রমে রাজনীতি বাঙ্গালী-জীবনের সকল চিন্তা ও উদ্যমের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে, জহরলাল, বিধান রায়, শরত বসু বা ডাঃ কাটজু আলাপের বাহিরে রহিলেন না।

একবার উকীল নরেন মণ্ডল প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বল্লে—যেমন কানু বিনা গীত নেই, তেমনি রাজনীতি বিনা কথা নাই বাঙ্গালীর আবালবৃদ্ধ বনিতার মুখে। এইটাই হয়েছে জীবনের অভিসম্পাত। ট্রামে, বাসে, রায়-লাইব্রেরিতে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সর্বত্রই নয় কংগ্রেসের মুণ্ডপাত, না হয় কম্যুনিষ্টের আদ্যশ্রাদ্ধ—আর না হয় বাম-পন্থীর ভাণ্ডাফোঁড়।

ললিত-গৃহিণী বল্লে—পূর্বে মুণ্ডপাত হত ইংরাজের। মুণ্ড নিয়ে গোলা খেলাটা ঠিক আছে—মুণ্ডের আকারটা বদলেছে।

সুষমা বল্লে—তখন ছিল ভারতবর্ষ পরাধীন। এখন আমরা স্বাধীন জাতি।

এবার প্রসঙ্গ মাষ্টার মশায়ের বিশেষ বিস্তার মাঝে এসে পড়েছিল।

সে বল্লে—দেখুন স্বাধীন দেশ নিজের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে নিজের যৌথ-স্বার্থ ছেড়ে রাখতে পারে। কিন্তু আজ যাঁরা দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা তাঁরা শক্তিলাভ করেছেন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর ওয়ারিসন হিসাবে। যে যন্ত্র শাসন করছে সেটিও ইংরাজের গড়া এবং ছাড়া। ইংরাজ কল-চালানো মিস্ত্রির স্থলে বসেছেন দেশী ড্রাইভার। আর এই গবর্ণমেণ্ট খাদ্য-সরবরাহ করবার দায়িত্ব নিয়ে মানুষকে অর্দ্ধ-ভুক্ত রেখেছেন এবং আকাশবাণীতে পরামর্শ দিচ্ছে—কলা আর কচু খেয়ে প্রাণ ধারণ কর।

শেষের কথা এমন অঙ্গ-ভঙ্গী করে উচ্চারিত হ'ল, যার ফলে সভায় ভদ্র-মণ্ডলী ও মহিলা-বৃন্দ খুব হাসলেন।

বলা বাহুল্য সভার কার্য্য খুব সাফল্যর সঙ্গে সম্পাদিত হ'ল। কিন্তু সভা ভঙ্গের পূর্বে একটা শোচনীয় ব্যাপার ঘটলো, যার ফল সম্বন্ধে সারারাত্রি সকলের নিদ্রার ব্যাঘাত হ'ল।

রাত্রি দশটায় সভা-ভঙ্গের আয়োজন হ'ল। প্রত্যেকে স্বীকার করলে জীবনের ইতিহাসে সেটা একটা লাল-অক্ষরে লেখা দিন হবে, পরদিন রবিবার আবার তারা সকাল হ'তে সন্ধ্যা অবধি একত্র কাটাবার সঙ্কল্প করলে। রথ বেশ মসৃণ পাকা রাস্তায় চলছিল, হঠাৎ সেই শোচনীয় ঘটনার ফলে, চলতি রথের চাকা পড়লো পথের ধারের নর্দমায়। এক কলসী দুধে পড়লো একফোঁটা—যাক্!

বিদায়ের প্রাক্কালে সীতারাম খবর দিলে পশুপতিবাবু এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হ'তে শব্দ হ'ল—নরেন ভাই। আমি পশু—চিমু।

একটা সোরগোল হ'ল। নরেন বল্লে—এসো এসো। মহেন্দ্র মাষ্টার মহিলাদের বল্লে—যাবার দরকার নেই। এ আমাদের বাল্য বন্ধু—পশুপতি চক্রবর্ত্তী।

গৃহে প্রবেশ করলে শাল, কম্ফার্টার প্রভৃতিতে মোড়া জীর্ণ চিমু, হাতে একটা লাঠি, মাঝে মাঝে কাস্‌ছে। এসেই উচ্ছসিত আনন্দে বল্লে—বাঃ! মেঘ না চাহিতে জল। নবগ্রহ একত্রে। তার পর সে হ'ল গলগ্রহ। পর পর তিন বন্ধুকে আলিঙ্গন করলে, গালে গাল ঘষলে।

কী কাণ্ড! অবসন্ন হ'য়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বল্লে—আর ক'দিন বাঁচবে এ যক্ষ্মা-রোগী। যম-রাজের-শমন এসেছে। হঠাৎ খেয়াল হ'ল নরেনকে দেখে আসি। রাত মান্‌লাম না। রিক্সাচড়ে এলাম। ভাগ্য—শেষ ভাগ্য। একত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ওঃ।

তার পর কাশীর বেগ এলো। শ্রীমতী সুষমা ছুটে বাহিরে গেল। মাষ্টারের অধর কোণে দুষ্টামির হাঁসি ফুটে উঠ্‌লো। বাকী সব বিস্মিত।

তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে তার হাতে দিল সুষমা। অতি স্নেহ-ভরে বল্লে—আপনি স্থির হ'ন। জল খান। আমি কালই বাবাকে ব'লে ডাঃ উকীলকে পাঠিয়ে আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

৫

মোড়ে তাদের গাড়ি থামালো। চিমু হেঁসে বল্লে—বাবা গরমে মারা যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরিত্যক্ত নরেনকে তোরা কে নিবি?

মহেন্দ্র বল্লে—ও ঠিক্ থাক্‌বে। সুষমা চলে যাবে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি। তার পর ডাঃ উকীল ফুঁড়ে দেবেন সেই নূতন দাবাই—যার কথা উনি রোটারীতে বলেছিলেন।

যখন প্রকাশ পেলে যে এ অভিনয়ের জন্য দায়ী মহেন্দ্র, শ্রীমতী রেবা সেন ভদ্রতা ও সৌজন্য জলাঞ্জলি দিয়ে বল্লেন—ছিঃ! আপনাদের উচিত এখনি ওঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া। ছিঃ! ছিঃ!

পরদিন সকালে দুই বন্ধু এবং রেবা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পৌঁছিল মণ্ডল-গৃহে। তাদের অভ্যর্থনা করলে শ্রীমতী সুষমা।

—নরেন কোথায়?

সমস্বরে দুই বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে।

সুষমা বল্লে—সে যক্ষ্মা-রোগী ছোঁয়া পদার্থ। ছোঁয়াছে রোগীর স্পর্শ করা আমার স্বামীকে দান করবার পাত্রী খুঁজছিলাম। যখন রেবার স্বামী তাকে কেড়ে নিতে চেয়েছে ও রোগের বীজ-ভরা পদার্থটি রেবাকেই দ'ব ঠিক করেছি। ওটা আমার নেশা। ছোঁয়াচ-লাগা পদার্থ ঘরে রাখিনা। আয় ভাই রেবা।

তার পর সে রেবার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কক্ষান্তরে। সে কক্ষে বসেছিল হাস্য-মুখ নরেন। রেবাকে বল্লে—রাগ করিসনি তো অপদার্থ উপহার পাবার প্রস্তাবে।

রেবা বুঝলে কাণ্ডটা। খুব হাঁসলে।

সুষমা বল্লে—কর্ত্তার হঠাৎ কী মতলব হ'ল আমার নিন্দা করবার, তাই নষ্ট চন্দ্র দেখার পূর্বেই নামে কলঙ্ক দিলেন। স্বামীর সত্য রাখবার জন্য গরীবকে ত্যাগ করতে হ'ল একটা কোট আর এক জোড়া আতা। খালি পশুপতিবাবু অভিনয় করেন না। আমিও গোখ্‌লেতে অভিনয় কর্ত্তাম।

যখন নরেনবাবুর হাত ধরে রেবা এ ঘরে এলো, আবরণ-মুক্ত পশুপতিও সেথায় এসে জুটেছে।

রেবা বল্লে—না রেবা পাবে না। রোগের ভয়ে পরিত্যক্ত এ নতুন দান পশুপতিবাবুর প্রাপ্য—এই নিন।

নরেন যখন চেপে তার কোলে বস্‌ল, কাতরকণ্ঠে পশুপতি বল্লে—সত্যি মৃত্যু এলো। ওঃ বাবা!

পূর্ব্ব আফ্রিকায় প্রচার কার্য্য

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা (ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মীরা) কাহামায় বেশীদিন থাকবো না তা' প্রথম থেকেই ঠিক কোরে গিছলাম। তাই তিন চার দিনের মধ্যেই কাজকর্ম্ম সেরে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। এখানে হিন্দুদের মধ্যে বেশ একটা সংগঠনের ভাব আছে। লোকজনের ধার্ম্মিকভাবও বেশ। ছোট বড় সকলেই প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় হিন্দুমণ্ডলের বাড়ীতে একত্রিত হয়। সেখানে সমবেত প্রার্থনা, পূজা, ভজন, কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বাহিরে হিন্দুর এরূপ ধর্ম্ম-ভাব বড় একটা দেখা যায় না। সহরে একটা সরকারী হাসপাতাল আছে। তার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি-কে যুক্ল—বেশ ধর্ম্মনিষ্ঠ সরলপ্রাণ একজন গোঁড়া হিন্দু যুবক। তাঁর চেষ্টা ও প্রেরণাতেই সহরের হিন্দুদের এই মিলনের ভিত্তি স্থাপিত হোয়েছে। ডাক্তার যুক্লই এই সজ্ঞের নেতা, কর্ম্মী, সেবক ও অভিভাবক সব। একশ নব্বই জন হিন্দুর বাস এই সহরে। আমরা যে-কয়দিন ছিলাম, সে কয়দিন প্রায় সকলেই আমাদের সভায় আসতো।

আফ্রিকার আদিবাসী—সোয়েলী

আফ্রিকার আদিবাসী—মাসাই

সেখানে দু' তিন দিন থাকার পর আমরা একদিন বিকাল ৫টায় মাউন্সা যাওয়ার জন্য কাহামা থেকে নির্গত হ'লাম—ইসাকা ষ্টেসন অভিমুখে। ডাক্তার যুক্ল তাঁর নিজের মোটরে আমাদের ষ্টেসনে পৌঁছে দিয়ে এলেন। স্থানীয় ময়দার মিলের মালিক শ্রীকালিদাস লীলাধরের বাড়ীতেই আমাদের নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা হোয়েছে। আমাদের বিদায় দেওয়ার জন্য কাহামা থেকে দুইটি মোটরে ছ' সাত জন লোক এসেছিলো। সবার খাওয়া দাওয়ার পর সামান্য কিছু বক্তৃতাও হোল। ইসাকায় হিন্দুর বসতি নেই। ষ্টেসন মাষ্টারের পরিবারের চার জন, শ্রীযুত লীলাধরের মিলের পাঁচজন, আর আমাদের বিদায় দিতে যারা এসেছিলেন—এই হোল বক্তৃতার শ্রোতা। শ্রীযুত লীলাধর থাকেন সিনিয়াঙ্গা নামে একটা সহরে—তাই

এখানে তাঁর থাকার বাসাবাড়ীটি বড় নয়। রাত দু'টোর গাড়ীর ঘণ্টা বাজতে আমরা সকলেই ষ্টেসনে গেলাম। ট্রেন এলে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বোসলাম। যাঁরা আমাদের বিদায় দিতে এসেছিলেন—গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ষ্টেশনের গ্যাসের আলোগুলোও ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হোয়ে গেলো। রাতের গভীর অন্ধকারের বুক চিরে ভয়ানক দৈত্যের মতো আমাদের গাড়ী ছুটছে।

ভোরের রক্তরাঙা আকাশে সূর্য্যদেবের আবির্ভাবে যখন

শিকারী মাসাই

পৃথিবীর বুকে সোনালী রংয়ের আলো ছড়িয়ে পড়ছিলো তখন আমাদের সেই দানবের মতো ট্রেনখানা এসে দাঁড়ালো—পূর্ব্ব আফ্রিকার বিখ্যাত সহর সিন্নিয়াঙ্গারে। জানিনা আমাদের এই ট্রেনে মাউঙ্গা যাওয়ার সংবাদ কেমন কোরে জেনেছিলো এই সহরের হিন্দুরা। অনেকে এসে আমাদের সহরে নিয়ে যেতে চাইলে, কিন্তু আমরা আর নামলাম না। আমরা একেবারেই মাউঙ্গা যাবো জানাতে নিরাশ হোয়ে ফিরে গেলো সকলে। এখানেই শুনলাম, গতকাল আমাদের মিশনের সকলে এখান থেকে মাউঙ্গা রওনা হোয়ে গেছেন।

একদিন ছিলো যখন এই সিনিয়াঙ্গার নাম কেউ জানতো না। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে একজন ইংরাজ তাঁর এক ভারতীয় বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার কোরে চাষ আবাদের জন্য কিছু জমি কেনেন এই সিনিয়াঙ্গায়। সেই জমিতেই আবিষ্কৃত হোয়েছে একটা হীরক-খনি। পৃথিবীর ভাল ভাল হীরা এখন এই খনি থেকেই বেরোয়। ডাঃ উইলিয়াম্‌সন হোলেন এই হীরকখনির মালিক। আগে ছিলেন তিনি গরীব; আর্থিক কষ্ট লাঘবের জন্যই তিনি আসেন স্বদেশ ছেড়ে এই আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে চাষ বাসের উদ্দেশ্যে। জমি কেনার মতো-টাকাও তাঁর হাতে ছিল না—টাকা ধার কোরে জমি কেনেন। হয়তো তিনি গবেষণার দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই জমিতে হীরা পাওয়া যাবে। আজ এই কয় বছরের মধ্যে ডাঃ উইলিয়ামসনের স্থান অনেকের মতে—পৃথিবীর তৃতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির পর্য্যায়ে। নিজের অধ্যবসায় ও কর্ম্মদক্ষতাই যে তাঁকে এই সৌভাগ্যের অধিকারী

গরীব আফ্রিকানদের ঘর

কোরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাঃ উইলিয়ামসন্ ভারী সাদা-সিদে লোক। বিলাসিতা নেই এতটুকু। রাস্তায় বেরুলে চেনা যায় না ইনি পৃথিবীর একজন নামকরা ধনী লোক। যে দেশের ভূমি তাঁকে এই প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক কোরেছে—যে দেশের মাটিতে তাঁর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী বাস করছিলো সেই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ডাঃ উইলিয়ামসন একজন সদ্বংশজাত ইংরাজ হোয়ে—বিয়ে কোরেছেন একজন গরীব আফ্রিকান্ নিগ্রো রমণীকে। অথচ যিনি ইচ্ছে করলে বিয়ে কোরতে পারতেন আমেরিকার স্যার হেনরী ফোর্ডের মেয়েকে।

সিনিয়াঙ্গা থেকে ট্রেন ছেড়ে চলছে তো চলছেই—থামার নাম পর্য্যন্ত করে না দু' চার ঘণ্টার মধ্যে। গাড়ীর ঝাঁকুনীতে মনেও দোলা লাগে। মন ক্লান্ত হোয়ে আসে, শরীরও অবসন্ন হোয়ে পড়েছে ট্রেনের ঝাঁকুনি ও অবিরাম চলার গতিতে। যখন ঝির ঝিরে একটা জলো ঠাণ্ডা হাওয়া এসে আমাদের চোখে মুখে লাগে তখনই আমরা হিসেব কোরতে থাকি—ভিক্টোরিয়া লেকের দুরত্ব। মাউঙ্গা এই লেকের তীরে একটা বন্দর। যতই মাউঙ্গার দিকে ট্রেন এগুতে থাকে ততই পাহাড়ের অবস্থিতি, উপত্যকার গভীরতা প্রভৃতি দেখে মনে

হোতে লাগলো যে কয়েক হাজার বছর আগে হয়তো এই অঞ্চলটাও লেকের গর্ভে ডুবেছিলো—হঠাৎ ভূমিকম্পে জেগে উঠেছে। এইসব দেখে আমাদের গন্তব্যস্থানের দূরত্বটা মনে মনে মাপতে লাগলাম। মনে দূরত্ব মেপে গন্তব্যস্থলকে নিকটে আন্‌লে কী হয়—বেলা প্রায় তিনটায় আমাদের ট্রেণ ভিক্টোরিয়া লেকের পাড়ে মাউঞ্জা ষ্টেসনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভারী সুন্দর সহরের অবস্থিতিটা। তিন দিকে লেকের ঢল্‌ঢলে নীল রংয়ের জল, আর একদিকটায় সবুজরংয়ের গাছ-পালায় ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী—একটার পর একটা যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রোয়েছে। নগরাজ হিমালয়ের দেশের লোক কিনা আমরা—তাই কী বার্ত্তা নিয়ে আমরা তাদের সম্রাটের দেশ থেকে এসেছি—তাই যেন শোনার জন্য উৎকর্ণ হোয়ে দাঁড়িয়ে রোয়েছে—আমাদের মুখের পানে চেয়ে। ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াতেই আমরা নামলাম।

নামলাম বটে, কিন্তু আগের থেকে কোন সংবাদ জানানো হয়নি তাই কেউ আমাদের নিতে আসেনি। ষ্টেসনে নামতেই একজন ভারতীয় ভদ্রলোক টেলিফোন কোরে আমাদের আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে দিলেন সহরে। পাঁচ-মিনিটের মধ্যে একজন সাদা পোষাক-পরিহিত লম্বা ছিপছিপে গৌরবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোক এসে আমাদের জানালেন তিনি আমাদের নিতে এসেছেন। তিনি ছিলেন স্থানীয় হিন্দু ইউনিয়ন নামে একটা হিন্দুপ্রতিষ্ঠানের একজন কর্ম্মকর্ত্তা। যাই হোক আমরা তো মোটরে উঠে বোস্‌লাম। বেশ সুন্দর সহর। 'ইণ্ডিয়া এভেনিউ'এর উপর দিয়ে মোটর গিয়ে দাঁড়ালো একটা নবনির্ম্মিত একতালা বাড়ীর সামনে। কার্ণিশের উপর লেখা রোয়েছে—"লোহানা পথিকাশ্রম"।' হর্ণ বাজাতেই রুদ্ধ দ্বার সশব্দে খুলে গেলো। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা। মালপত্র মোটর থেকে নামিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় প্রদেশে 'লোহানা' নামে একটি হিন্দু সম্প্রদায় আছে। পূর্ব্ব আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেক সহরেই সেই লোহানাদের বসতি আছে। কোথা থেকে এই লোহানা জাতির উদ্ভব তা' ঠিক কোরে বলা কঠিন—তবে এঁদের দেহের গঠন, নাক-চোখ, আচার-বিচার এই সব দেখে মনে হয় এঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের সঙ্গে শ্বেত হুনদের (White Huns) কোনো সম্পর্ক ছিলো। এঁরা উপবীত ধারণ করেন। আচার-বিচার, বিবাহপ্রথা সবই হিন্দুদের মতো—তবু কিছু কিছুতে যেন তাদের সেই প্রাচীন ধারা (tradition) রোয়ে গেছে বলে মনে হয়। সেখানে হিন্দু রীতি-নীতির সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খায় না। যাই হোক, এই লোহানা সম্প্রদায় অনেকদিন থেকেই এই আফ্রিকায় ব্যবসা বাণিজ্য কোরে আসছে। অনেক সহরেই তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য ছাত্রাবাস, লাইব্রেরী, পান্থশালা, ক্লাব প্রভৃতি গ'ড়ে উঠেছে। এই লোহানাদের পান্থশালাতেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হোয়েছে।

তাড়াতাড়ি স্নান-আহ্নিক সেরে নিয়ে খেতে গেলাম যাঁর বাড়ীতে তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত। কয়েকমাস আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হোয়েছিলো জাঞ্জিবার দ্বীপে—তারপর সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠতর হোয়েছিলো মাত্র মাসখানেক আগে ডোডামায়; তার পর এই সাক্ষাতকার। তাই—পরিচিত অতিথির সৎকারের বাড়াবাড়িটাও বেশ উপভোগ কোরতে হোল। খাওয়া দাওয়ার পর আশ্রমে ফিরে শুনলাম—এখানে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হোচ্ছে। মিশনের সন্ন্যাসী

গ্রীক ভদ্রলোকের সাইসল ষ্টেটে ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের নেতা স্বামী অদ্বৈতানন্দজী

ব্রহ্মচারীদের মনেপ্রাণে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—পুজোয় আনন্দ বইয়ে দিতে হবে বাংলা থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে এই আফ্রিকার বুকেও। মায়ের আগমনীর পুলকস্পন্দন আজ বাঙালীর অন্তর থেকে ছড়িয়ে দিতে হবে বিশ্ববাসীর অন্তরে অন্তরে। ভারী আনন্দ হোল মাতৃপূজার আয়োজনের কথা শুনে।

এই মাতৃপূজা বাঙালীর একটা বিশিষ্ট অবদান। বাঙালী তখন বন্দনা গায়—"সৌম্যা সৌম্যাতরাশেষ সৌমেভ্যস্ততি সুন্দরী" মন্ত্রে। আবার যখন জগতের বুকে কালের করালছায়া ঘনিয়ে আসে, পাপের অত্যাচারে যখন ধরণীতে জ্বলে ওঠে অশান্তির দাবদাহ, অসংখ্য প্রকারের রোগ-শোক-জ্বালা-মালা যখন বাঙালীকে ঘিরে ধরে সপ্তরথীর মতো, অন্তরে বাইরে যখন বাঙালী কোন আলোর সন্ধান পায় না—তখন অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে নটনাথ মহাকাল রুদ্রের বুকে প্রলয় নৃত্যকারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গধারিণী মহাকালীর সাধনা করে। বাঙালীর কোমল কণ্ঠেই তখন ঝঙ্কৃত হয়ে

ওঠে—"কালী করাল বদনী—বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী, বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা।"

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিভোর হয়ে বাঙালী যেমন পূর্ণিমার রাত্রে ঘরের কোণে সুখ সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননী লক্ষ্মীর আসন পাতে—তেমনই আবার শোক-তাপ অশান্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে তমিস্রা রজনীতে ভয় সঙ্কুল শ্মশান-চিতায় ভীষণা লোল রসনা মহাকালীর প্রসন্নতা অর্জ্জনে শব সাধনার অনুষ্ঠানেও অভ্যস্ত। এটাই বাঙালীর সাধনার বৈশিষ্ট্য।

ভারতে কাশীধামে মহা ধুমধামে সঙ্ঘের দুর্গোৎসব হয়। সে উৎসবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সঙ্ঘের শাখা ও অন্য জায়গায় প্রচাররত সব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও প্রচারকগণ সমবেত হন।

অল্প সময়ের মধ্যে জিনিষ পত্র যোগাড় করা সুরু হ'লো। খড় পাওয়া যায় না—তাই কুশ জাতীয় এক রকম শুকনো ঘাস দিয়ে ঠাকুরের মেড় তৈরী হ'লো। স্থানীয় লোকজনের ভারী আনন্দ। ভারত থেকে এত দূরে দুর্গাপূজা হবে—তাও সন্ন্যাসীর উদ্যোগে। তাই ভাবের দিক দিয়েও সহরে বেশ একটা পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। হিন্দু মণ্ডলের বড় বড় কর্ম্ম-কর্ত্তারা আমাদের বল্লেন—আপনাদের যা দরকার হবে আমাদের ব'লবেন, আমরা সব যোগাড় ক'রে দেবো। প্রাণপণে চেষ্টা ক'রতে লাগলো সকলে। কিন্তু এটা তো আর বাংলা দেশ নয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভিক্টোরিয়া হ্রদের পাড় থেকে মাটি নিয়ে এলো। কিন্তু প্রতিমা তৈরীর মতো আঁঠাল নয় মোটেই। পাট বা তুঁষ পাওয়া যায় না, তাই আঁঠালো করার কোন উপায়ও দেখলাম না! হঠাৎ একজন বল্লে—তুলা মিশিয়ে হয় নাকি দেখলে হয়। কিছুটা তুলা আনতে বল্লাম।

কিন্তু তুলাতেও হল না। শেষে সিমেণ্ট আর তুলা মিশিয়ে চেষ্টা চললো। কোনরকমে 'একমাটি' হোল। সময় বেশী নেই—তাই রাত জেগে কাজ চলছে। সিমেণ্ট-মেশানো মাটি একটু শুকুতেই ফেটে যেতে লাগলো। কী করা যায়! আরম্ভ কোরে এখন যদি না হয়—তবে লোকজনই বা কী মনে কোরবে। শেষে অনেক চেষ্টা বা খোঁজাখুঁজির পরও যে মাটি পেলাম তাও প্রতিমা তৈরীর মোটেই উপযুক্ত নয়—তবু আগেরটার চেয়ে ভাল। আগুনে জ্বাল দিয়ে কোন রকমে কাজ চালানোর মতো কোরে নেওয়া হোল। সেই দিনই—'একমাটি' তৃতীয় দিনে 'দোমাটি' কোরে চতুর্থ দিনে খড়ি দেওয়া হোল। প্রতিমা রং করার উপযুক্ত রং আবার পাওয়া গেল না। যাই হোক যা পাওয়া গেল—তাই দিয়েই রং করা হোল। একেবারে যে খারাপ হোল তা বলা যায় না। তবে সন্ন্যাসীরাই মিস্ত্রী,—আর্টিষ্ট, তাই ওরিয়েণ্টাল আর্টের অভাব কে অস্বীকার কোরবে! প্রতিমাতৈরী থেকে সুরু কোরে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত এত লোকের ভিড় আর কোনদিন দেখেনি। প্রতিমা তৈরী তো শেষ হোল—এখন সাজানোর পালা। মাটির গহনা-পত্র তৈরী করা সম্ভব হয়নি। তাই স্বর্ণকারের দোকান থেকে কেমিক্যাল-সোনার গহনা-পত্র দিয়ে গেলো। কাপড়ের দোকান থেকে সিল্কের কাপড় জামা এলো। ষষ্ঠীর দিন দুপুরেই ঠাকুরের যাবতীয় কাজ শেষ হোল

পূর্ব্ব আফ্রিকার টারোরা সহরে ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বৈদিক যজ্ঞ

এদিকে পূজার তিনটি দিনে তিনটি প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আফ্রিকার দিগ্বিদিকে টেলিগ্রাম, টেলিফোন করে নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানালো হ'লো। সকলে বিস্ময়ে হতবাক! আফ্রিকার ভূমিতে দুর্গাপূজা! ট্রেন, ষ্টীমার, মোটর, বিমানে করে লোক আসতে লাগলো এই পূজা ও সম্মেলনে যোগ দিতে। বহু চেষ্টা করেও ষোড়শোপচারে পূজার জিনিষ পাওয়া গেল না, তাই পঞ্চোপচারেই পূজা হ'ল। পুরোহিতের অভাব, তাই নিজেরাই পূজা করলাম। তন্ত্র ধারকের ভার পড়লো আমার উপর—পূজা করলেন মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মচারী।

মহাসপ্তমী পূজা আরম্ভ হ'ল। সকাল থেকে ছেলে-মেয়ের দল সাজিভরা ফুল নিয়ে দলে দলে আসতে লাগলো। যুবকের দল এলো অঞ্জলি দিতে। স্কুল, কোর্ট এবং অন্যান্য অফিস এই সময় বন্ধ ছিল। তাই উকিল-ব্যারিষ্টার, ছাত্র-ছাত্রী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই যোগ দিলো এই অনুষ্ঠানে। প্রাতে পূজা, অঞ্জলি, যজ্ঞ, ভোগ, প্রসাদ বিতরণ, বৈকালে হিন্দু সম্মেলন, অস্ত্র-শস্ত্রসহ দেবীর বীর ভাবোদ্দীপক আরতি—এই সব দেখার জন্য শত শত ভারতীয়, আফ্রিকান ও ইউরোপীয়ান আসতে লাগলো।

কচ্ছ, কাথিয়াবাড় ও গুজরাট প্রদেশে দুর্গা পূজাতে নবরাত্রি

উৎসব হয়। এই নয়টি দিন এই দেশের অধিবাসীরা পবিত্র ভাবে পূজা পাঠের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে। এই সময় প্রতি রাত্রে গ্রামের বা সহরের লোকজন একত্রে মিলে নাচ-গান, ভজন-কীর্ত্তন প্রভৃতি করে। বাংলা দেশের ব্রতচারীর 'কাঠি-নাচের' মতো এক প্রকার নাচ নাচে। মেয়েরাও এই নাচ নাচে। পুরুষদের নাচকে 'গর্ব্বি' এবং মেয়েদের নাচকে 'গর্ব্বা' বলে। ধনী বিদ্বান্ সকলেই এই নাচে যোগ দেয়। নাচের সঙ্গে গান ও তালে তালে বাজনা চলে। ভারী সুন্দর লাগে এই 'গর্ব্বি'। প্রতি রাত্রে দেবীর সম্মুখে এই নাচ হ'ত। এই নাচ দেখার জন্যও অনেক রাত পর্য্যন্ত ইউরোপীয়ানরা থাকতো। জ্বলন্ত প্রদীপ দ্বারা সুসজ্জিত একটা রথের মধ্যে শ্রীশ্রীদেবী মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। তার চার পাশে সকলে নেচে নেচে ঘুরতে থাকে। মেয়েরা সকলে মিলে কোন কোন বাড়ীতে এই গর্ব্বা নাচে—সেখানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার থাকে না। আর পুরুষদের এই গর্ব্বিতেও মেয়েরা যোগ দেয় না। আমাদের রামদাস ব্রহ্মচারী গুজরাটের লোক, তাই তিনিও এই গর্ব্বা নাচ নাচতে পারতেন।

মহা ধূমধামের মধ্য দিয়ে পূজার তিনটি দিন কাটলো। এখন বিসর্জ্জনের পালা। এমন সুন্দর প্রতিমা, এত পরিশ্রম ক'রে তৈরী ক'রে বিসর্জ্জন—অর্থাৎ কিনা জলে ফেলে দেওয়া হবে—তা কেউ আগে বিশ্বাসই করেনি। কেননা গুজরাটে দুর্গা পূজার প্রতিমা নির্ম্মিত হয় না। তাই প্রথমে ত অনেকে মনে ক'রল—সে প্রতিমা রাখার জায়গার অভাবেই বুঝি এই মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হ'বে। কিন্তু যখন বিসর্জ্জনের তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল—তখন সকলে বিসর্জ্জনের আয়োজন সুরু কর'ল। শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিয়ে গিয়ে ভিক্টোরিয়া হ্রদে বিসর্জ্জন দেওয়া হবে। দশমীর দিন বিকাল চারটা থেকেই লোকজন জমতে লাগলো পূজার মণ্ডপে। পাঁচটায় শোভাযাত্রা বেরুলো। সহর প্রদক্ষিণ ক'রে যাবে লেকের দিকে। আফ্রিকানরাও শোভাযাত্রায় যোগ দিল। মাউঞ্জায় এই জাতীয় শোভাযাত্রা আর কোনদিন কেউ দেখেনি। এইরূপ সকলে বলাবলি ক'রতে লাগলো। ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত ক'রে এই শোভাযাত্রা এগুতে লাগলো হ্রদের দিকে। ছোট একটা মোটর লঞ্চে প্রতিমা নিয়ে তীর থেকে বহু দূরে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হ'ল। তীরে শতশত নরনারী দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলো। বিসর্জ্জনের পর সকলে এক সঙ্গে বাসায় ফিরলাম।

মাউঞ্জা থেকে প্রায় চব্বিশ মাইল দূরে ভিক্টোরিয়া হ্রদে উকুরেয়ে নামে একটা দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের নান্‌সিও সহরের লোকজন এসেছিল—আমাদের এই পূজা ও সম্মেলনে। এই সব অনুষ্ঠান দেখে-শুনে তারা তাদের সহরে যাওয়ার জন্য আমাদের অনুরোধ করলে। সেই অনুরোধ স্বীকার ক'রে আমি এবং পরমানন্দ স্বামীজি একখানি ছোট লঞ্চে নানসিওর দিকে রওনা হ'লাম। ভিক্টোরিয়া হ্রদ—হ্রদ হ'লেও পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাদু জলের হ্রদ। আয়তন প্রায় পাঁচশ' বর্গ মাইল, লঞ্চটা খুবই ছোট, তাই ঢেউএ দুলতে লাগল। দোলার আধিক্যে গা বমি বমি ক'রতে লাগল। শুয়ে প'ড়লাম। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে দিনমণি পশ্চিম গগনের এক কোণে চলে পড়েছে; দূর থেকে মৎস্য শীকারীর ছোট ছোট নৌকাগুলো একে একে কিনারার দিকে ফিরছে, মহাতেজা প্রভাকরের বিদায় ও সন্ধ্যাদেবীর আগমনীর আয়োজনে নানসিও দ্বীপের হিন্দুর ঘর-সংসারে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে; মঙ্গলময়ের গুণগান ক'রতে ক'রতে নানান্ রকমের পাখীরা দল বেঁধে বেঁধে সোনালী রংএর সূর্য্যকিরণে ডানা মেলে দিয়ে নিতান্ত ক্লান্ত দেহখানি নিয়ে যখন রাত কাটানোর মতো একটা আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে চলেছিল—তখন আমরা নানসিও দ্বীপের বন্দরে পৌঁছিলাম।

বেশ সুন্দর দ্বীপটি, সবুজ লতাপাতায় ঢেকে রয়েছে। মাঝে মাঝে রং বেরংএর ফুল ফুটে তার শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কমলা, আনারস, আম এখানে বারো মাসই ফলে। নিতান্তই ছোট সহরটা। মূল ভূমির (Main land) সঙ্গে কোন সংযোগই নেই। এখন পর্য্যন্ত টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের লাইনও বসানো হয়নি—তাই বহির্জগতের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের যেন কোন সংস্রবই নেই। দু' তিন দিন আমরা নানসিওয় ছিলাম। প্রায় শ' দুই হিন্দুর বাস। বেশ ধার্ম্মিক সকলেই। আমাদের সংগঠনের বক্তৃতার পর 'হিন্দু মণ্ডল' গড়ে উঠলো। হিন্দু মহিলাদের জন্যও একটা কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ল। এখানের কাজ সেরে আবার আমরা মাউঞ্জায় ফিরে এলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের মাউঞ্জার কাজ-কর্ম্মাদি শেষ হ'ল। তখন আমরা ভিক্টোরিয়া লেকের অপর পাড়ে বুকোবা নামে একটা সহরে যাওয়ার তোড়জোড় করতে লাগলাম।

(ক্রমশঃ)

কিছুদিন যাবৎ বাংলার মসনদ টলটলায়মান হইবার পর হইতে দৈনিক-পত্রিকাগুলিতে বাংলার মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিভিন্ন প্রকার বিবৃতি প্রকাশিত হইতেছে। জার্ম্মাণীর ফ্রাঙ্কফুর্ট হইতে তাঁহার যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাংলার নারীদের সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহা যেমনই অহেতুক তেমনই অযৌক্তিক। বাংলার নারীজাতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞজনোচিত হয় নাই।

বাংলার নারী দেশের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য যে ত্যাগ, শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। ডাঃ রায় সে কথা উল্লেখমাত্র করেন নাই। এ কথা সত্য যে, কিছুদিন যাবৎ একদল বঙ্গনারী সরকারী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু তাহার প্রধান কারণ দারিদ্র্যের গুরুভার প্রধানতঃ তাঁহাদের উপরই পতিত হইয়াছে। স্বামীপুত্রকন্যাদের মুখে আহার তুলিয়া দিতে না পারিলে তাঁহাদের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। —সমাজ

* * *

কলিকাতা হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত যে একশত ফুট প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা ছিল, তাহার জরীপ শেষ হইয়াছে। খবর ভালো সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত রাজপথ নির্ম্মাণার্থে কিছু কিছু ধানী জমি নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া একটী সংবাদ দাদপুর হইতে আমরা পাইয়াছি। বেলডাঙ্গা থানার লোকনাথপুর গ্রামের পূর্ব্ব দিয়া নদীয়া জেলার মীরাবাজার হইতে এই রাস্তা রেলপথ বরাবর উত্তরাভিমুখে আসিবে এবং তাহার ফলে বেশ কিছু আবাদী জমি নষ্ট হইয়া যাইবে। রেজিনগর-তকিপুরের মধ্য দিয়া দাদপুর মৌজার পূর্ব্ব হইয়া রাস্তাটি বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর রোডে মিলিত হইবে। ইহাতেও কিছু আবাদী জমি পড়িতেছে। উক্ত অঞ্চলে আবাদ-যোগ্য জমির অভাব আছে। কাজেই তাহা বিবেচনা করিয়া রাস্তাটি অপর দিক দিয়া অর্থাৎ লোকনাথপুরে পশ্চিমের গঙ্গার বাঁধ বরাবর করিলে কি দুই দিক রক্ষা করা যাইত না? উক্ত রাজপথ নির্ম্মাণে সম্ভবমত আবাদী জমি যাহাতে নষ্ট না করা হয়, সেদিকে জনস্বার্থের খাতিরে দৃষ্টি রাখিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাইতেছে। —গণরাজ

* * *

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ দ্বিধা বিভক্ত হইলেও, আমরা সকলেই যে বাঙ্গালী সে কথা ভুলিলে চলিবে না। আমরা সকলেই সম্প্রীতিতে বাস করিতে চাই। তাই উভয় দেশের মধ্যে আদান প্রদান, লোক যাতায়াতের এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা যত সহজ হয় ততই ভাল। একদল লোক পূর্ব্ব বাংলাকে পশ্চিম বাংলা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে চান। বাংলার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু চালাইতে চান, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করিতে চান। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে উভয় বাংলার পরস্পরের উপর নির্ভর না করিয়া চলিবার উপায় নাই; সুতরাং বাধার সৃষ্টি করিয়া উহারা দেশের ক্ষতি করিতেছেন, দেশবাসীকে কষ্ট দিতেছেন। বৈঠকের পর বৈঠক বসিতেছে, একটার পর একটা সমস্যা সমাধান হইতেছে কিন্তু আবার সমস্যা গজাইয়া উঠিতেছে ব্যাঙের ছাতার মত। বাহির হইতে সমস্যা সমাধানের দ্বারা সমস্যা মিটিবে না। চাই অন্তরের ভাব-পরিবর্ত্তন। মুসলমানগণ পাকিস্তান চাহিয়াছিলেন, আজ পাকিস্তান পাইয়াছেন, তাহাকে বড় করিয়া তোলাই হইতেছে তাঁহাদের বড় কাজ। কিন্তু তাহা প্রতিবেশী পশ্চিম বাংলার সহিত কলহের দ্বারা হইবে না। পশ্চিম বাংলা চায় সম্প্রীতিতে থাকিতে, যাহাতে উভয় দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহাই করিতে। একে পূর্ব্ব বাংলা হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা সমাধান করিতেই তাহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইতেছে। তাহার উপর উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সমস্যা এত প্রবল আকার ধারণ করিবে যে সমাধান অসম্ভব হইবে। ইহাতে পূর্ব্ব-বাংলারও ভাল হইবে না—হিন্দুকে তাহাদের বাপ পিতামহের বাস্তু ভিটা হইতে বিতাড়িত করিলে স্থানীয় মুসলমানদেরও কোন সুবিধা হইবে না। সে কথা তাহারাও বোঝে। সুতরাং তাঁহাদের উচিত গবর্ণমেণ্টকে জানান যে পশ্চিম-বঙ্গ-বিরোধী আইন ও নিয়ম রহিত করিতে হইবে—উভয় দেশের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করিতে হইবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। —'দেশ ও দশ'

* * *

দিল্লীর শতকরা ৪০ জন এবং কলিকাতার শতকরা ৭৫ জন মধ্যবিত্ত সরকারী কর্ম্মচারীর সকলেরই কমবেশী ঋণ আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে মধ্যবিত্ত সমাজের দান অপরিমেয়। গান্ধীজীর ডাকে প্রথম যাহারা ছুটিয়া আসিয়া বিপ্লবে যোগ দিয়াছিল তাহাদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে। আমরা ভাবিতেছি, এই মধ্যবিত্ত সমাজ আজ যদি ঋণভারে জর্জ্জরিত হইয়া পঙ্গুত্ব লাভ করে, তবে সমাজে আদর্শ-বাদের হোমানলশিখা জ্বালাইয়া রাখিবে কাহারা? বেপরোয়া হইয়া অকূলে ঝাঁপ দিবার দুর্জ্জয় সাহস আছে যাহাদের—তাহারা যদি দারিদ্র্যে নিশ্চল হইয়া যাইবার উপক্রম করে তবে সমাজের সেই ক্ষতি সত্য সত্যই অপূরণীয়। —লোকসেবক

* * *

স্বাধীন ভারতের বড়লাটের বেতন বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া ৬৬ হাজার টাকা করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ সঙ্গে এই সর্ত্ত হইয়াছে যে বড়লাটের এই বেতনের উপর আয়কর লাগিবে না। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বড়লাটকে আয়কর দিতে হইত, তাহাতে ২ লাখ টাকা হইতে

৭০ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকিত। নূতন নিয়মে ৬৬ হাজার টাকা দৃশ্যতঃ মাসে সাড়ে পাঁচ হাজার হইলেও আয়কর দিতে হইলে মাসে ১৫ হাজার অর্থাৎ বছরে ঐ দুই লাখেরই কাছে গিয়া দাঁড়ায়। ফাঁকিটা দেওয়ার কি দরকার ছিল সে বিষয় প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, উঠিয়াছেও।

বড়লাটের এখনকার চালচলন পুরাণো আমলের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, এমন কি মোগল বাদশাহদেরও হার মানাইয়াছে। যুদ্ধের আগে ১৯৩৯ সালে তাঁর যে সব খরচ ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাহা আরও বাড়িয়াছে।

নয়াদিল্লীর বড়লাট প্রাসাদে ৮৬টি বড় বড় ঘর আছে, তৎসংলগ্ন ৫৬টি বাথরুম আছে। ইহার প্রত্যেকটি ঘরে এক একটি মধ্যবিত্ত পরিবার স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। ঘরগুলি সেই ভাবেই তৈরি করা হইয়াছে, কারণ আগে বিলাত হইতে বড়লোকেরা অনেকেই দিল্লী আসিলে হোটেলে না উঠিয়া লাটবাড়ীতে থাকিতেন এবং তাঁহাদের সুবিধার জন্য ঘরগুলি কতকটা ফ্ল্যাটের ষ্টাইলে তৈরি হইয়াছে।

বড়লাট প্রাসাদে ৩১২ জন ভৃত্য এবং ৯৬ জন ঝাড়ুদার আছে। এদের মোট মাসিক বেতনের বিল হয় ২৫০০৯ টাকা, অর্থাৎ বছরে ৩ লক্ষ টাকা। যে বড়লাটের নিজের বার্ষিক বেতন ৬৬ হাজার টাকা, তাঁর চাকর ও ঝাড়ুদারদের জন্য বছরে বেতন বাবদ খরচ ৩ লক্ষ টাকা। ভৃত্যদের উর্দ্দির জন্য বার্ষিক ব্যয় ৪০ হাজার টাকা।

বড়লাট প্রাসাদের সংলগ্ন একটি বাগান আছে, উহার আয়তন ২৯০ একর অথবা ৮১০ বিঘা। বাগান তদারকের জন্য ৩৬৩ জন ফুল-বিশেষজ্ঞ ও মালি নিযুক্ত আছে। তাদের বেতন এবং ভাতা বছরে প্রায় ৩ লাখ। অন্যান্য কর্ম্মচারিদের জন্য খরচ বছরে সাড়ে চার লাখ। বাড়ী মেরামতের খরচ বছরে ১২ লাখ। আসবাবপত্র মেরামত ইত্যাদির খরচ বছরে ১ লাখ। বড়লাটবাড়ীর আসবাবপত্রের মোট দাম ৫০ লক্ষ টাকা হইবে।　　—যুগবাণী

*　　*　　*

আজ অধিক খাদ্য উৎপাদনের দিনে আমাদের এই প্রদেশে যে সকল বিস্তৃত জলাভূমি পড়ে রয়েছে তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

হাওড়া জেলার ডেঙ্গোর মাঠ এমনি একটা জলা বা বিল। ১২৮ বর্গমাইল বিস্তৃত এই জলাভূমি হাওড়া জেলার প্রায় এক চতুর্থাংশ। হাওড়া জেলার পরিমাণ ফল ৫৩৪ বর্গমাইল। হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ে দিয়ে এই বিলের সন্নিকটে পৌছান যায়। এই জলার জল নিকাশের জন্য প্রায় ৬০ বছর পূর্বে এক পরিকল্পনা হয়েছিল। তা কার্যে পরিণত হয় নি। জালালসি ষ্টেশনের কাছে জেলা-বোর্ডের রাস্তার নীচ দিয়ে যে কালভার্ট রয়েছে তাকে প্রশস্ত করে পূর্বেকার জলপথকে বাধাহীন করে কানা নদীতে ফেললে ঐ বিলের জল অনেক পরিমাণে বেরিয়ে যাবে। ইহা ঐ বিলের প্রায় ৭৮ বর্গমাইল গভীরতর জলাভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধিগণ বলেন। কথাটি বিশেষরূপ অনুসন্ধান যোগ্য।　　—সত্যাগ্রহ পত্রিকা

*　　*　　*

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য সচিব শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর সম্প্রতি সাংবাদিক-সম্মেলনে পশ্চিম বাংলায় মৎস্যের প্রয়োজনের তুলনায় আমদানী ও উৎপাদনের যে চিত্র পরিবেশন করিয়াছেন তাহা ভয়াবহ। চাউল নাই, দুধ নাই, ডাল নাই, মাংস নাই এবং মাছও যদি অমিল হয় বাঙ্গালী কি খাইয়া বাঁচিবে?

দৈনিক প্রয়োজন	৩২০০০ মণ।
দৈনিক উৎপাদন	২০০০ মণ।
কলিকাতার প্রয়োজন	৬৮০০ মণ।
কলিকাতায় আমদানী	২৫০০ মণ।

—সংগঠনী

*　　*　　*

ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সহস্র সহস্র আশ্রয়হীন ও ক্ষুধার্ত্ত উদ্বাস্তুরা চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক মুষ্টি অন্নের জন্য নারী ও শিশুরা হাহাকার করিতেছে—এই পরিবেশের মধ্যে স্বাধীনতার কল্যাণময় রূপ হৃদয়ঙ্গম ও উপভোগ করিবার মত মানসিকতা তাহাদের নিকট হইতে আশা করা যায় না। কি ভারতে, কি পাকিস্থানে—অন্ন ও বস্ত্র ক্রয় করা জন-সাধারণের অধিকাংশ লোকের ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে জাতি ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হইতেছে।

—দেশ

*　　*　　*

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশ, কুমারী প্যামেলা মাউণ্টব্যাটেন শীঘ্রই লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশনার শ্রীকৃষ্ণ মেননের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন। এককালীন ভারতের ভাগ্যবিধাতার কন্যা ইণ্ডিয়া-হাউসে চাকুরী গ্রহণ করিলে বিশ্বের দরবারে ভারতের কদর বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে একমাত্র কৃষ্ণ মেনন ছাড়া সব ভারতবাসী আনন্দ লাভ করিবেন। অত বড় ঘরাণা এবং প্রতিপত্তিশালিনি সেক্রেটারী লইয়া কাজ করিতে ভীত হওয়া সত্যই স্বাভাবিক। কে কাহাকে চালাইবে এবং কাহাকে কাহার মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইবে, ইহা সত্যই ভাবিবার বিষয়।　　—যুগবাণী

*　　*　　*

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তধারার উপর দিকের শৃঙ্গে আরও তিনটি ধারাগৃহ আছে। ব্যাসকুণ্ড, গঙ্গাযমুনাকুণ্ড ও মার্কণ্ডকুণ্ড। ব্যাসকুণ্ডের উষ্ণপ্রস্রবণটি মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট থাকলেও, সকল মহিলার সেখানে স্থান সংকুলান হয় না। তাঁরা অনেকেই সপ্তধারায় পুরুষদের সাথে সহ-স্নানে প্রবেশ করতে বাধ্য হন্। তারই ফলে হয়তো সপ্তধারায় পুরুষ স্নানার্থীদের ভীড় বেড়ে যায়। পাহাড়ের কিছুটা উপরে উঠলেই 'গঙ্গাযমুনা ধারা' পাওয়া যায়। চমৎকার সে ধারা দুটি। প্রবলবেগে প্রচুর জল পড়ছে। সপ্তধারার জলের উত্তাপ বৈজ্ঞানিকেরা ৯০ ডিগ্রি ফার্ণহিট বলে ঘোষণা করেছেন। গঙ্গাযমুনার উষ্ণতা তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। সেখানে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে দীর্ঘকাল স্নান করা যায়, তবুও যত স্নানার্থীর ভীড় সপ্তধারায়। গঙ্গা যমুনায় বড় কেউ আসেন না। বোধকরি এখানে মাথা ঠোকাঠুকির কোনও সুযোগ নেই বলেই।

'সপ্তধারা' বা সপ্তর্ষিকুণ্ডের অভ্যন্তরে স্নানাগার

জল বেশ গরম, মৃদু মৃদু ধোঁয়া উঠছে। স্নান করতে গেলে প্রথমটা গায়ে ছ্যাঁক্ করে লাগে। মনে হয় ফোস্কা পড়ে যাবে। কিন্তু একটু একটু ক'রে ক্রমে সইয়ে নেবার পর শেষটা খুব আরাম হয় স্নান করতে। সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হ'য়ে উঠে। দেহের সকল ক্লান্তি ও জড়তার অবসাদ নিমেষে দূর করে দেয়। বোঝা গেল, রুগ্ন ও অসুস্থ মানুষেরা কেন এখানে বার বার ছুটে আসেন।

কিন্তু মুস্কিল এই, এখানে স্নানার্থীদের এত ভীড় যে ধীরে সুস্থে গায়ে গরমটুকু সইয়ে নিয়ে আরামে স্নান করার মোটেই অবসর মেলে না। অন্ততঃ বিশজন স্নানার্থী চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে শীঘ্র স্নান সেরে নেবার তাড়া দিতে থাকেন। যাঁরা অসহিষ্ণু, হয়তো অধৈর্য্য হয়ে একজন স্নানার্থীর দেহের উপর দিয়েই নিজের দেহটা বাড়িয়ে দেন। মাথায় মাথায় তখন ঠোকাঠুকি হ'য়ে যায়, বেহারী বন্ধুদের মধ্যে হামেশা বচসা লাগে। বাক্‌যুদ্ধ প্রায়ই হাতাহাতিতেও পরিণত হয়। কুণ্ডে স্নানের সময় এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। 'এতটা গরম জল অনেকের মাথায় সহ্য হয় না। তাঁরা গামছা ভিজিয়ে জল ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে মাথায় নিংড়ে দেন। কেউ বাল্‌তি ভরে রাখেন ঠাণ্ডা হলে মাথায় ঢালবেন। কেউ কেউ স্বচ্ছন্দে সেই দারুণ গরম জলে মাথা পেতে বসে যান স্নান করতে। হরেক রকমের জল পাত্র জড় হয় সেখানে। ধারা-জল ভরে নিয়ে যান তাঁরা পানীয় জলরূপে ব্যবহার করবার জন্য।

সপ্তধারার' পাশে পীর মকদুমসাহের সমাধি সৌধ আছে। এখানে ঈদের নমাজ পড়া হ'ত আগে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট, ভ্রাতৃবিরোধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এই ঈদ্‌গা পরিত্যক্ত ও জনশূন্য। একদিন আমরা কৌতুহলের বশে 'মকদুম কুণ্ড' দেখতে গেলুম। দেখে খুসি হলুম। পাহাড়ের কোলে শান্ত নির্জন পরিবেশ। পীর মকদুমসাহের সাধনগুহার নিচে পাথরে বাঁধা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড ছায়াতরু, তলদেশ বাঁধানো। শ্রান্ত পথিকদের বিশ্রাম ও ক্লান্তি দূর করবার আদর্শ স্থান। উভয় পাশে যাত্রীদের আবাস কক্ষ। প্রাঙ্গণের পুরোভাগে একধারে এই 'মকদুম কুণ্ড'। স্ফটিকস্বচ্ছ নির্মল জল, ঈষদুষ্ণ বলে স্নানের পক্ষে অত্যন্ত আরামপ্রদ। এখানে স্নানেরও অত্যন্ত সুব্যবস্থা। কুণ্ডের মধ্যে

প্রবেশের একটিমাত্র দ্বার। সেই দ্বার পথে কোনও স্নানার্থী পরিবার যদি একখানি বস্ত্রখণ্ড পর্দার মতো ঝুলিয়ে দেন্ তাহলে সেই পর্দা খুলে না-নেওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় আর কোনও লোক তার মধ্যে প্রবেশ করবে না। কুণ্ডের মধ্যে একপাশে কাপড় ছাড়া ও তেলমাখার পৃথক দুটি ঘর আছে। সম্ভবতঃ একটি মেয়েদের, আর একটি পুরুষদের। আমরা এই সব সুবন্দোবস্ত দেখে এবং এই ঈষদুষ্ণ জলের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হ'য়ে সপরিবারে স্নানপর্ব সেরে নিলুম। মনে মনে স্থির করলুম রাজগীর অবস্থান কালে কুণ্ডস্নানে যদি আসি তবে এই পীরসাহেবের মকদুম্ কুণ্ডেই আসবো। এখানে পাণ্ডার অত্যাচার নেই। একজন প্রৌঢ় মৌলভী কুণ্ডের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। তিনি আমাদের কাছে কুণ্ডের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। এখানকার জল নাকি সর্ব-রোগ-হর-গজ-বজ্র-সিংহ ! পীর মকদুম সাহের অদ্ভুত জীবনীও শোনালেন তিনি আমাদের। কিন্তু কোন দক্ষিণা দাবী করেননি।

গঙ্গা-যমুনা ধারাগার

আমরা খুশী হয়ে তাঁকে পীরের দরগায় ফুলের মালা ও আতর পান দেবার জন্য কিছু দক্ষিণা দিয়ে এলুম।

এই কুণ্ডটি শোনা গেল মোসলেম অধিকারে যাবার পূর্বে ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ড নামে খ্যাত ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে দু'মাস রাজগীরে অবস্থান করা সত্ত্বেও আমরা মাত্র আর একটি দিন মকদুম্ কুণ্ডে যাবার অবকাশ পেয়েছিলুম। সপ্তধারা, ব্রহ্মকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড এবং গঙ্গাযমুনাতেও দু'মাসের মধ্যে পনেরো দিনও গেছি কিনা সন্দেহ। আসলে রোগী ভিন্ন নিত্য ঐ গরম জলে 'হাফ্-বয়েল' হ'য়ে আসা পোষায় না। তবে বাড়ীর মেয়েরা প্রায় নিত্যই স্নানে যেতেন কুণ্ডে। কুণ্ডে যাবার পথটি কিন্তু বেশ ! সরস্বতী নদীর ছোট সেতুটি পার হ'য়ে বাঁ হাতি বেঁকলেই দেখা যায় কুণ্ডে ওঠবার জন্ম পাহাড়ের বুকে তৈরী প্রশস্ত সোপান শ্রেণী। কুণ্ড স্নানের আর একটা প্রত্যক্ষ ফল দেখেছি, মাথা মুছে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দারুণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। কোনও অসুবিধা নেই সেজন্ম ! কুণ্ডে যাবার পথে একাধিক উৎকৃষ্ট খাবারের দোকান আছে। অঙ্কুরিত ছোলা আর টাটকা মালাই ও মাখন এখানকার এক বিশেষ আহার্য্য। তা ছাড়া গরম অমৃতী, গরম ক্ষীরমোহন এবং পেঁড়াও মেলে।

এখানকার পাহাড়গুলির চূড়ায় চূড়ায় একাধিক ছোটবড় জৈন-মন্দির আছে। বিপুল পর্বত শৃঙ্গ থেকে নাকি জৈন তীর্থঙ্কর শ্রীমহাবীর প্রথম তাঁর অহিংসাধর্ম প্রচার করেন। সে আজ হ'ল প্রায় ২৫০০ বছর আগের কথা। কার্তিক অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে প্রতি বৎসর এখানে ভারতের নানা দিক দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ জৈন তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। তাঁরা কুণ্ডস্নান ও পাঁচটি পাহাড় পরিক্রমা করেন। যাঁরা বৃদ্ধ
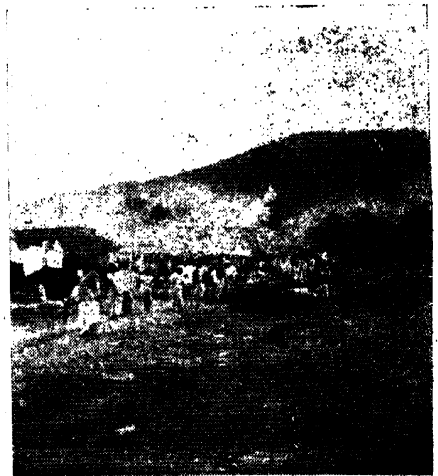
সরস্বতী নদীর এপার থেকে সপ্তর্ষিকুণ্ড দেখা যাচ্ছে।
(পথে স্নানার্থীদের ভীড়)

অশক্ত ও রুগ্ন তাঁদের জন্য কুণ্ডে যাবার ও পাহাড় পরিক্রমার জন্য 'ডুলি' পাওয়া যায়। আগে পাঁচ টাকাতেই হ'ত, আজকাল দশ পনেরো টাকা চায়। শুধু কুণ্ডে যাতায়াত করতে ডুলি নেয় দেড় টাকা দু'টাকা। বাতে পঙ্গু যাঁরা, তাঁদের কুণ্ডস্নানের একমাত্র উপায় এই ডুলি। এরা একেবারে আরোহীদের পাহাড়ের উপর তুলে ধারার সামনে নিয়ে যায়। সপ্তপর্ণীর অপর অংশের পলায়নোন্মুখ অধিবাসীটি বেনারস চলে যাওয়ার পর বাড়ীর মালিকদের আত্মীয়েরা ঐ অংশে আসবেন খবর আসায় সে অংশ খালি রইলো। ইতিমধ্যে আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব প্রায়ই আমাদের বাড়ী এসে পড়তে লাগলেন। পরিচিত বাঙালী যাঁরাই আসতেন, ষ্টেশনের সামনে সপ্তপর্ণীতে আছি শুনে দেখা করে যেতেন। স্বর্গীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্

অদ্রীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নালন্দা-মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে এই সময় নালন্দায় ছিলেন। আমরা রাজগীরে এসেছি শুনে তিনি আমাদের চিঠি লিখে নালন্দায় সাদর নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তারপর আমাদের যেতে দেরী হচ্ছে দেখে সপরিবারে রাজগীরে এসে দেখা করে গেলেন। বহুকাল বাদে অদ্রীশের সাথে দেখা। বৌমা এবং পাঁচটি সুদর্শনা নাতনী ও একটি সুন্দর শিশু নাতিকে পেয়ে খুব আনন্দ করা গেল। এর পরে অদ্রীশ আরও কয়েকবার রাজগীরে সপরিবারে এসে আমাদের সঙ্গে গল্পগুজবে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে গিয়েছেন। নালন্দায় যাওয়ার আমাদের খুবই আগ্রহ। রাজগীর আসার সর্বপ্রধান আকর্ষণ বলতে গেলে নালন্দাই। সুতরাং অদ্রীশ ও বৌমার আহ্বানে আমরা আনন্দিত চিত্তেই সম্মতি দিয়েছিলুম। শুধু, আরও একটু ভাল করে শীত পড়লে রৌদ্রের তাপে কষ্ট হবেনা

জৈন মন্দির প্রাঙ্গণ

সারাদিন ঘুরে ঘুরে নালন্দা দেখার—এই জন্ম দিনকয়েক পরে যাওয়াই স্থির হোলো।

এইখানে একটা বিষয় বলে রাখা উচিত মনে করি। রাজগীরে ম্যালেরিয়া আছে। টাউনের সমস্ত বাড়ীর ময়লা জল নিকাশের কোনোও ব্যবস্থা নেই। সর্ব্বত্র আশেপাশে ময়লা জল জমে দুর্গন্ধ হয়, মশার উপদ্রব বাড়ে। রোগও দেখা দেয়; কিন্তু ভাল ডাক্তার নেই। প্রায় ছ'মাস থেকে আমি 'হৃদয় দৌর্বল্য' রোগে ভুগছিলুম। কলকাতার খ্যাত ও অখ্যাতনামা অনেকগুলি চিকিৎসক নানা উপায়ে পরীক্ষার পর আমার রোগ নির্ধারণ করেন occlusion of the coronary artery! হৃৎপিণ্ডের রক্তবাহী একটি প্রধান ধমনী নাকি ভিতর থেকে বুজে আসছে! চিকিৎসা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট হয়েছিল—কায়িক পরিশ্রম সম্পূর্ণ নিষেধ। মানসিক উত্তেজনা ততোধিক নিষেধ। হাঁটা চলা বিশেষভাবে নিষেধ। স্বাভাবিক আহারের পরিমাণ অর্ধেকের বেশি কমিয়ে ফেলতে হবে। ধূমপান আর চলবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর নিতে হবে প্রতিমাসে ভিটামিন-বি,—২৫' সি, সি, গ্লুকোজের সাথে অন্তত আটটি ইন্টারভেনাস্ ইন্‌জেকশান।

সঙ্গে তিন ডজন ২৫° সি, সি, গ্লুকোজ এবং তিন শিশি 'ভিটামিন্-বি' সংগ্রহ করে নিয়ে রাজগীরে এসেছিলুম। এখানে পৌঁছেই পত্নী সর্বপ্রথমে ডাক্তারের খোঁজে ব্যস্ত হলেন। ইন্‌জেকশনগুলি নিয়মিতভাবে দিয়ে যেতে হবে; এই পরামর্শটি কলকাতার চিকিৎসকেরা তাঁর মাথায় বেশ ভালো করে বপন করে দিয়েছিলেন। সারা রাজগীর ঘুরে ইণ্টার-ভেনাস্ ইন্‌জেক্‌শান্ দেওয়ার মত ডাক্তার তিনি আবিষ্কার করতে না পেরে অকূল পাথারে পড়ার মত চঞ্চল হয়ে পড়লেন। আমি অবশ্য এতে মনে মনে বেশ খুশীই হয়ে উঠেছিলুম। শ্রীমতীর ব্যাকুলতাটি উপভোগ করতে করতে তাঁকে আরও চঞ্চল করে তোলার সাধু মতলবে ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়ার উপযুক্ত ডাক্তারহীন স্থানে বাস করা যে কতো বেশি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক, বিশেষ করে আমার মতো হার্টের রোগীর পক্ষে, এটা তাঁকে বোঝাতে গিয়ে কিন্তু বিপদে পড়লুম। বল্লেন—এখানে থাকা হবে না, চলো পাটনায় যাই! মনে মনে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন খুবই, কিন্তু বাইরে অচপল ধীরতা অবলম্বন করে দৃঢ়ভাবে চিকিৎসকের অনুসন্ধানে তৎপরতা অবলম্বন করলেন। সারা রাজগীর তদন্ত করে আশানুরূপ চিকিৎসক না পেয়ে স্বামী কৃপানন্দজীকে সাথে নিয়ে গৃহিণী বিহার শরীফে যেতে প্রস্তুত হলেন। সেখানে নাকি একজন এম্. বি, আই, এম্. এস্ বাঙালী ভালো ডাক্তার আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে ব্যবস্থা করে আসা হবে, নিয়মিতভাবে তিনি বিহার-শরীফ্ থেকে রাজগীরে এসে একদিন অন্তর আমাকে আন্তঃশৈরিক-সূচিকা ভেদ করে ঔষধ দিয়ে যাবেন। যে—কথা সেই কাজ! শ্রীমতী এসে বললেন আমি আজ ১১টার ট্রেণে স্বামীজীকে নিয়ে বিহারশরীফে ক্যাপ্টেন্ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে তোমার ইন্‌জেক্‌শনের একটা ব্যবস্থা করে আসব। আমি বললুম, রোগীকে শুদ্ধ নিয়ে চলো না! একটু পরীক্ষা করে দেখবেন তিনি, এই গণ্ডারচর্ম ভেদ করবার মত সূচী নৈপুণ্য তাঁর আছে কিনা!

এই সূত্রে বলে রাখি, আমি নিজে এলোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্বাসী মানব নই। আমি জানি, যা' হবার তা' হয়ই, কোনও চিকিৎসকই তা প্রতিরোধ করতে পারেন না, আর যা সেরে যাবার তা' সেরে যায়ই, বিনা ডাক্তারেও তা' সারবেই। মধ্যবর্তী পুত্রকলত্রেরা পূর্বজন্মের ঋণ শোধ করতে চিকিৎসকদের ধরে এনে 'নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচিন্' ঘটান মাত্র। সুদীর্ঘ জীবনে আত্মীয়বন্ধু পরিচিত বহুজনের বহু বিচিত্র রোগ ও তার চিকিৎসা, মৃত্যু এবং নিরাময়তা দেখে দেখে ঔষধে ও ডাক্তারে বিশ্বাস বৃদ্ধি না হয়ে দিনের দিন কমে কমে এখন প্রায় বিশ্বাস নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। সুতরাং

প্রচেষ্টা যতখানি ছিল, আমার নিজের নির্বিকার নিশ্চিন্ততা ততখানিই অবিচল ছিল বলা চলে। এই সূত্রে একটা ব্যাপার বলি।

ডাঃ ডেনহ্যাম্ হোয়াইটের নির্দেশে গৃহিণী আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন এক হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাগারে। পার্ক ষ্ট্রীটে ভদ্রলোকের চেম্বার। আমাকে সঙ্গে নিয়ে একজন ডাক্তার তাঁর কাছে পৌঁছে দিলেন। সেখানে আমার হৃৎপিণ্ডের বা হৃদয়াভ্যন্তরের বৈদ্যুতিক আলোকচিত্র তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা হবে। যো হুকুম!—শুয়ে পড়লুম লম্বা হয়ে একখানি সংকীর্ণ পরিচ্ছন্ন শয্যার উপরে। আমার সঙ্গী ডাক্তার এবং আরও দুইজন ডাক্তার আমাকে ঘিরে যন্ত্রপাতি নিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা আমার হাতে পায়ে বৈদ্যুতিক—রাখীবন্ধন করে বুকের উপরে একটি বিজলী যন্ত্র স্থাপন করলেন। আমি তাঁদের মুখের পানে তাকিয়ে স্থির হয়ে শুয়ে মজা দেখছি। লক্ষ্য করতে লাগলুম—প্রধান পরীক্ষকের ভ্রূ রীতিমত কুঞ্চিত হয়ে উঠছে। যন্ত্রটির পানে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। ক্রমশঃ মুখ গম্ভীর কালো হয়ে উঠলো।

তারপর আমার প্রতি প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো।—আপনার কি বুকের মধ্যে কোনও রকম কষ্ট হয়? উত্তর দিলুম—বেশী হাঁটলে মাঝে মাঝে হাঁফ্ ধরা ছাড়া আর কিছু হয় না।

—না না, তা' নয়। ধরুন বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বা দমবন্ধ হয়ে আসার মত মনে হয়? কিংবা বুক ধড়ফড় করা বা হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন ব্যথা করে ওঠা—ঐ রকম কিছু হয়?

একটু চিন্তা করে যথার্থ সত্য উত্তর দিলুম।—না, কখনও হয়নি এমন।

—ঘুমুতে ঘুমুতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বা বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে, এমনতর কি 'ফীল' করেছেন কখনও?

একটু লজ্জিত হয়েই উত্তর দিলুম, ঠিক ঐ রকমই হৃদয়ঘটিত বর্ণনা আমরা বইতে অনেক লিখি বটে, কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি মশাই—ঐ বুকের মধ্যে ধড়্‌ফড়্ করা, প্রাণের মধ্যে কেমন করা, বুক হুহু করা এসব ব্যাপারের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই। এক ঘুমে রাত্ কাটিয়ে জোরে ওঠাই আমার আবাল্যের অভ্যাস। বুক কেমন করা, প্রাণ কেমন করে ওঠা—মেয়েমানুষদেরই তো স্বাভাবিক লক্ষণ বলে জানি।

এবার প্রশ্ন হলো—আচ্ছা, আপনার খুব মাথা ধরে কি? বললুম—বিশ্বাস করুন, মাথাধরা ব্যাপারটা যে কী তা আমার চিরদিনের কৌতূহল সত্বেও আজও জানতে পারিনি। অনেকেরই মুখে 'মাথা ধরেছে' কথাটা শুনি আর ভাবি, আচ্ছা কাণ্ড যা হোক! মাথাটা তো মানুষের নিজেরই, ধরছে সে কোন্ ব্যক্তি? মোটের উপর আজও পর্য্যন্ত আমার মাথাটা যে কেউই ধরতে ছুঁতে পারেনি এ কথা আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

—আচ্ছা, মাথা না ধরুক, মাথা ঘোরে কি মাঝে মাঝে? মাথা ঘোরা ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার নিশ্চয় পরিচয় আছে আশা করি?

—বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, আমার মাথা কখনও ঘোরেনি,
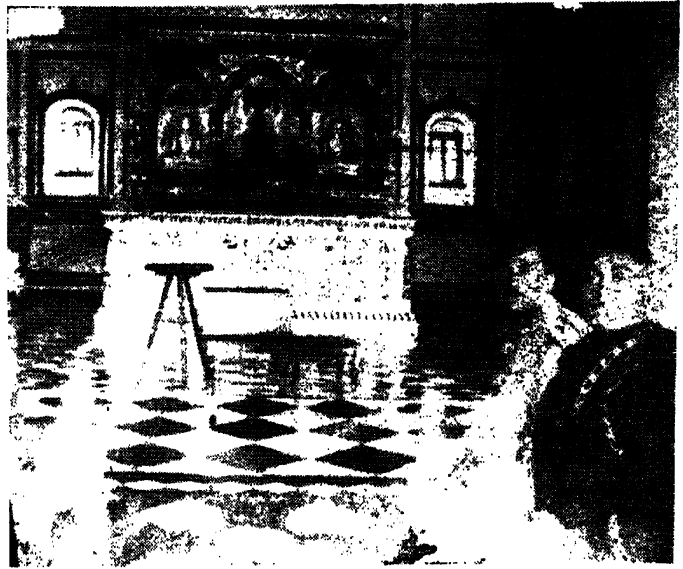
মন্দির অভ্যন্তরস্থ বিগ্রহপীঠ

এখনও ঘোরে না! আমি একথাটাও অনেকের মুখে শুনি বটে। বাড়ীতেই আমার স্ত্রীকে মাঝে মাঝে শয্যা নিতেও দেখি—এই মাথা ধরা আর মাথা ঘোরার দরুণ।—কিন্তু, আমি তো বুঝতে পারিনি ঘাড়ের উপর যে-মাথাটি এমন ফিক্সড্ রয়েছে,—সে ঘুরবে কি করে? ঘোরাটা সম্ভবই বা হয় কী করে? কিছু মনে করবেন না, আমি বড়ই দুর্ভাগা। সংসারে অনেক সর্বজনবিদিত ব্যাপারে আমি সত্য সত্যই আজও অনভিজ্ঞ। ঘাড়ের উপর আঁটা মাথাটা আমার শুধু এপাশ ওপাশ নড়ে মাত্র, ঘুরতে আদৌ পারে না। ঘুরলে সুবিধা হ'ত খুব, পিছনে কে আসছে সহজেই দেখতে পেতুম।

ডাক্তারেরা বিরক্ত হয়েই অবশ্য আমাকে খুব সন্তর্পণে এবং সাবধানে জীবন যাপন করতে উপদেশ দিয়ে সেদিন সেখান থেকে বিদায় দিয়েছিলেন।

আমার বিহারশরীফ্ যাওয়ার প্রস্তাবে পত্নী প্রথমে একটু ইতস্তত করে শেষকালে বললেন,চলো—তোমাকেও একটু দেখিয়ে আনি তাহলে।

ডাক্তার দেখাবার জন্য তো আমার ভারী মাথা ব্যথা। আসল উদ্দেশ্য বেহারশরীফ্ জায়গাটি একটু দেখে আসবো। বৌদ্ধ যুগের প্রসিদ্ধ জনপদ ওদন্তপুরই নাকি পাঠান বীর বক্তিয়ারের আক্রমণের পর বিহারশরীফে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমাদের বিহারশরীফে যাওয়ার আগের দিন সকাল বেলায় দ্বারভাঙ্গায় অনুষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স ফেরৎ শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য দর্শনসাগর ও পণ্ডিত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় রাজগীরে আবির্ভূত হলেন। শিবপ্রসাদবাবুর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর কন্যা-তুল্য ছাত্রী অঞ্জলি দেবী। ইনি স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র পরলোকগত রামচন্দ্রের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী। স্নেহাস্পদা অঞ্জলি দেবী ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সে সংস্কৃত ভাষায় স্বরচিত প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেছিলেন। সুধী শ্রোতারা নাকি সে রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সতীশচন্দ্র নেই, রামচন্দ্র নেই। বসুমতী অন্ধকার। তারই মাঝে প্রদীপ শিখার মতো প্রোজ্জ্বল এই বিদুষী বুদ্ধিমতী বালিকা। এঁদের আনন্দপ্রদসঙ্গ মাত্র দু'দিন পেয়েছিলুম। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই এঁরা রাজগীর ছেড়ে কলকাতা রওনা হয়ে যান। এঁরা যে ট্রেনে কলকাতার গাড়ী ধরবার জন্য বক্তিয়ারপুর যাচ্ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে আমরাও সেই ট্রেনেই বিহারশরীফের ডাক্তার দাশগুপ্তের খোঁজ করতে যাচ্ছিলেম। সমস্ত পথটা ট্রেণে গল্প-গুজবে কাটিয়ে বিহারশরীফে এসে আমরা নেমে পড়লুম। ডাঃ দাশগুপ্ত, তাঁর পত্নী শ্রীমতী দাশগুপ্ত ও তাঁর পুত্র-কন্যাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলুম। উদার অমায়িকচিত্ত সংস্কৃতিবান এই পরিবারের আতিথেয়তায় ও আন্তরিক যত্ন আদরে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে এলুম। ডাক্তার দাশগুপ্তের সময় অত্যন্ত কম। আশে-পাশে আর বড় ডাক্তার নেই বলে তাঁর 'ডাক' খুব বেশি। তিনি বন্ধুর মত পরামর্শ দিলেন, এতদূর থেকে আমার পক্ষে রাজগীর গিয়ে নিয়মিত একদিন অন্তর'ইনজেকশন্ দিয়ে আসা সম্ভব হবে না। আর আপনার পক্ষেও এত দূরে ট্রেণে এসে নিয়মিত ভাবে ইন্‌জেক্‌শন্ নিয়ে যাওয়াও সুবিধা হবে না। আপনি রাজগীর চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্‌সারীর ডাঃ গোপীনাথের কাছে ইঞ্জেক্‌শন্ নেবেন। ডাক্তার দাশগুপ্ত অকপটে স্বীকার করলেন যে বড় বড় ডাক্তারের চেয়ে তাদের কম্পাউণ্ডাররাই ইনজেক্‌শান দেয় ভালো, কারণ তারা ঐ কাজ করে করে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে! আমার স্ত্রীকে বললেন—আপনি বরং বিহারশরীফ থেকে একটা ভালো নয়া সূঁচ সিরিঞ্জে ব্যবহারের জন্য কিনে নিয়ে যান্।

চিকিৎসা ব্যাপার ছাড়া আরও অনেক কিছু আলোচনা করে সন্ধ্যার পর আমরা বিহারশরীফ থেকে রাজগীর ফিরে এলুম। শ্রীমতী বিহার শরীফ ষ্টেশনের অপর দিকের ডিস্পেন্‌সরী থেকে ইন্‌জেক্‌শনের জন্য একটি সিরিঞ্জের সূঁচ পছন্দ করে কিনে নিয়ে এসে ট্রেণে উঠলেন। ইচ্ছা ছিল, ডাঃ দাশগুপ্তর বাড়ী থেকে বেলাবেলি বেরিয়ে একটু বিহারশরীফটা ঘুরে দেখে নেবো; কিন্তু দাশগুপ্ত পরিবারের আন্তরিকতায় ও গল্প-গুজবে মগ্ন হয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেখানেই কাটিয়ে শেষ-ট্রেণে রাজগীরে ফিরলুম। (ক্রমশঃ)

কেদার-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি

কেদারবাবুর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার সময় আমাদের মনে একটা ব্যর্থতার ভয় জাগিয়া উঠে—মনে হয় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিতে যাইয়াও পাছে বর্ণনার কার্পণ্যে, দৃষ্টি এবং শক্তির দীনতায় তাঁহার মহত্বকে খর্ব্ব করিয়া ফেলা হয়।

আমাদের ভাগ্যের গুণে এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদে যদিও তিনি এখনও আমাদের মধ্যে একজন হইয়া রহিয়াছেন, তবুও আমরা জানি তিনি আমাদের দলের লোক ঠিক নন; তিনি সমস্ত সাহিত্যিক সব্যসাচীদের দলেরই একজন ছিলেন যাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ নাই। নূতন বাংলা, তথা নূতন ভারতকে যাঁহারা রূপ দিয়াছেন, বাণী দিয়াছেন, আশা আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা দিয়াছেন, কেদারবাবু সেই যুগপ্রবর্ত্তকদের দলের অন্যতম। একে একে তাঁহাদের দলের জ্যোতিষ্কগুলি অস্ত গিয়াছে, তিনিই শুধু স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া নিজের আকাশটিকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই কেদারবাবু সম্বন্ধে আলোচনা করায় সত্যিই বিপদ আছে। নিজের ব্যক্তিগত জীবন দিয়া যিনি অতীতের সহিত বর্ত্তমানের স্বর্ণসেতু বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন, বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিক রীতিগুলিকে যিনি মরশুমি ফুলের মতই আশে পাশে ফুটিতে ও ঝরিতে দেখিয়াছেন এবং তাহাদেরই মধ্যে যিনি প্রাংশু বনস্পতির মত মাথা উঁচু করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি এখনও সাহিত্যের ফসল থরে থরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ভয় হয় পাছে স্পর্দ্ধার অহঙ্কারে তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইয়া বসি।

কাজেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেদার-সাহিত্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে আমরা সাহস করিতেছি না। আমরা শুধু তাঁহার সাহিত্যের স্থানে স্থানে উঁকি মারিয়া, অতর্কিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রচনাগুলিকে আকস্মিক উপলক্ষ হিসাবে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

উপন্যাস, ছোট গল্প, রস-রচনা, কবিতা প্রভৃতি নানা জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়াই দীর্ঘদিন ধরিয়া কেদারবাবু বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সৃষ্টির বৈপুল্য বিস্ময়কর না হইলেও সামান্য নহে। তবে এই সাহিত্য সৃষ্টির বিচার করিতে হইলে শুধু তার পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, প্রকারটিও দেখিতে হইবে। কেদার-সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে তার রস, তার ইঙ্গিত, তার শব্দালঙ্কার-চাতুর্য্য, তার শব্দ সৃষ্টির কৌশল, তার ব্যঞ্জনা—এই সমস্ত গুলিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

কেদার-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তার বৈপুল্যে নয়, তার শক্তি ও সঙ্কেতে, তার নৈপুণ্যে।

এই শক্তির উৎস কোথায়?

ফরাসী পণ্ডিত টেন্ তাঁহার "ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—প্রত্যেক মনীষার মধ্যেই একটা "মেন্ স্প্রীং" আছে। যদি সেই "মেন্ স্প্রীং"টির সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্যান্য ছোট-খাট কলকব্জার কার্য্যপ্রণালী সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সাধারণ পাঠককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "কেদার-সাহিত্যের এই "মেন্ স্প্রাং"টি কি—? তাহা হইলে সকলেই একবাক্যে বলিবেন, "কেদারবাবুর রসানুভূতি"! কেদারবাবু যে "রস-রচনায়" ধুরন্ধর ইহা সকলেই স্বীকার করিবে।

এই রসটি কি?

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রস বলিতে যাহা বুঝেন এ রস অবশ্য তাহা নহে; কারণ, সংস্কৃত সাহিত্যে করুণ হইতে বীভৎস পর্য্যন্ত সব কিছুই এই রসের পর্য্যায়ে পড়ে। কেদারবাবুর "রস রচনা" বলিতে আমরা তাঁহার ব্যঙ্গ-রসিকতা-সমৃদ্ধ উজ্জ্বল সাহিত্যকেই বুঝিয়া থাকি। অথচ সাধারণ ব্যঙ্গের যে দোষ, সেই আঘাত-প্রবণতার দোষ কেদারবাবুর মধ্যে নাই। তাঁর তিরস্কার গুলি যেন প্রতিপক্ষের বিদ্রূপের মত শুনায় না, তাহা যেন দাদামহাশয়ের সপ্রেম সুমধুর ব্যঙ্গোক্তি, তাহাতে তত্ত্বকথা আছে, সত্য কথা আছে, গালাগালি আছে, তবুও তাহা মিষ্টই লাগে।

কবি বলিয়াছেন "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ"। কেদারবাবু যেন এই বাক্যের প্রতিবাদ করিবার জন্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। মনোহারী বিদ্রূপের হিতকারী বাক্যে তিনি যেন আমাদের উৎপথ-প্রস্থিত সমাজকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাংলা সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গতিগুলিকে রসদৃষ্টি দিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া বিদ্রূপে বিদ্রূপে তাহাকে লজ্জায় অপদস্থ করিয়া তাহাদিগকে সমাজদেহ হইতে বিতাড়িত করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য।

অথচ এই বিদ্রূপ-প্রবণতার জন্য তাহাকে নিষ্ঠুর অথবা বেদরদী ভাবা যায় না। ভূতগ্রস্ত মানুষকে প্রহার করিয়া রোজা যখন ভূত তাড়ায় তখন রোজার প্রহারটা তার নির্দ্দয়তার প্রমাণ হয় না—কারণ সে নির্দ্দয়তার অনুপ্রেরণা হইতেছে চিকিৎসকের মনোবৃত্তি। কেদারবাবুও যেন সমাজের রোজা হইয়া সমাজের ভূতকে মাঝে মাঝে প্রহার করিতে থাকেন। তাঁহার হস্তে ভূতের লাঞ্ছনা দেখিয়া আমাদের মধ্যে হাস্যরসের উপলব্ধি হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই হাস্যরসের মূল অনুপ্রেরণা আসিতেছে করুণ রস হইতে।

কথাটা হয়ত কাহারও কাহারও কাছে যুক্তিহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। তাঁহারা হয়ত বলিবেন "হাস্যরসের সহিত আবার করুণ রসের সম্পর্ক কি?" কিন্তু সম্পর্ক থাকাটা সত্যই আশ্চর্য্য নয়। ভবভূতি বলিয়াছেন—

> "একোরসঃ করুণ এব নিমিত্ত ভেদাৎ
> ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
> আবর্ত্ত বুদ্বুদ তরঙ্গময়ান্ বিকারান্
> অম্ভো যথা সলিলমেব তু তৎ সমগ্রম্॥"

কেদারবাবুর সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। করুণ রসের প্রেরণাতেই তিনি সমাজের দুঃখ কষ্টকে অনুভব করিতে পারিয়াছেন এবং করুণ রসের প্রেরণাতেই তাঁহার দরদী এবং ভাবপ্রবণ হৃদয় ব্যথিত হইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়া তাহার সংস্কার চাহিয়াছে।

তবে এই সংস্কার তিনি হিব্রু prophetদের মত চিৎকার করিয়া অভিশাপের ভয় দেখাইয়া আনিতে চাহেন নাই; ইহার জন্য তিনি oahypeএর মত ভৎসনা করেন নাই; swiftএর মত বীভৎস বিদ্রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পিত্তদগ্ধকর কটু বাক্যে অন্তরের বিষোদ্গার করেন নাই। অত্যন্ত ক্ষোভের উক্তির সময়টিতেও তাঁহার মুখের হাসিটি যেন নিভিয়া যায় না।

তাঁহার ব্যঙ্গগুলি করুণ রসের সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া সেগুলি আমাদের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে এবং সেগুলির প্রতি একটা নৈতিক সমর্থনও আমরা স্বীকার করিয়া লই।

অবশ্য একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে, সমস্ত হাস্যরসের মূলেই এই নৈতিক সমর্থনটি থাকে না; তবুও সে সব ক্ষেত্রে হাস্যরসটিকে রস হিসাবে গ্রহণ করিতে আমাদের বিশেষ বাধা থাকে না। সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে হাস্যরসের প্রধান আলম্বন হইতেছে বিদূষক। কিন্তু সেই বিদূষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে তাহা অত্যন্ত স্থূল, তাহার মূলে করুণ রসের প্রেরণাও নাই আর অন্তে নৈতিক সমর্থনও বিশেষ নাই। ভোজন-সর্ব্বস্ব লোভী ব্রাহ্মণ চাটুকারিতা ও নিকৃষ্ট ভাঁড়ামি করিয়া রাজার অন্যায় লালসার ইন্ধন জোগাইবার জন্য ছলা কলার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিদূষকের প্রতি সত্যিকারের ক্রোধ না হইলেও বিশেষ রকম আকর্ষণ জাগে না, কিন্তু রত্নাবলী বা কর্পূরমঞ্জরীর বিদূষককে দেখিলে যেন ঘৃণাই জাগে। প্রাসাদে বিবাহিতা সাধ্বী স্ত্রী থাকিতেও অন্য নারীর রূপ মোহিত কামাতুর রাজার জন্য নারী সংগ্রহের ব্যাপারে রাজার সহকারী বিদূষকের উপর আমাদের মন যেন স্বতঃই বিরূপ হইয়া উঠে। এই রাজাদের পত্নী বর্ত্তমানেও পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিবার একমাত্র যুক্তি হইতেছে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভের সম্ভাবনা। "স্ত্রী ভাগ্যে ধন" এই শাস্ত্রবাণী প্রসিদ্ধ। রূপসী অপরিচিতার কর রেখায় নাকি জানা গিয়াছে তাহার

স্বামীর রাজচক্রবর্ত্তিত্ব যোগ আছে; সুতরাং রাজা তাহাকে নিশ্চয়ই বিবাহ করিবেন—বীর্য্য-শুল্কা ধরণীকে বীর্য্য বলে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা না করিয়া উপযুক্ত নারীর ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের জোড় কমল বাঁধিয়া ভাগ্য ফিরাইবার অজুহাতে বিবাহের চক্রান্তে বিদূষকই রাজার প্রধান সহায়। কাজেই তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে হাস্যরস জমিয়া উঠে তাহাতে কোনও করুণ রসের প্রেরণা অথবা নৈতিক সমর্থন আমরা খুঁজিয়া পাই না। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' অথবা ভাসের "অবিমারক" প্রভৃতি দুই একটি নাটক ছাড়া সাধারণ প্রচলিত নাটকাদির মধ্যে হাস্যরসের আলম্বনগুলিকে আমরা যেন ভালবাসিতেও পারি না এবং তাহাদের হাস্যে যোগও দিতে পারি না। "ভাণ" জাতীয় নাটকের বিষয় বস্তুগুলিও যেন আমাদের রুচি বিরোধী।

ইংরাজী সাহিত্যে swift pope প্রভৃতির অনেক রচনাতেও আমরা এই নৈতিক সমর্থনটি খুঁজিয়া পাই না এবং সেই জন্যই মনে হয় তাহাদের সাহিত্যিক অমরত্বের অধিকারও নাই।

এই প্রসঙ্গে দুইটি আপত্তি উঠিতে পারে, একটি সমালোচকের আর একটি মনস্তাত্ত্বিকের।

সমালোচক বলিতে পারেন হাস্যরসের সৃষ্টির সহিত নৈতিক সমর্থনের প্রসঙ্গের কি সার্থকতা থাকিতে পারে? pope Dryden প্রভৃতির লেখকদের বহু রচনার মধ্যেই নৈতিক সমর্থন নাই, তাঁহাদের অনেক satireই ব্যক্তিগত আক্রমণের-ঘাত প্রতিঘাতে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে মানুষ হিসাবে pope প্রভৃতিকে আমরা সমর্থন করিতে না পারিলেও তাঁহাদের কাব্যগুলিকে কি এখনও আদরের সহিত পাঠ করি না?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে "হ্যাঁ কাব্য হিসাবে ঐ সমস্ত জিনিষ-গুলিকে পাঠ করি বটে, তবে উহা পাঠ করিবার আকর্ষণ হইতেছে ঐ সব কাব্যের বর্ণনার নিপুণতা, শব্দের ঝঙ্কার, বাক্যালঙ্কারের চাকচিক্য এবং সাময়িক ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। ইহা আমাদের নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে এই সমস্ত ব্যঙ্গ কাব্যের হীন ব্যক্তিগত আক্রমণ ও নৈতিক শৈথিল্য আমাদের রসানুভূতিকে আঘাত করে। তবে অন্যান্য বিষয়ের মিষ্টতার গাঢ়ত্ব-প্রযুক্ত আমরা এই তিক্ততা টুকুকে সহ্য করিয়া লই এই মাত্র।

মনস্তাত্ত্বিক বলিবেন, হাস্যরসের সহিত নীতির কোনও সম্পর্ক নাই। হাস্য হইতেছে মানুষের অতীতের বর্ব্বর যুগের একটা বৈশিষ্ট্য। শত্রুকে অথবা শিকারের বস্তুকে অসহায় অবস্থায় দেখিয়া তাহার অবস্থার অসঙ্গতি ভাবিয়া প্রতিপক্ষের মনে যে একটা ক্রুর জিঘাংসার আনন্দ জাগিয়া উঠে, হাস্যরসের মূল উৎস সেই স্থানেই আছে। কবলাগত মূষিককে লইয়া বিড়াল যে খেলা করে, ফড়িংএর ডানা কাটিয়া, ব্যেঙকে খোঁচা দিয়া, জীবজন্তুকে ঢিল মারিয়া ছেলেরা যে আনন্দলাভ করে, তাহাই হইতেছে আদিম হাস্যরসের উদাহরণ। এখনও দুর্বার পিচ্ছল পথে চলিতে যাইয়া কোনও লোককে পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিতে দেখিলে আমরা যে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারি না, তাহার মধ্যেই বা নৈতিক সমর্থন কোথায়?

কথাটা সত্য। দৈহিক স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়া হিসাবে হাস্যের সঙ্গে নীতির কোনও সম্পর্ক না থাকিতে পারে। কিন্তু শোক এবং সাহিত্যিক করুণ রস যেমন এক জিনিষ নয়, হাস্য এবং সাহিত্যিক হাস্যরসও সেইরূপ এক জিনিষ নয়। সেই জন্য নিছক গালাগালি, বর্ব্বর ভাঁড়ামি, নির্জ্জলা বিদ্রূপের মধ্যে মাঝে মাঝে হাসি পাইলেও সাহিত্যিক হাস্যরস তাহার মধ্যে ঠিক জমিয়া উঠিতে পারে না।

কেদারবাবুর হাস্যরসের মধ্যে আমরা যে জিনিষটির সন্ধান পাই, তাহা সত্যই সাহিত্যের সামগ্রী এবং উচ্চদরের সামগ্রী।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে হাস্যরস জমাইবার জন্য যে বিভিন্ন উদ্দীপন বিভাগের কথা অলঙ্কার শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় কেদারবাবু তাহার কোনগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথাতেই দেওয়া যাইতে পারে। স্থূল হাস্যরসের "বিকৃতাকার বাক্ চেষ্টা"দির উপর তিনি বিশেষভাবে নির্ভর করেন নাই।

অবশ্য একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে তাঁহার ভাদুড়ীমশাই ধীরাজবাবু দীনু-মামা চাটুয্যেমশাই প্রভৃতির মধ্যে তাঁহাদের শরীরের বিপুলত্বের জন্যই হোক্, অথবা কুশ্রীতার জন্যই হোক্ "বিকৃতাকারত্বে"র উপাদান আছে এবং দীনু-মামা চাটুয্যেমশাই প্রভৃতির মধ্যে ভোজনশৌণ্ডতা এবং 'বাক্‌চেষ্টা'দির বৈশিষ্ট্যগুলি সংস্কৃত নাটকের বিদূষককে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ইহাই তাঁহাদের সম্বন্ধে শেষ কথা নয়।

তাঁহার 'পাওনা' নামক উপন্যাসের নায়ক কৌলীন্যসর্ব্বস্ব দীনুমামা একটির পর একটি করিয়া বিবাহ করিয়া সমাজের উপকার ও কুলীনের কুল রক্ষার সহায়তা করিয়া যাইতেছেন দেখিয়া আমাদের মনে যখন একটা তরল ও সহজ হাস্যরস জমিয়া উঠে সেই সময়ে হঠাৎ গ্রন্থের শেষে ষোড়শী ও অন্নদার পরিচয় পাইয়া শান্ত ও করুণ রসের প্রাবল্যে আমাদের মন যেন অভিভূত হইয়া উঠে, ভারতের চিরন্তনী আদর্শের কুললক্ষ্মী সর্ব্বংসহা নারী যাহারা শত অত্যাচার ও অবহেলার মধ্যেও শুধু নিজের সতীত্বের গৌরবেই পতিদেবতার জন্য নিষ্কাম সেবায় আত্ম-বিলোপ করিতে পারে, তাহাদের সন্ধান পাইয়া আমরা যেন চমকিত হইয়া উঠি।

তাঁহার "সন্ধ্যা-শঙ্খের" মধ্যে দেখি বড় ঘরের মেয়ে সুরমার আভিজাত্য যখনই ধীরাজবাবুর ক্ষীণ চিত্তের চালচলনের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া ব্যাহত হইয়া উঠে তখনই চাগাইয়া উঠে তাঁহার দন্তশূল। স্বামী ধীরাজবাবু ঠিক সামলাইতে পারেন না, অথচ তাঁহার চামড়ার জিভ দিয়া এমন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ বাহির হইয়া যায়; যাহাতে অনর্থ আরও বাড়িয়া উঠে।

ইদানীং কিন্তু বন্ধু পরেশের শুচিবাতিকগ্রস্তা স্ত্রীকে লইয়া ঘর-কন্না করার দুঃখ দেখিয়া ধীরাজবাবু নিজের দুঃখটিকে হাল্কা করিয়া দেখিতে শিখতেছেন। ফলে তাঁহাদের দাম্পত্য কলহের আগুন ফুলঝুরির ফুলের মত দাহিকা শক্তিহীন কতকগুলি আতস বাজীর ফুল

কাটিয়াই নিঃশেষিত হয় এবং ব্যথার ব্যথা হইয়া ধীরাজবাবু শূল-যন্ত্রণা-দায়ী দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিয়া আপদের জড় উপড়াইয়া ফেলিবার জন্য সুরমা দেবীকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সুরমা দাঁত তুলিবেন কি করিয়া? দাঁত তুলিলেই ত ডেণ্টিষ্ট নির্ম্মলের সঙ্গে সম্পর্ক মিটিয়া যায়! কিন্তু নির্ম্মলের মত ছেলে কি শহরে আছে? বাড়ীর অবিবাহিতা মেয়ে রাধারাণীর বয়সটা দেখিতে হইল ত? বাস্তবিকই "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং"—"দেবা না জানন্তি"।

এ জাতীয় গল্প পড়িতে পড়িতে শেষে আমাদের থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। হাসাইতে হাসাইতে গ্রন্থকার যে আমাদের ভাবাইতে, কাঁদাইতে, চমক দিতে পারেন, ইহা প্রায় তাঁহার সব গল্পতেই দেখা যায়।

এই জন্যই কেদারবাবুর হাস্যরস সংস্কৃত নাটকের হাস্যরস অপেক্ষা ইংরাজী সাহিত্যের wit ও humourএর সহিত অধিকতরভাবে সম্পর্কিত।

ইংরাজী সাহিত্যে humour কথাটির একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। প্রাচীন শরীরতত্ত্বে মানবদেহের মধ্যে রক্ত (blood) পিত্ত (bile) কফ (phlegm) এবং melancholy নামক চারটি রস বা humourএর অস্তিত্ব কল্পনা করা হইত এবং ইহাদের যথাযথ মিশ্রণে মানুষের temperament (মনের অবস্থা) নির্ণীত হইত। ফলে কেহ হইত phlegmatic, কেহ হইত bilious, কেহ melancholy কেহ বা sanguine মনোবৃত্তি যুক্ত।

পরে এলিজাবেথের সময় বরাবর humour কথাটির অর্থ বদলাইয়া গিয়া মানুষের ব্যক্তিগত এক একটা খেয়াল বা বাতিক এই অর্থে কথাটা প্রযুক্ত হইতে লাগিল। Ben Jousonএর Everyman in his humour নাটকে আমরা humourটি অনেকটা এই অর্থেই প্রযুক্ত হইতে দেখিতে পাই। এখন পর্য্যন্ত humour কথাটির মধ্যে খেয়ালীর যে খেয়ালটিকে লক্ষ্য করা হইত, তাহাতে খেয়ালীর আত্মসচেতন ভাবটি ছিল না।

বর্ত্তমানে এই কথাটির মধ্যে একটা আত্মসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। ব্যক্তিগত খেয়াল, অসঙ্গতি বা দুর্ব্বলতার প্রতি একটা সজাগ মনোভাব লইয়া একটা ত্রুটি স্বীকারের সরলতা লইয়া, একটা সরস মনোবৃত্তি লইয়া হাসি-হাসান ও হাস্যাস্পদ হওয়াই হইতেছে এই humourএর বিশেষত্ব।

Wit humour ঠিক এক কথা নহে। witএর সমালোচক বিচারকের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপরের বিচার করে এবং বিচারক নিজে সেই সমালোচ্য দোষের গণ্ডীর বাহিরেই থাকিয়া যায়। humour এর মধ্যে সমালোচক নিজেও যেন নিজ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া ত্রুটি অসঙ্গতিগুলিকে খানিকটা নিজের বলিয়াই ভাবেন এবং মানুষের অখণ্ডনীয় এবং অনিবার্য্য দুর্ব্বলতার জালে নিজেকেও যেন সাধারণের মত জড়িত, অসহায় অবস্থায় দেখিতে পান।

কাজেই এই humour এর মধ্যে একটা করুণ রসের অনুভূতি আছে। কেদারবাবুর রচনার মধ্যে এই humourটিকে আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধভাবে দেখিতে পাই। তাঁহার সন্ধ্যা-শঙ্খের "মায়ের অনুগ্রহ" নামক গল্পে মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি হইয়া মতি মুকুজ্জেকে যখন বলিতে শুনি "মা ঠিক সময়ে এসেছেন, তাঁর ভুল হয় না, যদি এসেছো মা ভদ্র ঘরে লুকিয়ে-কান্না আর দেখিয়ে-হাসি থামিয়ে দাও এ জুচ্চুরি আর পারি না মা" তখন আমরা নিজেদের সহিত একই দোষে জড়িত বাক্-সর্ব্বস্ব চালসর্ব্বস্ব, গ্রামভদ্রদের অপ্রতিভ অবস্থাটা দেখিয়া হাসিব, না মতি মুকুজ্জের দুঃখের সহিত নিজেদের অপরাধের অনুভূতিতে কাঁদিব তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। ফলে জীবনের অসঙ্গতি ও বীভৎসতায় আমরা যেন অভিভূত হইয়া পড়ি। "স্নেহের ফাঁদ" গল্পটিতে ব্রজেশ্বরীর অন্ধ-নিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া সপ্তাহে সপ্তাহে সেখানে তাঁহার হারাণো অন্ধ-পালিতপুত্র গোপালের জন্য বসিয়া থাকার মধ্যে নারী হৃদয়ের যে কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা একদিক দিয়া যেমন আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, অন্য দিক দিয়া তেমনই মনকে আর্দ্র ও চক্ষুকে সিক্ত করিয়া তুলে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ক্ষণ-মিলন

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

সান্নিধ্যের উষ্ণশ্বাস শিরায় শিরায়
তীব্র অনুভূতি আনে, জ্বালায় আগুন;
হিম-নিপীড়িত নীড়ে বিহগ-মিথুন
তুহীন-ঝটিকা হতে আত্ম-রক্ষা চায়।

ক্ষণ-মিলনের মধু-আনন্দ আভায়
বিগত বিরহ কাটে বেদনা নিবিড়,
ঊষার উচ্ছাস নাশে রাত্রির তিমির
হৃদয়-নিলগ্ন প্রেম উচ্ছলিয়া যায়।

ক্ষণিকের পরিতৃপ্তি ক্ষণ-অনুরাগে,
স্বল্পতম পুলকের প্রদীপ্তি ভাস্কর,
আলিঙ্গনে আশ্লেষের উদ্দামতা জাগে,
যৌবন-প্রমত্ত প্রাণ তৃপ্ত নিরন্তর।

ক্ষণস্থায়ী এ মিলন স্মরণে অক্ষয়,
শান্ত জীবনের মাঝে অনন্ত প্রণয়।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

বহুদিন বাদে গ্রামের স্কুলে আসিলাম। অনেক দিনের বিস্মৃত স্মৃতি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অকস্মাৎ যেন মুখর হইয়া ওঠে; কিন্তু অতীতকে লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সময় এখন নয়।

কিশোর ছাত্র-জীবনের কয়েকটি দিন এই বিদ্যালয়টিকে ঘিরিয়া আছে—মহাকুমা সাব-ডেপুটির সে কথা এখন আর বানাইয়া বিনাইয়া ভাবিবার অবকাশ কই?

ভারতের ইতিহাসের গৌরবোজ্জল এই দিনটিতে রাষ্ট্র-শাসনকর্তার প্রোগ্রাম অনেক। অনেক সভা-সমিতিতে আজ খৃষ্টান ভারতের মর্যাদা এবং ভারতবাসীর স্বাধীন দেশের নাগরিক কর্তব্যের কথা প্রকাশ করিতে হইবে। ধারালো অভিভাষণে সভাপতি এবং প্রধান-অতিথির জ্ঞান-পরিধিকে প্রচার না করিলে রাষ্ট্রচেতনা জাগ্রত হইবে না।

ছাত্রেরা প্যারেড করিয়া মিলিটারী কায়দায় পতাকাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিল। 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা'—জাতীয় সঙ্গীতে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সত্তাকে প্রকাশ করা হইল। ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা-উৎসব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, গ্রামের পথে পথে তোরণ-দ্বার, ফাঁকা বন্দুকের তোপধ্বনি, কুচকাওয়াজ, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত একটি গ্রামকেও আজ প্রাণ-চেতনায় উদ্বেল করিয়া রাখিয়াছে।

স্কুলের প্রধান-শিক্ষক মহাশয় গর্ব্ব প্রকাশ করিলেন—এই গ্রাম্য-স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র আমি, আজ তাঁহাদের মাননীয় অতিথি। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়ী সেনানী না হইলেও গ্রাম-সংগঠন এবং স্বদেশপ্রীতিতে আমার তুলনার কথা নাকি ভূভারতে মেলে না। এই মহকুমার শাসনকর্তা হিসাবে আমার যোগ্যতা ইতিমধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আজিকার স্বাধীনতা উৎসবে এই গ্রাম্য-বিদ্যালয় আমার ন্যায় দেশের গৌরব এবং দশের রক্ষককে প্রধান অতিথিরূপে লাভ করিয়া ধন্য!

উচ্ছ্বাসের আধিক্যে স্তুতিবাদ মাত্রা অতিক্রম করিতে-ছিল। ইঙ্গিতে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে থামাইয়া দিলাম।

স্বাধীনতা-তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষ করিতেই অকস্মাৎ পণ্ডিত মশায়কে মনে পড়িল।

শঙ্কর পণ্ডিত। শঙ্করাচার্যের ন্যায় তেজস্বী পুরুষ, উন্নত নাসিকায় স্ফীত। প্রশস্ত ললাটে চিন্তার রেখাকয়টি স্পষ্ট-ভাবে জাগিয়া ওঠে—যখন গভীরভাবে কোন কিছু অনুধাবন করিতে থাকেন। এই গ্রাম্য স্কুলে একটি বৎসরের ছাত্র-জীবনে এই বিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে তাঁহাকেই চিনিয়া-ছিলাম বেশি। জানিয়াছিলাম—অনেক ঐতিহ্য পণ্ডিত মশায়ের দীর্ঘ সময়টিকে ঘিরিয়া আছে। সাধারণ ছেলের কাছে তিনি ছিলেন দুর্দান্ত—কঠিন নীতিজ্ঞানে অধ্যাপনার নিষ্ঠায় সুকঠোর শাস্তি দিতেন। কিন্তু আমি দেখিয়া-ছিলাম ভারতীয় সৃষ্টির এক অপূর্ব জ্যোতিষ্ক।

মাথা দুলাইয়া অত্যন্ত গভীরতার সহিত সংস্কৃত শব্দ কয়টি উচ্চারণ করিতেন তিনি—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

অমৃতের সন্তান তোরা, তোদের মৃত্যু নাই। কিন্তু ঋষি-বাক্য আজ মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে—তোদের ভীরুতায়, কাপুরুষতায়, হীন কলঙ্কে তেত্রিশ কোটি ভারতের সন্তান তোদের মৃত্যু এনে দিয়েছে মুষ্টিমেয় বিদেশীর দল আর তাদের অনুচরেরা।

কথাগুলি বলিতে বলিতে উত্তেজনার আধিক্যে শঙ্কর পণ্ডিতের দীর্ঘ অবয়বে বৈশাখীর ঝড় দেখা দিত। দুই চক্ষু বহিয়া অগ্নি বর্ষণ করিতেন তিনি—শুধু দেশের স্বাধীনতা নয়, দেশের ঐতিহ্যকেও পর্যন্ত শৃঙ্খলিত করতে চায় ওরা। ওরা এনে দিয়েছে—

নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি—

শঙ্কর পণ্ডিতের খোঁজ করিতে গিয়া শুনিলাম—ইংরাজ রাজত্বে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহার শিক্ষক বৃত্তির অবসান ঘটিয়াছে। এখানকার স্কুলের চাকুরী খোওয়াই তিনি অন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

হাকীমি বৃত্তির মাঝে ছাত্রজীবনের একটি ক্ষণকে

পুনরায় চেতনাসমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল হইতে দেখিয়া যেমন আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, সেই জীবনের প্রধান গুরুর সন্ধান না পাইয়া তেমনি বেদনা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম। আজিকার এই স্বাধীনতা-উৎসব এই বিদ্যালয়ে সেই ধ্বনিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতে পারিল না—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্—হে অমৃত লোকের সন্তান—তোমরা ওঠো জাগো। তোঁমাদের মনুষ্যত্ব অর্জন করো। স্বাধীনদেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ করে বিশ্বের কাছে প্রকাশ করো তোমাদের প্রাণের সত্যকে—তোমাদের জ্ঞানের আলোককে।

আর ও দু' একটি সভার কার্য সারিয়া ফিরিতেছিলাম—নিজের আবাসস্থলে। একটি আসন্ন মামলার জটিল তত্ত্ব সাব-ডেপুটি মনকে জুড়িয়াছিল।

পথে দুর্ঘটনা ঘটিল। চলন্ত জীপখানি গ্রাম্য পথে হঠাৎ অচল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। ষ্টীয়ারিং কষিয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল যখন, তখন গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। এখান হইতে মহাকুমার সদর গ্রাম দশ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত। ইতিমধ্যেই থানার খবর পৌঁছাইয়া গেছে—গাড়ির ব্যবস্থা করিতে জমিদার ভবনে লোক ছুটিয়াছে।

গ্রাম পথে নামিয়া যে সংবাদ পাইলাম—তাহাতে মন আমার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সন্ধান পাইলাম—শঙ্কর পণ্ডিতের।

এই গ্রামেরই নিকটবর্তী পল্লী-অঞ্চলে পণ্ডিত মশায় এক টোল খুলিয়াছেন। কয়েকটি সংস্কৃত-শিক্ষার্থীকে দর্শন-শাস্ত্র পড়ান—প্রাচীন প্রথায়। আমার আগমনবার্তা শুনিয়া পণ্ডিত মশায় লোক পাঠাইয়াছেন আমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়া। জটিল মামলার কথা ভুলিয়া রাজকর্মচারিদের পরিত্যাগ করিয়া একাকী খুসী মনে গুরু সন্দর্শনে ছুটিয়া চলিলাম।

ছোট্ট একটি গণ্ডগ্রাম। মাত্র জনকয়েক ভদ্র-পল্লীবাসী এবং কৃষিজীবী লোকজনের সমাবেশে পরি-বেষ্টিত। অদূরে মজা নদীর জলে বিশীর্ণ জলধারা ঘন সবুজ কচুরি পানার মাঝে স্থানে স্থানে জাগিয়া আছে। তাহারই উপকূলে খড়ের-ছাউনি মাটির আবাস একটি—পরিচ্ছন্ন সাধনায় আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম—পণ্ডিত মশাইকে। সেই দীর্ঘকান্তি বলিষ্ঠ পুরুষ বার্ধক্য-প্রপীড়িত।

আমাকে দেখিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া পণ্ডিত মশাই কহিলেন—অমল তুমি এসেছো? আমি জানি খবর পেলে তুমি নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। বড় আনন্দ পেয়েছি হাকিম হয়েছো শুনে।

অবনত মস্তকে পণ্ডিত মশায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিলাম—বড় সৌভাগ্য আমার, আজ আপনার মতন সাধুজনের সাক্ষাৎ পেলাম। ফুলবাড়ির স্কুলে ছাত্র-জীবনের কয়েকটি মূল্যবান দিনের কথা আমি আজও ভুলতে পারি নি। সাক্ষাৎলাভে ধন্য হব বলে। ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরছিলাম, হঠাৎ এই গ্রামের পথে গাড়ি খারাপ হ'য়ে গেল।

পণ্ডিত মশাই খুসী মনে বলিলেন—একেই বলে ঘটনা-চক্র। আমি কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। শঙ্কর পণ্ডিতকে দেখিয়া—উন্নত বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় চেহারা তাঁহার খর্বাকৃতি হইয়া বেঁকিয়া গেছে। প্রশস্ত ললাটের সেই চিন্তাশীলতায় ছাপ গাঢ় সমীবর্ণে আচ্ছাদিত। স্ফীতকায় নাসিকায় অবসন্নতার নিস্তেজ শ্বাস প্রশ্বাস। চক্ষু দুইটির গভীরতা কেবল থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ পায়।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলাম—স্কুলের চাকরি ছেড়ে নিশ্চয়ই খুব আর্থিক কষ্টে আছেন?

পণ্ডিতমশাই উত্তর দিলেন—না, কষ্ট আর এমন কী? দিন একরকম চলে যায়। কয়েকজন ছাত্রকে উপনিষদ আর দর্শনশাস্ত্র পড়াই। প্রচুর আনন্দে আছি এই নিয়ে। অতীত ভারতের লুপ্ত ঐশ্বর্য প্রকাশ করবার বরঞ্চ যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছি, কিন্তু দুঃখ এই যে ভগবানের মার—দুনিয়ার বার।

পণ্ডিতমশায়ের এ কথায় খুশী হইতে পারিলাম না। বলিলাম—আমার কিন্তু পণ্ডিতমশাই ফুলবাড়ির স্কুলের কথা খুব মনে পড়ে। সেখানে যে শিক্ষা আপনার কাছে পেয়েছিলাম—আমার জীবনের তা প্রকাণ্ড সম্পদ।

আমার কথায় পণ্ডিতমশাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিরাট স্বার্থকতাকে তিনি যেন খুঁজিয়া পাইয়াছেন। খুশীর আধিক্যে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। উচ্চৈঃস্বরে গৃহিণীকে ডাক দিয়া তিনি সগর্বে

প্রকাশ করিলেন—শুনেছো লক্ষ্মণের মা। শোনো আমার শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। মহকুমার হাকিম আজ সে কথা সগর্বে উচ্চারণ করছেন।

কৃশতনু পণ্ডিতগৃহিণী—মলিন শাড়ির আচ্ছাদনে সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ লইয়া আমার সম্মুখে আসিতে লজ্জা পাইতেছিলেন।

পণ্ডিতমশাই কহিলেন—ও আমার ছাত্র অমলকুমার। মহাকুমার হাকিম হলেও ও অমল তোমার পুত্রতুল্য। ওকে দেখে আবার তোমার লজ্জা কিসের ?

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে পণ্ডিতমশায়ের স্ত্রী অগত্যা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আমি অবনত মস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

—পণ্ডিতমশাই, চাকরি ছাড়লেন কেন ?

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যেন ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইলেন। অতীতের কোন জলন্ত নির্যাতনের কাহিনী অগ্নি-অক্ষরে তাঁহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। উত্তেজনার আধিক্যে সর্বশরীর কাঁপিতেছে। রোষবহ্নি জলন্ত চোখ দুটি হইতে ঠিকরাইয়া বাহির হইতে লাগিল। পণ্ডিত-গৃহিণী থামাইয়া দিলেন।

শুনিলাম—সে কথা।

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের একটি জলন্ত কাহিনী।

পণ্ডিতমশায়ের আদর্শে অনুপ্রেরিত তাঁহার এক ছাত্র ঘনবর্ষায় রাজদ্রোহী বিপ্লবীবেশে তাঁহার আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়াছিল। তিনি তাহাকে সযত্নে আশ্রয় দিয়াছিলেন। পুলিশের দল তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার গৃহে হানা দিয়াছিল। গ্রাম্য স্কুলপণ্ডিত অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াও রাজদ্রোহী বিপ্লবী বীরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমশায়ের স্ত্রীর নিকট শুনিতেছিলাম—এই বীরত্ব কাহিনীর আদর্শ স্বদেশপ্রেমিকতা।

রাজরোষে পণ্ডিতমশাই অনেক কিছু বিসর্জন দিয়াছিলেন—স্বল্প আয়ের গ্রাসাচ্ছাদন, গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতার বৃত্তি, আজন্মের কষ্টোপার্জিত যাহা কিছু সঞ্চয় এবং এমন কী তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কয়েকটি আঙুল পর্যন্ত।

লক্ষ্য করি নাই এতক্ষণ পণ্ডিতমশায়ের দক্ষিণ হস্তের কর্তিত আঙুল কয়েকটি। পুলিশের অত্যাচারে চিরতরে বিনষ্ট হইয়া গেছে। দক্ষিণ হস্তে তিনি আর লেখনী ধারণ করিতে পারেন না—এই বেদনাই পণ্ডিতমশায়ের অন্তরকে থাকিয়া থাকিয়া বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে।

অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট উচ্চ রাজকর্মচারী আমি—স্বাধীনতার মূল্য পাইয়াছি প্রচুর, যশ, মান, অর্থ, ঐশ্বর্য—জীবনের যাহা কিছু কাম্য সবই। আর আমার শিক্ষা এবং দীক্ষাগুরু স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অপূর্ব আত্মত্যাগে স্বদেশ-প্রেমিকতায় লাভ করিয়াছেন স্বাস্থ্যহীনতা, বার্ধক্য, আজন্ম-দারিদ্র্য এবং অপযশ। অখ্যাত গণ্ডগ্রামে বসিয়া কায়ক্লেশে সংসার জীবন যাপনের মাঝে ভারতীয় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার মহান আদর্শকে গ্রহণ করিয়া আজও তিনি অমৃতের পুত্রদের সঞ্জীবিত করিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন।

ঘনায়িত সন্ধ্যায় প্রদীপের মৃদু আলোকে পণ্ডিতমশায়ের কাটা আঙুলগুলি দেখিয়া বেদনা-হত কণ্ঠে বলিলাম—পণ্ডিতমশাই, স্বাধীন ভারতে আপনার চরিত্র মহিমান্বিত। আপনার ত্যাগের কথা দেশ জানে না। আজকাল স্বদেশী সরকার আপনাদের ন্যায় আদর্শ স্বদেশ-প্রেমিকদের পুরস্কৃত করছেন। আমি আপনার মাসোহারা সরকারী তহবিল থেকে দেবার ব্যবস্থা করবো।

আমার এ কথায় পণ্ডিতমশাই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বিশ বছর আগেকার ফুলবাড়ির গ্রাম্য স্কুল-পণ্ডিত কণ্ঠে সেই জোরালো সংস্কৃত ধ্বনি পুনরায় দীপ্তকণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—ভিক্ষাম্যাং নৈব নৈব চ। স্বদেশ-প্রেমের পুরস্কার চাইবো দেশ-সেবা করেছি বলে? জানো, অতীত ভারতের চাণক্য পণ্ডিতের আদর্শ? রাজ্য তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি।

পণ্ডিতমশায়ের এ কথার তাৎপর্য অনুভব করিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম।

গ্রামের জমিদার মোটর লইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন—মহামান্য মহাকুমা সাব-ডেপুটিকে সাদরে পৌঁছাইয়া দিতে। কিন্তু গাড়ি ফিরাইয়া দিলাম। ১৫ই আগষ্টের কার্যসূচী আমার শেষ হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয়ের ছাত্রেরা এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাতিয়া উঠিলাম স্বাধীনতা দিবসের উৎসব পালনে। পণ্ডিত মশায়ের গৃহ প্রাঙ্গণে উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

আয়োজন প্রায় শেষ।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার সময় দীপ্তকণ্ঠে শঙ্কর পণ্ডিত ভারতের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বাধীন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যময় সত্তাকে প্রকাশ করিলেন। ফুলবাড়ির গ্রাম্য স্কুলের পণ্ডিতমশায়কে নূতন করিয়া চিনিলাম। অতীত ভারতের ঋত্বিক ঋষি—যাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে অমৃত লোকের আহ্বান—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

রাজরোষ যাঁহার চারিত্রিক মহিমাকে খর্ব করিতে পারে নাই—উন্নতমস্তকে যিনি সকল অত্যাচারকে উপেক্ষা করিয়াছেন, দারিদ্র্য যাঁহার অঙ্গের ভূষণ—অভাব যাঁহাকে কোন দণ্ড দিতে পারে নাই—অতীত ভারতের সেই ঋষি-শক্তিকে স্বাধীনতার বার্ষিকী উৎসবে নিঃশব্দে প্রণাম করিলাম।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

(বহ্নি ও সৌরভ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

১৯০৩ সালের জুলাই মাসে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিলাত যাওয়ার পূর্বে বিডন ষ্ট্রীটে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অনুকরণে এক বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। এখন এই বিদ্যালয়টীকেই আদর্শ শিক্ষালয়ে পরিণত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন। বিদ্যালয়ের নাম হইল "সারস্বত আয়তন"। তাঁহার কল্পনা ছিল জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি এই আয়তন হইতে দলে দলে শিক্ষিত আচার্য সৃষ্টি হইবে এবং আয়তনের শিক্ষিত, দরদী, দেশহিতব্রতী আচার্যের চেষ্টায় সমস্ত দেশের চেহারা বদলাইয়া দেওয়া যাইবে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে রেওয়াচাঁদ আয়তনের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ হইলেন। দিন দিন বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ছাত্রসংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িতে লাগিল।

বসন্তকাল সমাগত হইলে উপাধ্যায়জী জ্ঞান ও পরাবিদ্যাদায়িনীর প্রতীক সরস্বতী পূজা ও বসন্তোৎসব আয়োজন করিবার জন্য বলিলেন। রেওয়াচাঁদ কিন্তু ভুল বুঝিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—জীবন-সহচর ও গুরু ব্রহ্মবান্ধব বুঝি সনাতনী প্রতিমা-পূজক হইয়াছেন। আরও ভুল করিলেন, 'প্রকৃত ক্যাথোলিক কি প্রতীক পূজার সমর্থক হইতে পারে?' ব্রহ্মবান্ধবের যুক্তি ছিল যে 'আয়তনের' অধিকাংশ ছাত্রই সনাতনী হিন্দুসমাজের,হিন্দু ছেলেদিগকে তিনি হিন্দু হিসাবেই শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চাহেন। তাহাছাড়া বাংলার পালপার্বণকে ব্রহ্মবান্ধব অন্য দৃষ্টিতে দেখিতেন, ভগবান সৎ চিৎ ও আনন্দ— এই সকল উৎসবের মধ্যে আনন্দময় ব্রহ্মকে তিনি প্রত্যক্ষ করিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে সাধারণ মানুষও বুঝিতে চাহিলে আনন্দ মুখর উৎসবের ভিতরেই উৎসবের অধিপতিকে উপলব্ধি করিতে পারে। 'আয়তনে' পূজা হইল এবং গান বাজও মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইল। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন সকল কিছুর মধ্যেও নিরালম্ব ঋষির মতন। রেওয়াচাঁদ কিছুতেই গুরুকে বুঝিতে পারিলেন না। সহায় সম্পত্তি দেশ সকল কিছু পরিত্যাগ করিয়া, অনাহার ও মৃত্যু প্রতি পদক্ষেপে উপেক্ষা করিয়া যিনি গুরুকে কায়ার পিছনে ছায়ার মতন অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন আজ তাঁহাকেই নীরবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই সাধু খ্রীষ্টান সকল কিছুই সহ্য করিতে প্রস্তুত—কিন্তু প্রতিমা-পূজক হইতে রাজী হইলেন না। রেওয়াচাঁদই পরে ব্রহ্মচারী অনিমানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'Boy's own home' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রিয় সহচরের অভাব দূর করিবার জন্য প্রবোধচন্দ্র সিংহ, মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী প্রমুখ অনেকেই আগাইয়া আসিলেন, কিন্তু রেওয়াচাঁদের অভাব উপাধ্যায়জী কখনও বিস্মৃত হন নাই।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে উপাধ্যায়জীর অন্যতম কীর্ত্তি বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদনা, এতদিন তিনি ইংরাজী ভাষায় সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেছিলেন। বাংলা সংবাদপত্রের নাম ছিল "স্বরাজ", "সন্ধ্যা" এবং "করালী"। এতদ্ভিন্ন শ্রীঅরবিন্দ পরিচালিত "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখিতেন। উক্ত তিনখানি পত্রিকা এক সঙ্গে কিম্বা পর পর পরিচালিত হইতেছিল তাহা সঠিক বলিতে পারা যায় না। পুলিসের অত্যাচারে তাঁহার নিজস্ব বহু প্রবন্ধ আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে। অনেক সময় সরকারী ফাইল হইতে তাঁহার প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াই সন্তুষ্ট হইতে হয়। আশা হয় স্বাধীনতার স্বাধীন আবহাওয়ায় ভক্ত হৃদয়ের গোপন অন্তস্তল হইতে এই সকল অমূল্যরত্ন লোক লোচনে আবির্ভূত হইবে।

'সুলভ সমাচারের' পরে সাধারণ্যে 'সন্ধ্যা'র প্রকাশ এক অপূর্ব কাহিনী। এই নূতন সংবাদপত্রের মূল্য "সুলভ সমাচারের" ন্যায় ছিল

মাত্র একপয়সা। 'সন্ধ্যা' প্রকাশের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "ভারতে আসিয়াছে আজ পঞ্চম সন্ধ্যা, প্রথম সন্ধ্যায় পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন এবং জড়ভরত এই দেশে গীতা ধর্মের প্রচার করিলেন; রাহুগ্রস্ত দেশে ধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী তিনিই উড্ডীন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সন্ধ্যা নামিয়াছিল এই দেশে বৌদ্ধ-বাদের প্লাবনে, আশ্রম ও ধর্ম চুরমার করিয়া ফেলিয়াছিল সেই প্লাবন, ভারত তাহার সনাতন ক্ষাত্রবীর্য, গেরুয়া ও ভিক্ষাপাত্রে উজাড় করিয়া দিয়াছিল।

তৃতীয় সন্ধ্যা আসিয়াছিল শঙ্করের আবির্ভাবে, পুরাতন ধূলিকণার মধ্য হইতে সুষুপ্ত ভারত জাগ্রত হইল এই সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে। চতুর্থ সন্ধ্যায় হইল ম্লেচ্ছবিজয়, রাজা ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছাচার পদে পদে, সহ্য না করিয়া উপায় নাই। পঞ্চম সন্ধ্যার বাণী হইবে ম্লেচ্ছাচার হইতে দেশকে রক্ষা, ভারতকে পুনরায় তাহার সনাতন, শাশ্বত-ধর্মে অভিষিক্ত করো—উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধিত। উঠো, জাগো প্রাপ্য বর লাভ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হও। দেশের আপামর সকলেই যাহাতে বুঝিতে পারে তাহার জন্য পত্রিকার ভাষা হইল সাবলীল ও জলদ। মুটে, মজুর এবং দোকানীরাও যাহাতে অসুবিধা বোধ না করে সেজন্য বক্তব্য হইল স্বচ্ছ ও সহজ। কাজেও হইল তাহাই; দৈনিক প্রায় ১০০০০ "সন্ধ্যা" ছাপা হইত; জমিদার, মধ্যবিত্ত হইতে সাধারণ নরনারী সকলেই 'সন্ধ্যা' পড়িত। ভাষার বক্তব্য কড়া হইত কেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া উপাধ্যায়জী বলিতেছেন, "আমরা সাধাসিধে বুলিতে প্রাণের কথা লিখি তাই ইহা সভ্য বাবুদের ভাল লাগে না। সভ্য বাবুরা বেঁধে-ছেঁদে কথা কহেন ও লিখেন, আমরা কিন্তু হৃদয়ের আবেগ অতো সভ্য ভাবে প্রকাশ করিতে পারিব না; তাই সভ্য বাবুদের আমরা দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় লই"। "আমাদের স্বাভাবিক বুলি এত চোয়াড়ে নয়—তবে যখন রাগ দেখাতে হয়, হাঁক ডাক করিতে হয় তখন মিষ্টি মিষ্টি বলিলে চলিবে না। দেশের রোগটাও কিছু বিষম হইয়াছে তাই মকরধ্বজের উপর চটী খাওয়াইতে হইবে, এ সময় কি ভেলসায় চলে? দেশের চারিদিকে তমোভাব—অসাড়তা, এখন হাত বুলাইলে চলিবে না, খোঁচা দিতে হইবে।"

"সন্ধ্যা" চারিদিকে আলোড়ন তুলিয়াছে এমন সময় পর পর কয়েকটী ঘটনা ঘটে; একজন ইংরেজ পাদরী কাকু'হার গীতা ও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়া কয়েকটী বক্তৃতা দেন। খড়্গপুরের ফিরিঙ্গি টিকেট-কলেক্টার হরিপ্রিয়া দে নাম্নী এক মহিলার উপরে অত্যাচার করিবার অভিযোগে ধৃত হয়, লর্ড কার্জনের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা, (২১, ২, ০৫)। ব্রহ্মবান্ধব একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। আর্য্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বেদান্তের নির্য্যাস হইল গীতা, সেই গীতা ও পার্থসারথির অপপ্রচারে চতুর্দিকে প্রতিবাদ সভা হইতে লাগিল। বর্ত্তমান চৌকিদারী প্রথা যে কত অসহায়, প্রাচীন পঞ্চায়েৎ প্রথা ছিল শক্তিশালী, কারণ জনসাধারণের শক্তির উপর ছিল নির্ভরশীল। তিনিই প্রথম আমাদের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিলেন 'গোলামখানা'—কারণ এখানকার শিক্ষার বিষয় বস্তু হইল 'গোলাম' ও 'গোলামী' জীবনের ভাবধারা সৃষ্টি।

কথা ও বার্ত্তায় তিনি এখন পর্য্যন্ত চরমপন্থী হন নাই কিন্তু ক্রমেই প্রাসঙ্গিক ঘটনা তাঁহাকে চরমপন্থী করিয়া তুলিল। ১৯০৫ সালের ২০শে অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা হয়। চতুর্দিকে যেন আগুন জ্বলিয়া গেল। ভাঙ্গা বাংলা জোড়া দেওয়ার জন্য 'সন্ধ্যা" ও 'যুগান্তর অফিসে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক 'ভর্ত্তি হইতে লাগিল। 'সন্ধ্যা' কার্য্যালয়ের কর্মব্যস্ত জীবন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই উপাধ্যায়জীর প্রেরণায় স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা লইলেন। মুক্তির ইতিহাসে এই জাগরণ এক উজ্জ্বল অধ্যায়। কলিকাতা মহানগরীর এক অখ্যাত নীরব গলি 'শিবনারায়ণ দাসের লেন' ত্যাগী, কর্মি ও নবজীবনের স্পন্দনে গম্‌গম্‌ করিতে লাগিল। ব্রহ্মবান্ধব অগ্নিবর্ষী ভাষায় লিখিতে লাগিলেন 'লর্ড কার্জন সোজা লোক নহে, গভীর জলে তাহার বাস', 'হিন্দু ধর্মের প্রতি লর্ড কার্জনের আক্রমণ,' 'কার্জন আমাদের শিকলকে শক্ত করিয়া তুলিল' এবং আরও কত। শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় ঘোষণা বাহির হইল। বিদেশী সকল কিছু বর্জন করো, দেশীয় আচার নিষ্ঠা মাথায় তুলে লও। ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও কত মহারথী আসিয়া পুরোভাগে দাঁড়াইলেন। সে এক অপূর্ব উন্মাদনা, জাতীয়তার ভাব-বন্যায় বঙ্গদেশে উজান বহিতে লাগিল'। ব্রহ্মবান্ধব লিখিলেন, তিনটী কথা ভুলিও না। প্রথম ফিরিঙ্গীর নিকট হইতে কিছু কিনিও না। দ্বিতীয় ফিরিঙ্গী ব্যবসায়ীর নিকট যাইবে না। তৃতীয় ফিরিঙ্গী বিদ্যালয় বর্জন করো এবং দেশে দেশে 'সারস্বত আয়তন' গঠন করো। তিনি লিখিয়া চলিলেন—লাট সাহেব বদলি হইলে কিবা আসে যায়, এক হাটের গরু অন্যহাটে বিক্রয় হইবে। লাল পাগড়ীর ভয় দূর করো ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার গৌণ উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও কেরাণী তৈয়ারীর বুনিয়াদের উপর এই বৈদেশিক শিক্ষাবিধি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই দেখা যায়, বিশেষজ্ঞ প্রতিভাবান যুবকগণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট না হইয়া লালদিঘীর চতুর্দিকে—না হয় ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অলিগলি 'কেরাণী-গিরি'র আশায় অবিশ্রাম ঘুরিয়া মরে। কিসে দেশের কল্যাণ বাড়ে, শিল্প ও শিল্পীর দল গড়িয়া উঠে, আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাবধারা বাড়িয়া উঠে, এই জন্য "ন্যাসনাল কাউন্সিল অব এডুকেসন" প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুস্থানে এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় 'সারস্বত আয়তন' গড়িয়া উঠে। জাতীয় মানসিক দুর্বলতায় অধিকাংশ এই সকল প্রতিষ্ঠান দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয় নাই, তত্রাচ যাদবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্বদেশী আন্দোলনের বিজয়-নিকেতন হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। যে সকল

মহাপ্রাণের আত্মত্যাগে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি পড়িয়া উঠে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম।

সরকার ভাবিলেন, কয়েকজন রাজদ্রোহীর কার্য্যকলাপে বিপুল জনতার রাজভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেই উৎসমুখ পুনরায় উন্মুক্ত করিবার জন্য যুবরাজকে আনিবার ব্যবস্থা সরকারী লালফিতার কেতাবী মহল হইতে স্থির হইল। উপাধ্যায়জী লিখিলেন "যুবরাজ আসিবে, যুবরাজ ফিরিয়া যাইবে—আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে, দেশ ও জাতির উপরে যে লুণ্ঠন চলিতেছে তাহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে।" তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে দেশবাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আর্য্যজাতি, আর্য্যদের এই পবিত্রভূমি। যেখানে এবং যাহাদের মধ্যে ভগবান বহুবার লীলা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই পবিত্র ভূমি ও তাহার অধিবাসী কখনও ধ্বংস হইতে পারে না। আর্য্যদের ভাষা ও তাঁহাদের যুগ যুগান্তের জ্ঞানও বিফলে যাইতে পারে না। ফিরিঙ্গির সহবাসে যে সকল পাপ তোমাদের স্পর্শ করিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, দুঃখ দৈন্য সহ্য করো তবুও ফিরিঙ্গির পায়ে মাথা নোওয়াইবে না, দেখিবে দেশ আবার বাঁচিয়া উঠিবে"।

পূর্ণ স্বাধীনতার উদাত্ত ঘোষণা উপাধ্যায়ের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হইয়া উঠে। "সূর্য্য ও চন্দ্রের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া জানাই যে আমি অন্তরের গোপনতম স্থান হইতে স্বাধীনতার বাণী শুনিতে পাইতেছি। বসন্ত সমাগমে গুল্মাদির যেমন নবকলেবর হয় ভারতের শাশ্বত ক্ষাত্র-শক্তির পুনরভ্যুত্থানের লক্ষণ চতুর্দিকে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমার দেহেও নবযৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শুষ্কবৃক্ষে কুসুমের উদ্গম হয় না, আমাদিগকেও দেহে মনে সরসতা, স্বাধীনতা—ফেরঙ্গ মনোভাব হইতে স্বাধীনতা ও দাস্যবৃত্তির স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। আমরা চাই সোণার ভারত—যে ভারতে কপিল, গৌতম, বশিষ্ঠ ও ব্যাস, রঘু ও দিলীপ, রাম এবং যুধিষ্ঠির ছিলেন সেই স্বর্ণময়, ভারতের প্রত্যাবর্তন চাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই যে দাস-মনোভাব বিদূরিত হইবে এমন কথা নাই। রাজপুত জাতি সম্বন্ধে প্রতাপের বিশ্বাস, হিন্দু পুনরুত্থানে প্রয়াসী শিবাজীর অনুরাগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। দাদাভাই নৌরজীর 'স্বরাজ' বিলাতী আমদানী, আমরা এই ফেরঙ্গ স্বরাজ চাইনা—আমরা চাই শিবাজী মহারাজের কল্পিত স্বরাজ।

বাংলা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় ১৬ই অক্টোবর। এই দিবসকে জাতির 'শোকদিবস' বলিয়া ঘোষণা করা স্থিরীকৃত হয়। বাংলার বিচ্ছিন্ন অংশদ্বয়ের সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বসূচক রক্তবর্ণ সূত্র পরস্পরের মণিবন্ধে বন্ধন করিয়া প্রাচীন ভারতীয় প্রথার অনুরূপ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। ঐতিহাসিক যুগে রাজস্থানের কোন রাণী বিপদে পড়িয়া দিল্লীর বিদেশী বাদশাহকে এই 'রক্তবর্ণ' সূত্র পাঠাইয়া দিয়া 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করেন, অভিপ্রায় বিদেশী ভাইও যেন বিপন্না ভগ্নীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন, এখানেও হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান প্রত্যেক ভাই, ভাইএর মণিবন্ধে রক্তসূত্র বাঁধিয়া, সারাদিন উপবাসী থাকিয়া বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের তালে রাজপথ প্রদক্ষিণ করিয়া পরিচিত অপরিচিত ধনী দরিদ্র সকলের প্রাণে ভ্রাতৃত্বের নবভাবধারা সৃষ্টি করে। দোকানী চলিয়া আসে তাহার দোকান ছাড়িয়া, অফিস আদালত বন্ধ করিয়া উকিল মোক্তার এবং কেরাণীকুল ও সে ভাববন্যায় আপ্লুত হয়। দেশের সর্বস্তর একই ভাবসূত্রে উদ্জীবিত হয়। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন এই রাখিবন্ধন উৎসবের প্রধান পুরোহিত।

১৯০৬ সালে উপাধ্যায়জী বিশেষ আড়ম্বরের সহিত শিবাজী-উৎসবের আয়োজন করেন। মহামতি তিলক, খাপার্দে, মুঞ্জে প্রমুখ নেতারা কলিকাতায় আসিলেন। এই উপলক্ষে এক স্বদেশী মেলা সংগঠিত হয়। এই মেলায় সিংহবাহিনীর পদতলে প্রার্থনারত শিবাজী-মূর্তি দর্শকগণের চিত্ত আকৃষ্ট করে। অধিকন্তু সপ্তাহব্যাপী মাতৃপূজার ব্যবস্থা থাকায় বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। এই সূত্রে স্বদেশী ও মাতৃপূজা চতুর্দিকে অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়।

শিবাজী উৎসবের কয়েকদিন পরেই বন্দেমাতরমের ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের স্মৃতিদিবস কাঁঠালপাড়ায় প্রতিপালিত হয়। ব্রহ্মবান্ধবের উদ্যোগে এক ষ্টীমার-ভর্তি সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক কাঁঠালপাড়ায় গমন করেন। ষ্টীমার যখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এর বাড়ীর সামনে দিয়া যাইতেছিল তখন সমবেত বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সুরেন্দ্রনাথ নামিয়া আসেন এবং সকলকে উৎসবান্তে তাঁহার বাড়ীর ঘাটে নামিতে বলেন। এই কথা লিখিবার উদ্দেশ্য—তখনও রাজনীতিতে পঙ্কিলতা ঢোকে নাই। সুরেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব রাজনীতিক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পৃথক হইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু 'মানুষ' হিসাবে তাঁহাদের মনে কোনও মলিনতা প্রবেশ করে নাই, বৈকালের প্রীতি সম্মিলনীতে সকলে ইহাই দৃঢ় ভাবে উপলব্ধি করেন।

তাঁহার ধারণা ছিল ধর্ম ও সমাজ আলাদা। ভারতবাসী খৃষ্টীয়ান হইলেও সমাজচ্যুত না হইতে পারে। এই কারণে তিনি নিজকে বৈদান্তিক খৃষ্টীয়ান ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন। "ধরার ভার", "অহিংসা", "বাঙ্গালীর নিজস্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রকৃতি শক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে অহিংসা তখনই সম্ভব, যখন চতুর্দিকের আবহাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ফিরিঙ্গি কবলে নিপাতিত জাতির সকল কিছুই আজ অসহজ, অসরল। আজ প্রয়োজন জাতির 'কুল কুণ্ডলিনী' মাকে জাগ্রত করা। 'মা' না জাগিলে কি সন্তান জাগিতে পারে?

"ফিরিঙ্গি আমাদের রাজা নয়, নায়েব সুবামাত্র; ইচ্ছা থাকিলে আমাদের ঘরে আমাদের 'রাজ' প্রতিষ্ঠা কর্তে কোনও বাধাই নাই।"

"রান্নাঘরে কুকুর ঢুকলে কি করো। হাঁড়ি কলসী দূর করে ফেলতে হয়, কিন্তু তার আগে কুকুরটাকে তাড়ান দরকার। কুকুর পালিয়ে যাবার সময় মুখ খিঁচিয়ে ত দেবেই, ভয় করো না লাঠি তোলো এবং জোরে মারো।"

"ফিরিঙ্গি বড় দয়ালু, মুখে গজায় লম্বা দাড়ি
শীতকালে খাই মিঠে আলু"

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কত উল্লেখ বুঝিব, ঠাণ্ডা গরম, সকলরকমে দেশের যুবজনচিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ফিরিঙ্গি সরকারের ও টনক নড়িল। 'যুগান্তর' ও বন্দেমাতরম্' পত্রিকার নামে শমন জারী হইল। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্রের নামে মোকর্দমা সুরু হইল। ব্রহ্মবান্ধব বুঝিতে পারিলেন তাঁহারও পালা আসিতেছে। কালীঘাট মন্দিরে তিনি শাদা ও কালো রং এর দুইটী পাঠা পাঠাইয়া পূজা দিতে বলিলেন, শাদা পাঁঠা হইল ফিরিঙ্গির যত শুভগুণ, কাল হইল তাহার যত আবিলতা। ব্রহ্মবান্ধবের খেয়াল হইল—জগজ্জননী যদি ভক্তের এই উপাচার গ্রহণ করেন তাহা হইলে ফিরিঙ্গির কর্মশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহার এদেশের বাসও টুটিয়া যাইবে। চঞ্চল সন্তানের যখন যা খেয়াল তাহা করিতেই হইবে। দিন যতই এগিয়ে আসছে খেয়ালের পাখ্‌নাও যেন দ্রুত উড়িয়া চলিয়াছে। মনে হইল বহুদিন ফিরিঙ্গির সহিত বসবাস করিয়াছেন, একই টেবিলে ফিরিঙ্গি-স্পৃষ্ট ফেরঙ্গখানা খাইয়াছেন, বিশুদ্ধ ভারতীয় হিসাবে তিনি ফিরিঙ্গি সহবাসে পতিত হইয়াছেন, সমাজধর্ম অনুসারে তিনি সাধারণের দৃষ্টিতেও ব্রাত্য। জীবনে যিনি অন্যায়ের সহযোগিতা করেন নাই, তিনি কি আজ জীবন-দেবতার ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া সহচরদের ইচ্ছার নিকটে আত্মসমর্পণ করিবেন? তাঁহার তিরোভাবের দুই মাস পূর্বে ১৯০৭ সালের 'টুয়েন্টীয়েথ সেঞ্চুরী'তে লিখিতেছেন, 'বিশুদ্ধ পানীয় জল বাহিরের নোংরার সংস্পর্শে এসে তাহার পবিত্রতা হারায়, পানীয় হিসাবে জল তখন অযোগ্য হয়। ঠিক তেমনি ফিরিঙ্গি ও বিদেশীর সহিত সহভোজনে কিম্বা সহবিবাহে সমাজ ও ধর্মের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়। দেশহিতৈষী ও দেশপ্রেমিক হিসাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজ রক্ষার দায়িত্ব আমারও আছে। হিন্দু সভ্যতা বহু ঝড় ঝাপ্টা সহ্য করিয়াছে, নূতন করিয়া ক্ষতি করিবার অধিকার কি আমার আছে?" উপাধ্যায়জী পুনরায় অস্থির হইয়া পড়িলেন, পরিশেষে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের নিকটে উপস্থিত হইয়া যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইলেন। উপাধ্যায়জী এই কার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত করিলেন যে তাঁহার জীবনে সমাজ ধর্মের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

'সন্ধ্যা' ও 'করালী' কাগজে আগুনের ভাষায় প্রবন্ধ লিখিত হইতে লাগিল। "কোন রাজাই সকল লোককে জেল দিতে পারে না। তোমাদের থানা ও পুলিশ তৈরী করো। লাঠি, সড়্‌কী, দা'—যাহার যা আছে হাতের কাছে রাখো। যেখানে ৫ জন ভদ্রলোক, সেখানে ৫০ জন চণ্ডাল, বাগদী তৈরী রাখো। আঘাত যেখানেই পাবে সেখানেই আঘাত করো। সভা সমিতিতে কিছুই হবে না।" "জননীর আদেশ এসেছে জল ঘোলা করো আর ফিরিঙ্গি তাতে ডুব দিক।" "জেনে রাখো হিন্দুর মৃত্যু হয় না, বুলেটে ও নয়। তোমার মতন, পোকা মাকড়, মর্ত্তে পারো, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুও হিন্দু জাতির মৃত্যু নাই। মেরে মর্ত্তে তোমার স্বর্গবাস, তোমার কীর্ত্তিতে তোমার জাতির উত্থান হবে। যতই ফেরঙ্গপনা করো ততই তোমার ও তোমার জাতির দুর্বলতা বেড়ে যাবে।"

এর পরের লেখা "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" প্রকাশে 'সন্ধ্যা' কার্য্যালয়ে খানাতল্লাসী হয়। ব্রহ্মবান্ধব ও তাঁহার কর্মচারীদের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এবং আসামীদের নামে পরোয়ানা জারী হয়। ব্রহ্মবান্ধব যখনই জানিতে পারিলেন পরোয়ানা বাহির হইয়াছে নিজেই তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করিলেন। ফিরিঙ্গির আদালতে গেরুয়া বস্ত্রের অপমান হইতে পারে চিন্তা করিয়া শাদা ধুতি ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া আদালতে হাজির হইলেন ও বিচারক কিংসফোর্ডের সামনে দাঁড়াইয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইলেন। দেশবন্ধু (তখনও দেশবন্ধু হন নাই) চিত্তরঞ্জন দাশ হইলেন তাঁহার কৌন্সুলী।

"সন্ধ্যা"র প্রকাশ, প্রচার এবং সম্পাদকীয় দায়িত্ব আমার। ১৩ই আগষ্ট ১৯০৭ সালে সন্ধ্যায় প্রকাশিত "এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" প্রবন্ধের লেখক আমি। স্বদেশের স্বরাজ সংগ্রামে আমি ঈশ্বর নিয়োজিত বলিয়া বিশ্বাসী। যাহারা বর্ত্তমানে আমাদের দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা স্বরাজ-সংগ্রাম তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূল। কাজেই এই ফিরিঙ্গির আদালতে, বিচার প্রহসনে, আমি অংশ লইতে অনিচ্ছুক।"

কিংসফোর্ড এই বিবৃতি শুনিবার পরে উষ্মার সহিত বলিয়াছিলেন "অহোঅহো", উপাধ্যায়জী জামিনে খালাস হইলেন। দুই পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রভৃতিতে অনেক দিন গড়াইয়া গেল, সাক্ষীসাবুদের জেরায় চিত্তরঞ্জন সময় লইতে লাগিলেন, কিন্তু কিংসফোর্ড পূজার ছুটীর পূর্ব্বেই বিচার শেষ করিতে চাহেন। তিনি ফতোয়া দিলেন বিচারালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বিচার চলিবে। আসামী পক্ষের কৌন্সুলী রাজী ত হইলেন না, বরং 'ব্রীফ' পরিত্যাগ করিলেন। কিংসফোর্ডের জিদ দেখিয়া তিনি অপর বিচারকের এজলাশে মোকর্দমা স্থানান্তরের জন্য হাইকোর্টে "মোশন" দিলেন, হাইকোর্ট আবেদন অগ্রাহ্য করিলেও নানা কারণে পূজার ছুটীর পূর্ব্বে মোকর্দমা শেষ করা সম্ভব হইল না, ২০।৮।০৭ তারিখে 'সন্ধ্যা'য় 'সিডিশানের হুড়ুম দুড়ুম ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম্" এবং ২৩।৮।০৭ তারিখে "প্রেমিকেরা আমাকে নিয়ে যেতে চায় বৃন্দাবনে" প্রকাশিত হয়। ইহার পরে সুশীল সেন নামক একটী বিদ্যালয়ের বালককে ১৫ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দেওয়ায় "সন্ধ্যা পত্রিকায়" "কশাই পাজী কিংসফোর্ড, পাজী, পাজীর পাজী" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত কয়েকটী প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব, প্রিণ্টার ও ম্যানেজারের নামে দ্বিতীয় রাজদ্রোহের অভিযোগ দায়ের হইল; কিন্তু উপাধ্যায়জী বলিলেন "আমাকে কারাগারে রাখে এমন শক্তি ফিরিঙ্গির নাই"।

ব্রহ্মবান্ধব এই সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ তাঁহার চিরসঙ্গী ছিল। সিডিশানের মোকর্দমার দিনের পর দিন কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ঐ রোগ সাংঘাতিক বাড়িয়া গেল। অসুস্থ জানিয়া তাঁহাকে বলা হইয়াছিল—বসিবার প্রয়োজন থাকিলে যথারীতি আবেদন পাইলে বিবেচনা করা হইবে। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি জানাইয়া দিলেন "ফিরিঙ্গির নিকটে ভিক্ষা, কখনই না"।

রোগ ক্রমেই উপশমের দিকে না যাইয়া প্রবলতর হইল। ২১শে অক্টোবর সোমবারে কার্ত্তিকবাবুর বাড়ী হইতে তিনি ক্যাম্পবেল

হাসপাতালে ভর্ত্তি হন ; হাসপাতালে যাওয়া কালীন পোষাকের বৈশিষ্ট্য ছিল, খালি পা ধুতি চাদর ও উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। হাসপাতালের রেজিষ্টারে লিখিত আছে—বি, উপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ, ধর্মের ঘরে কিছু লিখা নাই। প্রবাদ ধর্ম সম্পর্কে তাঁহাকে তিনবার প্রশ্ন করা হয় কিন্তু তিনি উত্তর দেন নাই। তাঁহার মতামত যে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং বিদেশী রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। ২২শে অক্টোবর ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র 'অপারেশন' করেন। অপারেশন খুবই নিরাপদ হইয়াছিল। তিনি সুস্থই হইতেছিলেন। বৃহস্পতিবারে তিনি আরও সুস্থবোধ করেন এবং শীঘ্রই বাড়ী ফিরিতে পারিবেন এইরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করেন। শনিবার "সন্ধ্যা"র দ্বিতীয় রাজদ্রোহ অভিযোগের সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া যায়। তাঁহার প্রফুল্ল আনন ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্য চিন্তান্বিত হইয়া পড়ে। জামিনে খালাস থাকা অবস্থায় এবং রোগশয্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তাঁহার দায়িত্বে কর্তৃপক্ষ হয়তো সম্মত না হইতে পারে? তাহা হইলে কি চিরসঙ্গী নিত্য সহচরদিগকে তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন না! শনিবারই সন্ধ্যার ম্যানেজার ও প্রিন্টার গ্রেপ্তার হন। এই দিন প্রায় ৫০জন অনুগত বন্ধুবান্ধবের সহিত তিনি কথা বলেন। কিন্তু রাত্রি ৮টার পর হইতে তাঁহার ঘন ঘন অবসাদ ও মূর্চ্ছা আরম্ভ হয় ; মাঝে মাঝে জ্ঞান হইলেও ব্যথার আবেগে তিনি তাঁহার প্রিয় ঠাকুরকে ডাকিতেন, "ঠাকুর ঠাকুর"! ব্যারামের গতি ধনুষ্টঙ্কারের মতন দাঁড়ায়!

ডাক্তারদের মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ২৭শে অক্টোবর রবিবার সকাল ৮৷৷টায় সব শেষ হইয়া গেল। বিদেশী বিচারকের ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া তেজোময় চিরমুক্ত আত্মা অনন্তধামে চলিয়া গেল। স্বদেশবাসীর জন্য রাখিয়া গেলেন তাঁহার অগ্নিময় জীবনকাহিনী! সন্ধ্যা পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হইল ইহাই সশরীরে স্বর্গারোহণ—ইহাই তেজস্বীর ইচ্ছামৃত্যু—ইহাই কর্মবীরের অবসান।" উপাধ্যায়জীর বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৭ বৎসর।

দলে দলে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান শেষবারের মত তাঁহাদের প্রিয়তম নেতাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। দোকান-পাট বন্ধ হইয়া গেল। মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যে চার পাঁচ হাজার লোকের শোভাযাত্রা শবানুগমন করিল, তখনকার দিনে চার পাঁচ হাজার লোকের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের তালে তালে ক্যাম্পবেল হাসপাতাল হইতে প্রিয় মহানায়ককে লইয়া নিমতলা ঘাট যাত্রা এক অচিন্তনীয় অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান। বিদেশী দেখিল—জাগ্রত জনমত কোন দিকে, স্বদেশ প্রেমিক নেতার চিতাগ্নিতে অগণিত জনতা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেন। তাঁহার লেখনীপ্রসূত "সন্ধ্যা" ও "করালীর" প্রবন্ধগুলি অর্পিত হইল। সেই অগ্নি শিখার সম্মুখে অবনত হৃদয়ে শত শত যুবক স্বদেশ উদ্ধারের এতে অগ্নি দীক্ষা লইল। মহাপুরুষের মহামরণে নূতন নূতন অগ্নি শিখা তাঁহার স্থান গ্রহণ করিল।

মৃত্যুর এক মাস পূর্বে কালীঘাট নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া ভাবাবেগে আপ্লুত উপাধ্যায়জী বলিয়াছিলেন "আমি ত মা চিরকালই তোমার দুরন্ত ছেলে, কখন ত কাহারও বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি নি, এই প্রার্থনা মা তোমার চরণে, দেশের কাজ করিতে করিতে, সত্যের প্রচার করিতে করিতে জেলে যাইবার পূর্বে যেন আমার এই দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়!" মা তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন।

হাসপাতালে থাকাকালীন বুধবারে (২৩।১০।০৭) অধ্যাপক ভাস্বানী তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন; ভাস্বানীজী নববিধান সমাজের একজন উল্লেখযোগ্য সভ্য এবং কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভাস্বানীজী এখনও জীবিত এবং সিন্ধু দেশে 'সাধু' বলিয়া সুপরিচিত। সাধু ভাস্বানীজীর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উপাধ্যায়জী বলিয়াছিলেন "**Wanderful have been the Vicissitudes of my life, wonderful have been my faith**, আশ্চর্য্য আমার জীবনের বিচিত্র পরিবর্ত্তন, আশ্চর্য্য এই বৈচিত্র্যময় জীবনের মাঝে আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস", সত্যিই অদ্ভুত বিচিত্র বর্ণগন্ধময় কর্মশীল জীবন নাট্য এই বিশ্বাসী ভক্তের। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে বিশ্বাসী ভক্তের একটানা উদাসী সুর এতই অসাধারণ যে সাধারণের দৃষ্টিতে আপাতঃবিরোধী ও অবোধ্য মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

ভারতের সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার, পরিচর্য্যা ও রক্ষা করিবার জন্য অগণিত নরনারী আত্মসুখ বিসর্জন করিয়া অজানা পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন, শয়নে স্বপনে অর্দ্ধজাগরণে মহাজননীর ব্যথা তাঁহাদিগকে কর্মপ্রবণ ও অস্থির রাখিয়াছিল ও বিচিত্র নরনারীর দুঃখকষ্টে যুগের আলো দেখাইবার জন্য অস্থি পঞ্জর জ্বালাইয়া চলার পথ তাঁহাদিগকে আলোকিত ও সুগম রাখিতে হইয়াছিল, ব্রহ্মবান্ধবের কর্ণে ও কি সেই দ্যুতিময় মহাবাণী প্রবেশ করিয়াছিল? স্বাধীন ভারত এই মহাপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করুক।

"অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ,
পশিত কি অভিশাপনিদ্রা ভেদ করে
কর্ণে তোর—জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধ জাগরণে,
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্য নিদ্রাহীন ব্যথা মহাজননীর।"*

---

* ব্রহ্মবান্ধবের যে সকল কথা প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, অশেষ পরিতাপের বিষয় যে ঐ গুলি তাঁহার 'কথা'র ছায়া মাত্র, তাঁহার নিজস্ব বাণীর অধিকাংশ আজও লোকচক্ষুর অগোচরে। রাজদ্রোহ মামলায় সরকারের নথিভুক্ত বিষয়ের কয়েকটী বাংলা অনুবাদ এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পাট ও পীঠ

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

শারদোৎসবের স্মরণিকা

আমোদ-প্রমোদের রাজ্যে মরশুমের সুরু শারদীয় মহাপূজার গোড়া থেকেই। বাঙলা দেশের প্রমোদ-পল্লীতে এ প্রথার কখনও ব্যতিক্রম হয় নি। পূজোর সময় থেকে বড়দিন ও নববর্ষ অতিক্রম করে ইংরাজের ইস্টার-পর্ব পর্যন্ত এই একটানা সাতটি মাসকে ব্যবসায়ের পক্ষে 'Harvest Season' বলা যায়।

উৎসবের স্মরণিকা হিসেবে আজকাল রঙ্গালয়ে মাত্র ২।৩টি নতুন নাটকের উদ্বোধন সম্ভাবনার আভাষ পেলেও, সিনেমার রাজ্যে যে সমারোহের সাড়া পড়ে গেছে, তার তুলনায় রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণ যৎসামান্যই।

দীর্ঘকাল পরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এবারে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটির নাম "পরিচয়"। বিষয় নির্বাচনে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও কলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশিরকুমারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এবং প্রধান ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয়-সাফল্যে এই নাটকটি ইতিমধ্যেই দর্শকবৃন্দের রসবোধকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছে। আগামী সংখ্যায় এই নাটকটি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

বাঙালী, অবাঙালী নির্বিশেষে সর্বস্তরের দর্শকের মনোরঞ্জন করবার উপযোগী নতুন ছবির সংখ্যা এবারে অপরিমেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে নিত্য নতুন 'রিলিজ'-এর বহর দেখে মনে হয় —স্থানীয় ছবিঘরের প্রমোদ-পল্লীতে, অতীতের সব রেকর্ড অতিক্রম করে যাবে।

সামাজিক ছবির দুরবস্থা

মুখর-ছবির পর্দায় সামাজিক বাঙলা ছবিগুলির আবেদন ও জনপ্রিয়তা যে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, এটা কয়েক-মাস ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সামাজিক ছবির কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় আবেদনের অভাব এবং বৈচিত্র্য-হীনতাই অধিকাংশ বাঙলা ছবির অকালমৃত্যুর কারণ বলে অনুমান করা যায়। যেমন শুধু জোরালো সংলাপের উপর ছবি দাঁড়ায় না তেমনি ঘটনাবলীর পরিকল্পনা ও ব্যঞ্জনার মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সঞ্চার না করতে পারলে, তার নাট্যরস দানা বাঁধে না।

বোধ করি এই কারণেই অধিকাংশ চিত্রনির্মাতাগণ সাময়িকভাবে সামাজিক ছবি তৈরী থেকে বিরত হ'য়ে, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং Costume picture প্রযোজনার দিকে অবহিত হয়েছেন। 'স্বামিজী'-ছবির সাফল্যও অনেককে প্রলুব্ধ করে তুলেছে, জীবনী চিত্র গঠনের দিকে। এটা খুবই আশার কথা সন্দেহ নেই।

জাঁকজমকপূর্ণ Costume জাতীয় চিত্র প্রযোজনায় অনেক ফাঁকা বলে এবং এই জাতীয় নাটকের বহুরকম দোষ-ত্রুটির অনেকটা mounting-এর গুণে ঢাকা পড়ে যায়। 'দেবী চৌধুরাণী' তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কিন্তু সামাজিক ছবিতে কোন কৃত্রিমতা বা মুষ্টিযোগের স্থান নেই। নির্দোষ চিত্র-নাট্য, চরিত্রানুযায়ী নিখুঁৎ অভিনয় এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ-নৈপুণ্য ব্যতীত অত সহজে কিস্তিমাৎ করা যায় না। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'— উপন্যাস হিসেবে অনবদ্য। বাণী-চিত্রাকারে তার রূপারোপের ব্যর্থতা প্রয়োগ-শিল্পীর অক্ষমতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দেবকী বসু ও জ্যোতির্ময় রায়

এবারে দুটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে লেখা, দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হ'ল। এর প্রথমটির লেখক স্বনামধন্য চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসু এবং পরেরটি লিখেছেন, বর্তমান প্রগতি-সাহিত্যের অন্যতম অগ্রণী "উদয়ের পথে"-র বিখ্যাত গ্রন্থকার ও "দিনের পর দিন"—চিত্রের পরিচালক শ্রীজ্যোতির্ময় রায়। ছায়া-ছবির দর্শক-মহলে এবং রসবেত্তার কাছে এঁদের নতুন প্রয়োজন নিষ্প্রয়োজন।

গল্প-লেখকের সাফল্য

ছবির জন্য যাঁরা গল্প লেখেন, তাঁদের মধ্যে mass-production-এর দিক দিয়ে শ্রীনিতাই ভট্টাচার্যের দাবী অগ্রগণ্য। নিতাইবাবু গত তিন বৎসরে মোট তেরোটি গল্প সরবরাহ করেছেন। তার মধ্যে চিত্রাকারে তিনখানি ছবি বক্স-অফিস 'Hit' বলে গণ্য হয়েছে। এ তিনখানির নাম 'সংগ্রাম', 'স্বপ্ন ও সাধনা' এবং 'সমাপিকা'। এই সাফল্যের পর থেকে নিতাইবাবুর লেখনীর যে বিরাম নেই, একথা বলাই বাহুল্য।

স্বাধীন দেশের চলচ্চিত্র

শ্রীদেবকীকুমার বসু

আজ আর বোধহয় কোন শিক্ষিত ভারতবাসীরই অজানা নাই যে, জাতীয় সংগঠনে চলচ্চিত্র সংবাদপত্রের মতনই শক্তিমান। সম্ভবতঃ চলচ্চিত্রের শক্তি বেশীই, কারণ জন-সাধারণের উপর চলচ্চিত্রের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও তীব্র। সংবাদপত্র পড়বার শিক্ষা না থাকলেও চলচ্চিত্র দেখে অনুপ্রাণিত ও উত্তেজিত হবার জন্ম কোন শিক্ষারই প্রয়োজন হয় না এবং দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের জন্মভূমি আজও কোটী কোটী নিরক্ষর সন্তানেরও জননী। চলচ্চিত্র যে-কারণে আজ পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে বড় entertainment সেই কারণেই চলচ্চিত্র আজ শিক্ষা-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ ও গৃহজীবনের ভাঙ্গাগড়ার সবচেয়ে বড় শক্তি।

স্বাধীন ভারতে এই শক্তিকে কি ভাবে রাষ্ট্র, সমাজ ও গৃহজীবনে প্রয়োগ করা উচিত সে আলোচনা আজ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নয়—বরং একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের সমাজ ও গৃহজীবন ভারতবাসী আজ কি ভাবে চাইবে তা' আজিকার যুগধর্ম্ম স্থির করে ও কর্চ্ছে এবং সমাজের মনীষী যাঁরা, ভারতের সমাজকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরাও পথ নির্দেশ করে দেবেন। কিন্তু রাষ্ট্র-ভারতের আজ যাঁরা নেতা ও নিয়ন্তা—তাঁরা চলচ্চিত্রকে কি ভাবে রাষ্ট্রের কাজে লাগাবেন সে সম্বন্ধে একজন চলচ্চিত্র-সেবীর পরামর্শ তাঁরা কি ভাবে নেবেন আমি জানি না, কিন্তু পরামর্শ না নিলেও পরামর্শ দেবার অধিকার কেড়ে নেবার অধিকার তাঁদের নেই। রাষ্ট্র-নেতারা নিশ্চয়ই বলবেন যে, চলচ্চিত্র তৈয়ারী ক'রতে না জানলেও তাকে কি করে আজ প্রয়োগ করতে হবে তা' তাঁরা জানেন এবং যাঁরা তৈয়ারী করতে জানেন এমন লোককে দিয়েই তাঁরা তৈয়ারী করিয়ে নেবেন বা নিচ্ছেন। এ সবই সত্য কথা এবং পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশের আজ যাঁরা শাসন ও পালনের বড় বড় জায়গায় বসে আছেন তাঁরাও এমনি কথা বলেন বা চলচ্চিত্রকে এমনি ভাবেই কাজে লাগাচ্ছেন। কথাটা সত্য হলেও শেষ কথা নয় এবং শ্রেষ্ঠ বা মঙ্গলকর নয়। চলচ্চিত্র তো তুচ্ছ, বৈজ্ঞানিক জগতের অধুনাতম সবচেয়ে বড় 'আবিষ্কার' atom bombও পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ধ্বংসই করেছে, কাজেই বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞ কথাই চরম কথা নয়, চরম কথা সেইটিই—যেটি চরম মঙ্গল আনে। এইখানেই মানুষ, মানুষ। তাকে শুধু পশু বললে অবশ্য মঙ্গলের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিকই হতো।

শ্রীদেবকীকুমার বসু

রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে হিটলার, মুসোলিনী, চার্চিল স্ব স্ব দেশের কম প্রিয় ছিলেন না, আজ ট্রুম্যান, এ্যাটলী ও ষ্টালিনও স্ব স্ব দেশে কম প্রিয় নন। তাঁরা সকলেই রাষ্ট্র-স্বাধীনতার জন্ম কম ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ঠিক তার পাশেই ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। রাষ্ট্র-স্বাধীনতার জন্ম তিনিও জীবন দিয়েছেন, তবু অন্যের সঙ্গে তাঁর অনেক পার্থক্য—জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিই স্বতন্ত্র। আমাদের

দেশের নেতারা, আজ যাঁরা রাষ্ট্রের উচ্চাসনে বসে আছেন তা' গান্ধীজীরই পথ নির্দেশের ফলে. কাজেই আজ যদি কেউ গান্ধীজী-তিরোভাবের পর এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সকল অনুষ্ঠানেই ভারতের একটা বিশেষ আদর্শ আছে তাহলে সে লোকটী চলচ্চিত্র-সেবী কেন? যদি সে লোকটী নগরের রাজপথে বসে' পরের পা ধরে' তা'র জুতা সাফ করে, তবুও তার কথা শ্রোতব্য। ইংরাজকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে সেই সিংহাসনেই দেশের একজনকে বসালে ভারতের স্বাধীনতা হবে না। ভারতের আদর্শকে সেই রাজসিংহাসনে বসাতে হবে। গান্ধিজী যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে কারুর ক্ষমতা হতো না তাঁকে কোন উচ্চ রাজপদে বসাতে—যতক্ষণ না ভারতের মহিমাময় আদর্শের মাথায় রাজমুকুট পরানো হতো—যতক্ষণ না গান্ধিজীর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতো। তেমনই চলচ্চিত্র বা যে-কোন শক্তিকে রাষ্ট্রে লাগাতে হলে American বা Russian পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নয়, কারণ atom bombএর improved মারণ-অস্ত্রই ভারতের আদর্শ নয়। আর আদর্শই পদ্ধতিকে পথ-নির্দেশ করে।

ভারতের একটা মহান আদর্শ আছে এবং সেই আদর্শে সমস্ত পৃথিবীকে আহ্বান করবার স্বপ্নের কথা সেদিন পণ্ডিত জহরলালজী নিজেও বলেছেন। বলবারই কথা—কারণ গান্ধিজীই তাঁর রাষ্ট্রগুরু।

কাজেই চলচ্চিত্র দিয়ে কি কি করা হবে শুধু নয়, কি ভাবে করা হবে সেটাও সমান বড় কথা। যেখানে পূর্ব্বে ছিল ইংরাজের রাজত্ব সেখানে কতকগুলি দেশী লোক শুধু বসে গেলেন—এতে কিছুই হলো না! ইংরাজের দরবারে প্রবেশের যে সব গোপন সুড়ঙ্গ ছিল সেই সব গোপন সুড়ঙ্গ, আঁকা বাঁকা পথগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে। পথ হবে উন্মুক্ত রাজপথ। কাজেই রাষ্ট্র-নেতাদের সাম্‌নে হাজির হবার সুযোগ ও সুবিধা আছে, মাত্র তাঁদেরই দ্বারা রাষ্ট্র-নায়করা উপদিষ্ট হবেন, এটা রামরাজ্যের কথা নয়। রাষ্ট্রপতিদের যেতে হবে ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যোগ্য লোকের সন্ধানে, যোগ্য স্থানের সন্ধানে—এইখানেই দেখা দেবে ভারতের নতুন পদ্ধতি। প্রজা রাজাকে খুঁজবে না, রাজা প্রজাকে খুঁজবে, এই ভারতের স্বাধীনতা, এই গান্ধীজির 'রামরাজ্য'। এর থেকেও বড় কথা এই যে, চলচ্চিত্রকে উন্নত ও শক্তিমান না করে তাকে রাষ্ট্রের কাজে লাগালে শক্তিহানিই ঘটবে। Government-এর দরবারে একটি finished ভাল educational film দেখলেই education হোলো না—যারা এই ছবি করছে সেই studioর carpenter, electrician ও কুলিদের কি ভাবে কাজ কর্ত্তে হয়—এটাই আগে দেখলে ঠিক পথে চলা হবে। শিক্ষার জন্য ভাল মলাটের বই রচনা করার আগে শিক্ষকদের অবস্থা এবং স্বাস্থ্য ও ভাতকাপড়ের কথাও ভাবতে হবে। স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্রকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োগ কর্ব্বার আগে—চলচ্চিত্র-শিল্পকে বড় না কর্লে ইংরাজ শাসনের মূর্ত্তিটাই মনে এসে পড়বে। আজ আমাদের শাসন করার সঙ্গে পালন করতে হবে আগে। চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী মাধ্যম যেখানে তৈরী হয়, সংস্কার করতে হবে প্রথম সেইখানে, শক্তি সঞ্চার করতে হবে আগে সেই মূল-উৎসে। তবে সেটা হবে রাষ্ট্র ও জাতির শক্তি, অন্যথা শক্তিহীন সেই চলচ্চিত্র রাষ্ট্র ও জাতির শক্তিহানিই ঘটাবে।

সমালোচকের দায়িত্ব

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

স্বভাবগত ভঙ্গীতে একটা হাঁস একবার ক'রে জলে ঠোঁট ডোবাচ্ছে, আর মুখ তুলে নিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে ঝেড়ে ফেলার মত একটা ক'রে দিচ্ছে ঝাঁকুনি—দূর থেকে দৃশ্যটি দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পার্শ্ববর্তীদের বলেছিলেন, "ঐ দেখ বাংলা দেশের সমালোচক।"

একটা কিছু হাতে এসে পড়া মাত্রই 'কিছু হয়নি' বলে মাথা ঝেঁকে ওঠার যে শ্রদ্ধাহীন ভঙ্গী—সচরাচর আমাদের সমালোচকদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দেখা দেয় তারই প্রতি তাঁর এই পরিহাসমূলক ইঙ্গিত। তথাকথিত সমালোচকদের অসঙ্গত আক্রমণে উত্যক্ত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের মত মানুষ ও-কথা বলেছিলেন সন্দেহ নেই। রসোপলব্ধির জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন যে সহৃদয় মন এবং শ্রদ্ধা, তার একান্ত অভাবের বিরুদ্ধে এই অতুলনীয় প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বেরও যে জীবনভরা একটা তীব্র নালিশ ছিল, তা তাঁর শেষ জীবনে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেও আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রে এসেছি।

আমাদের সুউন্নত সাহিত্যে এ অনাচার আছে বটে, তবু বলব সেখানে সমালোচক হিসাবে আলোচনা দাঁড় করাতে দরকার হয় যুক্তির, নিছক মন্তব্যের মূল্য আদায় করতে প্রয়োজন হয় সাহিত্যে বা পাণ্ডিত্যে ন্যূনপক্ষে খানিকটা প্রতিষ্ঠা। 'বইখানা পড়েছি', মাত্র এটুকু অধিকার নিয়েই প্রকাশ্য ব্যাপ্ত সমালোচনায় দাবীদার হওয়া চলেনা। কিন্তু ছায়া-ছবির ক্ষেত্রটি এদিক থেকে একেবারেই নিরঙ্কুশ—ফলে অধিকারী-ভেদ বর্জ্জিত। দৃষ্টি, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার জোরে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন এমন সমালোচক আঙ্গুলের দু-তিন ধাপ এগিয়েই খুঁজে পাওয়া যায়না। আবার সমালোচকের সংখ্যা গুণতে গেলে গুণে কুল পাবেননা একথাও সত্যি। এই দুর্দ্দিনে সাহিত্য-পত্রগুলো মরেছে, কিন্তু গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য চিত্র-পত্র। দৈনিক থেকে সুরু ক'রে এইসব সাপ্তাহিক-মাসিক-এ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচকের আসনে যাঁরা চড়ে বসেন, বসেন বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের রজ্জু বেয়ে বা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্র ধরে। গুণের মধ্যে সম্বল থাকে চিত্রখানি একবার দেখার অভিজ্ঞতা। এই অধিকার নিয়ে তাঁরা যা ক'রে থাকেন সমালোচনা তাকে আমি বলব না—কারণ তা যুক্তি-নির্ভর নয়, বলব নিছক মন্তব্য মাত্র। যেমন, 'ওটা আমার ভাল লাগেনি,' 'এটা না করাই ছিল উচিৎ,' 'সেটা হ'য়েছে অনবদ্য' ইত্যাদি। কিন্তু বক্তার একবার ভেবে দেখা উচিৎ, তাঁর 'আমি'র এই ভালো লাগা-না-লাগাকে সর্ব্বজন পরিবেশনে তিনি অধিকারী কিনা। কোন এক বিশেষ 'আমি' তাঁর রুচি এবং শিল্পবোধ সম্পর্কে, যে কোন পথেই হোক, যখন জাতির মনে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে, একমাত্র তখনই আসে তার বিচারকে স্পর্দ্ধিত মন্তব্যে ব্যক্ত করার অধিকার। দশ 'আমি'র এক 'আমি'কে এগিয়ে আসতে হ'লে প্রতি পদে জুগিয়ে চলতে হবে যুক্তির মাশুল। তথা-কথিত এইসব সমালোচকরা সমালোচনায় অধিকারী নন বলছি কেন—তার স্পষ্ট প্রমাণ ঘোষণা করে তাঁদেরই ভাষা ও বচনভঙ্গী। সমালোচকের পরিচয় দৃষ্টির গভীরতা ও পরিচ্ছন্নতায়। দৃষ্টির এই গভীরতা ও পরিচ্ছন্নতা আবার অবশ্যম্ভাবী রূপে গড়ে তোলে এক অনুযায়ী ভাষা। সাহিত্য এবং মননশীলতার ক্ষেত্রে মানসিকতার এই তারতম্য ভাষাকে চিহ্নিত করে বলেই তো ভাষা ও বচনভঙ্গী থেকেই চিনে নেওয়া যায় তার জাতভেদ।

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

সাহিত্যে দায়িত্বহীন সমালোচনা তেমন একটা ক্ষতির কারণ হয় না, কিন্তু চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে তা অবহেলার যোগ্য তো নয়ই—বরং অবহিত হ'য়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলেই মনে করি। এই মাধ্যমের এক মাথায় থাকেন মূলধনী, অন্য মাথায় জনসাধারণ। নির্ম্মাণের কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলেই মূলধনীর অস্তিত্বটাও অনিবার্য্য। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মূলধনী সব সময়েই চাইবে নতুনত্বের ঝক্কি এড়িয়ে গতানুগতিক পথে ব্যয়িত টাকাটা যাতে লাভের

বেসাতি নিয়ে ঘরে উঠে আসে। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনিকরা শ্রেণীধর্ম্মে হন কম-বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। এই প্রতিক্রিয়াশীলতার বাধা ডিঙ্গিয়ে যেতে সমালোচকদেরও সহায়ক হ'তে হবে কাহিনীকার ও পরিচালকদের। গতানুগতিক তাৎপর্য্যলুপ্ত বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে তাঁদের জাগাতে হবে বিরূপতা। যাতে মূলধনীরা বাধ্য হন নতুন আদর্শ এবং বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ দিতে। আবার নতুনের আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করাতেই তাঁদের কর্ত্তব্যের শেষ নয়। জনসাধারণকে সে-বিষয়ে আগ্রহশীল করে তোলার দায়িত্বও সমালোচকদের উপর সমান ভাবেই বর্ত্তায়। এতো গেল কর্ত্তব্য বা প্রত্যাশার কথা। কিন্তু যা ঘটছে তাতে ফিরে এলে দেখা যাবে, গতানুগতিক ছবিগুলোর যে সমালোচনা হয় তা-ও একেবারেই বর্ণহীন। অত্যন্ত দুর্ব্বল কাহিনীতেও সোল্লাসে উল্লেখ করার মত অংশ খুঁজে বার করা হয়, আবার সবল কাহিনীতে বড় ক'রে তোলার চেষ্টা চলে তাঁর খুঁটিনাটি খুঁতগুলিকে। ফলে সমালোচকদেরই উক্ত বেশ-ভালো, ভালো আর মন্দের আলোচনার সুর থেকে বিভেদ বোঝাটা হ'য়ে দাঁড়ায় মুস্কিল। এমন হাস্যকর কাণ্ডও ঘটে, একুশ লাইন জুড়ে যে মন্তব্য করা হয়েছে—পরবর্ত্তী এক লাইনে থাকে এমন বিরুদ্ধ উক্তি, যা সেই একুশ লাইনকে উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এসব অসঙ্গতি সম্পর্কেও তাঁদের সচেতন থাকা উচিৎ।

নতুনকে অভিনন্দিত করার প্রশ্নে আমার সমালোচিত সমালোচকরা হয়তো বলে উঠবেন, এ যে তাঁরা করে থাকেন তার একাধিক নজির রয়েছে তাদের হাতে। উক্তি তাঁদের মিথ্যে হবে না। সর্ব্বজনস্বীকৃত বিরোধহীন কতক মহৎ বিষয়বস্তু আছে যার বিরোধিতা প্রচলিত মূল্যবোধের কাছে নিজেকেই খাটো করে মাত্র—সে সব ক্ষেত্রে তাঁরা সহায়ক হন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্নসঙ্কুল বর্ত্তমান জীবনের বিভিন্ন সমস্যা জড়িয়ে নতুন ছাঁদে গল্প গাঁথলেই বাধে বিপদ। চতুর্দ্দিক হ'তে এঁরা জ্বালাময়ী ভাষায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে আসেন এগিয়ে। সে আক্রমণটা ঘটে যুক্তির শাণিত অস্ত্র নিয়ে নয়, বরং বলা চলে স্থূল মন্তব্যের শৃঙ্গ উঁচিয়ে—এমন কি কেউবা মাত্রাবোধ হারিয়ে জঞ্জাল জাতীয় ব্যক্তিগত উক্তি ছুঁড়ে নিজস্ব স্তর ঘোষণায় পর্য্যন্ত দ্বিধা করেন না। এ সূত্রে একটি ঘটনা মনে পড়ে—আমাদেরই এক বিখ্যাত সাহিত্যিক পরিচালক তাঁর চিত্র-নাট্যের একস্থানে খুবই স্থূল রকমের একটা চটুল দৃশ্য গুঁজে দিতে যাচ্ছেন, পাশে ছিলেন তার সাহিত্য গুণমুগ্ধ এক বন্ধু, তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'না না, এ আপনি দেবেন না।' পরিচালক মশাই মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'না হে, এটাই দিতেই হবে—এ জাতীয় দু-একটা জায়গা ক'রে রাখা দরকার, প্রথম টানেই সমালোচকরা যার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন—তাতে আমার গল্পের ভালো অংশগুলো বেঁচে যাওয়ার আশা থাকে।' কথাটি যে কতখানি মর্ম্মান্তিক সত্য তা আমি একাধিকবার নিজেই উপলব্ধি করলাম। স্থূল কিছু ধরে না দেওয়ার ভুলে আমার বর্ত্তমান ছবির সবটাকেই তছ্‌নছ্‌ করার একটা চেষ্টা সুরু হয়ে গেল। যে চিত্র দেখে প্রতিষ্ঠাবান সমালোচক, শিল্পরসিক এবং মনীষীদের অনেকেই মুক্তকণ্ঠে জানালেন সপ্রশংস অভিনন্দন, সেখানে এই সমালোচকরা পাতার পর পাতা ছড়িয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে চাইলেন এ ছবিতে কি কি নেই—কি আছে তার উল্লেখ থাকলো না মোটেই। এ চিত্র কাহিনীর সঙ্গে আমার পূর্ব্বতন কাহিনীর কতটুকু মিল তার খোঁজে তাঁরা মাথা খুঁড়লেন, কিন্তু ধাতে এবং জাতের ব্যাপ্ত গরমিল সম্পর্কে লিখলেন না একটি পংক্তি। সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের দুজন মানুষকে নিছক আঁচিল বা দাড়ির মিলের উপর ভর ক'রে সমধর্ম্মী প্রমাণ ক'রে দেওয়ার মতই এ প্রয়াস। তারপর সংলাপ-কাহিনীতে কেন প্রচুর ঘটনা সংঘাত নেই, এবং যে কাহিনী কথার অবলম্বনেই ধরে দেওয়া হয়েছে তাকে কথার মারফত বলা হোল কেন—তা নিয়েই বা না কত নালিশ! 'দিনের-পর-দিন' নামটিও নাকি ব্যর্থ হয়েছে মধ্যবিত্তের দুঃখ-দৈন্যের রূপ গল্পের অর্দ্ধাংশে গিয়ে থেমে গেছে বলে। সত্যিই থেমেছে কি? বর্ত্তমান গণতন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনীতিক চক্রে যে ঘুরপাক খেয়ে মরে, সেটাও যে তার দৈনন্দিন জীবনের লাঞ্ছনারই একটা অংশ এটুকু এঁরা চিনে নিলেন না। হয়তো বা কাহিনীতে এ জিনিসে তাঁরা অভ্যস্ত নন বলেই। তাই কাহিনীর রঙ্গমঞ্চকে গ্রহণ করলেন নিছক রঙ্গমঞ্চ হিসেবে—রাজনৈতিক মঞ্চের রূপক রূপে নয়—এমন কি নাটক নির্ব্বাচনের মত স্পষ্ট ঘটনাটি থাকা সত্ত্বেও। ফলে বর্ত্তমান গণতন্ত্রের হাস্যকর অসঙ্গতির প্রতি আমার কটাক্ষগুলো তাঁদের কাছে নেহাৎ অর্থহীন হয়েই রইলো। চিত্রের মত-মাধ্যমে এসব বিষয়বস্তু স্পষ্ট করে তোলার পথে থাকে অনেক বাধা। তাই আশা করেছিলাম কাহিনীর অন্তর্নিহিত এই তাৎপর্য্যটুকুর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরবার দায়িত্ব আমার দেশের সমালোচকরাই গ্রহণ করবেন। 'ম'সিয়ে ভার্দু'র' কাহিনীর রাজনৈতিক তাৎপর্য্য এবং ইঙ্গিতকে স্পষ্ট ক'রে তুলেছিলেন সে-দেশের সমালোচকরাই।

আমার এই গল্পটি গল্প হয়নি, হয়েছে একটি প্রবন্ধ, কেউবা এই মন্তব্য করেও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। একথা মেনে নিয়েই যদি আমি বলি বেশতো দুঘণ্টা বসিয়ে দশবার 'বাঃ' আর চারবার হাত-তালির সঙ্গে দেশের লোককে যদি একটি প্রবন্ধই শুনিয়ে দিতে পেরে থাকি তো মন্দ কি—দশ রকমের মধ্যে এও না হয় হ'ল একরকম। সমালোচকরা যদি বলেন, অতি-জানার ফলে এসব তাঁদের কাছে নেহাৎই ফাঁকা মনে হয় তো বলতে বাধ্য হব, তাঁদের নীচেও স্তর আছে সেটা তাঁরা ভুলে যান কেন! অবশ্য 'গল্প-নাই'-এর নালিশে আমি খুব বেশী বিস্মিত হইনি। সংস্কার-বহির্ভূত ভাবপ্রবণতার আতিশয্যহীন গল্পকে গল্প বলে মানিয়ে নিতে প্রয়োজন আরেকটা নতুন সংস্কার গড়ে তোলার। মেটে প্রদীপ বা গরুর গাড়ী এঁকে অল্পায়াসেই তা চিত্র-শিল্পের পর্য্যায়ে তোলা যায়। কিন্তু বিজলী বাতি বা মোটর গাড়ী আঁকলে সেটা কেবলই যেন হ'য়ে থাকতে চায় বিজ্ঞাপন-ঘেঁষা ছবি। আধুনিক জীবনের আদর্শ যেথা অর্থনৈতিক এবং

রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে গল্প গড়তে গেলেও থাকে এই বিপদ—কেবলই তা প্রচারধর্ম্মী বা বক্তৃতা বলে প্রতীয়মান হয়। সংস্কারানুগ প্রেমের বুকনি বা মাতার বিস্তৃত বিলাপেও যে-আশঙ্কা বড় একটা থাকে না। অতএব বুঝতে পারছি সাধারণ সমালোচকদের কাছ থেকে এদিক দিয়ে সুবিচার পাওয়ার জন্য আরও কিছুটা ধৈর্য্যের প্রয়োজন।

সমালোচকদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের একের সঙ্গে অন্যের হাস্যকর অসঙ্গতির কথাটাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মনে করি। এর নজিরও আমি আমার বর্ত্তমান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই টানছি। ধরুন, একজন যে অংশটুকুকে বলছেন অনবদ্য, অপর একজন সেটাকেই বলছেন একেবারে ব্যর্থ বা যাচ্ছেতাই। একের সঙ্গে অপরের এই মতভেদ একাধিক স্থানে উৎকট—রসবোধে এতখানি বৈষম্য ঘটলে অন্যত্র কি বলতাম জানিনা, এক্ষেত্রে জোরের সঙ্গেই বলব, এসবেরই মূলে রয়েছে আলোচিত সমালোচকদের ব্যক্তিগত মনোভাব অনুযায়ী দায়িত্বহীন মন্তব্য ছড়ানোর আগ্রহ। আশা রাখি, ছায়া-ছবির বাজার থেকেও অহেতুক এই বিড়ম্বনা একদিন লোপ পাবে। কে জানে এই চিত্র-পত্রিকাগুলির প্রয়াসে এবং আহ্বানেই হয়তো বা সত্যিকারের জ্ঞানী ও শিল্প-রসিকেরা একদিন এগিয়ে আসবেন এই সমালোচনার আসরে, আর চিত্র-সমালোচনাকে জাতে তুলে আমাদের গতিপথ করবেন সহজ এবং অনাবিল।

শরশয্যায়

শ্রীকালিদাস রায়

ধনীর ছেলে—স্বাস্থ্যে, রূপে, সুশিক্ষাতেও ধনী,
চরিত্রবান্, তরুণ গুণিগণের শিরোমণি,
একদা সে দেশের নায়ক হবে,
কর্‌ত পোষণ এই আশাটাই সবে।
উচ্চ আশা অনেক ছিল তার,
বইতে হ'বে বহু লোকের ভার।
পক্ষাঘাতে হঠাৎ হ'য়ে পঙ্গু গতিহীন
শয্যাগত হ'ল সে একদিন।
তিরিশ বছর শয্যাশায়ী হ'য়ে
কাটাচ্ছে কাল অনেক ব্যথাই স'য়ে।
দেখ্‌তে গেলাম, পেলাম বড়ই ব্যথা,
কি শুধাব' খুঁজে না পাই কথা,
অনেক ভেবে ব'সে—তাহার কাছে
জিজ্ঞাসিলাম 'যন্ত্রণা কি আছে ?'
বল্‌ল শুধু, "কি গা'ল আছে বলো মড়ার বাড়া,
যন্ত্রণা নেই শরশয্যার যন্ত্রণাটা ছাড়া।
সুস্থ সবল দেহ নিয়ে ফেলে মাথার ঘাম
চাষীর ঘরে জন্মে যদি কোদাল চালাতাম,
সারাটি দিন ক্ষেতের ধূলা মেখে
গামছা পরে' অর্দ্ধাশনে থেকে
তিরিশ বছর, কেন—জীবন ভোর,
এর চেয়ে সে জীবনও ভাই কাম্য হ'ত মোর।"
ঝর্‌ল তাহার অশ্রু রাঙা গণ্ড দুটি বেয়ে,
সজল চোখে রইনু আমি চেয়ে।
বড়ই ব্যথা পেলাম, রাতে ঘুম এল না চোখে
হয়ত শুনে বল্‌বে অনেক লোকে
'কত গরিব কত ব্যথাই সইছে জীবন ভ'রে,
তাদের কথা লেখ না-ত ছন্দে এমন ক'রে ?'
অনেক কাঙাল অনেক ক্লেশই সইছে অবিরত,
তাদের ঘেরে নেইত অতশত
নিত্য নূতন ভোগের আয়োজন,
নেই বিলাসের হাজার প্রলোভন।
ভোগ্য আছে ভাঁড়ার ভরা শক্তি ভোগের নাই,
এমন দশা নয়ত তাদের, দুঃখ পেলাম তাই,
রোগের শরশয্যা শুধু নহে,
ভোগের শরশয্যা তাহার পঙ্গু দেহ বহে।
কতই পেঁপে সজনে কলাগাছ
ভাঙ্গে চুরে কাল বোশেখীর নাচ,
জন্ম তাদের ভাঙ্‌তে ঝড়ে। বিচিত্র নয় ভাঙা,
তাতে কেঁদে কে করে নয়ন রাঙা ?
বিরাট বটবৃক্ষ যদি উপ্‌ড়ে পড়ে ঝড়ে,
কাহার হৃদয় আকুল নাহি করে ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৯৩২ সালের মাঝামাঝি সময়ে সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন চট্টগ্রামের ধলঘাটগ্রামে নবীন চক্রবর্ত্তীর বাটীতে। স্থানটি ছিল পটিয়ার মিলিটারি ক্যাম্প-এর মাইল চারেক দূরে। নবীন চক্রবর্ত্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবীই বিপ্লবীদের প্রতি আনুকূল্য করিয়া আপন বাটীতে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সময়ই অপূর্ব্ব সেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদার, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি অন্যান্য বিপ্লবিগণও মধ্যে মধ্যে আলোচনার জন্য সেখানে গিয়া সমবেত হইতেন। বাছিয়া বাছিয়া মহিলা কর্ম্মীদিগকেও এই সময় দলে গ্রহণ করা আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রীতিলতার ডাক নাম ছিল রাণী। তাঁহার পিতার নাম জগদ্বন্ধু ওয়াদেদার। জগদ্বন্ধুবাবু কাজ করিতেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্মৃতিশক্তির প্রখরতা ও ক্রীড়া-কুশলতার জন্য প্রীতি আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিশেষভাবে প্রশংসালাভ করিতেন। যথাসময়ে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকায় গিয়া আই-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। ঢাকায় যে "দীপালি-সঙ্ঘ" ছিল তাহাতে যোগদান করিয়া লাঠি ও অসি খেলায় প্রীতিলতা দক্ষতা অর্জ্জন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ না করার জন্য তাঁহার মনে যে দুঃখ ছিল— আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করার পর উহা দুরীভূত হয়। অতঃপর তিনি বি-এ পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন কলিকাতার বেথুন কলেজে এবং ১৯৩২ সালে বি-এ পরীক্ষা দিয়া চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ হন এবং নন্দনকানন উচ্চ ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতেই প্রীতিলতা স্বদেশী ভাবধারায় মানুষ হইয়াছিলেন এবং দেশের কাজ করিবার জন্য তাঁহার মন আকুল হইত। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির আদেশ হইবার পর তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর পরিচয় দিয়া তিনি বহুবার কারাকক্ষে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আদর্শ ও নিষ্ঠা তাঁহার জীবনে অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৯৩২ সালের ১১ই জুন তারিখে ধলঘাট গ্রামের গোপন আস্তানায় প্রীতিলতা, সূর্য্য সেন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং কয়েক দিন সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। বাড়ীটি ছিল দু'তলা। এই সময় সহসা একদিন বিপদ্ উপস্থিত হইল। ১৩ই জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ক্যামারণ পুলিশ-দারোগা মনোরঞ্জন সেন সহ একদল পুলিশ ও সৈন্য লইয়া উক্ত বাটীতে গিয়া রাত্রিকালে হানা দিলেন। ক্যাপ্টেন ক্যামারণ স্বয়ং রিভলবার হস্তে লইয়া অতি উৎসাহবশতঃ মই বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন তাঁহাকে উপরে উঠিতে দেখিয়া রাত্রির অন্ধকারেই তাঁহার উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের গুলিতে বিদ্ধ হইয়া ক্যাপ্টেন ক্যামারণ মই হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিপ্লবীদিগকে গুলি চালাইতে দেখিয়া পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীও নীচে হইতে গুলিবর্ষণ সুরু করিল। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া লড়াই চলিল উভয়পক্ষে। লড়াইয়ের মাঝখানেই নির্ম্মল সেন এক সময় গুলিবিদ্ধ হইয়া কক্ষতলে পতিত হইলেন। পুলিশের আগমন টের পাইয়াই সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন প্রীতিলতাকে পূর্ব্বেই নীচের তলায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উপরের তলায় গুলিবিদ্ধ নির্ম্মল সেনের কাতর আর্ত্তনাদ প্রীতিলতার কর্ণগোচর হইল। তিনি উপরে যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নীচের তলার অন্যান্য সকলে তাঁহাকে বিপদ নিশ্চিত জানিয়া উপরে যাইতে দিলেন না। সেই আঘাতেই কিছুক্ষণ পরে নির্ম্মল সেনের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সূর্য্য সেন ও অপূর্ব্ব সেন তাড়াতাড়ি কোনও মতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং নীচের তলার সকলকে জানাইলেন যে তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবেন। তাহা শুনিয়া প্রীতিলতাও তাঁহাদের সহিত পলায়নের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। সূর্য্য সেন শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া পারিলেন না। তাঁহারা তিনজনেই বাহির হইয়া পড়িলেন রাত্রির ঘোর অন্ধকারেই। বেশি দূর যাইবার আগেই কিন্তু পুলিশের গুলি ছুটিয়া আসিল তাঁহাদের দিকে। সেই গুলিতে অপূর্ব্ব সেন আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পুলিশ ও সৈন্যদলকে কোনও মতে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন কেবলমাত্র প্রীতিলতা ও সূর্য্য সেন।

তখন পুরা বর্ষাকাল। পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত এবং জল-প্লাবিত। সূর্য্য সেন অতি কষ্টে প্রীতিলতাকে সঙ্গে লইয়া প্রায় মাইল চারেক দূরবর্ত্তী জৈষ্ঠপুরা নামক একটি গ্রামের এক কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের বাহিরে পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত এই কুটীরটিও বিপ্লবীদের একটি আস্তানা ছিল। কয়েকজন বিপ্লবী পূর্ব্ব হইতেই সেই কুটীরে বাস করিতেছিলেন।

এদিকে পরদিন সকাল বেলাই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর গর্ডন দলবল লইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৃহমধ্যস্থ সকলের আত্মসমর্পণ দাবী করিলেন। তাঁহারা আসিয়া পড়ায় গৃহকর্ত্রী সাবিত্রী দেবী তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। অতঃপর লুইস্ গানের গুলি চালাইয়া বাটীর একাংশকে ধ্বংস করিয়া পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ভিতরে প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দিক তল্লাস করিয়া আবিষ্কৃত হইল ক্যাপ্টেন ক্যামারণ, নির্ম্মল সেন ও অপূর্ব্ব সেনের মৃতদেহ, রিভলবার, কয়েকখানি প্রয়োজনীয় পত্র, প্রীতিলতা ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের

ফটো, দুইখানি পুস্তকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি। প্রাপ্ত প্রমাণ হইতে পুলিশ জানিতে পারিল যে সূর্য্য সেন ও প্রীতিলতাও পূর্ব্বদিন রাত্রে ঐ বাটীতেই ছিলেন; কিন্তু সমস্যা প্রায় একরূপই রহিয়া গেল। বর্ষাকালের সেই অন্ধকার রাত্রে জল-কাদা ভাঙ্গিয়া পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিয়া কি ভাবে কোথায় পলায়ন করিলেন সূর্য্য সেন?

তল্লাসীর ফলে যে পাণ্ডুলিপি দুইখানি পাওয়া গিয়াছিল—তাহার একখানি ছিল গণেশ ঘোষের লিখিত। চট্টগ্রাম জেলে বসিয়াই ঐখানি তিনি রচনা করিয়াছিলেন এবং কৌশলে উহা বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতে বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস উহাতে বিবৃত হইয়াছিল। অপর একখানি পাণ্ডুলিপি ছিল সূর্য্য সেনের লেখা। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্ণ বিবরণী উহাতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার উক্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে বিপ্লবিগণ উক্ত অভিযানের জন্য ব্যাপক-ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং প্রায় ১২,০০০৲ টাকা, ১০,০০০ কার্ত্তুজ ও এক শতেরও অধিক লোক এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। কেবল ইউরোপীয়ান ক্লাবটি ঐদিন আক্রমণ করা সম্ভব হয় নাই; কারণ রাত্রি অধিক হওয়ায় উক্ত ক্লাবের সভ্যরা অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছিলেন এবং বিপ্লবীদের নিজেদেরও কতকগুলি অসুবিধা ছিল। ঐদিন ক্লাবটি আক্রমণ করা যায় নাই বলিয়া সূর্য্য সেন তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।

কল্পনা দত্তও যে এই সময় চট্টগ্রামের দলটির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হন এবং উক্ত কলেজ হইতেই পরীক্ষা দিয়া ১৯২৯ সালে আই-এস্-সি ও ১৯৩১ সালে বি-এস্-সি পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় চট্টগ্রামেই ফিরিয়া গিয়া বিপ্লবান্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। তাঁহারই চেষ্টায় বিপ্লবীদলের পক্ষে বহু অলঙ্কার ও অর্থাদি সংগৃহীত হয়। তাঁহাকে ও প্রীতিলতাকে—উভয়কেই নির্ম্মল সেন রিভলবার চালনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। পুলিশ একবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহার বাটীর লোকগণ জামিন হইয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনেন।

১৯৩২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুরুষের ছদ্মবেশে কল্পনা দত্ত পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবের বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহের জন্য অপর দুইজন যুবকের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্দেহজনক গতিবিধিতে পুলিশ খবর পাইয়া সেখানে আসে এবং তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিন পরে কল্পনা দত্ত জামিনে খালাস পান এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা চলিতে থাকাকালেই তিনি ডিসেম্বরের শেষাশেষি হইতে আত্মগোপন করেন।

পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবের নিকট হইতে ধৃত হইয়া কল্পনা দত্ত প্রভৃতি যখন হাজতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ই ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রীতিলতার নেতৃত্বে উক্ত ক্লাব প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হইল।

ধলঘাটগ্রামের ঘটনার পর হইতেই প্রীতিলতা পলাতক জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দিনে তিনি ছিলেন কাটলী গ্রামের আশ্রয়-কেন্দ্রে। সেই আশ্রয়-কেন্দ্র হইতেই মহেন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল দাস, কালী দে, শান্তি চক্রবর্ত্তী, সুশীল দে প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ বিপ্লবী সন্ধ্যার খানিকটা পরে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গ্রাম্য দরিদ্র মুসলমানের পোষাকে প্রীতিলতার নেতৃত্বে ক্লাবটি আক্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। প্রীতিলতা পরিধান করিয়াছিলেন সামরিক পরিচ্ছদ এবং উপরে একখানি চাদর দিয়া তাঁহার সেই পোষাক আবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যখন তাঁহারা ক্লাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন—তখন প্রায় রাত্রি দশটা-সাড়ে দশটা হইবে। জন পঞ্চাশেক শ্বেতাঙ্গ নর-নারী তখন ক্লাবঘরের অভ্যন্তরে পূর্ণোদ্যমে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়াছিল। অস্ত্রধারী প্রহরীর সংখ্যাও সেদিন সেখানে পাঁচ-ছয়জনের অধিক ছিল না। মহেন্দ্র ও সুশীল মুসলমান কোচ্‌ম্যানের ছদ্মবেশে গেট পার হইয়া ক্লাবের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহাদের দেখিয়া কাহারও কোন সন্দেহ হইল না। প্রীতিলতা ও তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীরা ক্লাবের পশ্চাতের একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমোদ-প্রমোদে মত্ত ইউরোপীয়দিগের উপর মহেন্দ্র ও সুশীল একই সঙ্গে বোমা নিক্ষেপ করিলেন। ক্লাবের পিছন দিকের দরজা হইতে প্রীতিলতা ও অন্যান্য সকলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষণ করিতে সুরু করিলেন রিভলবারের গুলি। বোমা ও গুলির আওয়াজে গোটা ক্লাবঘরটি কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—চতুর্দ্দিক ভরিয়া উঠিল ধোঁয়ায়। ভিতরের শ্বেতাঙ্গ নরনারী ভয়ার্ত্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এদিকে-ওদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। চট্টগ্রামের সূর্য্য সেনের দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবীদলটির দ্বারাই যে ক্লাবঘরটি আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। সূর্য্য সেনের সেই দল—যে দলের নামে পুলিশের বড়কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া একজন সাধারণ শ্বেতাঙ্গ পর্য্যন্ত ভয়ে কম্পিত হইত।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা যাবৎ ক্লাবের দুই পার্শ্ব হইতে অবিশ্রান্ত আক্রমণ চলিতে লাগিল। অনেকেই হইল হতাহত—যাহারা আহত হইল, তাহারা পড়িয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কার্য্য শেষ হইলে প্রীতিলতা বিপ্লবীদিগকে স্থানত্যাগ করিতে বলিলেন। তাঁহার কথামত বিপ্লবীরা খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়া লক্ষ্য করিলেন যে প্রীতিলতা স্বয়ং কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত ফিরেন নাই। ইহার কারণ কি, তাহা অবগত হইবার জন্য মহেন্দ্র চৌধুরী পুনরায় ক্লাবের দিকে ফিরিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে প্রধান সৈন্যনিবাসে ক্লাব-আক্রমণের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সেখান হইতে ঘটনাস্থলের দিকে একগাড়ী সৈন্যও পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহেন্দ্র প্রীতিলতার নিকট ফিরিয়া যাইতে যাইতেই দেখিতে পাইলেন যে চতুর্দ্দিকে তীব্র আলোকপাত করিতে করিতে দূর হইতে মিলিটারি গাড়ী অতি দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে।

মহেন্দ্র তথাপি ত্বরিতগতিতে প্রীতিলতার নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহার তখনও সেখানে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আত্মরক্ষার্থে তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসিবার জন্ত তিনি প্রীতিলতাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন; কিন্তু প্রীতিলতা ততক্ষণে পটাসিয়াম সায়নাইড্ বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আগ্নেয়াস্ত্রটি মহেন্দ্রের নিকট অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি যেন মাষ্টারদাকে তাঁহার শেষ প্রণাম জ্ঞাপন করেন। প্রীতিলতা বলিলেন যে এ জীবনে তিনি আর ফিরিবেন না।

রিভলবারটি লইয়া মহেন্দ্র প্রস্থান করার অল্প পরেই সৈন্তবাহী গাড়ীটি ক্লাবের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ চতুর্দিক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রীতিলতার মৃতদেহটি পাওয়া গেল ক্লাবঘর হইতে প্রায় একশত হাত দূরে। তাঁহার শরীর তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফটো, শ্রীকৃষ্ণের চিত্র, ক্লাব-বাড়ীটির একটি নক্সা, প্রীতিলতার নিজের লিখিত এক টুক্‌রা বিজ্ঞপ্তি-পত্র। সেই বিজ্ঞপ্তি-পত্র হইতে জানা গেল যে, মাষ্টারদার আহ্বানে সাড়া দিয়াই তিনি সেদিনের আক্রমণের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের দ্বারা অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-কলাপের ইহাও একটি অংশ বিশেষ।

সেদিনের ঘটনায় মিসেস্ সানিভাবা সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। আহত হইয়াছিলেন মিঃ ম্যাকডোলেণ্ড ও তাঁহার স্ত্রী, মিঃ লোয়ার ও তাঁহার পত্নী, মিঃ মিডিলটন ও তাঁহার স্ত্রী। আরও কয়েকজন অল্প-বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এদিকে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে যে দুইটি মামলা চলিতেছিল, তাহার ফলাফল একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথম মামলাটির রায় প্রকাশিত হইল ১৯৩২ সালের ১লা মার্চ্চ। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, ফণীন্দ্র নন্দী, সহায়রাম দাস, আনন্দ গুপ্ত, সুবোধ চৌধুরী, ফকির সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, লালমোহন সেন, সুবোধ রায় ও রণধীর দাশগুপ্তের প্রতি আদেশ হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের। নন্দলাল সিংহ দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অনিলবন্ধু দাসের বয়স অল্প বলিয়া তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্ত বোরষ্টাল স্কুলে পাঠাইবার আদেশ প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট সকলে মুক্তি পাইলেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কিত দ্বিতীয় মামলাটির রায় প্রকাশিত হইল ১৯৩৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। তিনজন বিচারপতির মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর দণ্ড লইয়া মতভেদ ঘটিল। মিঃ এ, এফ্, এম, রহমান তাঁহাকে চরম দণ্ডদানের হেতু নাই বলিয়া অভিমত প্রদান করিলেন, কিন্তু অপর দুইজন তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দানের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন; সুতরাং অধিকাংশের মতে তাঁহার প্রাণদণ্ডেরই আদেশ হইল। সরোজকান্তি গুহের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ। হেমেন্দু দস্তিদার নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া খালাস পাইলেন।

সরোজকান্তি গুহ ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হয়। ইহার ফলে সরোজকান্তির দণ্ড বহাল থাকে, কিন্তু অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর প্রাণদণ্ড রদ্ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ধলঘাটগ্রাম হইতে মাত্র মাইল তিনেক দূরে নেতা সূর্য্য সেন গৈরলা গ্রামের এক আশ্রয়-কেন্দ্রে অবস্থান করিতেছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে বিপ্লবীরা এই সময় উক্ত কেন্দ্রে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে আবশ্যক আদেশ-নির্দ্দেশাদি গ্রহণ করিয়া যাইতেন। দলের অন্যতম বিশ্বস্ত কর্ম্মী ব্রজেন সেন অতি যোগ্যতার সহিত সেই আশ্রয়-কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান করিতেন।

তারকেশ্বর দস্তিদার এই সময় সূর্য্য সেনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু দায়িত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। স্বতন্ত্র এক আস্তানায় তিনি অন্যত্র থাকিতেন। তাঁহার ও সূর্য্য সেনের মধ্যে গুপ্ত যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। পলাতক অবস্থায় কল্পনা দত্তও তখন তাঁহাদের সহিতই অবস্থান করিতেছিলেন।

সূর্য্য সেনকে ধরাইয়া দিতে পারিলে বা তাঁহাকে ধরিবার উপযোগী সংবাদ সরবরাহ করিতে পারিলে কর্ত্তৃপক্ষের পুরস্কারের পরিমাণ ৫০০০৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ইতিমধ্যে ১০,০০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। গৈরলা গ্রামের নেত্র সেন ঐ পুরস্কার পাইবার আশায় প্রলুব্ধ হইল। নেত্র সেন ছিল ব্রজেন সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাহার অবস্থা এক সময় ভালই ছিল, কিন্তু মদ্যপান ও অপব্যয়ের ফলে তাহার আর্থিক অবস্থা অতিশয় খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। এ হেন সময় নেত্র সেন যখন জানিতে পারিল যে সূর্য্য সেন প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবী তাহারই নিকট—প্রতিবেশী বিশ্বাসদের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন, আর তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজেন সেন তাহাদের দেখা-শুনা করিতেছেন, তখন তাঁহাদের ধরাইয়া দিয়া সহসা অতগুলি টাকা পাইবার লোভ তাহার দুর্নিবার হইয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সে সকল ব্যবস্থাই পাকা করিয়া ফেলিল।

বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেন তাহার কুকীর্ত্তির পরিচয় দিল ২রা ফেব্রুয়ারি। ঐদিন রাত্রির ঘনান্ধকারে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত ক্যাপ্টেন ওয়ামস্‌লি কয়েকজন সহকারী অফিসার ও একদল সশস্ত্র সৈন্ত লইয়া গিয়া গৈরলা গ্রামের বিশ্বাসদের বাটী পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। সূর্য্য সেনের সহিত তখন উক্ত আশ্রয়ে কল্পনা দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, ব্রজেন সেন, মণি দত্ত ও শান্তি চক্রবর্ত্তী ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুলিশদলকে আক্রমণ আরম্ভ করিবার ইঙ্গিত স্বরূপ নেত্র সেন তাহার গৃহের প্রাঙ্গণ হইতে একটি আলো লইয়া কয়েকবার সঙ্কেত করিল। বাহিরে অপেক্ষারত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী তৎক্ষণাৎ বাড়ীটির উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। বিপ্লবীদের তখন অল্পকাল পূর্ব্বে আহার সমাধা হইয়াছে মাত্র এবং অসুস্থতাবশতঃ সূর্য্য সেন আহারের পর সেই মাত্র বমি করিয়া ফেলিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহারা সহসা আক্রান্ত হইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পুলিশদল সেই স্থানটিকে আলোকিত করিবার জন্ত কয়েকটি রকেট বোমা ফাটাইল।

বাড়ীটির একদিকে ছিল জঙ্গল ও একটি নোংরা পুকুর। সূর্য্য সেন সেই মুহূর্ত্তেই স্থির করিয়া ফেলিলেন যে সেই দিকের পথ দিয়াই তাঁহাদের পলাইতে হইবে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর দৃষ্টি উহার বিপরীত দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকবার উহার বিপরীত দিকে গুলি চালাইলেন। ইহার ফলও তাঁহার আশানুরূপই ফলিল। যেদিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহারা বাড়ীটির সেই দিকের কক্ষেই আছেন মনে করিয়া পুলিশ ও সৈন্যদল সেইদিকেই তাহাদের অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিল।

রাত্রির অন্ধকারে বিপ্লবীরা অতঃপর সেই ঝোপ-জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সেদিকে ছিল একটি বাঁশের বেড়া। সুশীল দাশগুপ্ত সকলকে কোলে করিয়া একে একে সেই বেড়া পার করিয়া দিতে লাগিলেন। সূর্য্য সেনকেও ঐ একইভাবে তিনি যখন বেড়া পার করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন একটি গুলি আসিয়া তাঁহার হাতে বিদ্ধ হইল। ইহার ফলে তিনি আর সূর্য্য সেনকে বেড়া পার করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন না। যাঁহারা ইতিমধ্যেই বেড়ার ওপারে গিয়াছিলেন, তাঁহারা নোংরা পুকুরটি পার হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। সেইদিকে শব্দ শুনিতে পাইয়া পুলিশ আন্দাজেই ঝোপ-জঙ্গলের উপর গুলি চালাইয়া চলিল।

একটি গাছের গুঁড়ি ধরিয়া তখন সূর্য্য সেন নিজেই বেড়াটি অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলেন। কোথায় যে কে আছে বা না আছে, রাত্রির অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইবার উপায় ছিল না। বেড়াটি ডিঙাইয়া তিনি যে স্থানে গিয়া অবতরণ করিলেন—মনবিহারী ক্ষেত্রী নামক জনৈক সশস্ত্র গুর্খা সেখানে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছিল। সূর্য্য সেনকে আপন খপ্পরে পাইয়াই সে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং চীৎকার করিয়া অন্যান্য সকলকে নিকটে ডাকিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই বহু সশস্ত্র গুর্খাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অফিসাররা আসিয়া সানন্দে অবলোকন করিলেন যে ধৃত ব্যক্তিটি আর কেহই নন, তিনি স্বয়ং নেতা সূর্য্য সেন। ব্রজেন সেনও ধরা পড়িলেন পলায়নরত অবস্থায়। সূর্য্য সেনের দেহ তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত একটি রিভলবার ও কয়েক রাউণ্ড কার্ত্তুজ।

দেশের শত্রু নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতায় সূর্য্য সেন এইভাবে শেষ শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়িলেন। নেত্র সেনের উপর বিপ্লবীদের ক্রোধ ইহার ফলে দেখা দিল প্রচণ্ডরূপে। কিছুদিনের মধ্যেই আততায়ীর আঘাতে নেত্র সেনকে জীবন দিয়া করিতে হইল তাহার সীমাহীন পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

সূর্য্য সেন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসির আসামীর জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে অন্যান্য বন্দীদের হইতে পৃথক্ করিয়া সতর্ক প্রহরাধীনে তাঁহাকে রাখা হইল। সংবাদ-পত্র বা পুস্তক প্রভৃতি প্রাপ্ত হইবার কোনও সুযোগই তাঁহাকে দেওয়া হইল না।

মাষ্টারদা গ্রেপ্তার হইবার পর চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পরিচালনার ভার স্বাভাবিক ভাবেই গিয়া পড়িল তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। তিনি তখন চট্টগ্রাম কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর বি-এস্-সি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। কল্পনা দত্ত প্রভৃতি পলাইয়া গিয়া তারকেশ্বরের সঙ্গেই যোগদান করিয়াছিলেন। মাষ্টারদাকে কি করিয়া মুক্ত করিয়া আনা যায়—এই চিন্তাই ইহার পর সকলের মনে প্রধান হইয়া উঠিল। জেলের ভিতরের কয়েকজন বিপ্লবী অতি কষ্টে সূর্য্য সেনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সহিত জেলের বাহিরে অবস্থিত তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতিরও সংযোগ স্থাপিত হইল। সূর্য্য সেনের জেলখানা হইতে পলায়ন যাহাতে সম্ভবপর হয়, সে বিষয়ে কাজও অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেল অতি সন্তর্পণে। গোয়েন্দা পুলিসের তৎপরতায় ষড়যন্ত্রটি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সফল হইল না। ২০শে মার্চ্চ তারিখে পুলিশ ষড়যন্ত্রটির বিষয় জানিতে পারে এবং তাহার ফলে উহা ব্যর্থ হইয়া যায়।

পটিয়া থানার দারোগা মাখন দীক্ষিত এই সময়ই একদিন বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইলেন।

১৯৩৩ সালের মে মাস। গহিরা গ্রামের পূর্ণ তালুকদারের গৃহে তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি তখন অবস্থান করিতেছিলেন। ১৮ই মে তারিখে রাত্রিকালে একদল পুলিশ ও সিপাহী গিয়া সহসা বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এইভাবে আপনাদিগকে পরিবেষ্টিত হইতে দেখিয়া বিপ্লবীরা নিরুপায় হইয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। পুলিশ ও সৈন্যদলও ইহার প্রত্যুত্তরে গুলিবর্ষণ সুরু করিল। বিপ্লবীদের নিকট সেদিন অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদের পরিমাণ ছিল অল্প—সংখ্যাতেও তাঁহারা অধিক ছিলেন না। অপর পক্ষে পুলিশ ও সিপাহীদের সংখ্যা তাঁহাদের তুলনায় সেদিন অনেক বেশি। তাহারা বাড়ীটির উপর অবিশ্রান্ত ভাবে গুলি বর্ষণ করিয়া চলিল। বিপ্লবীরা বুঝিতে পারিলেন যে লড়াই চালাইয়া কোনই লাভ নাই। ইতিমধ্যেই পূর্ণ তালুকদার, শচীন্দ্র দাস ও মনোরঞ্জন দাস সিপাহীদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় পুলিশের পক্ষ হইতে অস্ত্র-ত্যাগ ও আত্ম-সমর্পণের আহ্বান আসিল। বিপ্লবীরাও স্থির করিলেন যে, সে অবস্থায় আত্ম-সমর্পণই সমীচীন হইবে।

বিপ্লবীরা তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র পুলিশের নিকট বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—তারপর তাহাদের নির্দ্দেশমত হাত উপরে তুলিয়া গৃহ হইতে একে একে বাহির হইয়া আসিলেন। পুলিশ সকলকেই গ্রেপ্তার করিল। তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত প্রভৃতি এইভাবেই ধরা পড়িলেন পুলিশের হাতে।

(ক্রমশঃ)

কালের মন্দিরা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোঙের বিলাপ

বৃদ্ধ হূণ-যোদ্ধা মোঙ্ গল্প বলিতেছিল। নির্জন বনপথের পাশে ক্ষুদ্র একটি জলসত্র; এই সত্রের প্রপাপালিকা যুবতী অদূরে বসিয়া করলগ্ন-কপোলে মোঙের গল্প শুনিতেছিল।

চারিদিকে প্রস্তরাকীর্ণ অসমতল ভূমির উপর দেবদারু, পিয়াল ও মধুকের বন। পথের ধারে বন তত ঘন নয়, যত দূরে গিয়াছে ততই নিবিড় হইয়াছে। অনুচ্চ পর্বতের শ্রেণী দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে শল্কাবৃত সরীসৃপের ন্যায় নিদ্রালুভাবে পড়িয়া আছে। নবাগত গ্রীষ্মের আলস্য ও পক্ক মধুক-ফলের গুরু সুগন্ধ মিশিয়া আতপ্ত বাতাসকে মদমন্থর করিয়া তুলিয়াছে।

এই পর্বত-কান্তার-তরঙ্গিত বিচিত্র দৃশ্যের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ কুটিল পথটি যেন অতি যত্নে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গিয়াছে। দ্বিপ্রহরেও পথ জনহীন, এই পার্বত্য রাজ্যের কেন্দ্রপুরী কপোতকূট এখান হইতে প্রায় ক্রোশেক পথ দক্ষিণে। পথের পাশে রুক্ষ প্রস্তরে নির্মিত একটি কুটীর—ইহাই জলসত্র; তাহার দুই পাশে দুইটি দীর্ঘ ঋজু দেবদারু বৃক্ষ ঘন কুঞ্চিত পত্রভারে স্থানটিকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধ হূণ মোঙ্ একটি দেবদারুর কাণ্ডে পৃষ্ঠ-ভার অর্পণ করিয়া জানুদ্বয় বাহু দ্বারা আবেষ্টন পূর্বক নিজ স্মৃতিকথা বলিতেছিল।

মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক মগধেশ্বর স্কন্দের ষোড়শ রাজ্যাঙ্কে উত্তরপশ্চিম ভারতের শৈলবন্ধুর অধিত্যকার একপ্রান্তে, বিটঙ্ক নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী কপোতকূট হইতে অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র জলসত্রের তরুচ্ছায়ামূলে আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

বৃদ্ধ মোঙ্ নিজের বিলাপপূর্ণ স্মৃতিকথা শুনাইতে ভালবাসিত। তাহার যোদ্ধ জীবন শেষ হইয়াছে, দেহে আর শক্তি নাই; যে দুর্ধর্ষ প্রকৃতি লইয়া পঁচিশ বৎসর পূর্বে মুক্ত কৃপাণ হস্তে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও বোধকরি নিভিয়া গিয়াছে। তাই, উত্তর মেরুর সুদীর্ঘ রাত্রে তুষার সঙ্কটের মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া মেরুবাসী যেমন সূর্যের স্বপ্ন দেখে, জরাগ্রস্ত মোঙ্ তেমনই হূণ জাতির অতীত বীর্য গৌরবের স্বপ্ন দেখিত। তাহার দেহ খর্ব, মাংসপেশী ক্ষয় হইয়া দেহের চর্ম গোল করিয়া দিয়াছে; তথাপি সে যে এককালে অতিশয় বলশালী ছিল তাহা তাহার শিথিল-চর্মাবৃত দেহ-কঙ্কালের সুবিপুল প্রস্থ হইতে অনুমান হয়। কেশলেশহীন মুখমণ্ডল অগণিত কুঞ্চন চিহ্নে শুষ্ক নারিকেল ফলের আকৃতি ধারণ করিয়াছে; উচ্চ হনু ও ভ্রূ-অস্থির মাঝখানে ক্ষুদ্র চক্ষুদুটি কিন্তু সুকৃষ্ণ। মাথার উপর কয়েক গুচ্ছ পাংশুবর্ণ কেশ আপন বিরলতার ফাঁকে ফাঁকে করোটির গঠন প্রকট করিতেছে।

মোঙের কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর নয়। হূণ জাতির কণ্ঠস্বর স্বভাবতই প্রসাদগুণবর্জিত; মোঙ্ কথা কহিলে মনে হইত, গুরুভারবাহী গো-শকটের তৈলহীন চক্র হইতে আর্ত আপত্তি উত্থিত হইতেছে। নগরের পান-শালায় মোঙ্ গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেই শ্রোতারা উঠিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিত। কিন্তু তথাপি মোঙ্ নিরাশ হইত না; কোনও ক্রমে একটি শ্রোতা সংগ্রহ করিতে পারিলেই সে অতীতের কাহিনী আরম্ভ করিয়া দিত।

বর্তমানে মোঙের একটি শ্রোত্রী জুটিয়াছিল—সে এই জলসত্রের প্রপাপালিকা সুগোপা। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা, তন্বী, বয়স অনুমান কুড়ি বাইশ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুত পঁচিশ বৎসর। অধর প্রান্তে একটু চটুলতার আভাষ, চক্ষুদুটি নীলাঞ্জন মেঘের স্নিগ্ধতায় সরস। সুগোপা কপোতকূটের রাজ-উদ্যানের মালাকরের বনিতা, তাহার হাতের মালা নহিলে রাজকুমারী—

কিন্তু সুগোপার পূর্ব পরিচয় পরে প্রকাশ পাইবে।

মোঙ্. দন্তধাবন কাষ্ঠের অন্বেষণে প্রায় নগর বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে আসে, করঞ্জবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ অন্যত্র পাওয়া যায় না। তখন দুদণ্ড সুগোপার কাছে বসিয়া সে নিজের প্রিয় কাহিনী বলিয়া যায়; সুগোপাও আপত্তি করে না। সারাদিন তাহাকে একাকিনী এই প্রপায় থাকিতে হয়, কচিৎ দুই চারিজন দূরাগত পথিক জলপান করিবার জন্য ক্ষণেক দাঁড়ায়, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া যায়; এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে মোঙের গল্প তাহার মন্দ লাগে না। সুদূর বক্ষু নদীর তীরে হূণেরা কি করিয়া জীবনযাপন করিত; তারপর একদিন যাযাবর জাতির স্বভাবজ অস্থিরতা কেমন করিয়া তাহাদের বিশাল গোষ্ঠীকে গান্ধারের সীমান্তে আনিয়া উপনীত করিল; তারপর পঞ্চনদ-ধৌত শ্যামল উপত্যকার লোভে তাহারা কি ভাবে পঙ্গপালের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; স্কন্দের সহিত হূণদের যুদ্ধ, হূণগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; তারপর দ্বাদশ সহস্র হূণ এই বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল, কপোতকূটে প্রবেশ করিয়া রাজপুরী আক্রমণ করিল—

মোঙ্ গল্প বলিতেছিল, সুগোপা অদূরে পীঠিকার ন্যায় একটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া করলগ্নকপোলে শুনিতেছিল—

দর্দুর-ধ্বনিবৎ একটি শব্দ মোঙের কণ্ঠ হইতে বাহির হইল; ইহা তাহার হাস্য। ক্ষণিক কৌতুক অপনোদিত হইলে মোঙ্ বলিল, 'মেষ! গড্ডলিকা! হূণ জাতি আর নাই, ভেড়া বনিয়া গিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে যাহারা সিংহ ছিল, তাহারা আজ ভেড়া! কাহাকে দোষ দিব? আমাদের যিনি রাজা, যিনি একদিন স্বহস্তে এদেশের বীর্যহীন অধিপতির মাথা কাটিয়া শূলশীর্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি আজ অহিংসা ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বরাহ পর্যন্ত আহার করেন না। ধর্ম! তরবারি যাহার একমাত্র দেবতা, সে চৈত্য নির্মাণ করিয়া কোন্ এক মৃত ভিক্ষুকের অস্থি পূজা করিতেছে! হ হ হ—' মোঙের কণ্ঠ হইতে আবার শ্লেষপূর্ণ দর্দুর ধ্বনি বাহির হইল।

সুগোপা করতল হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—'মহারাজ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।'

মোঙ্ও বৃক্ষকাণ্ডের অবলম্বন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল, তালপত্রের পুত্তলীর ন্যায় সহসা দুই হস্ত আস্ফালিত করিয়া বলিল—'সেই কথাই তো বলিতেছি। কিন্তু কেন এমন হইল? দ্বাদশ সহস্র শোণিত-লোলুপ মরু-সিংহ পঁচিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা আজ কোথায়? ভেড়া—সব ভেড়া।'

সুগোপার অধর কোণে একটু হাসি দেখা দিল; সে বলিল—'মোঙ্, তবে তো তুমিও ভেড়া।'

মোঙ্ও কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনশ্চ ঠেস্ দিয়া বসিল, ক্ষুদ্র চক্ষুযুগল কিছুক্ষণ সুগোপার মুখের উপর স্থাপন করিয়া রহিল; তারপর কতকটা যেন নিজ মনেই বলিল—'অসির নখ, ঘোড়ার পিছনের পা এবং স্ত্রীলোকের কটাক্ষ—মানুষের সমস্ত বিপদের মূলে এই তিনটি। হূণ শিশুকাল হইতেই প্রথম দুইটিকে এড়াইয়া চলিতে শিখে, কিন্তু ঐ তৃতীয় বিপদই তার সর্বনাশ করিয়াছে। বেশ ছিলাম আমরা মরুর কোলে; আমাদের বলিষ্ঠ রূপহীনা নারীরা অশ্ব উষ্ট্রের সহিত একসঙ্গে কাজ করিত, দুর্দম হূণশিশু প্রসব করিত—এদেশের কুহকিনীদের মত পুরুষকে মেষশাবকে পরিণত করিতে পারিত না। প্রবাদ বাক্য মিথ্যা নয়, অসির নখ, ঘোড়ার পা আর স্ত্রীলোকের কটাক্ষ—' মোঙ্ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ভাবে সুগোপার সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া শুষ্ক নারিকেলের মত মাথাটি নাড়িতে লাগিল।

মৃদু হাসিয়া সুগোপা বলিল—'মোঙ্—তোমার নাগসেনার কটাক্ষ কি এখনও খুব তীক্ষ্ণ আছে?'

মোঙ্ দুই হাত নাড়িয়া সুগোপার পরিহাস দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল—'এক পুরুষের মধ্যে একটা জাতি নির্বীর্য হইয়া গেল! আমরা না বুড়া হইয়াছি—যৌবন ও অশ্বিনীদুগ্ধজাত মদ্যের মাদকতা চিরদিন থাকে না, কিন্তু আমাদের সন্তানেরা বা কী? তাহারা হূণের পুত্র বটে, তবু তাহারা হূণ নয়। মরু-সিংহের ঔরসে একপাল ভেড়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

ভেড়ার উপমাটা বৃদ্ধকে চাপিয়া ধরিয়াছে, তদুপরি সে উত্তরোত্তর উষ্ণতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সুগোপা বলিল—'সেজন্য বিলাপ করিয়া লাভ নাই। এ দেশের নারীরা তোমাদের সাধিয়া বিবাহ করে নাই, তোমরাই বলপূর্বক তাহাদের বিবাহ করিয়াছিলে—এখন

কাঁদিলে চলিবে কেন? আর, ফলও নিতান্ত মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তোমাদের বংশধরেরা—আর কিছু না হোক—তোমাদের চেয়ে সুশ্রী। তাহাদের কুল না থাক, শীল আছে।'

'শীল আছে!' মোঙের স্বর ক্রোধে আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—'কী প্রয়োজন শীলের? শিষ্টতার দ্বারা শত্রুর মুণ্ড কাটিয়া লওয়া যায়? কশার পরিবর্তে সৌজন্য প্রয়োগ করিলে ঘোড়া অধিক দৌড়ায়? আমরা যেদিন রাজধানী অধিকার করি, সেদিন কি শিষ্টতা দেখাইয়াছিলাম? বাজপাখার মত আমরা কপোতকূটের উপর পড়িয়াছিলাম—নগরের পয়োনালক পথে রক্তের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল! রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা আমাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল—হ হ হ—' মোঙ্ আবার হাসিল—'রাজপ্রাসাদ বিজয়ের কথা স্মরণ হইলে এখনও আমার রক্ত নৃত্য করিয়া ওঠে—'

সুগোপা বলিল—'রক্তপিপাসু হূণ, তবে সেই গল্পই বল, তোমার আক্ষেপ শুনিবার আগ্রহ আমার নাই।'

দুরস্থ শিকারের প্রতি চলচ্ছক্তিহীন স্থবির ব্যাঘ্র যেভাবে তাকাইয়া থাকে, মোঙ্ সেইভাবে শূন্যে তাকাইয়া রহিল, লালায়িত রসনায় বলিতে লাগিল—'সেদিন দুই মুঠি ভরিয়া সোনা লুঠ করিয়াছিলাম। প্রাসাদের নিম্নে অন্ধকূপ কক্ষে সোনার দীনার স্তূপীকৃত ছিল—আটজন রক্ষী সেই গর্ভগৃহ পাহারা দিতেছিল···তুষকাণ প্রথমে সেই গুপ্ত কোষাগারের সন্ধান পায়; আমরা ত্রিশ জন হূণ গিয়া রক্ষীদের কাটিয়া ফেলিলাম। তারপর সকলে মিলিয়া সেই দীনার স্তূপ···এত সোনা আর কখনও দেখিব না। তুষ্‌কাণ ছিল আমাদের নায়ক, অধিকাংশ দীনার তাহার ভাগে পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইবার পর সেই সোনা আমাদের রাজাকে উপহার দিয়া তুষকাণ চষ্টনদুর্গের অধিপতি হইয়া বসিল—'

সুগোপা বলিল—'তা জানি। তারপর আর কি করিলে?'

মোঙ বলিয়া চলিল—'রত্নাগার হইতে উপরে আসিয়া আমরা রাজ অবরোধের দিকে ছুটিলাম। আমাদের পূর্বেই সেখানে বহু হূণ পৌছিয়াছিল; চারিদিক হইতে নারীকণ্ঠের চীৎকার, ক্রন্দন, আর্তনাদ উঠিতেছিল। আমরা অবরোধের অলিন্দে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে এক পরম কৌতুককর খেলা চলিতেছে। ছয় সাত জন হূণ যোদ্ধা একটা ক্ষুদ্র বালকের দেহ লইয়া মুক্ত কৃপাণের উপর লোফালুফি করিতেছে। বালকটা রাজপুত্র—এক বৎসর বয়ঃক্রম হইবে—মাংসের একটা উলঙ্গ পিণ্ড বলিলেই হয়। একজন তাহাকে তরবারির ফলার উপর লইয়া আর একজনের দিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে তববারির ফলার উপর গ্রহণ করিতেছে, মাটিতে পড়িতে দিতেছে না। শূন্যে শূন্যে খেলা চলিতেছে। শিশুটা মরে নাই, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কাতরোক্তি করিতেছে। পাছে তরবারির আঘাতে কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এইজন্য সকলেই তাহাকে ফলার পার্শ্বদেশে গ্রহণ করিতেছে; তবু শিশুটার সর্বাঙ্গ কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

'আমরাও গিয়া খেলায় যোগ দিলাম; মাঝে মাঝে হাসির অট্টরোল উঠিতে লাগিল। একটা যুবতী দ্বার পথে উঁকি মারিয়া সহসা চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল, আমাদের মধ্যে দুই চারিজন খেলা ছাড়িয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

এই সময় কে একজন আসিয়া সংবাদ দিল, রাজা ধরা পড়িয়াছে। রক্তপাগল হূণের দল শিশুকে সেইখানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। আমি কিন্তু তাহাদের সঙ্গে গেলাম না। শুধু হত্যা আর লুণ্ঠনে হূণের তৃপ্তি হয় না; নগ্ন তরবারি হস্তে আমি অবরোধের ভিতর প্রবেশ করিলাম।'

এতক্ষণ গল্প বলিতে বলিতে মোঙের ক্ষুদ্র চক্ষুযুগল হিংস্র উল্লাসে জ্বলিতেছিল, এখন সহসা যেন চক্ষুর জ্যোতি নিভিয়া গেল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বিপন্ন স্বরে বলিল—'এই অবরোধের একটা কক্ষে প্রথম নাগসেনার সাক্ষাৎ পাই। পালঙ্কের নীচে লুকাইয়াছিল, তাহাকে টানিয়া বাহির করিলাম। সে কঙ্কন দিয়া আমার কপালে আঘাত করিল। আমি তরবারি ফেলিয়া তাহাকে সাপটাইয়া ধরিলাম; সে আমার বক্ষে কামড়াইয়া দিল। কামড়ের দাগ এখনও আমার বুকে আছে। সেই অবধি—' মোঙের স্বর অত্যন্ত করুণ হইয়া ক্রমে থামিয়া গেল।

সুগোপা করতলে কপোল রাখিয়া নিঃশব্দে শুনিতেছিল,

এই নৃশংস কাহিনী তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দেশব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে যাহার জন্ম, অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বহু চিত্র যাহার শৈশব স্মৃতির মূল উপাদান, যাহার নিজের জননী ও বহু পরিজন এই শোণিতস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—মোঙের কাহিনী শুনিয়া তাহার বিচলিত হইবার কথা নয়। শুধু রাজপুরী অধিকারের এই পুরাবৃত্ত তাহার অজ্ঞাত ছিল বলিয়াই সে মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিবার পর সুগোপা মুখ তুলিয়া বলিল—'সেই শিশুর কি হইল?'

'শিশুর—?' মোঙ্ স্মৃতির জলে পুনরায় ডুব দিয়া বলিল—'শিশুটা সেই অলিন্দে রক্ত-কর্দমের মধ্যে পড়িয়া ছিল—তারপর—? হাঁ ঠিক, মনে পড়িয়াছে। চু-ফাঙ্! পাগলা চু-ফাঙ্! অবরোধ হইতে নাগসেনাকে লইয়া যখন বাহির হইতেছি, দেখি আমাদের পাগল চু-ফাঙ্ শিশুটাকে নিজের ঝোলার মধ্যে পুরিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এটাকে লইয়া কী করিবে—শূল্য মাংস তৈয়ার করিয়া খাইবে?' চু-ফাঙ্ ভাঙ্গা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল—মোঙ আবার চিন্তামজ্জিত হইয়া পড়িল—'আশ্চর্য্য, চু-ফাঙকে সেদিনের পর আর দেখি নাই, হয়তো মরিয়া গিয়াছে। হূণের আয়ু আর মরীচিকার মায়া কখন শেষ হইবে কেহ জানে না। চু-ফাঙ্ পাগল ছিল বটে কিন্তু অনেক যন্ত্র-মন্ত্র জানিত, গাছের পাতা ও শিকড়ের রস দিয়া দেহের অস্ত্রক্ষত অবিকল জুড়িয়া দিতে পারিত—'

সুগোপা জিজ্ঞাসা করিল,—'আর সেই যুবতী? তাহার কি হইল?'

'কোন যুবতী? নাগসেনা?'

সুগোপার অধর একটু প্রসারিত হইল, সে বলিল—'না, নাগসেনার কী হইল তাহা আমরা জানি; নাগসেনা এখন নাগিনী হইয়া তোমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে। আমি অন্য যুবতীর কথা বলিতেছি—যে তোমাদের খেলা দেখিয়া চীৎকার করিয়া পলাইয়াছিল—'

মোঙ্ তাচ্ছিল্যভরে বলিল—'কে তাহার সংবাদ রাখে! দুই তিন জন তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছিল—তারপর কি হইল জানিনা। রাজপুরীতে বহু কিঙ্করী পরিচারিকা ছিল, হূণেরা যে যাহাকে পাইল দখল করিল। কয়েকটা যুবতী আত্মহত্যা করিয়াছিল—'

সুগোপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'বোধহয় সেই যুবতীই আমার মাতা। তিনি রাজপুত্রের ধাত্রী ছিলেন, আমরা একই স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছিলাম।'

মোঙ্ বিস্ময় প্রকাশ করিল না, নিরুৎসুক ভাবে সুগোপার পানে চাহিয়া বলিল—'হইতেও পারে। তাহার বয়স তোমারই মতন ছিল।'

ভূমির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সুগোপা বলিল—'জানিনা আমার মায়ের কি দশা হইয়াছিল। তিনি আর রাজপুরী হইতে গৃহে ফিরেন নাই। হয় তো আত্মহত্যাই করিয়াছিলেন—'

এই সময় তাহাদের বিশ্রম্ভালাপে বাধা পড়িল।

(ক্রমশ)

বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য এক অমূল্য সম্পদ্। ইহার বিচিত্র ছন্দোময়ী কবিতা, অনুপম ভাবময়ী ভাষা এবং জীবন্ত চিত্র-সমন্বিত জীবনী-সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্যকে যুগে যুগে বন্দনীয়, স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় সাহিত্যের যাঁহারা স্রষ্টা, তাঁহারা অনেকেই এই বৈষ্ণব সাহিত্যের রসধারায় পুষ্ট হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র, মাইকেল, নবীন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি সকলেই বৈষ্ণব সাহিত্যে ধুরন্ধর ছিলেন। কাজেই বাংলার জাতীয় সাহিত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে বৈষ্ণব ভাবধারার মূল উৎসের সন্ধান করিতে হইবে। সাহিত্য হিসাবে, সংস্কৃতি হিসাবে, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হিসাবে ইহার যেরূপ অনুশীলন হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই আমি মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে নির্দিষ্ট হওয়ার পূর্বে, কতজনে এই বৈষ্ণব কবিতা বা সাহিত্য সম্বন্ধে সংবাদ রাখিতেন, সে প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কীর্ত্তনের প্রভাব খর্ব হইবার পরে পদাবলীর চর্চা অত্যন্ত সীমাবদ্ধভাবেই হইত, ইহা মনে করিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে না। শ্রাদ্ধাদিতে যে কীর্ত্তন হয়, তাহাও মন দিয়া শ্রবণ করেন এরূপ লোকের সংখ্যা এখনও বিরল। অথচ এই পদাবলীর মধ্য দিয়াই একদিন বাঙালীর সচেতন সত্তা অনন্ত সৌন্দর্যময় বিকাশের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল। একজনের পর একজন কবি—এবং তাঁহাদের মধ্যেই মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ কাব্য-শিল্পীর সম্ভাব দেখি—এই বৈষ্ণব-সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পর্বতশৃঙ্গ হইতে দূরদুরান্তব্যবহিত জলপ্রপাত বহিয়া যেমন একটি প্রসন্নসলিলা প্রশস্ত নদীর সৃষ্টি করে, বহু কবি, সাধক ও শিল্পী বৈষ্ণব সাহিত্য-সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করিয়া এক প্রসন্নোদার রস-স্রোতস্বতীর জন্মদান করিয়াছিলেন। এই রস-প্রপাতের দৌলতেই একদিন বাঙালীর মানসক্ষেত্র সরস, স্নিগ্ধ ও শস্যভারশ্যামল হইয়া উঠিয়াছিল।

বঙ্গদেশের তথা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বৈষ্ণব সাহিত্য যে কী বিপুল স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন! নানক, চৈতন্য, কবীর, দাদূ প্রভৃতি মহাপুরুষ ও অবতারকল্প মহামানবগণের আবির্ভাবে দেশের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ভক্তির প্লাবন বহিয়াছিল।

তাহার ফলেই বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার। এক-দিকে রামায়ণ, অপর দিকে কৃষ্ণায়ন কাব্যের ধারা ছুটিল। আমাদের কৃত্তিবাস এবং উত্তর পশ্চিমের তুলসীদাস রাম-ভক্তিমূলক কাব্য লিখিয়া ভক্তিধর্মের যে প্রেরণা যোগাইলেন, তাহার তুলনা নাই। এই প্রেরণার ইতিবৃত্ত না জানিলে রামায়ণের ভাবধারা বুঝিতে পারা যাইবে না। রামায়ণে যে ভক্তিরসের চূড়ান্ত পরিণতি আমরা দেখিতে পাই, তাহা কখনও আকস্মিক হইতে পারে না। সেখানে আমরা শুধু কবি-মানসেরই পরিচয় পাই না—পরিচয় পাই সমগ্র দেশের প্রাণসত্তার। কৃত্তিবাসে যাঁহারা কেবল বাল্মীকির তর্জমার অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রাণসত্তার অপূর্ব পরিণতির সম্বন্ধে বিপুল অজ্ঞতাই দেখাইয়াছেন। যে ভক্তিরসের হৃদয় স্পন্দন আমরা কৃত্তিবাসে পাই, বাল্মীকির মধ্যে তাহা কোথায় পাইব? মহর্ষির তিরোধানের বহু শতাব্দীর পরে ভারত যে প্রাণচঞ্চল সত্ত্বগুণপ্রধান অভিনব সত্তার সন্ধান পাইয়াছিল, তাহারই পরিচয় মিলে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি সুরদাসের কাব্য-কবিতায়, তাহারই বাদশাহী পাঞ্জা মিলে কৃত্তিবাসে, তুলসীদাসের রামচরিতে। কৃত্তিবাসে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযোজিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও উহার মূল সুর সম্বন্ধে আমাদের বুঝিতে বাধা হইবে যদি আমরা কৃত্তিবাস ও তুলসীদাসের কবিতা দেশের আধ্যাত্মিক পরিবেশ হইতে পৃথক করিয়া দেখি।

চণ্ডীদাসের কবিতা লইয়াও আমাদের কম বিব্রত হইতে হয় না। অনেক স্থলে আমরা ভ্রমে পড়িয়া মনে করি যে শ্রীচৈতন্যই এদেশে ভক্তির ধারা প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের কাব্যে যে প্রেমের সুর পাই, তাহা কখনও প্রেমধর্মের বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের পূর্বে হইতেই পারে না। কিন্তু মহাপ্রভুর অবদান সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনাদর প্রকাশ না করিয়াও একথা বলা যায় যে, যে ভক্তির অমৃতহ্রদে অবগাহন করিয়া ভারতের নানা দেশের কবিবিহঙ্গকুল মধুর কাকলিতে

আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অমৃত সাগরের কৌস্তভমণি শ্রীচৈতন্য বটেন, কিন্তু তাঁহার জন্মের পূর্বে এমন কি বহুপূর্বে নামপ্রেমের মহিমা লোকের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। এই বঙ্গদেশেই হরিদাস—যবন হরিদাস—মহাপ্রভুর পূর্বে তাঁহারই আগমনী গাহিতে শুরু করিয়াছিলেন, নামপ্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশেই মালাধর বসুও মহাপ্রভুর পূর্বে 'বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' বলিয়া প্রেমধর্মের গোপন তথ্যটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রহ্ম হরিদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে বড়। John the Baptist যেমন যীশুখ্রীষ্টের পূর্বে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারই জন্য জমি প্রস্তত করিয়া রাখিতেছিলেন, হরিদাসও তেমনি অগ্রদূতরূপে ভক্তিধর্মের পতাকা বহন করিয়াছিলেন। যীশু যে ধর্ম-প্রচার করিলেন, তাহার অধিকাংশ তত্ত্বই 'জনের' মারফতে পাওয়া যায়।

উত্তর পশ্চিমে আরও একজন মুসলমান এই ভক্তিধর্মের জয়গান করিয়া কম নির্যাতন ভোগ করেন নাই। তাঁহার নাম রসখান, তিনি বাদশাহ বংশের লোক ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি তাঁহার এক বন্ধুর প্ররোচনায় হজযাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু বৃন্দাবন পর্যন্ত আসিয়া তাঁহার মনের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি বন্ধুকে বলিলেন, 'তুমি যাও বন্ধু, আমার যাওয়া হইল না, আমি বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।' 'ম্যায় তো ব্রজ ছোড়কর অব কহীঁ ন জাউঙ্গা।' ক্রমে এই বার্ত্তা বাদশাহের কানে পৌছিল এবং তাঁহার হুকুমে রসখান তাঁহার বিপুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। রসখানের কাল সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন—খুব সম্ভব তিনি কবীর, দাদু প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন। গোপীপ্রেমে বিভোর এই মুসলমান কবির উপর শ্রীচৈতন্যের প্রভাব কল্পনা করার চেষ্টা ইতিহাস সমর্থন করিবে না। এই কবিই বলিয়াছেন:

শাস্ত্রন পঢ়ি পণ্ডিত ভয়ে কৈ মৌলবী কুরাণ।
জু পৈ প্রেম জান্যো নহীঁ কহা কিয়ো রসখান॥
—প্রেমবাটিকা

ইনিই লিখিয়াছেন:

জ্ঞান ধ্যান বিদ্যা মত মতি বিশ্বাস বিবেক।
বিনা প্রেম সব ধূর হ্যায় অগজগ এক অনেক॥
প্রেম বিনা জ্ঞান ধ্যান বিদ্যা সমস্ত ধূলির সমান।

এই রসখান বড় সুন্দর এক কথা বলিয়াছেন: তিনি বলিয়াছেন—আমি নির্গুণ-নিরাকার চক্ষুর অগোচর ব্রহ্মের মধ্যে হরির অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না, বেদ পুরাণের মধ্যে খুঁজিলাম, কত লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায়ও সেই হরির সন্ধান পাইলাম না।

হেরত হেরত হারি পর‍্যো রসখানি
বতায়ো ন লোগ লুগায়ন।
দেখো দুরো বহ কুঞ্জকুটীর মেঁ বৈঠো
পলোটল রাধিকা পায়ন॥

শেষে দেখিলাম তিনি কুঞ্জকুটীরে বসিয়া শ্রীরাধিকার পদ-সম্বাহন করিতেছেন।

এই সকল কবির কবিতা বাংলার বৈষ্ণব কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে। দেশের সমগ্র আধ্যাত্মিক পরিস্থিতির (atmosphere) সংবাদ না জানিলে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মীরার ভজন আমরা উপভোগ করিয়া থাকি, দাদূ দয়ালের তত্ত্ব-কথা আমরা সাদরে অনুধাবন করিয়া থাকি, কিন্তু যে পরি-স্থিতিতে এই অপূর্ব সাহিত্যের জন্ম,তাহা আমরা ভাল করিয়া অনুশীলন করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কোনও একটি ভাল চিত্র বুঝিতে হইলে তাহার পরিবেশটি বুঝা যেমন প্রয়োজন, তেমনি শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যশৈলী বুঝিতে হইলে পরিস্থিতিটির সন্ধান করিতে হইবে। মেঘনাদবধের কাব্য-শৈলী আর চিত্রাঙ্গদার কাব্য-শৈলী এক নহে, তাহার প্রধান কারণ উভয়ের মানসিক পরিস্থিতির প্রভাব। যে পরিবেশে মেঘনাদবধ মহাকাব্যের জন্ম হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সময়ে তাহা প্রভাবশালী ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর ঠিকই বলিয়াছেন যে মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে, মেঘনাদবধ আর হয় না। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতাও বুঝি তাহার স্রোত হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতার Background সেকালেই সম্ভব ছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারাই কঠিন, বৈষ্ণব কবিতার সৃষ্টি হওয়া ত দূরের কথা! তবে সুখের বিষয় এই যে, আগেকার অপেক্ষা বৈষ্ণব কবিতার প্রতি অনুরাগ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু এ অনুরাগ অনেকটা বিশ্লেষণের অনুরাগ, গবেষণার অনুরাগ। শবব্যবচ্ছেদ করিয়া যেমন জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনা যায় না, এ অনুরাগের দ্বারা তেমনি বৈষ্ণব

কবিতায় প্রাণশক্তির' সন্ধান মিলে না। কোথায় সেই প্রেম, কোথায় সেই উদারতা, কোথায় সেই দুস্পৃরণীয় সৌন্দর্যলালসা—যাহা একদিন সারা ভারতকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে তুলিয়া ধরিয়াছিল।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় একথা ভুলিলে চলিবে না যে বাংলার আর্দ্র-বায়ু কোমল বৈষ্ণবরসের জন্ম দেয় নাই। দক্ষিণ ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতে ভক্তিধর্মের প্রবল বন্যা বহিয়াছিল। ভাগবত, নারদ পঞ্চরাত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র আদি প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দক্ষিণ ভারতের আলোয়ারগণ তামিল ভাষায় যে বিপুল ভক্তিরসপ্রধান সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ভারতীয় হিন্দুদিগের মেরু-মজ্জায় জড়িত হইয়া গিয়াছিল। যে শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ ভক্তিবাদের স্বর্ণপেটিকা, তাহা দক্ষিণ ভারতেই রচিত হইয়াছিল একথা সকলেই জানেন। নম্মা আলোয়ার বা ষট্‌কোপ স্বামী অথবা আণ্ডাল দক্ষিণ ভারতে সেই প্রাচীন যুগে যে ভক্তিধর্মের বন্যা বহাইয়াছিলেন, উত্তর ভারতে তাহা আর অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে কিনা এ সন্দেহ করা যাইতে পারে। প্রাচীন যুগের তামিল রমণী আণ্ডাল মীরাবাইয়ের প্রেম-সেবার পূর্বাভাস দিয়া গিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার স্থান শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে। এই রঙ্গনাথের মন্দিরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক কন্যা বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন এমন কথাও লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মের যে প্রসার হইয়াছিল, তাহা জগতে আর কোথায়ও হয় নাই।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনায় যদি আমরা এই কথাটি বিস্মৃত হই, তাহা হইলে শুধু যে সেই সাহিত্যের প্রতি অবিচার করিব তাহা নহে; এই সাহিত্যের প্রাণ-স্পন্দনটুকু ধরিতে পারিব না। বাংলা সাহিত্যের মণি-কুট্টিমে এই যে বিপুল সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত তথ্য বুঝিতে হইলে ভারতের নানা প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তবেই আমাদের আলোচনা সার্থক ও ফলপ্রদ হইবে। যে ভারতে বৈষ্ণবধর্ম আমাদের সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে মহিমামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রকৃত মর্যাদা আমরা দিতে পারিব না, যতক্ষণ না আমরা এই সমগ্র ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যকে দেখিতে পারি।

এই মনে করুন আমাদের পদাবলী-সাহিত্য কীর্ত্তন হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে সে দেখা অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য। পদাবলী কীর্তনের জন্য এবং কীর্তন পদাবলীর জন্য। ব্রজবুলি ভাষা কেন সৃষ্ট হইল, তাহা হয়তো সঙ্গীতের দিক দিয়াই কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়। পদাবলী ব্যতীত এই কৃত্রিম ভাষা আর কোথায়ও ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কীর্তন ও পদাবলী নিরপেক্ষ নহে। এই পারস্পরিক সম্বন্ধ নিবিষ্টভাবে বিবেচনা না করিলে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা নিরর্থক হইবে বলিয়াই আমি মনে করি।

আমার একান্ত আশা আছে যে, আমাদের দেশের গায়ক ও সুধী সমাজের দৃষ্টি যখন কীর্ত্তনের উপর পতিত হইবে, পদাবলীর মাধুর্যে আকৃষ্ট হইবে এবং বাঙালী প্রতিভার বিশিষ্ট অবদান বৈষ্ণব সাহিত্য ও সঙ্গীতের অপূর্ব চারুকলায় মুগ্ধ হইবে তখন সে দৃষ্টি আর অন্যদিকে ফিরিতে চাহিবে না।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ—

কংগ্রেসকর্ম্মীরা দেশের শাসনব্যবস্থা দখল করিলে যে নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইবে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দিব্য দৃষ্টিদ্বারা তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সে জন্য তিনি কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে সাবধান করিয়াও দিয়াছিলেন। সরকারী চাকরী ও সরকারী সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় যে কংগ্রেস-সেবকগণের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করিবে, তাহা ভাবিয়াই তিনি লিখিয়াছিলেন—"কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, এইবার তাহাকে সংগ্রামের দ্বারা দেশের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক মুক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রাম অপেক্ষা ভবিষ্যতের এই সংগ্রাম আরও কঠিন। তাহার এক কারণ, ইহার জন্য গঠনকর্ম্মের প্রয়োজন হয় এবং গঠন-কর্ম্মে উত্তেজনা, বাহিরের আড়ম্বর বা আকর্ষণের স্থান নাই—অথচ সর্ব্বতোমুখী গঠনকর্ম্মের দ্বারাই অগণিত জনসাধারণের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে শক্তির সম্যক উদ্দীপন ও বিকাশ হওয়া সম্ভব।" এইরূপ গঠনকর্ম্মী আজ দেশে আর প্রায় নাই। গান্ধীজির আদর্শ লইয়া যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখন সেই নিঃস্বার্থ সেবার ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া সরকারী চাকরীর মোহে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সরকারী চাকরী পাইবার পর আর তাঁহাদের পূর্ব্বের অবস্থার কথা মনে থাকে না। একজন মন্ত্রীও সেদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—তিনি যে বেতন পান, তাঁহাতে তাঁহার চলে না। কেন চলে না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় তাঁহার নাই। কারণ মন্ত্রিত্ব লাভের পরই তিনি জাঁক-জমকের জীবনধারণ প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার সে সকলের প্রয়োজন ছিল না—এখনই বা তাহার প্রয়োজন কেন হইল? মহাত্মাজীকে বড়লাট পদ প্রদান করা হইলে তিনি কখনই দিল্লীর লাটপ্রাসাদে বাস করিতে যাইতেন না। বিলাতে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার সময় আমরা গান্ধীজির সেই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছি। ভারতবর্ষের চিরন্তন ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য কেন জাঁকজমকপূর্ণ ব্যয়বহুল ব্যবস্থা করা হইতেছে, দেশের জনসাধারণ এখনও তাহা বুঝিতে পারে না।

বাঙ্গালার বিপদ—

কুচবিহার রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ করা হইয়াছে। এই দুইটি রাজ্যেই বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। যতই রাজ্যরক্ষার বৃহত্তর স্বার্থের কথা বলা যাউক না কেন, বাঙ্গালা দেশকে ছোট করিয়া দিয়া বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার অভিপ্রায় যে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার গভর্ণরকে কুচবিহারের এজেণ্ট করা উচিত ছিল, তাহাও করা হয় নাই। ত্রিপুরা ও মণিপুরের এজেণ্ট হইয়াছেন আসামের গভর্ণর; বাঙ্গালা দেশকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়ার চেষ্টার অন্ত নাই। বাঙ্গালার রেলপথ তিনভাগে ভাগ করিয়া তথায় বাঙ্গালীর প্রভাব কমাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতায় সকল প্রদেশের লোক বাস করে—সেজন্য হয় ত হঠাৎ একদিন কলিকাতাকেও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন করা হইবে। তাহার পর আর পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া কোন প্রদেশ রাখার প্রয়োজন থাকিবে না। জলপাইগুড়ি দার্জ্জিলিং আসাম প্রদেশে, মেদিনীপুর উড়িষ্যায় ও বাকী জেলাগুলি বিহারে জুড়িয়া দিলেই চলিবে। এ সকল জানিয়াও বাঙ্গালার কংগ্রেস-নেতারা আত্মকলহে ব্যস্ত—বৃহত্তর স্বার্থ দেখার সময় তাঁহাদের নাই। কি করিয়া আপন আপন স্বার্থরক্ষা করিবেন—কংগ্রেসের সকল কর্ম্মীই সেজন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন—একে অপরকে গালি দিয়া সে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালী কি এখনও দেশের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হইবে না? বাঙ্গালী

তাহার আত্মশক্তির কথা কি ভুলিয়া গিয়াছে? দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রের বাঙ্গালা কি এই ভাবে তাহার সত্তা বিলুপ্ত করিয়া দিবে?

কণ্ট্রোল প্রথার উচ্ছেদ—

দেশের একদল লোক কণ্ট্রোল প্রথার উচ্ছেদের পক্ষপাতী। কিন্তু নানা কারণে গভর্ণমেণ্ট সে কাজে অগ্রসর হইতে চাহেন না। ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য—তিনি এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া না লওয়া পর্য্যন্ত দুর্নীতি দূর করা যাইবে না—ইহাই আমার বিশ্বাস। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দেশের নীতি-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহা তুলিয়া দিলে সাময়িক অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু পরিণাম কল্যাণকর হইবে। যে কণ্ট্রোল প্রথা পলে পলে জাতিকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিতেছে, তাহা তুলিয়া দিতেই হইবে।' এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার দৃঢ়মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ভারত সরকারের মতে ভারতবর্ষে মাত্র শতকরা দশ ভাগ খাদ্যের অনটন আছে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দিলে ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিকভাবে তাহা অন্য দেশ হইতে তাহা আনিয়া ঘাটতি পূরণ করিবে। ব্যবসা বাণিজ্যের পথ সহজ ও স্বাভাবিক হইলে প্রতিযোগিতায় পড়িয়া খাদ্যশস্যের মূল্যও কমিয়া যাইবে। সরকারকে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ পোষণ করিতে যে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইতেছে, তাহা বাঁচিলে অনেক সমস্যার সমাধান হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বেও এদেশে খাদ্য শস্যের ঘাটতি ছিল, কিন্তু তাহার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রয়োজন হয় নাই।" এমন কি বর্ত্তমান মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতিও একদিন বলিয়াছিলেন—"আমরা সিভিল সাপ্লাই রূপ শ্বেতহস্তীকে এত অর্থ দিয়া পুষিতে পারিব না।" এখন তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কিনা জানি না। নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীও বার বার সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর প্রায় ২ বৎসর অতীত হইলেও কেহ সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। মুখে শুধু মন্ত্রীরা গান্ধীবাদ প্রচার করেন—কিন্তু কাজের সময় সকলেই বৃটীশ-নীতি অনুসরণ ও অনুকরণের পক্ষপাতী। এইভাবে দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল কে-এম-কারিয়াপ্পা

প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটাধিকার—

বর্ত্তমানে স্থির হইয়াছে ভারতবর্ষে সকল নির্ব্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই ভোটদানের অধিকার লাভ করিবেন। গণতন্ত্রের দিক দিয়া কথাটা খুব মুখরোচক হইতে পারে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কিরূপ ফল প্রদান করিবে, তাহা চিন্তা করিলে শঙ্কিত হইতে হয়। স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিও বলিয়াছেন—যে দেশে শতকরা মাত্র ১৫ জন লোক লেখাপড়া জানে, সে দেশে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রই ভোটাধিকার পাইলে কখনই তাহা সুফলপ্রসূ হইবে না। আমরা গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, কিন্তু যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে দেশ-শাসন অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়, কেহই সে গণতন্ত্র পছন্দ করিবেন না।

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট—

স্বাধীনতা লাভের পর যেমন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান-সমূহে মনোনীত সদস্যদের কার্য্যকাল শেষ করা হইয়াছে, তেমনই অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদগুলিও তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার নূতন করিয়া সেই পদ সৃষ্টির জন্য একজন চেষ্টা করিতেছেন। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রায়ই বয়সের জন্য কাজের অযোগ্য হইয়া থাকেন—কাজেই তাঁহাদের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া কোন কাজ আদায়ের চেষ্টা করা বৃথাই হইবে। তাহা ছাড়া বৃটীশের আমলে যে শ্রেণীর লোক অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেন, তাঁহাদের কথাও সর্ব্বজনবিদিত—তাঁহাদের ফিরাইয়া আনা কোন যুক্তি-তর্কের দ্বারা সমর্থন করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে জন-সাধারণের পক্ষে বিনা বেতনে কাজ করাও সহজসাধ্য নহে—সে জন্য প্রায়ই অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট কথাটির সহিত দুর্নীতির সংযোগ দেখা যাইত। এ অবস্থায় নূতন করিয়া ঐ পদ সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম—দেশের একদল প্রতিপত্তিশালী লোক এই প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছেন। আশা করি—কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সুবিবেচনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ—

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৯৪৮ সালের ২৫শে জানুয়ারী অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে কলিকাতা ৯২ আপার-সার্কুলার রোডে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' নামক এক নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে এবং 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' নামে একখানি নূতন বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রচারের ব্যবস্থা হইতেছে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও ইহার উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এ কার্য্যে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু বিজ্ঞান পরিষদের কর্ম্মীরা নিশ্চেষ্ট নাই। তাঁহারা সম্প্রতি লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা নাম দিয়া আট আনা মূল্যের পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। ঐ গ্রন্থমালায় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'তড়িতের অভ্যুত্থান'

আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

শ্রীনীলরতন ধর প্রণীত 'আমাদের খাদ্য' ও শ্রীসুকুমার বসু প্রণীত 'ধরিত্রী' নামক তিনখানি অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত মনোজ্ঞ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলির মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সকলের সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্প্রতি এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গালার শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থগুলি দেখিলে সত্যেন্দ্রনাথের আবেদনের তাৎপর্য্য অবগত হইবেন। বাঙ্গালা দেশকে সর্ব্বতোভাবে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে হইলে বিজ্ঞানের প্রচার কত অধিক প্রয়োজন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

পরলোকে রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী—

কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত মোহিনীবাবুর পুত্র রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পুণা ইঞ্জিনিয়ারিং

রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

কলেজ হইতে পাশ করিয়া বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলে বস্ত্রশিল্প শিক্ষা করেন ও ১৯০৫ সালে পিতার সহযোগে কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বেলঘরিয়াতেও অপর একটি মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ২৫ বৎসর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু বৎসর কুষ্টিয়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং রায় বাহাদুর হইয়াছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তিনি আজীবন দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যিক সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা সাহিত্য সেবক সমিতির উদ্যোগে গত ২৮শে আগষ্ট অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় সমিতির উৎসাহী সদস্য ও সুলেখক শ্রীরমেশচন্দ্র সেনকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। শ্রীনরেন্দ্র দেব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীগৌরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া সেন মহাশয়ের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সভায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল।

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ—

আগামী ১৯৫০ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ যাহাতে ঋষি শ্রীঅরবিন্দকে প্রদান করা হয় সে জন্য চিলির মাদাম মিষ্ট্রেল, মার্কিনের পার্ল-বাক হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বহু গভর্ণর, ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতি সচেষ্ট হইয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের দান সারা পৃথিবী স্বীকার করিয়া লইয়াছে—তাঁহার সাধনা তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে। কাজেই তাহা যে একদিন সমগ্র পৃথিবীতে আদৃত হইবে, ইহা আদৌ বিচিত্র নহে। শ্রীঅরবিন্দকে নোবেল প্রাইজ পাওয়াইবার জন্য তদ্বিরের প্রয়োজন নাই—তাঁহার সাধনা সে পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা বর্ত্তমান সঙ্কটময় পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিলেই জগদ্বাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তু কলোনী—

আজ ভারতীয় রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু-সমস্যা সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষও এ বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন জানিয়া সকলে আনন্দিত হইবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ৫০৪ কানি জমী রাজ সরকার হইতে গ্রহণ করিয়া অগরতলা হইতে ৪ মাইল দূরে আনন্দনগর মৌজায় একটি কলোনী প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। তথায় ১২০টি পরিবার বাস করিয়া কৃষি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। মিশনের কর্ম্মী স্বামী

ত্যাগীশ্বরানন্দ বেলুড় মঠ হইতে তথায় যাইয়া ২ মাস কাল এ বিষয়ে কাজ করিতেছেন। স্থানটি পাহাড় ও জঙ্গলপূর্ণ। রাজ-সরকার ও রাজ-পরিবারের অনেকে স্বামীজিকে তাঁহার কার্য্যে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। আগরতলা রাজ্যে মিশনের এই পুনর্বসতি কার্য্য সকলের উদাহরণ স্থল হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কর্ম্মীর দলের আত্মকলহে নিযুক্ত না হইয়া ভারতের নানাস্থানে এইরূপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

নারী শারীর-শিক্ষা কংগ্রেস—

গত ১৮ই জুলাই ২৩টি দেশের ২০০ মহিলা-প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর-শিক্ষা কংগ্রেসের ছয় দিবসব্যাপী অধিবেশনে পাঁচটি মহাদেশের পক্ষ হইতে পাঁচজন মহিলা কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুগত্য জানাইয়া বাণী দান করেন। ভারতবর্ষের শ্রীমতী লীলা রায় এশিয়ার পক্ষ হইতে এই বাণী দান করিতে গিয়া বলেন—কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মহম্মদ এবং গান্ধীর স্মৃতিধন্যা এশিয়ার কন্যা আমি। 'শান্তির জন্য শক্তি সাধনাই এশিয়ার বাণী। তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর নিদ্রিত জাতিসমূহ এশিয়ার তপোবন-উদ্ভূত 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' বাণীতেই জাগ্রত ও আলোকিত হইয়াছিল। এশিয়ার নারী যুগ যুগান্ত ধরিয়া শত দুঃখ দুর্য্যোগে সহস্র ঝড়ঝঞ্ঝায় জীবনের এই পরম বেদ বিস্মৃত হয়নি, আজও না।" যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিয়া যে বাণী প্রেরণ করেন শ্রীমতী লীলা রায় এই কংগ্রেসে তাহা পাঠ করেন:—"আমি কুমারী লীলা রায়ের নিকট হইতে নারীদের শারীর-শিক্ষার প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। ভারত এই কংগ্রেসে যোগদান করাতে সুখী হইয়াছি। আমরা মেয়েদের শরীর গঠনে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছি—যাহাতে তাহারা ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। আমি এই কংগ্রেসের সর্বসাফল্য কামনা করিতেছি।" শ্রীমতী লীলা রায় বি-এ, বি-টি, বাঙলা সরকারের অধুনা-লুপ্ত 'কলেজ অব ফিজিকাল এডুকেশন ফর উইমেন' হইতে শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা লইয়া কলিকাতার উইমেন্স কলেজ এবং স্কটিশচার্চ কলেজের ব্যায়াম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হইয়াছিলেন। বাঙলা সরকারের পাব্লিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা নির্বাচিত হইয়া তিনি শারীর

মিসেস রোমেরো ব্রেষ্ট (আর্জেন্টিনা), ডেনমার্কের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ হার্টভিগ ফ্রিস্ক, শ্রীমতী লীলা রায় (ভারতবর্ষ), মিস্ মেরি থেরেসি আইকুম (ফ্রান্স)

শিক্ষার বৈদেশিক বৃত্তি লাভ করেন এবং প্রথমে কানাডার টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তদনন্তর যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর-শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া বর্তমান ১৯৪৮ সালে ইউটা হইতে অনার্সসহ এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের শারীর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি কোপেনহেগেনে

শ্রীমতী লীলা রায়

আন্তর্জাতিক শারীর শিক্ষা কংগ্রেসে এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিয়া য়ুরোপের শারীর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনের পর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমতী লীলা সুপরিচিতা নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ের কনিষ্ঠা সহোদরা।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কার্য্য—

গত ২১শে আগষ্ট হাওড়ায় যে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে গঠন কার্য্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইতে বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা যে ১১ দফা কর্ম্মধারা দাখিল করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। (১) অধিক খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য সঞ্চয় ও খাদ্যের অপচয় নিবারণ (২) কৃষকদিগকে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা ও তাহার প্রয়োগে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি কার্য্যে উৎসাহ দান (৩) কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমবেত-ভাবে চাষ দ্বারা জমির উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রণোদিত করা (৪) ছোট ছোট খাল, সেচ প্রভৃতি খনন ও সংস্কার (৫) দেশবাসীর নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক-শিক্ষার অভিযান (৬) কুটীর শিল্পের প্রসার (৭) স্বয়ং-কাটুনী-বৃদ্ধি পূর্ব্বক বস্ত্র সমস্যার সমাধান চেষ্টা (৮) পল্লীতে পল্লীতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন পূর্ব্বক পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নয়ন (৯) কংগ্রেস-সদস্য সংগ্রহের মধ্য দিয়া গণ-সংযোগ স্থাপন (১০) শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ও তাহাদের উপর শোষণ বন্ধ করা এবং তাহাদিগকে দেশের সমস্যাগুলির বিষয়ে অবহিত করা (১১) শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজ-বিরোধী কার্য্য প্রতিরোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। শুনিয়াছি, ঐ সম্মিলনে ৬জন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। এ সকল কার্য্যে সরকার হইতে শুধু পরিকল্পনা প্রস্তুত দ্বারা কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া মন্ত্রীদের কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কি উচিত ছিল না? ঐ সকল বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ যদি হইয়া থাকে, তবে তাহাও জনগণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে এই সকল কার্য্য আরম্ভ করা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদের সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব এবং কার্য্য-পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতার জন্য কাজগুলি সুষ্ঠ সম্পাদন ও সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। সে বিষয়েও কি মন্ত্রীদের কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না?

পাণ্ডিত্যের সম্মান—

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম-এ ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার জৈন-দর্শন ও জৈন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা করিয়া তিনি কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ২৪ পরগণা জেলার হরিনাভি গ্রামে তাঁহার আদিবাস।

কাবুলে ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনী

১ম চিত্র—তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীর নির্মিত একটি পুরুষ মূর্তির মুখাবয়ব দৃশ্যমান

৩য় চিত্র—তৃতীয় শতাব্দীর নির্মিত গান্ধার দেশীয় একটি যুবকের মুখাকৃতি

২য় চিত্র—চতুর্থ শতাব্দীর নির্মিত গান্ধার দেশীয় একটি নারীর মুখাবয়ব

এই ভ্রাম্যমাণ শিল্পী-প্রদর্শনী প্রথমে দিল্লীতে, তারপরে এলাহাবাদে এবং বর্তমানে কাবুলে গিয়া শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়াছে। শুনা যাইতেছে, ভারতের প্রত্যেক বড় বড় সহরে এই প্রদর্শনী ক্রমে ক্রমে যাইবে। ভারত সরকার এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা। অতীত ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্প-গৌরবকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া বর্তমানের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়ার শুভ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পরলোকে জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র—

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব একাউন্টেন্ট-জেনারেল জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র গত ৩রা ভাদ্র ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অবসর গ্রহণের পর কিছুকাল নিজাম রাজ্যে ও কাসিমবাজার ওয়ার্ডস্ ষ্টেটে কাজ করিয়া তিনি জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ১৫ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন।

হায়দ্রাবাদে কতিপয় মুসলমান অধিবাসীর সহিত দুইজন ভারতীয় সেনানায়কের বন্ধুভাবে আলাপন

কাশ্মীর সমস্যা—

কাশ্মীর সমস্যা চরমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে জন্য এখন ভারতের প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইতেছে! কাশ্মীর ভারতবর্ষে যোগদান করে—পাকিস্তানে যোগদান করিতে অস্বীকার করে। সকল দিক দিয়া ভারতের সহিত সংযুক্ত থাকাই সে পছন্দ করিয়াছে। কিন্তু ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট কাশ্মীরের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, কারণ কাশ্মীর রুসিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান—৫টি দেশের সীমান্তে অবস্থিত। কাশ্মীরে যাহার শক্তিশালী বিমানঘাঁটি থাকিবে—৫টি দেশকেই তাহার ভয়ে ভীত হইয়া থাকিতে হইবে। ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করে, কাশ্মীর যদি তাহাদের হাতে না থাকে, তবে অন্ততঃ পাকিস্তানের মত দুর্ব্বল দেশের অধীন থাকিলে সাম্রাজ্যবাদীদের কর্ত্তৃত্ব তাহার উপর থাকিয়া যাইবে। পশ্চিম-এসিয়ার ইরাক, ইরাণ, ট্রান্সজোর্ডন প্রভৃতি রাজ্যে ঐ ভাবে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসংঘকে জানাইয়াছেন—পাকিস্তান রসদ ও অস্ত্র দিয়া হানাদারদিগকে কাশ্মীর আক্রমণে সাহায্য করিয়াছে। পাকিস্তান সে কথা অস্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা প্রমাণ হইয়াছে। কাজেই পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষ এখন আর কোন কুলকিনারা পাইতেছে না। এ অবস্থায় পাকিস্তানকে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুমান ও বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী এটলী অগ্রসর হইয়াছেন। কাজেই পণ্ডিত জহরলালকে এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। বৃটীশ বা আমেরিকা স্পষ্টভাবে না পারিলেও পাকে-প্রকারে পাকিস্তানকে সমর্থনের পক্ষপাতী—তাহাতে তাহাদের স্বরূপ বুঝা গিয়াছে। পণ্ডিতজী কি করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন দলের সহিত মিতালী রক্ষা করিবেন—তাহাই সমস্যা। কাশ্মীরকে যে কোন প্রকারে হউক, ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখিতেই হইবে। কাশ্মীর ভাগ হইতে দিলে তাহা যেমন কাশ্মীরের অধিবাসীদের ধ্বংসের কারণ হইবে, ভারতের পক্ষেও তাহা তেমনই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে। পণ্ডিতজী ভারত সাম্রাজ্যকে বৃটীশ কমনওয়েলথের মধ্যে রাখায় একদল ভারতীয় সে কার্য্য সমর্থন করেন নাই। এখন যদি তিনি রাজনীতিকদের পাল্লায় পড়িয়া কাশ্মীর সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেন, তবে ভারতে শাসনতন্ত্র পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা—

পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ১৭ দফা অভিযোগ জানাইয়া প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নিকট এক বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছিল। পণ্ডিতজী সে সকল

অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া নিজ অভিমতসহ উক্ত বিবৃতি ও তাঁহার কৈফিয়ৎ সংবাদপত্রে প্রকাশ করায় বাঙ্গালার অধিবাসীরা বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের কথা প্রকাশ করিতেছেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার কৈফিয়তে বাঙ্গালার মন্ত্রীদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রধান ৫টি অভিযোগ সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কথা বলিতে পারেন নাই! যে সময়ে বাঙ্গালার স্থায়ী প্রধান-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিলাতে, সে সময়ে ঐ সকল অভিযোগ ও তাহার উত্তর ভারতের সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় ডাঃ রায়ের সম্মানও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ডাঃ রায় গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ২ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইবার পর প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজী তাহাদের মন্ত্রীসভা হইতে সরাইয়া দিয়া নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করা ডাক্তার রায়ের পক্ষেও আদৌ কঠিন হইবে না। বাঙ্গালা দেশের কংগ্রেস নেতৃত্ব লইয়া দলাদলি বাঙ্গালাকে সারা ভারতের নিকট হীন প্রতিপন্ন করিয়াছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে সকলে তাঁহার সাহস, বুদ্ধি ও শক্তির জন্য শ্রদ্ধা করে—তিনি যদি মন্ত্রিসভার গলদ দূর করেন, তবে তাঁহার প্রতি লোকের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে ও কংগ্রেসের নেতৃত্বও সহজেই তাঁহার করায়ত্ত হইবে। মন্ত্রীদের মধ্যে একদল স্বার্থান্বেষী দেশবাসীর স্বার্থ বলি দিয়া নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। ডাক্তার রায় যদি তাঁহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করেন, তবে দেশবাসী বর্ত্তমান মন্ত্রিসভাকে বিশ্বাস করিতে পারিবে না ও দেশের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া যাইবে। দেশের লোকের অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান হয় নাই—এ কথা কঠোর সত্য। এ অবস্থায় যদি দুর্নীতি নিবারণের ব্যবস্থা না হয়, তবে লোক কি করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্য সমর্থন করিবে? বাঙ্গালা দেশ ধ্বংসোন্মুখ—ডাক্তার রায়ের মত লোকই কেবল এ অবস্থা হইতে বাঙ্গালা দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ। সে জন্য দেশবাসী তাঁহার মুখ চাহিয়া আছে।
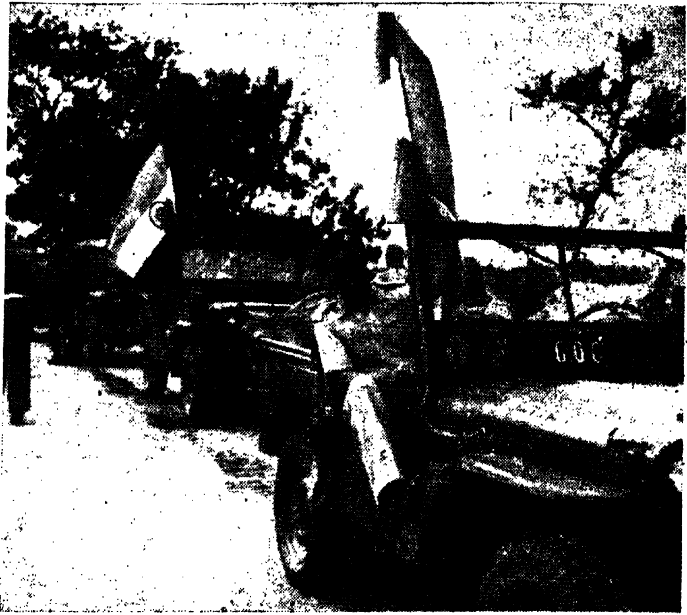
হায়দ্রাবাদে মেজর-জেনারেল জে-এন-চৌধুরী সাঁজোয়া বাহিনী পরিচালনায় রত

বস্ত্র, চিনি ও সরিষার তৈল—

গত এক বৎসর ধরিয়া সরকারী সরবরাহ-বিভাগ বস্ত্র-সমস্যা সম্বন্ধে বহু বিবৃতি ও ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু জনগণের বস্ত্র-সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। মধ্যে বাজারে আদৌ বস্ত্র পাওয়া যাইত না—এখন বাজারে কাপড় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কোনও নির্দ্ধারিত মূল্য নাই। যে যেরূপ ভাবে ইচ্ছা, ঐ বস্ত্র বিক্রয় করিয়া থাকে। সেজন্য একই শ্রেণীর কাপড় বিভিন্ন ব্যবসায়ার নিকট হইতে বিভিন্ন মূল্যে লোক ক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

কেন এরূপ হয় তাহা বুঝা যায় না। অথচ ভারতের কাপড়ের কলসমূহে এত অধিক কাপড় জমিয়া গিয়াছে, যে অধিকাংশ কল বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে সকল কাপড় উপযুক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিলে লোক তাহা ক্রয় করিতে পারিত। মানুষের ক্রয়-শক্তি ক্রমে কমিয়া যাইতেছে—কারণ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্ম সাধারণ লোক স্বল্প আয় দ্বারা খাদ্য সংগ্রহের পর বস্ত্র ক্রয়ের অর্থ সঙ্কুলান করিতে পারে না। এ অবস্থা হইতে মুক্তির কোন আশা দেখা যায় না। চিনির মূল্যও হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে। রেশনের দোকানে ১০ আনা সের দরে চিনি পাওয়া যাইত। খোলা বাজারে চিনির দাম ১২।১৩ আনা ছিল—গত ১ মাস হইতে সহসা তাহা বাড়িয়া ১ টাকা বা ততোধিক হইয়াছে। ইহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। সরকারী ইস্তাহার প্রচার করিয়া ১৫ আনা সের দরে চিনি বিক্রয় করিতে বলা হইয়াছে। এই ভাবে যদি সব জিনিষের দাম বাড়িয়া যায়, তবে লোক ক্রমে না খাইয়া মরিবে ও সরকারী ব্যবস্থার উপর জনগণ আস্থা হারাইয়া ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। শাসক-কর্তৃপক্ষ যে জনগণের স্বার্থরক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহা নানা দিক দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা দেশে সরিষার তৈল একটি নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রধান খাদ্য। সরিষার তৈলের দাম দেড় টাকা হইতে ২ টাকা হইয়াছিল। কিছুদিন হইতে তাহা বাড়িয়া ৩ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুষ্ট লোক বলিতেছে, দালদার কারখানার মালিকগণ বাজারে অধিক পরিমাণে দালদা চালাইবার জন্ম সরিষার তৈলের দর এইভাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন। দালদা ২৷৵০ সের—সরিষার তৈলের দাম তাহা অপেক্ষা অধিক হইলেই লোক তৈলের পরিবর্ত্তে অধিক দালদা ব্যবহার করিবে ও দালদার কাটতি বাড়িবে। দালদা যে উপকারী দ্রব্য নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। অপকার করে কি না, সে বিষয়েও লোক নিঃসন্দেহ নহে। এ অবস্থায় যাঁহারা অধিক দালদা চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা নিজেদের উপকার করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা দেশবাসী আদৌ উপকৃত হইবেন না। অসামরিক সরবরাহ বিভাগ এই সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা নিবারণের কোন চেষ্টা করেন বলিয়া মনে হয় না। খাদ্য সমস্যা ক্রমে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। 'অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনের প্রতিও সরকারী কর্তৃপক্ষের তেমন মনোযোগ নাই।' পশ্চিম বাঙ্গালায় নেতাদের মধ্যে দলাদলি দেশের অবস্থাকে আরও বিপন্ন করিতেছে। তাহা দেখিয়াও নেতারা 'আত্ম-কলহে ব্যস্ত। ইহার পরিণাম কি—তাহা ভাবিয়া দেখিবার লোক দেশে নাই।

ছাত্রীর কৃতিত্ব—

কুমারী চিত্রা ঘোষ এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উদ্ভিদ বিজ্ঞানে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ঈশান বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বাঙ্গালী মহিলার এরূপ সাফল্য এই প্রথম। চিত্রা ১৯৪৭ সালে ইণ্টার পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের শ্রীযুক্ত এস-কে-ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা।

কুমারী চিত্রা ঘোষ

সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা—

পশ্চিম বাঙ্গালায় একটি সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্ম গত ১০ই আগষ্ট

শিক্ষা সচিব রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাংলার বহু কবিরাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কবিরাজ হেরম্বনাথ শাস্ত্রী, কবিরাজ পরিমল সেনগুপ্ত প্রভৃতি সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ কি ভাবে চলিতে পারে, তাহা মন্ত্রী মহাশয়কে বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডাঃ এ-সি চট্টোপাধ্যায়ও সে আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে অবিলম্বে তাহা করা হইলে দেশবাসী আয়ুর্ব্বেদের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতে পারে।

স্বর্গত অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(ইঁহার পরলোকগমন সংবাদ গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।)

সিঁথিতে দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তিরোভাব দিবস—

গত ২২শে শ্রাবণ রবিবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোভাব দিবস উপলক্ষে দেশের সর্ব্বত্র নানাবিধ অনুষ্ঠান

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি—রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে তাঁর শেষ দিন অতিবাহিত করেন সেই ঘরের দৃশ্য ফটো—পান্না সেন

করিয়া রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা হইয়াছে। যদিও দেশের নেতৃবৃন্দ এক ইস্তাহার জারি করিয়া সকলকে এই
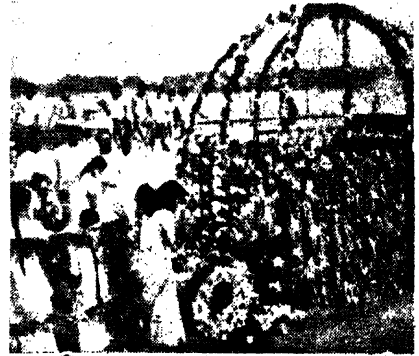
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে নিমতলা ঘাটে কবির চিতায় ভক্তদের মাল্যদান ফটো—পান্না সেন

তিরোভাব উৎসব করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি দেখা গেল, সকলেই এই উপলক্ষে কোন না কোন উৎসবে যোগদান করিয়া কবীন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

করিয়াছেন। রেডিও মারফতও সেদিন রবীন্দ্রনাথের কথা প্রচারিত হইয়াছিল এবং নিমতলা শ্মশান ঘাট (যেখানে রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়), জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী (রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে বাস করিতেন) প্রভৃতি স্থানে লোক সারাদিন তীর্থযাত্রীর ন্যায় গমন করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবসে স্কুল কলেজ প্রভৃতির গ্রীষ্মকালীন অবকাশ থাকায় ছাত্রগণের পক্ষে সে সময়ে সমবেতভাবে রবীন্দ্র স্মরণোৎসব করা সম্ভব হয় না। তাই তাহারা ২২শে শ্রাবণের সুযোগ ছাড়ে না। লোক রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়া তাঁহার রচনা আলোচনা করিবে, তাহাতে বাধা দেওয়া উচিতও নহে—দেখা গেল, শেষ পর্য্যন্ত সে বাধা নিষেধ কেহ মানিলও না। আমরা সকলের সহিত এই উপলক্ষে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সিঁথিতে দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে কলিকাতার বিশিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ

ফটো –শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

কস্তূরী

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এসসি

জীবজাত গন্ধ দ্রব্যের মধ্যে কস্তূরী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহার মনোরম গন্ধ অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। কস্তূরী, Moschus moschiferous, বা কস্তূরী-মৃগ নামক এক জাতীয় হরিণের শুষ্ক রস, নাভির নিম্ন দেশে ক্ষুদ্র থলের ভিতর উৎপন্ন হয়। ইহার অন্য নাম মৃগনাভি বা মৃগমদ। সদ্য অবস্থায় ঐ রসটি অনেকটা মধুর মত গাঢ় থাকে এবং ইহার রং রক্তাভ বাদামী থাকে। হরিণের মৃত্যুর পর ইহা ক্রমশ কঠিন হইয়া যায় এবং পরে অনেকটা দোপাটি ফুলের বীজের ন্যায় ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণাভ দেখিতে হয়। কস্তূরী উৎপন্ন হইবার পর, হরিণ তাহার দেহটি উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে এলাইয়া দেয়। এই সময় তরল কস্তূরী থলে হইতে নিঃসৃত হয় এবং চারিদিক সুন্দর গন্ধে ভরিয়া উঠে। ঐ গন্ধ অনুসরণ করিয়া শিকারীরা কস্তূরী-মৃগের সন্ধানে বাহির করে। কস্তূরী শুধু হরিণের দেহে উৎপন্ন হয়, হরিণীর দেহে নয়। কস্তূরীর সঙ্গে হরিণের বয়সের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; তিন বৎসর অপেক্ষা ছোট হরিণে ইহা পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ যে সকল কস্তূরী মৃগ ধরা পড়ে, তাহাদের বয়স তিন হইতে সাত বৎসর। কস্তূরীর গন্ধে হরিণ হরিণীকে নিকটে আকর্ষণ করে।

কস্তূরী মৃগ ভারতবর্ষ, চীন দেশ, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও অল্পপরিমাণে সাইবেরিয়াতে পাওয়া যায়। ইহারা ক্ষুদ্রকায়, দ্রুতগামী এবং চঞ্চল-প্রকৃতির হয়। এই জন্য কস্তূরী মৃগ শিকার করা খুব কঠিন কাজ। সাধারণতঃ ইহাদের ফাঁদ পাতিয়া ধরা হয়। ইহারা দুইটি করিয়া এক সঙ্গে থাকে, কদাচিৎ ইহাদের দলবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়।

একটি পূর্ণ বয়স্ক মৃগ হইতে মাত্র এক বা দুই আউন্স কস্তূরী পাওয়া যায়। কস্তূরীর উৎপাদন এইরূপ অল্প হওয়ায় এবং ইহার প্রয়োজন এত অধিক থাকায় পৃথিবী হইতে কস্তূরী মৃগ ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। তিব্বত ও তার পার্শ্বস্থ স্থান হইতে যে পরিমাণ কস্তূরী

পাওয়া যাইত তাহার জন্য প্রতিবৎসর প্রায় এক লক্ষ মৃগ হত্যা করা হইত। কস্তূরী মৃগের বংশ বৃদ্ধি কম হওয়ায় এবং মানুষের প্রয়োজন ও বিলাসিতায় ইন্ধন যোগাইবার জন্য কস্তূরী মৃগের বংশ প্রায় লোপ পাইয়া আসিতেছে। ইহাদের বংশ যাহাতে একেবারে নিঃশেষ না হইয়া যায় তাহার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব তিব্বতে লামাদের আদেশ আছে যে শিকারীদের যদি কস্তূরী মৃগ হত্যা করিবার সময় ধরা হয় তবে তাহাদের হাত কাটিয়া মন্দির দ্বারে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করা হইবে।

কস্তূরীর গন্ধ মাস্কোন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের জন্য। সুগন্ধের জন্যই শুধু ইহাকে গন্ধ দ্রব্যে ব্যবহার করা হয় না; কস্তূরীর একটি শক্তি আছে যাহার দ্বারা ইহা অন্য গন্ধ দ্রব্যকে ধরিয়া রাখে; ফলে ঐ গন্ধদ্রব্য খুব ধীরে ধীরে উপিয়া যাইতে থাকে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ঐ ঘটনাটিকে **fixation** বলা হয়। রাসায়নিক শাস্ত্রের উন্নতির ফলে আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে নকল কস্তূরী তৈরী হইতেছে। নকল কস্তূরীর মধ্যে **musk xylene** বা **xylol, musk Ketone** ও **musk amirette** প্রধান। হরিণ মারিবার পর কস্তূরী সহ থলে পশুর দেহ হইতে বাহির করিয়া বিক্রয় করা হয়। অনেক সময় নকল উপায়ে কস্তূরীর দানা তৈরী করিয়া থলিতে পুরিয়া বিক্রয় করা হয়। কস্তূরী বহুদিন হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাকে উদ্দীপক ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অনেক চীনদেশীয় চিকিৎসকের মতে কস্তূরী সর্প দংশন হইতে রক্ষা করে।

মৃগ কস্তূরী ব্যতিত কয়েকটি দ্রব্য আছে যাহাদের গন্ধ কস্তূরীর ন্যায়। আমেরিকায় এক জাতীয় ইঁদুর আছে যাহাদের দেহের বিশেষ গ্রন্থি হইতে কস্তূরীর ন্যায় গন্ধ যুক্ত এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। ইহাদের বলা হয় কস্তূরী ইঁদুর (**musk rat**)। **Hibiscus Abelmoschus** নামক এক জাতীয় ছোট গাছ আছে যাহার বীজ হইতে কস্তূরীর ন্যায় গন্ধ যুক্ত এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়। ইহা উত্তর বঙ্গে আগাছা রূপে জন্মায়। ইহার বাংলা নাম বালকস্তূরী বা মুষক-দানা। এছাড়া কস্তূরী-মূল নামক একজাতীয় উদ্ভিদের শিকড় ও কস্তূরী-কাঠ নামক এক জাতীয় কাঠে কস্তূরীর গন্ধ পাওয়া যায়।

কুলীন

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

অদ্বৈত প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ, শান্তিপুরে মহা ধুমধাম
ভক্তেরা হয়েছে ব্যস্ত; আনন্দের অন্ত নাই, সেথা অবিরাম
চলিতেছে আয়োজন। নিমন্ত্রণ হয় গ্রামে দূর গ্রামান্তরে
আত্মপর ভেদ নাই, অদ্বৈত-আহ্বান আজি—চাই সকলেরে।
জনপিতা সীতানাথ করিতে চাহেন আজি পিতার তর্পণ
শান্তিপুর উদ্বেলিত, উল্লসিত সকলের দেহ প্রাণ মন।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিলেন দলে দলে পাণ্ডিত্যমুখর
আসিলেন কুলীনেরা স্বকুলমর্য্যাদালোভী গর্ব্বিত অন্তর।
বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মাঝে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপ তলে মনোহর
বসিয়াছে পণ্ডিতের সভা, উঠে বেদ বেদান্তের ঝড়!
সগুণ বা গুণাতীত, স্রষ্টা তিনি নিরাকার কিংবা দেহধারী?
পণ্ডিতসভায় চিরকাল ভগবান নিয়ে হয় মারামারি!
অফুরন্ত স্নেহ যাঁর, স্থাবরে জঙ্গমে যাঁর নিত্য নব দান
সীমাতুচ্ছ পাণ্ডিত্যের দম্ভ সেথা বিচারের বস্তু ভগবান্!
শ্রাদ্ধশেষে যথাবিধি হাতে পূর্ণপাত্র করি প্রফুল্ল আননে,
আসিলেন সীতানাথ ধীরে ধীরে পণ্ডিতের কুলীনের স্থানে;
শ্রাদ্ধশেষে পূর্ণপাত্র কুলীনে অর্পণ করা শাস্ত্রের বিধান,
বাহিরে আসেন তাই শ্রীঅদ্বৈত করিবারে কুলীন সন্ধান।
স্বয়ম্বর সভা মাঝে প্রত্যেক ক্ষত্রিয় যথা দেখি বরমালা
লুব্ধ হয়, তেমতি কুলীন দলে পাগল করিল পূর্ণথালা!
সভাক্ষেত্রে প্রতিজন আপনার উচ্চবংশ-মর্য্যাদায় ভাবি
সীতানাথ পানে চাহি, আশান্বিত নেত্র লয়ে পাত্র করে দাবি।
চলিলেন সীতানাথ, কি অপূর্ব্ব সেই তনু দিব্যদ্যুতিমাখা
জাতিকুলগর্বী মাঝে নাহি মিলে একজনো কুলীনের দেখা।
কি সৌম্য সে অবয়ব তুচ্ছ করি সভাস্থিত অগণিত দ্বিজে,
দাঁড়ালেন দ্বারে আসি প্রকৃত শাস্ত্রার্থজ্ঞাতা, কুলীনের খোঁজে।
কুলীন অন্বেষি নেত্র অদ্বৈতের মুহূর্ত্তেতে হইল উজ্জ্বল,
'পেয়েছি কুলীন শ্রেষ্ঠে আজি মোর পিতৃশ্রাদ্ধ হইল সফল'—
বলিয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল প্রভু অনন্ত উল্লাস,
কুলীন দেখিতে আসি লোকে ভাবে বিস্ময়ে—এ যে হরিদাস!
শূদ্র তবু পদে আছে, অস্পৃশ্য যে হরিদাস জাতিতে যবন
কি আশ্চর্য্য সেই আজি অদ্বৈতের সম্মানিত কুলীন-ভূষণ।
মৃত্তিকা আসনে বসি নিজ মনে হরিদাস করে কৃষ্ণনাম,
কোন দিকে লক্ষ্য নাই দর দর নেত্রে ধারা বহে অবিরাম।
প্রীতি-স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রভু ডাকিলেন—'চোখ খোল, বৎস হরিদাস
আনিয়াছি পূর্ণপাত্র, হে কুলীন শ্রেষ্ঠ ধরো, পূর্ণ করো আশ।'
বিস্ময় ব্যাকুল ভক্ত কাঁপে থর থর—'প্রভু রক্ষা করো মোরে
এ সম্মানী নহি আমি—তার চেয়ে মৃত্যু দাও পতিত পামরে!'
স্থির দীপ্ত কণ্ঠ স্বরে স্তম্ভিত করিয়া সবে শ্রীদ্বৈত ধীরে—
কহিলেন—'ওহে ভক্ত, অভুক্ত যে পিতা মোর, কৃপা করো মোরে,
অন্যায় করিনি কিছু, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ যাহা তাই সত্য জানি
দেহ মন সমর্পিত ভগবান পদে যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি?
অহঙ্কার পূতিগন্ধে মহত্ত্ব কি থাকে কভু, কৌলিন্য কি থাকে?
কুলীনের শ্রেষ্ঠ তুমি, পবিত্রতা নিকেতন, নিত্য যার মুখে—
নৃত্য করে কৃষ্ণ নাম, সেই তুমি সর্ব্বতীর্থ অধিক পাবন,
পুঁথিগত বিদ্যা আর বংশগত কুল নহে কৌলিন্য-কারণ!'
শ্রীঅদ্বৈত অনুরোধে লজ্জায় মরিয়া ভক্ত পাত্র নিল করে,
বিপ্লবও জন্ম নিল মানুষের দম্ভ-রচা কৌলিন্যের ঘরে।

জলঙ্গমন্টি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যমুনা আহীর বললে, হামরা ঘী দহি তৈয়ার করি। সে সব কি বিনা পয়সায় বিকবার জন্ম ?

—কে বলেছে বিনা পয়সায় বেচবার জন্ম ?

—কে বলবে আবার ?—যমুনার মুখের চেহারাটা বিকট হয়ে উঠল: জমিদার বলে। পাইক-পেয়াদারা বলে। একদম জেরবার করে দিচ্ছেন ঠাকুরবাবু।

চারদিকে রোদে-ধোয়া বরিন্দের মাঠ। অপরিমিত আলো, অপরিসীম প্রাণ। হু হু করে হাওয়া বইছে। যেমন করে চৈতালী দুপুরে ঘূর্ণির ঘা দিয়ে দিয়ে উপড়ে নেয়—ছিঁড়ে নেয় মৃত ঘাস আর শুকনো পাতা, তেমনি ভাবে এই হাওয়া যেন মনের সব জঞ্জালকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। দূরে-কাছে ঘাসবনের মধ্যে পাহাড়ের নীল রেখার মতো পিঠ তুলে জেগে আছে অতিকায় সব মহিষ—বিরাট বিরাট তাদের শিংগুলো রোদে ঝকঝক করছে। ওই শিংগুলো দেখে ভয় করে। আরণ্য-প্রকৃতির রুদ্র-শাসনের মতো যেন উদ্যত আর উদ্ধত হয়ে আছে।

সব কিছু মিলিয়ে নিজের মধ্যেও যেন কী একটা সঞ্চারিত হয়। কেমন একটা ধারালো উত্তাপ ইস্পাতের ফলার মতো ঝলকায় রক্তের গভীরে। আয়নায় নিজেকে দেখতে পাওয়া যায়না, তবু মনে হয় সেই রোদের ছোঁয়ায় আতসী কাচের প্রতিফলকের মতো জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো। মনে হয়, হাতে একটা অস্ত্র থাকলে এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেও নরহত্যা করতে পারে !

রঞ্জন বললে, জমিদার কি জুলুম করে তোমাদের ওপর ?

—জমিদার ফের কবে হামাদের মাথায় তুলে রাখে ?—বিকট মুখে একটা তিক্ত হাসি হাসল যমুনা আহীর: খাজনা যা ন্যায়—সেটা তো দিচ্ছিলাম। কিন্তু আজ পাইক আসবে—পাঁচ হাঁড়ি দহি লিয়ে যাবে; কাল পিয়াদা আসবে তো ও ফের পাঁচ সের ঘী লিয়ে যাবে। হামরা তবে কী বিচ্‌বার জন্তে এখানে বাথান করে বসে আছি ?

—তোমরা গিয়ে নালিশ করোনা কেন ?—প্রশ্নটা নিজের কানেই ব্যঙ্গের মতো শোনালো। তবু জিজ্ঞাসা করলে রঞ্জন। কেমন সংস্কার হয়ে গেছে। দেবতায় বিশ্বাস না থাকলেও ঝুরি-নামা বটগাছের তলায় সিঁদুর মাথানো থান দেখলে যেমন আপনা থেকেই মাথায় হাত উঠে আসে, তেম্নি। ফল হবেনা জেনেও একবার প্রার্থনা-নিবেদন।

—শুধু একবার নালিশ ? হাজার বার করেছি।—যমুনা বললে, কী হইল ? কিছুই না। উল্‌টে হামাদের হাঁকিয়ে দিলে। বললে, ব্যাটারা ঝুটমুট বলছে।—যমুনা আহীরের মুখের ভেতর দাঁতগুলো ক্রোধে কিড়মিড়িয়ে উঠল: জমিদারবাবুদের অমন হাতীর মতন গতর হয় কেমন করে ? এমন মোটা হয় কেন ? মুফত্ হামাদের দহি-ঘী না খেলে অমন হয় ঠাকুরবাবু ?

কেবল দই-ঘিই নয়—ওই মেদস্ফীত স্বাস্থ্যের পেছনে যে অনেক রক্তশোষণের ইতিহাস—একথা রঞ্জনের মনে এল। ভৈরব-নারায়ণ আফিং খান আর ঝিমোন। কিন্তু সেই ঝিমুনির ফাঁকে ফাঁকেই তাঁর চোখের দৃষ্টি লোলুপ হয়ে ওঠে—কার ঘাড়ে ছোঁ দিয়ে পড়বেন তারই সুযোগ খুঁজে বেড়ান। বরিন্দের মাঠে তালগাছের মাথার ওপরে বসে থাকা ঝিমন্ত চিলের মতো।

দুধের গ্লাস নিয়ে ঝুম্‌রি ভেতরে চলে গিয়েছিল, এতক্ষণ পরে আবার বেরিয়ে এল। হাতে হলুদে ন্যাকড়া-জড়ানো ধূমায়িত একটা ছোট কল্‌কে। ধোঁয়াটার উগ্র দুর্গন্ধে চারদিকের বাতাস মুহূর্তে আবিল হয়ে উঠল। গাঁজা।

যমুনা আহীর অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ভর্ৎসনা-ভরা চোখে তাকালো ঝুমরির দিকে।

—আঃ, এখন কেন নিয়ে এলি! যা—এখন রেখে দে—

রঞ্জন বুঝতে পারল। তাকে দেখে চক্ষুলজ্জা হচ্ছে যমুনার। ঠাকুরবাবু সাত্বিক লোক—তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেই অভ্যস্ত। তাঁর সামনে গাঁজার কলকেতে টান দিতে সংস্কারে বাধছে।

রঞ্জন অভয় দিয়ে বললে, খাওনা—লজ্জা কি!

অত্যন্ত অপরাধীর মতো হে হে করে সংকুচিত হাসি হাসল যমুনা। বললে, হামরা ছোটলোক ঠাকুরবাবু, একটু নেশা-ভাং না করলে হামাদের চলেনা—

রঞ্জন হাসল: তোমাদের লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই, অনেক বড়লোক আর বাবুলোক তোমাদের চেয়ে নেশায় ঢের বেশি ওস্তাদ।—তার মনে পড়ল মুকুন্দপুরের উকিল তরণীবাবুর কথা। নেশায় তিনি এমনি সিদ্ধকাম হয়েছিলেন যে মদ, আফিং, এমন কি মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌শনে পর্যন্ত তাঁর আমেজ আসত না। অগত্যা সেই আমেজ আনবার জন্যে একটা বিচিত্র প্রক্রিয়া তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ঝাঁপিতে পুরে পুরে তিনি গোখরো সাপ পুষতেন। নির্বিষ মুমূর্ষু সাপুড়ের সাপ নয়—তাজা, হিংস্র, তীব্র বিষধরের দল। যখন শরীরের ভেতরে অবসাদ পুঞ্জিত হয়ে উঠত, মন্থর হয়ে যেত রক্তের গতি—দাবী করত স্নায়ুতে স্নায়ুতে অস্বাভাবিক খানিকটা উদ্দীপনা, তখন এই গোখরোর ঝাঁপির ভেতরে হাত দিয়ে তাদের একটি ছোবল নিতেন তরণীবাবু। আর সেই বিষে সারাটা দিন তিনি ঝিম মেরে থাকতেন—বিষের তীব্র যন্ত্রণা তাঁর শরীরে সৃষ্টি করত নেশার একটা স্বর্গীয় আমেজ।

রৌদ্রোজ্জ্বল 'বরিন্দের' মাঠের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত মনটা যেন একটা দার্শনিকতায় ভরে উঠল। শুধু তরণীবাবুই নয়—সারা পৃথিবী জুড়েই চলেছে এই সাপের বিষের নেশা। বিষধরের ছোবল নিয়ে নিয়ে এক ধরণের আমেজের মধ্যে তলিয়ে থাকা, এক জাতীয় উন্মাদনায় স্নায়ুকুণ্ডলীকে উত্তেজিত করে তোলা। কুমার ভৈরব-নারায়ণ! আরো অনেক কুমার বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, মিল-মালিক। কিন্তু তার পর? সব খেলার শেষ আছে—এ খেলারও একটা সমাপ্তি ঘটতে বাধ্য। এমন কোনো গোখরো নেই কি—যাকে নিয়ে শুধু নেশা-নেশা খেলাই চলেনা? অনিবার্য অমোঘ তার বিষ—তার জ্বালা একবার শুরু হয়ে গেলে নিষ্কৃতি নেই আর?

আছে বৈ কি। ধানসিঁড়ি ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সিঁথির রেখার মতো পথ। সেই পথে শাদা ধুলোর একটা হাল্‌কা আস্তর বিছোনো। রাত্রিতে যখন আকাশে চন্দন মাখিয়ে চাঁদ ওঠে—নিজেদের দীর্ঘ ছায়াগুলোর দিকে কেমন ভীত বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে তালের বন—হাওয়ায় হাওয়ায় তাল পাতায় খড়্ খড়্ করে শব্দ বাজে, তখন: তখন জ্যোৎস্নায় ধুয়ে-যাওয়া সেই ধুলোভরা ফালি পথের ওপর খেলা করতে বেরিয়ে আসে তারা। পথের ওপর নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে, কিলবিল করে ছুটোছুটি করে, জড়াজড়ি করে পরস্পরের সঙ্গে। অপরিণত ক্ষুদ্র ফণাগুলোকে বাতাসের দিকে সমুদ্যত করে যেন বিষসঞ্চয়ে পুষ্ট করে নিতে চায়। তারপর: তারপর পথের ওপর কোনো দূরাগত পদশব্দের স্পন্দন বাজে—ধানসিঁড়ির কোনো একটা শেষপ্রান্ত থেকে একটি হাল্‌কা ছায়া দীর্ঘায়িত হতে হতে এগিয়ে আসে। চক্ষের পলকে ধানক্ষেতের ভেতরে নেমে মাঠের ফাটলে, অধুনা স্বগায় কোনো কাঁকড়ার বর্ষায় করা গর্তে অথবা বাস্তহারা কোনো মেঠো ইঁদুরের আস্তানায় তারা মিলিয়ে যায়।

কিন্তু আর কতকাল তারা শুধু ফণায় বিষ ভরে নেবে? আর কতদিন কেবল ছায়া দেখে ভয় পাবে তারা—পায়ের শব্দ শুনে লুকিয়ে যাবে গর্তের আড়ালে?

ঘোর ভাঙল তার।

যমুনা গাঁজার কল্‌কে নিয়ে টান দিয়েছে, আর সেই সুযোগে এই মানস-মন্থনের পালা শুরু হয়েছে তার। এতক্ষণ পরে কিছু একটা শোনবার প্রত্যাশা করেই যেন সে তাকালো যমুনার মুখের দিকে। খানিকক্ষণ আমেজে বুঁদ হয়ে থাকার পরে যমুনা মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে দিলে। দুর্গন্ধ খানিকটা পিঙ্গল ধোঁয়ার কুয়াশা মাঠের উত্তপ্ত হাওয়ায় ভেঙে ভেঙে মিলিয়ে যেতে লাগল।

—আরো একটা জরুরি কথা আছে ঠাকুরবাবু—

কল্‌কেটা নামিয়ে রেখে যমুনা তাকালো। দেখা গেল দুপুরের কড়া রোদের সঙ্গে গাঁজার তীব্র নেশার ঝাঁজ মিশে একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছে যমুনার মধ্যে।

ক্রমশ লাল হয়ে উঠেছে চোখ দুটো—ঠেলে-ওঠা চোখের রক্তবাহী ছোটো ছোটো শিরাগুলি স্ফীত হয়ে ফেটে পড়বার উপক্রম করেছে। হঠাৎ যমুনাকে কেমন ভয়ঙ্কর মনে হল। তার বাথানের মহিষগুলোর মতোই কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড শরীর—ন্যাড়া মাথা, দৃষ্টিতে একটা হিংস্র জিঘাংসা। লোকটার ভ্রূরেখা প্রায় নেই বললেই চলে, আর অনেকটা সেই কারণেই হয়তো স্বাভাবিক মানবিকতা হারিয়েছে তার চোখ থেকে। ক্ষুধার্ত কোনো বুনো জানোয়ার যেন থাবা পেতে বসেছে রঞ্জনের কাছে। একটা দুর্গন্ধ বিষাক্ত উত্তাপের মতো ছোঁয়া দিচ্ছে তার গায়ে।

—কী জরুরি কথা ?

—আমাদের জেনানাদের লিয়ে কী করব ঠাকুরবাবু ?

—কেন, তাদের আবার কী হল ?

—নজর লাগছে।—চিবিয়ে চিবিয়ে বললে যমুনা আহীর।

—সে কী, কার আবার নজর লাগল ?

—যার নজর লাগে!—যমুনা এমন তীব্র ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে রঞ্জনের দিকে তাকালো যে মনে হল বুঝি তারই মধ্যে যমুনা আহীর তার উদ্দিষ্ট সেই প্রতিপক্ষকে দেখতে পাচ্ছে : ওই শালা পেয়াদার দল। খালি কি দহী-ঘী লিতে আসে ? শালাদের মতলব বহুৎ 'বুঢ়া'—ঠাকুরবাবু।

—বটে!—অকৃত্রিম বিস্ময়ে মন্তব্য করল রঞ্জন।

—হামাদের জরু বেটীর দিকে বহুৎ খারাপ নজর দেয়। খারাপ বাতচিত করে। এতদিন সয়ে গেলাম হামরা।—যমুনার চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল : সেদিন মাঠের ভিতর এক শালা ঝুমরীর হাত ধরেছিল। ঝুমরি হাতের বালার এক ঘা দিয়ে শালার মুখ ফাটিয়ে পালিয়ে এসেছে।—হঠাৎ ক্রোধে রোঁয়া ফোলানো বেড়ালের মতো সোজা হয়ে উঠে বসল যমুনা আহীর : হামি থাকলে কেবল মুখ ফাটিয়েই পালাতে পারত না—জান ভি মাঠের মধ্যে রেখে যেতে হত।

অভিভাবকতার একটা বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গি নিয়ে রঞ্জন বললে, ছিঃ ছিঃ, ওসব খুন খারাপির কথা ভাবতে নেই।

—হামরা ভাবিনা বাবু—এবার আর ঠাকুরবাবু বললে না যমুনা। ক্রোধে-ক্ষোভে ওই জমিদার বাড়ি সংক্রান্ত মানুষগুলি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আত্মীয়তার অনুভূতিও তার মনে জেগে নেই আর। গাঁজার কলকেটাকে উবুড় করে ঢেলে দিতে দিতে যমুনা বললে, হামরা ভাবিনা। কিন্তু খুন চড়ে যায়। দহি-ঘী বিনা পয়সায় লিয়ে যায়—লেও বাবা। ফের ইজ্জতে হাত দিতে চায় ?—যমুনা ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে চোখ ছড়িয়ে দিয়ে বোধ করি জমিদার বাড়িটাকে একবার দেখে নিতে চাইল : হামরা জাতে আহীর বাবু। হামাদের বাপ্ ঠাকুর্দা ছিল জোয়ান—ছিল ডাকু। কথায় কথায় জান লিত তারা।

তারা নিত, তাদের বংশধরেরাও আজ নিতে পারে—যমুনার সমস্ত শরীরে যেন এই সত্যটি অভিব্যক্ত হয়ে উঠল। রঞ্জন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার মনের মধ্যে যেন একটা গোপন পাপের মতো বিঁধছে—সে কুমার ভৈরবনারায়ণের অন্নপুষ্ট। তাই যমুনা তাকে মেনে নিতে পারছে না কোনো আত্মীয়তার অন্তরঙ্গতায় ; খানিকটা পরিমাণে এসেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ করে নামতে পারেনি তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমির ওপরে। এমনি এক একটা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত মুহূর্তে নিজেকে কেমন ত্রিশঙ্কুর মতো মনে হয় তার। শূন্য আকাশে বেশিক্ষণ আর ঝুলে থাকতে পারবেনা তা সে জানে। কিন্তু নীচে পা দিয়ে দাঁড়ানোর মতো মাটিও কি সে খুঁজে পেয়েছে ?

রঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। বললে, আজ চলি যমুনা, আর একদিন আসব।

—কিন্তু হামরা কী করব বাবু ?

যমুনা জানতে চাইল। রঞ্জন ঠিক উত্তর দিতে পারল না। মনে হল, প্রশ্ন করবার আগেই যেন যমুনা নিজের ভেতরে কর্তব্যটাকে নির্ধারণ করে নিয়েছে।

—যা ভালো মনে হয় তাই কোরো—

এর বেশি আর কী বলা যায় ? ধানসিঁড়ি ক্ষেতের আলপথে বিষ সঞ্চয় করে ফিরছে নাগশিশুরা। তাদের বিষফণাকে কে রোধ করবে ? কোনো উপদেশ—কোনো সদিচ্ছাকে মনে হবে মিথ্যার মতো—অর্থহীন প্রবঞ্চনার মতো।

—আচ্ছা চলি—

রঞ্জন বেরিয়ে পড়ল। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে যমুনার মেয়ে ঝুমরি। নাগিনী।

ক্রমশ
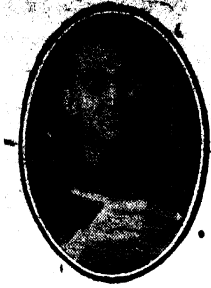
সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৪৯ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলার ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে মোহনবাগান ক্লাবকে হারিয়ে একই বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার লীগ-শীল্ড বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে। একই বছরে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম লীগ-শীল্ড বিজয়ী হয় ১৯৪৫ সালে এবং সে বছরও শীল্ডের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মোহনবাগান ক্লাব। এ বছরের লীগের দুটি খেলাতে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব মোহনবাগানের কাছে হেরে যায়। সেইকারণে শীল্ডের ফাইনালে, এ বছরের উভয় দলের তৃতীয় বারের খেলার ফলাফল সম্পর্কে খেলার মাঠে, ট্রাম-বাসে, চায়ের দোকানে এবং বাড়ীর রকে দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে কয়েকদিন ধরে জোর কল্পনা এবং বাক-বিতণ্ডা চলেছিল। এ বছরের ফাইনাল খেলাটি নানাদিক থেকে ক্রীড়ামহলে আলোচনার এবং আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত হয়। উভয় দলের সম্মতিক্রমে ৫ই সেপ্টেম্বর ফাইনাল খেলাটির দিন স্থির হয়। উভয় দলের টিকিট বিক্রীর বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হয়। কিন্তু সেইমত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব টিকিট বিক্রী না ক'রে একজন খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি এবং অপর জনের অসুস্থতার কারণে হঠাৎ আই এফ এ কর্তৃপক্ষের কাছে ফাইনাল খেলার দিন পরিবর্ত্তনের জন্য এক অনুরোধ জানায়। আই এফ এ সেই অনুরোধের উত্তরে খেলাটির তারিখ পরিবর্ত্তন ক'রে ১৫ই সেপ্টেম্বর করে। এইভাবে আই এফ এ শীল্ডফাইনাল খেলার দিন পরিবর্ত্তন আই এফ এ-র ইতিহাসে প্রথম এবং অভিনব। অন্যদিক থেকে এবারের ফাইনাল খেলার গুরুত্ব ছিল, মোহনবাগান ক্লাব ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে পর পর দু'বার শীল্ড বিজয়ী হয়ে এবছর ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম পরপর তিনবার আই এফ এ শীল্ড বিজয়ের সুযোগ লাভ করে। অপর দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছর প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে শীল্ডের ফাইনালে উঠে দ্বিতীয়বার একই বছরে লীগ-শীল্ড বিজয়ের যে সুযোগ পায় তা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হতে দেয়নি। এ বছর আই এফ এ শীল্ডের অনুষ্ঠানে মোট ৪২টি ফুটবলদল বাংলা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খেলায় যোগদানের জন্য নাম পাঠায়। কিন্তু কয়েকটি বিশিষ্ট ফুটবলদল শেষ পর্য্যন্ত খেলায় যোগদান করেনি। শীল্ড fixtureএর যে অর্দ্ধাংশ থেকে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব উঠেছিলো সেদিকে নামকরা বাঙ্গালোর ব্লু,হায়দরাবাদ পুলিস এবং ঢাকা ফুটবল ক্লাব শেষ পর্য্যন্ত যোগদান করেনি। ফলে ঐদিকে খেলার কোন আকর্ষণই ছিল না। ঐ দিকে প্রথম বিভাগের ই আই রেলদল, জর্জ্জটেলিগ্রাফ এবং দ্বিতীয় বিভাগের কাষ্টমস ছাড়া যে সব বাইরের দল খেলেছিলো তাদের আই এফ এ শীল্ড খেলা দূরে থাক, এখানের নীচের দিকের কোন লীগের খেলায় যোগদানের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা অশোভন হবে না। সেমি-ফাইনালে গৌহাটির মহারাণা ক্লাব ৮-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে গিয়ে ভারতবর্ষের অন্যতম ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ড খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে শীল্ডের ইতিহাসে সেমি-ফাইনালের খেলায় এরূপ শোচনীয় ব্যর্থতা ইতিপূর্ব্বে একবারই হয়েছিল, মহমেডান স্পোর্টিং-হাওড়া

জেলা দলের খেলায়। এবছরের শীল্ডের যে অংশ থেকে মোহনবাগান ক্লাব ফাইনালে যায় সে অংশের মহমেডান স্পোর্টিং—ভবানীপুর দলের তৃতীয় রাউণ্ডের দু'দিনেরই খেলা এবছরের শীল্ডের শ্রেষ্ঠ খেলা বলা অতিশয়োক্তি হবে না। শেষ পর্য্যন্ত ভবানীপুর ক্লাব দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৩-২ গোলে পরাজিত হলেও তাদের খেলা অগৌরব এবং হতাশার হয়নি। সর্ব্বক্ষণই সমর্থকেরা প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে খেলাটি উপভোগ করেছিলেন। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের ফাইনাল খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয়নি। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছরের লীগে এবং শীল্ডে অপরাপর দলগুলির সঙ্গে যে উচ্চাঙ্গের খেলা খেলেছিল শীল্ডের খেলা তেমন হয়নি; যদিও খেলোয়াড়রা বিজয়ী-দলের মতই খেলেছিলো। অপর দিকে মোহনবাগান ক্লাব লীগের দুটি খেলাতে ইষ্টবেঙ্গলের বিপক্ষে যেমন ভাল খেলেছিল সেরকম খেলা শীল্ডে দেখাতে পারেনি। প্রথম সুচনা থেকেই উভয় দলের কয়েকজন খেলার বিধি নিষেধ অমান্য ক'রে বল প্রয়োগ দ্বারা খেলেছিলেন, যার ফলে সত্যকার ফুটবল খেলার আকর্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য ছিল না। খেলার এই শোচনীয় পরিণতির জন্য ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের লেফট ইন্ আমেদকে দোষারোপ করা যায়। খেলার ৫ মিনিট আমেদ বল ছেড়ে মোহনবাগানের অনিল দের বুকে অসম্মানজনক ভাবে পা দিয়ে খেলার মাঠে এক অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা করেন। এর পর থেকেই উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে 'ফাউল' খেলা চলতে থাকে। খেলতে গিয়ে দেখা গেছে অনেক সময় খেলোয়াড়রা এত বেশী দলের প্রতি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে যে, জিদ বশে বলটি আয়ত্বে আনার চেষ্টা করতে গিয়ে অথবা বিপক্ষের খেলোয়াড়কে বাধা দিতে গিয়ে আইন অমান্য করে বসেছে। খেলোয়াড় এবং দর্শকেরা এই সব ছোটখাট ঘটনাকে উপেক্ষা ক'রে খেলার মাঠে সুষ্ঠু আবহাওয়া রক্ষার চেষ্টা করে যদি মারাত্মক ফাউল কিম্বা ইচ্ছাকৃত ভাবে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা অপমান করা না হয়। এ সব কাজ উভয়দলের পক্ষে মারাত্মক এবং বিরোধের কারণ বলেই আইন রচনার প্রয়োজন হয়েছে। খেলার ঝোঁকে কখনও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে অন্যায়কারী খেলোয়াড়কে তার জন্য সঙ্গে সঙ্গে করমর্দ্দন অথবা অন্যভাবে ক্ষমা চেয়ে নিতে আমরা দেখেছি। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় কিন্তু ভুলের জন্য সময়মত সংশোধনের চেষ্টা বা তার জন্য ক্ষমা চাওয়া যদি না হয় তাহলে তার থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অন্যায় হবে না যে, অন্যায়-কারীর ভুল ইচ্ছাকৃত অথবা অন্যায়কারীর একান্ত ভদ্রতা জ্ঞানের অভাব আছে। ফাইনাল খেলার ঘটনায় আমেদ যে ভাবে বল ছেড়ে অভদ্র আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তার জন্য যে তিনি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত তা তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি। রেফারীর মধ্যস্থতার পূর্ব্বেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাইলে ব্যাপারটা সেইখানেই শেষ হ'ত। এখন জনসাধারণ বিচার করবেন এ কাজ ইচ্ছাকৃত না খেলোয়াড়ের দিক থেকে ভদ্রতার অভাব। যে কোন বিশিষ্ট দলের অতি বড় খেলোয়াড়ের পক্ষে এরূপ আচরণ নিন্দনীয়। সকল ক্লাবের সভ্য এবং সমর্থকদের মনে রাখা উচিত, খেলায় জয়লাভও যেমন দলের পক্ষে গৌরবের কারণ অখেলোয়াড়ী আচরণও দলের পক্ষে সমান নিন্দা এবং ক্ষতির কারণ।

খেলার মাঠ ঃ

গত কয়েক বছর ইউরোপীয় ক্লাবগুলি আই এফ এ-র উপর পূর্ব্বের একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব হারিয়েছে। পূর্ব্বে যে কারণে আই এফ এ ভারতীয় ফুটবল খেলার ক্রমোন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো আমরা খুবই আশা ক'রেছিলাম, নিজেদের হাতে কর্ত্তৃত্ব পেলে সেই সব বাধা দূর হবে। খেলা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র গঠনে আমরা যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারাবো, যা আমরা কেবল সুযোগের অভাবেই এত দিন দিতে পারিনি বলে অভিযোগ করে এসেছি। অত্যন্ত লজ্জার কথা—অর্থ,ক্ষমতা,সময় ও সুযোগের অপব্যবহার আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি মজ্জাগত দোষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। খেলার মাঠের কথাই ধরা যাক। মাঠে আমরা এক শ্রেণীর দর্শকের নৈতিক অবনতির পরিচয় আজকাল পাচ্ছি। এক শ্রেণীর দর্শকরা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে খেলার মাঠে প্রকাশ্যভাবে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে সত্য। কিন্তু বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে অসন্তোষ নেই এ ধারণা

তুল। ইট-পাটকেল ছুড়ে অসন্তোষ প্রকাশ না করলেও জনসাধারণকে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অব্যবস্থা এবং রেফারিং সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করতে দেখা গেছে। কোন বড় রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি অবলম্বন হিসাবে না পেলে আনন্দ উপভোগ করতে এসে জনসাধারণ কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করতে উৎসাহিত হয় না বা নির্ব্বিবাদী দর্শক হিসাবে অপরের বিক্ষোভ প্রদর্শন সমর্থন করে না। খেলার মাঠে জনসাধারণের অভিযোগ অনেকগুলি এবং অনেকদিনের। প্রধান অভিযোগ, চাহিদা অনুপাতে খেলার মাঠের স্থানাভাব। চ্যারিটি ম্যাচে টিকিটের মূল্য যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সভ্যদের সাধারণ দর্শক শ্রেণীর সবুজ আসনগুলির বৃহৎ অংশ দিতে হয়, যে অংশটা চ্যারিটি ম্যাচ না হ'লে সাধারণ দর্শকেরা অনায়াসে পেয়ে থাকে। সুতরাং চ্যারিটি খেলায় সাধারণ দর্শকদের এক বৃহৎ অংশকে এই ভাবে খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই কারণে তাদের মধ্যে অসন্তোষ স্বাভাবিক। চ্যারিটি খেলার গুরুত্ব দর্শকদের মধ্যে এক মানসিক উত্তেজনা এবং খেলা দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করে, যার ফলে টিকিট পাওয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য খেলা আরম্ভের ৯।১০ ঘণ্টা আগে থেকে মাঠে উপস্থিত হয়। চ্যারিটি ম্যাচ নয় অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলায় দর্শকদের মধ্যে খেলা দেখার এত উৎসাহ দেখা যায় না। ৯।১০ ঘণ্টা মানুষের সারিতে দাঁড়িয়ে প্রখর রোদ এবং প্রবল বারিপাত সহ্য করা শরীর ধর্ম্মের পক্ষে কম নির্য্যাতন নয়। এইভাবে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করতে জনসাধারণকে বাধ্য করা, বা উৎসাহিত করা আই এফ এর পক্ষে নীতিজ্ঞান বিবর্জ্জিত কাজের পরিচায়ক। সহস্র সহস্র লোকের প্রাণশক্তিকে এইভাবে অবহেলা এবং ক্ষয় ক'রে হাসপাতাল বা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা, মোটেই জনকল্যাণজনক কাজ নয়, আত্মঘাতির সামিল। চ্যারিটি খেলায় টিকিট সংগ্রহে ব্যর্থকাম হ'য়ে এক শ্রেণীর দর্শক খেলা দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা দমন না করতে পেরে শেষে বিপদজনকভাবে বেড়া টপকে মাঠে প্রবেশ করতে উৎসাহিত হয়। ইংরেজ রাজত্বকালে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট এবং ঘোড় শওয়ার পুলিশরা দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী নিয়ে মাঠে ঢুকতে সাহায্য করতো দেখা গেছে। অবস্থার পরিবর্ত্তনে এখন সে ব্যবস্থা মাঠে চোখে পড়ে না। বরং পুলিশ দর্শকদের এই অন্যায় প্রবেশ পথে বাধা দেয়; এই শ্রেণীর দর্শকদের মধ্যে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের পর্য্যন্ত যোগ দিতে দেখা যায়। সোডার বোতল এবং ইটপাটকেল ছুড়ে দর্শকের প্রবেশ পথ থেকে পুলিশকে হটিয়ে দেবার উৎসাহও প্রকাশ পায়। ফলে অবস্থা আয়ত্বে আনতে পুলিস যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তা অবশ্য সব সময়ে সমর্থন যোগ্য হয় না। সুতরাং খেলার মাঠ যেন আজ আমাদের জাতীয়-নৈতিক-চরিত্র অধোগতির এক দৃষ্টান্তস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থার জন্য আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষেরও যথেষ্ট ত্রুটি আছে। তাঁদের দায়িত্ব-বিবেচনার অভাবের ফলেই খেলার মাঠের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পুলিসের লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস এবং গুলির সাহায্য নিতে হয়েছে। তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য দর্শকবৃন্দের চাহিদা অনুপাতে খেলার ষ্টেডিয়াম তৈরী করা এবং যে পর্য্যন্ত না ষ্টেডিয়াম হচ্ছে ততদিন একই দিনে ২টি বড় খেলার ব্যবস্থা ক'রে মাঠে ভীড়ের চাপ কমানো অথবা চ্যারিটি ম্যাচ একেবারে বন্ধ করা। অসামাজিক কাজের ইন্ধন দিয়ে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য বড় কথা, না জনসাধারণকে সকল প্রকার অসামাজিক কাজ থেকে দূরে রেখে ফুটবল খেলার মধ্যে জাতীয় চরিত্র গঠনের যে বিবিধ গুণাবলী আছে সেগুলি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের প্রধান? প্রাথমিক কর্ত্তব্য আমরা জাতীয় সরকার এবং আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষদের বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। চ্যারিটি ম্যাচ সম্বন্ধেও অভিযোগ আছে। চ্যারিটি ম্যাচগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে সমভাবে খেলানো উচিত। দু' একটা ম্যাচ কোন দলকে বেশী খেলতে দেখলে তেমন গায়ে লাগে না কিন্তু একটা দলের ভাল ভাল খেলাগুলি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলানোর অর্থ ক্লাবের সভ্যদের এবং সমর্থকদের আর্থিক অসুবিধায় ফেলা। প্রসঙ্গক্রমে এবছরের মোহনবাগান ক্লাবের চ্যারিটি ম্যাচের কথা বলতে হয়। মোহনবাগান লীগ ৩টে চ্যারিটি ম্যাচ খেলেছিলো। শীল্ডে তাদের খেলাতে হয়েছে তৃতীয় রাউণ্ডে, সেমিফাইনাল ফাইনালে এবং এ বছরের মোট ৬টি চ্যারিটি খেলার মধ্যে মোহনবাগানের ভাগে ৬টা

চ্যারিটি ম্যাচই পড়েছে। অন্যদিকে ইষ্টবেঙ্গল ৩, মহামেডান স্পোর্টিং ২, রাজস্থান ১। শীল্ডের ৩য় রাউণ্ডে মোহনবাগান-রাজস্থানের খেলাটি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলানোর কোন যুক্তি পাই না।

আজকাল খেলার মাঠের জনপ্রিয় দল বলতে তিনটি—মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং। এই তিনটি দলের মধ্যে সমান ভাগ ক'রে চ্যারিটি ম্যাচগুলি বণ্টন করলে কোন দলের সভ্যদের এবং সমর্থকদের গায়ে লাগে না। আই এফ এ কর্তৃক অনুষ্ঠিত চ্যারিটি ম্যাচে যে টাকা এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে মোহনবাগান ক্লাবের দান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বললে অত্যুক্তি হবে না। জনপ্রিয় এবং পুরাতন ক্লাব বলেই মোহনবাগানের চ্যারিটি খেলায় অধিক লোক সমাগম হয়। মোহনবাগানের ভাল ভাল খেলাগুলি চ্যারিটির উদ্দেশ্যে খেলানো হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ আপত্তি না তুলে নিজ ক্লাবের সভ্যদের এবং সমর্থকদের আর্থিক দিকটা বিচার না করেই ভদ্রতার খাতিরে আই এফ এ-র সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে চ্যারিটি ম্যাচ খেলতে সম্মতি দেন; ফলে প্রতি বছর তাদেরই বেশী চ্যারিটি ম্যাচ খেলতে হয়। সভ্য হিসাবে এই ক্লাবের চাঁদা বৃদ্ধি পেয়েছে তার উপর এত অধিক চ্যারিটি ম্যাচ খেলাতে ক্লাবের সভ্যদের অভিযোগ করতে শোনা গেছে, এ অন্যায় অভিযোগ নয়। তার উপর সাধারণ সমর্থকদের অসুবিধাও কম নয়। চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট নিয়ে ক্লাবের সভ্য এবং কর্তৃপক্ষ মহলের হায়রাণি বা কম কি। চ্যারিটি ম্যাচ হলেই ক্লাবের খেলোয়াড়দের এক ভীষণ দুর্ভাবনায় পড়তে হয়। চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করতে খেলার পূর্ব্ব দিনের অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত ক্লাবের তাঁবুতে এবং ক্লাবের কর্তৃপক্ষ মহলের বাড়িতে বাড়িতে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গেছে। খেলার দিন দুপুর বেলা পর্য্যন্ত তাদের বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এবং অফিসের 'বসদের' টিকিট সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। এই ধরণের হায়রাণি, টিকিট সংগ্রহে বিরক্তি এবং হতাশা নিয়ে খেলোয়াড়রা মাঠে খেলতে নামে। অন্যদিক থেকে খেলায় অসাফল্য বা ভুলত্রুটি হলেই সমর্থকদের কটূক্তি এবং গঞ্জনা। এই তো খেলোয়াড়দের জীবন। খেলোয়াড় জীবনে উচ্চাভিলাষ থাকার কথা নয়। ক্ষণিকের করতালি এবং ছাপার অক্ষরে সংবাদপত্রে ছবি বা প্রশংসা এ দেশের খেলোয়াড়দের সামাজিক স্বীকৃতি (Social recognition) যা দেয় তা দিয়ে জীবন সংগ্রামে কোন একটা সুরাহা হয় না। এ দেশের ফুটবল খেলোয়াড়রা যে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা আমাদের চিত্ত বিনোদন করেন তার উপযুক্ত মূল্য তারা পান না কারণ তাঁরা সব সখের খেলোয়াড়। মাঠের দর্শক হিসাবে আমরা যা দিয়ে থাকি তার ষোল আনা মুনাফা মাঠের ঠিকেদার অথবা চ্যারিটি ফণ্ডে যায়। যে খেলোয়াড়রা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চ্যারিটি ফণ্ডে টাকা তুলে দেন সেইসব খেলোয়াড়দের প্রতি আই এফ এ কর্তৃপক্ষের সৌজন্য প্রকাশের কোন গরজ নেই, তাঁদের দর্শনী দিয়ে চ্যারিটি ম্যাচ খেলা দেখতে হয়। প্রথম বিভাগের ১৩টি দল আছে। যে দুটি দল চ্যারিটি ম্যাচ খেলবে তাদের সমান ৬০টি টিকিট এবং বাকি ১১টি দলকে ১২১টি মোট ১৮১ খানি টিকিট প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের জন্য বিনামূল্যে দিলে আই এফ এ-র চ্যারিটি ফণ্ডে ৫৪৩্ টাকা (৩্ টাকা মূল্য হিসাবে) কম উঠবে বটে, কিন্তু অন্যদিকে খেলোয়াড়দের প্রতি যে সুবিচার করা এবং সৌজন্য দেখানো হবে তাতে আই এফ এ-র গৌরব বৃদ্ধিই হবে। এই সৌজন্য বোধ থেকেই আই এফ এ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যের বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

আমাদের দেশের ফুটবল খেলার মান যে ক্রমশঃ নিম্নগামী হচ্ছে এ বিষয়ে একমত নন এমন লোক বিরল। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ এই নিম্ন শ্রেণীর ফুটবল খেলা দেখিয়েই ফুটবল ক্লাবের সভ্যদের তাঁদের দেয় ক্লাবের বার্ষিক চাঁদা ছাড়া চ্যারিটির জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ খরচের দায়ে ফেলছেন তা যুক্তি সঙ্গত নয়। সাধারণ দর্শকশ্রেণীর সমস্তই স্কুল কলেজের ছাত্র এবং দুঃস্থ চাকুরে কেরাণী। একাধিক চ্যারিটি ম্যাচ খেলানো মানেই তাদের অমিতব্যয়ের দায়ে ফেলা; সভ্য সমাজের কোন জাতীয় সরকার এই শ্রেণীর কাজ নিশ্চয় সমর্থন করেন না।

খেলা দেখার স্থানাভাব, নিম্ন শ্রেণীর খেলা, দর্শক এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে অখেলোয়াড়ী আচরণ। ফুটবল আইন পুস্তকের অভাবে, দর্শকশ্রেণীর মধ্যে আইনজ্ঞানের অভাব হেতু বিক্ষোভ, নিম্ন শ্রেণীর রেফারীং, জনসাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা, আধা-পেশাদারী অবাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় আমদানী ক'রে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, ফুটবল খেলার উন্নতিকল্পে কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা না থাকা, জনসাধারণের মধ্যে নাগরিক-বোধ জাগরণের কোন সুপরিকল্পিত প্রচার ব্যবস্থা না থাকা, খেলার মাঠে একশ্রেণীর জুয়াড়ীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ—এই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ঘটনার সমন্বয়ে ফুটবল খেলার মাঠ দূষিত হয়ে উঠেছে; জনসাধারণের মধ্যে ধৈর্য্যের বাঁধ যে ভেঙ্গেছে তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব আই এফ এ কর্তৃপক্ষের। পুলিশের এ কাজ নয়। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে উদ্‌যোগী হয়ে জনসাধারণের কর্ত্তব্য বুদ্ধি এবং সহযোগিতার জন্য আবেদন জানালে খুবই শোভন এবং সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয়।
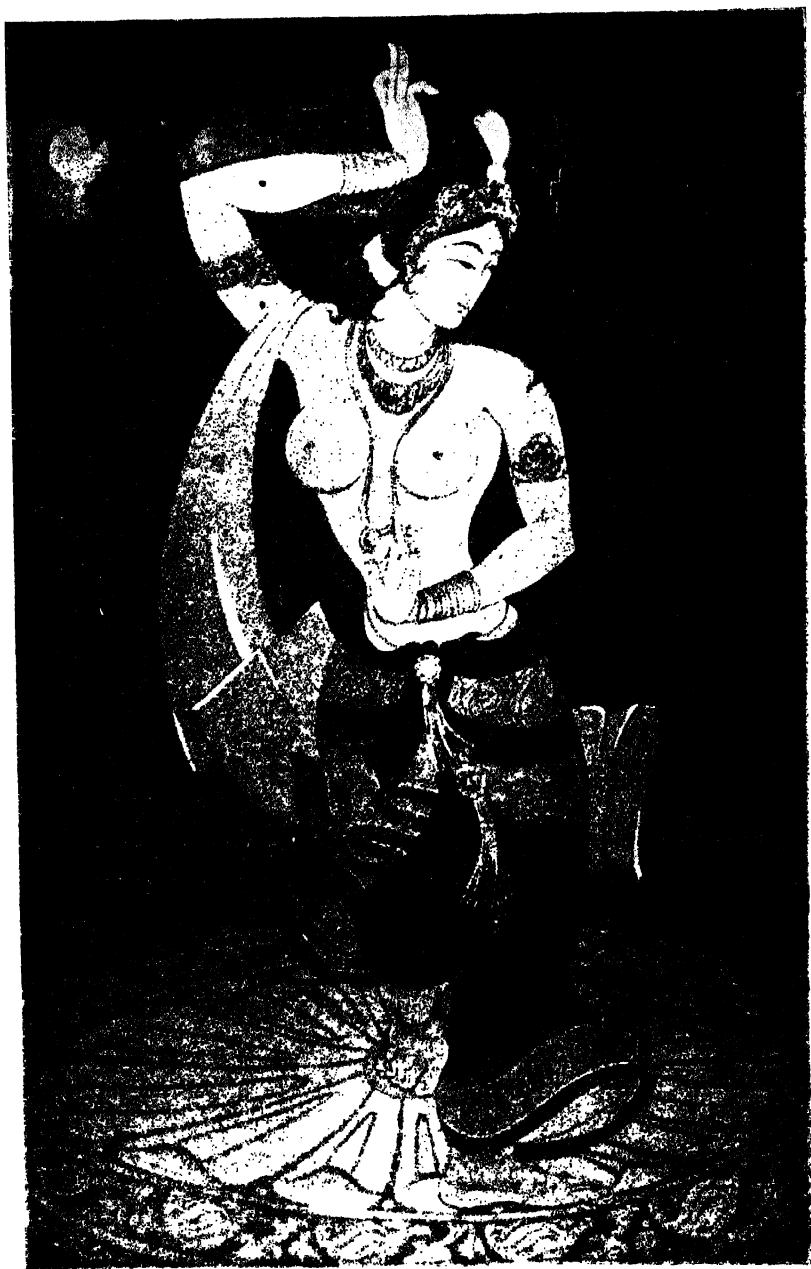
রেখা।

শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

অগ্রহায়ণ—১৩৫৬
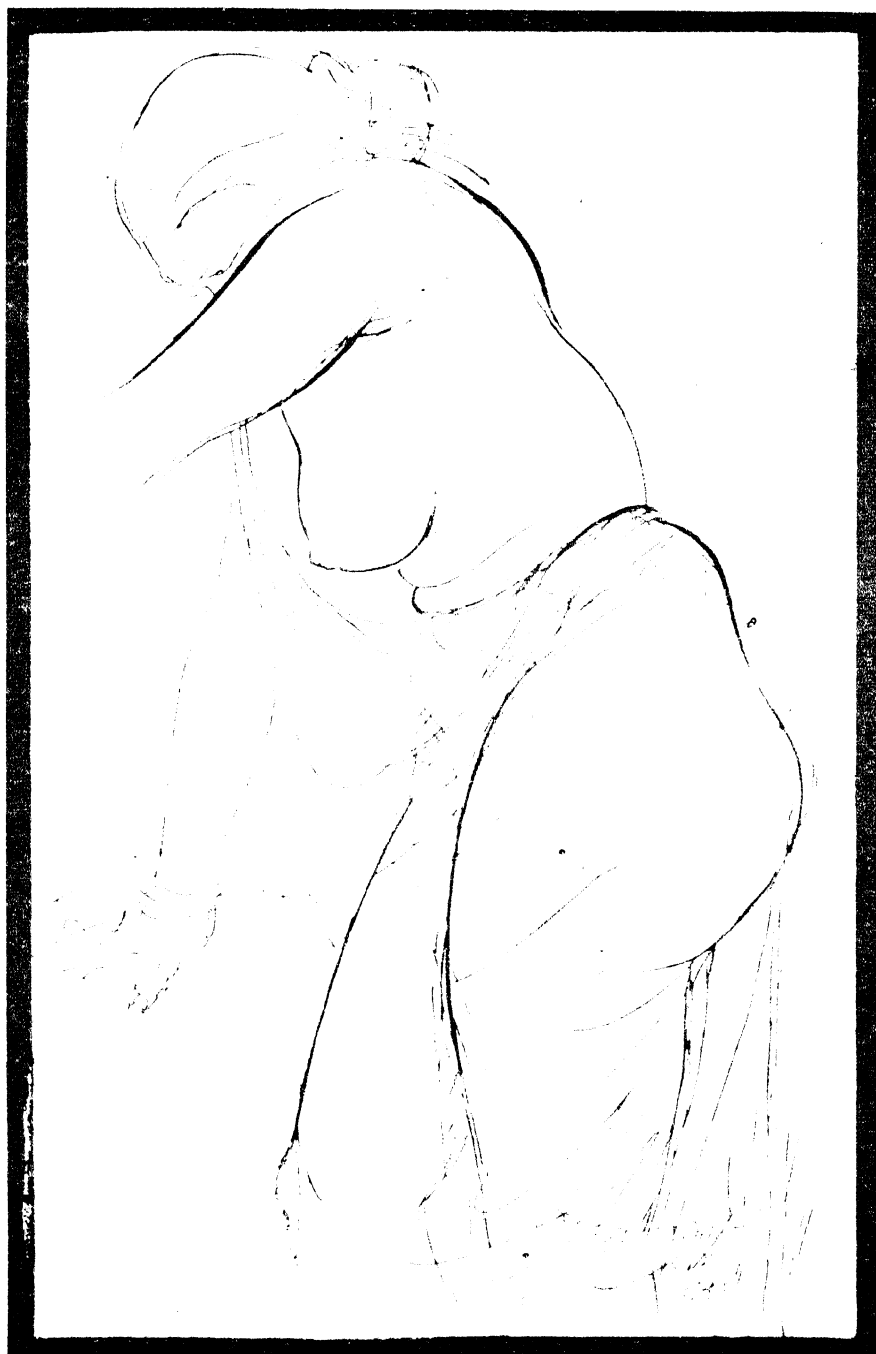
প্রথম খণ্ড	সপ্তত্রিংশ বর্ষ	ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীঅরবিন্দ ও মানব জীবনের চিরন্তন সমস্যা

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি,

মানুষের জীবনে যে একটা চিরন্তন সমস্যা দেখা যায় তাহার সমাধানে শ্রীঅরবিন্দ কি আলোকপাত করিয়াছেন তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। যে সমস্যার কথা বলিতেছি তাহা সভ্যতার আদিমকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের জীবনে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহার জীবনের সকল স্তরে ও সকল কাজে জড়িত আছে। সমস্যাটি এইরূপ। মানুষের মধ্যে যেন দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির খেলা চলিতেছে। তাহাদের একটি চিৎশক্তি ও অপরটি অচিৎ বা জড়শক্তি; একটি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, অপরটি ভৌতিক অচেতন দেহ। মানুষের জীবন যেন এই দুই শক্তি বা তত্ত্বের সংমিশ্রণে গঠিত এবং উহাদের প্রকৃতিগত বিরোধে দ্বিধাবিভক্ত, ক্লিষ্ট ও বিপর্য্যস্ত। একদিকে মানুষ একটি ক্ষুদ্র দেহে সীমাবদ্ধ এবং সেই দেহের আধিব্যাধি ও ক্ষুৎপিপাসায় প্রপীড়িত। তাহার দেহের সঙ্গে মনের একটি সুনিবিড় সম্বন্ধ থাকায়, দেহের সুখদুঃখ ও অভাব-অভিযোগ মিটাইবার জন্য মানুষের মন যত্নশীল হয় এবং সেইজন্য প্রায়ই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসর প্রভৃতি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার আত্মা দেহমনের দুঃখদৈন্য অতিক্রম করিয়া এবং উহাদের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া এক শাশ্বত সত্যের সন্ধানে ছুটিয়া যায়, এই মরজগতের ঊর্দ্ধে কোন এক অজানা অমরলোকে যাইতে চায়, নিজের সসীম সত্তাকে অসীমে মিশাইতে চায় এবং যিনি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, সত্য-শিব-সুন্দররূপ, সেই পরম সত্তাতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হয়।

মানুষের জীবনে চৈতন্য ও জড়ের, আত্মা ও দেহের এই দ্বন্দ্বও যেমন চিরন্তন, তাহার একটা সুষ্ঠু মীমাংসা করিবার প্রচেষ্টাও তেমন বহুযুগব্যাপী ও সর্ব্বতোমুখী। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তাহার জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে

এবং সর্ব্বস্তরে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এজন্যই নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য, নিজেকে উন্নত করিবার জন্য, দুঃখ, ব্যাধি, জরা ও মরণকে জয় করিবার জন্য কর্ম্মজীবনে মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা দেখা যায়। এই কারণেই মানুষের বিজ্ঞান নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে তাহার অদম্য জ্ঞান পিপাসা ও অবিরাম সত্য সন্ধানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যেন তাহার সসীম জ্ঞানকে অসীম করিতে চায় এবং প্রকৃতির জড়শক্তিকে পরাভূত করিয়া তাহার উপর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে ও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের সেবায় নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করে। চারুশিল্পের মধ্য দিয়া মানুষ তাহার অরূপ সত্তাকে রূপ দিতে চায়, অতীন্দ্রিয় সত্যকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার চেষ্টা করে এবং অনন্ত ও অসীম পরমার্থ তত্ত্বকে দেশ ও কালের সীমার মধ্যে দেখিতে চাহে। আবার তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতির মধ্য দিয়া, সত্য, শিব ও সুন্দররূপ ভাগবৎ-সত্তার উপলব্ধি করে। ধর্ম্মকর্ম্মের সাহায্যেও মানুষ তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া মানুষ নিজেকে বিপন্ন ও অসহায় বোধ করে এবং যে জড়দেহের সহিত তাহার অজড় ও অমর আত্মার আপাত বিরোধ দৃষ্টে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা অতিক্রম করিবার জন্য মানুষ সর্ব্বপ্রযত্ন প্রয়োগ করে।

কিন্তু বাস্তবজীবনে সাংসারিক কর্ম্ম করিয়া বা চারুশিল্পে সৌন্দর্য্যানুভূতির দ্বারা অথবা মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানুষ এই চিরন্তন সমস্যার একটা স্থায়ী ও সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে পারে না। এসবের মধ্যে মানুষ সাময়িকভাবে তাহার সংসার-বন্ধনের কথা ভুলিয়া পরমাত্মাতে লীন হইবার চেষ্টা করে এবং এক দিব্য-ভাবাবেগের মধ্যে অল্পকালের জন্য তাহার দুঃখ দৈন্য ও দৌর্ব্বল্য বিস্মৃত হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে নিমগ্ন হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই মানুষ দেখে যে, সে যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই ফিরিয়া আসিয়াছে এবং চিৎজড়ের বিরোধ জন্য অশান্তি ভোগ করিতেছে।

মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। এজন্য জীবনের এই চিরন্তন সমস্যার একটা বিচারসঙ্গত দার্শনিক মীমাংসা করিয়া সে উহার চির অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করে এবং তাহা না হইলে বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন দর্শনে এই সমস্যার বিভিন্ন এবং কোন কোন স্থলে পরস্পর বিরোধী সমাধান করা হইয়াছে। জড়বাদী দার্শনিকগণ জড়শক্তি বা অচিৎ সত্তামাত্রকে পরমার্থ সৎ বলিয়াছেন এবং আত্মা ও আধ্যাত্মিক সত্তা অসৎ, মিথ্যা ও ও মানুষের কল্পনাপ্রসূত আকাশ-কুসুম বলিয়া পরিহার করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অপরপক্ষে চেতনবাদী বা অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকবৃন্দ আত্মা বা ব্রহ্ম একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা ও মায়াময় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাসে বর্ণিত এই দুই চরমপন্থী মতবাদ মানুষের সম্পূর্ণ সত্তাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না এবং তাহার জীবনের পূর্ণবিকাশে সহায়তা করে না। জড়বাদীর সিদ্ধান্ত সত্য হইলে মানুষকে তাহার সত্য ধর্ম্ম ও নীতি বর্জ্জন করিয়া নাস্তিক-চূড়ামণি চার্ব্বাকের মত দেহাত্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতে হয় এবং অর্থ ও কাম পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া পশুর ন্যায় দেহেন্দ্রিয় সুখে পরিতৃপ্ত হইতে হয়। অপরদিকে মায়াবাদী দার্শনিকের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে মানুষকে তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়কে নিপীড়ন করিতে হয় এবং তাহার স্বভাবসুলভ প্রবৃত্তিগুলির মূলোচ্ছেদপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় লোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় দিন অতিবাহিত করিতে হয়। কিন্তু এই দুই চরম পন্থার কোনটাই আমাদের চিরন্তন সমস্যার সম্যক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাধান-রূপে মানুষের নিকট আদরণীয় বা গ্রহণীয় হইতে পারে না। কারণ, মানুষের সত্তাতে যে দেহ ও আত্মার একটা সম্মিলন ঘটিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এজন্য জড়বাদীর দেহাত্মবাদ তাহাকে পশুত্বের নিম্নস্তরে নামাইয়া আনে বলিয়া ঘৃণ্য মনে হয়, আবার চেতনবাদীর মায়াবাদ বা শূন্যবাদ অতি নীরস ও নিরর্থক বলিয়া উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে। অতএব মানুষ এই সমস্যার এমন একটী দার্শনিক সমাধান চায় যাহাতে তাহার দেহ বা আত্মার কোনটিকেই বলি না দিয়া উহাদের সুসমঞ্জস মিলন হইতে পারে এবং কর্ম্মে ও চিন্তায় আমাদের জীবন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া না পড়ে।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন (The Life Divine) নামক গ্রন্থে ঠিক এইরূপ একটী মনোজ্ঞ ও যুক্তিযুক্ত সমাধানের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি প্রথমেই এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে দেহ ও আত্মার বিরোধ মিটাইতে হইলে কোন চরমপন্থী মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা চলে না, কারণ তাহাতে এই বিরোধের একরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী বা চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, দুইটী প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রকৃত মিলন স্থাপন করিতে হইলে উহাদের একপক্ষকে অন্যপক্ষের কথা বুঝিতে হইবে এবং তাহার অন্তস্থ ভাবের গুণগ্রাহী হইতে হইবে। চিৎ ও জড়ের প্রকৃত মিলন ঘটাইতে হইলে উহাদের যথাসম্ভব সাদৃশ্য ও সমত্ব দেখাইতে হইবে, কারণ এইরূপেই তাহাদের তাদাত্ম্য ও একাত্মত্ব প্রতিপাদিত হইবে। যদি এইভাবে আমরা জড় ও চেতনের দেহ ও আত্মার প্রকৃত মিলন সম্পাদন করিতে পারি তবেই উহাদের আপাত-বিরোধের চির-অবসান ঘটিতে পারে এবং আমাদের জীবনেও কোন বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া তাহার স্বচ্ছন্দ গতিকে বাধা দিতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ যে বিশ্বচেতনার ((Cosmic consciousness) কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যেই চিৎ ও জড়ের বা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রথম মিলনক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। কারণ, এই বিশ্বচেতনায় চৈতন্যময় পুরুষ বা আত্মা জড়প্রকৃতির নিকট পরমার্থ সৎ বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং আত্মার নিকটও প্রকৃতি বা জড় পদার্থ বাস্তব সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অবশ্য বিশ্বচেতনা বলিয়া কোন সত্তা আছে কিনা তাহা বিবেচ্য। কিন্তু একথা ঠিক যে দার্শনিক দৃষ্টিতে "বিশ্বচেতনা" একটা অসম্ভব বা অসঙ্গত কথা নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ এক বিশ্বব্যাপী শক্তির খেলা ও উহারই ক্রমবিকাশ। এখন কথা হইতেছে যে এই বিশ্বব্যাপী শক্তি কি এবং উহার মূল বা উৎস কোথায়? একটু স্থির মনে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, যে শক্তির ক্রমপরিণামে পঞ্চভূত, প্রাণ ও সচেতন মনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার মূলে কোন চৈতন্যময় সত্তা বিদ্যমান আছে, নিছক জড় শক্তি হইতে মন বা প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব নহে। আবার জড়ের ক্রিয়া যে চেতনের অধীন তাহা আমরা অহরহ দেখিতেছি। সকলেই জানেন যে সারথী ব্যতীত রথ চলে না, বীণাপাণি ব্যতীত বীণা আপনি বাজে না, চক্রধারী ব্যতীত চক্র ঘুরে না। তবেই স্বীকার করিতে হয় যে জড়শক্তি চেতনাধিষ্ঠান, চেতনাধীন ও চেতনা-পরিচালিত। যেখানেই শক্তির খেলা দেখা যায় সেখানেই চৈতন্য অধিষ্ঠানরূপে বা প্রভব-স্থানরূপে বিদ্যমান আছে বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানসম্মত এক বিশ্বব্যাপী শক্তির মূলে যে চিৎশক্তি বিদ্যমান এবং উহা যে চিৎশক্তিরই স্থূল প্রাকৃতিক বিকাশমাত্র তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, জড় জগতের সত্তা চৈতন্য সত্তায় প্রতিষ্ঠিত এবং উহা এক চৈতন্যময় পুরুষের শক্তি বা ক্রিয়া। আপাতদৃষ্টিতে বা স্থূলবুদ্ধিতে প্রকৃতি ও পুরুষের বিরোধ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও বিচারবুদ্ধি ও সম্যক্ দৃষ্টির সাহায্যে বেশ বুঝা যায় যে তথাকথিত জড়-প্রকৃতি চেতন পুরুষের চিৎ-শক্তির স্থূল প্রকাশ এবং অরূপ ও অমূর্ত্ত আত্মার রূপধারণ ও মূর্ত্তি পরিগ্রহের প্রক্রিয়ামাত্র।'

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার "দিব্যজীবনে" যে এক সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী পরমার্থ সত্যের (Omnipresent Reality) ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই আত্মা ও অনাত্মা, চিৎ ও জড়ের চিরমিলন-মন্দিরের সুদৃঢ় ভিত্তি। এই পরমতত্ত্ব সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, বুদ্ধির অগম্য ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। মূল ও প্রাচীন বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদে ইঁহার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে শ্রীঅরবিন্দ তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি প্রচলিত ও শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহার মতে উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদই প্রকৃত অদ্বৈত ও একতত্ত্ববাদ। ইহাতে সকল বস্তুকেই ব্রহ্মরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য সত্তাকে, সত্য ও মিথ্যা, ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম, আত্মা ও অনাত্মা বা সদ্রূপ আত্মা ও অসদ্রূপী চিরন্তনী মায়া, এরূপ দুইটী পরস্পরবিরোধী বস্তুতে বিভক্ত করা হয় নাই। ব্রহ্মসত্তা কুত্রাপি বাধিত হয় না। অভাবরূপ অসৎ ও ভাবরূপ জগৎ সেই এক ব্রহ্মসত্তারই রূপান্তর বা ভাবান্তর মাত্র। প্রকাশমান বিশ্বরূপে তাঁহার যে সর্ব্বোত্তম অনুভূতি আমাদের হইতে পারে তাহাতে তাঁহাকে সচেতন স্বপ্রকাশ সত্তা, পরমা শক্তি

ও স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আবার এই বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া তিনিই যে এক অজ্ঞেয় সত্তা এবং অনির্ব্বাচ্য ও নিরতিশয় আনন্দরূপে বিরাজমান তাহাও বুঝা যায়।

যদি কোন সুধী ব্যক্তি স্থিরদৃষ্টিতে এই বিশ্ব-সংসার অবলোকন করেন, তবে তিনি বেশ বুঝিতে পারিবেন যে ইহা এক অনাদি, অনন্ত ও অফুরন্ত শক্তির সীমাহীন দেশ ও কালের বুকে অবিরাম গতি ও অনন্ত বিস্তৃতি। এ অনন্ত শক্তি কোথা হইতে আসিল? বেদান্তশাস্ত্র বলিয়াছেন এবং আমাদের বিচারবুদ্ধি দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে উহা এক দেশকালাতীত, নিষ্ক্রিয়, অব্যয় ও অক্ষর সত্তার এক পাদ বা অংশমাত্র। এই সত্তা নিষ্ক্রিয় হইয়াও সকল ক্রিয়ার আধার; সংখ্যা, গুণ ও রূপ বর্জ্জিত, অনির্ব্বাচ্য ও অনির্দ্দেশ্য। উহাই পরমার্থ সন্মাত্র ও আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যে বিশ্বব্যাপী শক্তির কথা এখানে বলা হইয়াছে তাহা এই পরম সত্তাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, আবার তাহার মধ্যেই আছে এবং তাহারই স্বরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে যে সত্তা ও শক্তি, ভাব ও ভব (Being and Becoming), ব্রহ্ম ও জগৎ, শিব ও কালী এই দুই পরমতত্ত্ব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। এই পরমাশক্তি জড়শক্তি নহে, উহা চিৎশক্তি, সচেতন তেজঃস্বরূপ এবং চিদ্‌বিলাসমাত্র।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে নিষ্ক্রিয় পরমার্থ সত্তাতে কোন ক্রিয়া সম্ভব নহে, তথাপি উহার ক্রিয়া সম্বন্ধ কিরূপে এবং কি কারণে ঘটিল? তবে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে ক্রিয়া বা শক্তি সত্তার অন্তর্নিহিত ও উহাতে সমবেত। অতএব 'ক্রিয়া সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিল' এ প্রশ্ন হইতে পারে না, যেমন 'জল কিরূপে শীতল হইল' এ প্রশ্ন উঠে না। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, ব্রহ্ম ও শক্তি, শিব ও কালী, তেমনই এক, অভিন্ন ও অবিনা-ভাবাপন্ন। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতাবলম্বন করিয়া শ্রীঅরবিন্দ উল্লিখিত প্রশ্নটীর প্রথমাংশের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন এবং উহা আমাদেরও গ্রহণীয়। এখন প্রশ্নের শেষ অংশটীর উত্তর কি হইবে তাহা বিবেচনীয়। কারণ, কোন বস্তুতে কোন শক্তি নিহিত থাকিলে উহা সক্রিয়ও হইতে পারে অথবা নিষ্ক্রিয় ও সুপ্তও থাকিতে পারে, যেমন সমুদ্রের জল স্থিরও থাকিতে পারে, আবার উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রবাহিতও হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মে চিৎশক্তি নিহিত থাকিলেও উহার গতি বা সক্রিয় ভাবের একটী কারণ দর্শাইতে হইবে। শক্তি ব্রহ্মে চিরনিদ্রিত না থাকিয়া ক্রিয়াশীল ও সৃষ্টিমুখী হইল কেন? ইহার উত্তরে অবশ্য বলা যায় যে ব্রহ্ম স্বীয় প্রকৃতি বা শক্তির অধীন হইয়া অবশভাবে কর্ম্মনিবদ্ধ ও গতিশীল হইয়াছেন। তান্ত্রিক ও মায়াবাদীরা ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পরম ব্রহ্ম এরূপ মায়াধীন ঈশ্বরতত্ত্ব নহেন। তিনি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্য-স্বরূপ এবং তাঁহার মায়া বা ক্রিয়াশক্তিরও অধীন নহেন। জগদ্রূপে তিনি তাহার শক্তি ব্যক্তও করিতে পারেন অথবা অব্যক্ত ও সুপ্তভাবেও রাখিতে পারেন। তাঁহার জীবও জগদ্রূপে প্রকাশিত হওয়া বা না হওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এমত অবস্থায় যদি তিনি তাঁহার শক্তিকে নামরূপের মধ্য দিয়া জগদাকারে প্রকট করেন, তবে তাহার একমাত্র কারণ হইতে পারে—তাঁহার আনন্দের উচ্ছ্বাস বা স্বতঃস্ফূরণ। বেদান্তে যে পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে তিনি সন্মাত্র নহেন, চিন্মাত্রও নহেন; কিন্তু সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ। যে চৈতন্যময় পরমসত্তা কুত্রাপি কোন বাধা প্রাপ্ত হয় না এবং যাহা দেশ, কাল ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, তাহা স্বভাবতঃই আনন্দময় হইবে। যে চিৎসত্তা সর্ব্বনিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা আনন্দময় সত্তা এবং এই দুই কথা একই বস্তুর নামান্তর মাত্র। আমাদের জীবনেও দেখি যে যখন উহার স্বচ্ছন্দগতি কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা অতৃপ্তি ও দুঃখ ভোগ করি। আবার যখন জীবনে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয় না তখন কোন অসুখ বা অসন্তুষ্টি বোধ হয় না। আরও দেখা যায় যে জীবনে আমরা যতটা বন্ধনমুক্ত হইতে পারি ততটাই সুখ ও সন্তোষ লাভ করিতে পারি। ইহার কারণ হইতেছে যে আমাদের পারমার্থিক সত্তা এক আনন্দময় সত্তা এবং সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মানন্দের সীমা নাই, শেষ নাই, আদি নাই, অন্ত নাই। সমুদ্রের জলে যে সব তরঙ্গ উঠে ও পড়ে তাহা গণনা করা সম্ভব হইলেও সচ্চিদানন্দ সাগরে অসংখ্য বিশ্বরূপে যে আনন্দ-লহরী অনন্ত কাল ধরিয়া উঠিতেছে ও পড়িতেছে তাহার

সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্মানন্দের এই স্বতস্ফূর্ত্তি, স্বচ্ছন্দগতি এবং অনন্ত অভিব্যক্তিই ব্রহ্মের চিৎশক্তিকে ক্রিয়াশীল ও সৃজনমুখী করে এবং তাহাকে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-রূপে প্রকাশিত করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে ব্রহ্মানন্দের অবাধ স্ফূরণ এবং উহার নানা ভঙ্গিমায় লীলার উদ্দেশ্যই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য।

শ্রীঅরবিন্দের ব্রহ্মবাদে মানব-জীবনের চিরন্তন সমস্যার একটা সুষ্ঠু ও হৃদয়গ্রাহী সমাধান করা হইয়াছে মনে হয়। ইহার আলোকে আমরা দেখিতে পাই যে জড় ও চেতন সত্তা দুই বৈরীভাবাপন্ন বা পরস্পর-বিরোধী বস্তু নহে, পরন্তু উহারা একই সত্তার দুইটী বিভিন্ন কিন্তু সমভাবাপন্ন ও পরিপূরক দিক্ বা অংশ বিশেষ। এই দুয়ের মধ্যে একই ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও আকারে বিরাজমান আছেন। তথাকথিত জড় বা অচিৎ সত্তার মধ্যে চৈতন্যময় আত্মা রূপ ও দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং চিৎসত্তা জড়ের অন্তর্নিহিত সত্য, সারতত্ত্ব ও আত্মারূপে প্রকাশিত আছেন। এরূপ দৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরকে দিব্য ও সদরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে এবং উভয়েই যে মূলে এক তাহা বুঝিতে পারে। মন ও প্রাণ পরমাত্মার প্রকাশের যুগপৎ রূপও বটে, যন্ত্রস্বরূপও বটে। ইহাদের সাহায্যে যেন তিনি জড়ের আকার ধরিয়াছেন এবং নিজেকে বহু জীবাত্মার নিকট প্রকট করিতেছেন। মন যখন বিশুদ্ধ হইয়া বিমল আদর্শের ন্যায় বিশ্বরূপে প্রকাশমান পারমার্থিক তত্ত্বকে প্রতিফলিত করে, তখনই তাহার চরম পূর্ণতা লাভ হয় এবং প্রাণ যখন সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিশ্বের অগণন ও নিত্য নূতন ব্যাপারের মধ্য দিয়া ভাগবৎসত্তার প্রকাশে সহায়তা করে, তখনই তাহার চরমোৎকর্ষ ঘটে। মানুষ যখন অন্তরে দিব্য শান্তভাব পোষণ করিয়া সানন্দে ও নিরহঙ্কারে অশেষ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে তখনই তাহার চরমোন্নতি হয়। মুক্তি বা মোক্ষ বলিতে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ ও সর্ব্ববিষয়ে ঔদাসীন্য বুঝায় না। অন্তরের শান্তি ও আত্মার কৈবল্যভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যিনি নিষ্কামভাবে সর্ব্বকর্ম্ম করিতে পারেন, উপেক্ষা, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা এসব দিব্যভাবের অধিকারী হইয়াছেন এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সত্য-শিব-সুন্দররূপী পরব্রহ্মে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া জীব ও জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তিনিই প্রকৃত মুক্তপুরুষ এবং তাঁহার মুক্তিই যথার্থ মুক্তি।

জাগ্রত নারায়ণ

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

আলোড়নহীন ক্ষীরোদ-সিন্ধু স্তব্ধ অচঞ্চল,
সর্প-শয়নে নিদ্রিত নারায়ণ।
নীরব শংখ, নিষ্ক্রিয় গদা, নিমীলিত শতদল,
ঘূর্ণন-হীন হাতের সুদর্শন।

কবে জাগ্রত হবে নারায়ণ? সে কথা জানিনা মোরা,
শুনিতেছি শুধু অসুরের কোলাহল।
চোখের সামনে কাঁদিছে আঁধারে কৃষ্ণা রাত্রি ঘোরা,
নীরবে অমর ফেলিছে অক্ষি-জল।
কাঁদিছে রাত্রি, কাঁদিছে আর্তি, কাঁদিছে ব্যর্থ আশা,
দিকে দিকে ওই কাঁদিছে সর্বহারা!
কঠোর-কণ্ঠে হাঁকিছে দৈত্য, উচ্চারি দুর্ভাষা।
মহাশংকায় কাঁপিয়া উঠিছে কা'রা?

শংকিত-বুকে পুঞ্জিয়া উঠে ক্ষোভের বাষ্পরাশি,
দেখা দেয় দূরে সংকেত ঝটিকার।
মেঘের আড়ালে লুপ্ত হয়েছে চন্দ্রতারার হাসি
ফেলে নিঃশ্বাস গভীর অন্ধকার।
মানব-হৃদয়-সিন্ধু-শয়নে সুপ্ত কি নারায়ণ?
লুপ্ত কি তাঁর অভয়-প্রদাতা হাত?
নিষ্ঠুর-লোভে নিপীড়িত ক্ষোভে বুকে বুকে ক্রন্দন
সৃজিছে যে আজি কঠিন দুঃখ-রাত!

মাভৈঃ দেবতা, মাভৈঃ ধরার লাঞ্ছিত যত নর।
নব-তরংগে জাগিছে আন্দোলন
জাগিছে শংখা, জাগিছে চক্রী, জাগিছে শুভংকর
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগ্রত নারায়ণ।

কালের মন্দিরা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অশ্বচোর

ভূমিনিবদ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া সুগোপা চমকিয়া দেখিল, এক পুরুষ দেবদারু ছায়ার তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কখন এই অপরিচিত আগন্তুক নিঃশব্দ পদে তাহাদের অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহারা জানিতে পারে নাই।

সুগোপা বলিয়া উঠিল—'কে তুমি?'

আগন্তুক উত্তর করিল—'পথিক। তুমি প্রপানালিকা? জল দাও।'

সুগোপা পথিককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। আগন্তুক যে বিদেশী তাহা তাহার বেশভূষা দেখিয়া সন্দেহ থাকে না। একটি জীর্ণ লৌহজালিকে উর্ধ্বাঙ্গ আবৃত, মস্তকেও অনুরূপ লৌহজালিকের শিরস্ত্রাণ। কটিতে চর্মকোষবদ্ধ তরবারি, পদদ্বয় স্থূল বৃষচর্মের পাদুকায় চর্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। দেহে কোথাও মাংসের বাহুল্য নাই, বরং দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ঈষৎ কৃশ। সমস্ত মিলাইয়া ছিলান ধনু-দণ্ডের মত দেহ ঋজু ও নমনীয়; কিন্তু মনে হয়, প্রয়োজন হইলে মুহূর্ত মধ্যে গুণসংযুক্ত হইয়া প্রাণঘাতী আকার ধারণ করিতে পারে।

আগন্তুকের বয়ঃক্রম অনুমান করা কঠিন, তবে ত্রিশ বৎসরের অধিক নয়। মুখাবয়বের মধ্যে চক্ষু ও নাসা অতিশয় তীক্ষ্ণ। ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষুর দৃষ্টিতে একটা সতর্ক দুঃসাহসিকতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাহুবল ও কূটবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যাহাদের জীবনধারণ করিতে হয়, তাহাদের চক্ষু এরূপ দৃষ্টি বোধকরি স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

ফলতঃ আগন্তুক যে একজন যুদ্ধজীবী তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহার মুখে ও বাহুতে অগণিত সূক্ষ্ম ক্ষতরেখা দেখিয়া এই অনুমান দৃঢ় হয়। ছিন্ন লৌহজালিকের ফাঁকে বক্ষের উপরেও বহু রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয় গৌরবর্ণ ত্বকের উপর কজ্জল দিয়া কেহ রেখাগুলি আঁকিয়া দিয়াছে। উপরন্তু ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি তিলকের ন্যায় একটি তাম্রবর্ণ চিহ্ন আছে। ইহা ক্ষতচিহ্ন অথবা সহজাত জটুল তাহা নির্ণয় করা যায় না।

সুগোপা ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখিয়া লইয়া জল আনিবার জন্য কুটীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। আগন্তুক মন্থরপদে আসিয়া তাহার পরিত্যক্ত শিলাপট্টের উপর বসিল। তাহার বসিবার ভঙ্গীতে একটু ক্লান্তভাব প্রকাশ পাইল।

মোঙ্ এতক্ষণ কৌতূহল সহকারে নবাগতকে দেখিতেছিল; এখন বলিল—'তুমি দেখিতেছি বিদেশী। তোমার দেশ কোথায়?'

বিদেশী উত্তর না দিয়া এমনভাবে হস্ত সঞ্চালন করিল, যাহাতে গান্ধার হইতে পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত যে-কোনও দেশ হইতে পারে।'

মোঙ্ আবার প্রশ্ন করিল, 'তুমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী?'

বিদেশী সতর্ক দৃষ্টি তাহার দিকে ফিরাইয়া তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

মোঙের ভেকধ্বনিবৎ ব্যঙ্গহাস্য আবার উত্থিত হইল—'ভাগ্য দেবতা দেখিতেছি তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন নয়; অস্ত্রক্ষত ছাড়া যুদ্ধ ব্যবসায়ে আর কিছু লাভ করিতে পার নাই। কোন রাজ্যের সেনাভুক্ত ছিলে?'

বিদেশী এবারও উত্তর দিল না, উর্ধ্বদিকে তাকাইয়া যেন অন্যমনস্ক রহিল। মোঙের কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, সে অতঃপর গাম্ভীর্য অবলম্বনপূর্বক পৌরুষ সহকারে বলিল—'যুবক, তুমি এ রাজ্যে নূতন আসিয়াছ, বোধহয় জান না ইহা হূণ অধিকৃত। মহাপরাক্রান্ত হূণ

কেশরী রোট্ট ধর্মাদিত্য এই বিটক রাজ্যের অধীশ্বর। আমিও হূণ। হূণগণ বিজাতীয়ের স্পর্ধা সহ্য করে না। তোমার নাম কি ?'

যুবকের স্বল্প গুম্ফের অন্তরালে একটু হাসি দেখা দিল; সে বলিল—'আমার নাম চিত্রক।'

'চিত্রক! চিতা বাঘ!' মোঙের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—'তোমার নাম সার্থক বটে, তোমার সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া তোমাকে চিতা বাঘ বলিয়াই মনে হয়। এরূপ নাম কেবল হূণদের মধ্যেই ছিল—সিংহ শূকর নাগ বৃষ—যাহার যেরূপ আকৃতি প্রকৃতি সে সেইরূপ নাম গ্রহণ করিত। এখন আর কিছু নাই—' সখেদ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আগ্রহভরে মোঙ্ বলিল,—'তুমি বয়সে নবীন, কিন্তু নিশ্চয় অনেক যুদ্ধ করিয়াছ! বহু নগর লুণ্ঠন করিয়াছ। এই বিটক রাজ্য একদিন আমরা—কিন্তু এদেশে যুদ্ধবিগ্রহ আর হয় না। মেষপাল কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? পঁচিশ বৎসর পূর্বে একদিন ছিল—'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—'কপোতকূট এখান হইতে কত দূর?'

মোঙ্ বলিল—'তুমি কপোতকূট যাইবে? অধিক দূর নয়, দুদণ্ডের পথ। এক প্রহর এখানে বিশ্রাম করিয়া যাত্রা করিলেও সন্ধ্যার পূর্বে রাজধানী পৌঁছিতে পারিবে। তোমার অশ্ব নাই দেখিতেছি, হূণ যোদ্ধা কিন্তু অশ্ব বিনা এক পা চলে না। উষ্ট্র রোমের শিবির এবং অশ্বের পৃষ্ঠ—হূণের ইহাই বাসস্থান। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমরা দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী—'

সুগোপা মৃৎপাত্রে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল, সুতরাং মোঙের গল্পে বাধা পড়িয়া গেল। পথিক সত্যই তৃষ্ণার্ত ছিল, সে সাগ্রহে উঠিয়া আসিয়া প্রথমে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিল, তারপর গণ্ডূষ ভরিয়া তৃপ্তিসহকারে জল পান করিল। সুগোপা তাহার অঞ্জলিতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে মোঙের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'মোঙ্, আর বিলম্ব করিও না, দাঁতন লইয়া গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে তোমার নাগসেনা দাঁতনের পরিবর্তে তোমার মুণ্ডটি চিবাইবে।'

মোঙ্ চকিতভাবে ঊর্ধ্বে চাহিল, সূর্যদেব মধ্য গগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মোঙ্ শঙ্কিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল; জঙ্গলের মধ্যে করঞ্জ কাষ্ঠ অন্বেষণ করিতে সময় লাগিবে, তারপর গৃহে ফিরিবার পথও অনেকখানি। বৃদ্ধ বয়সে দ্রুত ফিরিবার শক্তি নাই, নাগসেনার সম্মুখে ফিরিয়া যাইতে হয়তো সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। সেটা মোঙের পক্ষে সুখকর হইবে না। পারিবারিক ব্যাপারে যুদ্ধবিগ্রহ মোঙ্ ভালবাসে না।

পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার বীরত্ব কাহিনীটা আগন্তুককে শুনাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। মোঙ্ গাত্রোত্থান করিল; কাহাকেও কোনও সম্ভাষণ না করিয়া ক্ষুব্ধ অস্পষ্ট স্বরে তরবারির নখ, ঘোড়ার ক্ষুর ও স্ত্রীজাতির কটাক্ষ সম্বন্ধীয় প্রবাদ বাক্যটা আবৃত্তি করিতে করিতে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্রক আবার শিলা-পীঠের উপর বসিয়াছিল। সুগোপা দেখিল, সে দুই জানুর উপর কফোনি রাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তের শীর্ষে চিবুক ন্যস্ত করিয়া স্থিরনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে। হঠাৎ সুগোপা একটু অস্বস্তি অনুভব করিল। সে মাসের পর মাস একাকিনী এই জলসত্রে দিন কাটায়, কত পথিক আসে যায়; কেহ নবীনা প্রপাপালিকাকে দেখিয়া দুটা রঙ্গ পরিহাসের কথা বলে, সুগোপা চটুলকণ্ঠে তাহার উত্তর দেয়; কেহ বা প্রগল্‌ভতার সীমা অতিক্রম করিলে দুই চারিটি কঠিন বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়া তাহাকে অধোবদনে বিদায় করে। কোনও অবস্থাতেই সুগোপার আত্মপ্রত্যয় বিচলিত হয় না। কিন্তু আজ এই জীর্ণবেশ বিদেশী যুবকের নিষ্পলক চাহনি তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল।

স্খলিত নিচোলপ্রান্ত বুকের উপর টানিয়া দিয়া সুগোপা বলিল—'তুমি তো কপোতকূটে যাইবে, তবে বিলম্ব করিতেছ কেন?'

চিত্রক তেমনিভাবে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'শ্রান্তি দূর করিতেছি। আমার ত্বরা নাই।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল; চিত্রকের অচঞ্চল দৃষ্টি সুগোপার উপর বিন্যস্ত হইয়া আছে। সুগোপা ক্রমে অধীর হইয়া উঠিল, ঈষৎ রুক্ষস্বরে কহিল—'তুমি কোন্ বর্বর দেশের মানুষ—স্ত্রীলোক কখনও দেখ নাই?'

এইবার চিত্রক সুগোপার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া সাবধানে চারিদিকে চাহিল। তাহার অধরোষ্ঠ একবার

সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইল। তারপর আবার মুষ্টির উপর চিবুক রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—'স্থানটি বেশ নির্জন।'

এই অসংলগ্ন উত্তরে সুগোপা রুষ্টভাবে অধর দংশন করিল, তারপর ভূমি হইতে জলপাত্র তুলিয়া লইয়া কুটীরের দিকে চলিল।

—'তুমি সুন্দরী এবং যুবতী।'

সুগোপা চকিতে গ্রীবা বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। চিত্রকের কণ্ঠস্বরের সমতা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, সে পুনশ্চ বলিল—'তুমি সুন্দরী এবং যুবতী। এই জনহীন স্থানে একাকিনী থাকিতে তোমার ভয় করে না?'

ভ্রূভঙ্গ করিয়া সুগোপা বলিল—'ভয়! কিসের ভয়?'

'বনে হিংস্র জন্তু আছে!'

'হিংস্র জন্তুকে আমি ভয় করিনা।'

'আর—মানুষকে?'

'মানুষ ধৃষ্টতা করিলে আমার অস্ত্র আছে।'

'কী অস্ত্র?'

সুগোপা তর্জনী তুলিয়া কুটীরের প্রাঙ্গণ দেখাইল। চিত্রক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে একটি সম্মার্জনী রহিয়াছে। তাহার কণ্ঠে একটু নীরস হাস্যধ্বনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে বলিল—'তুমি সাহসিকা বটে। কিন্তু অস্ত্রের দ্বারা লোলুপ পুরুষকে নিবারণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়?'

'হয়।' অস্পষ্টস্বরে এই কথাটি বলিয়া সুগোপা আবার কুটিরের দিকে পা বাড়াইল। কিন্তু তাহাকে এক পদের অধিক অগ্রসর হইতে হইল না।

চিত্রক এতক্ষণ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ভঙ্গিতে বসিয়াছিল, এখন সহসা বন্য বিড়ালের মত লম্ফ দিয়া সুগোপার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—'সাহসিনী, এখন কোন অস্ত্র ব্যবহার করিবে?' তাহার কণ্ঠস্বরে গভীর ব্যঙ্গের সহিত গভীরতর একটা উত্তেজনার আভাস স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

সত্রাস চক্ষু তুলিয়া সুগোপা দেখিল, চিত্রকের দুই চক্ষু হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতেছে, তাহার ললাটস্থ তাম্রবর্ণ চিহ্নটা রক্ত তিলকের মত লাল হইয়া উঠিতেছে। সুগোপা ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ থাকিয়া বলিল—'পথ ছাড়, বর্বর।'

'যদি না ছাড়ি?'

সুগোপা অসহায় নেত্রে চারিদিকে চাহিল। এই সময়, যেন তাহার বিভ্রান্ত উৎকণ্ঠার সাক্ষাৎ প্রত্যুত্তর স্বরূপ শিলাকঙ্করপূর্ণ পথের উপর দ্রুত অশ্বের আস্কন্দিত ধ্বনি শুনা গেল। পরক্ষণেই একটি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে উচ্চ আহ্বান আসিল—

'সুগোপা! সুগোপা!'

চিত্রক সুগোপার পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে অশ্বারোহীকে দেখা গেল; বিদ্যুতের মত দ্রুতগতি অশ্ব পথ হইতে দেবদারু বৃক্ষের তলে আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহী এক লম্ফে ভূমিতে অবতরণ করিতেই সুগোপা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিল।

অশ্বারোহীর বয়স অধিক নয়, কিশোর বলিলেই হয়; মুখে শ্মশ্রুগুম্ফের চিহ্নমাত্র নাই। মস্তকে উজ্জ্বল ধাতুনির্মিত উষ্ণীষ, বক্ষে বর্ম, পৃষ্ঠে ধনু ও তূণীর। অপরূপ সুন্দর আকৃতি, দেখিয়া মনে হয় দেব-সেনাপতি কিশোর-কার্তিকেয় শত্রু বিজয়ে বাহির হইয়াছেন।

তরুণ বীর প্রফুল্ল রক্তাধরে হাসিয়া বলিল 'সুগোপা, কী হইয়াছে সখি?'

সুগোপার মন হইতে ক্ষণিক বিপন্নতার সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছিল, সে গদ্ গদ্ আনন্দের স্বরে বলিল—'কিছু না—ঐ বিদেশী গ্রামিকটা প্রগল্‌ভতা করিয়াছিল মাত্র। এস—ঘরে এস। শিকারে বাহির হইয়াছিলে বুঝি? গাল দুটি যে রৌদ্রে রাঙা হইয়া গিয়াছে!'

চিত্রক ইতিমধ্যে নিঃশব্দে সরিয়া গিয়া দেবদারু বৃক্ষের কাণ্ডে এক হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অন্য হস্তটি অবহেলাভরে তরবারির উপর ন্যস্ত ছিল। তরুণ ঈষৎ বিস্ময়ে তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ক্ষণিকের জন্য উভয়ের চক্ষু মিলিত হইল। তারপর অবজ্ঞাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের সহিত অশ্বের বল্‌গা চিত্রকের দিকে নিক্ষেপ করিয়া সুকুমার কান্তি তরুণ বলিল—'আমার অশ্ব রক্ষা কর—পারিতোষিক পাইবে।' বলিয়া সুগোপার কটি বাহুবেষ্টিত করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে কুটীরের দিকে চলিল।

সুগোপা সোহাগ-বিগলিত-কণ্ঠে বলিল—'তুমি যে এই নিভৃত স্থানে আমাকে দেখা দিতে আসিবে তাহা আমার সকল দুরাকাঙ্ক্ষার অতীত।'

তরল হাসিয়া তরুণ বলিল—'প্রপাপালিকা কিরূপ কর্তব্য পালন করিতেছে ; রাজপক্ষ হইতে তাহাই পরিদর্শন করিতে আসিলাম।'

তাহারা কুটীর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলে চিত্রক ধীরে ধীরে অশ্বের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দর কাম্বোজীয় অশ্ব, প্রস্তর মূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মধুপিঙ্গলবর্ণ ত্বকে চীনাংশুকের মসৃণতা, গ্রীবার চামর মুক্তামালায় মণ্ডিত, পৃষ্ঠে কোমল রোমাবলি নির্মিত আসন, বল্গার রজ্জু স্বর্ণালঙ্কৃত।

চিত্রক অশ্বের গ্রীবায় একবার লঘু স্পর্শে হাত বুলাইল, অশ্ব আপ্যায়িত হইয়া নাসা মধ্যে ঈষৎ হর্ষসূচক শব্দ করিল। চিত্রক তখন সঙ্কুচিত সতর্ক চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নিস্তব্ধ অপরাহ্ণ ; কেবল কুটীরের অভ্যন্তর হইতে মাঝে মাঝে কলহাস্যের ধ্বনি প্রকৃতির বৈকালী তন্দ্রালসতা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। পথে জনমানব নাই।

চিত্রকের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল ; কুটিল তিক্ত হাসি, তাহাতে আনন্দ বা কৌতুকের স্পর্শ নাই। তাহার ললাটের তিলকচিহ্ন আবার ধীরে ধীরে আরক্ত হইয়া উঠিল।

অশ্বের বল্গা ধরিয়া চিত্রক সন্তর্পণে তাহাকে পথের দিকে লইয়া চলিল ; শষ্পাকীর্ণ ভূমির উপর শব্দ হইল না। তারপর একবার পিছনে কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক লম্ফে সে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। আসনের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া জঙ্ঘা দ্বারা তাহার পঞ্জর চাপিয়া ধরিতেই অশ্ব তড়িৎ পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তরময় পথের উপর তাহার ক্ষিপ্র ক্ষুরধ্বনি কয়েকবার শব্দিত হইয়াই আবার পরপারের তৃণভূমির উপর নীরব হইয়া গেল।

নিমেষ [illegible] অশ্ব ও আরোহী পথিপার্শ্বস্থ গভীর বনানীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল। (ক্রমশঃ)

জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ডের বড়দিন উৎসব

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

গত বৎসর ১৭ই নবেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট অঞ্চলে ছিলাম। ঐ সময় বড়দিনের তোড়জোড় তেমন আরম্ভ হয়নি—যদিও লোকেরা ঘরে ঘরে বড়দিনের কেক প্রভৃতি তৈরীতে মন দিয়েছে এবং ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বড়দিনের সঙের মহড়া আরম্ভ করেছে। এর প্রমাণ পেলাম হোফহাইমে ডক্টর ওয়েপিঙ্গারের বাসভবনে, যাবার সময় পথে। তাঁর বাড়ি একটি টিলার উপরে। নীচে রাস্তায় অনেকগুলি ছেলে মুখোস পরে লাঠি নিয়ে খেলা ক'রছে। শুনলাম, এরা বড়দিনের সঙের মহড়া দিচ্ছে। ডক্টর ওয়েপিঙ্গারের বাড়ীতে আমায় খেতে দিলেন বড় একখানি বড়দিনের কেক কেটে কেটে। ঘরেই তৈরি—নিজেদের বাগানের আপেলও তাতে সংযুক্ত হয়েছে বুঝলাম। সেদিন ২৮শে নবেম্বর রবিবার। ওঁরা বিদায়কালে আমাকে মহাকবি গ্যেটের 'প্রাচ্য প্রতীচ্য দিভান' West-Oestlicher Divan উপহার দেন। এতে লিখে দেন—Adventsonntag 1948, অর্থাৎ এটি বড়দিন উৎসবের প্রথম রবিবার। সুতরাং এই সময় থেকেই যে বড়দিনের তোড়জোড় আরম্ভ হয় তা বলা যেতে পারে।

আমি ৩রা ডিসেম্বর রেলযোগে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে জার্মানির প্রধান বন্দর হামবুর্গ সহরে যাই। সেখানে ১৫ দিন ছিলাম। ফ্রাঙ্কফুর্টে যেমন বরফ পড়তে দেখলাম হামবুর্গে তা দেখিনি—যদিও হ্রদের জলে কূলের কাছে বরফের চাঙড় দেখতে পেলাম। এখানে লণ্ডনের মত ভীষণ কুয়াশা ও মাঝে মাঝে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ত—বাতাসও জোরের ছিল এবং শীতও ছিল খুব কনকনে। বড়দিনের বেচাকেনার জন্য এখানে ষ্টেসনের পিছনের চৌরাস্তার নিকটের ফাঁকা জায়গায় মেলা বসেছিল। হরেকরকমের খেলনা, লোহালকড়ের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র, মোজা, জুতো-জামা ও বিবিধপ্রকারের কাপড় চোপড়ের দোকান। লোকেরা ভিড় ক'রে জিনিসপত্র কিনছে। বড়দিনের সময় ঘর সাজানোর জন্য এবং প্রিয়জনকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে। মেলাতে দুএকটি দোকানী আমাদের চানাচুরওয়ালাদের মত চীৎকার করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে। হামবুর্গ সহরে যে সব বাড়ী ভাঙেনি—বড় রাস্তার ধারের সেই সব বাড়ীর নীচের তলায় অবস্থিত দোকানে বড়দিন উপলক্ষে জামা, জুতো, কাপড় চোপড়, ক্যামেরা ও নানাপ্রকার সৌখীন দ্রব্যসম্ভার বিক্রয়ার্থে সাজানো রয়েছে। আমাদের পূজোর বাজারের দোকানের মতই। অফিসের ছুটির পরে সন্ধ্যার দিকে লোকের ভিড়ও দেখেছি যথেষ্ট—দোকানগুলি ক্রেতার সমাগমে সরগরম। হামবুর্গে অটোক্রকমার ও তার ছেলে হাসক্রকমারের সঙ্গে

আমার খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। হান্স বেশ ইংরাজী জানে। স্কুলে পড়ার সময়েই তাকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয় ; অ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌ট বিভাগে তার কাজ ছিল। কাজেই কলেজে পড়বার তার সুযোগ ঘটেনি, এখন সে তার পিতার রাসায়নিক দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানির কারবারে মাইনে হিসাবে কাজ করছে। হান্স বলতো, বড়দিনের সময় তার বাবা, মা, ভাইবোনকে উপহার দিতে হবে। অবশ্য প্রতিদানে সেও অনেক উপহার পাবে। বৎসরের মধ্যে এ সময়টা ওদের খুব আনন্দের দিন। সবাই প্রিয়জনদের সাধ্যমত উপহার দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। বড়দিনের আর একটি বৈশিষ্ট্য রাস্তায় রাস্তায় থান গাছের বড় বড় ডালবিক্রি। শীতকালে এদেশের অধিকাংশ গাছেরই পাতা ঝরে যায়। বনতল পাতার লাল আস্তরণে সুন্দর দেখায়। গাছগুলো দেখায় একেবারে নেড়া। কেবল যেখানে থান গাছ আছে সেই জায়গায় এই গাছের কাঁটার মত পাতাগুলি থাকে সবুজ। আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে কারখানা দেখার ব্যাপারে বনের মধ্য দিয়ে যখন মোটরে গিয়েছি তখন মাঝে মাঝে থান গাছের বন চোখে পড়েছে ; এগুলো অনেকটা ঝাউ গাছের মত দেখতে ; নীচে থেকে ডালপালায় ক্রমশঃ বিস্তৃত হ'য়ে উপরে প্রায় রেখার মত সরু হয়ে উঠে গেছে। দেখতে অনেকটা গির্জারই মত। এই সময় শুধু এই গাছই সবুজ থাকে। সম্ভবতঃ এই দুই কারণে এই গাছকে এরা 'Christmas Tree' বা খৃষ্টক্রম ক'রেছে। হামবুর্গ বড় ষ্টেসনের (Haupt Bahnhof) সামনের বিস্তৃত মাঠে গাড়ী গাড়ী থান গাছ বিক্রয়ার্থ এনে জড়ো ক'রেছে দেখলাম। লোকে সারাদিন সেখান থেকে কিনে নিয়ে ঐ গাছ হাতে বাড়ী যাচ্ছে। ষ্টেসনের সামনের রাইখ্‌সহোফ হোটেলের সামনের রাস্তার অপর ফুটপাথ বরাবর ও এ গাছ সারি দিয়ে বসানো হচ্ছে দেখলাম। আমি ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রে হামবুর্গ ত্যাগ ক'রে জুরিখে রওনা হই। উহার দুই তিন দিন আগে একদিন রাত্রে ডিনারের পর রাইখসহোফ হোটেলের অধিবাসী ইণ্ডিয়ান মিলিটারী মিশনের স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীযুক্ত বি কে শ্রীবাস্তব তাঁর মোটরে ক'রে বেড়াতে বেরোন। সঙ্গে হামবুর্গের বিখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসক ডক্টর কৃপারাম ধাবানও ছিলেন। যুদ্ধে বাড়ী ঘর ভেঙে যাওয়ায় গ্যারেজের অভাবে গাড়ীগুলি লোকে রাস্তার মোড়ে রেখে দেয়। প্রহরী একজন মোতায়েন থাকে। আমরা রাইখসহোফ হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে মোটরের কাছে যাচ্ছি। শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব ও ডক্টর ধাবান আমার আগে আগে যাচ্ছেন। তাঁরা প্রায় রাস্তার মাঝখানে পৌছেচেন। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। সহসা বাঘিনীর আবির্ভাব! দুটি সুবেশ তন্বী তরুণী আমায় লক্ষ্য করে বলে উঠল—Do you know English? আমি কোনও সাড়া না দিয়ে এগোতে থাকলে তারা আবার বলল—Are you afraid of us? আমি এবার তাদের প্রকৃতি বুঝতে পেরে দ্রুতপদে ডক্টর ধাবানের নাগাল ধরে তিন জনে মোটরে গিয়ে উঠলাম। শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব এবং ডক্টর ধাবানও ইহা লক্ষ্য করেছিলেন। আমার দৌড়িয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস এদের প্রাণখোলা হাসির খোরাক জুটাল। কিছুক্ষণ হাসি ঠাট্টার পর শ্রীবাস্তব বললেন—পৃথিবীর নানা দেশের বিলাসী, বিত্তবান্ ব্যবসায়ীরা প্রায়শঃ এই হোটেলে আসছে, আর তাদের অধিকাংশই ত আসে টাকা উড়াতে। সুতরাং হোটেলের সামনে রাস্তায়—তাদের পাকড়াও করবার আয়োজনেরও অভাব নেই!

ডক্টর ধাবানের বন্ধু ডক্টর ননীগোপাল মৈত্র তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকদিন রাইখসহোফ হোটেলে কাটান। এঁদের সঙ্গে আমি লণ্ডনেও কয়েকদিন এক হোটেলে ছিলাম। ডক্টর মৈত্র বার্লিন থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসে ডুয়ার্সে চা বাগানে কাজ করেন। এঁদের সঙ্গে জুরিখেও দেখা হয়েছিল। এঁরা আমার আগেই রোম থেকে বিমানযোগে দেশে ফিরেছেন।' বাঙালী মেয়ের শাড়ীর সৌন্দর্য্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখেছি।

রাত্রিকালে হামবুর্গ শহর অতি নয়ন-মনোহর রূপ ধারণ করে। বিরাট হ্রদের চারপাশেই শহর। আর তার পাড় দিয়ে বরাবর প্রশস্ত সুন্দর রাস্তা। পূর্বে হ্রদের তীরে—কূল থেকে বেশ খানিকটা জলের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রাসাদোপম হর্ম্যরাজিতে হোটেল ও রেস্তোরাঁ ছিল। সেগুলির চিহ্নমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। হ্রদের ভিতর নিয়মিত লঞ্চ চলে। একটি কারখানা দেখে ফিরবার সময় আমি একদিন লঞ্চে চড়েছিলাম। প্রথম শ্রেণীর ট্রামের মত বসবার আরামজনক ব্যবস্থা। টিকিট ওর ভিতরে উঠেই করতে হয়। হানস ক্রুকনার সঙ্গে ছিল। হ্রদের ধারে নামকরা যে সব প্রমোদভবন ছিল, সে তার ধ্বংসস্তূপ দেখালো। হ্রদের ধারে অনেক স্থলে ঘাটগুলি শান বাঁধানো এবং বেড়ানোর জায়গাও অনেকটা করে বাঁধান। অসংখ্য সাদা বুনো হাঁস জাতীয় পাখী জলে ও ডাঙায় এই সব বাঁধান জায়গায় বেড়াচ্ছে লোকেরা রুটির টুকরো খেতে দিচ্ছে। পাখীগুলি নির্ভয়ে প্রায় হাতের কাছে এসে খুঁটে খাচ্ছে। হানস বলল, এগুলি শীতকালে আসে—বসন্তকালে আবার উত্তরের দিকে চলে যায়। লোকেরা সাগ্রহে এদের আগমন প্রতীক্ষা করে—মারার কথা দূরে থাক, কেউ এ পাখী ধরে না—তাই এরা এত নির্ভয়ে মানুষের গা ঘেঁসে বেড়ায়। এখন হানসের কথা ছেড়ে শ্রীবাস্তবের কাছে আসা যাক। গাড়ীতে তিনজনে হ্রদের ধার দিয়ে চলেছি। রাত্রি প্রায় দশটা। বড়দিন উপলক্ষে ভগ্নাবশেষ হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলি হরেক রকমের আলোকে ঝলমল করছে এক জায়গায় এলবের মধ্যে বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজের অসংখ্য আলোক জলে প্রতিফলিত হয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ঘুরার পরে ফিরা গেল। গাড়ীর ভিতরে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতের দু'একটি কলি তিন ভিন্ন দেশীয় অরসিক লোকের গলায় বিচিত্র শুনা যাচ্ছিল। শ্রীবাস্তব গাড়ী চালাচ্ছিলেন। গাড়ী ভারতসরকারের টাকায় খরিদ—তবে তেলের খরচা বহন করে জার্মান সরকার। কারখানা dismantle করার ভার শ্রীবাস্তবের উপর। এই কাজে তাকে বহু স্থানে ঘুরতে হয়। বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও চরিত্র মাধুর্য্যে শ্রীবাস্তব রাইখসহোফ হোটেলে অবস্থিত

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মিলিটারি মিশনের অফিসারদেরই খুব প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। পনের দিন এই হোটেলে তাঁর সঙ্গে থাকায় ইহা লক্ষ্য করেছি।

কৃপারাম ধাবানের জন্ম পাঞ্জাবে। স্বদেশী যুগের লোক। প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে তিনি জার্মানি যান। বার্লিনের ডক্টরেট অব মেডিসিন ডিগ্রী নিয়ে তত্রত্য একজন মহিলার পাণিগ্রহণ করে তিনি ঐ দেশেই আছেন। বার্লিনে বোমা পড়ার সময় তিনি তাঁর নিজের লঞ্চে নদীর মধ্যে দিবারাত্র থাকতেন। ভয়াবহ দিনের সব গল্প করতেন। নাৎসীরা তাঁকে বন্দী করেও অনেকদিন রেখেছিল। আমি যখন হামবুর্গে ছিলাম তখন তাঁর স্ত্রী শিশুপুত্রসহ বার্লিনে আছেন শুনলাম। নিজে হামবুর্গে ডাক্তারী করেন। স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজের সহিতও তিনি সংশ্লিষ্ট। বয়স পঞ্চাশের কাছে। অতি তেজস্বী, সজ্জন এবং ভারত-প্রেমিক লোক এই ধাবান। একটু সরল প্রকৃতির বলেই সম্ভবতঃ ভারতসরকারের কোনও বৈদেশিক দপ্তরে মোটা মাইনেয় ঢুকতে পারেন নি। যুদ্ধের পরে এঁর লঞ্চখানি ৪০ হাজার মার্কে বিক্রী করে ফেলেছেন বললেন। দেশে ফিরবার ইচ্ছা এঁর প্রবল। তবে উপযুক্ত আয়ের সংস্থান না হলে আসতে পারছেন না। ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যায় যোগের স্থান ইত্যাদি নিয়ে তিনি প্রবন্ধাদি পড়েন, ভারতীয় ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণা করতেও তাঁর খুব আগ্রহ দেখলাম। বড়দিন সম্বন্ধে তিনি বললেন—হিটলারের নাৎসীবাদে খৃষ্টধর্মের প্রতি অনাস্থা এনেছিল। এখন ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকার তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ বড়দিনের উৎসব বেশী জাঁকালো করবার চেষ্টায় আছে। এদিকে সাধারণ জার্মানরাও প্রবলতম আঘাতের পর এখন ধর্মের দিকে যেন বেশী ঝুঁকেছে। অভাবগ্রস্তেরা পর্য্যন্ত জিনিসপত্র বাঁধা রেখে বা বিক্রী করে সাধ্যাতীত ব্যয়ে বড়দিনের উৎসব সৌষ্ঠবমণ্ডিত করবার প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। কম্যুনিষ্ট প্রভাবকে দাবিয়ে রাখার জন্যও ধর্মভাবের পুনরুদ্ধার কার্য্যকরী বলে ডক্টর ধাবানের অভিমত। ফলতঃ এই চিন্তাশীল, বিদ্যানুরাগী, স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সঙ্গে হামবুর্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পাওয়া—জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে মনে করি।

অটো ও হান্‌স ব্রুকনার, শ্রীবাস্তব এবং ডক্টর ধাবানের সাহচর্য্য ও সৌহার্দ্যের স্মৃতিভার-মন্থর মনে ইণ্টার ন্যাশানাল ট্রেনযোগে ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রি দশটায় হামবুর্গ থেকে কবির কথায় "কামনার মোক্ষধাম যেথায় বিরাজে"—সুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিখ সহরের উদ্দেশে রওনা হই। কারণ এক বৎসর আগে থেকেই জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক পল কারায়ের সঙ্গে পত্র প্রয়োগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করেছিলাম। ইয়োরোপ যাত্রার প্রাক্‌কালে তিনি আমায় লেখেন যে আমি জুরিখে গেলে তিনি অতিশয় খুসী হবেন এবং সুইস রাসায়নিক কারখানা দেখার ব্যাপারে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। লণ্ডন এবং ফ্রাঙ্কফুর্টে থাকাকালে ও তাঁর প্রীতিমধুর পত্র পেয়েছিলাম। ট্রেনে একজন সুইডিস মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়—বয়স তাঁর আশির কাছে। ষ্টকহলম থেকে একাই তিনি রোমে যাচ্ছেন। বাজেলে নেমে আমায় শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি রোমের গাড়ী ধরলেন। এই বয়সেও তাঁর বেশ শক্তিসামর্থ্য আছে—ভাষাও তিনি তিন চারটি জানেন। নিজের ভাষা ছাড়া জার্মান, ফরাসী, ইংরেজীতে বেশ দখল। ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে ইনি বই লিখেছেন। রোমের বিশেষজ্ঞদের দেখিয়ে উহা প্রকাশের চেষ্টা করবেন, বললেন। দেশে উপযুক্ত ছেলে-মেয়েরা আছে। ষ্টকহলমের সুবিখ্যাত নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক অয়লারের সঙ্গে এর সাক্ষাৎ পরিচয় আছে জানালেন। আমি কেমিষ্ট শুনে—কেমিষ্ট্রীর কোন্ বিভাগে আমার অধিকার তাও জিজ্ঞাসা করতে ছাড়লেন না; সুতরাং এই বৃদ্ধা যে বেশ শিক্ষিতা তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

জুরিখে বড়দিনের উৎসব আমার চিরদিন মনে থাকবে। ২০শে ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশটায় 'কেমিশে ইনষ্টিটুট দের য়ুনিভারসিট্যাট', জুরিখে গিয়ে অধ্যাপক কারার ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি। পরদিন সন্ধ্যায় ইনষ্টিটিউটে বড়দিনের উৎসবে (Christmas Tree celebration) যোগদানের জন্য অধ্যাপক কারার আমায় নিমন্ত্রণ করেন। যথাসময়ে রসায়নের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর সোয়াইটজারের সঙ্গে নীচের তলায় প্রকাণ্ড একটি ল্যাবরেটরিতে উপস্থিত হলাম। সমবেত অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে অধ্যাপক কারার আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের দলের মধ্যেই আমি বসলাম। সোয়াইটজার দূরে সহকারী অধ্যাপকদের মধ্যে বসলেন। ছাত্র ছাত্রীদের অধিকাংশই রইল দাঁড়িয়ে—কেউ কেউ ল্যাবরেটরির টুল এবং working বেঞ্চের উপরেই আসন নিল। প্রায় পাঁচশ ছাত্রছাত্রী ঐ সভায় উপস্থিত ছিল। বড়দিনের ছুটি প্রায় দুই সপ্তাহ। এর পূর্বে প্রতি বৎসরই এইরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে শুনতে পেলাম। এইদিন শিক্ষক ছাত্র সবাই প্রাণখুলে মেশে এবং অবাধে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে। ল্যাবরেটরির কেন্দ্রস্থলে প্রকাণ্ড একটি থানগাছ বসানো হয়েছিল। তার ডালে ডালে হরেকরঙের ঝক্‌মকে গোলক ও বাতি ঝুলছিল। ছাত্র সমিতির সেক্রেটারি প্রথমে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে উৎসব উদ্বোধন করা মাত্র গাছের আলো-গুলি জ্বেলে দেওয়া হ'ল। জার্মানভাষায় ওদের জাতীয় সঙ্গীত সমবেত সুরে গাওয়ার পর এক এক দলে দুই তিন জন করে ছেলে এসে সামনের টেবিলের উপর উঠে মস্ত বড় কাগজে প্রফেসর ও ছাত্রদের নানাবিষয় নিয়ে এই উপলক্ষে আঁকা ছবি দেখিয়ে ক্যারিকেচার করতে শুরু করে দিল। জার্মান ভাষায় সুর করে ও উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতার ভঙ্গিতে ছড়াগুলি বলে চলল। সমবেত ছাত্র ও শিক্ষকগণ হাততালি দিয়ে মাঝে মাঝে তারিফ করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে চলল। ইতিমধ্যে ছাত্রীগণ প্রত্যেকের হাতে একটি করে খালি 'বিকার' সঙ্গে সঙ্গে বিস্কুট, কেক ও কমলালেবু দিয়ে গেল। বিকার দেখে প্রথমটায় ভয় হ'ল—মদ-টদ দেবে নাকি! কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখি প্রত্যেকের বিকারে বিনাদুধে তৈরি কড়া লাল

চা দিয়ে যাচ্ছে। তবী মার্কিণ তরুণী ছাত্রীরা অনেকবার করে কেক কমলালেবু দিয়ে গেল—চাও অনেকেই একাধিক বার নিলেন। তুইজন যোম্বাই-এর এবং একজন বাঙালী ছাত্র (শ্রীমান প্রমোদরঞ্জন ব্যানার্জি) মিলে উর্দু ভাষায় একটি জাতীয় সঙ্গীত গান করল। হাত-মাথা নেড়ে এরা মন্দ করল না—তবে এত খাঁটি উর্দু যে আমি বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলাম না। এদের গান শেষ হলে তুমুল করতালি পড়ল। অধ্যাপক কারার চেয়ার থেকে উঠে ওদের কাছে গিয়ে গানের প্রশংসা করলেন। আমার কাছে এসে বললেন "গান শুনতে ত ভালই লাগল—মানে কিছু বুঝলে তুমি?" আমি বললাম—"এ আমার কাছে জার্মানেরই সমতুল্য—কারণ ভারতবর্ষ মহাদেশের মত দেশ তার এক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশবাসীদের বুঝা খুবই শক্ত।" শুনে উনি একটু হেসে নিজের আসনে গেলেন।

এর পর ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ হিসাবে অধ্যাপক কারারের বক্তৃতা দিবার পালা। প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ ও শুভকামনা জানালেন। তারপর এই বিশেষ দিনে কলকাতার বেঙ্গলকেমিক্যালের চীফ কেমিষ্ট ডক্টর বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে উপস্থিত থাকায় তাঁরা অতিশয় আনন্দিত হয়েছেন বললেন। অতঃপর বড়দিন উৎসবের প্রাচীনত্বের উল্লেখ করে তিনি বললেন যে, যদিও গত প্রায় তুই হাজার বৎসর খৃষ্টের জন্ম উপলক্ষ করেই এই উৎসব প্রতিপালিত হয়ে আসছে তথাপি সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষকগণের ধারণা ইহার আগেও এই উৎসব প্রচলিত ছিল। ক্ষুদ্রতম দিবাভাগের ও শীতের অসহনীয় ক্লেশের ক্রমাপসারণ যে সময় থেকে আরম্ভ হয়—সেই সময়ে বসন্তের শুভাগমনে অপেক্ষমানে মানবমন স্বতই আনন্দ বিহ্বল হয়ে ওঠে। এরই বাহ্যপ্রকাশ এই বড়দিনের উৎসব। পরে খৃষ্ট-জন্মের সঙ্গে ইহার সময়গত যোগ ঘটায় শীতপ্রধান পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন জাতিদের সেই উৎসব ক্রমশঃ সর্বলোকগ্রাহ্য, ঐতিহ্যসমৃদ্ধ হয়ে বর্তমান আকারে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর নানাদিগ্‌দেশাগত ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখ করতে গিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ ও ধীশক্তির প্রাচুর্য্যের কথা বলেন। ইনষ্টিটিউটের মার্কিণ ছাত্রীদের দৈহিক সৌন্দর্য্য ও তৎপ্রতি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কৌতূহল দৃষ্টির উল্লেখপূর্বক ষাট বৎসর বয়সের গম্ভীরস্বভাব অধ্যাপক এই আনন্দের দিনে কিঞ্চিৎ রসিকতা প্রকাশ করলেন। সকলেই তাঁর ভাষণ খুব উপভোগ করল। সবই জার্মান ভাষায় হ'ল। সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি—তবু এই উৎসব খুব ভাল লেগেছিল। অধ্যাপক প্রায় আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেন। তার পর সভা ভঙ্গ হল। উৎসব শেষে তিনি আবার আমার কাছে এসে আমার কেমন লাগল জিজ্ঞাসা করলেন।

অধ্যাপক কারার এবার ৬০ বৎসরে পদার্পণ করলেন। ইনি অতিশয় রাসভারী লোক। ছাত্রেরা বলল—বৎসরের মধ্যে এই একটি মাত্র দিনে তাঁর মধ্যে একটু তারল্য ও কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় মেলে। সহকারী অধ্যাপক ডক্টর সোয়াইটজারের মুখে শুনলাম—তাঁরা অধ্যাপককে কখনো কোনো নাচে যোগ দিতে দেখেন নি। বস্তুতঃ জ্ঞান রাজ্যের নবনব প্রদেশে যাঁদের নিত্য অভিযান চালাতে হয় তাঁদের পক্ষে গীতার—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ" এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন না করে উপায় নেই—পৃথিবীর যে কোনও অংশেই তাঁদের জন্ম হউক না কেন। সরলতার প্রতিমূর্তি এই অধ্যাপক কারার। নোবেল প্রাইজ ও অন্যান্য বহু পুরস্কার, মেডাল লাভ করেছেন; কিন্তু বিলাসিতা বা অহংকার কিছুই এঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখে তা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পান। এঁর লিখিত "Lehrbuch der Organischen Chemie" বর্তমানে একাদশ সংস্করণ চলছে। নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে এই পুস্তক পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের রসায়ন শাস্ত্রের উচ্চতর জ্ঞান প্রচারের সহায়তা করছে। অথচ এতবড় একজন লোক নিত্য দুবেলা ট্রামে চড়ে কলেজে যাচ্ছেন। একখানি মোটরগাড়ি পর্য্যন্ত কেনেন নি!

এদেশের কারখানাতেও বড়দিনের সময় সকল শ্রেণীর কর্মী কর্মচারী—ছোটবড় সকলেই একত্র মিলিত হয়ে পানভোজন ও আনন্দোৎসব করে থাকেন। ইহা প্রত্যক্ষ করলাম সিবা কোম্পানিতে গিয়ে। ২২শে ডিসেম্বর ভোরে ৭টা ১২র ট্রেণযোগে জুরিখ থেকে বেরিয়ে বেলা ৯টায় বাজেলে সিবা কোম্পানির কারখানায় উপস্থিত হই। বাজেল রাইন নদীর ধারে সুইজারল্যাণ্ডের উত্তর সীমান্তের বিখ্যাত শিল্পপ্রধান শহর। ফরাসীরা এই শহরকে বাল বলে—ইংরেজেরাও তাদের অনুকরণে ঐ নামেরই পক্ষপাতী। বাঙালীর কর্ণ-কটু এই শব্দ ব্যবহার না করে আমি সর্বত্রই জার্মান উচ্চারণই রেখেছি। সিবার পুরো নাম—'কেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রিজ ইন বাজেল'। এই শহরে প্রায় দুই মাইলের মধ্যে সিবা, গাইগি, রচি ও স্যাণ্ডোজ—চারিটি পৃথিবী বিখ্যাত রাসায়নিক কারখানা। এর প্রত্যেকটিই এত বিরাট আকারের ও এত বিপুলভাবে সমৃদ্ধ যে এর একটির মত কেমিক্যাল কারখানাও আমাদের সমগ্র দেশের কুত্রাপি গড়ে ওঠে নি। আমি সিবা কোম্পানিতে উপস্থিত হলে ওঁদের বিক্রয় বিভাগের শ্রীযুক্ত টং এলেন। ঐদিন বড়দিন উপলক্ষে দুপুরে ওঁদের কারখানায় বার্ষিক মিলিত পানভোজের ব্যবস্থা হয়েছে, কাজেই সেদিন কারখানা দেখানো সম্ভবপর নয় বললেন। ভদ্রলোক স্যাণ্ডোজ কোম্পানিতে ফোন করেও ঐ জবাবই পেলেন। পরে রচিতে ফোন করে জানলেন—তাদের ভোজ সেদিন নয় সুতরাং তাঁরা কারখানা দেখাতে পারেন। সিবা থেকে ট্রামে ষ্টেসনের দিকে প্রায় ১ মাইল গিয়ে রাইন-ব্রিজের সন্নিকটে Drei Koenige (তিন রাজা) নামক হোটেলে আমাকে বসতে বললেন। আমি সেখানে গিয়ে মিনিট দশ বার অপেক্ষা করার পরেই রচির প্রচার বিভাগের ডাক্তার হিয়ং নামে ইংরেজ ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। তিনি অপর একটি ভাল হোটেলে নিয়ে আমার সঙ্গে করে লাঞ্চ খেলেন। তার পর উভয়ে হেঁটেই রাইন-ব্রীজ পেরিয়ে নদীর ধারের মনোরম রাস্তা দিয়ে গিয়ে মিনিট পনেরর মধ্যেই রচি বা

হক মাস লারোশের কারখানায় উপস্থিত হলাম। নদীর ভিতর থেকেই পাথর দিয়ে শক্ত করে গেঁথে তুলেছে পাড়। নদী বেশ প্রশস্ত গঙ্গার অর্দ্ধেকেরও বেশী—তবে জল একেবারে নীচে। ইয়ং বললেন, গ্রীষ্মাগমে বরফ গলতে থাকলে নদী একেবারে ভ'রে ওঠে। নদীর ধারের যে পথ দিয়ে আমরা গেলাম তার পাশে বরাবর লেবু গাছের শ্রেণী। অবশ্য তখন পত্র-পুষ্প বর্জ্জিত ছিল। ৩০।৩৫ বৎসরের এই ডাক্তার যুবক পথে চলতে৹ সুখ দুঃখের কথা বললেন। অবিবাহিত—ঘর সংসার না থাকাতে পয়সাও যাচ্ছে, অথচ শান্তি বা সুখও পাচ্ছেন না। এই দেশেই বিয়ে করে বসবাস করবেন ইচ্ছা। পথে ইয়ংএর পরিচিত একজন মার্কিণ আর্টসএর ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ছেলেটি শহরের দিকেই যাচ্ছিল। ছেলেটি চলে গেলে ইয়ং বললেন—"এরা লেখাপড়া শিখতে যতটা না আসুক, পয়সা উড়াতে ও মজা লুটতে এসেছে সুইজারল্যাণ্ডে। রচির কারখানা দেখার কথা আগেই বলেছি। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

বাজেল থেকে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে শুনলাম রাত্রে বড় দিনের উৎসব, তাই ডিনারের পালা নেই। এই হোটেল 'কুয়োর হাউস' রিগিরিক বনাকীর্ণ পাহাড়ের পাদদেশে সুইজারল্যাণ্ডের মেয়েদের পরিচালিত আলকহল ফ্রাইয়েস রেস্তোরাঁর অন্যতম। হোটেলে মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ। আহারের সময় টেবিলে জারে ক'রে বিশুদ্ধ পানীয় জল দিয়ে যায়। এইরূপ হোটেলের খরচ অন্যান্য হোটেলের তুলনায় সস্তা, কিন্তু ব্যবস্থা এবং খাওয়া-দাওয়া বেশ ভাল। পরিচালিকা ও পরিচারিকাদের মধ্যে কোনও চাপল্য বা চাঞ্চল্য নেই—বকশিস গ্রহণও এদের নিয়ম বিরুদ্ধ। এরূপ হোটেল পরিচালনা মেয়েরা সেবা-কার্য্যের মধ্যে মনে করে এবং সমাজে এ জন্য তারা হেয় নয়। একজন পরিচারিকার কন্যা স্থানীয় মেয়েদের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলে শুনতে পেলাম।

২২শে ডিসেম্বর রাত্রে হোটেলের বাসিন্দা এবং যারা আগে এই হোটেলে ছিল এখন জুরিখ শহরে অন্যত্র আছে তাদেরও বড়দিন উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ ছিল। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় ও জুরিখের টেকনিশে হোকশুলের সাত আটজন ভারতীয় ছাত্র উপস্থিত ছিল। এরা প্রথমে এখানে উঠেছিল, এখন কলেজের নিকটে 'পেয়িং গেষ্ট' হয়ে লোকের বাড়ীতে কম খরচায় আছে। হোটেলটি পাহাড়ের উপর বলে নীচে থেকে 'সাইলবান' বা দড়ি টানা ট্রামে আসা যাওয়ার খরচা বেশী পড়ে। ইহাও এদের কলেজের কাছে সরে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ভারতীয় ছাত্রেরা সবাই উপহার এনেছিল। জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বই এবং ইংরেজিতে জহরলালের বই। হোটেলের যে ঘরে ডিনার খাওয়া হয় সেই প্রকাণ্ড হলে আমরা প্রায় সাড়ে আটটায় গিয়ে সমবেত হলাম। নিমন্ত্রিতদের জন্য চেয়ার টেবিল ঠিক করাই ছিল। ঘরের ভিতর দেখি প্রকাণ্ড একটি খৃষ্ট-ক্রস। নানা প্রকার আলোক ও গোলকে ঝলমল করছে। পাশেই পরদা টাঙিয়ে থিয়েটারের ষ্টেজ করেছে। প্রথমে প্রত্যেককে একখানা করে ছোট সুদৃশ্য কাগজে গোটা গোটা হাতের লেখায় বিখ্যাত জার্মান কবি ও দার্শনিকদের দুই-চার ছত্র করে উদ্ধৃত বাণী দিয়ে গেল। আমার নামে পড়ছিল—**Rueckert**এর নিম্ন-লিখিত কয়েক ছত্র—

> **Wenn der Tag nicht hell ist,**
> **sei du heiter**
> **Sonn' und froher Sinne**
> **sind Gottes Streiter.**

এক কথায় মোটামুটি অর্থ কুহেলি আচ্ছন্ন আঁধার দুর্দিনে পড়লেও মানসিক প্রফুল্লতা হারিয়ো না।

এর পর প্রত্যেককে একটি করে ধাঁধা সংবলিত কাগজের টুকরো দিয়ে গেল। কেউ হয় ত পেল—"**Not a Rose**"—প্রথমে যার বুঝতে পারিনি। পরে দেখলাম "**Without thorn**"—চিহ্নিত একখানি কেক তাকে উপহার দেওয়া হল। এইরূপে নিমন্ত্রিত সকলেই একখানি ক'রে কেক পেলেন। বলা বাহুল্য, উপহৃত কেক ওখানে বসে খাবার জন্য নয়, সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য দেওয়া। এর পরে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আরম্ভ। একেবারে নিরামিষ সাত্ত্বিক আহারের আয়োজন। প্রচুর দুধ ও চিনি ময়দা কর্পূরাদি যোগে প্রস্তুত হালুয়ার মত অনেকটা সত্যনারায়ণের সিন্নির মত পাতলা ও মুখরোচক খাদ্য প্রত্যেকের পাতে পর্য্যাপ্ত দিয়ে গেল। তারপর দিল কেক। অবশ্য যে যত পারল পেট ভরে খেল। এর পরে সুরু হল—যীশুর জন্মোৎসব অভিনয় জার্মান ভাষায়। একটি সুন্দরী তন্বী ত্রয়োদশীকে শ্বেত বস্ত্র পরিয়ে মেরি সাজিয়ে ছিল। বড় একটি আলুর পুতুলকে কাপড় চোপড়ে শোভিত করে নবজাতরূপে ঝাঁপির মধ্যে শুইয়ে খৃষ্ট-ক্রসের তলায় রেখে দিল। তাকে মাঝে মাঝে মেরি ও তার সহচরীরা এসে আদর করে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে যাচ্ছিল। দাড়ি গোঁফে সজ্জিত সেই যুগের 'সেণ্ট' বা দেবদূত কে যেন বাইবেলের অংশ বিশেষ পড়ছিল। অপর কয়েকটি পুরুষের ভূমিকাও ছিল সেই যুগের। বলা বাহুল্য এ সব ভূমিকাতেও মেয়েরাই অভিনয় করল। পুরুষ কেউ ষ্টেজের ওদিকে ছিল না। মাঝে মাঝে গান করতে করতে মেয়েরা এসে যিশুকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরে যেতে লাগল। খুব বেশী বুঝতে না পারলেও অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সকলেই প্রশংসা করল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অভিনয় চলল। আমি সারাদিন রচির কারখানা দেখায় ক্লান্ত ছিলাম, আবার ৬টায় হোটেল থেকে বেরিয়ে বাজেলে সিবার কারখানা দেখতে যেতে হবে—কাজেই রাত্রি ১২টার সময় ভারতীয় বন্ধুদের নিকট বিদায় নিয়ে এবং হোটেলের অধ্যক্ষাকে বলেও ধন্যবাদ দিয়ে পাশের অপর বিল্ডিংএ আমার কামরায় শুতে গেলাম।

ষ্ট্রাইক্

শ্রীপূর্ণানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় এম এ

—'আমাকে অনুরোধ করো না, সমর, আমি পারব না'

—'পারবে না ?'—

—'না'—দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল জয়ন্ত।

—'কেন ?'

'—তুমিও প্রশ্ন করবে, কেন ?'

—'আমাদের অনুরোধকে তুমি উপেক্ষা করছ বলেই আমি প্রশ্ন করতে বাধ্য হোয়েচি'—সমর উত্তর দিলে।

—'জান আমি বিবাহিত'—

—'জানি'—

—'আমার দুটী ছেলে'—

—'জানি'—

—'আমি প্রায় নিঃস্ব ও নিরাশ্রয়'—

সমর চুপ করিয়া রহিল।

জয়ন্ত বলে যেতে লাগ্‌লো—'কাল যদি আমার চাকরী যায়, আমি কোথায় দাঁড়াব'—

—'তোমার মতো আরও অনেকে আছে'—

—'না নেই'—

—'তুমি নিজের দুঃখটাই বড় করে দেখছ'—

—'অতি স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যার পিছনে রয়েছে ক্রমাগত দৈন্যের ক্লেশের ইতিহাস'—

—'বলতে পারো আমাদের ভিতর সুখী কে ?'—

—'বাইরে থেকে সেটুকু বলতে পারিনে—আমার নিজের ইতিহাস হয়তো তুমি সব জান না, সমর'—

সমর কোন প্রশ্ন করল না। জয়ন্ত বলে যেতে লাগল—'আজ সাত বছর আগেকার কথা, কলেজ হোতে বেরলাম। পড়াশুনা কোরতে যা কষ্ট হোয়েছিল, নাই বা বোললেম। তারপর পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, দোরে দোরে ধর্ণা দিয়েছি শুধু একটা চাকরী—সামান্য আশ্রয়। কেউ অবহেলা করেছে, কেউ করেছে অপমান—অভিযোগ করিনি, চলে এসেচি। চোখে জল এসেচে—শুকিয়ে গেছে চিন্তার উত্তাপে। হয়তো ভাগ্যে জুটেছে কোনদিন অর্দ্ধাশন—কোনদিন বা অনশন। দরিদ্র বলে, সুযোগ নিয়েছে আমার অভাবের, এই যে যারা বসে আছে লোহার জয়েষ্টের মতো, নির্মম নিষ্ঠুর বড়লোকগুলো বাড়ী হাঁকিয়ে। পরিশ্রম করেছি অক্লান্ত, পারিশ্রমিক পেয়েছি সামান্য—যাতে না জোটান যায় পেটের ভাত'—

পকেট হোতে সিগারেট বার করে সমর দিলে জয়ন্তকে। জয়ন্তের মুখে পরিস্ফুট হোয়ে উঠলো অতীত বেদনার স্মৃতি—সমরের চোখে সহানুভূতি। ফুসফুসটাকে যতদূর সম্ভব ফুলিয়ে একটা টান দিলে জয়ন্ত সিগারেটটাতে, তারপর বলে যেতে লাগল—'সংসারে নিত্য অভাব। মনে হোতো আত্মহত্যা করি, কিন্তু পারিনি, ভাবতুম এমন দিনই যাবে না। একদিন আমারও সুদিন আসবে—একদিন আমিও হাসবো। দুঃখে কষ্টে সংসারের সব গেল ম'রে। বাকী রইলুম আমি—তারপর এই চাকরী। মনে কোরেছিলাম বিয়ে করে দারিদ্র্যকে আর আমন্ত্রণ করে আনব না। কিন্তু সময় সব ভুলিয়ে দিলে। আজ আমার অন্তর কেউ জানে না, সমর। বাইরের ছাউনিটা দেখে তোমরা মনে কর' আমি বিত্তশালী, কিন্তু সেটা ভুল—একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো জয়ন্ত।

—'অবিশ্বাস আমি তোমাকে করিনি জয়ন্ত' সহানুভূতির স্বরে সমর বললে।

—'জেনে শুনেও অনুরোধ করছ আমাকে'—

—'হ্যাঁ, তবু করছি'—

—'কেন ?—

—'কেন জান ? তুমি যদি অফিসে আসো, তাহলে আমরা আটকাতে পারবো না অনেককেই'—

—'এ যুক্তি তোমার সঙ্গত নয় সমর'—

—'তুমি অফিসারদের প্রিয়পাত্র, তুমি এলে অনেকেই আসবে, কোন যুক্তি, কোন দৃষ্টান্ত তারা মানবে না, বিশেষতঃ অনেকে তোমাকে শ্রদ্ধা করে'—

—'ভুল, সমর, তারা শ্রদ্ধা করে না, ভয় করে,—পাছে আমি কোন ক্ষতি করি। কিন্তু তারা জানে না যে…'—বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেল জয়ন্ত—

—'থাক্ তুমি কথা দাও, তুমিও অফিস্ যাবে না'—

—'সে অঙ্গীকার করতে আমি পারব না'—

—'যদি তোমার পরিবারের সমস্ত ভার—ইউনিয়ন নেয়—তবুও না'—

—'না—ইউনিয়ন সে ভার নিতে পারে না, আর সেটা প্রার্থনা করাও অন্যায়'—

—'আর তোমার অফিস যাওয়াটাই ন্যায়, কি বল ?'—একটু বিরক্তির সহিত সমর বলিল।

—'উত্তেজিত হও না সমর। যেটা অসম্ভব সেটাকে সম্ভব বলে মেনে নিওনা। আমাদেরই মতো গরীব কেরাণীর সামান্য চাঁদায় এই ইউনিয়নের তহবিল—তার থেকে সাহায্য করবে আমার সংসারকে। সে ভাত আমার মুখে উঠবে না, সমর'—

—'তাহলে তুমি যাবেই'—

—'হ্যাঁ'—

—'কাপুরুষ !'—সমর একটু বেঁকা হইয়া বসিল।

'—ছিলুম না, হোয়েচি বা হোতে হোয়েচে'—

—'বিপদটা শুধু তোমার একার—না ?'—

—'হয়তো তাই। একদিন আমিই যুদ্ধ করেছি দুঃখের সঙ্গে দিনরাত, সামান্য সহানুভূতি পাইনি কারুর কাছে'—

—'সে জন্যে আজ তার প্রতিশোধ নিচ্ছ'—আমাদেরি উপরে ?'—একটু শ্লেষের সহিত সমর প্রশ্ন করিল।

—'ঠিক তা নয়, তবে মানুষের উপরে বটে। দিয়ে পাইনি বলেই ধিক্কার ধরে গেছে জগতের উপরে'—

—'তুমি দিয়েছ ?'—বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করলে সমর।

—'অর্থ নয়, স্বার্থ'—অত্যন্ত নরম ভাবে উত্তর দিলে জয়ন্ত !

—'যাক্ তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই—তুমি কথা দাও যে তুমি অফিস যাবে না'—ধরে বসলো সমর।

—'দুঃখিত'—

—'তুমি ভাল চাওনা আমাদের ইউনিয়নের ?'—

—'চাই—সর্ব্বান্তঃকরণে'—

—'আমাদের মতের বিরুদ্ধে, অফিসে গিয়ে !'—সমর নীচেকার ঠোঁটটা একটু জোরে চেপে ধরে' প্রশ্ন করলে।

—'আমার ব্যক্তিগত মতকে বা বিবেককে উপেক্ষা না করে'—

—'তাহলে যেয়ো'—

জয়ন্তকে উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়া সমর চেয়ারটাকে প্রায় একরকম উলটাইয়া দিয়াই বাহির হইয়া পড়িল।

ষ্ট্রাইক্ নোটীশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। তারপর কয়েকটা দিন কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন বোধহয় অগষ্ট দিবস—জয়ন্ত বাহির হয় নাই। প্রভাত-ফেরীর উন্মাদনায় সেও ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছিল। স্ত্রী-অরুণাও কোলের ছেলেটাকে কোলে লইয়া জয়ন্তের পাশেই বসিয়াছিল। জয়ন্ত প্রভাত-ফেরীর মিছিলের দিকে তাকাইয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। অরুণা জিজ্ঞাসা করিল—

—'হ্যাঁ গা, তোমাদের ষ্ট্রাইকের কি হলো ?'—

—'হবে'—তেমনি অন্যমনস্ক হইয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলে জয়ন্ত।

—'তুমি ষ্ট্রাইক করবে ?'—উৎসুক হোয়ে জিজ্ঞাসা করলো অরুণা।

—'না'—

'—কেন ?'—

—'আমাদের চলবে কি করে—জয়ন্ত অরুণার দিকে মুখ ফেরালো।

—'তা বলে, সকলের মতের বিরুদ্ধে !'—

—'কি করি বল, যখন সকলেই আমার বিপক্ষে'—

কোন এক অজানা আশঙ্কায় অরুণার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

—'না গো না, তোমার একা গিয়ে কাজ নেই'—একটু বিচলিত হইয়া অরুণা বলিল—

—'যদি না যাই, আমি তুমি, তোমার ছেলে সব উপোস করতে পারবে ?'—

—'যদি তাতে তোমাদের সকলের ভালো হয়, না হয় একটু কষ্ট হলো'—

জয়ন্ত বিস্মিত হইয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পর বলিল

—'সে কষ্টটা কত গুরু তা বোধ হয় জান না অরুণা'—

—'সে কষ্টে তোমার যদি সম্মান বাড়ে, লোকে তোমাকে প্রশংসা করে, আমি সে দুঃখ সহ্য করে নেবো'—হাসি মুখে উত্তর দিল অরুণা।

—'বেশ, ভেবে দেখি'—জয়ন্ত টুথব্রাশে কতকটা পেষ্ট লইয়া উঠিয়া পড়িল।

অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করিয়া জয়ন্ত সেই মাত্র চা'র কাপে চুমুক দিয়াছে, সমর এক হাতে কতকগুলো লজেন্স্ অন্য হাতে একটা বাক্স লইয়া সোজাসুজি ঘরে আসিয়া ঢুকিল। জয়ন্ত প্রথমটা কতকটা থতমত খাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সমরের মুখে হাসি দেখিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রশ্ন করিল—'এগুলো কেন নিয়ে এলে সমর ?'—

—'বৌদির হাতের রান্না খাবো বলে'—

অরুণা ইতিমধ্যেই আর এক কাপ চা ও কিছু খাবার লইয়া আসিয়াছিল। কাহাকেও প্রশ্ন করিতে অপেক্ষা না দিয়া, অরুণার হাত হইতে চা'র কাপটা এক রকম ছোঁ মারিয়া লইয়া বলিল—'বৌদি, দুপুর বেলায় এখানেই দুটো প্রসাদ পাবো'—

—'তবু ভালো, আমি তো মনে করেছিলাম—ঠাকুরপো বুঝি সকলের আগে আমাদের সঙ্গেই ধর্মঘট করলে'—অরুণা একটু ঠাট্টা করিয়া বলিল।

—'সে আর পারলুম কৈ ? মনে করি জয়ন্তকে আর আপনাকে ভুলে যাই—কিন্তু পারি নে'—

—'ও ! তাহলে ভোলবার চেষ্টা কোরছেন'—

একটু হাসিয়া অরুণা চলিয়া গেল।

জয়ন্ত চায়ের কাপটা শেষ করিয়া, কাগজটা ধরিয়া ছিল। কাগজের উপর মুখ রাখিয়াই প্রশ্ন করিল—'ব্যাপার কি সমর ?'—

—'অত্যন্ত গুরুতর'—

—'খুলেই বলো'—

—'মুসলমানেরা বেঁকে বসেছে'—

—'কি, তারা ষ্ট্রাইক্ কোরবে না'—

—'না'—

—'তবু তোমরা ষ্ট্রাইক করবে ?'—

—'না, করে কি করবো বল তো'—

—'আমি অনেক ভেবে দেখেছি সমর, আমাদের ষ্ট্রাইক্ সফল হ'তে পারে না'—

—'কেন ?'—

—'প্রথম আমাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ, তারপর সাধারণে সহযোগিতা নেই'—

—'সে বিরোধ একমাত্র তুমি মেটাতে পারো জয়ন্ত'—একটু বিচলিত হোয়ে সমর বল্লে।

—'কিন্তু সাধারণের সহযোগিতা ?'—

—'সে আমরা পাবো'—

—'এর জন্যেই তোমার উপর রাগ হয় সমর, যুক্তি দিয়ে কোনটাকে মানতে চাও না বলে'—

—'ঘাট মানছি, বলো কেন পাবো না'—

—'প্রথমতঃ আমাদের ডিপার্টমেণ্ট ষ্ট্রাইক করলে সাধারণের কোন অসুবিধা হবে না—স্বীকার কর ?'

—'হ্যাঁ'—

—'দ্বিতীয়তঃ কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন আমাদের পক্ষে নেই'—

—'কিন্তু এগুলো পাবো না, এই ভেবে তো কাজ হোতে এখন আর সরে আসা যায় না'—

—'যখন সরে আসা যায় না, তখন আমাদের উচিত এখনকার মতো ষ্ট্রাইক নোটিশ ফিরিয়ে নেওয়া'—

—'তারপর ?'—

—'বিশেষ চিন্তা ক'রে তারপরে নামা'—

—'সে চিন্তাটুকু করবে কে ?'—

—'আমি করে রেখেছি, সমর ?'—

—'তুমি ?'—

—'বিস্মিত হচ্ছ ?'—

সমর চুপ করিয়া রহিল। জয়ন্ত বলিয়া যাইতে লাগিল—'সমর, তোমরা শুধু জানো নলপাতার আগুনের মতো জ্বলে উঠতে, কিন্তু রাখতে পার না তার উত্তাপকে। আমি তা পারিনে, কেননা আমার অতীতে আছে একটানা দুঃখকষ্ট, আমি চাই সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে, ভেঙে চুরমার করে এক করে দিতে। তোমরা ভাবো তোমরা কর্মী। কিন্তু পারো মাথা পেতে নিতে সব বিষাদকে, গ্লানিকে আর দুঃখকে ?'—জয়ন্ত প্রশ্ন করলে।

—'এতটুকু সত্যিই ভেবে দেখিনি, জয়ন্ত'—বিনয়ের সহিত সমর বলিল।

—'তোমরা ভাবো—আমাদের সহকর্মীদের অভাব কেবল তোমাদিগকেই বিচলিত করেছে আর আমি শুধু একটা জড়পিণ্ড, না আছে তাতে প্রাণের স্পন্দন, রক্তের চাঞ্চল্য। আমার কি মনে হয় জানো ? মনে হয়, ক্ষতি কি—যদি আজ সমস্ত মন্দির আর মসজিদ এক হোয়ে যায়। আমরা সবাই মিলে সব চারতলা আর একতলাগুলো ভেঙে মরুভূমি করে দিই—সেই ভগ্নস্তূপের উপরে গড়ে উঠুক নূতন পৃথিবী—নূতন ভারত !'—

—'এ তোমার বড় বড় আইডিয়া, এসব ভাববার ক্ষমতা আমার নেই—বিশেষতঃ যখন আমরা প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে'—

—'এখন আর পৃথক করে ভাববার দিন নেই। তোমরা ষ্ট্রাইক করে শুধু তোমাদের অফিসের কয়েকটা লোকের সুবিধে আনতে সক্ষম হবে না। এতে না পাবে জনসাধারণের সহানুভূতি, আর না পাবে গভর্ণমেণ্টের করুণা। সমগ্র ভারতের তুলনায় আমরা অতি নগণ্য—সেজন্যে আমরা কোনঠাসা হোয়ে পড়বো অতি সহজেই'—

—'তাহলে কি করতে হবে বলো'—

—'তার আগে আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও—সমালোচনা না করে তোমরা আমার নির্দ্দেশ মেনে চলবে'—

—'যদি বুঝি আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, আর সমষ্টিগত লাভ হচ্ছে'—

—'ব্যক্তিগত স্বার্থটুকু ত্যাগ করতে হবে সমষ্টির জন্যে, আর তা যদি না পারো আমাকে তোমাদের মধ্যে ডেকো না'—

—'শুধু আমার মত হোলেই তো চলবে না'—

—'হ্যাঁ, তোমরা আলোচনা করে দেখো—তোমরা যারা আমাদের ষ্ট্রাইক কমিটির মাথা, তাদের সকলকে ডেকে একটা মিটিং করো, আমি বুঝিয়ে দোব আমার পরিকল্পনা। তোমাদের মনঃপূত হয় তোমাদের কাজে নামতে হবে, আর তা যদি না হয় তোমরা ধর্মঘট করো করবে—আমি আফিসে যাবোই'—

সমর হয়তো কিছু বলিতে যাইতেছিল, অরুণা আসিয়া বলিল—'খাওয়া-দাওয়া কিছু করতে হবে, না বাক-যুদ্ধ করলেই চলবে ?'—

—'একটু খিদে করে নিচ্ছি বৌদি'—সমর হাসিয়া উত্তর দিল।

—'চল' ওঠা যাক্ সমর ; তোমরা বয়কট করলে পারি, কিন্তু অরুণা একঘরে করলে আমার আর সমাজে স্থান হবে না'—জয়ন্ত হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়িল।

তারপর আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গিয়াছে। জয়ন্ত আজ কয়দিন ধরিয়া অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেছে। অরুণা সমস্ত কিছু জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র জয়ন্তের সময়ের অভাবের জন্যই জিজ্ঞাসা করা হইয়া উঠে নাই। সেদিন অত্যধিক বৃষ্টির জন্য অরুণার সংসারের কাজ সারা হইয়া গিয়াছিল। জয়ন্ত রাত্রির আহার শেষ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া আনমনে পা দোলাইতেছিল। অরুণা আসিতেই প্রশ্ন করিল

—'রুণী, "মানে-না-মানার" সেই গানটা কি বল তো ?'—

অরুণা একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—'কোনটা'—

—'ঐযে, যেটা প্রায়ই গাও'—

—'ও, "জয় হবে জয় হবে, হবে জয় ?"—

অত্যন্ত আরামে সিগারেটের বাকী ধোঁয়াটা ছাড়িয়া দিতে দিতে জয়ন্ত বলিল—'সত্যি অরুণা, জয় আমাদের নিশ্চিত'—

—'তোমরা তো ধর্মঘট প্রত্যাহার করলে'—

—'কেন করলুম জানো ?'—

—'যাতে তোমার চাকরীটা বজায় থাকে'—একটু হাসিয়া অরুণা উত্তর দিল।

—'রুণী, অতো ছোট আমাকে ভেবো না, আমার কল্পনা

কোনদিন বাস্তবে পরিণত হতে পারে কিনা তা জানিনে, তবে যদি আমাদের কাজে আমরা কৃতকার্য্য হই, সেটা হবে ভারতের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়।'—

—'তুমি রাগ করলে, সত্যি তোমাকে রাগাবার জন্যে বলেছিলুম কথাটা।' অরুণা জয়ন্তের হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিলে।

'না অরুণা, অতো শীগ্‌গীর আমি মানুষকে ভুল বুঝি না, বিশেষত আমার কাজের প্রথম প্রেরণা তো তুমিই দিয়েছ'—জয়ন্ত আদর করে বললে।

—'যাক্, কি বলবে বলছিলে বলতো'—

—'আমরা কি ঠিক করেছি জানো—একই দিনে যুগপৎ গভর্ণমেন্টের সমস্ত কার্য্যকরী বিভাগগুলো বন্ধ করে দেবো'—

'শুধু তোমরা—এই কেরাণীরা?'—

—'হ্যাঁ, আমাদের মতো নিরীহ মসীজীবীর দল, যাদের না আছে সম্মান, সুখ ঐশ্বর্য্য—তবু যারা চালিয়ে যাচ্ছে অসীম দারিদ্র্যে এই দাসমুক্ত হিমাচল গভর্ণমেন্ট'—

—'তোমাদের বাধা দেবে তোমাদের মুসলমান সহকর্মীরা'—

—'ভুল অরুণা, তাদিকে ব্যাপারটা না বোঝালে কেন তারা আসবে এত দুঃখ ও কষ্ট বরণ করতে?'—

—'পেরেছ তাদিকে টেনে আনতে'

—'নিশ্চয়ই, বিশেষতঃ যখন তারা বুঝছে এ যুদ্ধ আমাদের পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের জন্যে নয়—এ যুদ্ধ আমাদের রুটীর জন্যে'—

—'আমি কিন্তু সব সময় বিশ্বাস করতে পারিনি ওদের, বিশেষতঃ ওদের 'প্রত্যক্ষ-দিবসের' কার্য্যকলাপ দেখে'—

—'উনত্রিশে জুলাইয়ের একতাও তো দেখেছো, সেদিন তো ওরা হোয়েছিল এক'—

—'হ্যাঁ, তা দেখেছি তবু—...'—

—'ওদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের কাহিনী পড়েই তুমি অনেকটা বিশ্বাস হারিয়েছ, কিন্তু আমি হারাইনি, আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই অশিবের মধ্যেই আসবে একদিন মিল'—

—'ভগবান সে সুদিন কি আমাদের দেবেন, যেদিন আমরা বাস ক'রতে পারবো ভাইয়ের মতো—বন্ধুর মতো, যেমন করে বাস করে এসেছি আজ কয়েক শতাব্দী ধরে'—

'—ঠিক এমনি একটা আলোচনা হোয়েছিল এক মৌলভীর সঙ্গে। তিনি আমায় বলেছিলেন "মিঃ গুপ্ত, বিচলিত হবেন না। একদিন এ আগুন নিভবেই, কেবল দুটো সম্প্রদায়ের যে বদ রক্তটা জমেছে সেটা বেরিয়ে গেলেই" হয়তো তাঁর সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হবে না, তবু তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হোয়ে আসে—কেননা তিনিই বোধ হয় ঠিক বুঝেছেন'—

—'কত নির্দোষ নিরপরাধ হিন্দু মুসলমান পৃথিবী থেকে সরে গেলো, কেবল কয়েকটা লোকের ভুলে। এরা জানে না পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান'—অরুণা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়লে।

—'আমার বিশ্বাস এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হয়তো শেষ দাঙ্গা, হয়তো এইটেই আমাদের দেখিয়ে দেবে সত্যের ও শিবের পথ, আলোক'—

—'যারা গেল, যারা হলো সর্ব্বহারা, যারা দিল রক্ত, তারা কি পেল বিনিময়ে?—

—'পেলুম আমরা অরুণা, যারা দেয় তারা তো পায় না। তারা দিয়েছে বলেই আমাদের কাছে বড়। আগত যুগে তারা হ'য়ে থাকবে আমাদের কাছে অমর স্মরণীয়'—

—'শুধু স্মৃতি!' একটু শুকনো হাসি হাসিয়া অরুণা বলিল—অতীতের স্মৃতিটুকুই তো আমাদের কাছে বড়, যার উপরে গড়ে উঠেছি আমরা, আর গড়ে উঠবে আমাদের ভবিষ্যৎ'—

—'যাক্ অনেক রাত হ'য়ে গেল, আমায় বাকীটুকু বলো'—

—'হ্যাঁ, সমগ্র ভারতে সরকারের সমস্ত বিভাগের কেরাণীরা একই দিনে কাজ হোতে দূরে সরে থাকবে, যতদিন পর্য্যন্ত তাদের দাবী না মেটায়'—

—'তারপর'—

—'এতেও যদি সরকার আমাদের ন্যায্য দাবী মেনে নিতে রাজী না হয়, ২৯শে জুলাই কোলকাতায় যেমন হোয়েছিল—সমগ্র ভারতে তেমনি ধর্মঘট হোবে, তাতে আর কেউ বাকী থাকবে না—শ্রমিকেরাও এসে দাঁড়াবে আমাদেরই পাশে'—

—'শ্রমিকেরা তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে কেন?'—

—'তাদের ধর্মঘটের সময় আমরা যোগ দোব বলে—উপরন্তু আমাদের জীবন-ধারণের মান বাড়লে তাদেরও বাড়বে, অন্ততঃ আমরা জোর করে সেটা বাড়াব'—

—'বেশ'—

—'এতে যে শুধু আমাদের সাম্প্রতিক লাভই হবে তা নয়, বরং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের এই এসোসিয়েসেন' বা সঙ্ঘ হবে একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। কংগ্রেস ও লীগ যেখানে মিলতে পারেনি আমরা সেখানে মিলবো'—

অরুণার চোখে স্বাধীন ভারতের সোনালী প্রভাতের স্বপ্ন। ঘরের আলোটা নিভাইয়া দিয়া সে স্বামীর কোলেই শুইয়া পড়িল। বাহিরে তখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল—তাহার মাঝেও পাশের বাড়ীর গ্রামোফোন হইতে শোনা যাইতেছিল—

—"জয় হবে, জয় হবে, জয়
মানবের তরে মাটীর পৃথিবী
দানবের তরে নয়"—

কয়েকটা বছর কাটিয়া গিয়াছে। জয়ন্তের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে যে ধর্মঘট সুরু হইয়াছিল তাহার ফলে সুবিধা হইয়াছে অনেকের, কিন্তু জয়ন্তের হইয়াছে সশ্রম কারাদণ্ড—রাজদ্রোহের অপরাধে—আজ জয়ন্ত ছাড়া পাইবে। সমর অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন সারিয়া অরুণাকে লইতে আসিয়াছে। সেই সবেমাত্র সকালের কাজ সারিয়া অরুণা পূজার ঘরে যাইতেছিল। সমর পিছু হইতে ডাকিল—'বৌদি'

—'কে ঠাকুরপো ?'—

—'হ্যাঁ, আমার একটা অনুরোধ আছে'—

—'বলুন'—

—'আপনাকে যেতে হবে'—

—'কোথায় ?'—অরুণা প্রশ্ন করিল।

—'জয়ন্ত আজ আসবে—তাকে অভ্যর্থনা করতে'—

—'তুমি তো সব জানো ঠাকুরপো' অত্যন্ত বেদনার সহিত অরুণা বলিল।

সমর চুপ করিয়া রহিল।

—'প্রদীপ ছিলো তাঁর অত্যন্ত স্নেহের—সে নেই। তার পরে যে এলো সেও ছেড়ে গেছে'—অরুণার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া এল।

—'ক্ষমা করো বৌদি, জয়ন্ত আসবে সেই আনন্দে তোমাকে দুঃখ দিয়েচি'—

চোখের কোণের জল মুছিয়া অরুণা বলিল—'সত্যিই আজ আনন্দের দিন ঠাকুরপো, একদিন আমিই তাকে এ কাজে নামতে বলেছিলাম—কিন্তু আমি—মা।'—

সমর আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল—একদিন এই জয়ন্তকেই সে 'কাপুরুষ, ভীরু' বলিয়া গালাগালি দিয়াছে। কিন্তু আজ সে মাত্র তাহাদেরই জন্য সর্ব্বস্বান্ত। কে জানে, জয়ন্ত উপস্থিত থাকিলে হয়তো প্রদীপ বাঁচিয়া থাকিত, খোকা মারা যাইতো না। জয়ন্তের আজ সব গিয়াছে—তাহার বিনিময়ে সে পাইবে শুধু সম্মান, শ্রদ্ধা ও অভ্যর্থনা। মানুষের পারিবারিক জীবনে ইহার দাম কি? যাহাদের লইয়া জয়ন্ত সুখের সংসার বাঁধিয়াছিল, কতো আশা, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল তাহারাই আজ নাই। অরুণা আজ শুধু একটা জীবন্ত কায়া—হয়তো তাহারা জয়ন্তের এই ত্যাগকে বড়ো করিয়া দেখিবে কিন্তু তাহাতে জয়ন্তের কি লাভ! বরং তাহাকে আরও অধিকতর দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। আজ এর জন্য যদি কেউ দোষী থাকে তো একমাত্র সে। সেই এই সুখী পরিবারে আনিয়া দিয়াছে বিরহ, বিচ্ছেদ, বেদনা ও দুঃখ। আত্ম-গ্লানিতে সমরের মন ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইত লাগিল এই শুকনো অভ্যর্থনায় আজ লাভ কি? কিন্তু সমাজ, লোকাচার? সেখানে যে এই প্রাণহীন আড়ম্বরেরই প্রয়োজন। উপরন্তু আজ সে যদি জয়ন্তকে অভ্যর্থনা না করে, তাহা হইলে সে তাহার ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে। জয়ের মা[…] আজ সেই তাহাকে পরাইবে। সমীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ষ্টেসনের কোলাহল, লোকের কর্ম ব্যস্ততার মাঝে সে উদগ্রীব হইয়[া] রহিল—প্রতি মানুষের পদক্ষেপ যেন তাহার বুকে আঘাত করিতে লাগি[ল] মনে হইল সমীর যেন কতো অপরাধ করিয়াছে। তাহার সম[স্ত] সংকোচকে দূর করিয়া দিল জয়ন্তের নির্লিপ্ত হাসি। কারাগারের পীড়[ন] যেন সে আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। যতটুকু গ্লানি ও ক্লেদ ছিল, তা[হা] দূর হইয়া গিয়া জয়ন্ত হইয়াছে আরও উজ্জ্বল ও ভাস্বর।

নানা প্রতিষ্ঠানের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া জয়ন্ত যখন আসিল তখ[ন] মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অরুণা তখনও পূজার ঘরে বসিয়া আ[ছে] —পৃথিবীর এতো কোলাহল, এতো আলো, সব যেন তার কাছ হইতে বহু দূরে।

জয়ন্ত অত্যন্ত স্নেহে ডাকিল—'অরুণা ?'

অরুণা কিছু বলিতে পারিল না, স্বামীর বুকে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। জয়ন্ত আরও স্নেহের সহিত বলিল—'প্রদীপ গেছে বলে কাঁদচো, ছিঃ! এতে তার অকল্যাণ হবে। দেশকে ভালবাসতে গেলে এর চেয়ে বড় দুঃখ সহ্য করতে হয়। আমরা দেশ কি জানি না বলেই এই সামান্য আঘাত সহ্য করতে ভয় পাই। সত্যিই আমার কোন দুঃখ নাই, অরুণা। প্রদীপকে হারিয়েচি সত্য। কিন্তু তার বদলে পেয়েচি কত অগণিত প্রদীপকে—যারা জ্বালিয়ে দিয়েছে আমার প্রাণে দেশ প্রেমের আলোক। ভগবান তো সমস্ত বাধা আমার কাছ হোতে আজ নিয়ে নিয়েচেন—তাঁর কাজে, দেশের স্বাধীনতার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবো বলে। দুঃখ কি অরুণা? আমাদের দুজনার ত্যাগে যদি একাধিক ব্যক্তিরও দুঃখ মোচন হয় সেই তো আমাদের পরম লাভ দুঃখ পেয়ে দেশকে আমি চিনেচি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাকে যেন কোনদিন আর না ভুলি। সেই দেশ আমায় ডাকচে—চলো। একদিন তুমিই তো আমায় প্রেরণা দিয়েছিলে। তুমি তেমনি আমার পাশে দাঁড়াও—আমি আবার ঝাঁপিয়ে পড়ি। এখনও যে আমাদের অনেক দূর চলতে হবে'—

অরুণার বুক হইতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণের অপেক্ষারত ছেলের দল ফিরিবার পথে গাহিয়া যাইতেছিল

—'কদম্ কদম্ বাড়ায়ে যা'—

কেদার-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি

(২)

কেদারবাবুর অনেক রচনার মধ্যেই কেদারবাবুর হাস্যরসটি করুণ-রসের স্নেহ-সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

ঘটনা-বৈচিত্র্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়া যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, যাহার মধ্যে হৃদয়ধর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির সাড়া জাগিয়া হাস্যের উদ্রেক হয়, সে জাতীয় জিনিষ যে কেদারবাবুর রচনার মধ্যে নাই, তাহা নহে। তবে তাহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য নহে।

রবীন্দ্র মৈত্রের "উপেক্ষিতা" "পুনর্মিলন" প্রভৃতি গল্পে যে হাস্যটি জমিয়া উঠিয়াছে তাহা ঘটনা-সংস্থান-জনিত; তাহাতে বুদ্ধির চেতনাই বিশেষভাবে দোলা দিয়া উঠে, হৃদয়ের কোমল অনুভূতিতে তেমন মোচড় লাগে না। ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক মাতার পারণের জন্য হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ বৃহভোজ্য (ভীম) টির গৃহে আনয়ন, পরে এই ভুলের ব্যাপারে হিড়িম্বা-ভীমসেনের পুনর্মিলন এবং অপর্য্যাপ্ত বস্ত্রাবৃত রাক্ষসী-সুন্দরীর অপ্রত্যাশিত দয়িত-মিলনে অপ্রতিভ হইয়া পশ্চাদ্গমনের দৃশ্য দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠি বটে, কিন্তু তাহাতে কান্না ঠিক আসে না।

কেদারবাবুর অনেক ছোট গল্পে এই জাতীয় নিছক হাস্যরসের উপাদান যে আমরা পাই না, তাহা নহে। পুলিসের হস্ত হইতে ধৃত গারুটিকে উদ্ধার করিবার জন্য পিছন হইতে মোহনলাল হঠাৎ যখন তাহার পৃষ্ঠে ভেরেণ্ডা ডালের আঘাত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চার পা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভগবতী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, তখন সত্য সত্যই আমরা হাসিয়া উঠি; তাহার পর ডেপুটির ভূমিকায় কচু রায় যে-ভাবে এই "সরকারী মাল ছিনিয়ে নেওয়া" ছেলেদের পুলিসের হাত হইতে রক্ষা করিল, তাহাতেও আমাদের হাসি আসে। তবে এ হাসির সঙ্গে অশ্রুর কোনও আত্মীয়তা নাই। কিন্তু কেদারবাবুর অনেক গল্পেই তাহা আছে; তাঁহার অধিকাংশ ছোট গল্পের মধ্যেই হাসিতে হাসিতে কখনও বা আমাদের চখের পাতা ভারী হইয়া আসে, কখনও বা চোখ খুলিয়া গিয়া নূতনতর দৃষ্টি দিয়া আমরা জগৎকে দেখিতে আরম্ভ করি। "আমরা কি ও কে" নামক পুস্তকের অনেক গল্প সম্বন্ধেই এই কথাটা খাটে।

শুধু রস-রচনা ও হাস্য-রসিকতার জন্যই কেদারবাবুর বৈশিষ্ট্য, এই প্রকার ধারণা করিলেও ঠিক হইবে না। তাঁহার কয়েকটি রচনার মধ্যে করুণ রস এমন ভাবে জমিয়া উঠিয়াছে যে হাস্যের ঠিক অবকাশ-টুকুও যেন পাওয়া যায় না। স্পর্দ্ধিতা রাজকুমারীর মতই মাথা উঁচু করিয়াই যে জীবন কাটাইয়াছে সেই পুরসুন্দরীর মৃত্যুর সময়ের করুণ দৃশ্যটি আমাদের অভিভূত না করিয়া পারে না। তাঁহার একমাত্র কন্যা তাহার পাশে বসিয়া আছে দেখিয়া পাছে তাহার কষ্ট হয়, সেই জন্য তিনি "মরণের সঙ্গে কস্তাকস্তি করিয়া" নিজের মুখের মৃত্যু-যন্ত্রণার কুঞ্চনগুলিকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় মেয়েকে কাঁদিয়া উঠিতে দেখিয়া পুরসুন্দরী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "গিরি কাঁদিসনে মা, মাথা ধরবে"।

মৃত্যুপথযাত্রী মা—মেয়ের মাথাধরাটুকু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না।

তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে গতির তীব্রতা ও ঘটনার জটিলতা নাই বলিয়া অনেকে অনুযোগ করেন। এ অনুযোগ বৃথা। ভরা পালে যে নৌকা চলে, তাহাতে সওদাগরি ষ্টিমারের গতিবেগ না থাকিলেও তার নিজের একটা ছন্দ আছে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ও গতির তীব্রতা ও ঘটনার জটিলতা যথেষ্ট আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে উচ্চকোটির সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সাহিত্য খানিকটা অবসরের জিনিষ। ঘটনার উপর দিয়া মেলট্রেণের গতিতে তাহা চলিতে চাহে না, সে আস্তে আস্তে, খুঁটিনাটি দেখিতে দেখিতে চলে, পথে চলিতে, চলিতে পথ প্রান্তের বন কুসুমটিকেও অবহেলা করিতে পারে না, তাহার জন্যও থমকিয়া দাঁড়ায়, তাহার গতি বিলম্বিত হইবে এ ভয় তাহার করে না। তাহার পথ-চলা কেরাণী ডেলিপেসেঞ্জারের ট্রেণ ধরার মত নহে, বিলাসীর সান্ধ্য ভ্রমণের মত।

"কেদারবাবুর মতে উৎকৃষ্ট রচনার রীতি কিরূপ হওয়া উচিত" এ প্রশ্নের উত্তর কেদারবাবুর দিবার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ বঙ্কিমবাবুকে যেমন প্রতিপক্ষ দলের সহিত ভাষার আদর্শ লইয়া বাদপ্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে যেমন "বীর বলী" ভাষার জন্য ওকালতি করিতে হইয়াছিল, Wordsworth প্রভৃতিকে যেমন poetic diction লইয়া লড়াই করিতে হইয়াছিল, কেদারবাবুকে সেরূপ কিছু করিতে হয় নাই। ফলে তাঁহার রচনার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলিতে হয় নাই। তথাপি তাঁহার যে একটি বিশিষ্ট রীতি আছে, তাহা তাঁহার লেখা দেখিলেই বুঝা যায়। তিনি নিজেও যে এ সম্বন্ধে একেবারেই কিছু বলেন নাই এমন নহে। তাহার চীন-যাত্রী নামক পুস্তকের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

"রচনাটি যাহাতে একটা বিবরণ বা কাজের কথা হইয়া না দাঁড়ায় তাই আনন্দের আবরণে জ্ঞাতব্য কথাগুলি বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি" এই যে "আনন্দের আবরণে" জ্ঞাতব্য বস্তু বলিবার প্রয়াস, ইহা কেদারবাবুর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তাঁহার "কাশীর কিঞ্চিৎ" নামক কবিতা পুস্তকে এই বৈশিষ্ট্যটি চমৎকার ফুটিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি "ডাইরেক্টারির" সমগ্রতা আছে, অথচ ইহার মধ্যে যে একটি চমৎকার সরস ব্যঙ্গের সুর ঝঙ্কৃত

হইতেছে, তাহার উপভোগ্যতা অল্প নহে, কবির দৃষ্টিতে কিছুই যেন বাদ পড়ে না।

কাশীতে পদার্পণ মাত্রই ষ্টেসনে রেলের কুলির জুলুম, লুঙ্গি-পরা চুঙ্গীর অত্যাচার পার হইয়া কবি "একার বসে ধাক্কা খেয়ে হিন্দুর মক্কা" বিশ্বনাথের পুরীতে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন বিশ্বনাথ কাঁকড়া হইয়া বসিয়া আছেন এবং "রাজ্য জুড়ে ঘুরে ঘুরে ডিম পেড়েছেন কসে"। কাশীর "হিলিবিলি কিলি কিলি" গলিগুলির "পুরোওয়াকিফ্ হ'তে হ'লে দুচার জনম চাই"।

বিদেশ বলিয়া ইঁহাকে বুঝিবার জো নাই; মেনির মাসী, পুঁটির পিসি, পাঁচী, চাঁপা দাসী, সকলেরই সন্ধান মিলিবে, অন্যান্য সুবিধা ও প্রচুর—

"দয়াবতী পাশকরা দাই এসেছেন কাশী
নির্ভাবনায় তীর্থবাস করুন সবাই আসি।"

অধিবাসীদের মধ্যে বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ার সংখ্যাই বেশী, বৌমাদের সুব্যবস্থায় পাঁচ সাত টাকা মাসোহারায় খোপে খোপে পায়রার মত ঘেঁসাঘেঁসী করিয়া তাঁহারা কাশীবাসী হইয়া আছেন। বৌমারা হিসাব জানেন,

"মোলে সেথা শ্রাদ্ধ নাই সেটাও লাভ"

তবে তাঁদের আপত্তি

"সাত টাকাটা বেজায় বেশী চার টাকায় যায় চোলে
মাগী কেবল সুদ খাটাবে ভুতে লুটবে মোলে"

বাঙ্গালীটোলার বিরাট গোলকধাঁধার মধ্যে কবি যেন বিশ্বরূপের ছাপ দেখিতে পান; সেখানে

"জন্ম মৃত্যু বিয়ে
মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া বিবাদ নিয়ে"

নানাশত পেশা ও ছত্রিশ জাতের বাঙ্গালী অন্ধকারে কূপের মত স্থানে কিল বিল করিতেছে; এক বাড়ীতে বাইশ উনুনের ধোয়া, উপর তলার সহিত নিচের তলার কলের জল লইয়া বিবাদ,—এই লইয়া তাহাদের জীবন। কাজের 'রুটিন' বেশ 'রেগুলার'—সকালে প্রাতঃস্নান সারিয়া বিশ্বনাথ হইতে হনুমানজীর পর্য্যন্ত মাথায় জল ঢালিয়া দু: পয়সার বাজার করিয়া (তাহার মধ্যে বিড়ালের মাছ ও পাখীর পেয়ারাও আছে) বাড়ী ফিরিয়া আসা, তাহার পর স্বপাক রন্ধন, আহার এবং আহারান্তে পাঠ, কোলাহল, সুদের হিসাব, ঘটকালী প্রভৃতিতে দিন কাটিয়া যায়—তবে—

"আমাদের লক্ষ্মীরা সব বোনেন বসে উল
পরিশ্রমের মধ্যে শুধু বাঁধেন নিজের চুল"

এইভাবে একটা রস দৃষ্টি দিয়া কবি সব কিছুই দেখিয়া যাইতেছেন, কাশীর "শ্রী ষাঁড় মহাশয়", "শ্রীমান্ বানর", "বাছা ইঁদুর", বেল গাছে বড় বড় অবধূত—যাঁহারা "বড়লোকের বংশরক্ষা করেন দিয়ে পুত্র" এবং যাঁহাদের ঔষধে "বড় বড় ভাগ্যবানের সারেও বহুমূত্র"—এই সব কিছুই কবির নজরে পড়িয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন চালসর্ব্বস্ব কোন্তো বাবুদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"তেড়া হয়ে তুড়ি মারে টপ্পা গীত গেয়ে
গোচে গাচে বাবু হন পচা শাল চেয়ে
কোন রূপে পিত্তি রক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে বেনো জলে নেয়ে।"

কেদারবাবুও সেইরূপ কাশীর বাঁদরের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন

"সহরের রস পেয়ে সব গরীবের ছেলে
গ্রামেতে ফেরে না যেমন পীরু পামগু ফেলে
না জুটুক অন্ন পেটে, না থাকুক আয়
পাঁচ আড্ডায় ঘুরে তবু চা সিগারেট পায়"

কখনও বা তাহার বর্ণনা—কাশীর সবলা, প্রগতিসম্পন্না নারীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে

"রাস্তাতেই হয়েছে তাদের সখের বৈঠকখানা
দল বেঁধে সব ঢেউ তুলে যায় মেলে সিল্কের ডানা,
পান চিবিয়ে অট্ট হাসি খোস্ গল্প পথে
ভদ্রেরা সব পাশ কাটিয়ে সরেন কোনও মতে।"

এইভাবে যেখানেই তিনি লঘুতা বিচ্যুতি বা অসঙ্গতি দেখিয়াছেন—তাহাকেই বিদ্রূপের আক্রমণ করিয়াছেন—কিন্তু তবুও তাহাতে কেহই যেন কবির প্রতি ক্রুদ্ধ হইবার অবকাশ পায় না। তাহার কারণ কেদারবাবুর ব্যঙ্গের মধ্যে বিদ্রূপ থাকিলেও Popeএর Satlus and Episttes প্রভৃতির মধ্যে যে রকম ব্যক্তিগত আক্রমণ আছে, কেদার-বাবুর মধ্যে সেটি নাই। Shakespeareএর Jaquesএর মত তিনি যেন বলিতে পারেন

"My taxing like wild goose flies
Unclaimed of any man,"

মনের সরসতাকে বজায় রাখিয়া লোকের বিচ্যুতিগুলি আলোচনা করা, ভর্ৎসনাকে মধুর রসে পরিবেশন করা বাস্তবিকই ক্ষমতার কাজ, এবং কেদারবাবুর সে ক্ষমতা আছে, এবং "আনন্দের আবরণে জ্ঞাতব্য কথাগুলি বলিবার প্রয়াস" তাঁহার "চীন যাত্রীতে"ও যতটা সার্থক হইয়াছে, কাশীর কিঞ্চিৎএও সেইরূপ হইয়াছে।

সত্যের সহিত এই যে আনন্দের মিশ্রণ, এটা সাহিত্য সৃষ্টির একটা খুব বড় কৃতিত্ব—এর মধ্যে যে শুধু ভারতীয় "সত্য শিব সুন্দরের" আদর্শই আছে তাহা নহে, Walter Pater প্রভৃতি পাশ্চাত্য সমালোচকও বলিয়াছেন—সাহিত্যের সামগ্রী শুধু truth নহে, তাহা হইতেছে "fineness of truth"

ধারাল কথাবার্ত্তায়-বাদপ্রতিবাদ যেখানে প্রত্যেক বাক্যের মধ্যেই হয়ত এখানে ওখানে এমন কতকগুলি-সরস দ্যুতিমান ইঙ্গিতের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা কর্ত্তিত হীরক-খণ্ডের মত বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন

ভাবে কিরণ সম্পাত করে—সেগুলি সাহিত্যিকের সত্যই খৌরবের জিনিষ। কেদারবাবুর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এই জাতীয় বাক্য সৃষ্টির কৌশল প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এই বাক্যের জালে গল্পের প্লট্ হয়ত মাঝে মাঝে মন্থরগতি হইয়া পড়ে, কিন্তু রসান্বেষী পাঠকের কাছে তাহাতে সাহিত্যের আকর্ষণ ক্ষীণ হইয়া পড়ে না। তাই তাঁহার ভাদুড়ী মশাইয়ের আচার্য্য, ইরাণী—প্রভৃতির কথাবার্ত্তাগুলি সত্যই আমাদের উপভোগের সামগ্রী হইয়া উঠে। প্রবাসী "ম্যাডোপুরের" চালসর্ব্বস্ব বাকসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী সমাজকে আচার্য্য যে ভাবে বিভ্রান্ত করেন,—তাহা তিনি সজ্ঞানেই করেন, তবে তাঁহার "পোজ্"টি এত নিখুঁত হয় যে—যাহাদের তিনি বোকা বানাইতে চাহিতেছেন তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। তবে আমরা যখন তাঁহাকে একান্তে বলিতে শুনি "পাগল নাকি—মোটর আবার কার? তবে ওরা ঐগুলোকেই দুনিয়ার পরমার্থ বলে জানে, ওদের কাছে ওর মনে মা বাপের চেয়ে ঢের বেশী। ওর নাম না করলে কি রক্ষা ছিল!"—তখনই আমরা বুঝিতে পারি—আচার্য্য মহাশয় কি ভাবে তাহাদের বোকা বানাইয়া নাচাইতে পারেন।

এই কথাবার্ত্তার বাদপ্রতিবাদের কৌশল ছাড়া আর একটি জিনিষ কেদারবাবুর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আমাদের নজরে পড়ে। তাহা হইতেছে তাহার শব্দসৃষ্টির কৌশল। বৃদ্ধ দাদামহাশয় যেমন তাঁহার আদরের নাতী-নাতনিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময় কখনও বা তাহাদের একটি আদুরে নাম দিয়া আসল নামটি বিকৃতভাবে উচ্চারণ করিয়া, কখনও বা অভিধান-অতিরিক্ত নূতন নাম, নূতন কথার সৃষ্টি করিয়া মুখ টিপিয়া হাসেন ও সকলকে হাসান—কেদারবাবুও অনেকটা সেই রকম করেন। Research Scholarকে তিনি বলেন 'চুন্টু পন্থী' 'ভূমিকা'কে বলেন "জমিকা",—বর্ণের "লালিমার" অনুকরণে সৃষ্টি করেন "ডালিমা" "থাপেলিমা"—এই জাতীয় বহু কথা কেদারবাবুর সাহিত্যের মধ্যে মিলিবে;—কখনও কখনও অনুপ্রাসটি তিনি কাজে লাগান;—তাঁহার "দমার দরিয়া" "ভণ্ট্ ভৈরবের জাত—" "কচ্ছপের মোচ্ছপ লাগা" প্রভৃতি সৃষ্টিও প্রচুর আছে। শব্দ রচনার অন্যান্য কৌশলও আছে—যথা "ডেঙ্গিয়ে ডেঙ্গিয়ে (ড্যাঙ্গ দিয়ে দিয়ে) চিবিয়ে চিবিয়ে কথা কওয়া" "বাঁদুরে কামড়" "পূর্ণগর্ভ চটের থলি" "মাইক্রস-কোপিক্ চাঁচন" "oil-clothস্থ (ভূমিষ্ঠ) হওয়া ইত্যাদি—

তাঁহার ইঙ্গিতগুলিও কম শক্তিশালী নয়। সুরমার দাঁতের (কথার) কামড়ের যে বিষ আছে তাহা ধীরাজবাবু জানাইতে চান। তাই তিনি ডেপ্টিস্ট্ নির্ম্মলবাবুকে নিরীহ ভাল মানুষের সরল কৌতুহল লইয়া জিজ্ঞাসা করেন

"আচ্ছা সাপ কি দাঁত দিয়ে বিষ ঢালে"?

সুরমা বাধা দিয়ে বলেন—"না ল্যাজ দিয়ে"

নির্ম্মলবাবু বুঝাইতে থাকেন—"সাপের দাঁতে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, তাই দিয়েই বিষ ঢেলে দেয়—বিষের থলি ওদের দাঁতের গোড়াতেই থাকে কিনা"

ধীরাজবাবু বলেন—"এই ঠিক কথা তবে শরৎবাবু জিভ দিয়ে ঢালার কথা লিখলেন? তাই না আমার—"

মেয়েরা—মাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়।

Wordsworth তাহার Poetry এবং poetic dictionএর বিতর্কে যাহাকে "degrading thirst after outrageous stimulation" বলিয়াছেন,—তাহাকে বর্জ্জন করিয়া,—সুলভ ভাবালুতা ও ভাবাতুরতা হইতে দূরে থাকিয়া,—পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ রাখিয়া,—মর্ম্ম-বিদারণ-কারী ঘটনা সমাবেশে পাঠকের মনকে অন্যায়ভাবে অভিভূত না করিয়া ধারাল ও ইঙ্গিতময়ী বাক্‌চাতুর্য্যের মধ্য দিয়া, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও টিপ্পনির মধ্য দিয়া, কেদারবাবুর প্লটগুলি অগ্রসর হইতে থাকে।

যাঁহারা সুলভ হাসিকান্নার খোরাক পাইবার জন্য তাঁহার রচনা পড়িবেন তাঁহারা হয়ত ব্যর্থমনোরথ হইতে পারেন, যাঁহারা চমকপ্রদ ঘটনায় ছায়া চিত্রের thrill খুঁজিতে চাহেন তাঁহারা কেদার সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ কিছু পাইবেন না, মঞ্চ অথবা পর্দ্দার জন্য তাঁহার রচনা বিশেষভাবে উপযোগী নাও হইতে পারে—কিন্তু রসিক পাঠকের তাহাতে কিছু আসে যায় না; তাঁহারা কেদার সাহিত্যের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব আনন্দের খনির সন্ধান পাইবেন এবং তাঁহার রচনাগুলি পড়িতে পড়িতে মনে মনে ভাবিবেন—"এ জাতীয় রচনা ত বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী দেখা যায় না"!

ভলটেয়ার

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

পাশ্চাত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। এই শতাব্দীতে আমেরিকা বৃটেনের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া জাতি-সংঘের মধ্যে আপনার স্বতন্ত্র স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই শতাব্দীতেই ফরাসী জাতি স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর ধ্বজা উত্তোলিত করিয়া স্বদেশে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন এবং অত্যাচারপীড়িত জনগণের মধ্যে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন করিয়াছিল। যে সমস্ত মনীষী মানবের ইতিহাসের এই অভিনব অধ্যায়-রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন, ভলটেয়ার তাঁহাদের অন্যতম। ভিক্‌টর-হিউগোর মতে "ভলটেয়ারের নাম উচ্চারণ করিলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষত্বের বর্ণনা করা হয়।" সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী তাঁহার প্রতিভার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। লুথার, ক্যালভিন প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকদিগের অপেক্ষাও কঠোরতরভাবে তিনি কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। মিরাবো, ড্যান্টন্, মরাট্ ও রোব্‌স্‌পিয়ার্ যে অস্ত্রের দ্বারা প্রাচীন সমাজের উচ্ছেদসাধন করিয়াছিলেন, তাহার উৎপাদনে তিনি প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ জীবনীশক্তির অধিকারী ছিলেন, এবং এই শক্তির প্রয়োগ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়াছিলেন।

ভলটেয়ার যখন জন্মগ্রহণ করেন, চতুর্দ্দশ লুই তখন ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অসাধারণ ক্ষমতাশালী এই রাজার ৭২ বৎসর-ব্যাপী রাজত্ব যখন শেষ হয়, (১৭১৫ সালে) তখন ফ্রান্সের প্রজার স্বাধীনতার কণামাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। তখন রাজকর্ম্মচারীদিগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সম্মুখে বিষম করভারে পীড়িত প্রজাকুল সন্ত্রস্ত, পুরোহিত সম্প্রদায় (Church) দুশ্চরিত্র ও কলুষ পঙ্কে নিমজ্জিত, সমাজের মর্ম্মস্থল কদাচারে জর্জ্জরিত। দেশের ও সমাজের এই অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যাঁহারা লেখনি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভলটেয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। ষোড়শ লুই যখন কারাগারে বন্দী, তখন ভলটেয়ার ও রুসোর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই দুইজনের দ্বারাই ফ্রান্সের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে।" লা-মার্টিন লিখিয়াছেন, "কার্য্যের দ্বারা যদি লোকের বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে ভলটেয়ারকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। শনৈঃ শনৈঃ সেই জীর্ণ যুগের ধ্বংসসাধন করিবার জন্য নিয়তি তাঁহাকে ত্র্যশীতিবর্ষ পরমায়ু দান করিয়াছিল। এই দীর্ঘ পরমায়ুকালের মধ্যে কালের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় তিনি পাইয়াছিলেন। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, জয় তখন তাঁহার করতলগত।"

ভলটেয়ার দেখিতে কুৎসিত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে দম্ভ ও চপলতা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। অশ্লীলতাও অসাধুতারও অভাব তাহাতে ছিল না। তদানীন্তন কালের যাবতীয় দোষ-ত্রুটীই তাঁহার চরিত্রে ছিল। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে করুণার ফল্গুধারা অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইত। পরের উপকারের জন্য শ্রম ও অর্থব্যয়ে তিনি অকুণ্ঠিত ছিলেন; বন্ধুদিগের সাহায্যে তাঁহার হস্ত সতত উন্মুক্ত ছিল, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনি সর্ব্বদা উদ্যত থাকিলেও মিলনপ্রয়াসী প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্ত তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

কিন্তু এই সমস্ত দোষগুণ ভলটেয়ারের চরিত্রের প্রধান কথা নয়। তাঁহার চরিত্রের সার ছিল তাঁহার অতুলনীয় মানসিক সম্পদ—তাঁহার মনের অফুরন্ত ধারণাশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি। নিরানব্বুই খানি গ্রন্থে নিবদ্ধ তাঁহার রচনার প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রতিভা প্রতিফলিত। যে কোন বিষয়েই তিনি লেখনী নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার মনের ঔজ্জ্বল্যে রচনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা চিন্তা করি, তাহা প্রকাশ করাই আমার ব্যবসায়।" যাহা তিনি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা বলিবার প্রয়োজন ছিল এবং যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহা সুষ্ঠুভাবেই বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার লেখা অধিক লোকে পড়ে না। তাহার কারণ, তিনি যে যে বিষয়ে লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে বর্ত্তমানে লোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে। যে যে সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহার জয়লাভের সংগে তাহাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

ভলটেয়ারের কর্ম্মক্ষমতা অসাধারণ ছিল। কখনও তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, "কার্য্যে ব্যস্ত না থাকা আর অস্তিত্বের বিলোপ একই কথা। যাহারা অলস, তাহারা ব্যতীত আর যাবতীয় লোকই ভাল।......যতই আমার বয়স বাড়িতেছে, ততই কর্ম্মের প্রয়োজন অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতেছি।.... যদি আত্মহত্যার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদাই কর্ম্মে লিপ্ত থাক।"

জীবিতকালে এত প্রভাব বিস্তার করিবার সৌভাগ্য অন্য কোনও লেখকেরই হয় নাই। কারাগার, নির্ব্বাসন, রাষ্ট্র ও চার্চ্চ কর্ত্তৃক পুস্তকের প্রকাশ-নিষেধ, কিছুতেই তাঁহার প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারে নাই। সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার বাণী চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। অর্দ্ধ জগৎ তাঁহার কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, রাজন্যবর্গ ও পোপের সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল। অত্যাচার সহনশীল ফ্রান্সকে তিনি চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন; এই চিন্তার ফলে ফরাসী জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরে ভলটেয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ নোটারী (Notary) ছিলেন। মাতাও ছিলেন সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা। পিতার নিকট তিনি পাইয়াছিলেন কোপন স্বভাব এবং বৈষয়িক বুদ্ধি, মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন চরিত্রের তরলতা ও বৈদগ্ধ্য। তাঁহার জন্মের সংগে সংগেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। এই ক্ষুদ্রকায় শিশুর বাঁচিয়া থাকিবার আশা কেহই করে নাই। কিন্তু

তাহার মৃত্যু হয় ৮৪ বৎসর বয়সে। এই দীর্ঘজীবনে অনবরত তাঁহাকে পীড়ার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল।

ভলটেয়ারের পিতৃদত্ত নাম ছিল ফ্রানকয় মেরী এরাউয়েট্ (Francoi Marie Arouet)। ফ্রান্‌কয় লিখিতে শিখিয়াই কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দেখিয়া পিতা বুঝিলেন, এ ছেলে কোনও কাজের হইবে না। কিন্তু তৎকালীন বিখ্যাত বারনারী নাইনন্ (Ninon de L' Enclos) বালকের আকৃতিতে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিদর্শন দেখিতে পান, এবং মৃত্যুকালে পুস্তক ক্রয়ের জন্য দুই হাজার ফ্রাঙ্ক তাহাকে দান করিয়া যান। এই অর্থ দ্বারাই তাঁহার বাল্যশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া ফ্রানকয় সাহিত্যসেবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পিতা বলিলেন, "আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া যে থাকিতে চায়, অথবা অনাহারে মরিতে চায়, সাহিত্য তাহাদেরই জন্য।" কিন্তু ফ্রানকয় জীবিকার জন্য সাহিত্যই অবলম্বন করিলেন।

ফ্রানকয় যে খুব অধ্যয়নশীল ও শান্তস্বভাব ছিলেন তাহা নয়; দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে তিনি গৃহে ফিরিতেন না; উৎপথগামী বন্ধুদিগের সহিত হুল্লোলে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। বিরক্ত হইয়া পিতা তাঁহাকে কেইন (Caen) নগরে এক আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং যাহাতে কাহারও সহিত তিনি মিশিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আত্মীয়কে বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ফল হইল না। ফ্রানকয়কে সত্বরই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। ইহার পরে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সংগে তিনি হেগ (Hague) নগরে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়াই তিনি এক যুবতীকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাত করিতে এবং চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। চিঠিতে প্রায়ই লিখিতেন, "চিরজীবন আমি তোমায় ভালবাসিব।" ব্যাপারটী ধরা পড়িবার পরে গৃহে ফিরিয়া কয়েক সপ্তাহ তিনি তাঁহার প্রেমিকাকে সত্যই মনে রাখিয়াছিলেন।

১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রানকয় প্যারিসে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই চতুর্দ্দশ লুইএর মৃত্যু হইল। পঞ্চদশ লুই তখন নিতান্ত শিশু। রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য একজন Regent নিযুক্ত হইলেন। Regentএর সময়ে প্যারিসে আমোদ-প্রমোদের ঢেউ বহিয়া গেল, ফ্রানকয় সেই স্রোতে গা-ভাসাইয়া দিলেন। বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্যয়সংক্ষেপের জন্য Regent যখন রাজকীয় মন্দুরার অর্দ্ধেক অশ্ব বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, ফ্রানকয় বলিলেন, "রাজসভার গর্দ্দভদিগের অর্দ্ধেক বিক্রয় করিলেই ইহা অপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ হইত।" এই সময়ে Regent রাজ-সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই মর্ম্মে দুইটী কবিতা প্রকাশিত হয় এবং ফ্রানকয় তাহাদের লেখক বলিয়া জনরব প্রচারিত হয়। Regent শুনিয়া ভীষণ রুষ্ট হইলেন এবং একদিন উদ্যানে ফ্রানকয়ের দেখা পাইয়া বলিলেন, "মঁসো আরুয়েট, আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাইতে পারি, যাহা তুমি কখনও দেখ নাই।" ফ্রানকয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন দ্রব্যটী কি মহাশয়?" Regent উত্তর করিলেন, "Bastille কারাগারের অভ্যন্তর।" পরদিনই (১৭১৭ ১৫ই এপ্রিল) ফ্রানকয়কে তাহা দেখিতে হইল।

Bastilleএ অবরুদ্ধ থাকিবার সময়ই ফ্রানকয় 'ভলটেয়ার' নামগ্রহণ করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি Henriade কাব্য রচনা করেন। তাঁহার ১১ মাস কারাভোগের পর Regent তাঁহাকে নিরপরাধী বলিয়া জানিতে পারিয়া কারামুক্ত করিয়া একটী বৃত্তি দান করিলেন। ভলটেয়ার তাঁহাকে লিখিলেন, "আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। বাসস্থান যাহাতে নিজে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারি, তাহার জন্য অনুমতি দিতে আজ্ঞা হউক।"

কারাগার হইতে বাহির হইয়া ভলটেয়ার Oedipi নামক এক বিয়োগান্ত নাটক লিখিলেন। রঙ্গমঞ্চে এই নাটক একাদিক্রমে ৪৫ রাত্রি অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা একদিন তাঁহাকে তিরস্কার করিবার জন্য প্রেক্ষাগৃহে আসি, অভিনয় দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। এই নাটক হইতে ভলটেয়ার ৪০০০ ফ্রাঙ্ক পাইয়াছিলেন। চতুর বৈষয়িকের মত তিনি এই অর্থের লাভজনক বিনিয়োগ-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরবর্ত্তী নাটক 'Artemire' প্রশংসালাভে সমর্থ হয় নাই। এই সময় তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। রোগমুক্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার Henriade কাব্য সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহার পরে ৮ বৎসর যাবৎ তিনি সর্ব্বত্র সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। তাহার পরে ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন হইলেন। অভিজাত শ্রেণীর অনেকে তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রতিভা ভিন্ন সম্মানের দাবী তাঁহার যে আর কিছুই নাই, ইহা তাঁহারা ভুলিতে পারিতেন না। একদিন এক ডিউকের প্রাসাদে ভোজনের সময় ভলটেয়ার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতা ও রসিকতার সহিত আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময় chevalier de Rohan অনতি-মৃদুস্বরে কহিলেন, "কে ঐ যুবক উচ্চৈঃস্বরে আলাপ করিতেছে?" ভলটেয়ার তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "মহাত্মন, যাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি কোনও মহৎ নাম বহন করেন না। কিন্তু যে নাম বহন করেন তাঁহার গুণে সকলেই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।" Rohan ভয়ানক রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একদল গুণ্ডা নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পরদিন রঙ্গালয়ে ভলটেয়ার মস্তকে পটি বাঁধিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে Rohanএর আসনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা Rohanএর ছিলনা। আত্মরক্ষার জন্য তিনি পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী, তাঁহার পিতৃব্যপুত্রের শরণাপন্ন হইলেন। Bastilleএর দ্বার আবার ভলটেয়ারের জন্য উন্মুক্ত হইল, কিন্তু তিনি অবিলম্বে দেশত্যাগ করিয়া যাইবেন। এই সর্ত্তে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। ফরাসী পুলিশ তাঁহার সহিত Dover পর্য্যন্ত গিয়া

ফিরিয়া আসিল। ইহার অনতিকাল পরেই প্রতিহিংসা গ্রহণের অভিপ্রায়ে ভলটেয়ার ছদ্মবেশে প্যারিসে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রত্যাগমন পুলিশে জানিতে পারিয়াছে, এবং অচিরেই আবারে তাঁহাকে বন্দী হইতে হইবে, তখন ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া গেলেন।

তিন বৎসর ভলটেয়ার ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। আগ্রহের সহিত তিনি ইংরাজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজী বানানে নিয়মের অভাব দেখিয়া তিনি বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। "কি অদ্ভুত ভাষা! Plagueএর উচ্চারণ প্লেগ্, আর Agueর উচ্চারণ এগু। মরুক অর্দ্ধেক ভাষা প্লেগে, বাকী অর্দ্ধেক এগুতে ভুগিতে থাকুক।" কিন্তু সত্বরই ইংরাজী পড়িতে সক্ষম হইলেন এবং এক বৎসর মধ্যে তদানীন্তন ইংরাজী সাহিত্যের পরিচয় লাভ করিলেন। লর্ড বলিনব্রোক তাঁহাকে সাহিত্যিকদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ইংরেজ সাহিত্যিকেরা যাহা খুসী লিখিতে পারেন। তাহার জন্য তাঁহাদিগকে শাস্তি পাইতে হয়না। "আশ্চর্য্য জাতি এই ইংরেজেরা! ইহাদের দেশে Bastille নাই, Letters de Cachet নাই! বিনাবিচারে এখানে কেহ কারারুদ্ধ হয়না! ইহাদের ধর্ম্ম ইহারা সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে, রাজার ফাঁসি দিয়াছে, বিদেশ হইতে রাজা আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছে এবং ইউরোপের যাবতীয় নরপতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহাদের দেশে ত্রিশটী ধর্ম্ম বর্ত্তমান, কিন্তু পুরোহিত একজনও নাই। যাবতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্ভীকতম Quaker সম্প্রদায় ইহাদের দেশেই উদ্ভূত হইয়াছে। অদ্ভুত মানুষ এই Quakerরা। খৃষ্টের বাণী সত্য সত্যই ইহারা অন্তরে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাঁহার উপদেশমত জীবন যাপন করিয়া খৃষ্টীয় জগৎকে অবাক্ করিয়া দিয়াছে!" জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভলটেয়ার Quaker দিগের আচরণে বিস্ময় বোধ করিতেন। তাঁহার Dictionary Philosophique গ্রন্থে তিনি এক Quakerএর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই Quaker বলিতেছে, "আমাদের ঈশ্বর শত্রুদিগকেও ভালবাসিতে এবং বিনা প্রতিবাদে অন্যায় সহ্য করিতে বলিয়াছেন। সমুদ্রপার হইয়া আমাদের ভ্রাতাদের গলা কাটিব, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে।"

ইংলণ্ডে তখন বিদ্যালোচনার প্রবল স্রোত বহিতেছিল। বেকনের প্রভাব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। Hobbs যে জড়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন, ফ্রান্সে হইলে তাহার জন্য তাঁহাকে প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। Lockeএর Essay on the Human Understanding দর্শনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। Collins, Tyndal ও অন্যান্য Deistগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস অঙ্গীকার করিয়াও প্রচলিত ধর্ম্মের প্রত্যেক মতেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিউটনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় ভলটেয়ার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে যাহা কিছু শিখিবার ছিল, অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রতি তাঁহার মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিল। Letters on the English গ্রন্থে তাঁহার ধারণা বর্ণনা করিয়া তিনি হস্তলিখিত অবস্থাতেই ঐ গ্রন্থ বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলেন না। এই গ্রন্থে ফ্রান্সের যথেচ্ছাচার-পীড়িত ব্যক্তিস্বাধীনতা বর্জ্জিত অবস্থার সহিত তিনি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক স্বাধীনতার তুলনা করিয়াছিলেন, এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীকে রাষ্ট্রে উপযুক্ত স্থান অর্জ্জন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে তাঁহার এই গ্রন্থই ফ্রান্সের স্বাধীনতার উদার প্রথম ঘোষণাধ্বনি।

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ভলটেয়ার ফ্রান্সে ফিরিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫ বৎসর প্যারিসে স্ফূর্ত্তির জীবন যাপন করিলেন। হঠাৎ স্ফূর্ত্তিতে বাধা পড়িল। একজন পুস্তক প্রকাশক তাঁহার অনুমতি না লইয়া Letters on the English গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্যারিসের Parliament অবিলম্বে ঐ গ্রন্থ ধর্ম্ম ও নীতিবিরোধী এবং রাজার অসম্মানজনক বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং প্রকাশ্য ভাবে উহা পোড়াইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন পুনরায় Bastille-বাস আসন্ন জানিয়া বুদ্ধিমানের মত ভলটেয়ার পলায়ন করিলেন, সঙ্গে লইয়া গেলেন এক পরস্ত্রীকে।

ভলটেয়ারের এই প্রণয়িনী Marquise du Chatelet ছিলেন এক অসাধারণ মহিলা। গণিতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। Newton এর Principiaর একখানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা তিনি রচনা করিয়াছিলেন এবং পরে "অগ্নি" সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি French Academy হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ভলটেয়ারকে তিনি "সর্ব্বপ্রকারে ভালবাসার উপযুক্ত," এবং "ফ্রান্সের সর্ব্বোত্তম অলংকার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভলটেয়ারও এই মহিলা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "তিনি Great man (মহৎলোক)। তাঁহার একমাত্র দোষ এই যে তিনি স্ত্রীলোক। কাইরীতে (Cirey) মার্কিজের একদুর্গ ছিল। তথায় তিনি প্রণয়ীকে আশ্রয় দিলেন। Marquise এর স্বামী তাঁহার গণিত চর্চ্চা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহার সৈন্যদলের সহিত দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। প্যারিসের সমাজে তখন অবস্থাপন্ন মহিলাদের স্বামীর সঙ্গে দুই একটি প্রণয়ী রাখার প্রথা ছিল। বাহ্যিক ঠাট বজায় রাখিতে পারিলে, ইহাতে কোনও কথা উঠিত না। প্রণয়ী যদি প্রতিভাবান্ কেহ হইতেন, তাহা হইলে তো কথাই ছিল না।

কাইরীতে প্রণয় চর্চ্চার সহিত অধ্যয়ন ও গবেষণাও চলিতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ভলটেয়ার এক মূল্যবান পরীক্ষাগার (Laboratory) পাইলেন। কয়েক বৎসর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আলোচনায় অতিবাহিত হইল। তাঁহাদের অতিথির অভাব ছিল না। সত্বরই কাইরী বিদ্বজ্জনের সমাগম ক্ষেত্রে পরিণত হইল। সন্ধ্যাকালে অতিথিদিগের সম্মুখে ভলটেয়ার স্বরচিত উপন্যাস পাঠ করিতেন। কখনও বা তাঁহার নাটকের অভিনয় করিতেন। আমোদপ্রমোদ

ভলটেয়ারের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কাইরীতে বিদ্যাচর্চ্চা ও আমোদ—দুইই প্রচুর পরিমাণে ফলিত। এইখানে ভলটেয়ার Zadig, Candide, Micromegas, L' Ingenu, Le Monde Comme-ilva প্রভৃতি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহারা ঠিক উপন্যাস নয়, রহস্যপূর্ণ ছোট রূপক গল্প।

L' Ingenu এক Red Indian-এর গল্প। কয়েক জন পর্য্যটকের সহিত ফ্রান্সে আসিবার পরে এই Red Indianকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা হইল। New Testament পড়িয়া সে এতই মুগ্ধ হইল যে কেবল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেই সম্মত হইল না অধিকন্তু সুন্নত (Circumcision) লইবার জন্য জেদ ধরিল। "বাইবেলে যাহাদের কথা আছে, সকলেরই সুন্নত হইয়াছিল, সুতরাং আমাকেও সুন্নত লইতেই হইবে।" এই সমস্যার সমাধান হইতেই পাপ স্বীকারের (Confession) প্রশ্ন উঠিল। সে বলিল "কোথায় পাপ স্বীকারের কথা আছে, দেখাও।" তখন তাহাকে Epistle of St John দেখানো হইল। তাহাতে আছে "পরস্পরের নিকট পাপ স্বীকার করিবে।" দেখিয়া সে পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার করিল, কিন্তু পাপ স্বীকার শেষ হইবা মাত্রই পুরোহিতকে চেয়ার হইতে টানিয়া নামাইয়া নিজে তথায় উপবেশন করিল, এবং কহিল "এখন তোমার পাপ আমার নিকট স্বীকার কর। পরস্পরের নিকট পাপ স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই তো লেখা আছে।" ইহার পরে সে Miss St. Yvesকে ভালবাসিয়া ফেলিল। দীক্ষা কালে উক্ত মহিলা তাহার ধর্ম্মমাতা (God mother) হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, শুনিয়া সে ভয়ানক রুষ্ট হইয়া বলিল, "তবে আমার দীক্ষা ফিরাইয়া লও।" পরে বিবাহের অনুমতি পাইয়া দেখিল, বিবাহে ঝঞ্ঝাট কম নয়। নোটারি চাই, পুরোহিত চাই, সাক্ষী চাই, চুক্তিপত্র চাই; আরো কত কি চাই। শুনিয়া বলিয়া উঠিল "তোমরা দেখছি ভীষণ দুষ্ট লোক। এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তোমাদের বিবাহ করিতে হয়।" এইরূপে গল্পের প্রবাহ ছুটিয়াছে এবং পুরোহিত তন্ত্রশাসিত খৃষ্টধর্ম্মের সহিত আদিম খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

Micromegas গ্রন্থে আছে পাঁচলক্ষ ফুট দীর্ঘ Sirius নক্ষত্রের এক অধিবাসীর সহিত কয়েক সহস্র ফুট দীর্ঘ শনিগ্রহের এক অধিবাসীর পৃথিবীভ্রমণের কাহিনী। ভূমধ্যসাগর পদব্রজে অতিক্রম করিবার সময় সিরিয়ানের জুতার গোড়া ভিজিয়া গেল। শনিবাসী বলিল, তাহাদের মাত্র ৭২টি ইন্দ্রিয় আছে, তাহাতে চলে না। সিরিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের পরমায়ু কত? শনিবাসী বলিল "বেশী নয়; পনের হাজার বৎসরের বেশী কম লোকেই বাঁচে।" এমন সময় একখানা জাহাজ আসিয়া পড়িল। সিরিয়ান তাহা হাতে লইয়া আঙুলের অগ্রভাগে রাখিয়া দোলাইতে লাগিল। জাহাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সিরিয়ান জাহাজের আরোহীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল "হে বুদ্ধিমান ক্ষুদ্র জীবগণ, আমার বিশ্বাস, তোমরা এই পৃথিবীতে যে আনন্দ উপভোগ কর, তাহা অতি নির্ম্মল। কেন না জড়ের ভার তোমাদিগকে বেশী বহন করিতে হয় না। তোমাদের দেহ এত ক্ষুদ্র, যে তোমাদের মধ্যে আত্মা ভিন্ন আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ কর।" জাহাজস্থ একজন দার্শনিক কহিলেন "দেহ ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে? প্রচুর অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় জড় পদার্থের অভাব তাহাতে নাই। এই মুহূর্ত্তেই আমাদেরই সমশ্রেণীস্থ একলক্ষ হ্যাটকোটধারী জীব সমসংখ্যক সমশ্রেণী জীবের প্রাণ সংহারে নিযুক্ত আছে। অনাদিকাল হইতে

ভলটেয়ার

ইহাই পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে।" তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সিরিয়ান কহিলেন "পাপিষ্ঠগণ, আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনি তোমাদের সমগ্র জাতিকে পদতলে পিষ্ট করিয়া হত্যা করি।" দার্শনিক বলিলেন "আপনার সে কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন নাই। আমরা আপনাদের চেষ্টাতেই আপনাদের ধ্বংস সাধন করিতে পারিবে। দশ বৎসর পরে আমাদের একশতাংশও জীবিত থাকিবে না। কিন্তু এই অবস্থার জন্য দায়ী রাজপ্রাসাদবাসী বর্ব্বরগণ। তাহারা নিজেরা বসিয়া থাকিয়া লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করিবার আদেশ দেয়। শাস্তি তাহাদেরই হওয়া উচিত।" (ক্রমশঃ)

ভয়

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ

জীবনের অবকাশপূর্ণ মুহূর্ত্তগুলো কেমন যেন একটানাভাবে চলে যায়, ছন্দের গতি আছে—কিন্তু মুগ্ধ হবার তাতে কিছুই নেই। হাঁস ফাঁস মোটেই ঠেকে না—অথচ যেন কেমন। চিত্ত দত্তের মনের আনাচে কানাচে যে রঙ ধরে—মুহূর্ত্তে তা ম্লান হয়ে ওঠে, প্রত্যক্ষ দিবালোকে যেন স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়।

আকাশ পাতাল কত কি ভাবতে থাকে। দূরে বর্ষা নেমেছে—গাছের পাতার মসৃণ রাস্তা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—আর কর্ম্মচাঞ্চল্যহীন জীবনের বর্ণ গন্ধহীন অভিব্যক্তি পাগল করে তোলে তাকে। এমনিভাবে জীবনের বাকী অংশটুকু কাটিয়ে দেবার কল্পনায় চিত্ত হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু মনের আনাচে কানাচে কয়েকটা চেনা অচেনা মুখ উঁকি দিয়ে যায়, আর সেই স্মৃতিগুলো নিয়ে অনেক চেষ্টা করেও স্মৃতির মুকুরে একটি চেনা মুখও ভেসে ওঠে না—আর তখনই হয় চিত্তের সবচেয়ে মুশকিল।

দূরে পল্লীর কোলাহল নিস্তব্ধ হয়ে আসে, গ্রামের প্রদীপের ক্ষীণতম রশ্মিটুকু মিলিয়ে যায়, পল্লীর কোলে নেমে আসে একটা সুষুপ্তির স্তব্ধতা। চিত্ত জেগে থাকে তখনো, দুর্ব্বার কর্ম্ম কোলাহলের মুখরতার মাঝে উদ্দাম-গতিতে ছুটে যাবার সাধ হয় তার। ঘরে বসে থাকা তার পক্ষে দায় হয়ে ওঠে, নিস্তব্ধতা ভেঙে ফেলবার জন্য চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা যায়। গভীর নিশীথে চেঁচিয়ে ওঠে সে। কে যেন তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে বিকট আর্ত্তনাদ করে ওঠে, পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে যায়। কিছুতেই সেই বিকট আর্ত্তনাদকে চিত্ত চাপা দিতে পারে না। কতবার ইচ্ছা হয়েছে মনের ভিতরকার সেই ধ্বনিকে শ্বাস রুদ্ধ করে মেরে ফেলতে, কিন্তু পারেনি সে কোনোদিন। বন্ধুবান্ধবেরা চিকিৎসার পরামর্শ দেয়। চিত্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে···এমন কী ঘটনা তাকে ঘিরে মূর্ত্ত হয়ে ওঠেছে যার জন্যে লোকের ব্যস্ততার আর সীমা নেই। ইদানিং সে ও-সব কথায় অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, মুখে চোখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। সে চায় কাজ, কোনো একটা কিছুর মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়—ভুলে যেতে চায়—পারিপার্শ্বিককে।

ভাবতে থাকে সে একটানা সেই—দীর্ঘ পথ। জীবনের সব কিছু নির্দ্দয়তা নিয়ে যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় পাহাড়ের ধারালো মুখ। পাহাড়ের দুরধিগম্যতা আর অরণ্যের বিভীষিকায় ভরা সেই দীর্ঘ পথের সমস্ত রুক্ষতা তার চোখের সামনে বিরাট এক অজগরের মতো কিলবিল করে ওঠে। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি সেই একটানা পথের দুঃস্বপ্ন তার উপর চেপে বসে—এক বিকট বুকচাপা স্বপ্নের ভয়াবহতায় উদগ্র। নাঃ এ স্বপ্ন তাকে ভুলতে হবে, সারারাত জেগে থাকতে হলেও ভুলতে তাকে হবেই। কর্ম্মব্যস্ততাকে টেনে আনবার জন্য আরো সে ছোটখাট কাজ খুঁজে বেড়ায়। দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশের হাটবাজার লোকজন সব তার কাছে নতুন ঠেকে। দেশের বাড়ীঘর আত্মীয়স্বজন সমস্তই নিতান্ত অপরিচিত মনে হয়। এ যেন কোন দূর বিদেশে স্বজনহীন নির্বান্ধব পুরীতে হঠাৎ পথ ভুলে সে এসে পড়েছে, না বোঝে এখানকার চালচলন, না জানে তার ভাষা।

এক এক করে মনে পড়তে থাকে পৃথিবীর প্রথম আলোক যেদিন তার চোখের পাতায় স্বপন জাগিয়েছিল। সে আলোক এই শ্যামলা বাঙলা দেশের এই নিভৃত পল্লীর। তারপর এক অসতর্ক মুহূর্ত্তেই তার জীবনে এসেছিল দারিদ্র্যের ঘনঘটা। তাই কৈশোর সীমা পার হবার বহু পূর্ব্বেই জীবনযুদ্ধের প্রেরণায় যেতে হয়েছিল তাকে রেঙ্গুন। এক এক করে মনে পড়তে থাকে। কতই বা বয়স—ত্রিশ পেরোয় নি আজো। এরই মাঝে কতশত ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেছে। দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত্ত কাটিয়ে দারিদ্র্যের কঠোরতাকে তুচ্ছ করে দিয়ে তার প্রচেষ্টা বিজয়ের গৌরবে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘ কুড়িটা বছর একটানা ভাবে কেটেছে সেই দেশে, অন্যত্র যাবার কথা ভাবেও নি কোনো দিন।

চোখের উপর ভাসতে থাকে কালোবস্তী অঞ্চল।

যেখানে তার সবকিছু প্রচেষ্টাকে নিঙড়ে নিঙড়ে চিত্ত তৈরী করেছিল তার গৃহ—হ্যাঁ—নিতান্ত অনাচার বৈকি। আর বিভোর হয়েছিল সেই দিনটির প্রতীক্ষায়—যেদিন উৎসবের আনন্দে তার ক্ষুদ্র নাড় ঝলমল করে উঠবে। প্রশংসা করেছিল অনেকেই। এতটা অল্প সময়ে অতখানি সমৃদ্ধি অনেকের চোখে আবার দৃষ্টিকটুও ঠেকেছিল। চিত্ত ভয়ানক আনমনা হয়ে যায়, ঢাকা জেলার ক্ষুদ্র পল্লীর ততোধিক ক্ষুদ্র বাড়ীর আবেষ্টন ভেদ করে দৃষ্টি তার চলে যায় রেঙ্গুনের ডালহৌসী পার্কের সিমানায়, সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কি যেন খুঁজে বেড়ায় সেখানে। পার্কের চারপাশের ঝক্‌ঝকে পিচের রাস্তায় পাঁচ বছর পূর্ব্বের একটি পূর্ণিমা রাত্রি যেন চোখের ওপর ভাসতে থাকে। জোৎস্নায় পাম গাছের পাতা জ্বলছে—লেকের বুকে কে যেন ঝকঝকে রূপোর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। চিত্ত তখন ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে, লেকের আশে পাশে ঘুরতে থাকে। কতবার পাক দেয় তার খেয়ালই থাকে না। হঠাৎ একটুকরো আলোর ঝলক এসে যেন তাকে চমকে দেয়। সামনা সামনি ডাক শোনে, কলকণ্ঠে কে বলে, এই যে আপনি। চিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে, মার্স্ক্যেকে চিনতে তার দেরী হয় না। প্রতি নমস্কার করতেও কেমন যেন ভুলে যায়। মার্স্ক্যে তার অবস্থা বোঝে। ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে যায় সোয়ে ডাগনের পাশে। সন্ধ্যারতির মদিরতায় সোয়ে ডাগনের পারিপার্শ্বিকতা স্নিগ্ধতায় অপরূপ হয়ে ওঠে। চিত্ত প্রথম দেখেছিল ওকে এক জলসায় পোয়ে নাচের এক অপরূপ ভঙ্গিমায়। চারিদিকের আলোকমালার সজ্জার মাঝে রঙিণ পোষাকে ঝলমলে মার্স্ক্যেকে চিত্তের খুব সুন্দর লেগেছিল। মনে ওর জাগিয়ে তুলেছিল একটা উন্মাদনা। সেই থেকে একটা আনন্দের অভিনব সাড়া জেগেছিল ওর মনে। আপনার আঙিনায় অমনিভাবে উৎসব সজ্জা রচনা করার সাধ হয়েছিল একদিন। একান্ত মন প্রাণ দিয়ে এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করার বাসনা জেগেছিল। সে সাধ তার অপূর্ণ থাকেনি।

তারপর সেই মধুর সন্ধ্যায় ডালহৌসী পার্কে দেখা। চিত্ত ভাবতে পারেনি, এটা এমনি আকস্মিক যে চিত্তের কাছে আজো অদ্ভুত লাগে। পরিচিত অপরিচিত শতেক কৌতূহলী দৃষ্টিকে এড়িয়ে সোয়ে ডাগন পেগোডার নীচে বসে পড়ে ওরা। মার্স্ক্যে তার কোঁচড় থেকে কয়েকটা ময়ান্দী ফল চিত্তের হাতে দেয়—দু একটা নিজের মুখে পুরতেও ভুল হয় না—তার। চিত্তের কেমন যেন সঙ্কোচ হয়—চোখে মুখে লজ্জার ছাপ ওর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্স্ক্যে অবস্থাটা বোঝে, হেসে বলে, ফলগুলো অমনিভাবে নাড়াচাড়া করবেন?

চিত্ত হাঁ না কিছুই জবাব দিতে পারে না—আস্তে আস্তে একটা ফল মুখে পুরে দেয়।

মার্স্ক্যে হেসে ওঠে, হল না, হল না—সবগুলো খেয়ে ফেলুন—কি যে আপনি!

সত্যই সুদীর্ঘকাল রেঙ্গুন বাসের পরও চিত্ত ময়ান্দীফল কোনদিন খায়নি সেকথা ভেবে—ওর নিজের কাছেই কেমন আশ্চর্য্য ঠেকে।

তারপর পরিচয় কেমন করে নিবিড় হয়ে ওঠে তার প্রতিটি দৃশ্য চিত্তের চোখের উপর ভাসতে থাকে। টুণ্টে সহর ক্রমেই ওর কাছে পরিচয়ের রঙিণ স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে। তার প্রতিটি গাছপালা আনারস পীচের ক্ষেত সব কিছুর সঙ্গেই যেন একটা নাড়ীর যোগসূত্রে রচিত হয়ে যায়। সে সূত্রের কেন্দ্র মার্স্ক্যে। প্রতি রবিবার টুণ্টেতে যাওয়া যেন একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় ওর কাছে।

মার্স্ক্যের মা মাটির কাজ করে, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে—মাটির পাত্রগুলো এক অপরূপ সৃষ্টির মতোই চিত্তের কাছে মনে হয়। পরিবারের প্রতিটী লোকের সাথেই পরিচয়ের নিবিড় বন্ধনে ধরা পড়ে যায় চিত্ত। চালচলন আচার ব্যবহার কিছুই যেন আর বেমানান ঠেকে না। এ যেন কতকালের পরিচয়। অথচ বেশী দিনের কথা তো নয়, চিত্ত এদের ভাবধারা দেখে হেসে অস্থির হয়েছে। বন্ধুবান্ধবরা উগ্র ব্রহ্ম-বিদ্বেষী বলতেও কসুর করেনি। চিত্ত হয়তো একদিন এতে গৌরবই বোধ করেছে।

সেদিনটা ছিল রবিবার। কিন্তু নিয়মিত টুণ্টে সহরে যেতে ভোলেনি। দুপুরের দিকে ওদের বেড়াতে যাবার কথা ছিল, দূরে বহুদূরে যেখানে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে রবারের বন। মার্স্ক্যের সাজ পোষাকে পারিপাট্যটা সেদিন ছিল আরো বেশী—সে পোষাক চিত্তের মনে রঙ

ধরিয়ে দেয়, ধরণীর সব কিছু অপরূপ রূপ নিয়ে চোখে একটা উন্মাদনা জাগায়। দুপুরের দিকে রবারের ক্ষেতের দীর্ঘ পথ বেয়ে ওরা বহু দূরে চলে যায়, দুজনেই যেন পৃথিবীর আর সব কিছু বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রবার ক্ষেতের একটা ফাঁকা অংশে বসে পড়ে দুজনে। কতক্ষণ কেটে যায় সে খেয়ালই থাকে না কারো। মার্স্‌য়ের হাতে একটা রক্ত গোলাপ। ফুলটাকে কত ভাবে যে সে আদর করতে থাকে। হঠাৎ ফুলটাকে চিত্তের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, তুমি তো যাচ্ছ, আমার কথা মনে থাকবে না।

চিত্ত ওর হাতখানা হাতে তুলে নেয়, বলে—যাচ্ছি, তবে তোমাকেও নিয়ে কেমন ?

মার্স্‌য়ে কথা বলে না—শুধু ঘাড়টা নেড়ে সম্মতি জানায়।

তারপর ওঠে ঝড়। গগনবিহারী এরোপ্লেন অগ্নি ছড়ায়, মৃত্যুর ভীষণতায় সব কিছু আলোক নিবে আসে অন্ধকারে প্রেতের ছায়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দেয়। ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে দিগ্বিদিগ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ধ্বংসের রুদ্র চক্ষু জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে যায় সব কিছু সুন্দরকে। ওঠে পলায়নের রোল। চিত্তর বন্ধুবান্ধবরা চলে গেছে অনেকেই—কেউ নিরুদ্দেশে কেউ হয়তো জন্মান্তরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। চিত্ত আর থাকবার কথা ভাবতে পারে না। টুন্টে সহরে মার্স্‌য়েদের বাড়ীতে যেয়ে উপস্থিত হয়। মার্স্‌য়ের বাপ মা সবাই যেন এক মুহূর্ত্তে বদলে যায়। চিত্তের সাথে কথা বলতেই চায় না—তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মার্স্‌য়ের বাবা উবাথে এগিয়ে আসে, ইঙ্গিতে দূরে ডেকে নিয়ে যেয়ে যে কথা জানিয়ে দেয়, তার ভাবার্থ হচ্ছে—বাছাধন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, আর এদিকে এসো না। চিত্ত ইঙ্গিতে জানায়, আচ্ছা।

তারপর সেই রবার বনের ধারে—একা একা বসে থাকে দীর্ঘ প্রতীক্ষায়। প্রতীক্ষা তাকে বেশীক্ষণ করতে হয় না। মার্স্‌য়ের রঙীণ পোষাকের ঝলকানি ওর চোখে এসে লাগে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আকাশে দু একখানা এরোপ্লেন পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। মার্স্‌য়ে ভয়ে আঁৎকে ওঠে, চিত্ত গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়—বলে আরে, ও যে আমাদের R. A. F.—ভয় কি ?

তারপর কর্ত্তব্য ওদের ঠিক হতে দেরী লাগে না। দুজনেই উঠে পড়ে, নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু হয় ওদের।

বন্ধুবান্ধবেরা সাবধান করেছিল—অনেকে জীবনের ভয় দেখিয়েছিল পর্য্যন্ত ; কিন্তু চিত্ত নির্ব্বিকার। তারপর সেই দীর্ঘ যাত্রাপথে এত বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে—সেকথা দুজনেরই কাছে আজ নতুন করে মনে হল। ভোরের দিকে দলের আরো কয়েকজনের সাথে মিলে একখানা গাড়ী ঠিক করে ফেলে চিত্ত। গাড়ী কিছু দূরে যেতে না যেতেই দূরে কোলাহল শোনা যায়—কারা যেন দ্রুতপদে ছুটে আসছে। দলের লোকেরা বল্লে, ওরে মেয়েটাকে টান মেরে ফেলে দেতো গাড়ী থেকে, নইলে কি সবাই মিলে অকারণে মারা যাব।

চিত্ত রুখে দাঁড়াল। কোলাহল নিকটতর হয়ে এল, দলের আর সব লোক গাড়ী থেকে নেমে প্রাণপণে ছুট দিল। চিত্ত বুঝতে পারলে সব—শুধু সময়টুকুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। লোকগুলো অবশেষে পৌঁছে গেল, গাড়ীর চালক পর্য্যন্ত ততক্ষণে কেটে পড়েছে। রামদা হাতে একটা বিরাট দল গাড়ী আগলে দাঁড়াল। উবাথের সর্ব্বদেহ যেন হঠাৎ দীর্ঘতর হয়ে উঠল। আশে পাশের সবগুলোর মাথাকে ছাপিয়ে উঠে সে বিকট দ্রংষ্টা বিকাশে. চিত্তের মাথা চিবিয়ে ফেলার আকাঙ্ক্ষা জানালে। উবাথের হাতের রামদা দুপুরের রৌদ্রে চিক চিক করে উঠল, আর মার্স্‌য়ের কাঁধের উপর সেই খড়্গ আস্ফালন করে ভীষণ অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল উবাথে।

প্রাণপণে চীৎকার করছে চিত্ত। গলা থেকে স্বর কি তার কিছুতেই বেরোয় না।

পাড়ার গাঙ্গুলী মশাই বলেন, না—রাত দুপুরে এ যন্ত্রণা তো আর সহ্য হয় না।

ছোট ছেলেমেয়ে ভয় পেয়ে জেগে ওঠে—কেঁদে কেটে অস্থির করে তোলে মায়েদের। কোনো মা হয়তো অসীম ধৈর্য্যের সাথে খোকাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে, খোকন ঘুমায় ও-ও-ও। খোকনকে কিন্তু থামানো যায় না। মায়ের ধৈর্য্য রাখা দায় হয়, দুমদাম খোকনের পিঠে চড় কষিয়ে দেয়, বলে, নাঃ পোড়ারমুখোকে আবার ভূতে পেয়েছে আজ।

অনেক লোকের আলোচনা শোনা যায়—কে একজন চিত্তের পিশেমশাইকে বলেন, ভূত শান্তি করান মশাই, ভূত শান্তি করান—নইলে কিছুতেই যাবে না।

আর একজন কে বলে, রাস্তায় কি কমনে দেখে এসেছে, মানে ঐ মড়া আর কি—রাম রাম, রাতে আবার নাম করে ফেল্লাম।

আরো কতজন কত কি বলে চলে, কতক চিত্তের কানে যায়, কতক যায় না।

দূরে বর্ষা নামে, পল্লীর কোলাহল আবার শুদ্ধ হয়ে আসে। চিত্ত জেগে থাকে তখনো। আকাশে রয়েল এয়ার ফোর্সের বম্বার দুরন্ত পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। দুরন্ত পাখীর পাখার ঝাপ্টা বুঝি চিত্তের পাঁজরে এসে লাগে। চোখের ঘুম যেন তার কে কেড়ে নেয়।

রবীন্দ্রনাথের বলাকা

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম-এ, ভাগবতরত্ন

রবীন্দ্র কাব্য বৈচিত্র্যময়—রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি, রবীন্দ্রনাথ যৌবনের কবি, গীতি-কবিতার কবি, সাধক কবি, সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কবি। দর্শনের জটিল তত্ত্ব, উপনিষদের গভীর রহস্য তাঁহার কাব্যে সুন্দরভাবে লীলায়িত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। দার্শনিক কবিতা রবীন্দ্রনাথ বহু লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে বলাকা একটী মনোরম কাব্য। এই বলাকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর গতিবাদের সুর ধ্বনিত করিয়াছেন ও তদুপরি বের্গসঁর গতিবাদের দুর্বল অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। সংক্ষেপে বের্গসঁর গতিবাদের কথা—এই কালই (Time) সত্য। অনন্ত প্রবহমান কালই সত্য—ইহার গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিলেই জীবনীশক্তি চলিয়া যায় এবং ইহা বস্তুতে পরিণত হইয়া যায়…এই প্রবাহ যদি কোনওরূপে প্রতিহত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বস্তুর স্তূপ জাগিয়া উঠিবে।

"যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছি্রয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে"—বলাকা

বের্গসঁর গতিবাদের নূতন কথা হইতেছে যে চলাটাই সত্য—যাহা চলে না, যাহা স্থির তাহা মৃত। এই নূতন তত্ত্বটা পুরাতন দার্শনিক মতের তীব্র প্রতিবাদ—পূর্ব্বে দার্শনিকরা বলিতেন যে যাহা শাশ্বত সত্য, চিরন্তন সত্য, তাহা স্থির অচঞ্চল—যাহা চঞ্চল বা গতিশীল তাহা মিথ্যা, তাহা হেয়, তাহা দুর্দ্দিনের—ইহার দার্শনিক প্রতিষ্ঠা নাই। ভগবান্ শঙ্কর সত্যের একটী লক্ষণ বলিয়াছেন যে সত্য 'কাল ত্রয় বাধিত' অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকালেই সমভাবে অবস্থিত। বের্গসঁ বলিলেন যে শুধু স্থিতিকে লইলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না—গতির প্রতি উদাসীন হওয়াতে আমরা প্রত্যেক জিনিষকে আর সকল জিনিষ হইতে পৃথক করিয়া দেখি—প্রত্যেক বস্তুকে স্বতন্ত্রভাবে নিরীক্ষণ করি।

আসল কথা আমরা বস্তুকে গতি হইতে পৃথক করিয়া দেখি, আমরা গতিকে বস্তুর একটা অবস্থা মাত্র কল্পনা করি। আমাদের নিকট গতি সত্য নহে বস্তুই সত্য। কাল (Time) যদি কেবল কতকগুলি মুহূর্ত্তের সংহতি মাত্র হয় তাহা হইলে দেশে ও কালে কোনও পার্থক্য থাকে না। কাল অবিভাজ্য—কালকে মুহূর্ত্তে ভাগ করা যায় না। কাল একটা অনন্ত প্রবাহ—কৃত্রিম বাধা দিয়া ইহার গতিকে খর্ব্ব করিয়া আমরা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছি—বাস্তবিকই ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নাই—আছে কেবল অনন্ত কাল প্রবাহ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বলাকায় বের্গসঁর ন্যায় গতিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নানা আকারে গতিকে কবি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন—প্রথম কবিতাতে তিনি ইহাকে নবীন ও কাঁচা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন

"ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা"

আর যে প্রবীণ যে 'পরম পাকা' সে তো কাজের বার হইয়া গেছে।

"ঐ যে প্রবীণ ঐ যে পরম পাকা
চক্ষুকর্ণ দুইটী ডানায় ঢাকা
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়"

তাই কবি চলার গান গাহিয়াছেন,

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে?

রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।

তিনি অতীতের প্রতি, পশ্চাতের প্রতি তাকাইতে চান না—

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে
তাকাসনে ফিরে

এই সমুখ ধাবনই তো জীবন—কবি তাই ডাক দিয়া গেলেন

যাত্রা কর যাত্রা কর যাত্রীদল
এসেছে আদেশ
বন্দরের কাল হোলো শেষ।

এই সমুখ পানে এগিয়া চলিলেই মৃত্যু হইতে অমৃতে পৌছিব

মৃত্যু সাগর মথন করে
অমৃত রস আনব হরে
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ সাধন সাধবে
কাঁদবে ওরা কাঁদবে

ইহাই উপনিষদের 'মৃত্যো র্মা' ং মৃতং গময়—তমসো মা জ্যোতির্গময়—ইহারই প্রতিধ্বনি নয় কি?

এই গতির বাণীকেই বলাকার একটী কবিতায় অভয় শঙ্খ বলা হইয়াছে—এই অভয় শঙ্খ বাজিলে আর বিরাম বিশ্রাম থাকে না—গতির উন্মাদনা আসিয়া পড়ে।

ভেবেছিলাম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাবো বিরাম খুঁজি
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক
হেনকালে ডাক্‌লো বুঝি
নীরব তব শঙ্খ

এই গতির ভিতরই সত্যকে খুঁজিতে হইবে—নিস্তব্ধতার মধ্যে ইহাকে খুঁজিলে কিছুতেই পাওয়া যাইবে না—কবি দেখাইয়াছেন, একদিকে আছে সত্য—অপরদিকে কেবল একটা ছবি।

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা?
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভীড়
আকাশের নীড়
ঐ যারা দিনরাত্রি আলো হাতে চলিয়াছে
আঁধারের যাত্রী—গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদের মত সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি

* * *

এই ধূলি—এও সত্য হায়
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির তাই এরা সত্য সবি
তুমি স্থির তুমি ছবি
তুমি শুধু ছবি।

সেইরূপ রাশি রাশি বস্তুর স্তূপে সত্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্তরের বেদনার মধ্যে সত্য নিহিত আছে—ভারত-সম্রাট সাজাহান রাজশক্তির-ধনমানকে তুচ্ছ করিয়া অন্তরের বেদনাকে চিরন্তন করিবার মানসে তাজমহল সৃষ্টি করেন।

"কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল, এ তাজমহল"

কিন্তু সেই হৃদয়ের বেদনা এই অপরূপ তাজমহলের চেয়েও অধিক সত্য, তাই ইহাকে স্মৃতি-মন্দিরও ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

সমাধি মন্দির এই ঠাঁই রহে চির স্থির
ধরার ধূলায় ঢাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?

জীবনের প্রকাশ তবে কিরূপ? যদি তাজমহলের মতন মানবের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিকেও জীবনে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহা হইলে কিরূপে ইহা ব্যক্ত হইবে? বের্গস বলিয়াছেন, ইহার স্বরূপ হইতেছে অনন্তপ্রবাহ—কবিও বলেন, ইহার প্রকাশ হইতেছে বিরাট নদী।

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে

এই প্রবাহ কোনও রূপে প্রতিহত হইলেই বস্তুর স্তূপ জাগিয়া উঠিবে।

'যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি

কাজে কাজেই এ প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে
তাকাসনে ফিরে
সমুখের বাণী
নিক্‌ তোরে টানি
মহা স্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে

বের্গস'র কথা এই যে, গতি শুধুই গতি—শুধু চলা—কিন্তু এই গতি কোন পথে? ইহার গম্যস্থান কোথায়, লক্ষ্য কি, এ সব কথার উত্তর বের্গস দেন নাই—রবীন্দ্রনাথ এইখানেই বের্গস'র সঙ্গ ত্যাগ করিলেন—কবি গতির মধ্যে আনন্দের রূপ দেখিলেন—গতি শুধু অফুরন্ত চলা

নহে—চলার মধ্যে আছে আনন্দের জয় গান, রূপের মত্ততা—গতি চায় স্থিতি—চায় মিলন, সেই অসীমের সহিত মিলন।

* * *

তাই কবি লিখিলেন

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ

* * *

তাই দেবলোক পানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দ মঞ্জরী'

স্মৃতির চিরন্তনত্ব কেবল স্মৃতিতে নহে—স্মৃতির সহিত যে প্রীতি আছে সেই প্রীতিতে,

সম্রাট্ মহিষী
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্য্যে হয়েছে মহীয়সী

* * *

রবীন্দ্রনাথ বের্গস'র মতন মানুষের দুইটী চেষ্টা স্বীকার করেন—একটী হইতেছে অকারণ অবিরাম চলা, আর একটী হইতেছে গতি হইতে। এই অকারণ অবিরাম চলা হইতে শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা—মুক্তির জন্য বেদনা—দুই চেষ্টাই সমান ভাবে সত্য—একটীকে তিনি উর্ব্বশী এই আখ্যা দিয়াছেন, অন্যটীর নাম দিয়াছেন লক্ষ্মী।

কোনক্ষণে সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি
একজনা উর্ব্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তারে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী

শান্তিনিকেতন পত্রে এই কবিতাটীর মর্ম্ম এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

"ভাঙাচোরা যখন চলিতে থাকে, জীবনের যখন অভিজ্ঞতার ভূমিকম্প হইতে থাকে, তখন তার মধ্যে যথেষ্ট বেদনা আছে—সেই উদ্দাম শক্তিকে অবজ্ঞা করা যায় না—কিন্তু এই চঞ্চলতাতেই যদি তার সমাপ্তি হোতো তা হোলে দুর্গতির আর অন্ত থাকৃতো না। তাই দেখ্‌তে পাই, এর মধ্যে লক্ষ্মীর হাত আছে—তিনি বাঁধন-ছাড়া তানকে সামের দিকে ফিরিয়ে এনে ছন্দ রক্ষা করেন। যে প্রলয়ঙ্করী শক্তি সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যদি সেই শক্তিই একান্ত হয় তবে সর্বনাশ ঘটে—কিন্তু সে তো একা নয় গতি প্রবর্ত্তিত করার জন্য সে আছে—গতি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে শক্তি, তাকে বলি কল্যাণী—এই নিয়ন্ত্রিত গতি দিয়েই তো বিশ্বের সৃষ্টি সঙ্গীত।"

কেবল গতিতেই সৃষ্টি হয় না—যেখানে চিত্তের ক্রিয়া সেইখানেই সৃষ্টি—গতি তো চিত্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া চাই, সেইটাই তো সৃষ্টি—যথার্থ সৃষ্টির উদাহরণ নিম্নলিখিত কবিতাটীতে পাই।

"পাখীরে দিয়েছ গান গায় সেই গান
তার বেশী করে না সে দান"

আমি যদি পাখীর মতন অচেতন হতাম, তা হোলে তো আমি যে দান পাইয়াছি তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতাম। কিন্তু আমি চিত্তের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই যখন আমি দানের চেয়ে প্রতিদান দিই অনেক বেশী—পাওয়ার চেয়ে অধিক দেওয়াতেই তো সৃষ্টিশক্তির পরিচয়। যেখানে চিত্তের ক্রিয়া সেখানেই সৃষ্টি। কেবল গতিতে সৃষ্টি হয় না। আমার মধ্যে এই সৃষ্টিক্রিয়া আছে বলিয়াই আমি অসীমকে প্রকাশ করিতে পারি—আমি যদি কেবল অসীমের ছায়া হইতাম তা হোলে আমার মধ্যে তাহার কোনও প্রকাশ সম্ভব হইত না। তাই রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে লিখিয়াছেন—

"তোমার আলোয় নাই তো ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর"

সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশেই যত কিছু আনন্দ, যত কিছু দুঃখ।

"আমি এলাম কাঁপলো তোমার বুক
আমি এলাম এলো তোমার দুঃখ
আমি এলাম তাইতো তুমি এলে
আমার মুখ চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে"

আর একটী কবিতায় এই ভাব আরও পরিস্ফুট হইয়াছে; অসীম যখন 'স্ব মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত থাকেন তখন তো কোনও আনন্দ নেই—পূর্ণ যখন অপূর্ণের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে তখনই তার যত কিছু আনন্দ

পূর্ণ তুমি তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে
তাই সে একে একে
যা কিছু ধন তোমার আছে আমার করে লবে
এমনি কোরেই হবে।

বের্গস' জীবনের মধ্যে কেবলই গতি দেখিয়াছেন—তিনি অসীমের সহিত জীবনের যোগ দেখিতে পান নাই—এই জন্য জীবনটা তাঁহার নিকট নীরস গতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না—জীবনের মধ্যে আনন্দের ধারা—রসের ধারা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সত্যের তিনি জীবন রূপ দেখিয়াছেন—এই জন্য তিনি জীবনের উদ্দেশ্য গতির লক্ষ হারাইয়া ফেলিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের নিকট কেবল গতি—কেবল চল সত্য নয়—তাহার রহস্য কবি ব্যক্ত করিলেন

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে
তবে ঘর ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত?

* * *

নিদারুণ দুঃখ ঘাতে
মৃত্যু ঘাতে
মানুষ চূর্ণিবে যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

* * *

চার—অধ্যায়

স্বামী পূর্ণানন্দ

(প্রথম)

বিশ্ব-বিধাতার এত বড় সৃষ্ট জগতে জীবলোকই সর্ব্বপ্রধান। এই জীবজগতে মনুষ্য-সমাজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই মনুষ্য-সমাজে সকল মানুষই সম-স্বভাব বিশিষ্ট নহে। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন মনুষ্য সমাজে মানুষের স্বভাবে ও আচরণে বিশেষ ভাবেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

এই পার্থক্যের বিশেষ কারণ, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মনোবৃত্তি। এই বিভিন্ন মনোবৃত্তিই বিভিন্ন মানব সমাজের মূল ভিত্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

উরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী শ্বেতকায় জাতি বর্ত্তমান জগতে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও, পাশবিক বলে এবং জাতিগত স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত একতায় সর্ব্বাগ্রগণ্য। একতাবদ্ধ এবং বলিষ্ঠ শ্বেতকায় জাতিসকল ইহলোকের সর্ব্ববিধ ভোগসুখেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট।

এই ভোগসুখকে চিরস্থায়ী করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাবশেই শ্বেতকায় বলগর্বিত জাতিসকল রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিকে তাহাদের জীবনসৌধের প্রধান ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতীয় এবং ভারতপ্রভাবান্বিত জাতি সকল ইহাদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব সম্পন্ন। ভগবৎভক্ত ভারতীয়গণ ত্যাগের সাধনায় এবং জাগতিক সর্ব্বদুঃখ সহনে চির অভ্যস্ত। ত্যাগ ও ধর্ম্মানুশীলনই ভারতের জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু, স্বর্গীয় মহামনস্বী মদনমোহন মালবীয়জীর ভাষায় বলিতে গেলে, বলিতে হয়, অভারতীয় বিধর্ম্মী জাতিমাত্রই চিরদিন ভারতের এই ত্যাগধর্ম্মকে দুর্ব্বলের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছে এবং ভগবৎ প্রেমের ভিখারী ভারতীয় জাতির সর্ব্বদুঃখ সহিষ্ণুতার ব্রতকে কাপুরুষের আচরণ বলিয়াই অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে।

অভারতীয়গণ ভারতীয় জাতিকে শুধু অবজ্ঞা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; সহস্র বৎসর যাবৎ এই ভারতীয় জাতিকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কল্পনাতীত অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিতে, ভারতের বিপুল ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে এবং ভারতীয় ধর্ম্ম-সমাজ ও সভ্যতাকে চূর্ণ ও বিলুপ্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু, দীর্ঘকালব্যাপী এইরূপ গুরুতম আঘাতেও ভারতীয় জাতির মৃত্যু হয় নাই। ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিলোপ ঘটে নাই। বারংবার ভারত বাহিরের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে; আবার সে তাহার অন্তর্নিহিত সাধন শক্তি সহায়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে উরোপীয় জাতিসমূহের, বিশেষ ভাবে ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে বহুকাল পরে ভারত এক নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। এই নব জাগ্রত ভারতের সাধন শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ রূপে আবির্ভূত হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আত্মবিস্মৃত এবং বহুকাল যাবৎ বৈদেশিক কুশিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি ভারতবাসীকে, শ্রীরামকৃষ্ণ আপন সফল সাধনা দ্বারা অতি প্রবল রূপেই আকর্ষণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্ট রূপেই ভারতীয় হিন্দুসমাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন যে, প্রাচীনতম ভারতের ধর্ম্ম—সভ্যতা—শিক্ষা ও সংস্কার, ভারতের দেব-দেবী, পূজা-অর্চনা ও শাস্ত্র-গ্রন্থাদি, কোন দেশের অপেক্ষাই গুণে হীন নহে। বরং বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ভারতের সন্তানগণ যদি আবার ভারতীয় সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যদি আবার একান্ত দৃঢ়তায় এবং অবিচলিত সংযমের সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষালাভে ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত হয়, তবে অনতিকাল মধ্যেই ভারত আবার জগতের জাতীয় সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভে অধিকারী হইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রথম অসাধারণ উদারতার সঙ্গে প্রমাণিত করেন, জগতে যত মত, তত পথ এবং প্রত্যেক ধর্ম্মপন্থাই ভগবানে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ। প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ ভগবৎ ভক্তগণের ধর্ম্মানুশীলনে দ্বন্দ্বের স্থান নাই। পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি সশ্রদ্ধ ভাবের দ্বারাই ধর্ম্মজগতে সাম্য ও সমন্বয় সাধিত হইতে পারে এবং এই পারস্পরিক শ্রদ্ধার পথেই ধর্ম্মান্ধতা, ধর্ম্মের নামে হত্যা ও লুণ্ঠন প্রভৃতি যাবতীয় হিংসা ও জাতিবিদ্বেষ মূলক ঘৃণিত কার্য্যসমূহ বিলুপ্ত হইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হন নাই। কঠোর সাধক জীবনের সরল সহজ ভাব ও কর্ম্মপ্রণালীর সহায়তায়, জীবন্মৃত ভারতের অন্তরে, অমোঘ ভারতীয় আদর্শের সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

(দ্বিতীয়)

শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনের অপূর্ব্ব বিকাশ; কঠোরতম সাধনা এবং লোকশিক্ষাদান প্রভৃতি সকল ঘটনাই ১৮৬৬ খৃঃ হইতে ১৮৮৬ খৃঃ মধ্যে সংঘটিত হয়। তাঁহার এই কর্ম্মপ্রচেষ্টা যে ভগবৎ ইচ্ছাতেই সম্পূর্ণ সফলতা লাভে সমর্থ হইয়াছিল—স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতির, ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলরাম বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, এবং সাধু নাগ মহাশয় প্রভৃতির জীবনের পরিণতিই তাহার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য দান করে।

এই সকল সন্ন্যাসী ও গৃহী সাধক ও ভক্তগণের মধ্যে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই সমগ্র জগতের বিস্ময়পূর্ণ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করিতেন, বিবেকানন্দ শিবস্বরূপ, মহাজ্ঞানী

ঋষিতুল্য, এক বিরাট শক্তিশালী মহাপুরুষ। তাই সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি বিবেকানন্দকেই তাঁহার সকল সাধন রহস্যের শ্রেষ্ঠ অধিকার দান করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

প্রদীপ হইতে প্রদীপে যেমন আলোকধারা চিরপ্রবহমান; শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির জ্যোতির ধারা ও আভা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন হইতে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানবগণের জীবনে প্রবহমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সাধনা ও শিক্ষা বিবেকানন্দের জীবনে কয়েকটি বিশেষ ভাবে রূপায়িত হইয়া সমগ্র জগতে এক অভিনব চেতনার সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়।

বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র জগতের মানব সমাজের-কল্যাণ কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ আদর্শ কর্ম্মযোগ। ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য সমগ্র জগৎকে ভুলিবার চেষ্টা অতি নিম্নস্তরের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পরিচয়।

সকল ধর্ম্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন উদার ও প্রেমিক মানুষই ভবিষ্যতে ধর্ম্মজগতে এক বিরাট সাম্য ও মৈত্রীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

ক্ষুধার্ত্ত ও পীড়িত মানুষকে ধর্ম্মশিক্ষাদান বাতুলতা মাত্র। সর্ব্বাগ্রে চাই ক্ষুধার অন্ন; শীত ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র এবং ব্যাধিগ্রস্তের উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা!

মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও ঘৃণাপূর্ণ অসম ব্যবহারই সমাজের সর্ব্ববিধ দুঃখ ও অশান্তির কারণ! তাই, সর্ব্বাগ্রে চাই, মনুষ্য সমাজের ভয়াবহ ছুঁৎমার্গের পরিহার—চাই মাতৃজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধন এবং সমাজে প্রেমপূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা!

দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই বিবেকানন্দ বলেন—ভারত যতদিন ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে, ততদিন জাগতিক কোন বিরুদ্ধ শক্তিই ভারতীয় সমাজ, ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিনাশ সাধনে সমর্থ হইবে না।

এই সকল গভীর ভাবপ্রবাহকে বিশ্বজন সমাজে প্রচারিত করিবার এবং জগতের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে, জগতের প্রকৃত ও স্থায়ী কল্যাণ সাধনের সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা লইয়াই বিবেকানন্দ আমেরিকার ধর্ম্মমহাসম্মেলনে যোগদান করেন।

সেই সম্মেলনের মহামণ্ডপতলে দণ্ডায়মান বিবেকানন্দ, বেদান্তের আত্মিক সাম্যের প্রেমপূর্ণ বাণী—সেই "ভ্রাতা ও ভগিনী" সম্বোধনেই সমাগত বিশ্বের নরনারীকে সম্মোহিত এবং পরমাত্মীয়ে পরিণত করেন।

ঐ মহাসভাতলেই বিবেকানন্দ তাঁহার সর্ব্বজনগ্রাহ্য সুমনোহর ভাষায়, ভারতীয় ধর্ম্মাদর্শকেই সমগ্র জগতের ধর্ম্মের জননী বলিয়া ঘোষণা করেন।

ঐ ধর্ম্মমহাসভাগৃহেই বিবেকানন্দ ভারতীয় ঋষির উদার বাক্যচ্ছন্দে ধর্ম্মসমন্বয়ের মহান্ ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেন—"অচিরেই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মের পতাকায় লিখিত হইবে একটি মাত্র বাণী—সংগ্রাম নয়, সহায়তা—ধ্বংস নয়, আত্মীয়করণ—দ্বন্দ্ব নয়, সমন্বয় সাধন ও শান্তি!!"

শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবের সেবা, মানুষ মাত্রকেই নারায়ণ রূপে দর্শন ও পূজার অভিনব বিশ্ববিপ্লবী শিক্ষাই নরেন্দ্রনাথের সাধক জীবনের চরম সার্থকতা দান করে। তাই, বিবেকানন্দ তাঁহার মহোজ্জ্বল সংক্ষিপ্ত জীবনের অবশেষে, সাশ্রুনয়নে, মানবের শ্রেষ্ঠ সেবক ও পূজকরূপে, অভিনব বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, —"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

(তৃতীয়)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনের সকল সাধনার শক্তিধারা যে অবিরাম চিরপ্রবাহমান, তাহা তাঁহাদের পরবর্ত্তী সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় জগৎবরেণ্য মানব ও কল্যাণব্রতীগণের জীবনে, বাক্যে, কর্ম্মে ও গ্রন্থাদিতেই সুস্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত হইয়াছে।

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ, ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে, স্বীয় মুখের অভ্রান্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন —"জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত প্রায়। তাহাতেই বা কি আসে যায়! আমি আগামী (১৫০০) পনেরোশত বৎসরের জন্য যথেষ্ট কর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিয়া গেলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় এবং উরোপের বিজয়মাল্যে ভূষিত হইয়া ভারতের বুকে ফিরিয়া আসিলে, ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গ তাঁহার ন্যায় বীর সন্ন্যাসী ও অসাধারণ বাগ্মীকে রাষ্ট্রীয় দলভুক্ত হইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

কিন্তু বীরধর্ম্মী বিবেকানন্দ, বৈদেশিক রাজসমীপে আবেদন-নিবেদনে রত, সেই দুর্ব্বলচিত্ত কংগ্রেসী দলে যোগদানের প্রস্তাব, দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি চাই, একটা মহাশক্তিশালী মানুষ তৈরী করার ধর্ম্মপ্রচার করতে।"

স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করেন নাই বটে; কিন্তু তিনি সমগ্র ভারতের বুকে যে অগ্নিময়ী জাগরণ-বাণী বিঘোষিত করেন, সেই অনন্ত জীবন্ত বাণীই আজ পর্য্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিকামী মাত্রকেই অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছে।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সর্ব্বপ্রথম বীর যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও সমসাময়িক সমগ্র ভারতের সর্ব্বজনমান্য চিন্তানায়ক, বিস্ময়কর রূপে অধুনা বিস্মৃত। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯১৩ খৃঃ ২৯শে এপ্রিলের "বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগের সঙ্গেই লিখিয়াছিলেন—"কেবল স্বামী বিবেকানন্দ নহেন, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও দক্ষিণেশ্বরের ঋষি ও তপস্বী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাপূর্ণ ধর্ম্মাদর্শ লাভ করিয়াছিলেন।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই মহান্। ইঁহারা ভবিষ্যতে চিরদিনই উচ্চশিক্ষিত ও চিন্তাশীল জনমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে শক্তিদান করিতে এবং আদর্শপন্থা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইবেন।"

বর্ত্তমান যুগের যোগীশ্রেষ্ঠ এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অগ্নিযুগের

সর্ব্বাধিনায়ক শ্রীঅরবিন্দ, ১৩১৬ সালের "কর্ম্মযোগিন্" মাসিকপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে পরম ভক্তিভরে এবং আনন্দোচ্ছল ভাবে যে কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারি সুস্পষ্ট ভাষায় নিবেদিত হইল।

"Ramkrishna Parama-Hansa is the epitome of the whole. He was the great Superconscious life, which alone can witness to the infinitude of the current that bears us all Oceanwards. He is the proof of the power behind us, and the future before us. So great a birth initiates great happenings."

"The going forth of Vivekananda, marked by the master, as the heroic soul destined to take the world between his two hands, and change it, was the first visible sign to the world that, India was awake, not only to Survive but to conquer,"

ইঁহাদেরই পরবর্ত্তী যুগে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অগ্নিযুগের শেষ উত্তরাধিকারী, মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপ হইতে লিখিয়াছিলেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে—আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। "নিবেদিতার" মত আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজি জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ, তাঁহাকে নিশ্চয়ই আমি গুরুপদে বরণ করিতাম।"

(চতুর্থ)

ভারতের মুক্তিকামী অক্লান্ত যোদ্ধৃবৃন্দের শেষ যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ নায়ক, বিশ্ববরেণ্য মহামানব মহাত্মা গান্ধি, বহুকালের বৈশিষ্ট্যহীন, ধনতান্ত্রিক গুজরাট প্রদেশের এক অতি বিস্ময়কর—মহামূল্য দান।

মহাত্মা গান্ধি আশৈশব ধনসম্পদের কোলে, সহজলভ্য সুখ-সম্ভোগে প্রতিপালিত। তথাপি চিরমাতৃভক্ত মহাত্মা গান্ধি বিদ্যার্জনে কোন দিনই অবহেলা করেন নাই এবং এই জ্ঞানের অন্বেষণ উপলক্ষেই তিনি ভারতীয় এবং ইউরোপীয় মহা-মনীষিদিগের চিন্তাধারার সহিত সুপরিচিত হন।

কিন্তু, স্বামী বিবেকানন্দের এবং মহাত্মা গান্ধির জীবনে ও কর্ম্মাদর্শে যেরূপ সুস্পষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, এরূপ আর কাহারও সঙ্গেই দৃষ্ট হয় না। মনে হয়, বিবেকানন্দের অসমাপ্ত জীবনের স্বপ্ন মহাত্মা গান্ধিকে প্রবলরূপেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং মহাত্মাজীই স্বামীজির কল্পিত আদর্শকে বাস্তব রূপদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ও মহাত্মা গান্ধির বিশ্বজনীন্ কর্ম্মধারার ও প্রাণস্পর্শী বাণীসমূহের বিস্তৃত আলোচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রমাণস্বরূপ কেবলমাত্র দুই চারিটি বিষয়েরই উল্লেখ করিব।

পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্বদেশ প্রেমের অশ্রুমাখা জীবন্ত ভাষায় একদিন বলিয়াছেন—"আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম।...এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইহাদের দারিদ্র্য ও যন্ত্রণা দূরীভূত না করিয়া, ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করা বৃথা। এই কারণেই, ভারতের দীন দরিদ্র জনসাধারণের মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই আমি আমেরিকায় যাইতেছি।"

"যে পর্য্যন্ত ভারতের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত ক্ষুধিতের মুখে অন্নদানই আমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইবে।"

মহাত্মা গান্ধির ১৯২০ ও ১৯২১ খৃঃ কথার ভিতর দিয়া স্বামীজির ঐ কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। "যে পর্য্যন্ত দেশে একটিও কর্ম্মহীন ও অন্নহীন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্রাম সুখ উপভোগে এবং উদরপূর্ণ ভোজ্য গ্রহণে লজ্জিত হওয়া উচিৎ।"

"রোগীর যন্ত্রণায়, ভগবান কবীরের শ্লোক গান করিয়া, শান্তনাদানের চেষ্টাকে আমি বৃথা বলিয়াই মনে করি।"

"বিশ্বের মানব কল্যাণের জন্য প্রাণদান করিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, ভারতবাসীকে আগে শিখিতে হইবে, কি উপায়ে নিজের জাতিকে বাঁচানো সম্ভব।"

সর্ব্ববিষয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দরিদ্র ভারতের, সুসংস্কৃত আদর্শশিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলিতে গিয়া, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতীয় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার বিস্তার একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বাগ্রে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করিতেই হইবে। কার্য্যকরী শিক্ষা এবং যে শিক্ষা ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়কে উন্নত করিয়া তুলিতে সমর্থ এবং দাসত্ব না করিয়াও যাহাতে মানুষ প্রচুর উপার্জনে ও দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয়ে সমর্থ হইতে পারে, এইরূপ শিক্ষাই আজ ভারতে বিশেষ প্রয়োজনীয়।"

১৯১৯ খৃঃ হইতে ১৯২২ খৃঃ পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী বৈদেশিক কল-কারখানার বিরুদ্ধে এবং ভারতে কুটীর শিল্পের (চরকা, তাঁত, প্রভৃতি) প্রচলনের জন্য প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন।

১৯২১ সালের জুন মাসে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি চাই না যে, আমার বাসগৃহের চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত হইবে, এবং জানালা সকলও আবদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়া আমার গৃহের সর্ব্বত্রই স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হউক, ইহাই আমার কামনা।"

"কিন্তু, বর্ত্তমান যুগে কলকারখানার প্রতি মানুষের উন্মত্ত আকর্ষণের আমি একান্ত বিরোধী। কলকারখানা মানুষকে ব্যক্তিগত শ্রমের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং কর্ম্মহীন করিয়া ফেলে। ইহার ফলে অধিকাংশ দরিদ্র মজুরকে মজুরীর ও খাদ্যের অভাবে অনাহার ভাবেই প্রাণ হারাইতে হয়। সুতরাং কলকারখানাকে মানুষের স্বাভাবিক মজুরীর অধিকারের সীমাকে অতিক্রম করিতে দেওয়া উচিৎ

নহে। অবশ্য, কলকারখানা থাকিবেই। মনুষ্যদেহের মত কলকারখানাও মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য।"

স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী উভয়েই ভারতের কোটি কোটি দরিদ্রের দুঃখে—গৃহকোণে আবদ্ধা অশিক্ষিতা দুর্দ্দশাগ্রস্তা মাতৃজাতির দুঃখে এবং ছুঁৎমার্গী উচ্চশ্রেণীর পীড়নে নিম্নশ্রেণীর অপাঙক্তেয়গণের দুঃখে, আজীবন অশ্রুবিসর্জন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের দুঃখ মোচনের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ছুঁৎমার্গ পরিত্যাগের জন্য উচ্চশ্রেণীর প্রতি কঠোরতম শাসনবাক্য উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন; মহাত্মা গান্ধীও সেই "Untouchability" দূর করিবার আশায়, ব্যাপকভাবেই সর্ব্বশ্রেণীর পঙ্ক্তি ভোজনের জন্য—অসবর্ণ বিবাহাদির প্রচলনের জন্য এবং ভারতের বিখ্যাত মন্দিরসকল সর্ব্বশ্রেণীর অবাধ প্রবেশের ও পূজার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, সারা ভারতব্যাপী প্রবল আন্দোলন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দরিদ্র দেশবাসীকে "নারায়ণ" আখ্যা দিয়াছিলেন এবং "নারায়ণ" জ্ঞানেই দরিদ্রের সেবার ও পূজার প্রচলন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া ঐ "দরিদ্র নারায়ণের" সেবা পূজা ও ছুঁৎমার্গ ধ্বংসের কাজ নীরবে অবিরাম গতিতেই চলিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী সেই "দরিদ্র-নারায়ণদিগকেই" "হরিজন" নামে অভিহিত করিয়া তাহাদের সঙ্গে ভাঙ্গিবস্তিতে বাস করিয়া, তাহাদের জীবনকে উন্নত করিবার চেষ্টায় আপন জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে মনে পড়ে, পরিব্রাজক বিবেকানন্দের এবং লবণ আন্দোলনে বিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযানকারী ও অল্পকাল পূর্ব্বের সাম্প্রদায়িক অত্যাচারে বিধ্বস্ত নোয়াখালী ভ্রমণকারী নগ্নপদ মুণ্ডিত-মস্তক, দীর্ঘ বংশদণ্ডধারী, অসাধারণ সহিষ্ণু, মানবপ্রেমী—মহাত্মা গান্ধীর গভীর সাদৃশ্য!

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া, মহান্ ঘোষণা বাণী দান করিয়াছিলেন,—"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতবাসী আমার প্রাণ।... বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ......।"

আজ পর্য্যন্ত ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ক্ষেত্রে বহু বীর স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে। তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই মুক্তিসংগ্রামে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু, একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই স্বামী বিবেকানন্দের "কটিবস্ত্র" ধারণের ইঙ্গিতের গভীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দেশে ও বিদেশে—সর্ব্বক্ষণে সর্ব্বাবস্থায় দরিদ্র ভারতের ঐ "কটিবস্ত্রের" সম্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র ভারতকে তাঁহার জীবনের অংশস্বরূপ মনে করিয়াই মহাত্মাজী চিরজীবন দরিদ্রের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ, দরিদ্রের উপযোগী আহার্য্য গ্রহণ এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীরেই সবরমতীতে ও সেবাগ্রামে বসবাস করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের দুইটি প্রবল বিবদমান জাতি—হিন্দু ও মুসলমান। এই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রেমের বন্ধন দৃঢ় ও স্থায়ী না হইলে ভারতের কল্যাণসাধন অসম্ভব বুঝিয়াই, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"আমাদের মাতৃভুমির পক্ষে হিন্দু ও ইস্লাম ধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইস্লামীয় দেহ—একমাত্র আশা। আমার মাতৃভুমি যেন ইস্লামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হন!"

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনেও এই হিন্দু ও মুসলমান জাতিদ্বয়ের মিলন সাধনের চেষ্টাই প্রবলতম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনের আগ্রহেই লণ্ডনের দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে, মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জাতির প্রতিনিধি রূপে, মুসলমান নেতা মওলানা সওকৎ আলীর হস্তে "শ্বেতপত্রে" স্বাক্ষর করিয়াও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

ঊনআশি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ তাপস, জগৎবরেণ্য মহামানব মহাত্মা গান্ধী, এই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনের ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার দুঃসাধ্য চেষ্টার ফলেই, ক্ষিপ্ত হিন্দু যুবকের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিয়া গেলেন। এই যুগপ্রবর্ত্তক ঋষির বুকের রক্ত-ঢালা মহাতপস্যার ফল কবে এই অন্ধকারপূর্ণ ভারতের বুকে, কল্যাণময় প্রভাত সূর্য্যের দীপ্তিতে প্রকাশিত হইবে, তাহা একমাত্র ভারতের ভাগ্যবিধাতাই জানেন।

ভদ্রাচলামের ক্যাম্প

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

(শিকার-কাহিনী)

আচমকা ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ খুলে দেখি একটি ছেলে আমাকে ঠেলছে। অভাবনীয় স্পর্দ্ধা, প্রায় রেগে উঠেছিলাম, কিন্তু ছেলেটার মুখ দেখে কিছু বলতে পারলাম না। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, চোখে জল, ভয়ে কথা পর্য্যন্ত জড়ান, বললে —"বাবাকে নিয়ে গেল"— সংক্ষিপ্তে ঐটুকু বলেই তার ভাষা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা যে কি তা ভাল করে বোঝবারও উপায় নেই—ছেলেটার মন একেবারে ওলোট পালট হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় জেরা করে খবর বার করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবু অনুমান আমাকে কারণের নাগালে পৌছিয়ে দিয়েছিল। ক্যাম্প খাট ছেড়ে উঠতে হল।

শীতকাল, সবে ভোর হতে আরম্ভ করেছে। তাঁবুর বাইরে জমাট কোয়াসা, লণ্ঠনের আলো দুই গজও চলে না। ছেলেটার হাতে টর্চ্চ দিয়ে বললাম,, "কল টিপে থাক, আমি বন্দুক নিয়ে এগুচ্ছি, তোর কোন ভয় নেই।"

ওদের আড্ডা আমার তাঁবু থেকে ত্রিশ গজের ভিতর। খানিকটা এগুতেই ছেলেটা আঁৎকে উঠল। আমিও যা দেখলাম তাতে রক্তহীম হয়ে আসার উপক্রম। আট দশ হাতের ভিতর দুটো চোখ টর্চ্চের আলো পড়ায় আগুনের মত জ্বলছে। বন্দুক তুলে টিপ করারও সাহস নেই, সামান্য নড়া চড়াতেই একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু পরেই চোখের আগুন নিভে গেল—বুঝলাম মুখ ঘুরেছে। এখন কি করা কর্ত্তব্য? মনে হল টর্চ্চটা আমার হাতেই থাকা ভাল—চলার পথে অভিজ্ঞতার উপদেশ দরকার হতে পারে। ভয়ঙ্কর জীবটি অন্ধকারের আড়াল নিয়ে যদি পিছন থেকে আক্রমণ করে তাহলে আমাদের মধ্যে একজনকে ওর সঙ্গে যেতে হবে। এইরূপ আচরণ কিছুই বিচিত্র নয়। বিচিত্র নয় কেন বলি, এইটিই হল আসল বুনিয়াদি চাল। এক হাতে রাইফেল এবং অপর হাতে টর্চ্চ নিয়ে এগুতে লাগলাম। মাঝে মাঝে চার ধারে আলো ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছি—চলন্ত আগুনের আতঙ্ক পিছু নিয়ে আছে কিনা। তখন একমাত্র চিন্তা কোন প্রকারে ছেলেটার আস্তানায় গিয়ে পৌছান। একটি পরিত্যক্ত খোড়ো ঘরে ওদের স্থান দিয়েছিলাম। বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছি, প্রায় নিশ্চিন্ত হবার আশা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে, এমনি সময় মনে হল, ঠিক আমার পিছনেই একটা কিছু ঘটে গেল। অকস্মাৎ অবর্ণনীয় ভয় আমাকে গ্রাস করে ফেলল, এমনই অবস্থা যে চলৎশক্তিরহিত। পিছন দিকে মুখ ফেরাবার সাহস ছিল না, তথাপি অনুমান চাক্ষুস হয়ে উঠেছে। সামনে এগুবার চেষ্টা করছি, পা চলে না, কেউ যেন লোহার শিকল দিয়ে মাটির সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মৃত্যুর ডাক শুনছি। এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম মনে পড়ে না। বাঁচার স্বাভাবিক ইচ্ছা কিভাবে সাহস যোগাড় করে নিচ্ছিল—হঠাৎ পিছন ফিরলাম,—ছেলেটা অন্তর্দ্ধান করেছে। বিভিন্ন দিকে আলো ফেলতে ফেলতে দেখলাম, ছেলেটার পা দুটো শোয়া অবস্থায় জমাট কোয়াসার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। টর্চ্চ আর বন্দুকের নল একত্র করতে করতে সব কিছুই অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে দিকে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই দিকে আলো ফেলে একরকম পিছু হেঁটেই ওদের আড্ডায় এসে পৌছলাম। তখনও আগুন পোয়াবার চুলী জ্বলছে। বেশী রাত পর্য্যন্তই খোস গল্প চলেছিল। দরজার কাছে গিয়ে দেখি ভিতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি আর ধাক্কার পর দরজা খুলল। ঘরের ভিতর আলো ফেলতে—চার জন মানুষই কিছু বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঘরে ঢোকবার পথেই পা পিছলে ছিল, মাটির উপর দেখলাম থোকা তাজা রক্ত।

ঘটনাটি গোড়া থেকে শুনলাম। শীতের রাতে মহুয়া একটু বেশী চড়ে গিয়েছিল। সকলেই বেহুঁস অবস্থায় শুতে যায়। ভোরের দিকে ঘুমের চাপ যখন ওদের পেড়ে ফেলে তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সকলে মিলে ওরা ছিল ছয় জন। বাপ বেটায় শুয়েছিল শেষের দিকে। টাটির বেড়া বন্ধই ছিল, কখন চেঁচাড়ি ফাঁক করে বাঘ ঘরে ঢোকে কেউ জানতে পারে নি। ছেলেটা জেগেছিল—বললে বাঘের ডাক শুনে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়। একটু পরেই দেখে টাটির দরজা ফাঁক করে বাঘ ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে—। বাইরের চুলীর আলো দরজার গর্ত্তের ভিতর দিয়ে ঘরে আসছিল, স্পষ্টই দেখেছিল। একটার পর একটা। মানুষ ডিঙ্গাতে, ভয় পেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে শুয়েছিল,—এর মধ্যে বাপকে ছুঁতে গিয়ে বোঝে জায়গাটা ফাঁকা। তখন কম্বল থেকে মুখ বার করে দেখে—বাপের মাথা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। এই সময় ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠে আমাদের ঠেলে তোলে—আমরা বাইরে আসতে সাহস পাই নি। ছেলেটাকেও আটকে রাখা গেল না, জোর করে একলা বেরিয়ে গেল। বিবরণ শেষ করে লোকটা থামল, একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করল না—ছেলেটার কি হোলো? বন্দুকের আশ্রয় দেখিয়ে, ওদের বার করার চেষ্টা করলাম না—কারণ সঙ্গে এলেও ঘন কোয়াসায় টর্চ্চের আলো বেকার। একলা ক্যাম্পে ফিরতে মন চাইছিল না। সকালের অপেক্ষায় বসে রইলাম।

ফরসা হতেই আমাদের তাঁবুতে গোলমাল উঠল। শিক্ষার্থী আর্দ্দালী

চা দিতে এসে আমাকে না পেয়ে চেঁচামেচি লাগিয়েছে। চিৎকার করে জানাতে হল, আমি এ দিকে আছি।

সকালের কাজ সব রইল পড়ে। জ্বলন্ত চোখ দুটো আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল, স্থির হতে পারছিলাম না। যেখানে দৃশ্যটি দেখেছিলাম—সেইখানে উপস্থিত হলাম। জায়গাটি একটি ছোট্ট নালার কাছে। পাড় বেশ উঁচু, কাছে না গেলে, নালার জল দেখা যায় না। দিনের আলো এবং খোলা মাঠ হলেও সন্তর্পণে এগুচ্ছিলাম। যে সব ব্যবহারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাতে সব সময় প্রস্তুত না থেকে উপায় নেই। পথ চলতে একটি বড় সড় উইএর ঢিপি পাওয়া গেল—উঠে পড়লাম ওর চূড়ার উপর। এইখান থেকে নালার অনেকটা দেখা যায়। খোঁজার বস্তু সহজেই পাওয়া গেল। একটু দূরে দাড়ী যুক্ত মোটা মানুষটি বালির উপর মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে।

লোকজন কাছেই ছিল, সাহসের অভাব বোধ করি নি। নিকটে এসে দেখলাম, মাথাটা দেহ থেকে প্রায় ঝুলিয়ে দিয়েছে।—মাথার কাছেই নরভুকের পায়ের দাগ, একটি ছোটখাট কুলোর পরিধি ঘিরেছে, লম্বাতেও অসাধারণ। বাঘ এত বড় হতে পারে চাক্ষুস প্রমাণ না পেলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

এইখানেই মানুষটাকে খাবার আয়োজন করেছিল। ভিজে মাটিতে বসার দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে। অস্বস্তিকর বিজলী বাতি কাছে আসার, উঠে দাঁড়ায়। তার পর পাড়ের উপর উঠে সন্দেহ গুঞ্জন করা দরকার হয়েছিল—একটু আমাদের দিকে আসতেই, আলো চোখে পড়ে। পরের ঘটনা ছেলেটাকে নিয়ে। হঠাৎ মুখ ঘোরাল কেন, জানতে সময় লাগল না—। এই জাতীয় আলোর সঙ্গে বিপদ জড়ান থাকে জেনে সোজা চলে গিয়েছিল আমাদের বিপরীত দিকে। চলার চিহ্ন অনুসরণ করে চলেছি, প্রায় ফারলং খানেক আসার পর দেখা গেল, হঠাৎ গতির পরিবর্ত্তন ঘটেছিল, —পলায়নের পরিবর্ত্তে আক্রমণের প্রয়াস বেড়ে ওঠে। যাবার সময় ধীরে সুস্থে এগিয়েছিল, ফিরবার পথে লাফের পর লাফ ব্যবহার করে একটু আগেই লাফ থামিয়ে দিয়েছিল, তার পর পিছন থেকে ছেলেটাকে নিয়ে যায়। এই রকম মারার প্রণালী ইতিপূর্ব্বে জানবার সুবিধা পাই নি। খুব নিঃশব্দে কাজ সারা হয়—হত জীবটিকে মাটিতে পড়তে দেয় নি। ঘাড় ধরে মানুষ সহ লাফ দিয়েছিল কিনা কে জানে। কেমন একটা ভৌতিক প্রভাব ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগল।

জন্তুটির কীর্ত্তি সম্বন্ধে নানা বর্ণনা অনেক দিন থেকেই শুনছিলাম। কাজের চাপে শিকারের সখকে বড় করে দেখতে পারিনি। শেষ পর্য্যন্ত মানুষ মারার খবর এমনই বেড়ে উঠতে লাগল যে, বাঘের পিছু নেওয়া আমার কর্ত্তব্যের এলাকায় এসে পৌঁছাল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, হরদম মানুষ উধাও হবার খবর পেয়েও নির্লিপ্ত থাকলে উপরওয়ালার কাছে জবাবদিহীর প্রশ্ন উঠে পড়ে।

এই গ্রামে কয়দিনের ভিতর চার জন মানুষকে নিল। আমার আশে পাশেই মওড়া জেনে, এই খানেই তাঁবু গাড়তে বলেছিলাম, ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল।

জায়গাটা তিন দিকে খোলা। একদিকে যেটুকু গাছ পালা আছে, তাকে জঙ্গল বলা চলে না। তলায় খাপছাড়া আসসেওড়ার ঝোপ —তার সঙ্গে কতকগুলি বাজে গাছ। যেটুকু জায়গা ঘিরে সবুজের কারবার তাও স্বল্পপরিধির ভিতর সমাপ্ত। ঝোপের পিছনেই গ্রাম। আমাদের দিক থেকে তাড়া খেলেই বাঘ গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়বে—আড়াল রেখে পালাবার ঐ একটি মাত্র পথ এবং পথের মাঝে কাহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেলে—শার্দ্দুল সুলভ আপ্যায়ন খুবই স্বাভাবিক। অপরদিকে গ্রামের ভিতর থেকে শিকার খুঁজে —বিরাট খোলামাঠের দিকে চলে আসবে। বিস্তৃত খালি জায়গায় ঝোপঝাপ নালা সবই আছে। আত্মগোপন করলে জানোয়ারটিকে আর পাওয়া যাবে না এবং এ তল্লাটও ছেড়ে পালাতে পারে।

শিকারের সম্ভাবনা জটিল হয়ে উঠতে লাগল। লোকেদের বললাম—পাঁচ ছয়টি মোষ চাই। বিপরীত দিকের গ্রাম থেকে নিয়ে আসতে হবে। সামনের বস্তিতে যাওয়া চলবে না, বাঘ নিশ্চয় কাছেই কোন বড় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

শিকারের জায়গা ছেড়ে উল্টো দিকে যাবার প্রস্তাব উঠতেই প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক লোক মোষ আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং আমার সমর্থনের অপেক্ষা না রেখে কর্তব্য পালনের জন্য আগুয়ান হয়ে পড়ল।

ঘুরে ফিরে রাত্রের ঘটনাই মাথায় পাক খাচ্ছিল। কাপড়ের ঘর, তার উপর নির্ব্বিঘ্ন প্রবেশ পথ ছেড়ে, মজবুৎ দেয়ালওয়ালা ঘরের দিকে গেল কেন। যে লোকটাকে ঘরের ভিতর মারল—সেও বাছাই করা মানুষ। রোগা মানুষগুলি বাদ দিতে সব কয়জনকে ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়েছিল, সর্ব্বোপরি ওস্তাদি প্যাঁচ, নিঃশব্দে কাজ হাঁসিল।

এরূপ একটি জীবের চাল চলন জানতে হলে গোয়েন্দাগিরী না করে উপায় নেই। কাজে নেমে পড়লাম, তাঁবুর পিছনে পায়ের দাগ খুঁজতে লাগলাম। কি সর্ব্বনাশ এইখানেই সে চার পাঁচবার টহল দিয়েছে—একবার পর্দ্দার কাছেও এসে দাঁড়িয়েছিল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সোজাই চলতে থাকে মহুয়াসেবীদের দিকে। "হাতের পাঁচ" ঐ দিকেই ঠিক ছিল। বাঘের চোখে দিব্য দৃষ্টি জড়ান থাকে —আধমাইল দূরের জিনিসে আহারের সম্বন্ধ থাকলে সামান্য নড়াতেই বুঝে নেয় আহার্য্যটি কোন জাতীয়। তাঁবুর কাছে টহল মারার প্রথার বিপদের সন্দেহ ঘনিয়ে ছিল, একবারও কোথাও বসে নি। গ্রামের আবহাওয়ায় সাদা কাপড়ের ঘর প্রথম খাপছাড়া, দ্বিতীয় বোধ হয় কোন সময় এই রকম ঘরের কাছে আসতে বিপদেও পড়ে থাকবে—কে বলতে পারে গুলির মারে আহত হয়েছিল কিনা। বাঘ পায়ের দাগ অনুসরণ করে খোড়ো ঘরের কাছে এসে পৌঁছালাম।

যা ভেবেছি ঠিক তাই ঘটেছিল, নরখাদক ঘরের ছায়ার অন্ধকারে

ঘুপটি মেরে বসেছিল—ভীড়ের বাইরে কাউকে একলা পাবার আশায়। যে সব জায়গায় বসে তাগ করেছিল সেই জায়গাগুলি—লেজের মৃদু দোলায় ঝাঁট দেবার মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ওৎপাতা বাঘের ধৈর্য্য মাপতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কারণ সীমাকে নাগালের মধ্যে পাবার উপায় নেই। প্রস্তুত আহার সুবিধামত পাবার জন্য কতক্ষণ বসে থেকেছে কে জানে। একলা কাউকে না পাওয়ায় দরজা বন্ধের পর আগুনের সামনে দিয়েই তিন চারবার ঘরটার চার ধারে ঘুরেছে—ঢোকার সহজ ফাঁক খোঁজার জন্য। কোন দিকে সুবিধা না করতে পেরে চুলীর আলোককে সাক্ষী রেখেই ঘরে ঢুকে পড়ে। এতটা কাহিনী মাটির কাছে জানা গেল। নরম বালি মাটির উপর সব কথাই লেখা ছিল। কারণ এখানকার বাসীন্দারা সকালেই গৃহত্যাগ করে, মানুষ এদিকে চলে নি।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, অতগুলি মানুষের গায়ে ছোঁয়া না লাগিয়ে কি ভাবে ঐ রকম মোটা মানুষকে শূন্যে ঝুলিয়েছিল ধারণা করা শক্ত। কিম্বা ছোঁয়া লাগলেও মহুয়ার রসগ্রাহীদের ভাবিয়েছিল, প্রিয়ার ছোঁয়া, আরো লাগুক। ভরা ঘুমের স্রোতে, সুরার সার কথা ভেসে আসা কিছুই বিচিত্র নয়।

যতই বাঘের আচরণের সঙ্গে ঘনিষ্টতা গাঢ় হতে লাগল, ততই আতঙ্কের ঘোর বাড়তে সুরু করে দিল। এখন ছেলেটাকে খুঁজে বের করা যায় কেমন করে? বিবেচনা করে দেখলাম ভীড় করে ছেলেটার কাছে যাওয়া উচিত হবে না। যেরকম ফাঁকা তাতে আমরা পৌছানর আগেই সরে গা ঢাকা দেবে, অথবা পালাবার সময় দেখতে পেলেও গুলির পাল্লার বাইরে থেকে যেতে পারে। একলা চুপি চুপি যেতে পারলেই ভাল হয় কিন্তু আহারে বসা বাঘের কাছে একলা যাবার সাহস ছিল না। আমার আর্দ্দালীকে সঙ্গে নিলাম। লোকটা এর আগে অনেকবার শিকারের গল্প করেছে—বন্দুক চালানতেও নাকি সিদ্ধহস্ত। এইরূপ আত্মপ্রশংসার যোগে প্রোমোসনের কোন দাবী ছিল না—সুতরাং আর্দ্দালীর সাহসকে অবিশ্বাস করার কারণ ঘটে নি। দোনলাটা ভরে নিয়ে আমার পিছনে আসতে বললাম।

বন্দুক ভরে তাঁবু থেকে ফিরে এসে বললে, "হুজুর মহিষগুলো এসে গিয়েছে—কয়েকটা এগিয়ে দিয়ে আমরা পিছনে থাকলেই ভাল হয়। এই বাঘটা একেবারে বজ্জাৎ জানোয়ার।

বাঘের নিন্দায় নতুন খবর না থাকলেও আর্দ্দালীর মনের অবস্থা কতকটা বুঝলাম। এইরূপ দোমনা লোক সঙ্গে নেওয়া উচিত হবে কিনা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বিপদ যদি কাছে এসে পড়ে তাহলে আর্দ্দালী আর আমার মাঝে দূরত্ব বেড়ে উঠবে। বিপদ দূরে থাকলে চেঁচামেচিতে কাছে ডেকে আনাও খুব সম্ভবপর। আর কেউ নেই, যার হাতে নিশ্চিন্ত মনে আগ্নেয় অস্ত্র তুলে দিতে পারি। গত্যন্তরে অনিচ্ছুক মানুষকেই সঙ্গে নিতে হল।

লোকবিরল বালি মাটির উপর দাগ সজাগ হয়ে আছে। বিপদের কেন্দ্রে আসতে রাইফেল ভরে নিলাম—দুই তিনটি বাড়তি কার্ত্তুজও বুক পকেটে রেখে দিলাম। আমার ক্যাম্পকে পিছনে ফেলে টানের দাগ, ঝোপের গা ঘেঁসে উত্তরমুখো চলেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে চলন্ত চিহ্ন মোড় ঘুরে যেতে পারে। চোখ কান হুঁসিয়ার রেখে একটার পর একটা পা ফেলছি। চলতে চলতে ছোট জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমরা ক্যাম্প ছেড়ে অনেকটা এসে পড়েছি। টানের দাগ তখনো দূরের দিকে আগুয়ান হয়ে আছে—আমার দৃষ্টি দাগের দিকে নিবদ্ধ—হঠাৎ আর্দ্দালী পিছন থেকে কাঁধছুঁলো, কানের কাছে এসে বললে "ঐ যে"।

চমকে উঠলাম, বুকের উপর কে যেন ভারী হাতুড়ী বসিয়ে দিল। দৃষ্টি দূরে চালাতে দেখলাম—একটি ছোট ঝোপের পাশে মানুষের মাথা বেরিয়ে আছে। বাঘ নিশ্চয় ঝোপের আড়ালে আহার চালিয়েছে। ঝোপের আশেপাশে একেবারে পরিষ্কার, কিন্তু হঠাৎ বেরিয়ে এলেও ভয় নেই। কিন্তু এতদূর থেকে নিশানা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কাছে গেলেও বিপদ বেড়ে ওঠে। আর্দ্দালীর উপদেশ অগ্রাহ্য করায় আপশোষ এসে গেল। দুজনমাত্র লোক, তার মধ্যে উভয়েই দোমনা হলে শিকার চলে না। একটু আগেই মোষের প্রস্তাবে যে ভাবে নির্লিপ্ততার দ্বারা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছি তাতে মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করারও সৎসাহস নেই। স্বোপার্জ্জিত বিপদকে বরণ করার জন্য এগুতে হল।

নিশানার প্রয়োজনীয় দূরত্বের কাছে আসতেই আর্দ্দালীকে বললাম, কাশতে। আদেশ অনুসারে সে গলা খাকরানি দিল, ঝোপের দিক থেকে কোন চঞ্চলতার লক্ষণ পাওয়া গেল না। মান বাঁচাতে প্রাণান্ত, —ভিতরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঠেলা মেরে আরো খানিকটা এগিয়ে দিল। ছেলেটা একই অবস্থায় পড়ে আছে। আর তো এগুন চলে না! রাইফেল তুলে নিজেই কাশলাম, তার সঙ্গে দুচারটে আবোল তাবোল কথাও বললাম, ঝোপ নড়ে না। সামনের দিকে মুখ রেখেই, আর্দ্দালীকে বললাম, দুচারটে নুড়ী বা ইটের টুকরা কুড়িয়ে নিয়ে এস, এইখান থেকে ঝোপের উপর ছুঁড়তে হবে। বাঘ বেরিয়ে পড়লেও ভয় নেই, চারধার ফাঁকা, তার উপর দুটো বন্দুক আছে, একটার গুলিতে পড়বেই। ইচ্ছা করেই আর্দ্দালীকে শিকারীর মাতব্বর স্থান দিতে হয়েছিল নিজের সাহস বাড়াবার জন্য।

আর্দ্দালী ঢিল খুঁজতে চলে গেল, আমি রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। দৃষ্টি এক জায়গায় ঠিক করে রেখেছি, সময় কেটে চলেছে। ক্রমান্বয় হাত ভেরে আসতে লাগল, আর্দ্দালী আর ফেরে না। ধৈর্য্য যথা সময় বিরক্তির নাগালে এসে পৌছাল—ভয় পর্য্যন্ত পিছিয়ে পড়েছে। সামনের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাবার উপায় নেই যে মুখ ঘুরিয়ে দেখব লোকটা গেল কোথায়। ঐরূপ অবস্থায় ধৈর্য্য গণ্ডির বাঁধন ছিঁড়লে মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে, আমার ক্ষেত্রেও যা স্বাভাবিক তাই ঘটল, বেপরোয়া হয়ে গেলাম একলাই এগুতে লাগলাম। সঙ্গে ৫০০ বোরের এক্সপ্রেস দোনলা ছিল, নির্ভরশীল অস্ত্র। একটা উপরি গুলি হাতে রেখে ঝোপের কাছেই, ছেলেটার পায়ের দিকে বালির উপর গুলি

চালালাম। একরাস বালি উড়ে গেল, বাঘ বার হল না। বন্দুকের আওয়াজ আর নিস্পন্দ ঝোপ সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফাঁকা নলটা ভরে নিয়ে এক পা দুপা করে ছেলেটার কাছে এসে পড়লাম, ব্যবধান কমতে কমতে ১৫।২০ হাতের মধ্যে এসে পড়ল। এইখান থেকে একই জায়গায় লক্ষ্য করে আবার গুলি চালালাম। বিকট আওয়াজের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধতাকে তোলপাড় করে দিল—তারপর সব চুপচাপ। নির্ভয়ে ঝোপের কাছে এসে পড়লাম। অপর পাশে গিয়ে দেখি বাঘ নেই এবং ছেলেটার বুক পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলেছে, ভীতিপ্রদ দৃশ্য। জমাট রক্তের উপর হঠাৎ লাফ মারার চিহ্ন রয়েছে, লাফের সময় পিছনের পা পিছলে গিয়েছিল—রক্তের সঙ্গে খানিকটা মাটিও উপড়ে গিয়েছে। নিশ্চয় আমাদের বহুদূর থেকেই দেখেছিল।

এখান থেকে আমাদের আস্তানা মাইল খানেকের উপর হবে। শিকারের যেটুকু অভিজ্ঞতা ছিল তাতে ঠিক জানতাম, বাঘ আর এ মুল্লুকে নেই। তবে বাকি অংশ খাবার জন্য সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসতে পারে। এই দিক দিয়ে হাটের পথ, একটু পরেই লোক চলাচল সুরু হবে। সুতরাং দিনের বেলা বাঘ ফিরছে না।

ছেলেটার যেটুকু অংশ পড়ে আছে তাই শিকারের সম্বল। মড়া আগলাতে হলে কয়েকজন লোকের দরকার, আর্দ্দালীটা ফিরলে বাঁচি—তাঁবুতে খবর পাঠান চলে। মড়ার কাছে লোক না থাকলে এখুনি শকুনীতে খেয়ে ফেলে দেবে। এরই ভিতর মাথার উপর কয়েকটা উড়তে আরম্ভ করেছে।

শব আগলে দাঁড়িয়ে রইলাম, আর্দ্দালী আর ফিরল না। কপালগুণে হাট-মুখো কয়েকজন চাষাকে দেখলাম আমার দিকেই চলে আসছে—কাছে আসতে গোড়াতেই বেশ জোর দিয়ে হুকুম দিলাম, "মড়ার পাহারায় থাক"—এই রকম হুকুম চালান আমার পেশার অন্তর্ভূত। অভ্যস্ত থাকায় দয়ার বস্তুকে দাবীর পর্য্যায় টেনে আনতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি। বন্দুক হাতে অফিসার ব্যক্তির আদেশ বিনা আপত্তিতে পালিত হল। একজন সাহস করে জিজ্ঞাসা করেছিল—"বাঘ যদি আসে?" অর্থাৎ তখন পালাতে পারব তো? উত্তরে কোন কথা বলিনি, কেবল লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম—যার মানে দাঁড়ায় এ রকম আদেশ তো দিই নি। দৃষ্টির শাসনে লোকটা এমন ভাবেই বশীভূত হয়ে গেল যে ওদের জিম্মায় শিকারের টোপ রেখে আসতে কোন প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা মনে এল না।

ক্যাম্পে ফিরে দেখি আর্দ্দালী পরম মনোযোগ সহকারে আসবাব-পত্র ঝাড়-পোঁচ করছে। কোন প্রশ্ন করবার আগেই সে বলে বসল, বালির দেশে কোথাও ঢিল পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে এদিকে এসে পড়েছিলাম, কাজগুলো পড়েছিল সেরে ফেলছি। প্রভুভক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য্য, এই লোকটার উপর নির্ভর করেই নরখাদক বাঘ মারতে গিয়েছিলাম। প্রাণ গঙ্গান ব্যবহারে যে সব ইচ্ছা ভিতরে কড়া হয়ে উঠেছিল তা ফাণ্ডামেণ্টাল রুলসের (Fundamental rules) গুঁতোয় চাপা তো দিলামই, অধিকন্তু স্বরকে মোলায়েম করে জানাতে হল—যা করেছ খুবই ভাল কাজ, এখন কতকগুলি লোক মড়া আগলাবার জন্য পাঠিয়ে দাও—গ্রামের মানুষগুলি রেহাই পাক।

উত্তেজনার সংঘর্ষণে দিবা-নিদ্রা কাজে এল না। সময়ের আগেই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলাম। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

(ঘটনাটি বন্ধুবর ম্যাক্, জি, সি, ট্যাম্পোর (আই, সি, এস,) কাছে শোনা)

পরিচয়

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ্র এম-এ, বি-এল্

শুধাবোনা তব পরিচয়!
মাটীর ধরণী 'পরে মানুষের ঘরণী পায় ভয়—
ঠেলে আসে তাই কুণ্ঠা ও দ্বিধা,
থান্ থান্ করে ভেঙ্গে পড়ে বালির বসুধা!
হেথা প্রেম কোথা?
কোথা অগ্নি-রেখা : কোথা ব্যাকুলতা?

কোথা অশ্রু লোনা :
কোথা পাথীর পালকে শবরীর সোনা!
যারা আসে চারিপাশে
সরম জড়িত চঞ্চল-চরণে, প্রথম প্রণয়-ত্রাসে—
হাতে লয়ে অভিসার-ফুল
তাদেরও নয়নে দেখি পঙ্কজের ভুল!
আঁখির আগেতে জাগে পদ্মার দুইকুল
মাঝে বহে খর-স্রোতা নাহি যার তুল্!
তারপর সুপ্ত রহে শুধু বালুচর
অঞ্চলে জড়ায়ে সোনা
প্রেম-হীন : ধূলায়-ধূসর—
মনের গহনে প্রেমিকারা তবু করে আনাগোনা!
তাই বলি
কারা করে কানাকানি—কারা যায় পথ চলি :
আপন গরবে গরবিণী—
বাজাইয়া কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
চৈত্র-রাত্রির বিষণ্ণ নাগিনী!
আকাশের অন্তহীন তারালোক বেয়ে
তুমি যবে নেবে মোরে চেয়ে
সেই দিন শুধাইব পরিচয়—
চোখে চোখে, মুখে শুধু নয়!

কংগ্রেসের পূর্বের রাজনৈতিক আন্দোলন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে ক্লাইভ ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করলেও, প্রকৃতপক্ষে এদেশে ইংরাজের শাসন প্রবর্তন করেন, ওয়ারেন হেষ্টিংস। পলাশীর যুদ্ধের ১৫ বছর পরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস এদেশের সর্বপ্রথম গবর্ণর হয়ে আসেন। হেষ্টিংস ভারতে ইংরাজের শাসন ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে অনুভব করেন যে, ভারতীয়দের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে শাসন কার্য পরিচালনা সহজতর হবে। তাই তিনি এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে মন দিয়েছিলেন। তাছাড়া সেই সময় এদেশের লোকেও ইংরাজী শিখতে পারলে রাজপুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে এবং সরকারী চাকরী মিলবে এই ভেবেও ইংরাজী শিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতে ইংরাজ অধিকৃত সমস্ত অংশেরই রাজধানী। এই রাজধানীতেই সর্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় বাঙ্গালীরাই সবার আগে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। এই সব ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যেই প্রথম দেশের উন্নতিমূলক চিন্তাধারা এবং বিশেষ ভাবে রাজনীতিক বোধ জাগ্রত হয়েছিল এবং দিনে দিনে সেসব পুষ্টিলাভ করেছিল। এঁরা একত্র মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্র[illegible] সভা-সমিতি ও সংঘের প্রতিষ্ঠা কর[illegible] এবং সেখানে দেশের উন্নতি সম্বন্ধে নানা বি[illegible] সঙ্গে রাজনীতিরও আলোচনা করতেন। এই-[illegible] ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীরাই শুধু বহুদিন পর্যন্ত অবিসংবাদিতভাবে ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত ভারতের নেতৃত্ব করেছিলেন।

দেশের যাবতীয় প্রগতিশীল ভাবধারায় বাঙ্গালীর এই যে নেতৃত্ব, এর আদিগুরু হলেন—রাজা রামমোহন রায়। রাজা নিজে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে একজন প্রধান অগ্রণী ছিলেন। তিনি শুধু হিন্দুর তৎকালপ্রচলিত ধর্মেরই সংস্কার করেন নি, অধিকন্তু হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থারও বহু সংস্কার করেছিলেন এবং দেশের রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্র দলনের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচক এক আইন করতে কৃতসংকল্প হন। এজন্য গবর্ণমেণ্ট সেই সময়কার নিয়ম অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টে আইনের খশড়া পেশ করেন। গবর্ণমেণ্টের এই খশড়া পেশের দুদিন পরেই ১৭ই মার্চ তারিখে এর প্রতিবাদে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজনের সহিসহ আদালতে এক দরখাস্ত করেছিলেন এবং বিলাতে সপারিষদ রাজার নিকটেও এক স্মারকলিপি প্রেরণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রের এই ক্ষমতা সংকোচক ব্যবস্থা বাতিল করবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে, এর প্রতিবাদে রাজা রামমোহন রায় তাঁর "মীরাৎ-উল-আকবর" নামক ফারসী পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সার চার্লস মেটকাফ বড়লাট হয়ে পুনরায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচক আইনের পূর্বে সভা-সমিতি সম্বন্ধেও একবার সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়েছিল। সেটা ছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন রাজা রামমোহন রায় তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং, দ্বারকানাথের দুইজন আত্মীয়ের স্বাক্ষরসহ এই সরকারী নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদেও সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের স্বাধীনতাপ্রীতি এত প্রবল ছিল যে, পৃথিবীর কোনও রাজ্য তার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে, এই সংবাদ শুনলেই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার ল্যাটিন রাজ্যগুলো স্পেনের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করেছে, এই সংবাদ শুনেই তিনি একটা বৃহৎ ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিলাত গমনকালে রাজা রামমোহন রায় এক ফরাসী জাহাজের মাস্তুলশীর্ষে অবস্থিত ফরাসী গণতন্ত্রের পতাকা অভিবাদন করতে গিয়ে, ভাবাবেগে অনবধানতাবশতঃ প'ড়ে গিয়েছিলেন [illegible] পায়ের গ্রন্থি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই ঘটনাটা থেকেই অতি সহজেই বুঝা যায় যে, রাজা রামমোহন রায়ের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কিরূপ তীব্র ছিল।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজনে মিলে "ভূম্যধিকারী সভা" নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার সদস্যপদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সভার অনুষ্ঠানপত্রে বলা হয়েছিল যে, দেশের ভূমিতে স্বার্থ থাকাই এই সভার সদস্য হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা।

এই "ভূম্যধিকারী সভা" যদিও পুরাপুরিভাবে রাষ্ট্রিক সভা ছিল না। তা'হলেও সঙ্কীর্ণ অর্থে বলতে গেলে এই ভূম্যধিকারী সভাকেই প্রথম রাষ্ট্রিক সভা বলা যেতে পারে।

দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেশাত্মবোধও জাগ্রত হতে থাকে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে প্রভৃতি মিলিত হয়ে "জ্ঞানার্জন সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, সকল প্রকার জ্ঞান অর্জনে পরস্পরের সহায়তা এবং পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন। এই সভায় রাজনীতিরও চর্চা হ'ত। এই সভায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতিও বক্তৃতা দিতেন।

এইভাবে বাঙলার ইংরাজীশিক্ষিত যুবকরা যখন নিজেদের দেশের

রাজনীতি চর্চা করছিলেন, ঠিক সেই সময় জর্জ টমশন্ নামে একজন ইংরাজ বিলাতেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। তিনি ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রতি বিলাতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্যই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এজন্য টমশন্ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" নামে এক সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। টমশন ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করতে আরম্ভ করলে, বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্র তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে থাকে। তখন তিনি নিজ মত প্রচারের জন্য "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাডভোকেট্" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বা'র করেন।

টমশন্ যখন এইভাবে তাঁর স্বদেশবাসীদের ভারতের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে যান। দ্বারকানাথ টমশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাঁকে ভারতে এসে স্বচক্ষে ভারতের অবস্থা দেখে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। দ্বারকানাথের এই আহ্বানে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে টমশন্ দ্বারকানাথের সঙ্গে ভারতে আসেন।

টমশন্ সাহেব ভারতে এলে, তাঁর আসার আগেই যে সব ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গলায় রাজনীতির চর্চা করছিলেন, তাঁরা সকলেই এসে টমশনের সঙ্গে মিলিত হলেন। এই সব দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে টমশন্ "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, এই সমিতির উদ্দেশ্য হবে সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের কল্যাণ সাধন করা এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্প্রসারণের জন্য শান্তিপূর্ণ ও আইন-সঙ্গত ভাবে চেষ্টা করা। এই কারণেই টমশনের এই "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"কেই প্রকৃত পক্ষে প্রথম রাষ্ট্রিক সভা বলা যেতে পারে।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটা আইন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এর মধ্যে একটা আইনে ছিল—কোন ইংরাজ মফঃস্বলে অপরাধ করলেও তার বিচার হবে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে। এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এতে প্রতিবাদ জানান এবং বলেন যে, যে অঞ্চলে অপরাধ করবে, সেই এলাকাতেই ইংরাজ আসামীরও বিচার হবে। রামগোপাল ঘোষ এই আইনের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে একটা পুস্তিকাও লিখেছিলেন। ইংরাজরা রামগোপালকে এই আন্দোলনের নেতা জেনে তাঁকে "এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি"র সহকারী-সভাপতির পদ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। এদেশের ইংরাজরাও তাঁদের সমর্থনে বেশ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ইংরাজদের এই প্রচেষ্টাকে সংঘবদ্ধভাবে বাধা দেবার জন্যই ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" ও "ভূম্যধিকারী সংঘ" একত্র মিলিত হয় এবং এর নাম হয়—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন। এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনই সেই সময়ে এদেশের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল এবং এর মারফৎই রাজনৈতিক মতবাদ ধ্বনিত হ'ত।

এরপরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রিক অভ্যুত্থান হয় সিপাহী বিদ্রোহে। ইংরাজের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার জন্য এবং ইংরাজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করবার জন্য এই বিদ্রোহ হয়েছিল। এই সিপাহী বিদ্রোহই হ'ল ইংরাজ শাসন আমলে এদেশে সর্বপ্রথম ব্যাপক আন্দোলন এবং প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, হিন্দু ও মুসলমান একত্র মিলিত হয়ে এই প্রথম ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা ক'রে সংগ্রাম সুরু করেছিল। পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকী উদযাপনকে উপলক্ষ্য ক'রে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন সিপাহীরা ভারতের সর্বত্রই একই দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, এই স্থির করে ছিল। কিন্তু মার্চ মাসেই একদিন বাঙ্গলায় ব্যারাকপুরে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়। এর পরই এই বিদ্রোহ দাবানলের ন্যায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংগ্রামের প্রধান নায়ক ছিলেন—নানাসাহেব। কানপুরের তাঁতিয়াটোপী, ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের রাজা কুমার সিং প্রভৃতিও এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। সিপাহীদের পরাজয় হ'লে তাদের মূল অধিনায়ক বাহাদুর শাহকে বিজয়ী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নির্বাসিত করল এবং তাঁতিয়াটোপীর ফাঁসি দিল। নানাসাহেব নিখোঁজ হয়েছিলেন এবং রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে যাবার পর বিলাতের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্থির করে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এতবড় ভারত সাম্রাজ্য শাসনের ভার আর রাখা উচিত নয়। তাই এবার ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শেষ ক'রে, ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শাসন ভার গ্রহণ করে এক ঘোষণায় বলেছিলেন যে—প্রজার ধর্মমতে হস্তক্ষেপ করা হবে না। প্রজার উন্নতি ও সন্তোষই আমাদের শাসনের পুরস্কার ব'লে বিবেচিত হবে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণায় ভারতের জনসাধারণ অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হচ্ছে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীল-আন্দোলন। নীলকর ইংরাজরা বাঙ্গলায় চাষীদের দিয়ে নীল উৎপাদন করাত। নীলকর সাহেবরা "রাজার জাত" বলে তারা প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে নীল চাষ করাত এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে চাষীদের কাছ থেকে নীল কিনত। যে সব চাষী দাদন নিয়ে নীলের চাষ না করত নীলকর সাহেবদের নিজেদের যে বিচারালয় ছিল, তারা নিজেরাই তাতে চাষীদের বিচার ক'রে শাস্তি দিত। এই সব নীলকর সাহেবদের অত্যাচার চরমে উঠলে, এর প্রতিবাদে বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করে। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে

থাকেন। দীনবন্ধু মিত্র সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে "নীল-দর্পণ" নামে একখানা নাটক লেখেন। নদীয়া জেলার চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামক দু' ভাইএ কৃষকদের একত্রিত ক'রে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনে নীলচাষ বন্ধ হইয়াছে। এই নীল আন্দোলনকেই প্রকৃতপক্ষে এদেশের প্রথম গণ-আন্দোলন বলা যেতে পারে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে "গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা" নামে এক সভা স্থাপন করেন। রাজনারায়ণবাবু ছিলেন মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল রাজনারায়ণ বাবুর এই সভার উদ্দেশ্য।

শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করার যে চেষ্টা রাজনারায়ণ-বাবু তাঁর গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার মারফৎ করতে চেষ্টা করেন, তা ব্যাপকতর রূপ নেয় "হিন্দু মেলা"র মধ্য দিয়ে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "নেশন্যাল পেপার" প্রতিষ্ঠা করেন। দেবেন্দ্রনাথ এই কাগজ সম্পাদনার ভার দেন, নবগোপাল মিত্রের উপর। এই "নেশন্যাল পেপারে" রাজনারায়ণ বাবুর গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশিত হ'লে নবগোপাল মিত্র এই অনুষ্ঠানপত্র পড়ে একটা জাতীয় মেলা স্থাপন করার মনস্থ করেন। নবগোপাল মিত্রের এই কাজে প্রথম থেকেই তাঁর সহকারী হন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২৭৩ বঙ্গাব্দের (১৮৬৭ খ্রী:) চৈত্র সংক্রান্তিতে এই জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথম তিন বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব'লে, এই মেলার নাম হয়েছিল "চৈত্র মেলা।" পরে এই মেলা "হিন্দু মেলা" নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল। প্রথম অধিবেশন অতি অল্প লোক নিয়ে এবং আড়ম্বরহীন ভাবেই সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় মেলার কাজ আরম্ভ হয়। প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গাওয়া হবে ব'লে একটা জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সে গানটা হ'ল—

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান। ইত্যাদি

এছাড়া মেলার এই অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লজ্জায় ভারত যশ গাই কি করে" এই গানটিও গাওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন—আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নয়, কোন বিষয় সুখের জন্যও নয় বা আমোদ প্রমোদের জন্যও নয়। এ স্বদেশের জন্য—এ ভারতভূমির জন্য, স্বদেশের হিতসাধনের জন্য। পরের সাহায্য না চেয়ে যাতে আমরা নিজেরাই তা সাধন করতে পারি, তাই হ'ল মেলার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই জাতীয় মেলার ৪র্থ অধিবেশন থেকে চৈত্র-সংক্রান্তির পরিবর্তে মাঘ-সংক্রান্তি অথবা এর পরবর্তী দিনে মেলা হতে থাকে।

পরে দ্বাদশ অধিবেশন থেকে আবার মাঘ-সংক্রান্তির পরিবর্তে সরস্বতী পূজার সময় মেলা হ'ত। নেশন্যাল সোসাইটি বা "জাতীয় সভা" এই জাতীয় মেলার একটা অঙ্গ ছিল, মেলার অনুষ্ঠান হত বছরে একবার। মেলার আদর্শ সামনে রেখে সারা বছর ধ'রে যাতে স্বদেশের উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়, সেজন্য জাতীয় সভার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ প্রতি মাসে এই সভার একটা ক'রে অধিবেশন হত। জাতীয় মেলার ৪র্থ অধিবেশনের পর থেকে এই জাতীয় সভার সৃষ্টি হয়।

দেশে জাতীয় ভাব প্রচারের কাজে হিন্দু মেলার দান অপরিসীম। এই মেলা তখন দেশে জাতীয় ভাবের যেন এক প্রবল বন্যা এনে দিয়েছিল। তার ফলেই "ইণ্ডিয়ান লীগ" ও "ভারত সভার" প্রতিষ্ঠা, রঙ্গমঞ্চে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকাদির অভিনয়, জাতীয় ভাবোদ্দীপক সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত রচনা প্রভৃতি সম্ভব হয়েছিল।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ এবং "রেইস এণ্ড রায়ৎ" পত্রের সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে "ইণ্ডিয়ান লীগের" প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইণ্ডিয়ান লীগের সম্পাদক ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ। শিশির-কুমারের পরিচালনায় ইণ্ডিয়ান লীগ রাজনীতিক কার্যে অনেক সাহায্য করেছিল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ-মোহন বসু ও মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভারতসভা এত বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে তার ফলে ইণ্ডিয়ান লীগ উঠে গিয়েছিল। আনন্দমোহন বসু "ভারতসভা" স্থাপনের আগের বছর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন বা ছাত্রসভা নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ছাত্রসভাই হ'ল এদেশে ছাত্র আন্দোলনের প্রথম আরম্ভ।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড রিপণের চেষ্টায় ফৌজদারী আইনের সংশোধক "ইলবার্ট বিল" প্রকাশিত হয়। এই আইনে দেশীয় বিচারকগণ ইউরোপীয় আসামীদেরও বিচার করতে পারবে বলা হয়। এই বিল প্রকাশিত হ'লে ইংরাজরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং এর প্রতিবাদ করে। অপরদিকে ভারতীয়রাও এই বিলের সমর্থনে আন্দোলন চালায়। এই নিয়ে দেশে তখন এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন লালমোহন ঘোষ।

এই সময় দেশের নেতৃবৃন্দ বেশ বুঝতে পারেন যে, ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়তে হ'লে সর্বভারতীয় আন্দোলন আবশ্যক। তাই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বছরই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে এক সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবৃন্দকে আহ্বান করা হয়েছিল। এই সময় ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কয়েকটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল। "ন্যাশন্যাল কনফারেন্সে" সেই সব প্রতিষ্ঠানেরও অনেকে যোগ দিয়েছিল। সুরেন্দ্র-নাথের এই ন্যাশনাল কনফারেন্সই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলন।

পর বৎসর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক কাজেই উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ ক'রে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। এবছর আর ন্যাশনাল কনফারেন্স হ'ল না। পরের বছর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর কলকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল।

কলকাতায় যখন ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন চলছিল ঠিক সেই সময় বোম্বাইএ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়।

এই কংগ্রেস সুদীর্ঘকাল ধরে দুশ্চর তপস্যার মধ্য দিয়ে আজ ভারতের স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হয়েছে। প্রাক্-কংগ্রেস যুগের এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্দোলনের ফলেই সেদিন কংগ্রেসের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। তাই কংগ্রেসের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের ন্যায় এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের আন্দোলন কাহিনীও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

দ্বারমঙ্গল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(এক)

নিশীথ রাত্রি।

পল্লীগ্রামে বিংশশতাব্দীর চতুর্থদশকে ঘড়ি নাই এমন নয়; শিবকালীপুরের জগন ডাক্তারের একটা পকেট ঘড়ি আছে, হরেন ঘোষালের একটা রিষ্ট ওয়াচ আছে, বর্ত্তমান পত্তনীদার শ্রীহরি ঘোষের বাড়ীতে ক্লক আছে, চেন-ঘড়িও আছে; কিন্তু তবুও সকলকে রাত্রি আন্দাজ করিয়া বাহির হইতে হইল। ডাক্তারের ঘড়িটা সময় ঠিক রাখে না, মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, ডাক্তার রেস্‌পিরেশন দেখিবার সময় বার দুই নাড়া দিয়া ঘড়িটাকে চালু করিয়া রোগীর বুকের উপর রাখিয়া দেয়—তাহাতেই কাজ চলিয়া যায়; আজ ডাক্তারের ঘড়িটা আটটা বাজিয়াই বন্ধ হইয়া আছে। ঘোষালের ঘড়িটা চলে না, চালাইলে এমনই চলে যে সন্ধ্যা ছয়টায় রাত্রি বারোটা বাজিয়া ছুটিয়া চলে। শ্রীহরি ঘোষের বাড়ীতে ঘড়ি দেখিতে কে যাইবে, বাড়ীর দরজায় আজকাল একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান বন্দুক লইয়া পাহারা দেয়।

আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের বাঁকানো দাঁড়াটা ঠিক মধ্য আকাশের দিকে প্রসারিত। পূর্ব্বদিগন্তে ময়ূরাক্ষীর বাঁধের জঙ্গলটার মাথায় আকাশ লালচে হইয়া উঠিয়াছে। নীচে দিগন্তে কৃষ্ণা একাদশীর চাঁদ উঠিতেছে। এগার দুইগুণে বাইশ দণ্ড রাত্রি পার হইতেছে, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পার হইয়া তৃতীয় প্রহরের দরজায় টোকা মারিতেছে। আকাশের দিকে তাকাইয়া নলিন বৈরাগী দেখিল—আকাশে নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ছায়াপথে জ্যোৎস্নার আমেজ ধরিয়া চলিয়াছে ঠিক বন্যার জলের আগে আগে সঞ্চরমান মাটি-ভিজানো জলের রেশের মত। পূর্ব্বদিকে তারাফুলের ক্ষেত জ্যোৎস্নার বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে—অল্প কতকগুলি তারা জাগিয়া আছে—বড় গাছের মাথার ফুলের মত। নলিন ছবি আঁকে, পুতুল গড়ে, প্রতিমা তৈয়ারী করে। সে মুগ্ধ হইয়া আকাশে এই জ্যোৎস্না-সঞ্চারের খেলা দেখিতেছিল। জগন ডাক্তার তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—হাঁ ক'রে আকাশপানে তাকিয়ে আছে দেখ। চল, আলো নে।

দশ বারো জন বাহির হইল। জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল, রামনারাণ ঘোষ প্রভৃতি মাতব্বর জন আষ্টেক ও তাহাদের সঙ্গে নলিন এবং সতীশ বাউড়ীও চলিয়াছে—তাহাদের হাতে দুইটা হ্যারিকেন। হরেনের কাছে দুর্ব্বল ব্যাটারীর একটা টর্চও আছে। গ্রামপ্রান্তে তাহারা মাঠে আসিয়া নামিল।

পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠ। পূর্ব্বদিকে দেখুড়িয়া, তারপর মহাগ্রাম; মহাগ্রামের পর শিবকালীপুর। এদিকে ওই কুসুমপুর তার ওদিকে কঙ্কনা। সম্মুখে মাইলখানেক দূরে ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ। বাঁধের উপরে ঘন গাছের সারি, কালো উঁচু পাঁচীলের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে গাছগুলির মাথায় চাঁদের আলোর লালচে ছটা বাজিয়াছে। দক্ষিণ দিকে গাছগুলির মাথায় উর্দ্ধলোকে সাদা আলো ভাসিতেছে। জংসন ষ্টেশনের ইয়ার্ডে কেরোসিন গ্যাসের উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। জংসন দ্বারমণ্ডল। লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া বলিয়া থাকে—জংসন।

কার্ত্তিক মাসের পাঁচ তারিখ। আজ কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, আগামী অমাবস্যায় কালীপূজা। বাঁধের গাছের বেড়ের মাথা ছাড়াইয়া চাঁদ এখনও উপরে উঠে নাই। পঞ্চগ্রামের মাঠ এখনও অন্ধকার। মাঠে মাঠভরা ধান। আলো হাতে দলটি মাঠে নামিল, দুপাশের কোমর পর্য্যন্ত উঁচু ধানের মধ্যবর্ত্তী আল-পথ—আলোর শিখা ধানের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল। ওদিকে মহাগ্রামের সামনেও মাঠের মধ্যে আলোর ছটা, দেখুড়িয়া হইতেও আলো বাহির হইয়া আসিল। ধানের আড়ালে শিখা-ঢাকা

হ্যারিকেনের আলোর আভাস উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। আলোর সঙ্গে চলন্ত মানুষগুলিকে ছায়ামূর্ত্তির মত মনে হইতেছে। গ্রামগুলি হইতে সারি সারি ছায়ামূর্ত্তি চলিয়াছে। সব চলিয়াছে একমুখে—ওই পাঁচ ভাইয়ের বাঁধ অর্থাৎ বন্যারোধী বাঁধের অভিমুখে।

বাঁধটার উপর তাল, শিমূল, শিশু, শিরীষ, অর্জ্জুন, বেল, বাবলা প্রভৃতি গাছের ঘন সন্নিবেশ; দুইপাশে বাঁধের কোলে কোলে ঘন শরজঙ্গল। শিমূল গাছটার মাথা সকল গাছকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

হরেন ঘোষাল চিরকালের চীৎকার-ঝঙ্কার-করা মানুষ। মাঠে পড়িয়াই সে ভূতপ্রেত স্তোত্র আরম্ভ করিল। এখানকার দেশপ্রচলিত ভূতপ্রেতের স্তোত্র; কবে কোন গ্রাম্য অর্দ্ধ-সংস্কৃত-জানা পণ্ডিত রচনা করিয়াছিল—কে জানে।

> ব্রহ্মপ্রেত বিল্ববৃক্ষে খ্যাওড়া গুল্মেচ প্রেতিনী
> নৃত্যতি শাল্মলীশীর্ষে শাঁকচুন্নী ভয়ঙ্করী
> ঝুল্যমান শিংশপায়াং কণ্ঠে রজ্জু গলায় দড়ে,
> ডাকিন্যঃ ধাবন্তি মঠে—মুখে অগ্নি ধ্বকং ধ্বকং।
> নমো অগ্রে ব্রহ্মপ্রেতং ॥

জগন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—ঘোষাল, এত বয়স হল তবু ছেলেমানুষী গেল না তোমার? ছিঃ!

হরেন হাতের টর্চটা শিমূল গাছের মাথার দিকে ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল—ছেলেমানুষী? ছেলেমানুষী হ'ল? ভূত নাই? বিশ্বাস কর না তুমি? রাত্রে একলা হাঁটতে পার ওই বাঁধের ওপর দিয়ে? বাঁধ তো বাঁধ, দুর্গা মরল বিষ খেয়ে—তারপর গাঁয়ের পথে কেঁদে বেড়াতে লাগল—তখন বাবা কে রাস্তায় একলা বেরিয়েছ, শুনি? দেবু পণ্ডিত শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দিলে—বললে—দুর্গার পোষা বেড়ালটা কাঁদে; আমরাও বাবা মানুষ, চালের ভাত খাই—ধানের ভাত খাই না—

জগন বলিল—যাঃ গেল যাঃ! তাই বলছি নাকি আমি? ভূতের তর্ক আমি করি নাই, ভূতপ্রেত আমি মানি, হাজার বার মানি! দেবু মাষ্টারের মত প্রাইভেটে বি-এ পাশও করি নাই, এত বড় ইংরিজীনবীশ লায়েকও হই নাই। আমি বলছি সবেরই একটা সময় আছে। একটা বড় কাজে চলেছিস—একসঙ্গে দশ বারো জন রয়েছি—এখন আর ভূত ভূত কেন?

—বাস্ বাস্। ভূত মানো যখন বলছ—তখন আর ঝগড়া নাই, আমি চুপ করছি।

রামনারাণ বলিল—ভূত আছে বই কি, স্বগ্য আছে নরক আছে আর ভূত নাই? তাই হয় না কি? তবে 'পেত্যা' ভূত নয় আমি স্বচক্ষে দেখেছি। শেয়ালের মত একরকম জন্তু। বুয়েচ না—হাঁ করবে—আর আলো জ্বলে উঠবে মুখের ভেতর। আরেঃ বাপ রে—সে এক তাজ্জব ব্যাপার!

জগন ডাক্তার ভাবিতে-ভাবিতেই চলিয়াছিল। বড় কাজের ভাবনা।

সমস্ত অঞ্চলটা থম থম করিতেছে। সমস্ত নির্ভর করিতেছে একটি লোকের কথার উপর। মহাগ্রামের শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন। দশ, বৎসর পূর্ব্বে দেশত্যাগ করিয়া তিনি কাশী গিয়াছেন। বাড়ীঘর জমি সব ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখানে তাঁহারই একজন ছাত্র ন্যায়রত্নের পিতৃপুরুষের টোলটি কোনমতে বজায় রাখিয়াছে, সেই এখানকার দেবকর্ম্ম চালায়। জমি জেরাতের উৎপন্ন হইতে এখানকার খরচপত্র চালাইয়া উদ্বৃত্ত যাহা থাকে পাঠাইয়া দেয়। তাও পাঠানো হয় ন্যায়রত্নের পৌত্রবধূর নামে। ন্যায়রত্ন নাকি কখনও স্পর্শ করেন না এ সব টাকাকড়ি; তিনি না কি কাশীর ঘাটে বসিয়া ভাগবত কথকতা করেন—সমাগত শ্রোতারা যাহা দিয়া যায় সেই অর্থ হইতেই তাঁহার চলে। সেই মানুষকে আজ বাধ্য হইয়া এ অঞ্চলের সকলের অনুরোধে, সরকারী অনুজ্ঞায় ফিরিয়া আসিতে হইতেছে।

আজই রাত্রি সাড়ে তিনটায় ডাউন বেনারস এক্সপ্রেসে জংসন দ্বারমণ্ডলে তিনি নামিবেন। সেই কারণেই তাহারা এই রাত্রে দ্বারমণ্ডল জংসনে চলিয়াছে।

শুধু তাহাই নয়। ওই মহাগ্রামের দল, ওই দেখুড়িয়ার দল সব এই জন্যই চলিয়াছে। শিবকালীপুরের শ্রীহরি ঘোষ সন্ধ্যাতেই গরুর গাড়ী জুড়িয়া দ্বারমণ্ডল চলিয়া গিয়াছে, ডাকবাংলায় আছে; কঙ্কনার বাবুদেরও কেহ একজন ওখানেই থাকিবে। এ ছাড়াও অর্থাৎ এই পঞ্চগ্রাম ছাড়াও এ অঞ্চলের আরও অনেক গ্রামের সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তি আসিয়াছে। দ্বারমণ্ডল জংসনের মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য ব্যবসাদারেরা তো আছেই। সদর শহর হইতে হিন্দুমহাসভার লোক, কংগ্রেসের লোক এবং ব্যক্তিগত-ভাবে আরও বড় বড় উকীল জমিদার ব্যবসায়ীও আসিবার কথা। তাঁহারা হয়তো রাত্রে আসেন নাই কাল সকাল সাড়ে আটটার ট্রেণেই সকলে আসিয়া হাজির হইবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিবেন—পুলিশ সাহেব সম্ভবত দ্বারমণ্ডল বাজারেই আছেন, এস-ডি-ও আসিবেন, সার্কল অফিসারের দ্বারমণ্ডলেই আপিস। কলিকাতা হইতে হিন্দুমহাসভার কোন হোমরা-চোমরাকে আসিবার জন্য তার করা হইয়াছে, কেহ-না-কেহ নিশ্চয় আসিবেন বলিয়াই জগনের অনুমান।

*　　*　　*

সমস্ত অঞ্চলটা থম থম করিতেছে। দ্বারমণ্ডল জংসনের চারিদিকে চারিটি পঞ্চগ্রাম অর্থাৎ বিশখানি গ্রামে বোধ হয় এক মুহূর্ত্তে আগুন লাগিয়া যাইবে। রক্তবন্যা বহিবে।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড আক্রোশ ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

দ্বারমণ্ডল জংসন ষ্টেশন হইতে দুই তিন মাইল দক্ষিণে হাট দ্বারমণ্ডল এ অঞ্চলের বহুপ্রাচীন বাজার। প্রাচীন কালে এখানে বহু-প্রসিদ্ধ হাট বসিত। হাট আজও আছে, কিন্তু হাটের সে প্রসিদ্ধি আর নাই। দ্বারমণ্ডল বাজারের উত্তর প্রান্তে হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ দেবীস্থান আছে। জয়তারা দেবীর আশ্রম লোকে বলে সিদ্ধপীঠ। জংগলে ঘেরা মনোরম স্থান; প্রাচান কালের মন্দির, একটি দিঘী এবং আরও খানদুয়েক খড়ো ঘর ঘিরিয়া চারিপাশে বুনো শ্বেত-কাঞ্চন, পলাশ, বেল এবং বনশিরীষের জংগল। তীর্থ-যাত্রীর সংখ্যা কম নয়। এই দেবী-স্থানের পশ্চিম দিকে উত্তর মুখে চলিয়া গিয়াছে দ্বারমণ্ডল বাজার হইতে নদীর খেয়াঘাট পর্য্যন্ত প্রাচীন কালের শড়ক। দ্বারমণ্ডল হাটের বুক চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে যে বিখ্যাত বাদশাহী শড়ক—সেই শড়ক হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। রেললাইন পড়িবার আগে হাট দ্বারমণ্ডলের উত্তর দিকটায় তিনমাইল ব্যাপী একটা পাথুরে প্রান্তর ধু-ধু করিত। শুধু বর্ষার সময় এই প্রান্তরটায় ওই খেয়া ঘাটের চারিপাশে খড়ের চালা তুলিয়া বাজার বসিত। নদীর ঘাটে গঙ্গা ও ময়ুরাক্ষীর মোহনা হইয়া এখানে দেশ বিদেশের নৌকা আসিয়া কেনা-বেচা করিত। এই হেতু ওই খেয়াঘাটটার নামই দ্বারমণ্ডল ঘাট বা ঘাট দ্বারমণ্ডল। রেলষ্টেশন হওয়ায়—ঘাট এবং হাট দ্বারমণ্ডল দুইই প্রায় বিলুপ্তির মুখে; লোকে বলে কানা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সব কথা থাক।

হাট দ্বারমণ্ডলের উত্তর প্রান্তে এই জংগলে এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পীঠ হিসাবে আরও অনেক প্রাচীন, কিন্তু সে পীঠ-মাহাত্ম্য নাকি অজ্ঞাত ছিল, স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়া সাধনা করিয়া নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়া গুপ্ত পীঠকে প্রকাশ করেন এবং এখানকার মাহাত্ম্য প্রচার করেন। এখানে প্রবাদ—দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মানুষ আরোগ্যলাভ করে, মহাসঙ্কটে মানুষ পরিত্রাণ পায়, রাজরোষ প্রশমিত হয়, হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার হয়, ভিক্ষুক রাজ্য-পদ পায়, নিসন্তান সন্তান লাভ করে, অনাবৃষ্টিতে বর্ষণ হয়; দেবী প্রসন্না হইলে সবই হইতে পারে। মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হওয়ার কাহিনীও লোকে আজও বলিয়া থাকে। সেকালে ঘাটে যত নৌকা আসিত—হিন্দুর হৌক মুসলমানের হৌক কেরেস্তানের হৌক—প্রত্যেক নৌকা হইতে এখানে পূজা আসিত। আজকাল নৌকা আসে না কিন্তু মুসলমানেরা এখনও আসে; মানসিক মানিয়া যায়, মানস পূর্ণ হইলে পূজা দেয়; হিন্দুরা পাঁঠা বলি মানসিক করে, মুসলমানেরা মুর্গা মানসিক করে, জংগল-প্রান্তে মুর্গীটিকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। হিন্দুদের নিম্নস্তরের মধ্যে সেকালে শূকর খাওয়ার প্রচলন ছিল, সে প্রচলন ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে কিন্তু দুই বৎসর আগে পর্য্যন্ত দুর্গা পূজার সময় বিজয়া দশমীর ভোর বেলা—জংগলটির অগ্নিকোণের প্রান্তে তাহারা শূকর বলি দিয়াছে।

দেবী-স্থানের পশ্চিমদিকে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ ঘাট দ্বারমণ্ডল হইতে হাট দ্বারমণ্ডলের পাকা শড়ক; শড়কের খানিকটা জংগলটার নৈঋত কোনের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। এইখানে শড়কটার পশ্চিমদিকে একটা প্রাচীন নিমগাছের নিচে একটা উঁচু টিপি ছিল। টিপিটা মকদম শাহের টিপি বলিয়া পরিচিত। হিন্দুমুসলমান

যাহারা এখানে পূজা দিতে আসিত তাহারা ওই টিপিতেও একটি প্রদীপ অথবা বাতি জ্বালিয়া দিত। কালের সঙ্গে হিন্দুদের প্রদীপ দেওয়া কমিয়া আসিয়াছে, ওদিকে মুসলমানদেরও জয়তারার স্থানে আসা বিরল হইয়াছে।

বিরোধ বাধিয়াছে এইখানে।

জংসন দ্বারমণ্ডলে তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিল্লীওয়ালা দরিদ্র মুসলমান আসিয়া ছোট একটি মণিহারীর দোকান করিয়াছিল। সে এখন লক্ষপতি। গোটা জেলায় মণিহারি মাল সরবরাহের ব্যবসা তাহার একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে। জংসন শহরে প্রকাণ্ড দোকান—পাঁচসাতখানা বাড়ী, আশপাশের গ্রামে প্রায় দুই তিনশো বিঘা ধান জমির মালিক সে। ফৈজুল আলি সাহেবের ছেলে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বসিয়াছে। এই ফৈজুল সাহেব বৎসর কয়েক পূর্ব্বে মকদম শাহের টিপি ছোট একটি সমাধির আকারে বাঁধাইয়া দেয় এবং ইদ রমজানের সময় এখানে নামাজ পড়িয়া ও বেড়াভাসানের সময় আলোক সজ্জা করিয়া স্থানটির মর্য্যাদা বাড়াইয়া আসিতেছিলেন।

গতবৎসর বিজয়া দশমীর সময় দেবী-স্থানের অগ্নিকোণে শূকর বলিতে তাঁহার নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায় আপত্তি তুলিয়াছিল। আপত্তি সফলও হইয়াছে। শূকর বলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা চলিতপ্রথা বলিয়া কোন আপত্তি না করিলেও শূকরবলি সমর্থন করে না। যাহারা বলি দিত—তাহারাও ইদানীং এ বিষয় বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছে।

এ বৎসর রমজানের নামাজের সময় স্থির হইয়াছে ওখানে একটি মসজিদ তৈয়ারী করিতে হইবে এবং দেবী-স্থানের বাজনাতেও আপত্তি তুলিয়াছে মুসলমান সম্প্রদায়। আবার কানা-ঘুষা শুনা যাইতেছে—এবার বকরীদের সময় ওখানে কোরবাণী করা হইবে।

কালবৈশাখীর টুকরাখানেক মেঘ যেন বজ্রপাত করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ঘোষণা করিল, বিপর্য্যয় আসন্ন!

সমস্ত অঞ্চলটার মানুষ অকস্মাৎ চকিত পাখীর মত কলরব করিয়া উঠিল।

সোমনাথ আক্রমণের কাল হইতে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ এইখানে বাসা গাড়িয়া আছে। এ অঞ্চল—এ অঞ্চল কেন সমগ্র রাঢ়ভূমিতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিসম্পন্ন, দেশের ভূমির অধিকারীও তাহারাই। তাহারা চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

দ্বারমণ্ডলের জয়তারার স্থান এ জেলায় প্রসিদ্ধ তীর্থ-ক্ষেত্র। বর্ত্তমান কালে—পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের ধর্ম্মে বিশ্বাস টলিয়াছে, তাহারা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিতেছে, জয়তারার আশ্রমে তাহারা বড় আসে না, কিন্তু এ সংবাদে তাহারা বিচলিত হইয়া উঠিল। স্থানীয় ব্যবসাদার জমিদার গৃহস্থ হইতে জেলার উকীল-মোক্তার-ডাক্তার-মাষ্টার, সকলেই বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার লাটসাহেবের কাছে দরখাস্ত পাঠাইল, খবরের কাগজে বড় বড় হরফে সংবাদ প্রকাশিত হইল; দেশের ঘরে ঘরে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

ওদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ও আয়োজনের ত্রুটি রাখিল না।

বাংলা দেশে গত বৎসর হইতে মুসলীম লীগ দল মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিয়া দেশ শাসনের অধিকার লাভ করিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে এখানকার মুসলমানদেরও চেহারা পাল্টাইয়া গিয়াছে। জেলার মুসলীম লীগ কিছুদিন আগে সমারোহ করিয়া কনফারেন্স করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে—এ জেলার দরিদ্র নির্য্যাতিত মুসলীম সম্প্রদায় অনেক সহ্য করিয়াছে, আর সহ্য করিবে না। সম্প্রতি—এই ঘটনার প্রথমেই একদিন জেলা মুসলীম লীগের সভাপতি ও সম্পাদক দ্বারমণ্ডলে আসিয়া ফৈজুল আলি সাহেবের বাড়ীতে অতিথি হইয়া স্থানীয় মুসলমান মাতব্বরদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করিলেন, মকদম শাহের দরগায় গিয়া সেখানে নামাজ পড়িলেন, সরজমিনে নিজেরা সমস্ত দেখিলেন। তার পর একদিনে প্রায় চার হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া—মসজিদ তৈয়ারীর ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিলেন। কলিকাতায় প্রাদেশিক লীগ আপিসে নকসার জন্য লেখা হইল, আরও লেখা হইল একজন মুসলীম নেতাকে পাঠাইবার জন্য—তিনি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিবেন। ঘটনাটা জটিল হইয়া উঠিল। হিন্দুরা প্রতিবাদ করিল, দরখাস্ত পাঠাইল। তাহারাও দরখাস্ত

পাঠাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার—লাটসাহেব—উপরন্ত মন্ত্রীদের কাছেও দরখাস্ত পাঠাইয়াছে।

হিন্দুরাও তিন চারটি মামলা দায়ের করিয়াছে। দেওয়ানী ফৌজদারী দুই রকমের মকদ্দমাই স্থাপন করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উভয়পক্ষের প্রধানদের লইয়া মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুরা বলিতেছে—ওই দরগা আসলে মুসলমানদের তীর্থস্থলই নয়। তাহারা বলে—মুসলমান ফকীরের সমাধিস্থল একথা সত্য; কিন্তু মকদম শাহ জন্মগত জাতিত্বে মুসলমান থাকিলেও আসলে ছিলেন হিন্দু সাধক;—হিন্দুমতে সাধনা করিবার জন্যই তিনি এই সিদ্ধপীঠের এক কোনে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ এখানকার প্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—মকদমশাহ আজমীড় শরিফে সাধনা করিতেন—সেখানকার খাদেমের তিনি প্রধান শিষ্য ছিলেন। সাধনায় প্রভূত শক্তির অধিকারী হইয়া তিনি বাঘের পিঠে সওয়ার হইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণে বাহির হন। এখানে আসিয়া দেবীস্থানের সিদ্ধপুরুষ সাধকের কথা শুনিয়া সাধকের কাছে লোক পাঠান—যে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবেন। তিনি যেন প্রস্তুত হইয়া থাকেন। পরের দিন ভোরবেলা দেবীর সেবক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ মুখ ধুইবার জন্য একটি প্রাচীরে উঠিয়া নিমগাছের ডাল ভাঙিতেছেন—এমন সময় বাঘের গর্জ্জনে সমস্ত দেবীস্থান থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মকদমশাহের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কোথায় রে তুই কাফের? শোন—আমার কথা তুই মন দিয়া শোন। তোর সাধনা যদি মিথ্যা হয়—ভণ্ডামী হয়—তবে আমার এই বাঘ এক লহমায় তোর বুকের পাঁজরায় থাবা মারিয়া পাঁজরা চূর্ন করিয়া তোর কলিজা বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিবে। একমাত্র তুই যদি তোর ভণ্ডামি ছাড়িয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিস—তবে আমি তোকে রক্ষা করিব। কই, কোথায় তুই? মনেও ভাবিস না যে লুকাইয়া তুই পরিত্রাণ পাইবি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—অপেক্ষা কর। আমি যাইতেছি। বলিতে বলিতেই তিনি যে পাঁচীলের উপর দাঁড়াইয়া নিমের ডাল ভাঙিতেছিলেন—সেই পাঁচীল তাঁহার বাহন বা রথ স্বরূপে চলিতে আরম্ভ করিল। বড় বড় গাছ পাশে কাত হইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল—তাঁহার পাঁচীল আসিয়া মকদমশাহের সম্মুখে থামিল। তিনি বলিলেন—আমার আজ মহাভাগ্য—আজ প্রভাতেই আমি আপনার মত মহাপুরুষকে অতিথি স্বরূপে পাইয়াছি।

ফকির মকদমশাহ অবাক হইয়া গিয়াছিলেন—একটা মাটির পাঁচীল এমনভাবে চলিয়া আসিতে পারে—এ তাঁহার কল্পনাতীত বলিয়া মনে হইল। তাঁহার বাহন বাঘটার গর্জ্জন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। বিচিত্র দৃষ্টিতে সে স্থানটার চারিদিক দেখিতেছিল। ব্রাহ্মণ হাসিয়া ফকীরকে বলিলেন—ওটা গত জন্মে এখানে কুকুর ছিল। সমস্ত জীবন এই আশ্রমে কাটাইয়াছিল—সেই পুণ্যে এ জন্মে বাঘ হইয়াছে।

বলিয়া পাঁচীল হইতে নামিয়া তিনি বাঘটার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিলেন—বাঘটাও সানুরাগে ব্রাহ্মণের হাত চাটিতে সুরু করিল।

ফকীর মকদমশাহ সবিস্ময়ে ব্রাহ্মণকে বলিলেন—তুমি কে?

—আমি সামান্য একজন মানুষ।

—তুমি সামান্য নও, অসামান্য।

বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের হাত চাপিয়া ধরিলেন। ব্রাহ্মণও তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রীতি বিনিময় করিলেন। তারপর হইল কত বিচিত্র কথা। সাধনার গুহ্যতত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইল। অবশেষে দিনান্তে মকদমশাহ বলিলেন—এইবার আমাকে আতিথ্য গ্রহণের দক্ষিণা দাও।

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন—বল কি দক্ষিণা চাও।

—তোমার সাধনতত্ত্বে আমাকে দীক্ষা দাও।

—তথাস্তু।

দীক্ষান্তে মকদমশাহ প্রশ্ন করিলেন—আর একটা প্রশ্ন।

মকদমশাহ প্রশ্ন করিলেন—কতদিনে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইবে? ব্রাহ্মণ যে নিমের ডালটী হাতে লইয়া আসিয়াছিলেন—সেই ডালটির প্রান্ত হইতে একটি নিম ফল লইয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—এইটাকে এইখানে পোঁত। এটিতে জল দিয়ো। এই বীজ হইতে অঙ্কুর হইবে—অঙ্কুর বৃক্ষ হইবে, বৃক্ষে ফুল ধরিবে—তাহার পর ধরিবে ফল—সেই ফল পাকিয়া মাটিতে খসিয়া পড়িবে। যেদিন প্রথম ফলটি মাটিতে খসিয়া পড়িবে—সেইদিন তোমার সিদ্ধিলাভ

হইবে। হইয়াছিলও তাই। এই নিম গাছটি সেই নিম গাছ। বর্ত্তমানে হিন্দু জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে বাঁধানো দরগার নিচের ঢিপিটি সেই ফকীরের যোগের আসন। ওইখানেই তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং মকদমশাহ জন্মগত জাতিত্বে মুসলমান থাকিলেও আসলে তিনি ছিলেন হিন্দু যোগী। এ স্থানের সঙ্গে মুসলমানদের কোন সংস্রব থাকিতে পারে না।

মুসলমানরাও ইহার জবাব দিয়াছে।

তাহারা বলিয়াছে—ইহা একটি আষাঢ়ে গল্প। পৌত্তলিক হিন্দুর অলৌকিক কাহিনী ও প্রবাদ রচনার শক্তির একটি প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন। সামান্য সত্যকে কেন্দ্র করিয়া রাশি রাশি মিথ্যার খড় মাটি ও রঙ সমন্বয়ে তাহাদের পুত্তলী নির্ম্মাণের মতই একটি পুত্তলিকা মাত্র।

এখানে আসল সত্য হইতেছে এই যে, মকদমশাহ আজমীর শরিফের একজন সাধক ছিলেন। এখানকার একজন ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান তীর্থ ভ্রমণে আজমীর শরিফ গিয়া মকদমশাহের নিকট এখানকার মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। বলেন—সেখানে এমন কেহ মৌলানা নাই—এমন কোন ফকীর হজরত নাই—যিনি হিন্দু প্রধান অঞ্চলের পৌত্তলিকতার অন্ধকার হইতে মুসলমানদের আত্মাকে আলোর সন্ধান দিতে পারেন। হজরত মকদমশাহ ব্যথিত হইয়া আজমীর শরীফ হইতে এখানে মুসলমানদের হিন্দু তান্ত্রিকতার ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য আসেন। শড়কের পশ্চিমদিকে ওই নিমগাছ এবং তাহার চারিদিকের জঙ্গলটুকু হিন্দুদের দেবীস্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র স্থান। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম দিকে—সুদীর্ঘকাল মুসলমান জাতির দুয়োরাণী নামে ইংরাজের অপ্রিয়ভাজন এবং সন্দেহভাজন হইয়া থাকার কথা ঐতিহাসিক সত্য। হিন্দুরা ইংরাজের সুনজরে থাকিবার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উপর এ অঞ্চলে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাহারাই অর্থসম্পদ ও জমিদারীর অধিকারী হইয়া বসিয়া আছে। তাহারই ফলে মকদমশাহের দরগাকে তাহাদের দেবীস্থানের সামিল বলিয়া জবরদস্তি অধিকার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু চিরকাল একটা মহান ঐতিহ্যশালী জাতি ঘুমাইয়া থাকে না। ভারতবর্ষে মহান ইসলামের পুনরভ্যুদয় ঘটিতেছে। মুসলমানেরা জাগিয়াছে। আমাদের অধিকার আমরা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া ফিরিয়া পাইতে চাই। হজরত মকদমশাহের কালে এই স্থানে মুসলমানেরা মুক্তির সন্ধান পাইয়াছিল। তখন এই স্থানে হাজার মুসলীম নামাজ পড়িয়াছে, হাজার বাতিতে রৌশন জ্বালিয়াছে, মহান আল্লাহতয়লার নামে কত কোরবাণী হইয়াছে। সে সবের প্রমাণ আজ বিলুপ্ত। কিন্তু যেখানে মুসলমান আছে সেখানেই ইসলাম আছে, তাহার হদিশ আছে, তাহার সকল প্রথা-পদ্ধতি অবশ্যই আছে। সুতরাং মকদমশাহের দরগার উপর আজ মুসলমানদের নবজাগরণের দিনে—মসজিদ নির্ম্মাণ করিবার অধিকার এবং ইসলামের নির্দ্দেশ মত সকল আচরণ পালন করিবার অধিকার অবশ্যই তাহাদের আছে। এই অধিকার একবিন্দু ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন আপোষ করিতে তাহারা নারাজ। পূর্ণ অধিকার তাহারা যে কোন মূল্যে অর্জ্জন করিতে বদ্ধপরিকর।

অবশেষে দ্বারমণ্ডল জংসনে গভর্ণমেণ্ট এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। সম্মেলন ঠিক নয়; আসলে সরকারীভাবে ব্যাপারটার তদন্ত হইবে। এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তিদের আহ্বান করা হইয়াছে। তাঁহারা সাক্ষী দিবেন। এই হিসাবে সর্ব্বাগ্রে নাম উঠিয়াছে—মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্নের। বয়স তাঁহার আশী পার হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার প্রপিতামহকে দেখিয়াছেন এ অঞ্চলের অন্তত আড়াইশত বৎসরের ইতিহাস তিনি জানেন। এ ছাড়া এই মানুষটি সম্পর্কে এখানকার প্রত্যেকেরই একটি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ ধারণা আছে; ন্যায়রত্ন মিথ্যা বলিবেন—এমন অপবাদ মুসলমানেরাও মুখ ফুটিয়া প্রচার করিতে পারে নাই। কুসুমপুরের দৌলত হাজির বয়সও অনেক, সোত্তর-বাহাত্তর-হইবে; এ অঞ্চলে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বদ্ধিষ্ণু এবং বিষয়ী লোক;—আপন সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাহাকে কুচক্রী বলিয়া অপবাদ দেয়;—কটুভাষী বলিয়াও তাহার অখ্যাতি আছে—সেই দৌলত শেখ হাজিও তাঁহার নাম শুনিয়া বলিয়াছে—হাঁ—তা—ন্যায়রত্ন ঠাকুরের বাত মানতে হয়। মানুষের মত মানুষ লোকটা। তা—সে আসুক—বিবেচনা করে বলুক না কেন ঠাকুর—হিঁদুরা যদি

তাদের মতে পূজা করতে পায়—তবে মুসলমানেরা পাবে না কেন? তাদের কসুরটা কি? হিন্দুদের আস্তান—আগের বটে, সে বাত তো—কেউ না করছে না। তামাম হিন্দোস্তানে হিঁদুরা এসেছে আগে—তা বাদে এসেছি আমরা। সেই বিবেচনা ক'রে সে কি বলে বলুক।

মোট কথা হাজিও ন্যায়রত্নের কথা তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিবার সংকল্প ঘোষণা করিতে কুণ্ঠাবোধ করে; এমনি একটা শ্রদ্ধান্বিত সম্ভ্রমের আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। এখানকার লোক বলে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই।

শুধু সর্ব্বসাধারণই নয়—সরকারী মহলেও তাঁহার এ খ্যাতি খাতায় কলমে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহার পৌত্র বিশ্বনাথ ছিল বিপ্লবী দলের কর্ম্মী। সেই সম্পর্কে একবার পুলিশসাহেব তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি একমাত্র পৌত্রের শুভাশুভ বিবেচনা করেন নাই, বলিয়াছিলেন—কথাটা যখন জেনেছি তখন জানি না বলব কি ক'রে। আর যা সত্য, তাই বা অস্বীকার করব কি করে? হ্যাঁ, বিশ্বনাথ বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে। সে কথা সে আমার কাছে স্বীকার করেছে। তবে এর অধিক কিছু আমাকে সে বলতে চায় নি; আমিও আর প্রশ্ন করি নি।

পুলিশ সাহেব বাঙালী হিন্দু—তিনি বলিয়াছিলেন—ন্যায়রত্ন মশায়, আপনাদের বংশের সন্তান আপনার একমাত্র পৌত্র, তাকে আপনি—এই ভাবে—আক্ষেপপূর্ণ অনুযোগ তিনি শেষ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলেন, তাই ওইখানেই চুপ করিয়া গিয়াছিলেন।

ন্যায়রত্ন উত্তর দিয়াছিলেন—বংশধারা গঙ্গার প্রবাহের মত, সে প্রবাহ থেকে যে স্রোতটা পাশের ঢালু জমির আকর্ষণে কেটে বেরিয়ে যায়—তাকে কি টেনে ফেরানো যায়? সে চলে আপন বেগে, আর জমির ঢালের সুবিধায়। সেই তার পথ, সেই তার কর্ম্মফলের গতি। ওতে আক্ষেপ করবার কিছু নাই।

একটু হাসিয়াছিলেন—এইখানে। তারপর আবার বলিয়াছিলেন—দেখুন গঙ্গা থেকে পদ্মাস্রোত এমনিভাবে বেরিয়ে মহিমাহীন বলে অখ্যাতি অর্জ্জন করেছিল কিন্তু আজ ভাগীরথী মজে এসেছে। গোমুখী থেকে যত জল যায় সাগর সঙ্গমে, তাকে ওই পদ্মার খাত ধরেই যেতে হয়। আজ আর তাকে মহিমাহীনা বলে অপবাদ দিলে—নিন্দুক-স্বভাবের পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। অন্ততঃ সত্য বলা হবে না। তাহ'লে পদ্মার সঙ্গে গোমুখীর মহিমাও অস্বীকার করতে হবে। আমাদের খাত মজে এসেছে।

এই সব কারণে সরকার দপ্তর হইতেও তাঁহাকে সম্ভ্রমপূর্ণ আহ্বান পত্র পাঠানো হইয়াছে। দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা প্রায় প্রত্যেকেই অনুরোধ পত্র পাঠাইয়াছেন।

দেবু ঘোষ নিজে গিয়াছে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য। দেবু ঘোষের সঙ্গে সদর শহরের হিন্দুমহাসভার একজন তরুণ সভ্যও গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন বৃদ্ধ হইয়াছেন। এ ছাড়াও তাঁহাকে এ যাত্রায় নিরাপদে লইয়া আসার দায়িত্ব আছে। অন্ততঃ এখানকার লোকেরা তাই মনে করে। আরও একটা কথা আছে। দেবু ঘোষ আর সে কালের দেবু ঘোষ নয়। এ দেবু ঘোষ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নূতন মানুষে পরিণত হইয়াছে। প্রাইভেটে সে বি-এ পাশ করিয়াছে। তিনকড়ি মণ্ডলের বিধবা মেয়ে স্বর্ণকে বিবাহ করিয়াছে। এখন সে জংশন সহরের বাসিন্দা। এখানকার কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী। জগন জানে কংগ্রেসের মধ্যে অনেক ছোট ছোট দল আছে। দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী; তার মধ্যে আবার নানান দল। এমনি একটি বামপন্থী দলের সভ্য দেবু ঘোষ। অনেক বিচিত্র নূতন কথা বলে সে। তাহার মধ্যে ধর্ম্ম এবং সমাজ লইয়া এমন কতকগুলা কথা সে বলে যে জগনের আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়। দেশের সমস্ত কিছুকেই সে ব্যঙ্গ করিয়া আঘাত করিয়া কথা বলে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মুসলমানদের লইয়া এমন সব কথা সে বলে না। তাহাদের সম্পর্কে তাহার পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট। কংগ্রেস অনেকদিন হইতেই মুসলমানদের অযথা খাতির করিয়া আসিতেছে বলিয়া জগনের ধারণা—কিন্তু দেবু ঘোষের পক্ষপাতিত্ব কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশী। এই সব কারণেই হিন্দুমহাসভাও একজন স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়াছেন। ভাল হইয়াছে। খুব ভাল হইয়াছে।

বাঁধের উপর সকল দল একসঙ্গে মিলিত হইল।

বাঁধের পর নদীর চর।

কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভে এখনও চরের পলিমাটি নরম রহিয়াছে। নদীতে এখন অনেক জল। শশী মাঝি খেয়া নৌকা লইয়া কিছুক্ষণ আগেই আসিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। নৌকার মাথায় বসিয়া তামাক খাইতেছে।'

এইটাই খেয়াঘাট।

এপারের ঘাটটার নাম পঞ্চগ্রামের ঘাট। ওপারে একটা বুড়াগাছ অজগরের পিঠের মত মোটা বাঁকা-শিকড় মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বহুকালের বট। ওই বটতলাতেই ওপারে নৌকা গিয়া লাগিবে। ওইটাই প্রাচীনকালের দ্বারমণ্ডল ঘাট—বা—ঘাট দ্বারমণ্ডল। এইখানে একদা বর্ষার সময় সদাসর্ব্বদা বিশ তিরিশখানা বড় মালবাহী নৌকা বাঁধা থাকিত। ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাইত।

ঘাটের উপরে বসিত মেলার মত খড়ো চালার বাজার। জগন শুনিয়াছে সেকালে নাকি মুরশিদাবাদ, কাটোয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি শহর অঞ্চল হইতে দশ বারোঘর দেহ ব্যবসায়িনী পর্য্যন্ত আসিয়া তিন চার মাস থাকিয়া যাইত।

মধ্যে মধ্যে ডাকাত পড়িত। বড় বড় দল। লুটতরাজ করিয়া চলিয়া যাইত। সেই কারণে ফৌজদার এখানে তিন মাসের জন্য ফৌজ পাঠাইতেন।

ওই যেখানটায় এখন সাইডিং লাইনের সীমা আসিয়া উত্তর দিকে শেষ হইয়াছে—যেখানে সারি-সারি বাফার গুলা রহিয়াছে ওই জায়গাটাকেই বলে—ফৌজদারের মাঠ। আজও বলে।

সে দিন আর এ দিন। জগন মধ্যে মধ্যে দার্শনিক হইয়া উঠে।

আজ সারি সারি উজ্জ্বল কেরোসিন গ্যাসের আলোয় দ্বারমণ্ডল জংসনের বিস্তীর্ণ রেলইয়ার্ডটা ঝলমল করিতেছে। লাইন-লাইন-আর লাইন। সারি-সারি, সারি-সারি-লাইন আঁকিয়া বাঁকিয়া পরস্পরের সঙ্গে বাঁধাবাঁধি করিয়া চলিয়া গিয়াছে অন্ততঃ মাইল খানেকেরও বেশী। চওড়ায় অন্ততঃ সিকি মাইল। ওভার-ব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া ইয়ার্ডটার দিকে তাকাইলে মনে হয় এ যেন একটা অতি অতিকায় কিছুর কঙ্কাল; যেন পৌরাণিক যুগের কোন মহাবলশালী অতিকায় দৈত্য বা অসুরের কঙ্কালটা মাটি কাটিয়া বাহির করিয়াছে, অতৃপ্ত তৃষ্ণায় অবরুদ্ধ রোষ যাহা ছিল বুকের মধ্যে তাহারই স্পর্শে হাড়গুলা এমনি কালো এবং কঠিন হইয়া গিয়াছে! অনবরত শান্টিং হইতেছে। শব্দে শব্দে গোটা ইয়ার্ডটা বিশ্বকর্ম্মার পুরীর মত মুখরিত।

হরেন বলিল—জলদি কুর। সিগনল পড়ল, ডাউন দিলে—ওই দেখ। মুন অর্নামেণ্ট—অর্থাৎ কিনা শ্রীমান শশীভূষণ জলদি কর!

খেয়া পার হইয়া তাহারা যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল তখন প্লাটফর্মটা লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। সকলে তাকাইয়া আছে ময়ূরাক্ষীর ব্রিজের দিকে। ওই—ওই—লাইনের উপর বেনারস এক্সপ্রেসের সার্চ্চ-লাইটের ছটা পড়িয়াছে! চকচক করিতেছে। প্লাটফর্ম্মের উপর এই শেষরাত্রেও দ্বারমণ্ডল হাটের চারিপাশের চার পঞ্চগ্রাম অর্থাৎ বিশখানি গ্রামের দুই চারিজন করিয়া লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে লাইনের দিকে।

মহামহোপাধ্যায় শিবশেখর ন্যায়রত্ন আসিতেছেন। ষ্টেশন প্লাটফর্মেই ওয়েটিং রুম হইতে চেয়ার আনিয়া রাখা হইয়াছে। বাহিরে একখানা মোটর অপেক্ষা করিতেছে। দ্বারমণ্ডলের মাড়োয়ারী ধনী সুরযমলজীর বাড়ীতে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তীব্র আলোক এবং উত্তাপ ছড়াইয়া এক্সপ্রেসখানা আসিয়া দাঁড়াইল।

প্লাটফর্ম্মের জনতা উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া খুঁজিতেছিল দেবু ঘোষকে অথবা হিন্দুমহাসভার স্বেচ্ছাসেবকটিকে। তাহাদের কেহ-না-কেহ জানালায় বা দরজায় মুখ বাড়াইয়া থাকিবে।

কৈ? কৈ? কোথায়? কোন দিকে?

দেবু! দেবনাথ! দেবু!

এইদিকে! পিছনের দিকে! এই যে! এই যে!

সকলে ভিড় করিয়া পিছনের দিকে ছুটিল। এই যে! এই যে! গার্ডের গাড়ীর ঠিক আগের গাড়ীখানা হইতে দেবু ঘোষ এবং পনের ষোল বৎসরের একটি কিশোর দুইজনে গাড়ীর খোলা দরজার দিকে হাত প্রসারিত করিয়া

দাঁড়াইয়াছিল; দরজার মুখেই শীর্ণদেহ গৌরবর্ণ পক্ককেশ ন্যায়রত্ন গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাঁহার পিছনে হিন্দুমহাসভার স্বেচ্ছাসেবকটি।

কে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল—বোলো ভাই ন্যায়রত্নকী—জয়!

ন্যায়রত্ন ধ্বনিতে চকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। পাকা ভ্রূ জোড়ার নিচে চোক দুটি ঝকঝক করিতেছে! শুভ্র-মালিন্যহীন চোখ! হাত তুলিয়া তিনি ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন—না!

দেবু ঘোষ উচ্চকণ্ঠে বলিল—উনি একাদশীর উপবাস ক'রে আছেন—তারপর হঠাৎ একটু অসুস্থও হয়ে পড়েছেন। আপনারা গোলমাল করবেন না, ভিড়ও করবেন না।

কিশোর ছেলেটি বলিল—আমার কাঁধে ভর দিন!

হাত নাড়িয়া বৃদ্ধ ইঙ্গিতে জানাইলেন—না! বিনা সাহায্যেই তিনি সাবধানতার সঙ্গে প্লাটফর্মে নামিয়া পড়িলেন।

সর্ব্বাগ্রে শ্রীহরি ঘোষ হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেল।

ন্যায়রত্ন এক পা পিছাইয়া গেলেন এবং ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন—না।

কিশোর ছেলেটি বলিল—প্রণাম করবেন না। উনি প্রণাম কারুর নেন না!

ন্যায়রত্ন সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—আমি একটু বিশ্রাম করব। বড় ক্লান্ত আমি!

হিন্দুমহাসভার সম্পাদক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—চলুন—গাড়ী আছে বাইরে—ব্যবস্থা সব ঠিক করা আছে।

ঘাড় নাড়িয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—না। এইখানে—এইখানেই বিশ্রাম করব আমি। অজুমণি! কম্বলখানা বিছিয়ে দাও তো! একটু, একটু স্থান ক'রে দিন। আর কাল, কাল সকলের সঙ্গেই দেখা হবে। আজ একটু বিশ্রাম।

হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলেন তিনি।

প্রায় ঠিক তেমনটি আছেন ন্যায়রত্ন। মাথায় খাটো গৌরবর্ণ পক্ককেশ মানুষটি শুধু একটু শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন—রঙটা উজ্জ্বলতর হইয়াছে। জংসন স্বারমণ্ডলের চারিদিকে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। ন্যায়রত্ন বিস্ময়হীন ঔৎসুক্যহীন বিচিত্র দৃষ্টি চারিদিকে চোখ বুলাইয়া একবার দেখিয়া লইলেন।

জংসন স্বারমণ্ডল।

উত্তরে ওই বটগাছতলায় খেয়াঘাট। ঘাট স্বারমণ্ডল!

দক্ষিণে জ্যোৎস্নালোকে দেখা যাইতেছে ওই জয়তারার আশ্রমের জঙ্গল। তার ও-পাশে ওই হাট স্বারমণ্ডল।

(ক্রমশঃ)

লেখক উপন্যাসখানির 'বন্দর সাতঘাটের' পরিবর্তে 'স্বারমণ্ডল' নামকরণ করিলেন। (ভাঃ সঃ)

টাকার মূল্য হ্রাস

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সুরু হয়, অনেকে তাহা প্রথম মহাযুদ্ধের ফল বলিয়া মনে করেন। এই অর্থনৈতিক মন্দার চাপে ব্রিটেনাদি বহু দেশের মুদ্রানীতিও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। মজুত স্বর্ণসম্পদ অত্যন্ত কমিয়া গেল বলিয়া নিরুপায় ব্রিটেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর স্বর্ণমান ত্যাগ করে। ভারতবর্ষ বা সিংহলের মত ব্রিটেনের অধীন দেশ অথবা অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, নিউজিল্যাণ্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকার মত ডোমিনিয়ন শ্রেণীর দেশের কথা দূরে যাক, ব্রিটেনের এই স্বর্ণমান ত্যাগের সিদ্ধান্ত ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সমৃদ্ধ দেশকেও স্বর্ণমান ত্যাগের পরোক্ষে বাধ্য করে এবং ইহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত স্বর্ণমান পুনঃ প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর নানা স্থানে নানা আন্দোলন চলিলেও স্বর্ণমান কিন্তু আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণমান পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের মুদ্রা মূল্যও হ্রাস পায়। আগে প্রতিটি ব্রিটিশ মুদ্রা ষ্টার্লিংয়ের বিনিময় মূল্য ছিল ৪·৮৬টি মার্কিন ডলার, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ইহা মোটামুটি ৪·০৩টি মার্কিন ডলারে নামিয়া আসে। এই সময় ভারতে পূর্ণ স্বর্ণমান প্রচলিত না থাকিলেও ভারতীয় মুদ্রানীতি ও বিনিময়-ব্যবস্থা সম্পর্কিত তদন্ত কমিটি হিল্টন ইয়ং কমিশনের (১৯২৫) পরামর্শ অনুযায়ী গোল্ড বুলিয়ন ষ্টাণ্ডার্ড বা স্বর্ণপিণ্ড মান চলিতেছিল। ব্রিটেন যেই মূল্য হ্রাস করিয়া স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিল, পরাধীন দেশ ভারতের পক্ষে আর স্বর্ণ বিনিময় সাপেক্ষ মুদ্রানীতির সম্ভ্রম রক্ষা করা সম্ভব হইল না এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কিত ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের আইন বাতিল করিয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর হইতে টাকাকে

ষ্টার্লিংয়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করিয়া 'ষ্টার্লিং বিনিময়মান' নামে নূতন একটি মুদ্রামান প্রবর্ত্তন করেন। টাকা ষ্টার্লিংয়ের বিনিময় হারে প্রচলিত প্রতি টাকার ১ শিলিং ৬ পেন্স দর অপরিবর্ত্তিত রহিল।

ইহার পর যুদ্ধের শেষ দিকে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইলে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা নীতিতে স্বর্ণের মর্য্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে চেষ্টা চলে। এই চেষ্টার গুরুত্ব স্বীকার করিয়াও নিছক স্বর্ণের অভাবের জন্যই মিত্রপক্ষীয় দেশগুলি মার্কিনী প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারে নাই। যাহা হউক, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার বা ইনটার ন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের তরফ হইতে সদস্য শ্রেণীভুক্ত সকল দেশকে স্বর্ণের হিসাবে তাহাদের প্রত্যেকের মুদ্রার বিনিময় মূল্য স্থির করিয়া জানাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। ভারতে টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্সের স্থলে ১ শিলিং ৪ পেন্স করিবার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন চলিতেছিল, এই সুযোগে বিনিময় হার পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারত সরকার কিন্তু প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব লইতে সাহস করিলেন না এবং ফলে সাধারণ দেশবাসীর দিক হইতে আগ্রহ সত্ত্বেও টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং ৬ পেন্সই রহিয়া গেল। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ষ্টার্লিং টাকার বিনিময় হার অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও ভারত সরকার ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ ও ৪১ নং ধারা সংশোধন করিয়া লন এবং তদ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্রিটিশ মুদ্রা ষ্টার্লিংয়ের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন মুদ্রা হিসাবে টাকার আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় হার স্থির করিবার অধিকারী হন। গত জানুয়ারী মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই জানান যে, ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং ও ভারতীয় টাকার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সকল সম্পর্কের অবসান ঘটিয়াছে এবং এখন ইনটার ন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের আওতায় ভারতবর্ষ টাকার যে (স্বর্ণ) মূল্য স্থির করিয়াছে, তদনুযায়ীই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইতেছে।

যুদ্ধোত্তরকালেও দুনিয়ার মুদ্রা ব্যবস্থা একরূপ যুদ্ধের আগের পর্য্যায়েই চলিতেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ক্রমশঃ অধিকতর উদ্বৃত্ত দেশ হইয়া উঠিতেছিল সত্য, কিন্তু পাছে ঘাটতি দেশগুলির অর্থাভাব ঘটিলে মার্কিনী রপ্তানী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ধনতান্ত্রিক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তজ্জন্য মানবতার নাম করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় দেশগুলিকে মার্শাল সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করে এবং ব্রিটেন সমেত ১৯টি ইউরোপীয় দেশ এই পরিকল্পনানুযায়ী মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করে। প্রাচ্যের ঘাটতি দেশগুলির জন্যও কোনরূপ মার্কিন সাহায্য দেওয়া যায় কিনা, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে তাহা লইয়াও মাথা ঘামাইতে দেখা যাইতেছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ক্রমশঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে এত বেশী চলিয়া যাইতে লাগিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে অপরাপর দেশগুলির অবস্থা এমনি শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল যে, মার্কিন সাহায্য এবং বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ভার সাম্য তথা মুদ্রানৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টাতেও শেষ পর্য্যন্ত কাজ হইল না। ব্রিটেনকে পুরোভাগে রাখিয়া ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একান্ত অসহায়ভাবেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল। এ অবস্থায় প্রথমটা মার্কিন পণ্য আমদানী কমাইয়াই আত্মরক্ষার চেষ্টা তাহারা করিল সত্য এবং ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলি মার্কিন এলাকা হইতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের হিসাবে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ কম মালপত্র আমদানীর সিদ্ধান্ত করিল। ব্রিটিশ অর্থসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস গত ১৪ই জুলাই এই মর্ম্মে একটি বিবৃতিও সংবাদপত্রে প্রকাশ করিলেন। ব্রিটেন মার্শাল পরিকল্পনানুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যতদূর সম্ভব বেশী সাহায্য সংগ্রহেও সচেষ্ট ছিল, কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষ যখন জানাইলেন যে, ব্রিটেন যে পরিমাণ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছে, ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দের হিসাবে তদপেক্ষা শতকরা ৩৬ ভাগ কম বরাদ্দ করা হইয়াছে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তখন মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ইহার পরও অধিকতর মার্কিন সাহায্য লাভে শেষ চেষ্টা করিতে ব্রিটেন ছাড়ে নাই; ব্রিটিশ অর্থ সচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও বৈদেশিক সচিব মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন গত ৩১শে আগষ্ট বিমান যোগে ওয়াশিংটন যাত্রা করিলেন। ওয়াশিংটনে ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ব্রিটিশ, মার্কিন ও ক্যানাডিয়ান অর্থসচিব ও বৈদেশিক সচিবদের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন বসিল এবং এই সম্মেলন শেষ হইল ১২ই সেপ্টেম্বর। ব্রিটেন যাহাতে ডলার সঙ্কট হইতে মুক্তি পায় তজ্জন্য ব্রিটেনের ডলার ব্যয় সঙ্কোচ ও অধিকতর স্বাধীনতার সহিত মার্শাল সাহায্য খরচ করিবার স্বাধীনতা লাভের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীভূত হয়। মোটের উপর ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলকে এই সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখা যায় এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে ফিরিয়া অর্থসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আলোচ্য ওয়াশিংটন সম্মেলনকে সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্যজনক সরকারী সম্মেলনরূপে বর্ণনা করেন (**The most successful we have ever had**)।

ইহার পরদিন অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের কথা ঘোষণা করেন। ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা এবং মজুত স্বর্ণসম্পদের পরিমাণ এমন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে এই ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের সংবাদ লোকের কাছে অত্যধিক গুরুতর হইলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু প্রথমতঃ অর্থসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কিছুদিন পূর্ব্বে সুইটজারল্যাণ্ডে স্বাস্থ্যান্বেষণে যাইবার পূর্ব পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে মুদ্রামূল্য হ্রাসের সমর্থন করেন নাই বলিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ মুদ্রামূল্য হ্রাস ছাড়া অন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ডলার সঙ্কট এড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া অর্থসচিবের ঘোষণায় সারা জগতে সাড়া পড়িয়া গেল। অর্থসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড অবশ্য জানাইলেন যে, ওয়াশিংটন যাত্রার আগেই ব্রিটেনের চরম অর্থসঙ্কট হইতে আত্মরক্ষার প্রকৃষ্টতম উপায় হিসাবে তাঁহারা মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবেন বলিয়াই স্থির

করিয়া লইয়াছিলেন।* যাহা হউক অর্থসচিবের এই ঘোষণার ফলে ষ্টার্লিংয়ের মূল্য অভাবিতভাবে কমিয়া গেল। এই ষ্টার্লিংয়ের চলতি বিনিময় মূল্য ছিল ৪ ডলার ৩ সেণ্ট, ইহা রাতারাতি কমিয়া দাঁড়াইল ২ ডলার ৮০ সেণ্ট। পূর্বে উল্লিখিত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের হিসাবে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ এই ১৮ বৎসরের মধ্যে দুইবার বিনিময় হারের পরিবর্ত্তনের ফলে এক ষ্টার্লিং ৪ ডলার ৮৬ সেণ্ট হইতে ২ ডলার ৮০ সেণ্টে নামিয়া আসিল।

ব্রিটেন ষ্টার্লিংয়ের মুদ্রামূল্য কমাইল বলিয়া ষ্টার্লিং এলাকার সমস্ত দেশের সম্মুখে নিদারুণ এক সমস্যার উদ্ভব হইল।' আইনগতভাবে ব্রিটিশ মুদ্রার সহিত কোন বাধ্যতামূলক যোগাযোগ না থাকিলেও আন্তর্জ্জাতিক লেনদেনে ব্রিটিশ মুদ্রা ষ্টার্লিংয়ের উপর ষ্টার্লিং এলাকার সকল দেশের মুদ্রারই নির্ভরশীলতা ছিল যথেষ্ট, এখন ষ্টার্লিংয়ের মূল্য-হ্রাস ঘটায় ইহাদের মুদ্রাব্যবস্থাতেও স্বভাবতঃই বিশৃঙ্খলা দেখা দিবার সম্ভাবনা ঘটিল। অবস্থার যাহাতে দ্রুত অবনতি না হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রধানতঃ কমনওয়েলথযুক্ত ও ইউরোপীয় ১৪টি দেশের সহিত ভারতবর্ষ (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র) সঙ্গে সঙ্গে ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস ঘোষণা করিল। ভারতবর্ষে মুদ্রাব্যবস্থার সমতা রক্ষার জন্য ১৯, ২০ ও ২১শে সেপ্টেম্বর সমস্ত ব্যাঙ্কেও কাজ কারবার বন্ধ রাখা হইল এবং ষ্টার্লিংয়ের সমান হারে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য কমাইয়া প্রতি টাকার ডলার-বিনিময় মূল্য দাঁড় করান হইল ৩০·২২৫ সেণ্টের স্থলে ২১ সেণ্ট। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর ষ্টার্লিং বা টাকা কাহারও অন্তর্দ্দেশীয় মূল্যের কোনরূপ তারতম্য হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ষ্টার্লিং টাকার বিনিময় হার আগের মত ১ টাকা=১ শিলিং ৬ পেন্সই রহিল।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের মুদ্রামূল্য হ্রাস নীতি সরাসরি স্বীকার করিয়া লইল বটে, কিন্তু পাকিস্তান বিপরীত পথ গ্রহণ করিল। সমস্ত কমনওয়েলথযুক্ত দেশের মধ্যে একমাত্র পাকিস্তানই মুদ্রামূল্য কমাইতে রাজী হইল না। পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্কের গবর্ণর, পাকিস্তান সরকারের অর্থবিভাগীয় সেক্রেটারী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া পাকিস্তান মন্ত্রিসভার করাচীতে এক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। পাকিস্তান বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আর্থিক লেনদেন হঠাৎ একটা সঙ্কটজনক অবস্থায় উপনীত হইল এবং প্রচলিত পাক-ভারত আর্থিক চুক্তি অকস্মাৎ বানচাল হইয়া গেল। এই চুক্তির ১নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছিল যে, ভারতীয় টাকা এবং পাকিস্তানী টাকার সরকারী বিনিময় হারে উভয় মুদ্রার মূল্য সমান ধরা হইবে এবং যথাযথ নোটিশ ও পারস্পরিক আলোচনা না করিয়া কোন কর্ত্তৃপক্ষই এই সমমূল্য বিনিময় হারের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। এখন পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য অনুরূপ হওয়ার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে টাকার অবাধ লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২১শে সেপ্টেম্বর সকল ব্যাঙ্ককে জানাইয়া দিলেন যে পাকিস্তানী টাকার ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন দর উল্লেখ করিতে পারিবেন না। দুর্গাপূজার মুখে এই ঘোষণা ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেই এক শ্রেণীর নরনারীর জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যের হইল নিদারুণ ক্ষতি।

নূতন যে বিনিময়হার ঘোষিত হইল তাহাতে পাকিস্তানী টাকার ডলার মূল্য অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া প্রতি টাকা আগের ৩০·২২৫ সেণ্টই বলবৎ রহিল। প্রতি পাকিস্তানী টাকার ষ্টার্লিং বিনিময়হার হইল আগের ১ শিলিং ৬ পেন্সের স্থলে ২ শিলিং ১·৯ পেন্স। আগে ভারতীয় ও পাকিস্তানী টাকার দর সমান ছিল, এখন প্রতি একশত পাকিস্তানী টাকার বিনিময় মূল্য হইল ১৪৪ ভারতীয় টাকা (এই অর্থে এখন ১০০ ভারতীয় টাকার বিনিময়ে পাকিস্তানের ৬৯ টাকা ৮ আনা পাওয়া যাইবে)।

আগেই বলা হইয়াছে ব্রিটেন ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস করিয়াছে প্রচণ্ড ডলার সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষা করিতে। বাড়তি ডলার না পাইলে ব্রিটেনের চলিতে পারে না। ষ্টার্লিংয়ের মূল্যহ্রাসের ফলে ব্রিটেনের নিরাপত্তা হিসাবে মজুত স্বর্ণসম্পদের প্রয়োজন কমিয়াছে, ডলার এলাকার ষ্টার্লিং এলাকার পণ্য সস্তা হইবে বলিয়া ব্রিটেনের পক্ষে রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াইয়া বাড়তি ষ্টার্লিং উপার্জ্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে। এ ছাড়া এই ষ্টার্লিং মূল্য হ্রাসের দ্বারা লোকচক্ষুর অগোচরে ব্রিটেনের আর একটি বিরাট স্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়াছে! সকলেই জানেন, বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় দেশের নিকট ষ্টার্লিং দেনার চাপে ব্রিটেন এখন অত্যন্ত বিপন্ন। ব্রিটেনের এই ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ১৩৫০ কোটি পাউণ্ড বা আগের বিনিময়হারের হিসাবে ৫৪৪১ কোটি ডলার। ষ্টার্লিংয়ের ডলার মূল্য কমাইয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এক কলমের খোঁচায় ১৬৬১ কোটি ডলার দেনা কমাইয়া লইয়াছেন। ষ্টার্লিং এলাকার পণ্য সস্তা হইবার ফলে বাড়তি ডলার উপার্জ্জিত হইলে তো কথাই নাই, যদি তা নাও হয়, তাহা হইলেও এই ভাবে ব্রিটেন বর্ত্তমানের হিসাবে দশ বৎসরের ডলার ঘাটতি পূরণ ক্ষমতা এক সিদ্ধান্তেই অর্জ্জন করিয়া লইয়াছে। এ হিসাবে মুদ্রামূল্য হ্রাসে ব্রিটেন বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় হিসাবেই লাভবান হইয়াছে বলা চলে।

এখন প্রশ্ন এই যে, ভারতসরকার যে এতটুকু বিলম্ব না করিয়াই মুদ্রামূল্য হ্রাসে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা সুবিবেচনা বা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হইয়াছে কি না? পাকিস্তান মুদ্রামূল্য হ্রাসে সম্মত না হওয়ায় যে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব

---

* ব্রিটেনের মজুত স্বর্ণসম্পদের পরিমাণ ডলার সঙ্কটের চাপে আতঙ্কজনকভাবে হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই সম্পদের মূল্য ছিল ৫৫ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে ইহা ৪৭ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ে দাঁড়ায়, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই ইহা কমিতে কমিতে ৪০ কোটি ৬০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ে পৌঁছায়। ব্রিটেনের মুদ্রাব্যবস্থার নিম্নতম নিরাপত্তার পক্ষে এই স্বর্ণসম্পদ যথেষ্ট নয় (আমার লেখা ১৩৫৬, ভাদ্রের ভারতবর্ষে ষ্টার্লিং এলাকায় ডলার সঙ্কট শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

হইয়াছে, বিশেষ করিয়া তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটি বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটেন তাহার বাহিরের দেনার যে উল্লেখযোগ্য অংশ এক পয়সা খরচ না করিয়া কমাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে ভারত ও পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যথেষ্ট পরিমাণে। ইতিপূর্ব্বে যখন ষ্টার্লিং চুক্তি হয়, তখন ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি আদায় করা উচিত ছিল যে, ভবিষ্যতে কখনও হিসাবের কোন ফাঁকেই ব্রিটেন তাহার দেনার পরিমাণ কমাইতে পারিবে না। তখন সে ব্যবস্থা হয় নাই, কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের এই ত্রুটিতে মারাত্মক ফল ফলিবার সম্ভাবনা সম্পর্কে তখন অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৩৫৫, ভাদ্রের ভারতবর্ষে আমার লেখা ষ্টার্লিং চুক্তি সম্পর্কিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এখন ব্রিটেনের শতকরা ৩০.৫ ভাগ টাকা পিছু পাঁচ আনা খারিজ করিয়া দিবার এই সিদ্ধান্তে কার্য্যতঃ ভারতের ২৪২ কোটি টাকা ও পাকিস্তানের ৬৮ কোটি টাকা, একুনে ৩১০ কোটি টাকা (মোট ৯৩ কোটি ডলার) পাওনা বাতিল হইতে চলিয়াছে। অথচ সকলেরই নিকট ইহা সুবিদিত যে ষ্টার্লিং পাওনা শিল্পের হিসাবে একান্ত অনগ্রসর ভারত বা পাকিস্তানের পক্ষে শুধু পাওনার অঙ্ক নয়, ইহা এই দুই বহু সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আর্থিক পুনর্গঠনের একমাত্র আশাভরসা স্থল। এ হিসাবে এই পাওনা খারিজ হওয়ার অর্থ—ডলার এলাকা হইতে ভারতবর্ষ বা পাকিস্তান ন্যায্য পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানীতে সমর্থ হইবে না এবং ফলে তাহার আর্থিক পুনর্গঠন ব্যাহত হইয়া দেশব্যাপী ভয়াবহ দারিদ্র্য চিরকালীন হইয়া দাঁড়াইবে। এই জন্যই গত ৫ই অক্টোবর ভারতীয় গণপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে অধ্যাপক কে টি শাহ প্রস্তাব করেন যে, ষ্টার্লিং ব্যালান্সের আগের ডলার মূল্য যাহাতে একটুও না কমিতে পারে তজ্জন্য ভারতসরকার প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করুন এবং ব্রিটিশ মুদ্রা পাউণ্ডের সহিত সব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নোটের জামিন হিসাবে সঞ্চিত তহবিলের ভিত্তিতে ভারতীয় টাকার দর নির্দ্ধারিত হউক।

ইহা গেল আগের ভুলের মাশুল। এখন ভারতসরকারের সিদ্ধান্তের লাভলোকসানের হিসাব ধরা যাক। নীতির দিক হইতে নিজ দায়িত্বে হঠাৎ ব্রিটেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাস ভারতের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন। ভারতের সহিত পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশের মুদ্রার বাট্টাহার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, ভারতসরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে এই সব দেশের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল। ভারতসরকার তাহা করেন নাই বলিয়া ইহাদের স্বভাবতঃই অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। পাকিস্তান এবং সিংহল সরকার তো ভারতসরকারের অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এইভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে তাড়াহুড়া করিয়া কোন সিদ্ধান্তগ্রহণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ করা রাজনীতির হিসাবে নিশ্চয়ই লাভজনক নয়।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের সপক্ষে ব্রিটিশসরকারের মত ভারতসরকারের সব চেয়ে বড় যুক্তি এই যে, ইহার ফলে ডলার এলাকায় ভারতীয় পণ্য সস্তা হইয়া অধিকতর পরিমাণে বিক্রীত হইবে এবং ফলে ডলার উপার্জ্জিত হইবে বেশী। এই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু স্বয়ং গত ১৯শে সেপ্টেম্বরের এক বিবৃতিতে আশার কথা শুনাইয়াছেন ("Devaluation encourages export and helps business in the Country.")। কাগজে কলমে এই মতবাদের মূল্য যাহাই হউক, ভারতের পক্ষে কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কতখানি সাফল্যজনক হইবে তাহা লইয়া কিন্তু ইতিমধ্যেই অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়াছে। কথাটা অনস্বীকার্য্য যে জিনিষ সস্তা হইলে জিনিষ কাটে বেশী, কিন্তু ডলার এলাকার জিনিষ সস্তা করিতে গিয়া ভারতবর্ষকে অতঃপর প্রতিটি ডলার অর্জ্জন করিতে আগের হিসাবের যে শতকরা ৪৪ ভাগ বেশী মাল দিতে হইবে, তাহাও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এইভাবে অতিরিক্ত মাল পাঠাইয়া রপ্তানী কত বাড়ানো সম্ভব—যাহাতে ভারতের পক্ষে আগের তুলনায় লক্ষণীয় অধিক পরিমাণ ডলার অর্জ্জিত হইতে পারে? তাছাড়া টাকার দাম শতকরা ৩০.৫ ভাগ কমিয়া যাওয়ায় ডলার এলাকার পণ্যের দাম এদেশে এমনিই এক-তৃতীয়াংশ বাড়িয়া যাইবে এবং বর্ত্তমান চোরাকারবারের যুগে ব্যবসাদারদের কৃপাদৃষ্টি হইলে সে বৃদ্ধি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না। যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও নানাপ্রকার ভোগ্যপণ্যের জন্য ভারতবর্ষ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ডলার এলাকার উপর যেরূপ নির্ভরশীল, তাহাতে এই মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ ভারতবাসীর জীবনের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করিবেই। অবশ্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু হইলে অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে থাকিতে পারে। ভারতসরকার মুদ্রামূল্য হ্রাসের সুবিধা লইয়া ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের সাধু সংকল্প জোরগলায় ঘোষণাও করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ফাটকাবাজীর দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করিতে ভারতসরকার গত ২১শে সেপ্টেম্বর এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও চোরাকারবারীদের আয়ত্তে রাখিতে সরকার দীর্ঘকাল যেভাবে ব্যর্থকাম হইয়াছেন তাহাতে এক্ষেত্রেও তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট আশা পোষণ করিতে সাহস হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কঠোরতার এতটুকু অভাব ঘটিলে শুধু ডলার এলাকার পণ্যেরই দাম বাড়িবে না, বিদেশী জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে দেশী জিনিষপত্রের দাম অনিবার্য্য ভাবে বাড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমান পণ্যবাজার যদি লক্ষ্য করা যায়, এ সন্দেহ অমূলক নহে বলিয়াই মনে হইবে।

সবচেয়ে বেশী মুস্কিল হইয়াছে পাকিস্তানের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে। পাকিস্তান ডলারের হিসাবে টাকার মূল্যহ্রাসে সম্মত না হওয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পণ্য চলাচল ব্যবস্থা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দুইটি রাষ্ট্রে জিনিষপত্রের দর হইবে দুইপ্রকার। পাকিস্তান কাপড়, লোহা, কয়লা প্রভৃতি নানা জিনিষের

জন্য ভারতের উপর নির্ভর করে এবং ভারতবর্ষ পাট, তুলা, কাঁচা চামড়া, খাদ্যশস্য প্রভৃতির হিসাবে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী। আপেক্ষিক ভাবে বিবেচনা করিয়া পাট, তুলার জন্য ভারতের মুখাপেক্ষিতাই বেশী। বর্তমান বৎসরে আন্তঃ-ডোমিনিয়ন চুক্তিমত পাকিস্তানের ভারতকে সাড়ে চারি লক্ষ গাঁইট তুলা, চল্লিশ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট এবং ২৪ লক্ষ চামড়া যোগাইবার কথা। শুধু এই পাট ও তুলার আগেকার দর ছিল ১১০ কোটি টাকা, এখন প্রতি একশত ভারতীয় টাকা মাত্র সাড়ে উনসত্তরটি পাকিস্তানী টাকার সমান হওয়ায় এ হিসাবে ভারতকে দিতে হইবে ১৫৮ কোটি টাকা। পাক-ভারত বাণিজ্যে এখন বাণিজ্যিক গতি ভারতের প্রতিকূলে (১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বাণিজ্যে পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত হয় ২৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা), এ সময় পাকিস্তানের পাওনা বাড়িয়া গেলে তাহা ভারতবর্ষ কি ভাবে শোধ করিবে? বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ ইকনমিকস্ এণ্ড সোসিওলজির' ডাইরেক্টর অধ্যাপক এন সি ভাকিল গত ২৬শে সেপ্টেম্বর এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অবশ্য মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতসরকারের পক্ষে বর্তমানে আত্মরক্ষা করিতে হইলে পাকিস্তানে রপ্তানী দ্রব্যাদি অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। পাকিস্তানের জিনিষের উপর শুল্ক বাড়াইয়া এদেশে উৎপন্ন জিনিষপত্রের দাম কমাইবার চেষ্টাকে তিনি ভ্রান্তবুদ্ধি-প্রসূত বলিয়াছেন। ভারত বিভাগের সময় ঋণভারের যে অংশ পাকিস্তানের ভাগে পড়িয়াছিল, সেই চারিশত কোটি টাকা পাকিস্তান স্বাধীনতালাভের পাঁচ বৎসর পরে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশটি কিস্তিতে ভারতকে শোধ দিবে, এইরূপ কথা আছে। অধ্যাপক ভাকিল পরামর্শ দিয়াছেন যে, বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির বিবেচনায় ভারতসরকার পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য ঘাটতি সেই দেনা হইতে পূরণ করিয়া লউন। বলা নিষ্প্রয়োজন, জরুরী অবস্থায় অধ্যাপক ভাকিলের এই প্রস্তাব ভারতসরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

এছাড়া পাকিস্তান ও ভারতের মুদ্রামূল্য বৈষম্যের ফলে ভারতের উপর জনবাহুল্যের চাপও বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ইহাতে খাদ্যসমস্যা, বেকারসমস্যা, সবই তীব্রতর হইতে পারে। এতদিন অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাজকারবার করিয়াছে এবং তাহাদের পরিবারবর্গ তাহাদের প্রেরিত টাকায় পাকিস্তানে জীবনধারণ করিয়াছে। এখন টাকার বাট্টাহার পরিবর্তিত হওয়ায় ভারত হইতে প্রেরিত অর্থ পাকিস্তানে কমিয়া যাইতেছে এবং ফলে আগের মত সে টাকায় পোষ্যবর্গের দিন চলা অসম্ভব। এক্ষেত্রে শুধু অসংখ্য হিন্দু নয়, বহু মুসলমান নরনারীরও পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসা অসম্ভব নয়।

আগেই বলা হইয়াছে ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশ বলিয়া ব্রিটেন মুদ্রামূল্য হ্রাস করায় ভারতবর্ষ একপ্রকার নিরুপায় অবস্থাতেই ঘটনাপ্রবাহের সহিত তাল রাখিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে। ইহার ফলে ডলার এলাকার সহিত বাণিজ্যে সুবিধা যদি খুব বেশী নাও হয়, ষ্টার্লিং এলাকাযুক্ত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতের অনেক সুবিধা হইবে বলিয়া ভারতসরকার আশা করিতেছেন। ঘরের পাশে ঘনিষ্টতম প্রতিবেশী পাকিস্তান অপ্রত্যাশিত ভাবে মুদ্রামূল্য হ্রাসে রাজী না হওয়ায় অবশ্য জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, তবে এখনও অনেকে আশা করিতেছেন যে ভারত ও ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া হয়তো পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত সংকল্পের পরিবর্তন করিবে এবং মুদ্রামূল্য হ্রাসে রাজী হইবে। যাহা হউক, ইহা ভবিষ্যতের কথা এবং ইহা লইয়া এখন জল্পনা কল্পনা বৃথা। উপস্থিত ষ্টার্লিং পাওনা হ্রাস পাইল বলিয়া বিশেষভাবে এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের সংস্কারের সহিত আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণে যতটা সাফল্যলাভ করিতে পারে, ততই তাহার ভবিষ্যতের হিসাবে মঙ্গল।

স্মরণ-রেণুর গন্ধে

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শতেক কাজের ফাঁকে পাও যদি কভু অবসর—
নিতান্ত নির্জনে বসি' দক্ষিণের বাতায়ন খুলে,
সুদূর দিগন্তে চাহি' ফাগুনের গন্ধ-গানে ভুলে,
আমার কবিতাগুলি পড়ি' মোর মরণের পর
মনে মনে ভেবো শুধু কা'রে আমি করেছি অমর।
তখন আষাঢ় যদি ঘনাইয়া আসে আঁখি-কূলে,
প্রাণের প্রাণান্ত ভরি' সাগরের অধীরতা তুলে,
কবিতার খাতাখানি চেপে ধোরো বুকের উপর।

লেখনীর দিল প্রাণ, ছন্দ দিল যে তা'র ভাষায়,
সঙ্গতা-সৌরভ যা'র বহে আজো মধু-সমীরণ,
কাতর মিনতি মূক-নয়নের অশ্রু-কুয়াশায়
আখরে আকার দিনু এ-ফাগুনে তাহারি কারণ।

বিফল-বসন্তে একা সেই স্বপ্নে সঙ্গোপনে বসি'
স্মরণ-রেণুর গন্ধে রচিলাম ক্ষুদ্র চতুর্দশী ॥
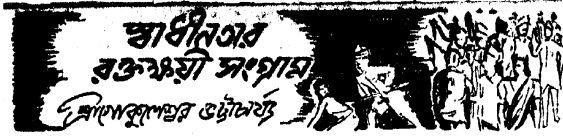
(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তারকেশ্বর দস্তিদার গ্রেপ্তার হওয়ার পর Indian Republican Army-র চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবীদের দ্বারা সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইলেন বিনোদ দত্ত। দলের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী মহেন্দ্র চৌধুরীও গ্রেপ্তার হইলেন।

সূর্য্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তকে লইয়া চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সংক্রান্ত তৃতীয় দফা মামলার বিচার আরম্ভ হইল ১৯৩৩ সালের ২৬শে জুন হইতে। জেলখানার নিকটবর্ত্তী গোয়েন্দা কার্য্যালয়ের একটি কক্ষে অতিশয় সতর্কতার সহিত তাঁহাদের বিচার চলিতে লাগিল। এই বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হইল —তাহাতে রহিলেন মিঃ W. Mcsharpe, রজনী ঘোষ ও খন্দকার আলি তায়েফ। আলিপুর কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর সহায়তায় সরকার পক্ষে মামলা পরিচালিত করিতে লাগিলেন। অভিযুক্তদের পক্ষে রহিলেন কৌসলি জে, ঘোষাল, বিনোদলাল সেন ও রজনী বিশ্বাস। সরকার পক্ষে প্রায় ১২৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং ইহা প্রমাণ করা হয় যে তারকেশ্বরই ইন্সপেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিচারে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন—আর কল্পনা দত্তের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। এখানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ছয় বৎসর কারারুদ্ধ রাখিবার পর শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ কল্পনা দত্তকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যখন সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার চট্টগ্রাম জেলের Condemned cell-এর নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অনুবর্ত্তী কয়েকজন যুবকের দ্বারা ১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারি প'ল্টন মাঠে আবার একটি আক্রমণ পরিকল্পনা স্থির হইল। দুইজন প্রিয় নেতার প্রতি প্রদত্ত ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনই বোধ হয় এই আক্রমণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল। প'ল্টন মাঠে ঐদিন শ্বেতাঙ্গদিগের ক্রিকেট খেলা হইবার কথা ছিল, সুতরাং দর্শক হিসাবে সেদিন সাহেব-মেমের সংখ্যাও মাঠে কম হইবার কথা নহে। বিপ্লবীরা স্থির করিলেন যে দর্শকগণের বসিবার আসনের নিম্নে ডিনামাইট স্থাপন করিয়া ক্রীড়াদর্শন-রত বহু ইউরোপীয়কে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া এক সঙ্গে উড়াইয়া দিবেন। এই উদ্দেশ্যে হিমাংশু ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও নিত্য-গোপাল ভট্টাচার্য্য নামক চারিজন তরুণ যুবক উক্ত দিবসে দ্বিপ্রহরে ডিনামাইট বসাইবার জন্য খেলার মাঠে গমন করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগকে খেলার মাঠে দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি পুলিশের সন্দেহ হয় এবং শীঘ্রই বিপ্লবীদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধে। হিমাংশু ভট্টাচার্য্য ও নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রহরীদের গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। ধরা পড়িলেন অবশিষ্ট দুইজন—হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী। বিচারের পর পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের দুইজনেরই ফাঁসি হইয়াছিল।

জেলের কর্ত্তৃপক্ষ সূর্য্য সেনকে একখানি রামায়ণ দিয়াছিলেন—কারাকক্ষে তিনি পরম আগ্রহভরে উহাই পাঠ করিতেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির তারিখ গোপন রাখা হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের আশঙ্কা ছিল যে পূর্ব্বাহ্ণে ফাঁসির তারিখ প্রকাশ হইয়া গেলে শেষ পর্য্যন্ত আবার হয় তো কোন একটা গণ্ডগোল বাধিয়া বসিবে; কিন্তু এত গোপনীয়তা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তারিখটি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলের রাজনৈতিক বন্দীগণ জেল ওয়ার্ডারের নিকট হইতে গোপনে জানিতে পারিলেন যে উক্ত দিবসেই সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসি দেওয়ার আয়োজন চলিতেছে। সূর্য্য সেনও ইহা জানিতে পারিয়া অন্যান্য বন্দীদের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি তাঁহাদের উদ্দেশে কিছু বলিবেন। এই খবর পাইয়া সকল বন্দীই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

দিবসের শেষে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। সন্ধ্যার অল্প পরে নেতা সূর্য্য সেন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর তাঁহার প্রকোষ্ঠের লৌহদ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। দুই হাত দিয়া লোহার গরাদগুলি ধরিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম চীৎকার করিয়া উঠিলেন, —"বন্দেমাতরম্।" ঋষি বঙ্কিমের প্রচারিত মন্ত্র যেন সেদিন প্রাণময় হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের অপেক্ষা মাত্র। চট্টগ্রাম কারাগারের শত শত রাজবন্দী এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রিয় নেতার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইবামাত্র তাঁহারা হইয়া উঠিলেন অধীর ও উদ্বেল। সূর্য্য সেনের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহারা মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে কারাকক্ষ মুখর করিয়া তুলিলেন। প্রত্যেকটি রাজবন্দী যেন তড়িতাহত হইয়া সজাগ হইয়া উঠিলেন। জেলখানার স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা রাজ-বন্দীদের কলরোলে টুটিয়া গেল।

কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশে সূর্য্য সেন যখন তাঁহার শেষ বক্তব্য নিবেদন করিতে সুরু করিলেন, তখন জেলখানা আবার নিস্তব্ধ হইল। সূর্য্য সেন বলিয়া চলিলেন,—"হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আমি তোমাদিকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্ম্মির চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবিগণ আমরা সারা জগতের স্বাধীনতা-কামীদের বন্ধু ও সমগোত্রীয়। বিশেষ কোন অঞ্চল বা দল-এর সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ পরিচালিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে অত্যাচারী বৈদেশিক শাসন-শক্তি অহরহ আমাদিগকে শোষণ

ক'রছে—সেই শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য—আমাদের উদ্দেশ্য দরিদ্রদের বাঁচার ব্যবস্থা করা। যে বিদ্রোহের আগুন আমরা জ্বালিয়েছি—তোমরা তাকে নিভতে দিও না। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের জবাব আমরা জালালাবাদে দিয়েছি। তোমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ এনো না, দলাদলির সৃষ্টি ক'রে দেশের কাজ ভুলে যেয়ো না। ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির আদর্শকে তোমরা সার্থক ক'রে তুলো—শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত অকাতরে ঢেলে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন ক'রো। স্বাধীন দেশে প্রতিষ্ঠিত ক'রো প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেদিন আর তোমাদিগকে কেউ বিদ্রোহী ব'লবে না—তোমরাই হবে সেদিন জাতির সবচেয়ে বড়ো সেবক। আমাদের শুভেচ্ছা তোমাদের যাত্রাপথকে জয়যুক্ত ক'রবে। বন্ধুগণ, তোমরা সবাই বলো—বন্দেমাতরম্।"

শত শত বিপ্লবীকণ্ঠ পুনরায় চট্টগ্রাম জেলের কক্ষে কক্ষে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সমগ্র জেলখানাকে কাঁপাইয়া তুলিল—জানালা-দরজার কপাটগুলি কম্পিত হইতে লাগিল সেই ধ্বনির ঝঙ্কারে। সূর্য্য সেনের পর তারকেশ্বরও তাঁহার প্রকোষ্ঠ হইতে বন্দীদের উদ্দেশে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন এবং তাহার পর গান গাহিতে সুরু করিলেন। জেলখানা তখন মিলিটারি কর্ত্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে—জেলখানার বাহিরে কারফিউ অর্ডারগ্রস্ত নিস্তব্ধ চট্টগ্রাম সহর। বন্দীদের মুখে শ্লোগান শুনিয়া ও তাঁহাদের মধ্যে অসাধারণ চাঞ্চল্য দেখিয়া জেলখানার প্রতি কক্ষে মিলিটারিরা গিয়া প্রবেশ করিল এবং বন্দীদিগকে প্রহার করিতে লাগিল নির্দ্দয়ভাবে। বহু বন্দী ইহার ফলে সাংঘাতিকভাবে আহত হইলেন। এত কাণ্ড করিয়াও কিন্তু বিপ্লবীদিগকে শায়েস্তা করা গেল না—জেলের কর্ত্তৃপক্ষ অতিশয় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

ফাঁসির আসামীদের সাধারণতঃ ভোর বেলাতেই ফাঁসি দেওয়া হয়; কিন্তু বন্দীদের মধ্যে চাঞ্চল্য উত্তরোত্তর যেরূপ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে ভোরবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে কর্ত্তৃপক্ষ আর সাহস করিলেন না। মধ্য রাত্রেই দুইজন বিপ্লবী-নেতার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে তাঁহারা উদ্যোগী হইলেন।

রাত্রির অন্ধকারে নিমজ্জিত চট্টগ্রাম কারাগার। সশস্ত্র প্রহরীরা গভীর রাত্রিতে আসিয়া অতি সন্তর্পণে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বরের Condemmed Cell-এর লৌহদ্বার উদ্ঘাটিত করিল। সূর্য্য সেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে শেষ পর্য্যন্ত বিপ্লবীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আমরণ সংগ্রাম করিয়া মৃত্যু-বরণ করিবেন। তাই প্রহরীরা দ্বার উন্মুক্ত করা মাত্র তিনি ভীম বিক্রমে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাগ্রে যে প্রহরীটি ছিল, সূর্য্য সেনের ঘুষির আঘাতে সে ধরাশায়ী হইল। তারকেশ্বরকে তাঁহার প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করা হইলে তিনিও মাষ্টারদার দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিলেন। প্রহরীরাও নির্ম্মমভাবে তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল।

তাঁহাদের প্রকোষ্ঠ হইতে ফাঁসিমঞ্চ অধিক দূরে নয়—প্রহার করিতে করিতে প্রহরীরা তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। সূর্য্য সেনকে এত প্রহার করা হইল যে, তাঁহার নাকের হাড় ও দাঁত ভাঙিয়া গেল—সমগ্র মুখমণ্ডল ও পরিচ্ছদ রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল। তারকেশ্বর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহারা চীৎকার করিতে লাগিলেন—"বন্দেমাতরম্". আর নিজ নিজ কক্ষ হইতে অন্যান্য বন্দীরাও চীৎকার করিতে লাগিলেন "বন্দেমাতরম্" বলিয়া।

সূর্য্য সেন শেষ পর্য্যন্ত সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। উন্মত্ত জেল কর্ত্তৃপক্ষ সে সব দিকে নজর দিলেন না। তাঁহারা সূর্য্য সেনের সংজ্ঞাহীন দেহটাই ফাঁসিমঞ্চে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইলেন এবং গলায় ফাঁসি রজ্জু পরাইয়া দিলেন। তারকেশ্বরের গলায়ও ফাঁসির রজ্জু পরাইয়া দেওয়া হইল। একই সময়ে একই মঞ্চে দুইজনের ফাঁসির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে চট্টগ্রামের জেলখানায় অতঃপর ঘৃণ্যতম অপরাধের অনুষ্ঠান হইল। লোকচক্ষুর অগোচরে ভারতবর্ষের দুইজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর আনুষ্ঠানিকভাবে ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির পর তাঁহাদের শবদেহ কোথায় লইয়া যাওয়া হইল—তাহাও কেহ জানিতে পারিল না।

জেলের বন্দীরা সেদিন সারা রাত্রি ধরিয়াই প্রহৃত হইতে লাগিলেন। চট্টগ্রাম-বিপ্লবে ইহাই ইতিহাস।

১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হইতেছিল, অন্যান্য বিপ্লবীদের দ্বারা তদ্রূপ বাংলার অন্যান্য স্থানে এবং ভারতবর্ষের আরও দুই-একটি সহরে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হইতেছিল। আইন-অমান্য ও বর্জ্জন আন্দোলন মেদিনীপুর জেলায় চলিতেছিল পুরা দমেই। উক্ত জেলার দাসপুর থানার অধীন চেতুয়া হাটে বিলাতি-বর্জ্জন আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিল এবং বিলাতি বস্ত্রে বহ্ন্যুৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। এই আন্দোলন দমনকল্পে ১৯৩০ সালের ৩রা জুন দারোগা ভোলানাথ ঘোষ তাঁহার একজন সহকারী ও জনকয়েক কনষ্টেবলকে সঙ্গে লইয়া চেতুয়া হাটে গমন করিলেন ও চারিজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিলেন। ধৃত চারিজন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে শীতল ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে দারোগা ভোলানাথ ঘোষ অতি সামান্য কারণে অপমান করিয়া সকলের সম্মুখেই প্রহার করিলেন। এই ঘটনায় উক্ত অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এবং কিয়ৎকাল পরে কয়েক শত লোকের এক ক্রুদ্ধ জনতা সমবেত হইয়া পুলিশদলকে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা দারোগা ভোলানাথ ঘোষ ও তাঁহার সহকারী অনিরুদ্ধ সামন্তকে ধরিয়া লইয়া গেল। অত্যধিক প্রহারের ফলে ভোলানাথ ঘোষের মৃত্যু হইলে তাঁহার লাশকে বিকৃত করিয়া সনাক্তকরণের সকল সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। অনিরুদ্ধ সামন্তের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুণ্ডটি অগ্নিতে দগ্ধ করা হয় এবং শরীরের অবশিষ্টাংশ জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এই ঘটনার তদন্তের জন্য ঘাটালের মহকুমা হাকিম [illegible] সাহেব একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়া ৭ই জুন তারিখে কংসাবতী নদী

তীরে গিয়া উপনীত হইলে নদীর অপর পারে হাজার হাজার লোক সমবেত হইল এবং বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া হাকিমকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। হাকিম তাহাদের উপর গুলি বর্ষণের আদেশ দিলেন। জনতার উপর সশস্ত্র পুলিশদল নির্ব্বিচারে গুলি চালাইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে একটি-দুইটি নহে—চৌদ্দজন লোক গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইল। এই নৃশংস প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারাই অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটিল না। চেতুয়া হাটের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল ব্যাপিয়া জনসাধারণের উপর পুলিশী জুলুম এতই তীব্র আকার ধারণ করিল যে সেখানকার অধিকাংশ লোকই ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইল। পেডি সাহেব ছিলেন এই সময় মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।

মেদিনীপুরের একটি স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে চেতুয়া হাটের ঘটনার জন্য বহু ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিয়া একটি মামলা সুরু করা হয়। এই ট্রাইবুন্যালে ছিলেন ২৪ পরগণার এডিসন্যাল জজ মিঃ লেথব্রিজ, রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ ও মহেন্দ্রনাথ দ'স। বিচারে ১২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও ৫ জনের দুই বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হয়। অপর সকলে মুক্তিলাভ করেন।

কলিকাতার ইণ্টালিতে ১৬নং গোপ লেনে বিনোদবিহারী রায় নামক জনৈক ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীটি ছিল বিপ্লবীদের একটি আড্ডা এবং ময়মনসিংহের বিপ্লবীদের সহিত ইঁহাদের যোগাযোগ ছিল। এই বাটী হইতে মনোরমা ঘোষ এবং বিনোদবাবুর পুত্র শিশিরকুমার বিস্ফোরক প্রস্তুতের উপকরণ কয়েক বোতল নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিড সঙ্গে লইয়া ১৯৩০ সালের ৭ই আগষ্ট ময়মনসিংহ যাত্রা করেন। তারক কর নামক অপর একজন যুবকও পথে ইঁহাদের সহিত যোগদান করেন। পুলিশ কিন্তু কোনও মতে ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া ময়মনসিংহের সরিষাবাড়ী থানায় সংবাদ পাঠাইয়া দেয় এবং ৮ই তারিখে ষ্টীমার জগন্নাথগঞ্জঘাটে পৌছিলে পুলিশ তাঁহাদের তিনজনকে আটক করিয়া সরিষাবাড়ী থানায় লইয়া যায়। কলিকাতায়ও এই উপলক্ষে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মিঃ গার্লিক, লালবিহারী দাস ও রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত বসুকে লইয়া গঠিত আলিপুরের এক স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে ইঁহাদের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে তিনজনের পাঁচ বৎসর হিসাবে এবং দুইজনের তিন বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হইল। একজন বিচারে খালাস পাইলেন বটে, কিন্তু অর্ডিন্যান্স বলে তাঁহাকেও আটক রাখা হইল।

টেগার্ট সাহেবের উপর বিপ্লবীদের ঘৃণা ও ক্রোধ বহুদিন হইতেই পুঞ্জীভূত ছিল। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা ইতিপূর্ব্বে টেগার্ট ভ্রমেই অপর এক ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে পুনরায় টেগার্ট সাহেবের জীবন-নাশের চেষ্টা হইল। ২৫শে আগষ্ট তারিখে দীনেশচন্দ্র মজুমদার, অনুজ সেনগুপ্ত এবং অপর একজন যুবক বোমা ও রিভলবার লইয়া ডালহৌসি স্কোয়ারে একটি মোটর গাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেলা আন্দাজ এগারোটা-সাড়ে এগারোটার সময় টেগার্ট সাহেবের গাড়ীটি যখন তাঁহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহারা সেই গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিলেন। বোমা বিস্ফোরিত হইল বটে, কিন্তু টেগার্ট সাহেব রক্ষা পাইলেন। তখন দীনেশ ও অনুজ একদিকে এবং অপর যুবকটি আর একদিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হেয়ার ষ্ট্রীটে গিয়া দীনেশ ধরা পড়িলেন এবং পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া অনুজ আত্মহত্যা করিলেন। অপর যুবকটি পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন।

অনুজ ছিলেন খুলনা জিলার সেনহাটি গ্রামের অধিবাসী—দীনেশের বাড়ী ছিল বসিরহাটে। ধৃত হইবার পর দীনেশের নিকট হইতে এলুমিনিয়ামের খোলযুক্ত বোমা, রিভলবার ও কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। অনুজের শরীর তল্লাস করিয়াও পাওয়া যায় ঐ একই ধরণের বোমা ও রিভলবার। পরে ইহা প্রমাণিত হয় যে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিভলবার চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত অস্ত্র ছিল। দীনেশচন্দ্রের বিচার হয় একটি স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে। ১৮ই সেপ্টেম্বর মামলার রায় প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

ডালহৌসি স্কোয়ারের ঘটনার পর পুলিশ উক্ত তারিখেই কৈলাস বসু ষ্ট্রীটস্থ ডাঃ নারায়ণ রায়ের বাটী খানাতল্লাস করে এবং এই তল্লাসী কার্য্য কয়েক দিন যাবৎ কলিকাতার অন্যান্য স্থানেও চলিতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ দত্তের বাসা তল্লাস করিয়া পুলিশ গান কটন, বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ ও এলুমিনিয়ামের shell প্রাপ্ত হয়। আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে একটি স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে ডাঃ নারায়ণ রায়, সুরেন্দ্র দত্ত, অম্বিকা রায়, ভূপাল বসু, রসিকলাল দাস, যতীশ ভৌমিক, অদ্বৈত দত্ত প্রভৃতিকে অভিযুক্ত করিয়া এই উপলক্ষে একটি মামলা রুজু করা হয়। ইঁহাদের কাহারও কাহারও নিকট হইতে যে কার্ত্তুজ ও বোমা পাওয়া যায়—তাহা ডালহৌসি স্কোয়ারের ঘটনায় দীনেশচন্দ্র ও অনুজের নিকট হইতে প্রাপ্ত কার্ত্তুজ ও বোমারই অনুরূপ ছিল বলিয়া এই মামলাকে ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত করা হয়। স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল দুইজনকে মুক্তি দিয়া অবশিষ্ট অভিযুক্তদের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করেন। ট্রাইবুন্যালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল হইলে ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই হাইকোর্ট কর্ত্তৃক এই মামলার শেষ বিচার নিষ্পত্তি হয়। হাইকোর্টের বিচারে আরও তিনজন খালাস পান এবং অবশিষ্ট সকলে দণ্ডলাভ করেন। ডাঃ নারায়ণ রায় ও ভূপাল বসুর হয় ১৫ বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর দণ্ড, সুরেন্দ্র দত্তের ১২ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড সহ দ্বীপান্তর দণ্ড এবং রোহিণী অধিকারী ও যতীশ ভৌমিকের যথাক্রমে পাঁচ ও দুই বৎসর হিসাবে কঠোর পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড। জেল হাজতে অবস্থান কালে আসামীগণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হইয়াছিল।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত দীনেশচন্দ্র মজুমদার যখন মেদিনীপুর জেলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোনও রকমে তিনি জেলখানা হইতে পলায়ন করেন। হিজলীর বন্দীনিবাস হইতে [illegible]

দাস ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ও পলায়ন করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা তিনজনে নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে "চিত্রা" সিনেমার বিপরীত দিকের একটি বাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে পুলিশ কোনও মতে সংবাদ পাইয়া উক্ত বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলে এবং তাহার ফলে বিপ্লবীদের সহিত তাহাদের এক সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। উভয়পক্ষ হইতেই গুলি বর্ষণ চলিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত তিনজনেই ধৃত হইলেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় অভিযুক্ত করিয়া যে মামলা হইল—তাহাতে দীনেশচন্দ্র প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, অবশিষ্ট দুইজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল।

ডালহৌসি স্কোয়ার ঘটনার কয়েকদিন পরেই ঢাকাতেও একটি ঘটনা ঘটিল। নারায়ণগঞ্জের জল-পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ এইচ্. এ. এম্. বার্ট অসুস্থ হইয়া ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৯৩০ সালের ২৯শে আগষ্ট সকালের দিকে বাঙ্গালার তৎকালীন ইনস্পেক্টর জেনারল অফ পুলিশ মিঃ এফ্. জে. লোম্যান এবং ঢাকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ মিঃ ই. হড্‌সন হাসপাতালে গিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য। মিঃ বার্টকে দেখিয়া তাঁহারা যখন বাহিরে আসিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের উপর জনৈক আততায়ী গুলিবর্ষণ করিলেন। প্রথমে আহত হইলেন মিঃ হডসন—তাঁহার কোমরে বিদ্ধ হইল রিভলবারের গুলি; কিন্তু মিঃ লোম্যান যে আঘাত পাইলেন—তাহাই অধিকতর মারাত্মক হইল; কারণ গুলি তাঁহার মেরুদণ্ড ভেদ করিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

যুদ্ধোত্তর বার্লিনে এক সপ্তাহ

ডক্টর সুবোধ মিত্র

১৩ই জুলাই বার্লিনের 'গাটো' বিমানঘাঁটিতে পৌছলাম। ইচ্ছা ছিল ট্রেনে ক'রে জার্ম্মানীর অন্যান্য সহরগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে বার্লিনে যাব, কিন্তু রাশিয়ার অবরোধের (blockade) জন্য বার্লিনে ট্রেনে যাতায়াতের সুবিধা নেই। গত এক বৎসর ধরে রাশিয়া তার অধিকৃত জার্ম্মান-সীমানার ভিতর দিয়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নাই; সেইজন্য বার্লিনে যাতায়াতের এবং জিনিষপত্র সরবরাহের ভীষণ অসুবিধা ঘটে, কেন না বার্লিনের চারদিকেই রাশিয়ার অধিকৃত এলাকা। একমাত্র খোলা ছিল আকাশপথ এবং সেই পথ দিয়েই হামবুর্গ এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্রতি ৫ মিনিট অন্তর দিনে এবং রাত্রে সমান ভাবে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বিমানগুলি এতদিন আহার্য্য এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি—এমন কি কয়লা পর্য্যন্ত সরবরাহ ক'রে এসেছে। গত কয়েক সপ্তাহ হ'ল রাশিয়া অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছে বটে কিন্তু এখনও সহজভাবে যানবাহনের চলাচলের ব্যবস্থা হয় নাই।

বিখ্যাত ব্রাণ্ডেনবুর্গ তোরণ এবং Unter Den Linden রাজপথ—(যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা)

বিমানঘাঁটি থেকে বার্লিন সহর প্রায় ১৫ মাইল। পাইন বনের ভিতর দিয়ে সুন্দর রাস্তা। আশে পাশে বেশী ঘর বাড়ী নেই। মাঝে ২টী সেতু ছিল; যুদ্ধের সময় বোমায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে; বড় বড় ইস্পাতের কড়িগুলি বেঁকে স্ক্রুর মত পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। তারই পাশে নির্মিত অস্থায়ী সেতুর ওপর দিয়ে আমাদের মোটর বাস্ এল।

বিখ্যাত Kurfurstendam রাস্তার শেষ ভাগে 'এয়ার টারমিনাস' অফিস। এই এয়ার অফিসটী নূতন করে তৈরী করা হয়েছে কেননা Kurfurstendam রাস্তায় একখানা বাড়ীও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই। বেশীর ভাগই ধ্বংসের স্তূপ; সামান্য কয়েকখানা বাড়ীর বাইরের

খোলস খানিকটা রয়েছে, ভিতরকার সবটাই ভেঙ্গে পড়েছে অথবা পুড়ে সাফ হ'য়ে গেছে। প্রথম যুদ্ধের পর ১৯২৩ সালেও এই Kurfursten-dam দেখেছি, তখনও রাস্তায় বেশী আলোর ঝলসানি ছিল না এবং যানবাহনও বেশী চলাচল করত না বটে, কিন্তু প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাস্তার উপর একছাঁচে ঢালা অগণিত বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ীগুলির দিকে তাকালে মনে হত—এরা সহরকে সুন্দর করে গড়তে অর্থ এবং কারুকার্য্যের কোনটারই কার্পণ্য করে নি। এর ৮ বৎসর পরে অর্থাৎ হিটলারের রাজত্বের কিছু পূর্ব্বেও এই Kurfurstendam আবার দেখেছি। তখন সর্ব্বক্ষণই যেন দেওয়ালীর উৎসব; অগণিত কাফে' রেস্তোঁরা, সিনেমা, নাচঘর এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ক্লাবে Kurfurstendam জমজম্ করত। আজ সেই রাস্তায় শুধু ধ্বংসের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই।

বিখ্যাত ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ তোরণ এবং Unter Den Linden রাজপথ—(যুদ্ধোত্তর অবস্থা)
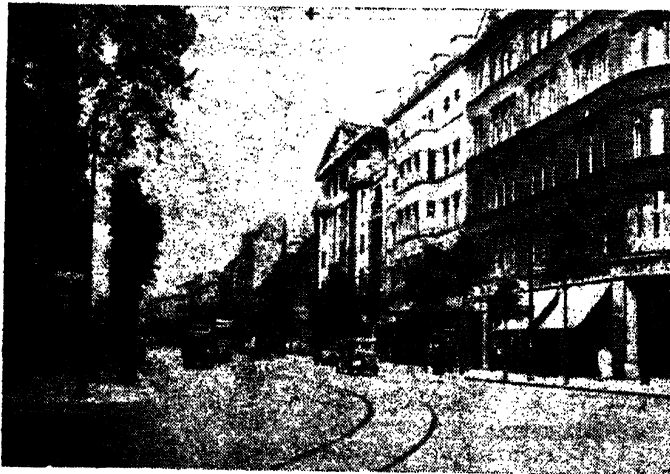
Unter Den Linden রাজপথের অপরাংশ—(যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা)

আমার থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিল Bristol Hotelএ। পূর্ব্বে এই Bristol Hotel ছিল Unter den Linden রাজপথের উপর প্রসিদ্ধ Brandenburg তোরণের কাছে। সহরের এই অংশটি এখন রাশিয়ানদের ভাগে পড়েছে এবং হোটেলটি বোমা বিধ্বস্ত হওয়াতে মালিক অদূরে Grunewald উদ্যানের ভিতর একটী ছোট্ট হোটেল করেছেন। মুলার এক্সরে কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফন্ ডাকেরণ আমার বার্লিন প্রবাসের ভার নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন এবং কি ভাবে এখানে চলাফেরা করতে হবে সে সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু পরামর্শ দিয়ে গেলেন। তখন বেলা ১২টা হবে; জিনিষপত্র কিছু কিছু গুছিয়ে রেখে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম সহর দেখ্‌বার জন্য এবং সুবিধামত কোথায়ও মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিতে। যে রাস্তা দিয়েই যাই ওই Kurfurstendamএর মত একই অবস্থা, শুধু ভাঙ্গা বাড়ী আর ধ্বংস স্তূপ; যতদূর চোখ যায় একখানাও আস্ত বাড়ী দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; Kant Street Joachimthaler street, Alexander Platz প্রমুখ সমস্ত বিশিষ্ট রাস্তাগুলিরই ওই একই অবস্থা। চলাচলের সুবিধার জন্য বার্লিন সহরের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে—তাকে বলে stadtbahn; এই ট্রেনের ষ্টেশনগুলি যথা, Charlotenburg, Friedrichstrasse Bahnhof, Zoologische Garten Bahnhof, যারা বার্লিনে গিয়েছেন তাঁদের সকলেরই

পরিচিত। ষ্টেশনগুলি যদিও বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন ট্রেন চলাচল আবার সুরু হয়েছে। সহরের এই ট্রেন transport সবটাই রাশিয়ার অধিকারে। আজকের বার্লিন সহর দেখে কেবলই মনে পড়ছিল নেপল্‌সের পম্পাই সহরের কথা। তবে তফাৎ এই যে একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, আর অন্যটি হচ্ছে বিজ্ঞানের অভিনব সৃষ্টির নিষ্ঠুর অবদান। ঘুরতে ঘুরতে Zoologische Garten ষ্টেশনের সাম্‌নে একটা খোলা রেস্তোঁরাতে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে নিলাম। খাবার বেশ ভালই। আলু, কপি এবং বড় এক টুকরা ভাজা মাংস যাকে এরা বলে schnitgel ; দাম পড়ল আমাদের টাকায় ৬৲ টাকা। লণ্ডনেও এই খাবার এর চাইতে কিছু সস্তায় পাওয়া যেত না।

বিকেলে মিঃ ফন্ ডালেরণের বাড়ীতে চা খাবার নিমন্ত্রণ ছিল। এঁর বাড়ীখানি বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে, তাই বোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। অবশ্য দূরের বাড়ীগুলি সবই যে বেঁচে গেছে তা নয়। মিঃ ডালেরণ বললেন—যে বার্লিনের শতকরা ৭০খানা বাড়ী বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়েছে। বহু লোক সহর ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছে এবং যারা এখানে রয়েছে স্থানাভাবে বেশ কষ্ট করে থাক্‌তে হচ্ছে। মিঃ ডালেরণের একজন সহকর্ম্মী ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর স্ত্রী মাত্র ১২ ফুট চওড়া এবং ১২ ফুট লম্বা একখানা ঘরে থাকেন। সেখানেই শুতে হয়, বস্‌তে হয়, রান্না করে খেতে হয় এবং বাসনও মেজে নিতে হয়। এমনও দেখা যায় যে স্থানের অকুলানের জন্য স্বামী হয়ত বার্লিনে থাকলেও স্ত্রীকে অন্য সহরে বাস করতে হচ্ছে।

Unter Den Linden রাজপথের অপরাংশ—(যুদ্ধোত্তর অবস্থা)

বার্লিন শহরের একটি স্কোয়ার এবং বৈদ্যুতিক ট্রেন স্টেশন—(যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা)
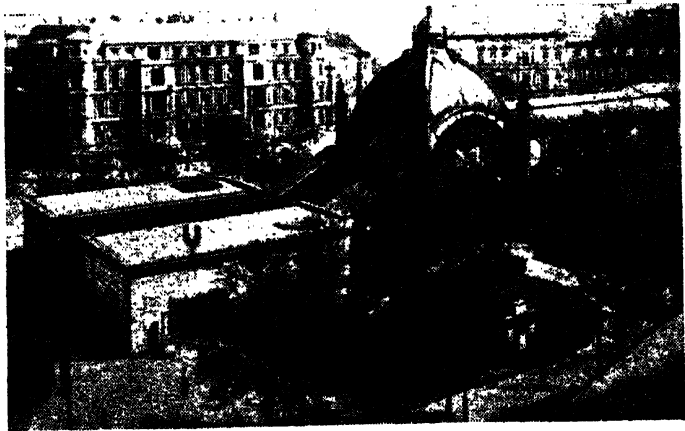
গত যুদ্ধ শেষ হ'বার অব্যবহিত পরেই জার্ম্মানী এবং অষ্ট্রিয়া ৪ ভাগে বিভক্ত হ'য়ে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মিলিটারী গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে শাসিত হচ্ছে ; বার্লিন এবং ভিয়েনা সহরও ৪ ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বার্লিনের যে অংশ রাশিয়ার অধিকারে রয়েছে তার সঙ্গে বাকী ৩ ভাগের সম্বন্ধ খুবই কম। অবরোধের (blockade) সময় ত কোন সম্বন্ধই ছিল না। বর্ত্তমানে রাশিয়ার অংশকে East blook এবং বাকী তিন অংশকে west blook বলা যেতে পারে। রাশিয়ান অংশের ব্যবস্থা বাকী অংশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; এমন কি এই অংশের টাকাও পৃথক্। জার্ম্মানদের টাকাকে মার্ক (Mark) বলে। রাশিয়ানদের অংশে যে টাকা ব্যবহৃত হয় তাকে বলে East Mark, অন্য অংশের টাকাকে বলে West Mark ; মূল্যেরও যথেষ্ট পার্থক্য আছে ; যেমন একটী West Mark এর মূল্য ৫টী East Mark এর সমান। এটি হয়েছে

সম্প্রতি West Mark আমেরিকান ডলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে বলে।

বার্লিনের এই দুই অংশের ভিতর স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করা কিংবা জিনিষপত্র বেচা কেনা করা একেবারে অসম্ভব। টাকার দাম যে শুধু কম বেশী তা নয়, এক অংশের টাকা অন্য অংশে অচল।

বার্লিন শহরের একটি স্কোয়ার এবং বৈদ্যুতিক ট্রেন স্টেশন—(যুদ্ধোত্তর অবস্থা)
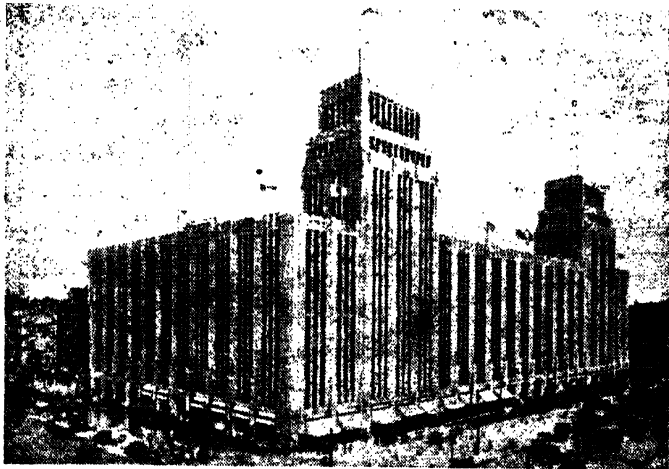
বার্লিনে সুপ্রসিদ্ধ ডিপার্ট মেন্টাল ষ্টোর (Warenhous)—(যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা)

রাশিয়ানদের অধিকৃত অংশে কি ভাবে যে জার্মানরা জীবন যাপন করে—সে সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়; এ অংশটা যেন একখানা লোহার পরদা (iron curtain) দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছে। তবে একটু আধটু যেটুকু খবর ছিট্‌কে আসে, তা থেকে বোঝা যায় যে স্বাধীন জীবন ত' দূরের কথা, সাধারণ জীবন যাপনও অনেক সময় দুর্বহ হয়ে ওঠে। এই মুহূর্ত্তে যে লোকটি সাধারণভাবে কাজ কর্ম্ম করে যাচ্ছে—পরমুহূর্ত্তে তার যে কি অবস্থা হবে, কোথায় তার ডাক পড়বে, এবং সেই ডাকের ইঙ্গিত যে কি, তা ভয়াবহ এবং অনিশ্চিত। দুঃখ কষ্ট মানুষকে বহু অবস্থায় সহ্য করতে হয়, কিন্তু সেই দুঃখ কষ্টের পেছনে যদি একটা অসহায় অনিশ্চয়তা থাকে তা'হলে সেটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই হচ্ছে রাশিয়ান অধিকৃত বর্ত্তমান বার্লিনের অবস্থা।

বার্লিনের বড় বড় হাঁসপাতাল-গুলি রাশিয়ান অংশে পড়েছে। আমার অনুমতিপত্র ছিল শুধু ব্রিটিশ ও আমেরিকান অংশে যাবার জন্য। আমি যখন রাশিয়ান অংশের হাঁসপাতাল দেখ্‌তে যাই, তখন এই অংশের জার্ম্মানরা খুব ভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিলেন; ক্যামেরা কিছুতেই সঙ্গে নেবে না, বিদেশী টাকা পয়সা সঙ্গে রাখ্‌বে না ইত্যাদি। ট্যাক্সিওয়ালাকে যখন বল্‌লাম যে রাশিয়ান অংশের হাঁসপাতালে যেতে হবে, প্রথমটায় সে রাজী হল না, শেষে বেশী পয়সার লোভ দেখাতে রাজী হ'ল। রাশিয়ান সীমানায় পৌঁছে তার চেহারা সত্যিই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। এর অবস্থাটা কতকটা অনুমান করা যায় আমাদের তৎকালীন হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পর কোনও শিখ্ ট্যাক্সিওয়ালাকে পার্ক সার্কাসে সন্ধ্যার সময় যেতে হলে তার যেরকম মুখের অবস্থা হয় সেই রকম ভাব। আমার অবশ্য রাশিয়ান অংশে ঘোরাফেরা করাতে কোনই অসুবিধা হয় নাই। শেষকালটায় সাহস এত বেড়ে গিয়েছিল যে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে আমার বৃদ্ধ প্রফেসর ডাঃ ষ্টিকেলের ছবিও তুলে নিয়ে এলাম। এই অশীতি বৎসরের শুভ্রকেশ প্রফেসরের নিকট থেকে ছাত্রাবস্থায় বহু জিনিষ শিখে-ছিলাম; নিজে হাতে করে কত অস্ত্রোপচারই না শিখিয়েছিলেন। ২৫

বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই হাসপাতালের ডিরেক্টর ছিলেন এবং আজও এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সেই কাজই করে যেতে হচ্ছে—তবে তফাৎ এই যে তখনকার ডিরেক্টর ছিলেন ইউনিভার্সিটি ক্লিনিকের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন কর্ণধার, যাঁর পশ্চাতে অন্ততঃ ২৫ জন ডাক্তার প্রত্যহ সারি দিয়ে চলতেন! আর, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ডিরেক্টর হ'চ্ছেন রাশিয়ার নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মধারার একজন সাধারণ তাঁবেদার মাত্র। ডাঃ ষ্টিকেলের কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল না, তাই তাঁর চাকরিটী বজায় আছে, যদিও তার আনু-ষঙ্গিক আভিজাত্য বিশেষ কিছুই নেই। এই বৃদ্ধ প্রফেসর আজ সর্ব্বহারা। যুদ্ধের সময় তাঁর ঘর বাড়ী এবং যাবতীয় মূল্যবান জিনিষপত্র ধ্বংস হ'য়ে গেছে; এখন অতি সাধারণ একখানা ঘরে থাকেন; ২টী উপযুক্ত ছেলে ছিল, একজন যুদ্ধে নিহত এবং অপরটী রাশিয়ায় বন্দী হয়ে বহু বৎসর নিরুদ্দেশ। খুব সম্ভব জীবিত নেই; একটী মেয়ে, তার স্বামী যুদ্ধে নিহত হ'বার পর পুনরায় বিবাহ করে অন্য সহরে বাস কচ্ছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে প্রফেসর একেবারে নিঃসঙ্গ হ'য়ে প্রাণহীন যন্ত্রের মত দৈনন্দিন কাজগুলো করে যাচ্ছেন। অন্যান্য যে কয়জন প্রফেসর এখনও জীবিত রয়েছেন তাঁদের জীবনধারাও কম বেশী ওই একই রকমের। অর্থনৈতিক দৈন্যই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ পায়। সেই জার্ম্মান প্রকৃতিগত অহমিকা চূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে গেছে, স্ফূর্ত্তি নেই, কোনও রকমে দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া।

বার্লিনে সুপ্রসিদ্ধ ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর (Warenhous)—(যুদ্ধোত্তর অবস্থা)

অল্পবয়স্ক ডাক্তারের দল বেশীর ভাগই বার্লিনের রাশিয়ান অংশ থেকে চলে এসেছে; ফলে হয়েছে এই যে ব্রিটিশ আমেরিকান অংশে ডাক্তারের প্রাচুর্য্য খুবই বেশী এবং সেই হেতু তাদের আর্থিক অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন।

বার্লিনের মেডিকেল কলেজে বহু ছাত্র দেখলাম। একটু আশ্চর্য্যও লাগল। যুদ্ধের পর এত ছাত্র কী করে মেডিকেল কলেজে পড়তে এল? অনুসন্ধান করে জানলাম যে এর বেশীর ভাগ ছাত্রই যুদ্ধের সময়ই মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হ'য়েছিল। যুদ্ধের সময় জার্ম্মানীতে নিয়ম হয়েছিল যে যারা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবে তাদের শুধু ছুটীর সময়েই যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে। কলেজে যখন পড়াশুনা চলবে, তখন ছাত্রেরা সহরেই থাকবে, যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে না। তাই বহু জার্ম্মান যুবক এই সুযোগ নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অন্ততঃ কয়েক মাসের জন্য রেহাই পেতে। সেই সব ছাত্রদের ভিতর যারা জীবিত আছে তারাই এখন ডাক্তারী শিক্ষা শেষ কচ্ছে।
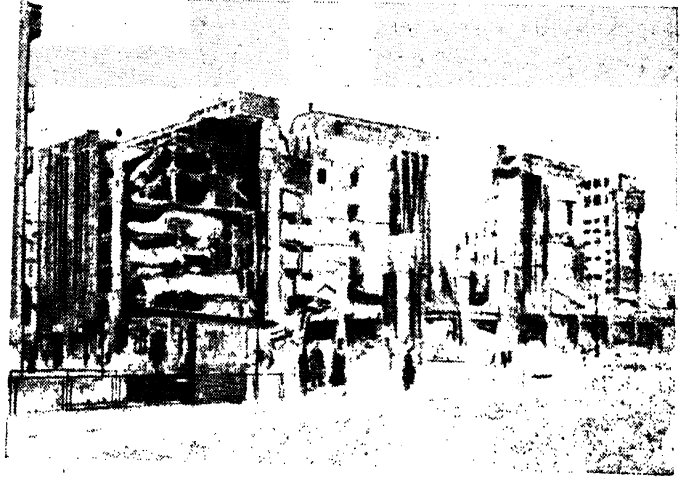
(আগামী বারে সমাপ্য)

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হঠাৎ একদিন দেখি এগারটার গাড়ীতে রাজগীরে এসে নেমেছেন প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে তাঁর সৌভাগ্যবতী পত্নী শ্রীমতী কমলা দেবী। আমরা সপ্তপর্ণীর বারান্দা হতে হাত তুলে উচ্চকণ্ঠে তাঁদের যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে সাদরে আহ্বান করলাম আমাদের কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য। কারণ, রাজগীরে কোথাও আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ভাল নেই। সুহৃদ্বর সুনীতিকুমার হয়ত অমত করতেন না, কিন্তু বৌঠান্ জবাব দিলেন—এটা তাঁর বাপের বাড়ীর দেশ, আমরাই তাঁদের মুল্লুকের অতিথি। কথাটা সত্য, এই রাজগীরের মাইল সাতের মধ্যেই 'রৈতক' গ্রামে তাঁর পিত্রালয়। তাঁরা গয়ার জমিদার বলেই খ্যাত। অগত্যা

শ্রীমতী দাশগুপ্তার বাংলো—কৃষ্ণকলি কুটীর

চুপ ক'রে গেলুম। শুধু একবার সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলুম মধ্যাহ্নের সেবাদির ব্যবস্থা···ওঁরা ব'ললেন—সব ঠিক আছে। কোথায় উঠছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা আঙুল দিয়ে অদূরে রেখাবচাঁদ বাবুর বাড়ী 'বীরেন্দ্র-ভবন' দেখিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যায় তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে 'বীরেন্দ্র ভবনে' গিয়ে শুনলুম তাঁরা এখানে এসে একটু মুস্কিলে পড়েছেন। বাড়ীর মালিক রেখাবচাঁদ-বাবু তাঁদের পাটনা থেকে পত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন ম্যানেজারের কাছে অথচ তাঁর ম্যানেজার বাড়ীতে অনুপস্থিত। ঐ সময় রাজগীরের সন্নিকটস্থ "পাওয়াপুরীতে" জৈনদের বিরাট মেলা বসেছিল। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের আবির্ভাব না তিরোভাব সংক্রান্ত কি একটা উৎসব। বেহারের সমস্ত জৈন সাতদিন ধরে সেখানেই বসবাস করছেন। 'বীরেন্দ্র ভবনে' আমাদের সঙ্গে ট্রেনের পরিচিত সেই কালিবাবু ও কেদারবাবু ছিলেন, তাঁরা সস্ত্রীক একজন বাঙালীকে বিদেশে বিপন্ন হয়ে পড়তে দেখে মানবতার দিক থেকে যেটুকু সাহায্য করা কর্ত্তব্য তা করেছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐ পণ্ডিত মানুষটির কোনও পরিচয়ই তাঁরা জানতেন না। সন্ধ্যায় আমাদের ও-বাড়ীতে আসতে দেখে তাঁরা খুব খুশী হয়েই নীচেয় নেমে এলেন। তারপর যখন আমাদের মুখে শুনলেন যে আমরা এসেছি ঐ নবাগত দম্পতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে। আমাদের কাছে তাঁদের পরিচয় পেয়ে কালিবাবু ও কেদারবাবু তখন দুঃখিত ও লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন ওঁদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে ও আদর যত্ন ক'রতে পারেননি বলে। যাই হোক, তাঁরা তৎক্ষণাৎ রাত্রের জন্য একখানি খাটিয়া ও একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের ব্যবস্থা করে দিলেন, আমরাও একখানি খাটিয়া, একটি বালতি ও একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠালুম। সপ্তপর্ণীর একটা অংশ তখন খালি পড়েছিল। রেখাবচাঁদবাবুর বাড়ীর নীচের তলার ঘরগুলি তেমন ব্যবহারযোগ্য নয় বলে আমরা ওঁদের কষ্ট হবে ভেবে আমাদের সপ্তপর্ণীতে চলে আসবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলুম। বৌঠান্ কিন্তু সম্মত হলেন না। বললেন—একটা রাত্রি চোখকান বুজে কেটে যাবে—কাল সকালে এঁকে নিয়ে আমাদের ছোড়দার কাছে চলে যাবো।

তাঁর ছোড়দা হ'লেন রাজগীরের সর্ব্বজনপ্রিয় একটি সাধু পুরুষ। তিনি গৃহী সন্ন্যাসী—ওখানে 'বাণপ্রস্থী বাবা' নামে খ্যাত। আরও একজন গৃহী সন্ন্যাসীও ওখানে থাকেন, তিনি ঘোরতর তান্ত্রিক। সর্বদাই রক্তাম্বরে ভূষিত হ'য়ে থাকেন। তাই ওখানকার সবাই তাঁকে 'লালবাবা' বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু, কমলা দেবীর ছোড়দা বাণপ্রস্থী-বাবার' কোনও বেশভূষার ভণ্ডামী নেই! যাই হোক, ছোড়দার আশ্রমে কিন্তু ওঁদের যাওয়া হ'ল না। কেদার ও কালী ওঁদের কিছুতেই ছাড়লেন না। অন্ততঃ রেখাবচাঁদবাবুর ম্যানেজার না-ফেরা পর্য্যন্ত ওঁদের তাঁরা কিছুতেই যেতে দেবেন না বলায় এবং ওখানে আরামে থাকার সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা করে দেওয়ায় ওঁরাও রয়ে গেলেন। কেদারবাবু ও কালীবাবু পরদিন প্রভাতে সুনীতিবাবুকে এবং আমাকে সস্ত্রীক চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের আঙিনায় পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ নানা গল্প-গুজব ক'রে আমরা ফিরে এলুম।

পরদিন সকালে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখি—ওরে বাবা!

সেকি সকালের চা ? সন্দেশ রেষ্ঠিকেনি হালুয়া কচুরি সিঙাড়া কলমুল চাটনি আচার চিঁড়েভাজা ডালমুট পাঁপর-সে হরে-কর কথা ! আমি 'চা-পায়া' নই, কাজেই সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্যেরই সদ্ব্যবহার করলুম। রাজগীরের মতো এক গণ্ডগ্রামে এত সব সৌখীন রসনানন্দ মোদক কোথায় পেলেন জানবার কৌতূহল হওয়ায় শোনা গেল কালিবাবুটি নাকি এক মস্ত গুণী। তিনি জলযোগের যাদুকরের মতো নিজের হাতে একাই এ সব তৈরী ক'রেছেন ! বললুম—ধন্য আপনি। অন্য কিছু না ক'রেও যদি আপনাদের বড়বাজারে একখানা খাবারের দোকান করেন, তাহ'লে দুদিনে দ্বারিক ঘোষকে দেশত্যাগী ক'রে দিতে পারবেন।

চা ও জলখাবারের পালা শেষ ক'রে নানা আলোচনার পর যখন উঠতে যাবো—কেদারবাবু বললেন—একটু কষ্ট করে একমিনিট বসতে হবে স্যর—আমার ক্যামেরার সামনে। অগত্যা আমরা সবাই মিলে বীরেন্দ্র ভবনের দ্বিতলের গাড়ীবারান্দায় বেরিয়ে বসলুম। কেদারবাবু তাঁর অটোমেটিক ক্যামেরায় আমাদের সকলের একটি 'গ্রূপ' ফটো নিলেন। বাড়ী ফিরতে আমাদের ১১টা বেজে গেল। প্রবাসে একটি প্রভাতের সুখস্মৃতির অভিজ্ঞান স্বরূপ কেদারবাবু সেই ছবি এক একখানি আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। সুনীতিবাবুরা ওখানে থাকতে থাকতেই বামপন্থী বাবার আশ্রমে মহাধুমে ৺কালীপূজা হ'ল। সুনীতিবাবু ও কমলা দেবীর সঙ্গে আমরাও দীপান্বিতা অমাবস্যার অর্দ্ধেক নিশা প্রায় ওখানেই কাটিয়ে এলুম। সুনীতিবাবুর নানা অভিজ্ঞতাপূর্ণ বহু বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক গল্প শুনে এবং চাটনীর মত উপাদেয় ও মুখরোচক পরচর্চ্চা ক'রে চা-জলখাবারের সঙ্গে আমাদের বিদেশে দু'চারটা দিন বেশ উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছিল, হঠাৎ সুনীতিবাবু দিল্লী থেকে তাঁর মেয়ে জামাইয়ের এক জরুরী তার পেয়ে দিল্লী চলে গেলেন। আমাদের কাছে রাজগীর আবার নীরস একঘেয়ে হয়ে উঠলো। আলাপ আলোচনার মর্ম্ম ও আস্বাদ গ্রহণ করে, এবং বেশ তারিয়ে গল্পগুজব করার সুখ পাওয়া যায় যার সঙ্গে—এমন মানুষ আজকের দিনে আমাদের দেশে ক্রমশঃই দুর্লভ হ'য়ে উঠছে। আহারে যেমন সুস্বাদু ও নানা বিচিত্র রসাস্বাদযুক্ত অথচ স্বাস্থ্যের পক্ষে পুষ্টি ও কল্যাণকর আহার্য মানুষের আকাঙ্ক্ষিত, মানসিক ভোজেও ঠিক ঐ কথাই বলা যায়। সুতরাং এই ক'দিনের স্মৃতি আমাদের অনেকদিন মনে থাকা স্বাভাবিক।

সপ্তপর্ণীর দক্ষিণ পাশে একটি বাংলোয় আমাদের প্রতিবেশিনী শ্রীমতী দাশগুপ্তা ছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর মধ্যমা কন্যা ও জামাতা এবং ছোট মেয়ে কুমারী 'কৃষ্ণকলি'। নবনীতার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল খুব। আমরা ওঁর বাংলোর নাম রেখেছিলুম—"কৃষ্ণকলি-কুটীর।" এঁর কথা আমার আগেই উল্লেখ করা উচিত ছিল। কারণ এই অদ্ভুত উত্তমশীলা, প্রসন্নমনা ও সদাহাস্যময়ী ভদ্রমহিলাটি না থাকলে সেই আমিষশূন্য, পাণ্ডব বর্জ্জিত রাজগীরে আমাদের হয়তো একাদশী করেই দিন কাটাতে হতো। ইনি একজন [illegible] মহিলা। অক্টোবর মাসে রাজগীরে তখন যে সকল রসদ দুর্লভ, সেই মাছ, মাংস, মুর্গী, ডিম, টাটকা তাজা তরীতরকারী, ফল মূল, জানিনা কেমন ক'রে কোন মন্ত্রবলে কোথা থেকে যে সে সব সামগ্রী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শ্রীমতী দাশগুপ্তা সংগ্রহ করে ফেলতেন ! অতি প্রত্যূষে উঠেই তিনি সেই যে রসদ সংগ্রহের কাজে লাগতেন—যে-পর্যন্ত তাঁর আশেপাশের প্রতিবেশীরা সকলে কিছু কিছু না পেতেন, তিনি বিশ্রাম নিতেন না। এঁরই সুদক্ষতার উপর নির্ভর করে আমরা একদিন গৃধ্রকূট দর্শন ও বান গঙ্গায় বনভোজনের ব্যবস্থা করতে ভরসা পেয়েছিলুম।

এই সময়ে আমাদের সপ্তপর্ণীর অপর অংশে এসে উঠেছিলেন শ্রীমতী বনজ্যোৎস্না দেবী দুটি নাবালক পুত্র নিয়ে। পাশাপাশি এক প্রাচীরেই বাস করতেন কিন্তু তাঁর মৃদু কণ্ঠস্বর কদাচ শোনা যেত। বোধ করি দেব উপাধিধারী ব্যক্তিটির দানবকণ্ঠ অহরহ তারস্বরে তাঁর

রাজগীর স্টেশন

কর্ণগোচর হওয়ায় শান্তস্বভাবা মহিলাটি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমার কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে, বোধ হয় আমার মত শান্তিভঙ্গকারী দুর্দ্দান্ত লোকের বাড়ীর পাশে এসে পড়ে তিনি যে ভুল করে ফেলেছিলেন সম্ভবতঃ তারই জন্য মনে মনে তিনি গভীর অনুতপ্ত হয়েছিলেন। যাই হোক, অকস্মাৎ একদা এক সন্ধ্যায় পাশের বাড়ীর নিস্তব্ধ গম্ভীর আকাশে এক 'শশাঙ্ক' উদয় হল। বনজ্যোৎস্না দেবীর অনুজা মনোজ্যোৎস্না দেবীও এসেছিলেন সেখানে কিছুদিন আগে তাঁর দুটি শিশু নিয়ে। কিন্তু সপ্তপর্ণীর বনে ও মনে আনন্দের কোনও জ্যোৎস্নাই উঁকি মারে নি। অথচ সেদিন সন্ধ্যায় সপ্তপর্ণী যেন হঠাৎ আনন্দজ্যোৎস্নায় পুলকিত হয়ে উঠেছিল। বিকেলে বেরিয়েছিলুম বেড়াতে, সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে শুনতে পেলুম সপ্তপর্ণীর এক কোণে রবীন্দ্র সঙ্গীতের অমৃত সুরধারা অঝোরে ঝরে পড়ছে। একটি পুরুষ ও একটি নারী-কণ্ঠের মিহি ও মোটা দুটি তার একত্রে মিলিত ঐক্যতানে সেদিনের সন্ধ্যাটিকে পরম রমণীয় করে তুলেছিল।

গানের সুরের সম্মোহন-স্পর্শে কেমন যেন মনে হ'ল এঁরা আমাদেরই স্বজাতি—আমাদেরই বন্ধু। কোনও সঙ্কোচ বা বাধা হল না আমাদের ঘরে তাঁদের সাদর আহ্বান জানাতে। তাঁরাও কোনও অভিমান না-রেখে হাসিমুখে চলে এলেন আমাদের কাছে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গানে গল্পে আলাপে কাটলো। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার ভিতর দিয়ে অনায়াসে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলো শশাঙ্কবাবুদের সঙ্গে আমাদের।

শ্রীমতী মনোজ্যোৎস্না ওরফে 'রেণু'র সুমধুর কণ্ঠ মোহন-বেণুকেও হার মানায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার জন্যই যেন সৃষ্টিকর্ত্তা মেয়েটিকে অমন দরদভরা পরিশীলন-কোমল কণ্ঠ দিয়েছিলেন। শশাঙ্ক ভায়াও বেশ সুকণ্ঠ গায়ক। স্বর পুরুষোচিত গম্ভার, ভরাট অথচ সুমিষ্ট। বোলপুর শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র তিনি। প্রজাপতির নির্বন্ধে এদের মিলন হয়েছে যেন—'মণি-কাঞ্চন' সংযোগ! মনে মনে এঁদের দীর্ঘায়ু ও সুখশান্তি কামনা করলুম। পরদিন বিকেলেই শশাঙ্কভায়া

রাজগীর পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিস

পাটনা ফিরে গেলেন, কারণ, তিনি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, পাটনা শাখার ম্যানেজার। তাঁকে সোমবার যথাসময়ে ব্যাঙ্কে হাজিরা দিতেই হবে। যাবার আগে তিনি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে আবার সামনের সপ্তাহে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।

এই মানুষটিকে অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। ভদ্র, বিনয়ী, সবরকম কৃত্রিমতাবর্জিত, সদালাপী এবং সুদৃঢ় চরিত্রের মানুষ এই শশাঙ্ক। দেহে ও মনে বলিষ্ঠ অথচ মধুর অমায়িক প্রকৃতি।

ভগবান তথাগতের পথ অনুসরণে আমরা দলবদ্ধ হয়ে গৃধ্রকূটে যাত্রা করছি শুনে এঁরাও মহা উৎসাহে আমাদের দলে যোগ দিতে প্রস্তুত হলেন। স্থির হয়েছিল, ভোরে যাত্রা করে সন্ধ্যায় রাজগীরে ফিরে আসা হবে এবং গৃধ্রকূটের ওপারে বানগঙ্গার পাষাণ উপকূলে খিচুড়ী রান্না করে বনভোজনের আনন্দ আহরণ করা যাবে। শ্রীমতী দাশগুপ্তের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল বনভোজন পরিচালনার। রাঁধুনী একজন এবং ভৃত্য একজন সঙ্গে গেলেও তাদের চালনার দায়িত্ব তাঁরই হাতে দেওয়া হয়েছিল। ছ'খানি গরুর গাড়ী এবং একটি ডুলি নিয়ে আমরা এক হেমন্ত প্রভাতে শোভাযাত্রা করে রওনা হলুম গৃধ্রকূটের পানে।

শ্রীমতী বনজ্যোৎস্না বাতের রোগী। আরোগ্যকল্পে উষ্ণ প্রস্রবণে স্নানের জন্যই তাঁর রাজগীরে আসা। তিনি গরুর গাড়ীর আতঙ্কে ডুলির ব্যবস্থা করেছিলেন। কোনও দোষ নেই। কারণ, যাঁরা গৃধ্রকূট ঘুরে এসেছেন তাঁরা ওখানকার বন্ধুর পার্বত্যপথের দুর্গমতার যে ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাতে সহরের মসৃণ পীচের পথে মোটরে ঘুরতে অভ্যস্ত মানুষদের আতঙ্ক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। শ্রীমতী বনজ্যোৎস্না নিজে ড্রাইভ করে ঘুরে বেড়ান। শ্রীমতী দাশগুপ্তাও শুনলুম ড্রাইভিং জানেন, উপরন্তু তাঁর একটি রাইফেল আছে এবং তিনি নাকি অব্যর্থ লক্ষ্যভেদও করতে পারেন। অবশ্য দুনিয়ার মেয়েরা সকলেই লক্ষ্যভেদে পটু এবং তাঁদের কাছেকেই বড় একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখা যায় না; বিনা

গৃধ্রকূটের পার্ব্বত্যপথে প্রাকৃতিক দৃশ্য

রাইফেলেও তাঁরা চিরকাল শিকারে অভ্যস্ত। তথাপি একজন রাইফেল-নিপুণা নারী আমাদের পার্বত্য অরণ্য-পথের পরিচালিকা হওয়ায় আমরা সকলেই বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে অগ্রসর হলুম। কারণ, গৃধ্রকূটের জঙ্গলে নানা বন্যজন্তু, বিশেষ করে বড় বড় ভাল্লুকের নাকি অভাব নেই।

ছ'খানি গো-যান ও একটি ডুলিতে ছিলেন, শ্রীমতী দাশগুপ্তা, তাঁর কন্যা শ্রীমতী উমা এবং কুমারী কৃষ্ণকলি, শ্রীমতী বনজ্যোৎস্না ও তাঁর পুত্র প্রবীর ও সুবীর, শ্রীমতী মনোজ্যোৎস্না এবং তাঁর দুটি শিশু-পুত্র, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ও তাঁর কন্যা নবনীতা এবং আমি। চাল, ডাল, ডিম, ঘি মশলা, হাতা, হাঁড়িসহ রাঁধুনী এবং চাকর যে ছিল বলাই বাহুল্য। বানগঙ্গায় স্নানের লোভে তেল সাবান, তোয়ালে আয়না চিরুণী ব্রাস্‌ও নেওয়া হয়েছিল। আমাদের এই বিরাট শোভাযাত্রা দেখে ছোট্ট জনপদ রাজগীরের পথে রীতিমতো জনতা জমে যেতে লাগল। সবারই চোখে মুখে যেন এই প্রশ্ন—'এরা কারা'?

কোথায় চলেছে? আমাদের মিছিল রাজগীর ষ্টেশন ছাড়িয়ে চলে এল। রাজগীর পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো।

সপ্তধারা পর্য্যন্ত পথ বেশ ভালই। তারপরেও দু'এক মাইল পথ খারাপ হলেও সহনাতীত অদ্ভুত অভিজ্ঞতার উপযুক্ত বলা যায় না। 'শোনভাণ্ডার' পার হওয়ার পর শুরু হলো কষ্টসহিষ্ণুতার কঠোর পরীক্ষা! উচ্ছৃঙ্খল ঢেউয়ের মুখে জেলে ডিঙীর মতো গরুর গাড়ী যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খানাখন্দ ও গর্ত্ত বহুল বড়ো বড়ো শিলাবিকীর্ণ পার্বত্যপথে ওঠা-নামা শুরু করলে এবং আরোহীদের কুলোয় ফেলে চাল ছোলা ঝাড়ার মতো লোফালুফি লাগালে, দেখলুম গাড়ী ছেড়ে মেয়েরা একে একে পথে নেমে এলেন এবং পদব্রজে পর্বতারোহণ শুরু করলেন। আমি এর আগে একাধিকবার ২০।২২ মাইল পর্যন্ত গরুর গাড়ী চড়ে বেড়িয়েছি। ভারতের এই সনাতন বৈদিক যানের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় থাকায় আমাদের গাড়ীতে বেশ পুরু ক'রে খড় বিছিয়ে তার উপর খান দুই তোষক পেতে চাদর মুড়ে একেবারে গদী বানিয়ে নিয়েছিলুম। একটি বালিশ মাথায় দিয়ে লম্বা হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আরামেই চলেছি। গাড়ী দোল খাচ্ছে, টোল খাচ্ছে, হেলছে দুলছে, লাফাচ্ছে বটে, তবু আমি ছিলুম নির্বিকার। কিন্তু মেয়েদের সকলকে গাড়ী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে দেখে পুরুষের অভিমানে আঘাত লাগলো। অগত্যা আমিও রথের রাজশয্যা পরিহার ক'রে পথ ধরলুম।

পর্বতের বুক চিরে একে-বেঁকে চলেছে সংকীর্ণ শৈলসরণী। পথের দু'ধারে অজস্র জানা ও অজানা তরুলতা বৃক্ষরাজি ধূসর পাহাড়কে একেবারে সবুজ করে রেখেছে। বনতুলসীর সৌরভ ভেসে আসছে হৈমন্তী হাওয়ায়। ছোট ছোট গাছ ভরে কাঁচা-পাকা গিরি-বদরি পথিক ললনাদের প্রলুব্ধ করছে। শ্রীমতীরা আঁচল ভরে তুলে নিলেন, ছেলে-মেয়েরাও এ লুণ্ঠনে পরম উৎসাহে যোগ দিলে। প্রতিযোগী তো কেউ ছিল না। নির্জ্জন বনপথ। আমরাই কজনা চলেছি—শুধু কুল নয়; বিচিত্র বরণের বনফুলও ছিল শিলাতল আলো করে। নিমেষে তারা ধন্য হল শ্রীমতীদের কবরী শোভা বন্ধনের সৌভাগ্য লাভ করে। অরণ্যবেষ্টিত সেই পার্বত্য প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যে চিত্ত যেন সুদূরলোকচারী হয়ে উঠলো।

রেণু তখন উদাত্ত কোমল কণ্ঠে গান ধরেছে—"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ—"

আনন্দে উৎসাহে সুরে শোভায় সৌন্দর্যে পথের ক্লান্তি কষ্টের অনুভবই হচ্ছিলনা যেন।

(ক্রমশঃ)

ডুবিল কি চাঁদ মেঘের অন্ধকারে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জ্বলে দীপ বাতায়নে
পড়ে মনে
এমনি নিশাতে তুমি ছি'লে মোর সাথে
তোমারে শুধাতে'
ছিল কত কথা মোর!
জীবনের যত গীতি
প্রেমপ্রীতি
যত কলরব হারায়ে গিয়েছে সব
রজনী নীরব!
অনাদ'রে ফেলে রেখে
গেছ ফুলদল ব্যথার পরাগ মেখে।

সমুখে তিমির রাত্রি
ওগো সাথী
দোলে তরুলতা: বাতাসের পুলকতা
কাণে কাণে কথা
সমীর শুনাতে আসে
সকলি রয়েছে, তুমি নাহি মোর পাশে!

আমি আজ অসহায়
সমাহিত আশা: হারায়েছি ভালোবাসা
মিলন তিয়াষা
মিছে জাগে অনিবার
আর নাহি প্রয়োজন দিন গনিবার।

বহুকাল ধরে মোরা
হৃদি ঝোরা
ঝরায়েছি দোঁহে প্রণয়ের সমারোহে'
কামনার মোহে'
কুসুম ফোটার বেলা
আমরা দু'জনে রচেছি রঙের মেলা।
রহিলাম একা-একা
তুমি দেখা
দিবে নাক জানি, শুধু তব লিপিখানি
মোর কাছে' টানি
পড়িতেছি বারে বারে
ডুবিল কি চাঁদ মেঘের অন্ধকারে!

পাট ও পীঠ

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

রঙ্গমঞ্চের উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রচেষ্টা

পূজা-উৎসবকে স্মরণীয় করে তুলতে, এবারের প্রমোদ-পল্লীতে বহু হিন্দি ও বাংলা ছবি স্থান লাভ করায়, ব্যাপক ভাবে আনন্দ পরিবেশনের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এবারের আয়োজন অকল্পিত বললেও চলে।

চিত্রজগতের তুলনায় রঙ্গপীঠের দান যৎসামান্য। এবারের পূজায় কোন নতুন নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় নি। পুরাতন নাটকের পৌনঃপুনিক অভিনয় ঘটিয়ে দর্শক আকর্ষণ করবার চেষ্টা ছাড়া, রঙ্গমঞ্চের প্রয়োগ-কর্তারা বিশেষ কোন নতুন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন নি।

এ বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রচেষ্টা হিসেবে স্মরণীয়, নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অতি আধুনিক নাটক "পরিচয়"। শিশিরকুমারের কাব্যধর্মী মন এবার যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারে নি। তাই যুগের দাবী মেটাতে তাঁকে বাস্তবতা সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও সচেতন দেখা যাচ্ছে। যে রসবিচারের পরিচয় তিনি দিয়েছেন 'রীতিমত নাটক'-এ—কাব্য ও বাস্তবতার সমন্বয় ঘটিয়ে, আলোচ্য নাটকেও তার পরিচয় বিদ্যমান। মডার্নিজম্-এর নামে বাস্তবতার স্থূল অংশগুলির প্রয়োগ কার্যকরী হলেও, তা আরও মার্জিত ও বিশুদ্ধ হ'লে, রসগ্রাহী দর্শকের রসবোধকে অনেক বেশী পরিতৃপ্ত করতে পারত। তথাপি, তিনি যে মন নিয়ে 'পরিচয়' মঞ্চস্থ করেছেন, তা সংস্কার-বর্জিত খাঁটি প্রগতিবাদী শিল্পীর মন। ঘটনার আকস্মিকতা ও দুঃসাহসিকতা আধুনিক বাস্তববাদী মনকে পরিতৃপ্ত করেই ক্ষান্ত হয় না; যথেষ্ট চিন্তার খোরাক দিয়ে আমাদের মনকে সক্রিয় করে তোলে। সামাজিক ভাঙ্গন-গড়নের যুগ-সন্ধিক্ষণে, নাট্যকার তথা প্রযোজকের এই সাধু উদ্দেশ্য আমরা সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি।

আমাদের জাতীয় নাট্যশালার দুরবস্থার উল্লেখ করে, শ্রদ্ধেয় ও সুখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্প্রতি তাঁর একটি প্রবন্ধে যে সময়োচিত মন্তব্য করেছেন, সেদিকে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শচীন বাবু বলেছেন: "আজকের দিনে আমরা এমন নাটক চাই, যা জাতির বৈশিষ্ট্যের, জাতির প্রকৃতির, জাতির সংস্কারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, নাটকের ও নাট্য-শালার প্রগতির ও পরিণতির পথনির্দেশ করবে।"

একদা গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল এই উদ্দেশ্য নিয়েই রঙ্গালয়ের জন্য নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের লেখনী-ধারণ সার্থক হয়েছিল বলেই, অর্ধশতাব্দী পরেও সে সব নাটকের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। তদানীন্তনকালের সমাজের প্রকৃত রূপ, মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার এবং জীবনধারার বৈশিষ্ট্য এই সব নাটককে আশ্রয় করেই অভিব্যক্ত হয়েছে। এযুগের প্রচারধর্মী নাট্যকারদের মত, ইজম্ এবং সারমন্-এর সাহায্যে তাঁরা আসর মাৎ করবার দুশ্চেষ্টা করেন নি। বিলিতি নাটকের বিষয়বস্তু এবং ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও তাঁরা লেখনী ধারণ করেন নি। দীনবন্ধু মিত্র থেকে অমৃতলাল পর্যন্ত, প্রত্যেকের নাটকের মাধ্যমে তদানীন্তন-কালের সমাজ ও জীবনধারাকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বিকারগ্রস্ত সমাজের চিত্র, অমৃতলালের শেষ সামাজিক প্রহসন, 'ব্যাপিকা বিদায়' অবলম্বন করে মূর্ত হয়ে ওঠে। এধরণের সমাজ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত উদ্দেশ্যমূলক নাটক আধুনিক যুগে আর দেখা যায় নি।

সংকল্প-চিত্রের সাফল্য

বাংলা কথক-ছবির তালিকায় এবারে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য অবদানরূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য, এম, পি, প্রডাকসান্স-এর 'সংকল্প' এবং কলালক্ষ্মী চিত্র-মন্দিরের 'স্বামী'।

কবি ও গীতকার শ্রীশৈলেন রায় এই সমাজ শিক্ষা-

মূলক কাহিনীটির পরিকল্পনা ও গঠনে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নিছক কাব্যবিলাস ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টির মোহ পরিহার করতে পারায় এবারে তাঁর কাহিনীটি নাটকীয় গতিবেগে এবং ঘটনাবৈচিত্র্য ও সংঘাতে যথেষ্ট সাবলীল ও সিনেমা-ধর্মী হতে পেরেছে। ছবির গল্প-লেখক হিসেবে শৈলেন বাবু এতদিন যাঁদের নিরাশ করে এসেছেন, আলোচ্য চিত্রের কাহিনা তাঁদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করার দাবী রাখে।

একটি পরম আদর্শবাদী স্কুল-মাস্টারের জীবনের পটভূমিকায় যে কাহিনীটি নাটকাকারে শাখা-পল্লবিত হয়েছে, সেটি নিছক হিতোপদেশ বিতরণের জন্য বা নীতি-বিচারের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হ'লে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ত। ঘটনার বৈচিত্র্য, গতিবেগ এবং সংঘাত, নাটকীয় পরিণতি বা climax সৃষ্টির পথে যা একান্ত প্রয়োজন, কাহিনীকার তার যথাযথ প্রয়োগে লক্ষ্যচ্যুত হন নি। ঘটনাকে বা চরিত্রকে যথেষ্ট নাটকীয় করে তুলতে তিনি কোন উদ্ভট বা অবাস্তব উপায় অবলম্বন করেন নি। যে সব ইমোশান্ থেকে আবেগের সৃষ্টি, তার প্রয়োগেও কাহিনীকার সুচিন্তিত মনোজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এই sense of balance এবং understanding লেখকের নাট্য-প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলেছে।

স্কুল মাস্টারের জীবনী নিয়ে শৈলেন বাবু নাটক রচনা করেছেন; কিন্তু সে নাট্যরচনায় তিনি স্কুলমাষ্টার সাজবার দুশ্চেষ্টা করেন নি। পিতার জাবনের আদর্শবাদ তার কর্মের মধ্যে দিয়ে কিভাবে সন্তানদের অনুপ্রাণিত করে—মনুষ্যত্বের পূর্ণতম বিকাশের পথে তার অমোঘ প্রভাব কোন পরিণতির সন্ধান দেয়, একটি পরিবারের ভাঙ্গা-গড়া ও জীবন-সংগ্রামের অন্তরালে তার পরিচয় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। দর্শকের চিত্তে যুগপৎ বিক্ষোভ ও হর্ষ সৃষ্টির দ্বারা নাটকীয় আবেদনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করে, এই চিত্রের প্রয়োগকর্তারা দেশের ও দশের শ্রদ্ধা অর্জন করবার দাবী রাখেন।

সঙ্কল্প-চিত্রের কাহিনীটি অসাধারণ নয়; ভাবপ্রবণ মনোবৃত্তির উপর ভর করে গড়ে উঠলেও, সর্বশ্রেণীর দর্শক-চিত্তে আবেদন সৃষ্টির দিক দিয়ে, ছবির প্রচারগত ও ব্যবসাগত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার নয়। সূক্ষ্ম যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিচার করলে হয় ত এর অংশবিশেষের স্থূলতা ধরা পড়বে—কিন্তু তা রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে নি। কাহিনীর গতি অতি দ্রুত, তার ক্রমবিকাশের ধারা অতি সচ্ছন্দ এবং সম্পাদনা ত্রুটিশূন্য। [illegible] প্রয়োগেও চিত্রনাট্যকার তাঁর রসবোধ ও রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

'অগ্রদূত' নামে পরিচিত যে কয়টি অভিজ্ঞ টেক্‌নিশিয়ান্ 'সঙ্কল্প'-চিত্রের পরিচালনার জন্যে দায়ী, তাঁদের আরব্ধ কর্ম সম্পাদনে যথেষ্ট মাত্রাজ্ঞান ও কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে, কাহিনী বিস্তারের পথে তাঁদের যত্ন, নিষ্ঠা ও প্রগতিবাদী মনের সন্ধানও পাওয়া যায়। চিত্র-পরিচালনায় একক শক্তির পরিবর্তে সম্মিলিত শক্তির প্রয়োগ-সাফল্যে, অভিজ্ঞ টেক্‌নিশিয়ান্ দ্বারা গঠিত এই বিশেষ গ্রুপ্-টির team-work ইতি-মধ্যেই সমালোচক ও রসবেত্তার সমাদর ও সমর্থন লাভ করেছে।

নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা চিত্রাবতরণ করেছেন, ছোট-বড় নির্বিশেষে তাঁদের team-work ও ছবির জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের প্রধান সহায় বলে গণ্য হবার যোগ্য। শিল্পীদের মধ্যে অনন্যসাধারণ অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, প্রতিভাময়ী চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী মলিনা। নায়িকার শিশুকন্যার ভূমিকায় একটি ছোট মেয়ের অভিনয় এই চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ।

একমাত্র সঙ্গীতের প্রয়োগে গীতকার শৈলেন রায় এবং সুরস্রষ্টা রবীন চট্টোপাধ্যায় আমাদের নিরাশ করেছেন। নিতান্ত অপপ্রয়োগের ফলে গীত-যোজনার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়েছে। তথাপি, এ বৎসরের পরম উপভোগ্য অবদান-রূপে 'সঙ্কল্প'-চিত্রের দাবী আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

শরৎচন্দ্রের "স্বামী"

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত, কলালক্ষ্মী চিত্র-মন্দিরের 'স্বামী'—বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এমন একটি কাহিনী অবলম্বনে রূপায়িত, যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যের উপযোগী যথেষ্ট নাটকীয় উপাদানের অভাব দেখা যায়। সাহিত্য-রস দানা বাঁধবার পক্ষে যা যথেষ্ট, নাট্যরস জমাট করে তোলবার

পথে তা যথেষ্ট নয়। নাট্যবিস্তারের পথে যে ধরণের গতিধর্মী ও বৈচিত্র্যধর্মী narrative-এর একান্ত প্রয়োজন, আলোচ্য কাহিনীতে তার সন্ধান খুব সামান্যই পাওয়া যায়।

কাহিনীর মূল রস গ্রহণের পক্ষেও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পড়ুয়াদের কাছে এই উপন্যাসটি তাঁর অন্যান্য কাহিনীর মত সহজবোধ্য নয়। যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের উপর কাহিনীটির ভিত্তি, তার পূর্ণরস উপলব্ধির জন্য চাই সেই রসগ্রাহী পরিণত মন, যা সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে অত সুলভ নয়।

এই ধরণের কাহিনীকে ফিল্মের জন্যে নির্বাচিত করার যেমন পরিচালক সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি মূল উপন্যাসের অন্তর্নিহিত মাধুর্য অক্ষুন্ন রেখে তার যথাসম্ভব অবিকৃত চিত্ররূপ দেবার মধ্যে পরিচালকের সূক্ষ্ম রসবোধ, কলাজ্ঞান ও সাহিত্যধর্মী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের সনাতনধর্মী মন কাহিনীর পরিণতিতে যে moralএর নির্দেশ করেছেন, চিত্রিত নাটকে সেই moral টুকুর আবেদন সাহিত্যরসিক ও বুদ্ধিজীবী দর্শকচিত্তে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে পারবে বলে আমার মনে হয়।

নায়ক-নায়িকারূপে ঘনশ্যাম ও সৌদামিনীর ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল ও সুমিত্রা দেবীর সহজ ও সংযত অভিনয় যতখানি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, উপনায়ক নরেনের ভূমিকায় প্রদীপকুমারের অভিনয় তা হয় নি। এই ভূমিকাটির আংশিক ব্যর্থতা তাঁর অভিনয়-অক্ষমতারই পরিচয় বহন করে। ঘনশ্যামের প্রৌঢ়া জননীর ভূমিকায় সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব রূপসজ্জা, ভাবাভিব্যক্তি এবং চরিত্রানুগ অভিনয় এই বাণীচিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

নাটকীয় আবেদন সৃষ্টিতে এবং ঘনশ্যামের চরিত্র বিকাশে গানগুলির প্রয়োগ এবং সুর-যোজনা আংশিক-ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

জীবনী-চিত্রের ব্যর্থতা

শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী এবং শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়ের চিত্র-নাট্য অবলম্বনে রূপায়িত, নিউ থিয়েটার্সের বহু প্রত্যাশিত ধর্মমূলক জীবনী-চিত্র "বিষ্ণুপ্রিয়া" নিতান্ত মামুলী ছবির মতই বিশেষত্ব বর্জিত। নিমাই চরিত্রে কৃষ্ণভক্তির দিক খানিকটা আলোচ্য নাটকে পরিস্ফুট হলেও তার বিরাট পাণ্ডিত্য, প্রেমধর্ম ও বৈষ্ণবসুলভ সহনশীলতা এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দিকটা অবহেলিত হওয়ায়, জীবনী-চিত্র হিসেবে 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-র সার্থকতা যৎসামান্যই।

জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং অবধূত নিতাইয়ের আবির্ভাব ও যোগাযোগ, শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ম ও ধর্ম-জীবনের মুখ্য ঘটনা। আলোচ্য নাটকে এই দুটি চরিত্রের অবতারণায় চিত্রনাট্যকার তথা কাহিনী-রচয়িত্রী তাঁদের গভীর অজ্ঞতা এবং রসবোধহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। বিচার-প্রার্থীর প্রকাশ্য দরবারে বিচারক কাজী-সাহেবের সঙ্গে অপরাধী নিমাই-পণ্ডিতের মধ্যে 'দোস্তি' ঘটাবার যে theatrical প্রচেষ্টার সুযোগ নিয়েছেন, তা বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিকামী দর্শকের কাছে নিতান্ত হাস্যকর বলে মনে হয়েছে।

নিমাইয়ের সংগে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ পর্যন্ত ঘটনাগুলি, সংগীতে, সংলাপে ও অভিনয়ে যথেষ্ট সাবলীল ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মূল নাটকের এইটুকুই পূর্বাভাষ। কিন্তু তারপর থেকেই উদ্ভট রামায়ণ রচনার মত, নিমাই-বিষ্ণু-প্রিয়ার জীবনী কথা এমন সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে গেছে যার মধ্যে শস্তা চমক দেবার চেষ্টাটাই প্রকাশ পেয়েছে—যুক্তিবাদী মনে আবেদন সৃষ্টির উদ্দেশ্য এককালীন ব্যর্থ হয়েছে।

ছবির নাম 'বিষ্ণুপ্রিয়া' কিন্তু কাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে শান্তিনিকেতনী ঢং-এর এমন একটি 'নাচুনে তরুণী', যার নাচ, গান ও সদাই দোলায়মান দেহভঙ্গী, নাটকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মূল কাহিনীর রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। ছবি প্রদর্শনের সময় দর্শকদের প্রকাশ্য প্রতিবাদ থেকেই এই বিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া এবং শচীমাতাকে ছাপিয়ে একটি নিতান্ত কাল্পনিক সখা-চরিত্র কেমন করে এই জীবনী চিত্রে এতটা প্রাধান্য পায় তার কারণ আমাদের অজ্ঞাত।

স্থানাভাবে এই ছবিখানি সম্বন্ধে বাকী আলোচনা বারান্তরের জন্যে স্থগিত রাখা হ'ল।

চলচ্চিত্র তদন্ত-কমিটির কর্মারম্ভ

ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা এবং তার উন্নতির উপায় নির্ধারণের জন্যে

ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি 'ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি' বসিয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। এদেশের চিত্র-শিল্পের প্রতি গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতা প্রকট হবার পর, সারা ভারতব্যাপী আন্দোলনের ফলেই এই 'কমিটি' গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়।

একজন চেয়ারম্যান এবং পাঁচজন সভ্যদের দ্বারা গঠিত এই কমিটিতে, সরকারী এবং বেসরকারী সভ্যদের তালিকায় মাত্র দু'জন নির্বাচিত হয়েছেন, যাঁরা ভারতীয় ফিল্মশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক রূপে অগ্রগণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। এঁদের নাম: বোম্বাইয়ের বিনায়ক শান্তারাম এবং বাঙলার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

গত ৮ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে কমিটির চেয়ারম্যান্ শ্রী এস, কে পাতিল-এর সভাপতিত্বে এই তদন্ত কমিটির প্রাথমিক বৈঠক অন্তে, ১০ই এবং ১১ই সেপ্টেম্বর আরো দুইটি বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘের সভাপতি এবং এই কমিটির অন্যতম সভ্য শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার শেষের দুটি বৈঠকে যোগদান করবার জন্যে লণ্ডন থেকে বিমানযোগে ভারতে আসেন। ১২ই তারিখে তিনি আবার লণ্ডনে ফিরে যান। লণ্ডন এবং আমেরিকার বিখ্যাত ষ্টুডিওগুলির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়া এবং বৈদেশিক ফিল্মশিল্পের গঠন ও পরিচালন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই শ্রীযুত সরকারের বর্তমান শফরের উদ্দেশ্য।
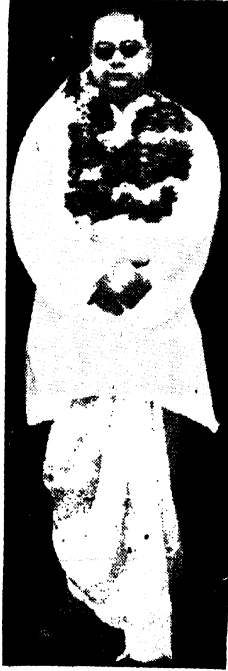
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার বংশ-গরিমায়, বিদ্যায়, আভিজাত্যে এবং চিত্র-প্রযোজনায় শীর্ষস্থান অধিকার করবার যোগ্যতায়, অন্যতম প্রধান শিল্পপতিরূপে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রীযুত সরকারের এই উদ্দেশ্যমূলক বৈদেশিক শফর সাফল্যমণ্ডিত হোক আমরা আন্তরিক ভাবে এই কামনা করি। চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটিতেও শ্রীযুত সরকার ও শ্রীযুত শান্তরামের যুগ্ম সহযোগিতার সাফল্য কামনা করি।

শহরে শঙ্কর-অমলার নৃত্যানুষ্ঠান

দীর্ঘকাল পরে স্থানীয় নিউ এম্পায়ার স্বনামধন্য নৃত্য-শিল্পী উদয়শঙ্করের বিচিত্র নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হওয়ায় উচ্চস্তরের আনন্দ উপভোগের সুযোগ পাওয়া গেল। নৃত্যকলার সাধনায় শঙ্কর ও তাঁর পত্নীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সর্বজনবিদিত। নভেম্বরের মধ্যভাগে আবার তাঁর দলবলসহ য়ুরোপে অভিযান করবার পূর্বে, শঙ্কর ও অমলা দেবীর অগণিত গুণগ্রাহীদের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে এই নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

এবারের অনুষ্ঠান-লিপিতে যে সব বিষয়গুলি স্থান লাভ করেছে, পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যে ও ভাব-মাধুর্যে তা হয়ে উঠেছে সত্যই অভিনব। প্রত্যেকটি নৃত্য-পরিকল্পনার মধ্যে শঙ্করের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ, সৃষ্টিপ্রয়াসী মন এবং ভারতীয় জীবনধারার স্পন্দন ও স্পর্শ পাওয়া যায়। আর্ট ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা সমগ্রজাতির শিক্ষা, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের অন্তর ও বাহিরের একমাত্র সার্থক Revivalist রূপে উদয়শঙ্করের দান অমূল্য। ভারতের নিজস্ব কৃষ্টিগত ভাবধারার প্রচারকরূপে শঙ্করের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তাঁর স্বদেশের গৌরব ও শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায় হয়েছে।

শুভ সংক্রান্তে—

মহাপূজার পর বিজয়া উপলক্ষে আমরা আমাদের লেখক, গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি সকল বন্ধুবান্ধবকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া নূতন উদ্যমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশ্বাস আছে, মহামায়ার প্রসাদে ও সকলের শুভেচ্ছায় এই দারুণ দুর্দ্দিনেও আমরা সকলকে পূর্ব্বের মত সেবা করিবার শক্তি ও সৌভাগ্য লাভ করিব। সকলের সমবেত সাহায্য ও চেষ্টার ফলে 'ভারতবর্ষ' যেন তাহার গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, ইহাই শুভদিনে আমরা কামনা করি। ভারতবর্ষের সেবা করিতে করিতে যাঁহারা সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, আজ আমরা তাঁহাদের সকলের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

ধর্ম্মঘটের শিক্ষা—

কলিকাতায় গত ২২শে অক্টোবর হইতে ৯ দিন ব্যাপী যে কর্পোরেশন কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘট হইয়া গেল, তাহা কলিকাতাবাসীদিগের প্রভূত ক্ষতি করিলেও তাহার মধ্য দিয়া নূতন কর্ম্মোদ্যমের সূচনা দেখা গিয়াছে। রক্ষীদলের যুবকগণ ঐ কয়দিন সকল অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া কলিকাতার পথ হইতে জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। সেই সঙ্গে তরুণের দল স্বেচ্ছাসেবকরূপে তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বাঙ্গালার যুবকগণ যে এখনও উপযুক্ত নেতৃত্ব লাভ করিলে সকল প্রকার কাজই করিতে পারে, তাহা এই কয়দিনে লোক বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বেলিয়াঘাটা অঞ্চলের যুবকগণের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। তাহারা কয়দিন ধরিয়া খাটা পায়খানার ময়লা যে ভাবে পরিষ্কার করিয়াছে, তাহা সত্যই অভাবনীয়। মহাত্মা গান্ধী যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, বিপদের সময় যুবকগণ সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যে কার্য্য করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের দেখিয়া মনে হইয়াছে—বাঙ্গালা দেশের তরুণের দল নিষ্ক্রিয় হয় নাই। যতীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম প্রভৃতির ত্যাগের আদর্শ তাহারা বিস্মৃত হয় নাই—প্রয়োজন হইলেই তাহারা আবার অসাধ্য সাধন করিয়া বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে।

শোচনীয় দুর্ঘটনা—

কর্পোরেশনের কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কলিকাতা হ্যারিশন রোডে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দেশবাসী সত্যই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে। একদল যুবক যখন গলির মধ্য হইতে জঞ্জাল আনিয়া রাজপথের উপর গাদা করিতেছিল, তখন বেনিয়াটোলার মোড়ে হ্যারিসন রোডের উপরে এক ধনী মাড়োয়ারীর বাড়ী হইতে তাহাদের উপর নৃশংসভাবে গুলীবর্ষণ করা হইয়াছিল—এমন কি পুলিশ পর্য্যন্ত প্রথমটায় তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। বর্ত্তমানে সাম্য ও স্বাধীনতার যুগে এই ভাবে শক্তিশালী ধনী কর্ত্তৃক শক্তির অপব্যয় অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার। যুবকগণের অপরাধ—তাহারা ঐ ধনীর গৃহের সম্মুখে জঞ্জাল রাখিয়াছিল—তাহাদের ঐ কার্য্য কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল না। গলি হইতে ময়লা বাহির করিয়া আনিয়া প্রশস্ত রাজপথে রাখাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক—পরে যথাকালে সে ময়লা সরাইয়া ফেলা হইত। কিন্তু উদ্ধত ও ধনগর্বিত শক্তিশালী ব্যক্তিরা আগ্নেয়াস্ত্র অপব্যবহার করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছে। পরে পুলিশ আসিয়া ঐ বাড়ী হইতে বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে ও বহু বে-আইনিভাবে রক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্রও নাকি তথায় পাওয়া গিয়াছে। যাহাতে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই প্রার্থনা করি, ধনী বলিয়া যেন বিচারে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা না হয়—তাহা দেশবাসী কখনই সহ্য করিবে না। একদল অবাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশে থাকিয়া ও বাঙ্গালার অর্থে পুষ্ট হইয়া বাঙ্গালীদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ধনীর পক্ষ সমর্থন করে

বলিয়া একদল লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস হইয়াছে। হ্যারিসন রোডের দুর্ঘটনার বিচারের ফল যেন জনসাধারণের মন হইতে সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে সমর্থ হয়। অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালা দেশে বাস করুন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না—কিন্তু বাঙ্গালীর উপর তাহাদের অযথা অত্যাচার যেন কেহ সমর্থন না করেন, ইহাই সকলের কামনা।

প্রধান মন্ত্রীর আমেরিকা ভ্রমণ—

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি ভ্রমণে গিয়াছেন, তাহা জানিবার কৌতুহল সকলের পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি তথায় বিভিন্ন বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে যে সকল কথা প্রচার করিতেছেন, আমরা নিম্নে তাহার সার-মর্ম্ম প্রদান করিলাম, তাহার ফলে লোক তাহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। তিনি জানাইয়াছেন—(১) পররাজ্য আক্রান্ত হইলে অথবা স্বাধীনতা বা ন্যায় বিচার বিপন্ন হইলে ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ থাকিবে না। তবে পূর্ব্ব ও পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলিতেছে, ভারতবর্ষ তাহাতে যোগ দিবে না (২) ভারতের সরকারী নীতির মূল লক্ষ্য হইল—জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা। এই উদ্দেশ্যে মার্কিনী অর্থ বা যান্ত্রিক সাহায্য গৃহীত হইবে। (৩) সামাজিক স্থায়িত্ব বিধানের জন্য ভারত ও এশিয়ার লোকদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা প্রয়োজন। এই সামাজিক স্থায়িত্ব বিধানই কম্যুনিজম-প্রসার নিরোধের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী উপায়। (৪) ভারতে কোনরূপ উপনিবেশিক শোষণ চলিবে না এবং যে কোন সাহায্যই তাহাকে দেওয়া হউক না কেন, তাহাতে এমন কোন সর্ত থাকিতে পারিবে না, যদ্বারা ভারতের স্বাধীনতা কোন রকমে ক্ষুণ্ণ হয়। (৫) ভারতবর্ষ স্বাভাবিক ভাবে এশিয়ার নেতৃত্ব অধিকার করিয়াছে এবং উহার পক্ষে এখন আর নিঃসংস্রব হইয়া থাকা সম্ভব নহে।

চীনে কম্যুনিষ্ট সরকার—

চীনে কম্যুনিষ্ট সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও কম্যুনিষ্ট-নেতা মাও সে তুং এই সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সোভিয়েট রুসিয়া ও রুস প্রভাবিত পূর্ব-ইউরোপের কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই এই নূতন সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই নূতন সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য অন্যান্য দেশের প্রতিও তাঁহারা আবেদন জানাইয়াছেন। এংলো-মার্কিণ গোষ্ঠীর দেশগুলি এই নূতন চীনা-সরকারকে স্বীকার করিয়া লওয়ার প্রশ্নটি বিবেচনা করিতেছেন। পরামর্শের জন্য চীনাস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দার কে-এম-পানিকর ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট সরকারকে স্বীকার করিয়া লওয়ায় রুসিয়ার বিরুদ্ধে চীনা কুওমিংটাং সরকার চীন-রুস চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনিয়াছেন। জগতের গতি এখন কোন দিকে চলিবে তাহাই বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

গান্ধীজির জন্ম দিন—

সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, ২রা অক্টোবর শুধু ভারতের সর্ব্বত্র নহে, ভারতের বাহিরেও বহু স্থানে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালিত হইয়াছে। লোক সে দিন শ্রদ্ধার সহিত একত্র সমবেত হইয়া গান্ধীজির জীবন ও কর্ম্মাদর্শের কথা স্মরণ করিয়াছে। গান্ধীজি চরকায় সুতা-কাটা ভাল-বাসিতেন বলিয়া লাট-প্রাসাদে চরকা যজ্ঞ বা দল বাঁধিয়া সুতাকাটা হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজির ৩০ বৎসরব্যাপী প্রচারের পরেও ভারতের অতি অল্প-সংখ্যক লোক চরকায় সুতা কাটিয়া থাকে—অধিকাংশ লোকই চরকায় সুতা কাটা নিরর্থক বলিয়া মনে করে। তাহারা যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গান্ধীজির জীবনের মূল শিক্ষা ছিল—সত্যের অনুসন্ধান। জীবন হইতে মিথ্যাকে দূর করার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসী যদি সেই সত্যের অনুসন্ধানের চেষ্টা করে, তবে গান্ধীজির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। দুঃখের কথা—দেশবাসী অসত্যের ভক্ত হইয়াছে ও সে জন্য দেশ-বাসীর দুঃখদুর্দ্দশা বাড়িয়াছে। শুধু গান্ধী-জন্ম দিবসে নহে, প্রত্যহ আমাদের গান্ধীজিকে স্মরণ করার সময় মনে করা উচিত—আমরা প্রত্যেকে যেন তাঁহার মত সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

চিনির ফাটকা—

গত মহাপূজার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে হঠাৎ বাজার হইতে চিনি অদৃশ্য হইয়া যায় ও তাহার ফলে সারা দেশের লোককে অবর্ণনীয় অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে পতিত হইতে হইয়াছিল। তাহার প্রায় ১৫ দিন পরে ১০ই অক্টোবর হইতে রেশনের

দোকান হইতে চিনি দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা মাথা পিছু মাত্র সপ্তাহে আধ পোয়া এবং তাহার মূল্যও কম নহে। পূর্ব্বে যখন চিনি রেশনে পাওয়া যাইত তখন তাহার দাম ছিল সের প্রতি দশ আনা। কিন্তু চিনির কণ্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ার পর চিনির দর না কমিয়া তাহা বাড়িতে থাকে ও গত কয় মাস যাবৎ ১৫ আনা বা এক টাকা সের দরে চিনি পাওয়া যাইত। চিনির কলওয়ালারা বা ব্যবসায়ীরা যে অত্যধিক লাভের লোভে চিনির দর এভাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত—কিন্তু গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে বিবৃতি প্রকাশ ছাড়া চিনির দর কমাইয়া জনগণের অভিযোগ দূর করিতে অগ্রসর হন নাই। কাজেই লোক যে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে ধনী ও চোরাকারবারীর সমর্থক বলিয়া মনে করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? পূজার সময় চিনি প্রকাশ্য বাজার হইতে উধাও হইলেও সর্বত্র ২ টাকা ৩ টাকা সের দরে চিনি কিনিতে পাওয়া গিয়াছে—লোক বৎসরে মাত্র ঐ কয়দিনই গৃহে আনন্দোৎসব করিয়া থাকে, কাজেই তাহারা বাধ্য হইয়া ২ টাকা ৩ টাকা সের দরে চিনি ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। পুলিস এই সংবাদ জানিয়াও ইহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করে নাই। শাসকবৃন্দ এই অব্যবস্থার কথা জানিয়াও জনগণের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত চিনি সরবরাহের ব্যবস্থায় মনোযোগী হন নাই। ১৫ দিন ধরিয়া এইভাবে চিনির বাজারে অরাজকতা চলিয়াছে—শাসকগণের মধ্যে ইতিমধ্যে কোন ব্যবস্থা করা যে সম্ভব ছিল না—এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। চিনির চোরা-কারবার ঐ ১৫ দিন প্রকাশ্যভাবেই চলিয়াছিল। অথচ মধ্যে মধ্যে শুনা যায় যে চিনির কলে চিনি জমা হইয়া আছে—চিনির গুদামে চিনির অভাব নাই। কাহাদের দোষে বা কি জন্য চিনির বাজারে এই অরাজকতা হইয়া গেল—সে বিষয়ে তদন্ত করিয়া অপরাধীদের উপযুক্তভাবে শাস্তি দান করা কি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না? যদি তাহা মনে না করেন, তবেই ত লোক বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীকে চোরা বাজারের সমর্থক বলিয়া মনে করিবে। একদল ব্যবসায়ী এই কয়দিনে প্রচুর অর্থ-উপার্জ্জন করিয়াছে—অথচ দরিদ্র গৃহস্থগণের যে জন্য দুঃখ ও কষ্টের অন্ত ছিল না। এখন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ প্রায় ১ মাস পরেও) চিনি উপযুক্ত ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা হয় নাই—সে জন্য লোককে তিন টাকা সের দরে বাতাসা ও ৪ টাকা সের দরে মিছরী কিনিতে হইতেছে। এই অব্যবস্থা দূর না হইলে লোক বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্য্য সমর্থন করিতে পারিবে না।

লবণ-সমস্যা—

চিনির মত লবণের বাজারেও ফাটকাবাজী হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বাজারে প্রচুর লবণ থাকা সত্বেও একদল ব্যবসায়ী চোরাকারবারের সুবিধা করিবার জন্য সংবাদ রটাইয়াছিল যে চিনির মত লবণও কণ্ট্রোল করা হইবে ও কিছুদিন বাজারে লবণ পাওয়া যাইবে না। ঐ সংবাদ রটনার ফলে ২।৩ দিন বাজারে লবণ ১২ আনা ১৪ আনা সের দরে বিক্রীত হয়—কিন্তু যখন দেখা গেল বাজারে প্রচুর লবণ আছে, তখন লোক ক্রয় বন্ধ করিয়া দিল ও তাহার ফলে ফাটকাবাজদের বাসনা অপূর্ণই থাকিয়া গেল। যাহারা এই সকল কাজ করে, পুলিসের পক্ষে তাহাদের সন্ধান করা আদৌ কষ্টসাধ্য নহে। কিন্তু পুলিস বিভাগও এখন আর পূর্ব্বের মত কর্ম্মদক্ষ নাই। ফলে দেশের দরিদ্র জন-সাধারণকে দিনের পর দিন নিত্য নূতন অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে।

চাউল সমস্যা—

বাঙ্গালাদেশে গত ২ মাসেরও অধিক কাল অধিকাংশ রেশন দোকান হইতে অখাদ্য চাউল বিক্রয় করা হইতেছে। মহাপূজার পূর্ব্বে এক মাসেরও অধিক কাল শুধু আতপ চাউল দেওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে প্রায় সকল লোক সিদ্ধ চাউল খাইতে অভ্যস্ত, কাজেই তাহাদের পক্ষে আতপ চাউল হজম করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। তাহার পর প্রায় এক মাস কাল অখাদ্য চাউল (কাঁকর ও খুদ মিশ্রিত) দেওয়া হইতেছে। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াও কোন ফল হয় না। অথচ রেশন এলাকার বাহিরে মণ প্রতি সাড়ে ১৭ টাকার চাউল ৩০ টাকা মণ দরে (ভাল) চাউল বিক্রীত হয়। লোক যদি (অবশ্য যাহাদের আর্থিক সামর্থ্যে কুলায়) রেশনের চাউল না লইয়া কালোবাজারে চাউল ক্রয় করে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আমরা বহুবার এ বিষয়ে লিখিয়াছি—কিন্তু অসামরিক সরবরাহ বিভাগ এ বিষয়ে আদৌ মনোযোগী হন না। দেশের লোকের পক্ষে দুর্দ্দশা ভোগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

শ্রীএম-এস্‌-গোলওয়ালকর—সহকর্মী পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রধান　　ফটো—পান্না সেন

নারী সেবা সংঘে রাজকুমারী শ্রীঅমৃত কাউর　　ফটো—পান্না সেন

কুচবিহার ও ত্রিপুরা—

পূর্ব্ব ভারতের তিনটি স্বাধীন রাজ্য সম্প্রতি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—তন্মধ্যে মণিপুর আসাম গভর্ণমেণ্টের অধীন করা হইয়াছে এবং ত্রিপুরা ও কুচবিহার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন করা হইয়াছে। তিনটি রাজ্যেই বঙ্গভাষাভাষী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক—পশ্চিম বাংলা এখন একটি অতি ক্ষুদ্র প্রদেশে পরিণত হওয়ায় তাহার শাসনের নানারূপ অসুবিধা হইয়াছে। মণিপুর অবশ্য আসামের একপ্রান্তে—কাজেই তাহার আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু কুচবিহার ও ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ বুঝা গেল না। ঐ ২টি রাজ্য পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হইলে পশ্চিম বাংলাকে সমৃদ্ধ করার সুবিধা হইত। ঐ ২টি রাজ্যের বঙ্গভাষাভাষীদের হয় ত বাঙ্গালা ভাষা ক্রমে ত্যাগ করিতে হইবে ও ফলে সেখানে বাঙ্গালার যে সংস্কৃতি ছিল তাহাও শেষ হইয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যবস্থা বাঙ্গালী সমর্থন করিতে পারে না। ইহা প্রতীকারের কি কোন উপায় হইতে পারে না। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল না—কুচবিহার ও ত্রিপুরা বাঙ্গালা হইতে পৃথক হইয়া গেল—তাঁহারা এই সকল অন্যায়ের প্রতিবাদে যদি অগ্রসর না হন, তবে দেশবাসীর আস্থাভাজন হইয়া থাকিবেন কি প্রকারে—তাহাই চিন্তার বিষয়।

পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীতে নূতন রাষ্ট্র—

পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলে একটি নিখিল জার্ম্মাণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐক্যবদ্ধ কমুনিষ্ট সোসালিষ্ট দল একটি গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। এই নূতন রাষ্ট্রের আইন সভায় পশ্চিম জার্ম্মাণীরও প্রতিনিধি আছে এবং জার্ম্মাণীর ঐক্য-রক্ষা এই সরকারের প্রধান নীতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। রুস কর্তৃপক্ষও ঘোষণা করিয়াছেন যে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী হইতে সমস্ত রুস সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইবে। পশ্চিম জার্ম্মাণী সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃপক্ষ কি করিবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

চীনাবাদামের ময়দা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেসামরিক সরবরাহ-সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নূতন এক খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টন চীনাবাদামের খইল পশু-খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ঐ খইলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও লৌহ প্রভৃতি থাকে। সেজন্য ঐ খইল হইতে ময়দা প্রস্তুত করিয়া তাহা আটা ময়দার সহিত মিশাইয়া সকলকে খাইতে বলা হইয়াছে। চীনাবাদাম পুষ্টিকর খাদ্য—তাহা নানাভাবে ভারতের লোক ব্যবহার করিয়া থাকে। যতদিন না দেশে প্রচুর চাউল উৎপাদন করা হয়, ততদিন আমাদের এইভাবে নূতন নূতন খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। কেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সকলকে চাউল কম খাইয়া কলা ও মিষ্টি আলু বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র অতি অল্প চেষ্টায় প্রচুর পরিমাণে কলা ও মিষ্টি আলু উৎপাদন করা যায়। দেশবাসী সে বিষয়ে অবহিত হইলে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

ভারতের মোটর-শিল্প—

ভারত সরকার বিলাতের মোটরনির্ম্মাণকারী ব্যবসায়ী রুটস কোম্পানীকে ভারতে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার ও এদেশে মোটর নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। প্রথমতঃ এই কোম্পানী ইংলণ্ড হইতে তৈয়ারী কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম আনিয়া তাহা দ্বারা মোটর প্রস্তুত করিবে। পরে ক্রমে তাহারা এদেশের মালমসলা ও উপকরণ হইতে মোটরের বিভিন্ন অংশ তৈয়ারের কাজে হাত দিবে। এই খবরে মোটর শিল্পের ভারতীয় উদ্যোক্তাদের মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। বোম্বায়ের 'কমার্স' পত্র তাহাদের পক্ষ হইয়া গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন। বিলাতী কোম্পানীকে এদেশে মোটরের কারখানা করিতে দিলে যে সকল ভারতীয় কোম্পানী ইতিমধ্যে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—এই তাহাদের অভিযোগ। কিন্তু ভারতে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ মোটর প্রয়োজন, তাহার জন্য বিদেশী কোম্পানীদের সুযোগ না দিলে ভারতের চাহিদা মিটানো যাইবে না এবং প্রতিযোগিতা না থাকিলে দামও কম হইবে না। ধনিক

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিয়া অনেক সময় দেখা গিয়াছে, তাহার ফলে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যদি তাহা বন্ধ হয়, তবে গভর্ণমেণ্টের এই কাজ সকলেই সমর্থন করিবে।

সুভাষ-দ্বীপে উপনিবেশ—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাস্তুত্যাগী পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদের বাসের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। সম্প্রতি ঐ দ্বীপপুঞ্জের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সুভাষ-দ্বীপ রাখা হইয়াছে এবং দ্বীপে যাঁহারা বাস বা ব্যবসা করিতে যাইতে চাহেন তাঁহাদের সুখ সুবিধা বিধানের জন্য 'সুভাষ-দ্বীপ উপনিবেশ সমবায় সর্বার্থসাধক সমিতি লিঃ' নাম দিয়া কলিকাতা-(৯)—৪৪ বাদুড় বাগান ষ্ট্রীটে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সুভাষ-দ্বীপ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে বহু ভ্রান্ত ধারণা আছে—সেগুলি দূর করার জন্য ঐ ঠিকানা হইতে প্রকাশিত 'নিউ বেঙ্গল' নামক ইংরাজি পত্রিকার আন্দামান বিশেষ সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ ও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী না যাইলে পাঞ্জাবী বা সিন্ধী বাস্তুহারার দল তথায় যাইয়া বসতি স্থাপন করিবে ও তাহারা নানা দিক দিয়া লাভবান হইবে। বাঙ্গালীদের আজ এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া উপনিবেশটি যাহাতে বাঙ্গালীর দ্বারা পূর্ণ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। 'সুভাষ-দ্বীপ' যেন 'নূতন বাঙ্গালা' দেশে পরিণত হয়, আমরা সর্বান্তঃকরণে তাহাই কামনা করি।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা—

গণপরিষদে স্থির হইয়াছে যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে হিন্দী, আর উহার লিপি হইবে নাগরী—কিন্তু অন্তত ১৫ বৎসর উহা পুরাপুরি আমলে আসিবে না। এই সময় আরও বাড়িতে পারে। এই ১৫ বৎসর এখনকার মত ইংরাজি ভাষাতেই রাজকার্য্য চলিবে। পরিষদে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেও একদল লোক এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন নাই। স্বরাজ হইলেও আমরা আমাদের রাজকার্য্য কোন দেশী ভাষায় চালাইতে পারিব না বলিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ভারতে প্রচলিত কোন প্রাদেশিক ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা করা হইলে বহু লোক যে অসুবিধাগ্রস্ত হইবে একথা বলার কোন প্রয়োজন দেখি না। যদি কোন ভারতীয় ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা করিতে হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষাই সেই স্থানলাভের একমাত্র অধিকারী। কিন্তু সংস্কৃতও চলিত ভাষা নহে। ইংরাজি লিখিলে শুধু সারা ভারতে তাহা চালাইয়া কাজ করা যাইবে না, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তাহা কাজে লাগানো যাইবে। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য বর্ত্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ—কাজেই ইংরাজীর মারফত জগতের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার সংগ্রহ করা যাইবে। কাজেই গণপরিষদ ইংরাজিকে সর্বভারতীয় ভাষা রাখিয়া উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

চোরা-কারবারীর দণ্ড—

বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিরাপত্তা আইন অনুসারে ১৩জন চোরা-কারবারী ব্যবসায়ীকে সম্প্রতি জেলা হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন। তাহারা ধান্য, চাউল, চিনি, লবণ প্রভৃতির চোরা কারবার করিয়াছিল। প্রত্যেক জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। আজ ব্যবসায়ীরা মনে করে, চোরা কারবার ছাড়া লাভের অন্য উপায় নাই। সন্দেহ হইলেই নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করা চলে। কাজেই এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা হইলে লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইবে ও ক্রমে দেশ হইতে চোরা-কারবার চলিয়া যাইবে।

পাটের অবস্থা—

পাকিস্তানে অধিক পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় ও তাহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আনিয়া পাটকলসমূহে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি পাকিস্তান সরকারের ব্যবস্থায় পাটের দর অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় লোক পাটকলগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। ভারতীয় পাটকল সমিতি ঘোষণা করিয়াছেন যে পাকিস্তান হইতে আর আদৌ পাট না কিনিলেও ভারতবর্ষে ১৯৫০ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত পুরা কাজ চালাইয়াও ৫লক্ষ গাঁটের বেশী মাল মজুত থাকিবে। ভারতের বহু স্থানে এবার পূর্ববঙ্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট পাট জন্মিয়াছে। এই বৎসরেই ত্রিবাঙ্কুরের পাট বাজারে বাহির হইবে। পাট সম্পর্কে ভারত যাহাতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়, সেজন্য সর্ব্ববিধ চেষ্টা হইতেছে।

পরলোকে সতীশচন্দ্র দে—

গত ১৯শে কার্ত্তিক কলিকাতা ১৯-এ চৌধুরী লেনস্থ ভবনে, ৮১ বৎসর বয়সে বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন এবং কলিকাতার বিশুদ্ধানন্দ মাড়ওয়াড়ী হাসপালের প্রবীণ চিকিৎসক রায় বাহাদুর ডাঃ সতীশচন্দ্র দে এম-এ, এম-বি পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ দে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার ও স্বর্ণপদক অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ডাঃ স্যর কৈলাস বসুর অবসর গ্রহণের পর তিনি মাড়ওয়াড়ী হাসপাতালের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ১৩ বৎসরকাল কাজ করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাংলায় রচিত কতকগুলি ডাক্তারী পাঠ্যপুস্তক আছে। তাঁহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস ও প্রবোধচন্দ্র দে আই, সি, এস তাঁহার পূর্ব্বেই বিগত হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অধ্যাপক ডক্টর সুশীলকুমার দে এম, এ, ডি-লিট্ সর্ব্বজনপরিচিত।

শিক্ষার ফল—

সম্প্রতি বোম্বায়ে ভারতীয় বিদ্যাভবনে এক বক্তৃতায় দেশ-পাল চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলের চিন্তার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন—"ছাত্র সংখ্যার দিক হইতে বিচার করিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিতে হয়। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বর্ত্তমান অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে 'মানুষ' বাহির হইতেছে তাহাকে কোনমতেই ভাল বলা চলে না—ছাত্র, শিক্ষক, জনসাধারণ, আইন পরিষদ ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য সকলেই এ বিষয়ে একমত। সংখ্যার দিক হইতে কমতি না ঘটিলেও ইহাদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রয়োজন মিটিতেছে না, কারণ গুণাবলীর দিক হইতে ইহারা একেবারে অনুপযুক্ত। * * * যে পরিমাণ লোভ ও স্বার্থপরতা আজ দেশে বিরাজ করিতেছে—যাহার ফলে জাতীয় সরকারের লক্ষ্যসাধন দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক। অতীতে বহুকাল ধরিয়া আমাদের শাস্ত্র ও সংস্কৃতি পর্বতের ন্যায় ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছে। যে সংযম, শৃঙ্খলাবোধ ও নাতিশিক্ষা আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত, গত ১০০ বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে তাহার বিরোধী শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসরণ করায় তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রাচীন উত্তরাধিকারের বিলোপ সাধন করিল বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নূতন কিছুই দিতে পারিল না। ইহাই দুঃখের বিষয়।" শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী সত্য কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে নূতন রাষ্ট্রের নায়ক, সেই রাষ্ট্র হইতে বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টাই এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। এখনও রাষ্ট্রপরিচালকগণ গতানুগতিক পথেই চলিয়াছেন। দেশ-পালের এই সকল মন্তব্য যেন সকলের চিন্তাধারা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়।

অসামঞ্জস্য—

আমেরিকা যাইবার সময় বোম্বায়ের পথে পুণায় যাইয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু 'ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমী'র ভিত্তি সংস্থাপন করেন। সেদিন তিনি বলেন —আমরা অহিংসার কথা বলি, অথচ এদিকে এখানে সেখানে সামরিক বিদ্যালয়ও খুলিতেছি—জীবন ব্যাপার এমনই অসঙ্গতিপূর্ণ। আমরা আমাদের সামরিক শিক্ষা পর-দেশ আক্রমণের কাজে লাগাইব না। কেবল আত্মরক্ষার নিমিত্তই অনিচ্ছায় আমাদের এই প্রস্তুতি। এ কথা কেবল আমার নিজের কথাই নহে, আমাদের দেশের সকলেরই এই অভিমত। ইহা আমাদের আত্মসংযমের দ্যোতক।" পণ্ডিত নেহরু যে অসামঞ্জস্যের জন্য লজ্জিত হইয়াছেন, তাহা দূর করাই মহাত্মা গান্ধীর সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি জানিতেন, ক্ষাত্রধর্ম্মের মনে যদি অহিংসার কথা থাকে ত উহা আত্মসংযমী হইবে, আর তাহা হইতে উহার শক্তি বৃদ্ধি হইবে। মনে যদি আমরা হিংসা পোষণ করি, তাহা হইলে দৈহিক শক্তি আমাদের বর্ব্বর করিয়া তুলিবে, আর সেই বর্ব্বরতা হইতে আমাদের ব্যর্থতা দেখা দিবে।

—পাঁচ—

একটা মস্ত গড়খাই—প্রায় বুজে এসেছে। কলমীবন আছে, মাঝে মাঝে এক একটা ঢোঁড়া সাপ ডুব-সাঁতার কাটে শ্যাওলা ভরা কালো জলের তলায়। 'গলা উঁচু করে ঘোরে পানকৌড়ি—দূর থেকে কেউটের ফণার মতো দেখায়। পানও নেই, কড়িও নেই—গোটা কতক গেঁড়ি-গুগলি আর এক-আধটা পদ্ম চাকাই ভরসা।

গড়খাই পেরিয়ে একটা উঁচু মিনারের ধ্বংস স্তূপ। লোকে বলে, 'বুরুজ'। 'পাল বুরুজ'। হয়তো অবজার-ভেট্‌রী ছিল পালরাজাদের আমলে। হয়তো এর সমুচ্চ শীর্ষে দাঁড়িয়েই দ্বিতীয় মহীপাল দেখেছিলেন—দিব্যোকের বিদ্রোহী বাহিনীর মশাল রক্ত-জবার মতো ফুটে উঠছে কালান্তক অন্ধকারে।

পাল-বুরুজ ছাড়িয়ে কিছু কাঁটা বন, লাটার ঝোপ। তলায় তলায় বিকার্ণ ইট-পাথরের কঙ্কাল। বিধ্বস্ত প্রাসাদের অস্থি শেষ। নক্‌সা-কাটা ইঁট, খোদাই করা গ্র্যানাইট আর কষ্টি পাথরের টুকরো। তারপরে আবার গড়খাইয়ের বৃত্তাকার রেখা। সেইটুকু পেরিয়ে বুনোওল আর ঘেটু ফুলের একরাশ জঙ্গল ভাঙলে পালনগর শুরু।

নামেই পালনগর, কিন্তু পালেরা কেউ নেই। দেড়শো ঘর পরাক্রান্ত পাঠানের বাস এখানে। উচ্চারণ করে "পায়ঠান"—'ঠ' এর ওপর অস্বাভাবিক জোর দেয় একটা। শের সাহের সঙ্গে নাকি কী একটা সম্পর্ক ছিল ওদের। হয়তো ওই জোরটুকু দিয়েই সেদিনের বীরত্বের জের টানতে চায় একটুখানি।

এই 'পায়ঠান'দের নেতা ফতেশা পাঠান। কালো কুচকুচে জোয়ান শরীর। মুখে পুরু গোঁফ, তার দুটি প্রান্ত দংশনোদ্যত কাঁকড়া-বিছের লেজের মতো উর্ধ্বগামী। প্রসন্ন থাকলে সেই প্রান্ত দুটিকে তিনি পাকাতে থাকেন—উত্তেজনার কারণ ঘটলে টেনে টেনে লম্বা করতে থাকেন। দাঙ্গাহাঙ্গামা কাজিয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহ। তিন চারটে দেওয়ানী লড়ছেন কুমার ভৈরব নারায়ণের সঙ্গে—ফৌজদারীও আছে। 'বাদিয়া মুসলমান' নামে এক শ্রেণীর দুর্দান্ত লোককে এনে বসিয়েছেন 'শাল বুরুজে'র উত্তরে এক খণ্ড পতিত জমিতে। নাম মাত্র খাজনা দেয়—লাঠি ধরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়। হাত খুব পরিষ্কার 'বাদিয়া'-দের। হাঁসুয়ার কোপে এত সহজে মাথা নামিয়ে দেয় যে মুণ্ডুহীন মানুষটা টেরও পায় না কখন সে নিঃশব্দে মরে গেল।

পালনগরের মাঝখানে বেশ বড় আকারের একটি মসজিদ। লাল গম্বুজটা চোখে পড়ে অনেক দূর থেকে। সারাদিন তার ওপরে জালালী কবুতর চক্র দিয়ে ওড়ে। মিনারের গায়ে দলে দলে বাদুড় ঝুলে থাকে। অনেক কালের পুরোণো মস্‌জিদ। যে পাঠান ফকির গাজী হয়ে পালনগর দখল করেছিলেন, ওটি নাকি তাঁরই কীর্তি।

সমৃদ্ধ পাঠানদের গ্রাম এই 'পালনগরে' শতকরা নিরানব্বুই জন মুসলমান। এতকাল ছোট একটি মাদ্রাসায় 'আলেক বে-পে' ছাড়া আর কোনো শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ফতে শা পাঠান গত বছর একটি এম-ই ইস্কুল করেছেন এখানে। পাঁচ সাতজন মাস্টার এসেছেন গ্রামে—সেই সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর আলোও এসেছে।

ফতেশা পাঠানের বৈঠকখানা ঘরে মজলিশ বসেছিল। রবিবারের সকাল—ইস্কুল ছুটি। ফতেশা স্বয়ং আছেন, একজন মাস্টারও এসে জুটেছেন। তা ছাড়া দৈনন্দিন আগন্তুক জনকয়েক মাতব্বর ব্যক্তি তো আছেনই।

সামনে একখানা খবরের কাগজ। তাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা দানা বেঁধে উঠেছে। কথা বলছিলেন আলিমুদ্দিন সর্দার। পাবনা জেলার লোক—আই-এ পাশ

করে নানা জায়গা ঘুরবার পর ইস্কুলের মাস্টারী নিয়ে এসেছেন।

আলিমুদ্দিন বললেন, এ বড় আফশোষের কথা, এখনো পাকিস্তান বোঝেন না।

এন্তাজ আলী পাঠান কারবারী লোক। বয়স্ক ব্যক্তি—চুল কাঁচা-পাকার খাদ মেশানো থাকলেও দাড়ি প্রায় সবটাই শাদা হয়ে এসেছে। হাট-বাজারের উপলক্ষে নানা জায়গায় যেতে হয় তাঁকে, ব্যবসায় উপলক্ষে নানা স্তরের লোকের সঙ্গে মেশামেশিও আছে। সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষ। মৃদু হেসে বললেন, বুঝবনা কেন! নানা রকম কথাই তো শুনছি। শহরে দেখলাম ছোকরারা এরই মধ্যে বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আপনি একটু খোলসা করে বলুন দেখি মাস্টার সাহেব।

আলিমুদ্দিন নড়ে চড়ে বসলেন: আসল কথা, আমরা আর ওদের সঙ্গে থাকব না।

—কাদের সঙ্গে?—এন্তাজ আলী প্রশ্ন করলেন।

—কাদের আবার? কাফেরদের।

—হিন্দুদের বলুন।—এন্তাজ আলী হাসলেন।

—ও একই কথা—আলিমুদ্দিন ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বক্র দৃষ্টি এন্তাজ আলীর মুখের ওপর ফেলে বললেন, কাফের আর হিঁদুতে কোনো তফাৎ নেই। তারা পুতুল পূজো করে, হাজার কুসংস্কার মানে, এক জাত আর এক জাতকে ছুঁলে তাদের নাইতে হয়। তা ছাড়া তারা ইসলামের শত্রু। কাফের কথার আর কী মানে থাকতে পারে এ ছাড়া!

একটা মস্ত তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়া খাচ্ছিলেন ফতেশা পাঠান। চোখ দুটো বোজাই ছিল, খুব মন দিয়ে আলোচনা শুনছিলেন। নলটা ছেড়ে দিয়ে চোখ মেলে তাকালেন এবার। সোজা হয়ে উঠে বসলেন খানিকটা—দংশনোদ্যত বিছের লেজের মতো গোঁফটাকে টেনে টেনে খানিকটা লম্বা করতে চাইলেন, তারপর:

—ঠা বলেছেন। ও সব ব্যাটাই হারামখোর। সবাই কাফের। আর সব চাইতে বড় কাফের হল হিজলবনীর ওই ভৈরবনারায়ণ।

এন্তাজ আলী সম্পর্কে ফতেশার চাচা, সেদিক থেকে খানিকটা দুঃসাহস তাঁর আছে। তেমনি হাসিমুখেই বললেন, তোমার সঙ্গে মামলা চলছে বলেই বুঝি?

—না চাচা, আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনারা সেকেলে লোক, এসব বুঝবেনও না। মাস্টার সাহেবই খাঁটি কথা বলছেন।

—বেশ বলুন, শোনা যাক।—এন্তাজ আলী দেওয়ালে গা এলিয়ে দিলেন।

আলিমুদ্দিন অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

—এসব বাজে তর্কের কথা নয়—যুক্তির জিনিস। আমি আরো স্পষ্ট করে বলছি। হিন্দুদের সঙ্গে আলাদা হয়ে নয়া রাষ্ট্র আর নতুন তমদ্দুন তৈরী না করতে পারলে আমাদের কোনো আশা নেই।

—সেদিন এক মৌলবী সাহেব মস্‌জিদে 'ওয়াজ' করে গেলেন। তিনিও ওসব বললেন বটে—

ফতেশা পাঠান নিজের সুচিন্তিত মন্তব্য জুড়ে দিলেন।

—ওসব মৌলবী-টৌলবীর কথা ছেড়ে দিন।—আলিমুদ্দিন বিরক্ত হয়ে উঠলেন: কিছু বোঝে না, এটা বলতে ওটা বলে—সব মাটি করে দেয়। ধর্ম ছাড়া মাথায় কিছু ঢোকে না। ধর্মের নিন্দা আমি করছি না, কিন্তু এ হল রাজনীতির ব্যাপার। এখনো যদি আপনারা হুঁশিয়ার না হন, তা হলে আপনাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

—কে সর্বনাশ করবে, হিন্দুরা?—এন্তাজ আলী বললেন, কেন, মুসলমানের কব্জীর জোর কি একেবারে মরে গেছে?

—ভুল হল চাচা সাহেব। কব্জীর জোরের দরকার আছে, কিন্তু একালে তাই সব নয়। রাজনীতির খেলায় হার হয়ে গেলে কোনো কব্জী আপনাদের বাঁচাতে পারবে না। আর এই বেলা কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

—কংগ্রেস? কেন কংগ্রেস কী দোষ করল? শুনছি, এতকাল তো কংগ্রেস আজাদীর জন্যেই লড়াই করে আসছে। সে তো হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আজাদী—এন্তাজ আলী আস্তে আস্তে বললেন।

—হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আজাদী!—আলিমুদ্দিনের মুখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠল: গোড়াতে 'কায়েদে আজমও' তাই ভাবতেন। এমন দিন ছিল যেদিন গান্ধীজীর ডান হাত ছিলেন জিন্না সাহেব। কিন্তু যেদিন প্রথম তিনি মুসলমানদের স্বার্থের কথা ভাবতে চাইলেন, সেদিন থেকেই তাঁর বরাতে জুটতে লাগল ঘৃণা, সন্দেহ, নিন্দা। গোড়াতে

তিনিও মুসলিম লীগকে ভালো চোখে দেখেন নি, কিন্তু পরে বুঝলেন—মুসলমানের খাঁটি বন্ধু যদি কেউ থাকে তবে তা কংগ্রেস নয়, ওই মুস্‌লিম লীগ।

—কিন্তু কংগ্রেস—

—চাচা সাহেব, এতকাল ধরে ওদের একটানা প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা শুনতে শুনতে কংগ্রেস ছাড়া কিছু আর ভাবতে পারছেন না!—আলিমুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: আজাদী! কংগ্রেস কোন্ আজাদীর জন্যে লড়াই করে এসেছে এতকাল? হিন্দুর। আমরা পৌত্তলিকতা মানিনা, তবু কেন আমাদের উচ্চারণ করতে হবে, 'বন্দে মাতরম্'—মাটিকে আমরা মা বলব কোন্ লজ্জায়? কেন আমরা ভাবতে যাব: 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী?' বিপ্লবীদের আমি শ্রদ্ধা করি, দেশের জন্য যারা শহীদ হয়েছে, তাদের সালাম করি আমি। কন্তু কেন বিপ্লবীদের দীক্ষা নেবার সময় কালীমায়ের পায়ে প্রণাম করতে হবে? কেনই বা শপথ নিতে হবে ওই পুতুলের খাঁড়া মাথায় ঠেকিয়ে?

ফতেশা পাঠান কী বুঝলেন কে জানে। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেললেন, সাবাস!

আলিমুদ্দিন সরদার একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেললেন তাঁর দিকে। তারপর এস্তাজ আলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, চাচা সাহেব, ওটা মুসলমানের আজাদীর রাস্তা নয়!

—কিন্তু আজাদী এলে হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই কি তাতে সুরাহা হত না?

—না, একেবারেই না।—জোরের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে ফরাসে একটা ছোট কিল বসালেন আলিমুদ্দিন: ইংরেজ দেশ ছাড়বে এটা ঠিক। তার আর বেশিদিন বাদশাহী চলবে না সে তা বুঝতে পেরেছে। একথাও মানি যে তাকে তাড়ানোর পেছনে হিন্দু আর কংগ্রেসেরও অনেকখানি দান আছে। কিন্তু স্বাধীনতা যখন আসবে সে হবে ত্রিশ কোটি হিন্দুর স্বাধীনতা—দশ কোটি মুসলমানেরও না—কয়েক লাখ শিখেরও নয়। চাকরী-বাকরী, সুযোগ-সুবিধা সব জুটবে হিন্দুর ভাগে, মুসলমান পাত্তের কাঁটাটিও পাবে না।

—এখন অবিশ্যি মুসলমানদের কিছু চাকরী-বাকরীর সুবিধে হচ্ছে—ফতেশা অনেকক্ষণ ধরে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিলেন, ফাঁক পেয়ে এইবারে জুড়ে দিলেন কথাটা: নবীপুরের আলতাফ মিঞা এবারে এম-এল-এ হয়েছে, বিস্তর চাকরী জুটিয়ে দিচ্ছে লোককে।

—লীগ মিনিস্ট্রি রয়েছে যে। হিন্দু মন্ত্রী থাকলে হত নাকি ওসব?

—আজাদী হলেও তো লীগ মিনিস্ট্রি হতে পারে—বলতে চাইলেন এস্তাজ আলা।

—কাঁচা কথা বললেন চাচাসাহেব, একেবারে কাঁচা কথা। আপনার মতো প্রবীণ লোকের কাছ থেকে এ কথা শুনব আশা করিনি। লীগ মিনিস্ট্রি হবে কোত্থেকে? ভোট পাবেন কেমন করে? তিনগুণ বেশি ভোটে হিন্দুরা গিয়ে বসবে গদীতে—আসবে জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট। একটা কথা বলবার মুখ থাকবে না আপনাদের।

—কিন্তু যে সব জায়গায় মুসলমান বেশি, সেখানে তো আমরাই জিতব।

—এইবার পথে এসেছেন—আলিমুদ্দিন হাসলেন: খানিকটা বুঝতে পারছেন আমার কথাটা। কিন্তু দুটো একটা প্রভিন্সে মুস্‌লিম মেজরিটি নিয়ে আমরা যুঝব কী করে দেশজোড়া হিন্দুদের সঙ্গে। তাই যেখানে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, সেই সব প্রদেশ নিয়ে আমাদের নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠবে—সে রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান!—আলিমুদ্দিনের গলার স্বর ক্রমশ উচ্ছ্বাসে গভীর হয়ে উঠতে লাগল: আমাদের হাত থেকেই ইংরেজ হিন্দুস্থান কেড়ে নিয়েছিল, যদি এ রাজ্য ফিরে পাওয়া যায় তা হলে এর সবটাই আমাদের পাওনা! কিন্তু নানা অসুবিধের কথা ভেবে সে দাবী আমরা তুলিনি। আমরা শুধু আমাদের মেজরিটি প্রভিন্স নিয়েই নয়া রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই। তাও কি কম হবে! দশ কোটির মধ্যে অন্তত আট কোটি মুসলমানকে আমরা পাবই। আর তা হবে পৃথিবীর বৃহত্তম ইস্‌লামিক রাষ্ট্র। শুধু ইস্‌লামিক রাষ্ট্রই বা বলছি কেন—ইয়োরোপের কটা দেশে আট কোটি লোক আছে? যে আরবেরা একদিন সারা দুনিয়ার ওপর তলোয়ার ঘুরিয়েছিল, কত ছিল তাদের সংখ্যা?

ফতেশা আরামে গোঁফের প্রান্ত দুটো পাকাতে লাগলেন: বেশক্!

এন্তাজ আলী চুপ করে রইলেন। চিন্তার রেখা ফুটেছে সারা মুখে।

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—কিচ্ছু শক্ত নয় বোঝা। শুধু বোঝবার মতো মনটাই তৈরী হয় নি চাচাসাহেব! কিন্তু দিন আসছে, আপনারাও আর ঘুমিয়ে থাকতে পাববেন না।

—আপনারা কিন্তু স্বপ্ন দেখছেন—এন্তাজ আলী বললেন।

—স্বপ্নকে আমরা সত্য করে তুলব। মহম্মদ ঘোরী, বক্তিয়ার খিলিজীও তাই করেছিলেন।—আলিমুদ্দিন মাস্টারের চোখমুখ জ্বলতে লাগল: এই স্বপ্নই একদিন আরব থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত ইস্‌লামের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল।

—কিন্তু একসঙ্গে কি থাকা যেত না?

—না।—আলিমুদ্দিনের স্বর দৃঢ় হয়ে উঠল: সে কথা 'কায়েদে আজম' ভেবেছিলেন, আমাদের পাকিস্তানের মহাকবি ইক্‌বালও তাই ভেবেছিলেন। একদিন তিনি লিখেছিলেন:

"সারে জাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা!
আব রোজ এ গঙ্গা বহ দিন হ্যায় য়াদ তুঝকো,
উতরো তেরী কিনারোঁ মেঁ কারোয়াঁ হামারা।"

তারপর তাঁর ভুল ভাঙল। বুঝলেন, হিন্দুস্তান তাঁর কেউ নয়, গঙ্গার জলের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই। তিনি বললেন, আমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছিল, তাই ও কবিতা আমি লিখেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি, পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানের কোনো গতি নেই। তাই ভুল শুধরে তাঁকে লিখতে হল:

"অয় গুল্‌সিতান্ এ উন্দুলুস্ বহ দিন হ্যায় য়াদ তুঝকো,
থা তেরী ডালীওঁ মেঁ জব আশিয়াঁ হামারা।
মঘরিব কী বাদীওঁ মেঁ গুন্‌জী আজাঁ হামারী—
সারে জাঁহা সে আচ্ছা, পাকিস্তান হামারা!"

দরদ ভরা গলায়, উচ্চকিত আবৃত্তি করে গেলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার। চমৎকার আবৃত্তি করেন—ঘরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত মুগ্ধতা। উর্দু কবিতার ললিত-ছন্দ-বিন্যাসে কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটা আবিষ্ট হয়ে রইল।

খানিক পরে নীরবতা ভেঙে ফতেশা প্রশ্ন করলেন, মানে কী হল ওর?

বিকারের দৃষ্টি ফুটে উঠল আলিমুদ্দিন মাস্টারের চোখে: মুসলমানের ছেলে, এইটুকু উর্দু জানেন না! এটা লজ্জার কথা সাহেব!

ফতেশা থতমত খেয়ে গেলেন: কিছু কিছু শিখেছিলাম—তা কবে ভুলে গেছি। আমি তো আপনার মতো আর—হেঁ—হেঁ—

—একটু পড়ে নেবেন আবার। দেখা দরকার।—আলিমুদ্দিন খবরের কাগজটা ভাঁজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন: আমি এবার উঠি—অনেক বেলা হল।

—কিন্তু আলোচনা তো শেষ হল না—এন্তাজ বললেন।

—না, সবে শুরু হল—এবার আলিমুদ্দিনও হাসলেন: আরো অনেক কথা বলতে হবে, আরো অনেক আলোচনা করতে হবে। ভালো কথা, আপনারা সবাই লীগের মেম্বার তো?

এক এন্তাজ আলী ছাড়া সবাই মাথা নীচু করলেন।

—আমি জানতাম—আলিমুদ্দিনের স্বরে অনুকম্পা ফুটে বেরুল: আচ্ছা, কাল আমি চাঁদার খাতা নিয়ে আসব। পাঁচশো পাঠানের গ্রাম এই পালনগরে লীগের শক্ত ঘাঁটি তৈরী করতে হবে একটা। আচ্ছা, চলি এবারে আদাব।

—আদাব।

আলিমুদ্দিন মাস্টার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বেলা বেড়ে উঠছে। অল্প অল্প হাওয়ায় গুঁড়ো চন্দনের মতো লালমাটি উড়ছে দিকে দিকে। মিনারের মাথায় ঝুলন্ত বাদুড়গুলোর পেছনে একদল কাক লেগেছে, বাদুড়ের আর্ত চীৎকার ছড়িয়ে যাচ্ছে বিকৃত যন্ত্রণায়। একরাশ ধুলো আর কুটো-কাটি বয়ে একটা ঘুর্ণি পাক খেতে খেতে উঠে গেল।

বর্ষার জল শুকিয়ে আসা মাটি থেকে কেমন একটা গন্ধ—একটা উত্তপ্ত গন্ধ। পাড়াগাঁয়ের লোক আলিমুদ্দিন মাস্টার—ওই গন্ধটা তাঁর চেনা। ওর কেমন একটা নেশা আছে—একটা মাদকতা আছে যেন। মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে, ওই সামনের ঘূর্ণিটার মতোই চিন্তাগুলিকে আবর্তিত করে তোলে। আলিমুদ্দিন মাস্টার ভাবতে ভাবতে পথ চললেন।

'সারে জাঁহা সে আচ্ছা পাকিস্তান হামারা।' নিশ্চিত

সিদ্ধান্ত, নির্ভুল বিশ্বাস। এর আর ব্যতিক্রম নেই কোথাও। দৃষ্টি চলে গেল 'পাল-বুরুজে'র উইঢিবি ঘেরা উঁচু চূড়োটার দিকে। ওই গড়ের হিন্দু রাজত্ব যেমন একদিন বিজয়ী মুসলমানের শাণিতাগ্র তলোয়ারে পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়েছিল—সেইদিন আবার ফিরে আসছে নতুন করে। 'পাকিস্তান হামারা!'

কোনো সন্ধি? না। কোনো রফা? অসম্ভব। কোনো ঐক্য? অবাস্তব।

কিন্তু এমন কি চিরদিন ছিল? চিরকালই কি এমন চরমপন্থী ছিলেন তিনি?

না, তা নয়। জীবনে তিনিও অনেক করেছেন, অনেক অভিজ্ঞতা তাঁরও হয়েছে। প্রথম প্রথম যেগুলিকে বিচ্ছিন্ন কতগুলো ঘটনামাত্র মনে হয়েছিল, আজ তারা ধরা দিয়েছে একটা বিশেষ তাৎপর্যের ভেতরে—আজ আর কিছু জানতে তাঁর বাকী নেই।

মনে আছে, হিন্দুদের ইস্কুলে প্রথম ভর্তি হওয়ার কথা। যে বেঞ্চে তিনি বসেছিলেন, সেখানকার তিন চারটি হিন্দু ছেলে খানিকবাদে এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল।

ক্লাশে পড়াচ্ছিলেন বাংলার মাস্টার সারদাবাবু। ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই, কী হচ্ছে?

—বসতে পারছি না!

—কেন?

—ও যে মুসলমান স্যার

—মুসলমান তো কী হয়েছে?—সারদাবাবুর দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠেছিল।

একজন বলেছিল, ওর গায়ে বিশ্রী রসুনের গন্ধ স্যার। একেবারে মুসলমানী গন্ধ।

হো—হো করে ক্লাশ শুদ্ধ হাসির বন্যায় ভেঙে পড়েছিল। সে হাসি থেকে সারদাবাবুও বাদ যাননি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য—ক্লাশের মুসলমান ছেলেরাও সে হাসিতে যোগ দিয়েছিল।

সারদাবাবু কৃত্রিম ক্রোধে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, যত সব বানরের দল! যা—যা, সামনের ওই বেঞ্চিটাতে গিয়ে বোস।

সেদিন সারা ক্লাশে আর মাথা তুলতে পারেনি আলিমুদ্দিন। কিশোরের প্রথম চেতনায় সে অপমান বিঁধেছিল যেন আগুনের চাবুকের কণ্টকিত আঘাতের মতো। সেই কৈশোরেই মনে হয়েছিল, এ অপমানের জবাব একদিন তাকে দিতে হবে।

তারপরে এ জাতীয় তিক্ত অভিজ্ঞতা বহুবার তাঁর হয়েছে। আঘাতের পর আঘাত এসেছে নানাদিক থেকে—স্পর্শাতুর মন বিদ্রোহ করে উঠেছে বার বার। আরো বড় হয়ে একজন বিদেশী রাজনৈতিক নেতার জীবন-চরিত থেকে তাঁর মনের সমর্থন মিলেছিল:

"নতুন একটি পরিষ্কার কোট পরিয়া আমি স্কুলে আসিয়াছিলাম। হঠাৎ কোথা হইতে মলিন-বস্ত্র পরা জীর্ণশীর্ণ দেহ কয়েকটি ছাত্র আসিয়া আমার সামনে দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া তাহাদের একজন আমার কোটের ওপর খানিকটা থুথু ছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া পালাইল। সে ব্যবহারের অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই, আজ তাহা আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া গেছে।"

তিনি বুঝেছিলেন এ বড়লোকের ঐশ্বর্যের প্রতি দরিদ্রের স্বাভাবিক বিদ্বেষ। আর আলিমুদ্দিন বুঝলেন এ শ্রেষ্ঠতার অভিমানে অন্যের আত্মমর্যাদায় নিষ্ঠুর আঘাত। এ আঘাত একদিন সুদে—আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে—তাঁর মন ঘোষণা করেছিল।

কিন্তু তখনো তাঁর ভুল সম্পূর্ণ কাটেনি। তখনো তিনি ভেবেছিলেন, সে মর্যাদা ফিরে পাবার পথ সকলের ভেতর দিয়েই। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বুকের মধ্যে কৈশোরেই জ্বলে উঠেছিল—উনিশশো তিরিশ সালের আন্দোলনে যোগ দিয়ে শেষবার তাঁর ভুল ভাঙল। (ক্রমশ)

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে ফুটবল খেলার ইতিহাসে বিশিষ্ট ফুটবল প্রতিযোগিতা বলতে এই চারটি—কলকাতার ফার্স্ট ডিভিসন ফুটবল লীগ, আই এফ এ শীল্ড, বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ এবং সিমলার ডুরাণ্ড কাপ। এদের খ্যাতি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। এ পর্য্যন্ত কোন দলই এই ভারত বিখ্যাত চারটি ফুটবল প্রতিযোগিতায় একই বছরে জয়ী হ'তে পারে নি। একমাত্র কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবই এই চারটি প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছে, অবিশ্যি বিভিন্ন বছরে। রোভার্স এবং ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতায় পূর্ব্বে কোন ভারতীয় দলের যোগদানের অধিকার ছিল না। ১৯২৩ সালে রোভার্স কাপে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে যোগদান করে মোহনবাগান ক্লাব এবং ঐ বছরে প্রতিযোগিতার ফাইনালে ডারহামস এল আই-এর কাছে ৪-১ গোলে হেরে যায়। খেলার প্রথম ৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত মোহনবাগান ক্লাব একগোলে অগ্রগামী ছিল। হঠাৎ খেলার শেষের দিকে দলের বিপর্য্যয় ঘটে। মোহনবাগান ক্লাবই প্রথম ভারতীয় এবং স্থানীয় দল হিসাবে রোভার্সের ফাইনালে খেলেছিল। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে রোভার্স কাপ বিজয়ী হয় বাঙ্গালোর মুসলীম ১৯৩৭ সালে। এ দলটি পর্য্যায়ক্রমে দু'বার ১৯৩৭-৩৮ সালে রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব রোভার্স কাপ পায়। এর পর ভারতীয় দল হিসাবে রোভার্স বিজয়ী হয়েছে ১৯৪২ সালে বাটা স্পোর্টস (ক্যালকাটা), ১৯৪৮ সালে ট্রেডস ক্লাব এবং ১৯৪৯ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ১৯৪৮ সালে মোহনবাগান ক্লাব দ্বিতীয়বার রোভার্সের ফাইনালে উঠে ট্রেডস ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়।

'Triple Crown' অর্থাৎ ক্যালকাটা ফুটবল লীগ, আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স এবং ডুরাণ্ড কাপ এই চারটি প্রতিযোগিতার মধ্যে তিনটি প্রতিযোগিতায় একই বছরে বিজয়ী হয়েছে এ পর্য্যন্ত মহমেডান স্পোর্টিং এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ১৯৪০ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম 'Triple Crown' পায় ফার্স্ট ডিভিসন ফুটবল লীগ, রোভার্স এবং ডুরাণ্ড বিজয়ী হয়ে। ঐ বছর তারা আই এফ এ শীল্ড পায়নি। এক তাদের ছাড়া একই বছরে রোভার্স এবং ডুরাণ্ড অন্য কোন দলের ভাগ্যে জুটেনি। বে-সামরিকদল হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবই প্রথম ডুরাণ্ড কাপ পায়। এ বছর দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 'Triple Crown' পেয়েছে লীগ, আই এফ এ শীল্ড এবং রোভার্স বিজয়ী হয়ে।

কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল :

মিঃ এল লিভিংষ্টোনের নেতৃত্বে কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল ভারতবর্ষ, পাকিস্থান এবং সিলোনের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্রিকেট খেলায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করেছে। দলের মোট ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৯ জন খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়ার, ৫ জন ইংলণ্ডের এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২ জন। এ দলে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যোগদান করলে দলের 'কমনওয়েলথ ক্রিকেট' নামকরণ খুবই সার্থক হ'ত। দক্ষিণ আফ্রিকার এবং নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ম্যাচ খেলার সম্পর্ক অনেক কালের। কমনওয়েলথ টীমে এ দু'দেশের একজন খেলোয়াড়েরও স্থান না পাওয়াটা খুবই অশোভন হয়েছে। সুতরাং এ দলটিকে ঠিক

কমনওয়েলথ ক্রিকেট টীম বলা সঙ্গত হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যাণ্ডে বিশিষ্ট ক্রিকেট টেষ্ট খেলোয়াড়ের অভাব নেই। তা ছাড়া এ দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভারতীয় ক্রিকেট মহল খুশী হ'তে পারেনি। দলে যে ৫ জন টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় আছেন তাঁরা হ'লেন, অষ্ট্রেলিয়ার ফ্রেড ফ্রিম্যার এবং জর্জ্জ ট্রাইব, ইংলণ্ডের উইনষ্টন প্লেস এবং নর্ম্মান ওল্ডফিল্ড এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ফ্রাঙ্ক ওরেল।

ক্রিকেট খেলা ইংলণ্ডের জাতীয় খেলা এবং ইংলণ্ড ছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং বৃটিশ উপনিবেশ গুলিতে ক্রিকেট খেলায় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ইংরেজ ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদীদের চেষ্টাতে। ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতির সঙ্গে অন্ত কোন ক্রিকেট খেলারত দেশের তুলনা চলে না। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ম্যাচ কেবলমাত্র ক্রিকেট জগতেরই বড় আকর্ষণ নয়; এ দু'দেশের টেষ্ট খেলার জনপ্রিয়তার সঙ্গে সমগ্র ক্রীড়া জগতের খুব কম খেলার তুলনা চলে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে টেষ্ট ক্রিকেট খেলার যথেষ্ট মূল্য আছে। কেবলমাত্র দলের শক্তি পরীক্ষা ছাড়া খেলাধূলার মধ্যে দু'দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে যে হৃদ্যতা এবং বন্ধুত্বের ভাববিনিময় ঘটে তার প্রভাব দু'দলের খেলোয়াড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, দু'দেশের জনসাধারণকেও প্রভাম্বিত করে। সুতরাং খেলাধূলার দ্বারা যথেষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইতিহাসে এর প্রমাণের অভাব নেই।

১৯৪৯-৫০ সালের ক্রিকেট মরসুমে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের প্রতিনিধিমূলক এক ক্রিকেট দলের আগমনের কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে আয়োজন বাতিল হয়ে গেছে। তারই পরিপূরক হিসাবে কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে এসেছে বলা যায়। ভারতীয় ক্রিকেট দল অষ্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডের শক্তিশালী টেষ্ট ক্রিকেট দলের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরে খেলে এসেছে কিন্তু ক'জন ভারতীয়ের পক্ষে সে খেলা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে! ভারতীয় ক্রিকেট মহলের বহুদিনের আশা, ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খেলোয়াড়দের খেলা দেখে চক্ষু সার্থক করে। কিন্তু তারা এ পর্য্যন্ত নিরাশই হয়ে এসেছে, ভারতবর্ষে আগত বৈদেশিক ক্রিকেটদলগুলি নিজ নিজ দেশের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের বাদ দিয়েই এদেশে ক্রিকেট খেলে গেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন্ ব্র্যাডম্যান প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন; ভারতবর্ষের ক্রিকেট মহল অন্ততঃ ভারতবর্ষে তাঁকে চোখে দেখতে পেলেও ধন্ত হয় যাবে। ভারতবর্ষের ক্রিকেট মহল বৈদেশিক ক্রিকেট দলের সফরে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেছে এবং তাদের সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলায় প্রচুর অর্থ উঠেছে। এ থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটখেলা-অনুরাগীদের সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তিশালী দল এলে খেলায় উত্তেজনা, উৎসাহ এবং অর্থ সবই যে বেশী পরিমাণ হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষে দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালকমণ্ডলী সেদিক বিচার ক'রে যদি শক্তিশালী ক্রিকেট দল না আনতে পারেন তাহলে ভারতীয় ক্রিকেট মহল হতাশায় ক্রিকেট খেলা দেখা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাবে। ভারতীয় ক্রিকেট এখনও ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সমান আসন দাবী করতে পারেনি। তুলনামূলক বিচারে ভারতীয় ক্রিকেট এখনও শিশু অবস্থায় আছে। টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল জয়লাভ করলে ভারতীয় ক্রিকেট মহল যেমন খুশী হবে তেমনি অন্যদিকে শক্তিশালী বৈদেশিক ক্রিকেট দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের পরাজয়েও আনন্দ পাবে, ভাল খেলা দেখার জন্যে। খেলায় জয়লাভ এবং উচ্চাঙ্গের খেলা এ দুই দর্শকদের উত্তেজনা এবং আনন্দ সৃষ্টি করে। দুর্ব্বল দলের সঙ্গে নিজ দলের জয়লাভে যে পরিমাণ উত্তেজনা এবং আনন্দ সৃষ্টি করে তার তুলনায় শক্তিশালী দলের সঙ্গে দলের পরাজয়ে উত্তেজনা এবং আনন্দ কম হয় না। কমনওয়েলথ টীম শেষ পর্য্যন্ত টেস্ট খেলায় কি রকম কৃতিত্ব দেখাবে তা পরের কথা। এই দলটি যে ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ এই তিনটি দেশেরও প্রতিনিধিমূলক হয়নি আমাদের দেশের সামান্ত একজন স্কুলের ছাত্রও বলে দিতে পারে। এরূপ দলের সঙ্গে আমাদের জয়লাভ বা পরাজয় শেষ পর্য্যন্ত দর্শকমহলকে খুব বেশী উৎসাহিত করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কমনওয়েলথ টীম চারটি ক্রিকেট ম্যাচ খেলে ২টিতে জয়লাভ করেছে এবং বাকি ২টি খেলা ড্র গেছে। বৃষ্টির জন্যে ইণ্ডিয়ান ইউনিভারসিটি দলের সঙ্গে প্রথম খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে; নর্থজোনের সঙ্গে খেলাটিও ড্র গেছে। জয়ী হয়েছে এক ইনিংস ১২২ রাণে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া একাদশ দলের সঙ্গে এবং মাত্র ১ উইকেটে হোলকার ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলের খেলায়। নর্থজোনের বিপক্ষে কমনওয়েলথ দলের ৭ উইকেটে ৬১৩ রাণ ভারতবর্ষে আগত বৈদেশিক দলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ রাণের রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে। পূর্ব্বে সর্ব্বোচ্চ রাণের রেকর্ড ছিল ওয়েষ্টইণ্ডিজদের, ৭ উইকেটে ৫৭১ রাণ। প্রথম টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়েছে দিল্লীতে গত ১১ই নভেম্বর থেকে। এস [illegible]এর নেতৃত্বে কমনওয়েলথ ক্রিকেট দলের [illegible] ভারতীয় দলে খেলছেন ভি এম মার্চ্চেণ্ট (অধিনায়ক), ভি হাজারে, আর এস মোদী, ডি জি ফাদকার, পি উমরিগড়, সি এস নাইডু, এইচ গাইকোয়াড়, সি টি সারভাতে, এম কে মন্ত্রী এবং (উইকেট কিপার) এইচ অধিকারী এবং উদয় মার্চ্চেণ্ট।

ক'লকাতায় সুইডিস ফুটবল দল ঃ

ফুটবল খেলার দর্শকমণ্ডলী জেনে খুশী হবেন সুইডেনের খ্যাতনামা 'Helsingborg Clubএর একটি দল আগামী ডিসেম্বর মাসের ক'লকাতায়, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং পশ্চিমবঙ্গ একাদশ দলের সঙ্গে প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় যোগদান করবে। আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে সুইডিস ফুটবল খেলোয়াড়দের সুনাম আছে। আশা করা যাচ্ছে, এই দলটি সুইডেনের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে। এই দলটি ক'লকাতায় অবস্থানকালে মোহনবাগান ক্লাবের আতিথ্য গ্রহণ করবে।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ[illegible]ঘোষাল প্রণীত শিশু-উপন্যাস "অ[illegible]পকের বিপত্তি"—১।৹
র[illegible] চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "তিন [illegible]"—১৲
[illegible] ঘটক প্রণীত উপন্যাস "[illegible] কুহেলী"—৪৲
[illegible]বীরকুমার মিত্র প্রণীত "মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল চাকী"—১।৹
প্রিয়[illegible] সেন-অনূদিত "[illegible] সুরে"—৩৲
বিজয় [illegible] প্রণীত সাহিত্য-সমালোচনা "এ যুগের সাহিত্য"—৩।৹
ইন্দ্রজিৎ প্রণীত প্রবন্ধ-সঙ্কলন "ইন্দ্রজিতের খাতা"—৩।৹
স্বামী তপানন্দ প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "গীতি-অর্ঘ্য"—১।৹৲
সন্তোষকুমার বিশ্বাস প্রণীত উপন্যাস "প্রগতিশীলা"—৩৲
শ্রীকিরণবিকাশ মুচ্ছদ্দী প্রণীত নাটক "দানবীর"—২৲
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত "শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যান"—১৲
"মোহনের বজ্রাঘাত"—২৲, "অনুরাগিণী রমা"—২৲
শ্রীবিনোদবিহার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : জীবন ও সাধনা"—৩।৹
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাংলা কাব্যানুবাদ "গীতায়ন"—১৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অতুলনীয় মোহন"—২৲,
হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "ফাদার অ্যাণ্ড সন"—১।৹
মহর্ষি যোগানন্দ হংস প্রণীত "সনাতন-ধর্ম্ম"—২৲, "Light & Truth"—১।৹
স্বপনবুড়ো প্রণীত কিশোর নাট্য "প্রতিশোধ"—১৲
শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "যুগান্তরের কথা বা স্যার রাজেন্দ্রনাথের জন্মস্থান ভ্যাবলা গ্রাম ও ভ্যাবলার মুখোপাধ্যায় বংশের ইতিহাস"—২৲
শ্রীনগেন্দ্রনাথ রক্ষিত প্রণীত "বিলাতের চিঠি"—২৲

ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন ঃ ২৫শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে সকল ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাওয়া যাইবে, পৌষ সংখ্যা তাঁহাদের ভিঃ পিঃতে পাঠানো হইবে। ছয় মাসের জন্য গ্রাহক নম্বরসহ টাকা মণি অর্ডার করিলে ৪৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে ৪।৵৹ আনা লাগে। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ পূর্বক ২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন।

আমাদের পাকিস্তানের গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে, বর্তমানে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের অর্থাদি আদান প্রদান ব্যাপারে অনেক জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে; সুতরাং পাকিস্তানের ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের টাকা আমাদের হাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আর কোন সংখ্যা ইহার পর পাঠানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

কার্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

সূচীপত্র

সপ্তত্রিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৫৬

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী লাল গামছা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

জমির পৌঁচে

শিল্পী — দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

পৌষ—১৩৫৬

দ্বিতীয় খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

গীতার সমন্বয়বাদ

শ্রীবাসনা সেন এম-এ, কাব্যতীর্থ

ভারতীয় সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রে মুখ্যতঃ কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতা শাস্ত্র যাহাকে আমরা সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের সারাৎসার বলিয়া মনে করি, সেই গীতার মধ্যেও কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানবিষয়ক তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্যে একবার কর্ম্মের প্রাধান্য, একবার ভক্তির প্রাধান্য, আবার জ্ঞানের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ যদি পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন না হইত তবে ভগবান কেন পৃথকভাবে তাহা নির্দ্দেশ করিলেন? সুতরাং গীতা পাঠমাত্রই তো পাঠকের হৃদয়ে অর্জ্জুনের ন্যায় সংশয় উপস্থিত হইবে, তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন বলিতেছেন—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মনস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥

যদি জ্ঞানযোগই শ্রেষ্ঠ হয় তবে কেন আমাকে এই ঘোর হিংসাত্মক কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ? কখনও বা কর্ম্মের প্রশংসা, কখনও বা জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ—ইহাতে আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। যাহা দ্বারা শ্রেয়োলাভ করা যায় আমাকে তাহাই উপদেশ কর। অর্জ্জুনের এই উক্তির তাৎপর্য্য পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে উদিত হয়। কিন্তু নিবিষ্টভাবে গীতার তত্ত্ব অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আপাততঃ বিরোধ পরিলক্ষিত হইলেও, চরম সিদ্ধান্তে কোন ভেদ নাই। সমগ্র গীতাশাস্ত্রকে তাই কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় শাস্ত্র বলা যায়।

অদ্বিতীয় বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী সমগ্র গীতাকে কাণ্ডত্রয়ে বিভক্ত করিয়াছেন। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে

কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিকাণ্ড ও অন্তিম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবদগীতা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য যেমন পরম তত্ত্ব তেমনি এই পরম তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া কিরূপে মায়ার পারে ও এই সংসারের পারে যাওয়া যায় তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব স্বভাবতঃ অপূর্ণাত্মাভিমানী, সেইজন্য তাহাকে কর্ম্ম করিতে হয়। সেই অভাব মোচনের জন্যই সে কর্ম্ম করে বলিয়া ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়। অতএব গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই দেখাইতে চেষ্টা করিলেন, এই কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি সম্ভব হয়—কি কৌশল অবলম্বন করিলে? যে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ তাহাই যখন মুক্তির কারণ হইবে, তখনই 'কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি' এই তাৎপর্য্য প্রতিপাদিত হইবে। এই কর্ম্মবন্ধন মোচনের প্রথম ও প্রধান উপায় হইল যজ্ঞ। এই যজ্ঞকর্ম্মই গ্রন্থির পর গ্রন্থি উন্মোচন করিতে করিতে মানুষকে যোগ-ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরম ও চরম মুক্তির ভূমিতে পৌছাইয়া দেয়। সেইজন্য গীতা বন্ধনের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিল 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ'—এই কর্ম্মবন্ধনরূপ অজ্ঞানের হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়? প্রথমেই তাই অর্জ্জুনের ঐ 'অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ'—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্'॥ এই কামই জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখে। এই কামই আবার ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়া গজাইয়া ওঠে এবং মোহজাল বিস্তার করিয়া জীবকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়স্পর্শ হইতেই সুখ দুঃখানুভব ফোটে, আর সুখ দুঃখের অনুভব হইতেই বিষয়ের ধ্যান আরম্ভ হয়,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে
সঙ্গাৎসঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ইহাই মোহজাল বিস্তারের ক্রম এবং বন্ধন সৃষ্টির কৌশল, তখন চিত্ত ভোগের দিকে দৌড়াইবে।

কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥

এই বন্ধন হইতে উদ্ধারের উপায় কি?—'কণ্টেকেনৈব কণ্টকম্'—কণ্টক দিয়াই যেমন কণ্টকের উদ্ধার করিতে হয় তেমনি এখানেও কর্ম্মদ্বারাই কর্ম্মবন্ধন শিথিল করিতে হইবে। এইরূপে একবার ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে দৈবযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ জ্ঞানযজ্ঞের ভূমিতে উঠিয়া 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ"—রূপ কর্ম্মের ও যজ্ঞের সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মদর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিতে চিত্ত মগ্ন হইয়া যাইবে। ইহাই হইল কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মনিবৃত্তি। যাহা হইতে যে রোগের উৎপত্তি তাহাই তাহার ভেষজ ঔষধ—তবে তাহার সহিত কিছু মিশ্রণ প্রয়োজন। এখানে তাই কর্ম্মের সহিত বুদ্ধির যোগ প্রয়োজন। এই বুদ্ধি কোন বুদ্ধি? ইহাই অশক্তবুদ্ধি। সংসারের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে একটা রহস্যময় প্রকোষ্ঠ আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই বুদ্ধির কাজ, ইহাই মানবজীবনের সাধনা। আর যিনি এই রহস্যালোকে বসিয়া আছেন তিনিই পরমদেবতা। কিন্তু ইহার আবিষ্কারের চেষ্টা কোথায় করিতে হইবে? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রথম কর্ম্মের মধ্যে এই রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করাই সাধনার প্রশস্ত পথ।

'কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যম্ গহনা কর্ম্মণো গতিঃ'॥

ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা গীতা প্রথমেই কর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন, কেননা এই কর্ম্মের মধ্য দিয়াই ভগবান নিজের আত্মপ্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই জগৎ চক্রটাই কর্ম্মচক্র। তারপর এই কর্ম্মই পরম উৎকর্ষলাভ করিলে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়—'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মেই সমাপ্ত। সুতরাং কর্ম্মে ও জ্ঞানে সাময়িক ভেদমাত্র, মূলতঃ কোন ভেদ নাই। এই মূলসূত্র ছিন্ন হইলেই জীবের কর্ম্মবন্ধন উপস্থিত হয়।

কর্ম্মতত্ত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে গীতা প্রথমেই কর্ম্মকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।—কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম। কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম উভয়ই ভোগফলপ্রদ। যেহেতু তাহাদের প্রেরণা আসে নিম্ন প্রকৃতি হইতে। প্রকৃতিই কর্ম্মের প্রেরকও বটে নিষ্পাদকও বটে—কেননা প্রকৃতির দুইভাগ—এক জ্ঞান, অপর ক্রিয়া—'প্রকৃতে 'ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ'

তারপর এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সাধনার সময় কর্ম্মভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপে সাধনার স্তরে বা ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এই যে সাধনের তিন স্তর—কর্ম্মস্তর, ভক্তিস্তর ও জ্ঞানস্তর, এই তিন স্তরের প্রত্যেক স্তরেই আবার ক্রমবিভাগ আছে। কর্ম্ম প্রথমে থাকে সকাম; এই সকাম আবার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। তারপর আসে কর্ত্তব্য-বোধে কর্ম্ম, ইহাই ধর্ম্ম স্তর। এই কর্ম্মই প্রীতি বা প্রেম চালিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই শেষে ভক্তিতে পরিণত হয়। ভক্তিতেও নিজের তুষ্টিই প্রথমে থাকে প্রধান লক্ষ্য, পরে হয় ইষ্টের তুষ্টি, অবশেষে জ্ঞানস্তরে উপনীত হইলে উপাস্য উপাসক, সেব্য সেবক এক হইয়া যায়। শ্রুতি তাই বলিতেছেন—

'যত্র দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র
সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং
বিজানীয়াৎ।'

ইহাই জীবের স্বস্বরূপে স্থিতি—সমস্ত আধ্যাত্মিকতার পরিসমাপ্তি।

এইবার সংক্ষেপে গীতার ভক্তির স্তর বা সাধনার ক্রমটা আলোচনা করা আবশ্যক। গীতা অধ্যাত্মশাস্ত্র হইলেও বিশেষ করিয়া সাধন শাস্ত্র। সেইজন্য সাধন লইয়াই এখানে অধিক আলোচনা করা হইয়াছে। কিরূপে পরমতত্ত্ব জীবনে ফুটাইয়া তোলা যায় তাহাই গীতা বিশেষভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতি অনুযায়ী "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।" সেই মূল পরমার্থ সত্য সাক্ষাৎকার করিলে সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হয় তাহাই গীতায় মুখ্যভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভক্তিমার্গের চরম উৎকর্ষ প্রদানকালে ভগবান বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

ভক্তের প্রতি ভগবানের ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কথা কি হইতে পারে? ভক্তিদ্বারা পরমপুরুষকে লাভ করা—ইহা গীতার অষ্টম, নবম অধ্যায়ে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ' ভক্ত ভগবানে অর্পিতবুদ্ধি হইলে সেই পরমপদ নিঃসংশয়ে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভক্তের পাছে সন্দেহ হয় যে পুনর্জন্মের হাত হইতে কি নিষ্কৃতি লাভ হইবে? তখনই ভগবান বলিতেছেন, 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।—ভগবদুপাসনায় চিত্ত শুদ্ধ হইলে, নিশ্চলবুদ্ধি হইলে মৃত্যুকালেও সেই ঈশ্বরচিন্তাই উপস্থিত হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মৃত্যুকালে যে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্
যঃ প্রযাতি সঃ মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

মৃত্যুকালে এই ভগবদভক্তি কখনই সম্ভব নয় যদি উপাসক জীবনের সর্ব্বমুহূর্ত্তে উপাস্যের ধ্যান না করে। শাণ্ডিল্য ঋষি এই ভক্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'সা পরাণুরক্তি-রীশ্বরে'। ঈশ্বরে যে পরম অনুরাগ তাহাই পরাভক্তি। বিষ্ণুপুরাণে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ একস্থলে বলিয়াছেন—

'যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন—'বিষয়ীর বিষয়ে যেরূপ টান থাকে ভক্তের ভগবানের উপর সেইরূপ টান হওয়া চাই। বৈষ্ণবগণ এই ভক্তির পাঁচ প্রকার ভাগ করিয়াছেন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভক্ত ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা করে। ভগবানকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইতে হইলে কি ভাবে তাহাকে ভজন করিতে হইবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা গীতায় নির্দ্দেশ করিতেছেন—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাংনমস্কুরু
মামেবৈষ্যাসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।

এইরূপ ভগবদ্ভক্ত পথে সাধক ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে যখন ভগবানের বিভূতি জানিবার অধিকার জন্মে তখনই তাহার সেই দিব্যদৃষ্টি খোলে, যাহার ফলে সে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে সমর্থ হয়। ভগবানকে এইরূপে জানা দেখার একমাত্র উপায় অনন্যাভক্তি। এই অনন্যাভক্তি লাভ করিতে হইলে যে 'মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্বৈর সর্ব্বভূতেষু' হইতে হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহারই উপদেশ গীতার একাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন।

কিন্তু ভক্তিমার্গে এই অবস্থা কি সহজে লাভ করা যায়? এই কঠিন পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় কি তাহাই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্। অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বণ্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥

ভগবদভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রথমে অভ্যাসের দ্বারা চেষ্টা করিতে হইবে, অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে ভগবান বলিতেছেন—

'মৎকর্ম্ম পরমো ভব'—ভগবদপ্রীতি সাধনার্থ কার্য্যানুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধি হইবে। তাহাতেও যদি ভক্ত অসমর্থ হয় তবে ভগবান চরম উপদেশ দিতেছেন 'সর্ব্ব-কর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান' ভগবানের শরণাপন্ন ও সংযতাত্মা হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিতে হইবে। এই ভক্তিমার্গে সাধনের দ্বারা ভক্তের কি অবস্থা হয়? ভক্ত তখন কি স্বরূপে অবস্থান করে?

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ॥
সম শত্রৌচমিত্রে চ তথামানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

এইরূপে ভক্তিমার্গে সাধনক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এই পথেই ভক্ত ভগবানকে জানিতে সক্ষম হয়। ভগবানে ভক্তির ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ভক্তি সাধনায় নিষ্ণাত ভক্তের এইরূপ লক্ষণ—

মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

এই শ্লোকে ভক্তের স্বরূপ অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। ভক্ত তখন আর অন্য কথা বলে না, ভগবদব্যতিরিক্ত অন্য বিষয়ে আনন্দ পায় না। ইহাই ভক্তিসাধনার চরম অবস্থা। ভক্তের কাছে তখন অন্য কিছু লাভ করা আর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় না—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

তারপর জ্ঞান, সন্ন্যাস ও ত্যাগতত্ত্ব বুঝাইবার ছলে গীতা সমস্ত সাধন তত্ত্বটি অষ্টাদশ অধ্যায়ে অতি অপূর্ব্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। হিন্দু সাধনার চরম সাধনা হইল সন্ন্যাস। এই জন্য এই শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ গীতার পরিসমাপ্তিতে এই সন্ন্যাস ও ত্যাগকে উপলক্ষ করিয়া গীতার সমস্ত সাধনা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। কর্ম্মে জীবনের আরম্ভ, ভক্তি উপাসনায় জীবনের স্থিতি, আর সন্ন্যাসে বা জ্ঞানে জীবনের শেষ। মানুষ সন্ন্যাসকে সাধারণ ত্যাগ অর্থে গ্রহণ করিয়াই ভ্রমে পতিত হয়। এ ত্যাগ দ্রব্য-বিত্তাদি বাহ্য পদার্থ হইতে দূরে থাকা নয়। ইহা অসক্ততা, নির্লিপ্ততা, সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত অবস্থা। এই ত্যাগতত্ত্ব অতি দুর্বিজ্ঞেয়, কারণ জ্ঞানীর পক্ষেই ইহার যথাযথ অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব। হিন্দু সাধনার মূল কথাই হইল ত্যাগ। এই ত্যাগ যেমন যজ্ঞদানতপরূপ ক্রিয়াযোগেও প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি চরম জ্ঞানেও সর্ব্ব উপাধি ত্যাগরূপ মহাত্যাগ বা সন্ন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তির রাজ্যে, সাধনের রাজ্যে, ক্রমোৎকর্ষের রাজ্যে মানুষ নীচের ভূমি ত্যাগ করিয়া, অপকর্ষের ভূমি ত্যাগ করিয়া, উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া চলে এবং এই ত্যাগই ক্রমশঃ সাধককে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ ভূমিতে পৌছাইয়া দেয়। জ্ঞানযোগের যথার্থ অধিকারী না হইলে কখনও তাহাকে সন্ন্যাস বা কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত নহে। অধিকারীর অধিকারানুসারেই তাহাকে ব্যুৎপাদন করা উচিত।

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানং কর্ম্মসঙ্গিনম্'

সুতরাং সাধারণের পক্ষে সহজ কর্ম্মের ত্রুটি দেখিয়া এবং জ্ঞানের উৎকৃষ্টতার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি কর্ম্ম ছাড়িয়া জ্ঞানের জন্য হাত বাড়াইলে সমূহ ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হইবে না। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

ন কর্ম্মনামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

তবে প্রশ্ন এই যে জ্ঞানীর কর্ম্ম ত্যাগ কিরূপে সম্ভব? ইহার মীমাংসা আত্মার অবিক্রিয়ত্বে। আত্মা কর্ম্মের দ্বারা হ্রাস প্রাপ্ত হন না বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন না—তিনি পরিপূর্ণ। এই আত্ম-স্বরূপ লাভই পরম জ্ঞানের অবস্থা। তখন 'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে, জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। এই কর্ম্মসন্ন্যাস বা অপরিণামিতাই

গীতার প্রধান প্রতিপাদ্য। কেননা গীতা মুখ্যতঃ মোক্ষশাস্ত্র। এই মোক্ষও যাহা, স্বরূপে স্থিতিও তাহাই, সন্ন্যাসও তাহাই।

জ্ঞানীর লক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—'বাসুদেব সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ। শ্রুতিও এই কথাই বলিতেছেন 'একোহিদেবঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'—সর্ব্বভূতে সেই এক আত্মার অবস্থিতিরূপ বুদ্ধি হওয়াই জ্ঞানযোগের চরম সিদ্ধান্ত। সমস্ত সাধনার মূল লক্ষ্য হইল এই ভেদে অভেদে দর্শন। বহুর মধ্য হইতে এককে খুঁজিয়া বাহির করা। তাই কি বেদে, কি গীতায়, কি দর্শনশাস্ত্রে এই দ্বৈত দর্শনকে এক তত্ত্বে লইয়া যাওয়ার পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অতএব সমগ্র গীতা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে কর্ম্মমুক্ত না হইয়া ঠিক ঠিক ভক্তির সন্ধান মিলে না, সেই জন্য সন্ন্যাসও সম্ভব হয় না। এই কর্ম্ম ও ভক্তি মিলিত হইয়া সাধককে উন্নতির পথে লইয়া চলে—তত্ত্বজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। জননীর মত হিতকারিণী গীতা কল্যাণকামী জীবের কি পাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কি হইতে হইবে—ইহা বিশদভাবে দেখাইয়া তাহাকে সীমার পারে লইয়া অসীমের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার মুক্তি সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। জীবকে যজ্ঞদান তপকর্ম্ম দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে—'যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম॥ আর তাহাকে হইতে হইবে স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভক্ত। প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্, আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।' 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥' তারপর জীবকে পাইতে হইবে সেই 'ব্রহ্মপরমম্' বা পুরুষোত্তমকে। অতএব 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ॥ ইহাই জ্ঞানযোগের শেষ কথা। মধুসূদন সরস্বতী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন 'স চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতু পরমপ্রেমা ত্রিধা তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ সএবাহমিতি ত্রিধা। ভগবচ্ছরণ ত্বং স্যাৎসাধনাভ্যসপাকতঃ। ভগবদভক্তির তিনটি রূপ এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে—আমি তোমার, তুমি আমার এবং তুমি ও আমি অভিন্ন, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এই সম্বন্ধ। (সিদ্ধান্ত বিন্দু ৮ম শ্লোক ৫৭৯ পৃঃ) ইহাই জীবের চরম কৃতার্থতা, তাহার চরম পরিণতি। এইরূপে সসাম জীব অসীম আত্মভাবে ফুটিয়া উঠিবার জন্যই জন্মের পর জন্মে অগ্রসর হইয়া চলে এবং শেষ জন্মে—'বাসুদেব সর্ব্বম্'—এই ভাব লাভ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের উপরে উঠিয়া কৃতকৃত্য হয়।

সুতরাং সমগ্র গীতাশাস্ত্রে অধিকারীভেদ অনুসারে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরোপাসনায় প্রতিষ্ঠিত হইলে জীব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। তখনই জীবব্রহ্মের ঐক্য সাধিত হয় এবং শ্রুতিতে উক্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' 'তত্ত্বমসি' অহং ব্রহ্মাস্মি এই সমস্ত মহাকাব্য সকলের বস্তুতঃ উপলব্ধি হইয়া থাকে। তখন উপাস্য, উপাসক সৃষ্ট স্রষ্টা, জ্ঞেয় জ্ঞাতার মধ্যে ভেদই আর থাকে না। সমস্ত ভেদই সেই সচ্চিদানন্দে বিলীন হইয়া যায়।
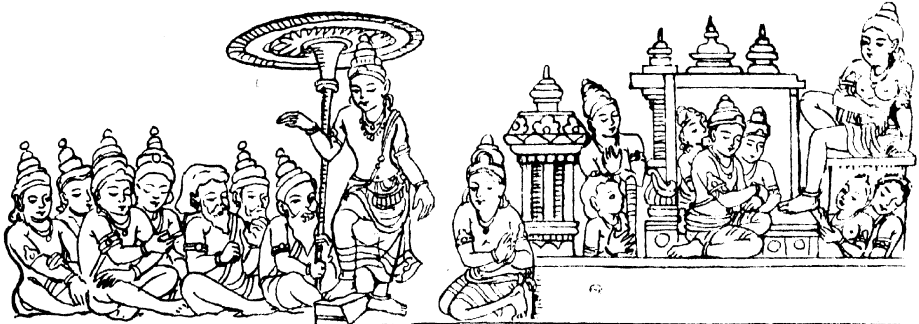
ভরত বড়, না ভারত

মল্লিকারঞ্জন রায়

পায়ে-চলা-পথটা বেরিয়ে গেছে কলোনীর শেষ সীমান্ত হতে। সে পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে চলুন। পথ অসমতল ···বিস্তৃত রুক্ষ ধুলাকীর্ণ মাঠের মাঝে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তার অস্তিত্ব মাঝে মাঝে। হয় তো খানিকটা এগিয়ে গেছেন। মাইলখানেক। চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটুখানি সবুজ রেখা—দূরে। এগিয়ে চলুন সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখবেন প্রকাণ্ড একটা নিম গাছ, বহু পুরাণ। কতদিনের সে কথা কেউ বলে দিতে পারবে না। গাছের ঠিক নিচে গিয়ে আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যাবেন—বেশ খানিকটা জায়গায় ঘাসের গালিচা বিছানো ···যেন শ্যামল বাংলার একটুকরো। হয়তো মনটা আপনার উদাসী হয়ে উঠবে বাংলার কথা ভেবে। হয়তো মনে পড়ে যাবে আপনার প্রিয়জনের কথা—সুদূর বাংলায় আছেন যিনি···

ঘাসের উপর বসে পড়বেন আপনি। আশে পাশে সাড়া নেই জনমানবের, নেই কোনো বসতি···। নির্জন, নিস্তব্ধ। শুধু বাতাসের করুণ ক্রন্দন গাছের পাতায় পাতায়। হঠাৎ চোখে পড়বে আপনার···এক পাশে একটা স্মৃতি ফলক। কার সমাধি। কালের কষাঘাতে জীর্ণ শীর্ণ অস্তিত্বটুকু শুধু বজায় আছে কোনোমতে। কার এ সমাধি? কেউ বলতে পারে না; বলতে যারা পারতো শত শত বছর আগে, তারা বিদায় নিয়েছে। নেই কোনো সরকারী নির্দ্দেশিকা। সমাধি শিখরে তবু মাঝে মাঝে আজও জ্বলে ক্ষীণ প্রদীপ, তার চিহ্ন চোখে পড়বে আপনার···

অজ্ঞাত, আকর্ষণহীন এ নগণ্য সমাধির পাশে বসে থাকতে ভালো লাগবে আপনার। মনে হবে যেন এর সঙ্গে কোন্ অদৃশ্য আত্মীয়তা আপনার··। বসে বসে ভাববেন আপনার প্রিয়জনের কথা। যাকে আপনি ভালোবাসেন, যে আপনাকে ভালোবাসে···। কিন্তু মিলন হলো না আজও দুজনের—অদৃশ্য কোন্ দুর্ব্বাসার অভিশাপে।

রাতের আঁধার নেমে আসবে···ফেরার পথে পা বাড়াবেন আপনি···

পরদিন বিকেলেও বেড়াতে বেড়াতে সেখানে গিয়ে হাজির হবেন আপনি নিজের অজ্ঞাতে···। দিনের পর দিন কোন্ অবোধ্য আকর্ষণ আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে সেখানে···। হয়তো নেই কিছু···এই না থাকাটাই আপনার বড় আকর্ষণ।···

* * *

সেদিন হয়তো গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ একটু চাঁদের আলো এসে পড়বে সমাধির উপর। হয়তো শুয়ে থাকবেন আপনি ঘাসের উপর। চমকে উঠে বসে পড়বেন···। একটি মেয়ে···! ক্ষীণ মৃতপ্রদীপ হাতে নেমে এলো যেন কোন অদৃশ্য লোক থেকে। প্রদীপখানি তুলে ধরে চেয়ে থাকবে মেয়েটি একান্ত করে ওই সমাধির পানে ···তৃষাতুর চোখে দেখবে যেন কি···তারপর এক সময় সন্তর্পণে প্রদীপখানি রেখে দেবে সমাধি শিখরে···উদাস নেত্রে চেয়ে থাকবে দূর আকাশের কোন নক্ষত্রের পানে···

কে? কে এই মেয়েটি···বিস্ময় আপনার বেড়ে যাবে ···ওর পোষাক দেখে···রাজপুত রমণীর ছবি যদি দেখে থাকেন তবে আপনার মনে হবে সে পোষাকের সঙ্গে যেন এর সাদৃশ্য আছে কিছুটা···

এক সময়ে মেয়েটি আপনার পাশে এসে বসবে। এই আশ্চর্য্যজনক পরিস্থিতিতে আপনি বাক্যহারা হয়ে যাবেন··· কথা বলাত পারবেন না প্রথমে।

মেয়েটি আপনাকে জিজ্ঞেসা করবে, আপনি রোজ আসেন এখানে? কেন?

আত্মস্থ হতে খানিক সময় লাগবে আপনার···। তারপর তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আপনি তার পরিচয় জানতে চাইবেন। মেয়েটি বলবে—"আমার পরিচয় জানলো না কেউ আজো। আপনিও নাই বা শুনলেন। তার চেয়ে একটা গল্প শুনুন—যদি আপত্তি না থাকে।"

আগ্রহে শুনে যাবেন আপনি···

পৃথ্বিরাজের সঙ্গে বিবাদ ছিল জয়চন্দ্রের···। তাঁকে জব্দ করতে জয়চন্দ্র ডেকে আনেন মহম্মদ ঘোরীকে। ঘোরীর সাথে পৃথ্বিরাজের যুদ্ধ হয় দুবার···। প্রথমবার ঘোরী পরাজিত হন। সে খবর ইতিহাসের পাতায় আপনি পড়েছেন। পৃথ্বিরাজের জয়লাভে যে সাহায্য করেছিল সবচেয়ে বেশী, তার নাম নেই ইতিহাসের পাতায়। এমন অনেক থাকে না···

প্রথম যুদ্ধ···দু পক্ষে প্রবল তোড় জোড়···সৈন্যদের ছাউনি পড়েছে···দলে দলে সৈন্য এসে জড় হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ সুরু হচ্ছে না···। এক পক্ষ অন্য পক্ষের সৈন্যবলের প্রকৃত খবর জানে না···। কোনদিক থেকে কি ভাবে আক্রমণ করলে সুবিধা হবে তারি মন্ত্রণা চলছে দু'শিবিরে। নগরে থমথমে ভাব···সবাই কামনা করছে তাদের রাজার জয় হউক···পৃথ্বিরাজের জয়···

এমনি দিনে নগরে ফিরে এলো ভরতসিংহ···তার ঘোড়া এসে থামলো এক কুটীরে···ঠক্···ঠক্···দরজা খুলে বিস্ময়ে দাঁড়াল জয়ন্তী···চোখে আনন্দের রেখা···

ভরতসিংহ আর জয়ন্তীর শৈশব আর কৈশোর কেটেছে এক সঙ্গে খেলা করে···কত মধুর ছিল সে দিনগুলো। তারপর এলো যৌবন···পিতার খেয়াল হল মেয়েকে পাত্রস্থ করতে হবে। চলল পাত্রের সন্ধান···মেয়ের মুখে নেমে এলো আষাঢ়ের কালো মেঘ। মেয়ের মনে কোথায় বাধা মা জানতেন···স্বামীকে জানালেন তিনি সে কথা···

কিন্তু ভরতসিংহ দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন···তার হাতে মেয়ে তুলে দেওয়া···তা হয় না। জয়ন্তীর পিতা ভরতকে ডেকে বললেন একদিন···খেলা করে করে অনেকদিন কাটলো। বয়স বেড়েছে এবার রোজগারের পথ দেখো···

ভরত বুঝল সব···একদিন বেরিয়ে পড়ল অজানা পথে অর্থের সন্ধানে···। জয়ন্তী জানাল···সে অপেক্ষা করে থাকবে···।

তারপর কেটে গেছে মাস ছয়···। ছয় মাস বাদে নিজ নগরে ফিরে এলো ভরত···।

ভিতরে নিয়ে গেলো তাকে জয়ন্তী···। পিতা তার যুদ্ধক্ষেত্রে অদূর সৈন্য শিবিকায়···। মাতা মারা গেছেন···মাস দুই···। নির্জন গৃহ···

প্রথম মিলনের বিস্ময় কেটে গেলে ভরত কথা বলতে সুরু করল—"জানো জয়ন্তী, আর আমি দরিদ্র নই···অনেক ঘুরে ঘুরে কাজ পেয়েছি মহম্মদ ঘোরীর অধীনে—ছোট বলাধ্যক্ষের পদ···"

ঘৃণায় জয়ন্তীর নাসা কুঞ্চিত হল···। সে বলল···"কি করেছ···যবনের অধীনে ভৃত্য তুমি···আমাদের শত্রু সে···।"

"তুমি জানো না জয়ন্তী···এ যুদ্ধ জয়লাভ করলে আমি হব এ রাজ্যের রাজা তুমি রাণী···। ঘোরীর সাথে আমার চুক্তি হয়েছে···। তাই তো যোদ্ধার বেশ ছেড়ে নাগরিকের বেশে এসেছি পৃথ্বিরাজের সৈন্যের অবস্থানের খবর নিতে···"

"ভুল, ভুল···যবনের ছলনায় তুমি দেশের সর্ব্বনাশ ডেকে আনছ···ঘোরী নিজে হবে রাজা···যুদ্ধ জয় করে সে তোমাকেও করবে পদানত···ভরত এ দুর্বুদ্ধি তুমি ত্যাগ কর···'

"না তা হয় না, বড় আমাকে হতে হবেই। অনেক খবর আমি সংগ্রহ করেছি···এবার ফিরে যেতে পারলেই···

কিছুতেই তাকে ক্ষান্ত করতে পারল না জয়ন্তী···। বেদনায় তার মুখ মলিন হয়ে এলো···এই কি সেই ভরত, যাকে সে ভালোবাসত···? যার পথ চেয়ে বসে আছে সে? হঠাৎ তার ভ্রূ কুটীল হয়ে উঠলো···তারপর···

আদর আর সোহাগে ভুলিয়ে শত্রুপক্ষের অনেক খবর জেনে নিল জয়ন্তী···। তারপর ভরতকে বলল···তুমি একটু বসো প্রিয়···আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি। জয়ন্তী সে ঘর থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে গেল···

ভরত বসে আছে, কিন্তু জয়ন্তীর আর দেখা নেই···। ভরত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে···রাত অনেক হয়ে গেছে···এর পর ফিরে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে···। বাইরে এলো সে···কিন্তু তার ঘোড়া···? জয়ন্তী? তাড়াতাড়ি পায়ে হেঁটে আঁধারে আত্মগোপন করল সে···

জয়ন্তী? জয়ন্তী কোথায়? জয়ন্তী তার পিতার সাথে পৃথ্বিরাজের শিবিরে···ভরতের কাছ থেকে যত খবর সংগ্রহ করেছিল সব জানাল পৃথ্বিরাজকে···।

পৃথ্বিরাজ নিজ গলার মুক্তার মালা খুলে দিলেন

জয়ন্তীকে···। তার সৈন্যেরা চলল শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করতে···একদল চললো···ভরতকে আটকাতে···।

জয়ন্তী চলে এলো···তার চোখে জল···মুক্তার মালা লুটিয়ে পড়ল পথের ধূলায়···।

যুদ্ধের খবর ইতিহাসের পাতায় আছে···। পৃথ্বিরাজের আদেশ ছিল যে ভাবেই হোক ভরতকে জ্যান্ত ধরে আনতে হবে। কিন্তু এলো মৃত, রক্তাক্ত দেহ···। জয়ন্তীকে ডেকে পাঠালেন পৃথ্বিরাজ···। বললেন—"বহিন, তোমার জন্যই আমি জয়লাভ করেছি। যে দেশদ্রোহী আমার সর্ব্বনাশ করতে চেয়েছিল সে মৃত, তার সমুচিত শাস্তি সে লাভ করেছে। এবার বল তোমাকে কি পুরস্কার দেব।"

জয়ন্তী! সে কি বিচলিত হয়েছিল? তার অন্তর কি কেঁদেছিল? বাইরে সে অবিচলিত। অন্তরের খবর কে জানে···

জয়ন্তী বলল—"কিছু পুরস্কারের যোগ্যতা নেই আমার ···শুধু প্রার্থনা মহারাজ, দয়া করে ভরতসিংহের মৃতদেহ আমাকে আমার অভিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে দিন···"

পৃথ্বিরাজ বিস্মিত···কি এ বলে নির্ব্বোধ বালিকা···।

জয়ন্তীর পিতা বললেন—মহারাজ, ওর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখবেন না···

পৃথ্বিরাজ বললেন—"আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে। ভরতসিংহ জয়ন্তীর কে?"

"সে খবর নাই শুনলেন মহারাজ···"

"বেশ তাই হোক···"

পরদিন নিশীথে রচিত হল ভরতসিংহের সমাধি···। এই তুচ্ছ স্মৃতি ফলক···। রোপিত হল এই নিম গাছ···

মেয়েটি থামলে এবার···

আপনি জানতে চাইবেন···"জয়ন্তী কি প্রতিরাতে প্রদীপ দিতে আসতো এই সমাধি স্থানে···"

মেয়েটি জবাব দেবে না···।

আপনি আবার জিজ্ঞাসা করবেন···কিন্তু···আপনি কে তা তো বললেন না? আপনিই কি···

* * * *

হঠাৎ চক্ষু মেলে চেয়ে দেখবেন রাত অনেক হয়েছে··· ক্ষীণ চাঁদ বহুক্ষণ অস্ত গেছে···নিম গাছের নীচে সবুজ ঘাসের উপর আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন···

ভারতের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস

শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার

ইউরোপীয় দেশগুলির সমবায় আন্দোলনের গোড়া আলোচনা করে দেখা যায় যে, সেখানে সমবায় দুঃখদুর্দ্দশা মোচনের উপায়স্বরূপ স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রসারলাভ করেছিল। ভারতবর্ষে ঠিক উল্টোভাবে সমবায়ের প্রবর্ত্তন করেন গভর্ণমেণ্ট। এখানকার সমবায় আন্দোলনের ইতিবৃত্ত আলোচনার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তদানীন্তন অর্থনৈতিক কাঠামোর একটু আলোচনা করা দরকার।

ইংলণ্ডের Industrial Revolution মজুর শ্রেণীর মধ্যে এক নবচেতনা আনয়ন করেছিল। কিন্তু একক ব্যক্তি-স্বাধীনতার আস্বাদন গ্রহণের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করায় মিলিত প্রচেষ্টার উৎস ও প্রেরণা তাদের মধ্যে এসেছিল। সমবায় তারই এক পরিণতি বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষে অনুরূপ Revolution না হলেও পুরাতন ও মধ্যযুগীয় অর্থনীতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত করল বিদেশী শাসন ও আনুসঙ্গিক বিদেশী ব্যবসার প্রবর্ত্তন। সস্তা পণ্যের আমদানী কুটীর শিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। ফলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতার চাপ গেল বেড়ে। জমির আয়তন ক্রমান্বয়ে কমে যেতে যেতে এমন অবস্থায় এসে পৌছাল, যেখানে কৃষি লোকসানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এছাড়া কৃষিজীবীর ঋণ গ্রহণের অভিশাপ ও ঋণভারগ্রস্ততা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিপর্য্যস্ত করে ফেলেছিল। মহাজনের অতি মাত্রায় সুদের হারের ফলে খাতক কৃষিজীবীর পুঁজি যেমন একদিকে ক্ষয় হতে লাগলো, অন্যদিকে তেমনি তার যৎসামান্য জমিজমাও মহাজনের কবলে পড়তে লাগল। এইখানে উল্লেখযোগ্য এই যে দেশে চুক্তি-আইনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকায় মহাজন ও খাতকের মধ্যে যে কোন চুক্তিই আইনের চোখে গ্রহণীয় ছিল। ফলে মহাজনের তৃষিত দৃষ্টি ঋণদাদনের মূলে খাতকের জমির উপরই নিবদ্ধ থাকত এবং ঋণের পরিমাণ চক্রাহারে বাড়তে বাড়তে খাতকের ক্ষমতার বাহিরে যতদিন না গিয়ে পড়ত ততদিন আদায়ের চাড়ও সচরাচর মহাজনদের মধ্যে লক্ষিত হত না। মহাজনের উৎসাহ দেখা দিত খাতককে জমি থেকে বিচ্যুত করার সময়। এর উপর বাংলা দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মহাজনদের এদিকে উৎসাহিত করেছিল। ফলে পূর্ব্বেকার গ্রাম্য অর্থনীতির কাঠামো চুরমার হয়ে গেল। যেখানে শতকরা ৭৫জন কৃষির উপর নির্ভরশীল সেখানে এই অবস্থার সৃষ্টি একটি চরম সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তার উপর মাঝে মাঝে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি

এই গুরুতর অবস্থাকে আরও গুরুতর করে তুললো। অশিক্ষার দরুণ মিলে মিশে কাজ করার প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগল না। দেশের সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক জীবনে চরম দুঃখ দুর্দ্দশার দিন ঘনিয়ে এল। তার জন্য স্থানে স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বোম্বাই প্রদেশের পুণা ও আহম্মদনগর জেলায় খাতকেরা মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মহাজনদের আক্রমণ করে কর্জ্জের নথি ও কাগজপত্র সব পুড়িয়ে দিল। এই বিদ্রোহ দমন করতে সামরিক বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বিদেশী গভর্ণমেন্ট দেখলেন যে কিছু করার দরকার। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ কমিশন (Deccan Riots Commission) এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন যে, এক তৃতীয়াংশ কৃষকের দেনার পরিমাণ তার জমির পরিমাণ হতে ১৮গুণ—যা হতে ঋণগ্রস্ততার ভার বুঝতে পারা যায়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশন (Famine Commission of 1880) ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ ঘুরে এসে দেখেছিলেন যে, কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ঋণভারে জর্জ্জর এবং অন্য এক তৃতীয়াংশ ঋণগ্রস্ত হলেও চেষ্টা করলে ঋণমুক্ত হতে পারে।

দুইটি কমিশনের Reportএর উপর ভিত্তি করে গভর্ণমেন্ট কতকগুলি আইন পাশ করলেন, কৃষিজীবীর ঋণগ্রস্ততার ভার কমাবেন বলে—দাক্ষিণাত্য কৃষিজীবী বিষয়ক বিল (১৮৮০), জমির উন্নতির জন্য ঋণদান বিষয়ক আইন (১৮৮৩), কৃষিজীবীদের ঋণলাঘব আইন (১৮৮৪)। আংশিকভাবে কিছু কিছু সুবিধা হলেও কোন আইনই কৃষককে সম্পূর্ণরূপে বাঁচাতে পারলে না। ১৮৯২ সালে Madras Government স্যার Federic Nichlorsonকে ইউরোপে পাঠালেন সেখানকার সমবায় সমিতিগুলির অনুকরণে সমবায় সমিতির প্রবর্ত্তন এদেশে করা যায় কিনা তা পর্য্যবেক্ষণ করতে।

তিনি ইউরোপের কৃষি ও অন্যান্য ভূমি ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্যকারিতা ও কার্য্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করে এসে প্রথম মত প্রকাশ করলেন যে, সমবায় পদ্ধতির প্রবর্ত্তনে কৃষিজীবীর ঋণগ্রস্ততার ভারও যেমন একদিকে কমবে, অন্যদিকে তেমনি তাদের ঋণদানের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে। ১৮৯৫-৯৭ সালে তিনি যে report পেশ করেছিলেন তাতে তিনি বিশেষ জোরের সঙ্গে ভারতবর্ষে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের কথা বলেছিলেন। ইউরোপের ভূমিব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। তার মতে এমন কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে না যাতে ঋণদাতার, ঋণগ্রহিতার অবস্থার সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের ব্যবস্থা না থাকবে। সুতরাং গভর্ণমেন্ট পরিচালিত ব্যাঙ্ক ঋণগ্রস্ততার সমস্যার সমাধানই করতে পারবে না। কারণ তাতে ঋণদানের প্রধান বিচার্য্য বিষয়—ঋণের নিরাপত্তা ও ঋণগ্রহিতার সুবিধার ব্যবস্থা করতে হলে গভর্ণমেন্টকে লোক নিয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রচুর খরচ করতে হবে। যদি তা সম্ভবও হয় তাহলে দেশের লোক প্রত্যেক ব্যাপারেই গভর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং সমবায় সমিতির একমাত্র সন্তোষজনক উপায়—যাতে কৃষিজীবী তার প্রয়োজনীয় যথাযথভাবে ঋণ পেতে পারে। তার মতে আইন প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য অপ্রত্যক্ষ সাহায্য ও উপায়ের দ্বারা দেশে সমবায় কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনকে উৎসাহ দিতে হবে। জার্ম্মাণীর প্রবর্ত্তিত সমবায় ব্যাঙ্কের অনুপাতে এদেশে সমবায় ব্যাঙ্ক গড়ে তুলবার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করলেন। ১৯০১ খৃঃ দুর্ভিক্ষ কমিশন এই মতকে সমর্থন করেন। ১৮৯৯ খৃঃ মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট নিকোলসনের রিপোর্ট অনুযায়ী কিছু না করারই সিদ্ধান্ত করেন। তাদের মতে গ্রামে গ্রামে ঋণদান (Renal credit) খুব জরুরী সমস্যা ছিল না। ইতিমধ্যে যুক্তপ্রদেশ হতে Mr. H. Duponen, the people Bank of India নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তক ও নিকোলসনের report জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। যুক্তপ্রদেশ, বাংলা ও পাঞ্জাবের অঞ্চলে কয়েকজন জেলাশাসক নিজেদের চেষ্টায় কতকগুলি সমবায় সমিতি স্থাপন করেন। তন্মধ্যে পাঞ্জাবের স্যার ম্যাকল্যাগানের প্রচেষ্টাই বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেছিল। যাহা হোক, এই সব উদ্যম ও প্রচেষ্টা সমবায়কে আকর্ষণীয় করে তুললেও, এগুলো বিক্ষিপ্তভাবে করা হচ্ছিল। সুসংবদ্ধ বা সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই। সাধারণ জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কের আইন এই সমবায় সমিতির পক্ষে প্রযোজ্য নয় একথা সহজেই বুঝতে পারা গিয়েছিল এবং একটি পৃথক সমবায় আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারা গিয়েছিল। নিকোলসনের Report এর উপর প্রাদেশিক Governmentর মত নিয়ে স্যার এডওয়ার্ড ল' সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি র‍্যাফাইসেন ব্যাঙ্কের অনুপাতে এদেশে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ করেন। এই সমস্ত সুপারিশ ক্রমে Sir Efftson কর্ত্তৃক ১৯০৩ সালের ব্যবস্থাপক সভায় (Imperial legislative Council) সমবায় বিল উত্থাপিত হয়। Effetson সাহেব নিজে এবং অন্যান্য ভারতীয় সভ্যগণ এই বিষয়ে কৃতকার্য্যতা ও সহযোগিতার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু Lord Curzon একরূপ জোর করে সমবায় সম্বন্ধীয় ১০এর আইন পাশ করেন।

এইভাবে এদেশে সমবায়ের জন্ম হলো। ইউরোপের সমবায়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের সমবায়ের পার্থক্য এখানে। যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন হিসাবে সমবায় বিকাশ লাভ করেছিল, আর এদেশে বিদেশী সরকার প্রবর্ত্তন করলেন সেই সমবায়।

১৯০৪ সালের ১০ আইন

এই আইন পাশ হওয়ার পর হতে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। এই আইনে ঋণদান সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ঋণ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়। এর কারণ এই নয় যে অন্য উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা এখনও বুঝতে পারা যায়নি। প্রধান কারণ হল এই যে, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অন্য উদ্দেশ্যে

সমিতি চালানোর লোকের অভাব হওয়াই স্বাভাবিক হবে এবং তাহ'লে উন্নতির গোড়াতেই ধাক্কা খেয়ে সমবায় আন্দোলন আর অগ্রসর হতে পারবে না, এই ভয় হয়েছিল। সমবায় শিক্ষার দিক হতে সাদাসিদা ধরণের ঋণদান সমিতি কার্য্যকরী হবে এই কথা ভেবে লওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া শুধু মাত্র এক উদ্দেশ্যে বিশেষ ঋণদান সমিতি স্থাপন হলে পরিচালনার সুবিধা হবে এই কথা ভেবেই এই আইনে অন্য কোন উদ্দেশ্যের সমিতি গঠনের ব্যবস্থারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি। উপরন্তু সহরাঞ্চলের সমবায় সমিতি অপেক্ষা গ্রাম্য সমিতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল বেশী। সমস্ত সভ্য সংখ্যার চতুর্থ পঞ্চমাংশ কৃষিজীবী হলেই সমিতিকে গ্রাম্য সমিতি, অন্যথায় নাগরিক সমিতি বলা হবে এই আইন করা হয়। গ্রাম্য সমিতিতে অসীম দায়িত্বের প্রবর্ত্তন করা হয় এবং সহরাঞ্চলের সমিতিতে দায়িত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপার সভ্যদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঠিক করে দেওয়া হয় যে গ্রাম্যসমিতির সমস্ত মুনাফা এবং নাগরিক সমিতির বেলায় Reserve fundএ জমা হবে। প্রত্যেক সমিতির প্রবেশ মূল্য, শেয়ার, সভ্যের আমানত ও বাহির হতে কর্জ্জ গ্রহণের দ্বারা নিজেদের কার্য্যকরী মূলধন সৃজন করবে এবং সৃষ্ট…অর্থ সভ্যদের মধ্যে দাদন করবে। সমিতি স্থাপনের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে Registrar নিযুক্ত হবেন। সমিতির Audit পরিদর্শন গভর্ণমেণ্ট অফিসাররা করবেন। প্রয়োজন হলে Registrar সমিতি উঠিয়ে দিতে পারবেন। মোটের উপর সমবায় আন্দোলন গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতি সাহায্য ও উপদেশ লাভ করবে। আন্দোলনকে উৎসাহ দান করার জন্য আয়কর, stamp, registration প্রভৃতি হতে সমিতিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৩ বৎসর সমিতিকে ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত শতকরা ৪৲ টাকা হার সুদে দিতে অঙ্গীকার করল, যদি অনুরূপ পরিমাণ টাকা নিজের থেকে তুলতে পারে। ১৯০৪ সালের আইনকে সমবায় ঋণদান বিষয়ক আইন বলা হয়েছিল। কারণ এই আইনে একমাত্র ঋণদানের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া শুধু মাত্র ঋণগ্রস্ততার ভার কমাবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই আইনের জন্ম হওয়ায় ঋণদান ঋণগ্রহণ সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে করা হয়েছিল।

১৯০৪ সালের আইনের দুটী প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হল সরলতা ও স্থিতিস্থাপকতা। অশিক্ষিত কৃষিজীবীর বোঝবার অসুবিধা না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে জটিলতাবিশিষ্ট পরিকল্পনা যতদূর সম্ভব পরিহার করা হয়েছিল এবং যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য করে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ যাতে প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমিতি গড়ে উঠতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে কতকগুলি সর্ব্বথাপ্রযোজ্য মূলনীতির রচনাই ছিল এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই সমবায়ের এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হলেন এবং একজন করে Registrar নিযুক্ত করলেন। আন্দোলন এমনভাবে অপ্রত্যাশিত প্রসার লাভ করল যে ১৯০৪ সালের আইনটিকে নূতন কতকগুলি পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেল। ১৯০৬-৭ সালে সমিতির সংখ্যা ৮০৩ হতে ১৯১১-১২ সাল ৮১৭৭ হয়ে দাঁড়ায় এবং সভ্যসংখ্যা ৯০৮৪৪ হতে ৪,০০৩৩১৮ হয়ে দাঁড়াল। কার্য্যকরী মূলধন ও ২৩০,৭১৩৮৩৲ টাকা হতে বেড়ে ৩৯১৫৭৪১৬২ টাকায় গিয়ে দাড়াল।

১৯০৪ সালের আইনে ঋণ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যবিশিষ্ট সমবায় সমিতি গঠনের ব্যবস্থা হয়নি। তার উপর সমিতিসমূহের দ্রুত প্রসার ও নিকটবর্ত্তী স্থান হতে ঋণ পাওয়ার সমস্যা উদ্ভব হওয়ায় কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। প্রাথমিক সমিতিগুলি যখন দ্রুতভাবে গড়ে উঠতে ও কৃতকার্য্যের সঙ্গে কাজ করতে লাগল তখন একটি প্রধান সমস্যা তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল—কেমন করে সহজে মূলধন সংগ্রহ করা যায়। কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপনের কোন ব্যবস্থাই আইনে না থাকায় সেদিকে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করল। এইরূপ সমিতি স্থাপন করতে পারলে অতি সহজে মূলধন সংগ্রহ করা যাবে এটা বেশ বুঝতে পারা গেল। তা ছাড়া এইরূপ সমিতি স্থাপিত হলে তার দ্বারা প্রাথমিক সমিতিগুলি পরিদৃষ্ট, পরিচালিত ও প্রয়োজন হলে উপদিষ্টও হতে পারবে এটা বুঝা গেল। ১৯১২ সালের আইনে এগুলির ব্যবস্থা হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন দ্বিতীয় পর্য্যায়ে এসে পড়ে। কেন্দ্রীয় সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি, উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি প্রভৃতি স্থাপন আইনতঃ গৃহীত হয়। গ্রাম্য ও নাগরিক সমিতির বদলে অসীম ও সসীম দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতির উদ্ভাবন ব্যবস্থা করা হয়। গ্রাম্য সমিতিতে পূর্ব্বে শেয়ারের উপর কোন মুনাফা দেওয়ার ব্যবস্থা ১৯০৪এর আইনে ছিল না। ১৯১২ সালের আইনের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অনুমতি সাপেক্ষে সে ব্যবস্থা হয়। অসীম ও সসীম দায়িত্ব সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হয় যে, কোন সমিতিতে অন্য একটি সমিতির সভ্য হতে পারার ব্যবস্থা থাকলে প্রথমোক্ত সমিতি সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট হবে। অপর দিকে যে সমিতিতে অধিকাংশ সভ্য কৃষিজীবী থাকবে এবং যেখানে সভ্যদের মধ্যে ঋণ দাদন একটি উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হবে সেই সমিতি অসীমদায়িত্ববিশিষ্ট হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সমিতির সভ্যগণ দায়িত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

১৯১২ সালের আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলন নূতন প্রেরণালাভ করতে থাকে। সেই সমিতির সংখ্যা, তাদের সভ্যসংখ্যা ও উন্নতির গতি যথেষ্ট বেড়ে যায়, যদিও এই বাড়ার হার সকল প্রদেশে সমান হয় নাই। ১৯১৪-১৫ সালে সমিতির সংখ্যা ও প্রাথমিক সমিতির সভ্য সংখ্যা ১৭৩২৭ এবং ৮,০২৪৪৭৯ থাকে। ১৯২১-২২ সালে ঐ সংখ্যা যথাক্রমে ৫২১৮২ এবং ১৯৭৪২৯০ থাকে এবং ১৯২৭-২৮ সালে যথাক্রমে ৯৬০৯১ এবং ৩৭৮০১৭৩ হয়। কার্য্যকরী মূলধনের অঙ্ক ও উপরোক্ত বৎসরগুলিতে যথাক্রমে ১২২২৯২০০০ টাকা,

৩১১২২৫০০০, ৭৬৭০৮৭০০০ টাকা হয়। সুতরাং সকল দিক হতে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

১৯১২ সালের আইন পাশ হওয়ার পর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সমিতি দ্রুতবেগে গড়ে উঠতে থাকে। যেমন ক্রয় বিক্রয় সমিতি, দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি, তন্ত্র সমবায় সমিতি প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যাও বেড়ে যায় এবং সমবায় আন্দোলন যে জনসাধারণের আস্থাভাজন হচ্ছে এর একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। আন্দোলনের সত্যকারের উন্নতি কতদূর হয়েছে তা পরিমাপ করে দেখার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ সালে ম্যাকলাগান কমিটি নিয়োগ করেন।

এই কমিটির বিবরণী ১৯১৮ সালের Sept.এ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণী প্রকাশ হওয়ার পর সমবায় আন্দোলনের তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে বলা যেতে পারে। সমবায় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকাশ লাভ করুক এই কথাই সুপারিশ করেন। তিনি ঋণদাদনের ক্ষেত্রেও যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা কমিটিকে স্মরণ করে দেন। কমিটি ঋণদান সমিতি গুলোকে প্রতিপদক্ষেপে কেন্দ্রীয় সমিতির উপর নির্ভর না করে সভ্যগণের মধ্য হতে গৃহীত আমানতের বলে কার্য্যকরার পরামর্শ দেন। তাতে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতার লক্ষণ একদিকে দেখা যাবে ও অন্যদিকে আমানতের পরিমাণও বেড়ে যাবে। যথাযথভাবে অডিট ও পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথাও কমিটি উল্লেখ করেন। তা করা হলে জনসাধারণের আস্থা বেড়ে যাবে। কমিটির রিপোর্ট যখন বার করা হয় তখন দেশে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির পথে ছিল। সুতরাং রিপোর্টের সতর্কীকরণের মূল্য তখন আন্দোলনের মধ্যে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা বুঝতে পারেন নি। ১৯১২ সালে বিশ্বব্যাপী মূল্য হ্রাসের দিনে সেগুলোর সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হয়।

সমবায় আন্দোলনের চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হয় ১৯১৯ সালে। ভারত-গভর্ণমেণ্টের Reform Act পাশ হওয়ার পর থেকে এই আইনে সমবায় হস্তান্তরিত প্রাদেশিক বিষয় বলে পরিগণিত হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে মন্ত্রীর অধীনে প্রসারলাভ করতে থাকে। কয়েকটি প্রদেশ ১৯১২ সালের আইনকে ভিত্তি করে প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন করে। বোম্বাই এ বিষয়ে অগ্রণী হয়, ১৯২৫ সালে নতুন আইন পাশ করে। ১৯২৭ সালে Burma, ১৯৩২ সালে Madras। ১৯৩৫ সালে Bihar Orissa ও ১৯৪১ সালে বাংলা নূতন আইন প্রণয়ন করে। অন্যান্য প্রদেশ তাদের নিজেদের আন্দোলনের উপযোগী করে ১৯১২ সালের ভারত আইনকে কিছু কিছু সংশোধন করে—নিজেদের আন্দোলনের উপযোগী করে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করে নেয়। এই সকল নূতন আইনের সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রায় দেখা যায় যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট Registrarকে ১৯১২ সালের আইন অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা দান করেছে। বাংলা দেশের সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন কার্য্যে সুবিধার জন্য ও সুষ্ঠু উপায়ে তার উন্নতিবিধানের জন্য ১৯৪০ সালের প্রাদেশিক আইনে Registrarকে আন্দোলন পরিচালনা ও পরিদর্শনের জন্য ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। শিক্ষা ও প্রচার কার্য্যের জন্য বেসরকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে বোম্বাই সমবায় শিক্ষানিকেতন (Bombay Co-operative Institute) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কয়েকটি প্রদেশে আন্দোলনের গতি ও উন্নতি সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধানের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান কমিটি স্থাপন করেন। তন্মধ্যে মধ্যপ্রদেশের Kinis Committee (১৯২২), যুক্তপ্রদেশের Okdon Committee (১৯২৬), মাদ্রাজের Townsend Committee (১৯২৮) এবং পাঞ্জাবের Canent Committee (১৯২৯)র নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশে কোন কমিটিই নিযুক্ত হয় নি। এই সব কমিটি যে সকল সুপারিশ করেন সে সমস্তই প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-সমূহ কার্য্যকরী করার চেষ্টা করেন। ফলে সকল প্রদেশেই লক্ষিত হয় যে সুপারিশ কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক Bank সমূহকে প্রচুর ঋণদান এবং তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ায় দায়িত্বগ্রহণ—এই মোটামুটি সর্ব্বক্ষেত্রে করা হয়েছে।

আন্দোলনের পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হয় ১৯২৯ সালে। বিশ্বব্যাপী মূল্য হ্রাসের (Depression) ঢেউ এদেশে লাগে। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য আশাতীত ভাবে কমে যায়। এতদিন মূল্যবৃদ্ধির দিনে সমবায় সমিতি গুলোর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল, আজ চাকা একেবারে ঘুরে গেল। আন্দোলনকে ঢেলে সাজার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয় এবং এখন হতে আন্দোলনের প্রসারের পরিবর্ত্তে দোষ ত্রুটি সংশোধন এবং পুনর্গঠনই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৯-৩১ সালে কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটিগুলো যে সুপারিশ করেন তাতে এই কথাই বলা হয় যে স্বল্পমেয়াদী ঋণদান সমিতি গুলোকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হলে গ্রাম্য ঋণগ্রস্ততার ভার একদিকে যেমন কমানো দরকার, অন্যদিকে তেমনি পৈতৃক ঋণের ভার হতেও কৃষিজীবীকে অব্যাহতি দেওয়া দরকার। এর ফলে দেশে জমিবন্ধকী সমিতির ও ঋণ সালিশী বোর্ডের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে মাদ্রাজ অগ্রণী হয়ে প্রথম জমিবন্ধকী সমিতি বিষয়ক আইন ১৯৩৪ সালে প্রণয়ন করে। এ ছাড়া গভর্ণমেণ্টকে সময়ে সময়ে দেশের আন্দোলন সম্বন্ধে অবহিত করে রাখার জন্য ১৯৩০ সালে Reserve Bank of India কৃষি-ঋণদান বিভাগ খোলে।

যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালকে আন্দোলনের ষষ্ঠ অধ্যায় বলা যেতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যজনক আবহাওয়া বদলে যায়। সমিতির সভ্যগণ বিশেষ করে কৃষিজীবী সভ্যগণের মধ্যে মহাজনের ও সমিতির পুরাতন দেনা পরিশোধ করার আগ্রহ লক্ষিত হয়। অধিকন্তু সুপরিচালিত Bank গুলোতে আমানতের পরিমাণও বেড়ে যায়। দেশে চাহিদা অনুপাতে জিনিষপত্রের সরবরাহ না থাকায়—দাম যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং কৃষিজীবীর অর্থোপার্জ্জন সুগম ও সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে সমবায় Bankগুলো হতে ঋণ

গ্রহণের তাগিদ কমে আসে এবং ঋণদান সমিতিগুলোতে টাকা বাড়তি হয়ে দাঁড়ায়। বাড়তি টাকা কিভাবে খাটানো যায় এইটাই এক সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের স্বল্প সরবরাহ ও আনুসঙ্গিক দুষ্প্রাপ্যতা হেতু যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধান করার জন্য সমবায়ের অপর একদিকে প্রসার লাভ ঘটে—সমবায় প্রথার উৎপাদন ও বণ্টন কার্য্য। যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত সমবায়ের একদিকেই মূলতঃ বিকাশ ঘটেছিল—তা সমবায় প্রথার ঋণদান। যুদ্ধোত্তর কালে ঋণদান গৌণ-পর্য্যায়ে নেমে আসে এবং উৎপাদন ও বণ্টন কার্য্য মুখ্যস্থান অধিকার করে। ফলে এতদিনের অন্যায় সংশোধিত হয়। ইহা এদেশে সমবায় আন্দোলনের প্রতি যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

নিম্নলিখিত তালিকা হতে দেখা যাবে যে ১৯২৯ সালের পর হতে যুদ্ধ আরম্ভ পর্য্যন্ত সমবায় আন্দোলনের প্রসারের হার পূর্ব্বাপর বৎসরের তুলনায় অনেক পরিমাণে কমে গেছে। যুদ্ধকালে এই অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং ভারতের সমবায় সমিতি সমূহের কার্য্যকরী মূলধনের অঙ্ক ১৯৩৮-৩৯ সালের ১০৬ কোটী টাকা হতে ১৯৪৪-৪৫ সালে ১৬৪ কোটী টাকায় এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এ বৃদ্ধির হার যুদ্ধকালীন মূল্য বৃদ্ধির (Inflation) তুলনায় যথেষ্ট কম। ইহার প্রধান কারণ সমিতিগুলো হতে সভ্যদের টাকার চাহিদা কমে যাওয়া। এইজন্য সমিতিগুলোও আর মূলধন বাড়ানোর পক্ষপাতী হয় নি। অপরদিকে সভ্যগণের মধ্যে মিতব্যয়িতার অভ্যাসের অভাব পরিদৃষ্ট হয়—যার ফলে তারা পুরাতন দেনা শোধ করার পর আর কোন টাকা জমাতে পারে নি। ফলে সমিতিগুলোতে আমানতের অঙ্ক কমে যাওয়ায় মূলধনের অঙ্কও কমে যায়। কিন্তু এই সময় ঋণদান ও দাদনের কার্য্যের মাত্রা যে বেড়ে গেল তা নিম্নে ২নং তালিকায় দেখলে বুঝতে পারা যায়। এই তালিকার ৬নং ভাগে দেখা যাবে যে খেলাপী টাকার পরিমাণ ও হার ক্রমশঃই কমে আসছে। এর থেকে এই বোঝা যায় যে সভ্যগণ নূতন ঋণ সম্যক পরিশোধ ত করছেই, উপরন্তু পুরাতন দেনার কিছু কিছু পরিশোধ করছে। সমবায় সমিতির উন্নতির এটা একটি লক্ষণ।

কিন্তু এই উন্নতি যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালীন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে এই উন্নতির কতটুকু স্থায়ী হয় তাহাই লক্ষ্য করার বিষয়। সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই এই উন্নতিকে স্থায়ী করার জন্য নানারূপ পরিকল্পনার উদ্ভাবন করেছেন এবং অধিকতর উন্নতির দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি রাখবেন। এইখানে উল্লেখযোগ্য এই যে এই প্রবন্ধে সারা ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, কোন প্রদেশের বিশেষ দিকে দৃষ্টি রেখে বলা হয়নি।

(১) ভারতবর্ষের সমবায় সমিতি-সমূহের সংখ্যা, তাদের সভ্যসংখ্যা ও কার্য্যকরী মূলধনের বৃদ্ধির তালিকা—

বৎসর	হাজার অঙ্ক বিশিষ্ট		লক্ষ অঙ্ক বিশিষ্ট		কোটী অঙ্ক বিশিষ্ট	
	সমিতির সংখ্যা	বৃদ্ধির পরিমাণ	সভ্য সংখ্যা	বৃদ্ধির পরিমাণ	কার্য্যকরী মূলধন	বৃদ্ধির পরিমাণ
১৯২০-২১—১৯২৪-২৫	৫৮	—	২১'৫	—	৩৬'৩৬	—
১৯২৫-২৬—১৯২৯-৩০	৯৪	৩৬	৩৬'৯	১৫'৪	৭৪'৭৯	৩৮'৫৩
১৯৩০-৩১—১৯৩৪-৩৫	১০৬	১২	৪৩'২	৬'৩	৯৪'৬১	১৯'৭২
১৯৩৫-৩৬—১৯৩৯-৪০	১১৭	১১	৫০'৮	৭'৬	১০৪'৬৮	১০'০৭
১৯৪০-৪১—১৯৪৪-৪৫	১৫০	৩৩	৭২'২	২১'৪	১২৪'৩৫	১৯'৬৭

(২) ১৯৩৮-৩৯ হতে ১৯৪৫-৪৬ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সমবায় সমিতি সমূহের ঋণ সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীর তালিকা—

১	২	৩	৪	৫	৬
বৎসর	সমিতি সংখ্যা (লক্ষ অঙ্ক বিশিষ্ট)	সভ্যগণকে বৎসরের মধ্যে ঋণ দাদন (কোটী টাকার সংখ্যা)	সভ্যগণ কর্ত্তৃক বৎসর মধ্যে ঋণশোধ (কোটী টাকার সংখ্যা)	সভ্যগণের নিকট বাকী ঋণের পরিমাণ (কোটী টাকার সংখ্যা)	খেলাপী টাকার পরিমাণ (কোটী টাকার সংখ্যা)
১৯৩৮-৩৯	১'২২	২৬'৪১	২৪'৩৬	৪৬'৯৫	১৪'০৫
১৯৩৯-৪০	১'৩২	২৬'৮০	২৫'৬৫	৪৭'১৩	১৩'৮৪
১৯৪২-৪৩	১'৪৬	৩২'৯৮	৩৪'৮৭	৪৪'১৩	১১'৭৭
১৯৪৩-৪৪	১'৫৬	৪০'০৬	৪০'৯৩	৪০'৭৪	১০'৩৬
১৯৪৪-৪৫	১'৩০	৪১'৭৬	৪২'১২	৪৪'৯৯	৯'১৬
১৯৪৫-৪৬	১'৭২	৫১'৭৫	৪৯'৬৮	৪৬'৯৪	৮'৫২

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

Review of co-operative movment in India হইতে গৃহীত

কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মগধের দূত

মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনাচ্ছলে যে অমিত-বিক্রম মগধেশ্বরের বিজয়গাথা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সমুদ্রগুপ্ত। এক হিসাবে সমুদ্রগুপ্ত আলেকজাণ্ডার অপেক্ষাও শক্তিধর ছিলেন; আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পরেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার সমুদ্রমেখলাধৃত বিশাল সাম্রাজ্যকে এমন সুকঠিন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধরগণ তিন পুরুষ পর্যন্ত প্রায় নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিয়াছিলেন, শত বর্ষ মধ্যে সে বন্ধন শিথিল হয় নাই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিল সমুদ্র গুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্তের সময়। তখনও সাম্রাজ্য কপিশা প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু বহিরাকৃতি অটুট থাকিলেও গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যে দুর্দম জীবনশক্তি এই বিরাট ভূখণ্ডকে একত্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিল, কালক্রমে জরার প্রভাবে তাহা শ্লথ হইয়া গিয়াছে।

কুমারগুপ্তের দীর্ঘ রাজত্বকালের শেষভাগে উন্মত্ত ঝঞ্ঝাবর্তের মত হূণ-অভিযান সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আঘাত করিল। এই প্রচণ্ড আঘাতে জীর্ণ সাম্রাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। কুমারগুপ্ত ভোগী ছিলেন, বীর ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ঔরসে এক মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—গুপ্তবংশের শেষ বীর স্কন্দ। তরুণ স্কন্দগুপ্ত তখন যুবরাজ-ভট্টারক পদে আসীন; রাজবংশের চঞ্চলা লক্ষ্মীকে স্থির করিবার জন্য স্কন্দ তিন রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। সেই দিন হইতে ক্ষয়গ্রস্ত পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে অটুট রাখিবার অক্লান্ত চেষ্টায় দীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ও সৈন্য শিবিরে যাপন করাই এই ভাগ্যহান বীরকেশরীর পূর্ণ ইতিহাস।

যুবরাজ স্কন্দ পঞ্চনদ প্রদেশে হূণ অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন হইলেন। হিংস্র বর্বর হূণগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিল, কিন্তু অসামান্য রণপণ্ডিত স্কন্দের সহিত আঁটিয়া উঠিল না। তথাপি আশ্চর্য এই যে, তাহারা নিঃশেষে দূরীভূত হইল না। পঞ্চনদ প্রদেশ নদনদী ও পর্বত দ্বারা বহুধা খণ্ডিত; চক্রবর্ত্তী গুপ্তসম্রাটের অধীনে প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রবৃহৎ সামন্তরাজা ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য রচনা করিয়া এই দেশ শাসন করিতেন। হূণদের আক্রমণে সমস্তই লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল, কূলপ্লাবী বন্যায় খড়কুটার সহিত মহীরুহও ভাসিয়া গিয়াছিল। অতঃপর স্কন্দের আবির্ভাবে বন্যার জল নামিল বটে কিন্তু নানা স্থানে আবদ্ধ জলাশয় রাখিয়া গেল। পরাজিত হূণ অনীকিনীর অধিকাংশ দেশ ছাড়িয়া গেল, কতক প্রকৃতি-সুরক্ষিত দুর্গম ভূমি আশ্রয় করিয়া রহিয়া গেল।

কুটিল রোগ যেমন তীব্র ঔষধের দ্বারা বিদূরিত না হইয়া দেহের দুর্লক্ষ্য দুরধিগম্য স্থানে আশ্রয় লয়, কয়েকটা হূণ গোষ্ঠীও তেমনি ইতস্তত সানু-সঙ্কট-বন্ধুর স্থানে অধিষ্ঠিত হইল। হয় তো স্কন্দ আরও কিছুকাল এই প্রান্তে থাকিতে পারিলে সম্পূর্ণরূপে হূণ উৎপাত উন্মূলিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, সাম্রাজ্যের অপর প্রান্তে গুরুতর অশান্তির সংবাদ পাইয়া তাহাকে ফিরিতে হইল। পঞ্চনদ প্রদেশ বাহ্যতঃ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রহিল বটে, কিন্তু ধর্ষিতা নারীর ন্যায় তাহার প্রাক্তন অনন্যপরতা আর রহিল না।

বিটঙ্ক নামক ক্ষুদ্র গিরিরাজ্য এই সময় একদল হূণের করতলগত হইয়াছিল। এই হূণদের প্রধান পুরুষ রোট্ট রাজ্যের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ধারা দেবী নাম্নী এক কুমারীকে অঙ্কশায়িনী করিয়া নূতন রাজবংশের সূচনা করিয়াছিলেন।

প্রথম সংঘর্ষের বিস্ফুরিত অগ্ন্যুদ্গার নিভিয়া যাইবার পর বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে বিদ্বেষ-ভাব হ্রাস পাইতে লাগিল। উগ্র হূণ প্রকৃতি পারিপার্শ্বিক প্রভাবের ফলে শান্ত হইয়া আসিল। সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবর্তন হইল স্বয়ং মহারাজ রোট্টের। ধারা দেবীর কোমল এবং সহিষ্ণু অন্তরে না জানি কোন অপরিমেয় শক্তি ছিল, তিনি এই দুর্ধর্ষ বর্বরকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিলেন। রোট্ট ক্রমশঃ বুদ্ধের করুণাবাণীর শরণাপন্ন হইলেন, তাঁহার নামের পশ্চাতে ধর্মাদিত্য উপাধি যোজিত হইল। কপোত-কূটের যে চৈত্য হূণদের প্রথম আগমনে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা পুনর্গঠিত হইল।

রোট্ট ধর্মাধিত্যের রাজত্বকালের সপ্তমবর্ষে মহাদেবী ধারা একটি কন্যা প্রসব করিয়া চিরদিনের জন্য তাঁহার পরম সহিষ্ণু কোমল চক্ষুদুটি মুদিত করিলেন। কিন্তু রোট্ট আর নূতন মহাদেবী গ্রহণ করিলেন না—একটিমাত্র কন্যার নাম রাখিলেন রট্টা যশোধরা।

প্রথম হূণ অভিযানের পর শতাব্দীর একপাদ ক্ষয় হইয়া গেল — ওদিকে স্কন্দগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পর সম্রাট হইয়াছেন। সাম্রাজ্যের চতুঃসীমা ঘিরিয়া বিদ্রোহ এবং অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে; ধীরে ধীরে মগধকে কেন্দ্র করিয়া বহ্নিচক্র অগ্রসর হইতেছে। রাজ্যের অভ্যন্তরের ও পুষ্যমিত্রীয়গণ গোপনে মাৎস্যন্যায় ও চক্রান্তের বিষ ছড়াইতেছে। এই বিষবহ্নির মধ্যে স্কন্দ ক্লান্তিহীন নিদ্রাহীনভাবে যুদ্ধ করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার বিপুল বাহিনী কখনও লৌহিত্যের উপকূলে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহীর অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছে, আবার পরদণ্ডেই সেতুবন্ধ অভিমুখে যাত্রা করিয়া শান্তি-সেতু বন্ধনের প্রয়াস পাইতেছে। বর্ষান্তে মহারাজ তাঁহার মহাস্থানীয়ে পদার্পণ করিবার অবকাশ পান না। সচিবগণ পাটলিপুত্রে থাকিয়া যথাসাধ্য রাজকার্য চালাইতেছেন।

সাম্রাজ্যব্যাপী এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাজকার্য যে সুচারুরূপে চলিতেছিল না তাহা বলা বাহুল্য। ভূমিকম্পে যখন মাথার উপর গৃহ ভাঙিয়া পড়িতেছে তখন গৃহকোণে রক্ষিত ক্ষুদ্র তৈজস কেহ লক্ষ্য করে না। তুচ্ছ বিটঙ্ক রাজ্যের কথা পাটলিপুত্রের সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল; পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কেহ তাহার খোঁজ লয় নাই।

রাজ্যের প্রাচীন পুস্তপাল মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে এক নবীন কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবীনতার উদ্যমে তিনি একদিন অক্ষপটল-গৃহের পুরাতন নিবন্ধ পুস্তকাদি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিটঙ্ক রাজ্যের নাম আবিষ্কার করিলেন। পঁচিশ বৎসর এই রাজ্য হইতে রাজস্ব আসে নাই। রাজ্যটা গেল কোথায়?

বহু নথিপত্র অনুসন্ধানের পর প্রকৃত তথ্য জানা গেল। চিন্তান্বিত নবীন পুস্তপাল মহাশয় দুঃসংবাদটা মহামন্ত্রীর কানে তুলিলেন।

স্কন্দ তখন পাটলিপুত্রে উপস্থিত। সুদূর কেরল দেশে যুদ্ধ করিতে করিতে একটা গুরুতর দুর্যোগের জনশ্রুতি শুনিয়া তিনি ত্বরিতে রাজধানী ফিরিয়াছেন। আবার নাকি হূণ আসিতেছে; লক্ষ লক্ষ শ্বেত হূণ বক্ষু নদী পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। দুইজন চৈনিক শ্রমণ এই সংবাদ লইয়া কপিশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেখান হইতে রাজদূত দিবারাত্র অশ্বচালনা করিয়া স্কন্দের নিকট বার্তা আনিয়াছে। কেবল যুদ্ধের ভার কয়েকজন প্রাচীন সেনাপতির উপর অর্পণ করিয়া স্কন্দ পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

মহামন্ত্রী বিটঙ্ক রাজ্যের সংবাদ লইয়া রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন,—'একটা বড় ভুল হইয়াছে। বিটঙ্ক নামক পঞ্চনদ প্রদেশের একটা রাজ্য আমাদের হিসাব হইতে হারাইয়া গিয়াছিল। দেখা যাইতেছে হূণেরা সেটা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পঁচিশ বৎসর তাহারা রাজস্ব দেয় নাই।'

স্কন্দ তখন প্রাসাদের এক বিশ্রাম কক্ষে একাকী ছিলেন, মণি কুট্টিমের উপর বসিয়া অক্ষবাটের সম্মুখে পাশা ফেলিতেছিলেন, মন্ত্রীর কথায় স্বপ্নাতুর চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। স্কন্দের বয়ঃক্রম এই সময় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু বলদৃপ্ত দেহে কোথাও জরার চিহ্নমাত্র নাই; রমণীর ন্যায় কোমল চক্ষু দুটি যেন সর্বদাই স্বপ্ন দেখিতেছে। তাঁহার সুঠাম দেহ ও লাবণ্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহাকে পরাক্রান্ত যোদ্ধা বলিয়া মনে হয় না, কবি ও ভাবুক বলিয়া ভ্রম হয়।

স্কন্দ দুই হাতে পাশা ঘষিতে ঘষিতে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—'পাশা বলিতেছে এবার হূণকে তাড়াইতে পারিব না। তিনবার পাশা ফেলিলাম, তিনবারই পাশা ঐ কথা

॥লিল। গুপ্ত সাম্রাজ্য টলিতেছে, ভাঙিয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই।'—তারপর চকিতে সচেতন হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন—'আসন গ্রহণ করুন আর্য।'

মহাসচিব পৃথিবীসেন রাজার সম্মুখস্থ আসনে বসিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, শুষ্ক দেহ বংশযষ্টির ন্যায় ঋজু ও গ্রন্থিযুক্ত; ইনি একাধারে এই বৃহৎ রাজ্যের মহাসচিব ও মহাবলাধিকৃত; স্কন্দের পিতা কুমারগুপ্তের সময় হইতে অনন্যমনে রাজ্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

পৃথিবী সেন নীরসকণ্ঠে বলিলেন,—'কবি কালিদাস একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন—পাশার ভবিষ্যদ্বাণী, মদ্যপের প্রতিজ্ঞা ও শত্রুর হাসি যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা বিচারমূঢ়।—হায় কালিদাস!' দীর্ঘশ্বাস মোচনপূর্বক স্বর্গত কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া মন্ত্রী কহিলেন,—'এখন এই বিটঙ্ক রাজ্যটা লইয়া কি করা যায়?'

ঈষৎ হাসিয়া স্কন্দ বলিলেন,—'রাজ্যটা হারাইয়া গিয়াছিল? বিচিত্র নয়। কেরল যুদ্ধে আমার অঙ্গুরীয় হইতে একটি নীলকান্ত মণি কখন খসিয়া গিয়াছিল জানিতে পারি নাই। আজ প্রথম লক্ষ্য করিলাম। এই দেখুন।' বলিয়া অঙ্গুরীয় দেখাইলেন।

অতঃপর রাজা ও মন্ত্রী মিলিয়া দীর্ঘকাল মন্ত্রণা করিলেন। বিটঙ্ক রাজ্য অবশ্য তাঁহাদের চিন্তার অতি ক্ষুদ্রাংশই অধিকার করিল। অবশেষে স্থির হইল যে হূণ যখন আবার আসিতেছে তখন চতুরঙ্গ বাহিনী লইয়া স্কন্দ তাহাদের আগম-পথ রোধ করিবার জন্য এক মাসের মধ্যে পুরুষপুর যাত্রা করিবেন। উপরন্তু পঞ্চনদ প্রদেশে যত সামন্ত রাজা আছেন সকলের নিকট অচিরাৎ দূত প্রেরিত হইবে, যাহাতে এই সম্মিলিত সামন্তচক্র হূণদের বিরুদ্ধে ব্যূহরচনা করিয়া স্বরাজ্য রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকেন। বিটঙ্ক রাজ্যেও মগধের দূত যাইবে; তত্রত্য হূণ রাজাকে মগধের আনুগত্য স্বীকার করিবার আদেশ প্রেরিত হইবে। হূণ যদি স্বীকৃত না হয় তখন স্কন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

সচিব রাজ সন্নিধান হইতে বিদায় লইবার কিয়ৎকাল পরে বিদূষক পিপ্পলী মিশ্র আসিয়া দেখা দিলেন। অতি স্থূলকায় ব্রাহ্মণ, হস্তে একটি বৃহৎ কুষ্মাণ্ড। রাজা দেখিয়া বলিলেন,—'পিপুল, একি! কুষ্মাণ্ড কেন?'

কুষ্মাণ্ড মহারাজের পদপ্রান্তে রাখিয়া বিদূষক মন্ত্রীর পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—'মহারাজ, রিক্তপাণি হইয়া রাজ সমীপে আসিতে নাই, ইহাই শিষ্ট নীতি।'

রাজা বলিলেন,—'ঠিকই হইয়াছে, তোমার বুদ্ধি ও কলেবর দুই-ই কুষ্মাণ্ডবৎ। এটি কোথায় সংগ্রহ করিলে?'

পিপ্পলী বলিলেন, চালে ফলিয়াছিল। ব্রাহ্মণীকে অনেক স্তোক দিয়া বয়স্যের জন্য আনিয়াছি।

'ব্রাহ্মণীকে কী স্তোক দিয়াছ?'

'বয়স্য, ব্রাহ্মণীর একটি অকাল কুষ্মাণ্ড ভ্রাতুষ্পুত্র আছে, তাহার বড়ই দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা। এখন মহারাজ যদি তাহাকে কোনও দূর দেশে দূতরূপে প্রেরণ করেন তবেই তাহার সাধ পূর্ণ হয়। আমি মহারাজের নিকট নিবেদন করিব এই স্তোক দিয়া গৃহিণীর কুষ্মাণ্ডটি হস্তগত করিয়াছি।'

রাজা সহাস্যে বলিলেন,—'ধন্য পিপুল, তোমার বয়স্য-প্রীতি অতুলনীয়। তাহাই হইবে; তোমার ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেশ ভ্রমণে পাঠাইব। এখন এই কুষ্মাণ্ড রন্ধনশালায় প্রেরণ কর।'

কুষ্মাণ্ড স্থানান্তরিত হইলে স্কন্দ বলিলেন,—'পিপুল, এস পাশা খেলি। আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিব। তুমি যদি আমাকে পরাজিত করিতে পার, বুঝিব নিয়তির বিধান অলঙ্ঘনীয়।'

পিপ্পলী মিশ্র বলিলেন,—'বয়স্য, পরাজিত করিতে পারি বা না পারি, নিয়তির বিধান চিরদিনই অলঙ্ঘনীয়। কারণ নিয়তি স্ত্রীজাতি।'

'দেখা যাক' বলিয়া স্কন্দ পাশা ফেলিলেন। ইহা আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার প্রায় তিন মাস পূর্বের ঘটনা। (ক্রমশঃ)

যুদ্ধোত্তর বার্লিনে এক সপ্তাহ

ডক্টর সুবোধ মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ড্যালেরণের ওখানে সান্ধ্য ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। খাবার পর ডালেরণ পরিবারের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল। মিঃ
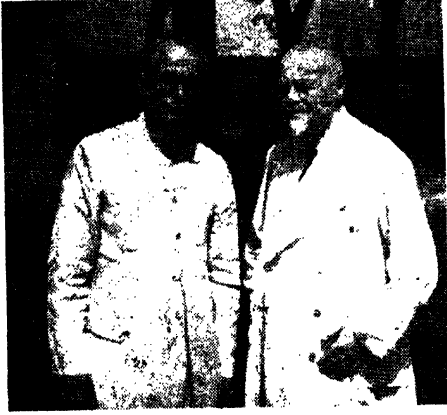
প্রফেসর ডক্টর ষ্টিকেল (বার্লিন) ও ডক্টর সুবোধ মিত্র

ডালেরণ যুদ্ধের বেশীর ভাগ সময়েই রাশিয়ান ফ্রণ্টে কাটিয়েছিলেন। জার্ম্মানীর সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। অকপটে স্বীকার করলেন যে

হের ফন্ ডালেরণ পরিবার

জার্ম্মানীতে ইহুদীদের উপর একটু বেশী মাত্রায়ই অত্যাচার করা হয়েছিল, যদিও ইহুদীপ্রীতি এঁর এবং অন্যান্য জার্ম্মানদের একটুও নেই। এঁদের মতে হিট্‌লার ইহুদীদের নৃশংসভাবে না মেরে ফেলে শুধু জার্ম্মানী থেকে তাড়িয়ে দিলেই ভাল কর্ত্তেন। হিট্‌লারের উপর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এখনও বেশ বর্ত্তমান। ফুয়ার সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে গলার স্বর বেশ নরম হ'য়ে আসে।

মিঃ ডালেরণ বললেন: "যুদ্ধে হারজিত আছেই; আমরাও ত' জিত্‌তে পার্‌তাম। আজ আমরা হেরেছি, আজ আমরা সর্ব্বহারা।

লুবলিং ক্যাম্পে জার্মানদের কীর্তি

(অর্ধমৃতদের গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হইতেছে)

এর উপযুক্ত শাস্তি আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি এবং যতদিন প্রয়োজন হয় নেব। এ শাস্তি আমাদের প্রাপ্য, কেননা আজ আমরা পরাজিত। এর জন্য যে হিট্‌লারই দোষী তা নয়, এ আমাদের ভাগ্য। আজ রাশিয়াও ত' হেরে যেতে পারত।"

কিছুক্ষণ পরে মিঃ ডালেরণ আবার বললেন "আজ আমাদের যা অবস্থা হয়েছে, তাতে আমরা সব সহ্য কত্তে পারি। কিন্তু রাশিয়ানদের অত্যাচার আমাদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিচ্ছে; এ অত্যাচারের যে শেষ কোথায় তাও জানি না।"

কথায় কথায় ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কথা উঠ্‌ল; মিঃ ডালেরণ স্থির কণ্ঠে বল্‌লেন: "যদি রাশিয়ানদের অত্যাচার এই ভাবে চলে—তা হ'লে যুদ্ধ নিশ্চিত। অবশ্য যুদ্ধ হবে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার; জার্ম্মানরা সেদিন মরিয়া হ'য়ে লড়বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শুধু তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য। যে ভাবে আজ তারা বাস করছে এ ভাবে আর বেশীদিন চল্‌লে রাশিয়ার নির্ম্মম অত্যাচারে তাদের বেঁচে থাকাই সমস্যাজনক হয়ে উঠ্‌বে। হয় তৃতীয় যুদ্ধ অনিবার্য্য, আর তা না হ'লে সমস্ত জার্ম্মানী তথা সমস্ত ইউরোপকে কম্যুনিষ্ট হ'তে হবে।"

এতক্ষণ মিঃ ডালেরণ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। এইবার একটু দম নিয়ে আবার বল্‌তে আরম্ভ করলেন: "আপনারা ইহুদীদের উপর অত্যাচারের কথা শুনে আমাদের খুবই ঘৃণা করেন সত্য এবং আমরাও আমাদের কৃতকার্য্যের জন্য সত্যিই ঘৃণার পাত্র। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে ঝোঁকের মাথায় হিট্‌লার খুব অন্যায় কাজই করেছিলেন এবং তার জন্য আমরা সকলেই দায়ী; কিন্তু আমাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার খবর রাখেন কি আপনারা? যে অনুপাতে ইহুদীরা জার্ম্মানীতে অত্যাচারিত হয়েছিল, তার বহুগুণ সংখ্যায় এবং কঠোরতায় পোলাণ্ডের জার্ম্মানরা বিধ্বস্ত হয়েছে; জেকোস্লোভাকিয়ায়, হাঙ্গারীতে এবং যুগোস্লাভায় জার্ম্মানদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে।"

বার্লিনের একটী বিখ্যাত অংশ (Hallesches Tor) (যুদ্ধ-পূর্ব্ব অবস্থা)

বার্লিনের একটি বিখ্যাত অংশ (Hallesches Tor) (যুদ্ধোত্তর অবস্থা)

মিঃ ডালেরণ অবশেষে বললেন: "কিন্তু এসব ভেবে আর কি হবে? আমি জীবনটাকে realistic ভাবেই নিই। যতদিন বেঁচে আছি, আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাব; তারপর যা হয় হোক; সবই মাথা পেতে সহ্য করে যাব।"

* * *

মিসেস্ ডালেরণ এক প্রকার চুপ করেইছিলেন এতক্ষণ। এইবার বল্‌লেন: দেখুন, আমার জীবনে আর কোনই optimism নেই। জীবনের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তারপর আর কিছুই প্রত্যাশা করি না। সবই ত' ছিল, আজ কিছুই নেই। আবার যদি সুযোগ ও সুবিধা হয় তাহ'লেও আর ঘর সাজাবার স্পৃহা নেই। মিসেস্ ডালেরণ শুধু নন্—বেশীর ভাগ জার্ম্মান মেয়েদের ভিতর এই রকম একটা অস্বাভাবিক নৈরাশ্য, একটা নিদারুণ ব্যর্থতা দেখতে পাওয়া যায়। এদের ভেতর এমন কেউই নেই যে স্বামী, পুত্র অথবা নিকটতম

আত্মীয় হারায় নি ; তারপর যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সঙ্কটে এদের জীবন আরও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তাই এই স্বামীপুত্রহারার দল এমন একটা সর্ব্বহারার পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। জীবনের আশা ভরসা এবং মাধুর্য্য এদের কাছে অবাঞ্ছিত হ'য়ে পড়েছে।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্ম্মানীতে এমন একটা সময় এসেছিল যখন আহার্য্য, পরিধেয় এবং বসতবাটীর অকুলন চরম অবস্থায় পৌঁচেছিল। টাকার দাম কমে যাওয়ায় কালো বাজারে টাকা দিয়ে জিনিষ কেনা যেত না ; জিনিষের পরিবর্ত্তে জিনিষ পাওয়া যেত। এই সব জিনিষের ভেতর সিগারেটই ছিল সবচেয়ে ঈপ্সিত জিনিষ। আহার্য্য থেকে আরম্ভ করে এ হেন জিনিষ ছিল না যা সিগারেটের পরিবর্ত্তে না পাওয়া যেত। বাড়ীতে সোনা রূপার জিনিষ যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, যথাসর্ব্বস্ব এমন কি কার্পেট পর্য্যন্ত দিয়ে সকলে সিগারেট সংগ্রহ করতো। এই সিগারেট

প্রাচীন বার্লিনের একটি রাস্তা

(Petri Street)

(যুদ্ধ-পূর্ব্ব অবস্থা)

প্রাচীন বার্লিনের একটি রাস্তা

(Petri Street)

(যুদ্ধোত্তর অবস্থা)

বিশ্ববিখ্যাত প্রফেসররা একজোড়া পুরাণো জুতা, একটা পুরোণো সোয়েটার এবং কিছু খাবার চর্ব্বির জন্য আমাদের কাছে কত কাকুতি মিনতি করে লিখেছিলেন। জার্ম্মান টাকার দাম খুবই কমে গিয়েছিল। কালোবাজার পুরাদমে আরম্ভ হ'য়েছিল। এই সময় বার্লিনে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে।

সংগ্রহ করতো ধূমপানের জন্য নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য ! এক একটা সিগারেটের পরিবর্ত্তে চর্ব্বি, মাংস, আলু সবই পাওয়া যেত। এক সপ্তাহ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সাধারণ লোকে যে অর্থ উপার্জ্জন করত, তার মূল্য এক প্যাকেট সিগারেটের চেয়েও কম। এই সিগারেট-পাগলামী এত বেড়ে উঠেছিল যে আমেরিকান টমিরা

সিগারেটের বদলে যা চাইত তাইই পেত। বর্ত্তমানে অবশ্য আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত জার্ম্মান টাকা হওয়ায় এবং সিগারেটের প্রচুর আমদানী হওয়ায় এই অস্বাভাবিক অবস্থা আর নেই।

খুবই আকস্মিক ভাবে আমার একজন পুরাতন জার্ম্মান বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁর ঠিকানা আমার জানা ছিল না। একটি বইয়ের দোকানের মালিককে একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার বন্ধুর কথা বলেছিলাম; তিনিই সন্ধান দিলেন যে আমার বন্ধু বোধহয় রাজস্ব বিভাগে কাজ করেন। ইনি এখন বার্লিনের অর্থনৈতিক বিভাগের একজন ডিরেক্টর। প্রথম যুদ্ধে একজন অফিসার ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধে যোগদান করেন নি; এমন কি তিনি হিটলারের নাৎসি পার্টিভুক্তও ছিলেন না। এঁর মত সুপণ্ডিত দেব-চরিত্র জার্ম্মান খুব কমই দেখেছি। জীবনের উপর দিয়ে তাঁর বহু ঝড় বয়ে গেছে; আঘাতের পর আঘাত পেয়ে যেন খাঁটী সোনা হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর প্রথম অনুযোগ হ'ল কেন আমি তাঁর চার পাঁচখানা চিঠির উত্তর দিই নি? কিন্তু যখন শুনলেন যে তাঁর একখানা চিঠিও আমার হস্তগত হয় নি তখন বললেন—খুব সম্ভবতঃ জার্ম্মান মিলিটারী অফিস চিঠিগুলো নষ্ট করে ফেলেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম: "ওই শক্তিমান নাৎসি পার্টির ভেতর কী করে তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলে?"

লুবলিং Concentration Campএ জার্মানদের কীর্তি—হাজার হাজার নরনারী ও শিশুর কঙ্কাল

বললেন: "সে আর জিজ্ঞাসা কোরনা। বেঁচে আছি সেইটাই আশ্চর্য্য। এমন দিন ছিল না যেদিন কোন-না-কোন ভাবে নির্য্যাতিত না-হয়েছি। বোধহয় আমার দায়িত্বপূর্ণ কাজই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিল। অবশ্য নাৎসি পার্টিভুক্ত নয় এরূপ লোকের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না; তাদের অনেককেই 'ডেশাও' কিংবা 'লুবলিং'এর Concentration Campএ জীবনপাত করতে হয়েছে। উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর এবং পত্রিকা সম্পাদক কেউই বাদ পড়েন নি।"

হাঁসপাতালের কাজ ছাড়া অবশিষ্ট সময়ের বেশীর ভাগটাই এই বন্ধুর সঙ্গে কেটে যেত। কোনও লৌকিকতার বালাই ছিল না। খোলাখুলি-ভাবে হিটলারের নাৎসি জার্ম্মানীর আলোচনাই হ'ত বেশী। বলতেন: "হিটলারের সময় জার্ম্মানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়েছিল বটে, কিন্তু সাধারণের স্বোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবার উপায় ছিল না। সর্ব্বদাই একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় দিন কাটাতে হ'ত। কখন এবং কি কারণে যে ডাক পড়বে তা কারুরই জানা নেই। ভোর রাত্রে দরজায় ধাক্কা পড়ল, বোঝা গেল ডাক এসেছে, না বলবার উপায় নেই; সেই সময়ই স্ত্রী-পুত্রের নিকট থেকে চিরবিদায় নিয়ে যেতে হবে, কারণ—হয়ত বা আর ফিরবে না।"

"আজ আমরা রাশিয়ার অত্যাচারের জন্য অভিযোগ কচ্ছি, কিন্তু এই অত্যাচারের নমুনা ত নাৎসিরাই দেখিয়েছে।"

এ বিষয় কোনই সন্দেহ নেই। কী ভাবে যে এই নাৎসি জার্ম্মানী ইহুদী এবং বিপক্ষ দলের উপর নৃশংস ভাবে অত্যাচার করেছে তা ধারণারও অতীত। 'ডাশাও' এবং লুবলিং' ক্যাম্পে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুরা পীঁপড়ের মত মরেছে। লুবলিং ক্যাম্পের অত্যাচার আরও ভীষণ ছিল; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই একই পথের পথিক হ'তে হয়েছিল—অনশন, অনিদ্রা, নৃশংস প্রহার, গ্যাস ঘরে ঢুকিয়ে হত্যা, অর্দ্ধমৃতদের উঁচু স্থান থেকে গভীর খাদে নিক্ষেপ, সবই অতি সুচারুভাবে জার্ম্মান দক্ষতার সঙ্গেই করা হয়েছিল। মানুষ যখন ধাপে ধাপে নীচের দিকে নামতে আরম্ভ করে তখন কত নীচ যে হ'তে পারে তা কল্পনাতীত।

ব্রিটিশ ও আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত জার্ম্মানীর অংশ আজ শাপমুক্ত; তারা সর্ব্বহারা হ'লেও আজ স্বোয়াস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পাচ্ছে; রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পাচ্ছে এবং মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকবার সবচেয়ে যে বড় জিনিষ সেই সহজ ও স্বাভাবিক চিন্তাধারার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। অদ্ভুত এই জাতটার কর্ম্মপ্রেরণা এবং কর্ম্মশক্তি। এই অল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংস স্তূপের ভেতর থেকে এক্সরের যন্ত্র, মাইক্রসকোপ, ক্যামেরা, ওষুধ এবং অন্যান্য যে সব বৈজ্ঞানিক জিনিষ-পত্র তৈরী করেছে তা একমাত্র এই জার্ম্মান জাতির পক্ষেই সম্ভব।

ভদ্রাচলামের ক্যাম্প

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

(শিকার-কাহিনী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মতলব খুঁজছিলাম কি ভাবে শিকারে বসা যায়। একটি নকল ঝোপ করলে তার ভিতর কতকটা আত্মগোপন করা চলে—কিন্তু ঝাওড়া গাছ এত বেঁটে যে স্বাভাবিক গঠন বজায় রাখতে হলে মাটিতে গর্ত্ত করতে হয়—তাতেও অসুবিধার কিছু নেই—কিন্তু গুলি খেয়েও যদি বাঘ আড়ালের উপর লাফিয়ে পড়ে তাহলে রিপোর্ট লেখার সুবিধা পাওয়া যাবে না। একমাত্র উপায় মোটা বাঁশের খাঁচা করে—ঝাওড়া গাছ আড়াল দিলে সব দিক রক্ষা হয়।

সিদ্ধান্ত কাছে আসতেই হুকুম বেরিয়ে গেল। মাচানের মাল-পত্র যোগাড় হতে সময় লাগল না। মড়া আগলাবার লোকগুলি এক জায়গায় বসে আছে, এখুনি বেরিয়ে পড়া ভাল।

বাঘের আনা-গোনার পথ জানতাম, মওড়ার দিকে বন্দুকের নল বার করার ব্যবস্থা করে—খাঁচা তৈরী হয়ে গেল। ছেলেটার যেটুকু অংশ পড়েছিল তাই ইস্পাতের তার (flexible steel wire) দিয়ে একত্রিত করে ঝোপের গোড়ার সঙ্গে কষে বাঁধিয়ে দিলাম। কঠিন দড়ির প্রয়োজন ছিল, কারণ বেশীর ভাগ সময়ে দেখেছি, সামান্য সন্দেহের কারণ থাকলে—নির্ব্বিঘ্ন হবার জন্য বাঘ খাওয়া-শিকারকেও ধরেই লাফ মারে—এবং ভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে খায়।

রোদ পড়তে দেরী নেই—লোকজনদের বিদায় করে দিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সরঞ্জাম গুছানর কাজ দ্রুত সেরে ফেলে, সর্ব্ব প্রথম, বাঁ দিকের বুক পকেটে পিস্তল পুরে দিলাম। মুহূর্ত্তে বের করে ফেলার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। মাটিতে বসলে সব সময় বাড়তি সাবধানতার গা ঘেঁসে থাকা আমার অভ্যাস।

অল্পক্ষণের ভিতরই আবেষ্টনী নিঝুম মেরে আসতে লাগল। গোধুলীর শেষ আলোয় বালি মাটি সোনা হয়ে গিয়েছে। নিরিবিলিতে ঝোপের আশে পাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক সুরু হয়েছে—তার সঙ্গে কুয়াসার পর্দ্দা ঘন হয়ে উঠছে। দিনের আলো শেষ হতেই অন্ধকার যেন তেড়ে এল আমাকে ঘিরে ফেলার জন্য। ঘের ভাল ভাবেই পড়ল। ঝোপের ভিতর নিজের হাত পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ঠিক এই সময় দূরে ফেউএর ডাক শুনলাম। যে দিক থেকে বাঘের আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম সেই দিক থেকেই রাজদূতের ঘোষণা আসছিল।

ক্রমান্বয়ে বিপদ সঙ্কেত কাছে এসে পড়ল,—খুবই কাছে। উত্তেজনা চরমে উঠে গিয়েছে তার সঙ্গে হৃদস্পন্দন। টর্চ সংযুক্ত রাইফেল প্রস্তুত, ছেলেটার কাছ থেকে একটা কোন চেনা শব্দ শুনলেই অস্ত্র কাঁধে তুলে নি। অপর দিকে ফেউএর ডাক, আর এগুতে চায় না। একই জায়গা থেকে করুণ রব তুলে চলেছে। ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল। প্রায় আধঘণ্টা সময় এইভাবে কেটে গেল। নতুন ঘটনার কোন সূত্রপাত নেই।

ফেউএর ডাক হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল—তারপর আওয়াজ আসতে লাগল আমার ক্যাম্পের দিক থেকে। বাঘ তা হলে আমাদের চালাকি ধরে ফেলেছে—ক্যাম্পের দিকেই রওনা হয়েছে—কে জানে আজ আবার কাকে নেবে।

ঘণ্টা দেড়েক সময় পার হয়ে গেল—একই ভাবে বসে আছি, পায়ে ঝিনঝিনি ধরে গিয়েছে, সিগারেটের জন্য প্রাণ আনচান, শেষ পর্য্যন্ত দুত্তোর বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। ভাবলাম আশাকে বাড়ন্তের দিকে এগিয়ে দিয়ে ঝকমারি পোহানয় কোন লাভ নেই। বাঘ আর ফিরছে না—একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়া যাক। বন্দুক বগল থেকে নামাতেই বাঁট কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষণে খটাং করে আওয়াজ হল। পা দুটোকে আরাম দেবার চেষ্টায়—নড়ে বসতে গিয়ে—জলপাত্রকে (flask) উল্টে ছিলাম প্রায়। কি ভাবে তা সামলে ছিলাম মনে নেই। মোট কথা মৃৎ গহ্বরের মাচানে যেটুকু শব্দ হল তাকে জমাট নিস্তব্ধতার মাঝে হৈ-চৈ বলা চলে। সিগারেট বার করে দিয়াশলাই জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার উঠল, পর মুহূর্ত্তে, আমার মাচানের উপর যেন পাহাড় ধসে পড়ল। পায়ের তলায় দিয়াশালাইএর বাক্স চাপা পড়লে যে অবস্থা হয় মাচান সেইভাবে মড় মড় করে চেপটে গেল। ছাউনী মাথায় না ঠেকলেও সামনের বেড়া প্রায় গায়ের উপর ঝুঁকে পড়েছে, বাঘের মুখ ঠিক আমার মুখের সামনে, ভয়াল ক্রোধ প্রকাশ কালীন—বিকট গন্ধযুক্ত মুখের লালা আমার কপাল, চোখ, নাক, কানের উপর ছড়িয়ে পড়ছে। এই সময় যে কয়টা গলা খাকরানি শুনেছিলাম তার বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। আমার তৎকালীন মনোভাব বুঝতে হলে অভিজ্ঞতাটি নিজে সংগ্রহ করে নিতে হয়।

ঐটুকু সময়ের ভিতর, কিভাবে পিস্তল বার করেছিলাম, কিভাবে ঘোড়া টিপেছিলাম, কোন দিকে নল ছিল কিছুই মনে নেই। এইটুকু বলতে পারি পিস্তল ছুটেছিল। পিস্তলের আওয়াজে আশ্রয়ের সাড়া পেলাম—নিজেকে খোঁজার সুবিধা যুটল। ঘটনার আলোড়নে—ক্ষণিকের জন্য বেহুঁসের মত হয়ে গিয়েছিলাম।

পিস্তল ছোটার পর—অনেকটা সময় কেটে গেল। অতি সন্তর্পণে বন্দুকের বাঁট খুঁজতে লাগলাম, বহু কষ্টে ছোঁয়া পেলাম কিন্তু কাছে আনার উপায় নেই, কিসের বাধায় আটক পড়েছে—টানাটানি করতে

গেলে নতুন শব্দে আবার কি ঘটবে তার ঠিক নেই। অস্ত্রটিকে বাতিলের মধ্যে ফেলে দিলাম।

পলে পলে সময় কেটে যেতে লাগল—যে কোন সময় আহত শার্দ্দুলের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছি। গুলি খেয়ে মাচানের সামনেই পড়ে আছে কিনা জানবার উপায় নেই। অন্ধকার, দূর ও কাছের কোন পার্থক্য রাখে নি। ঠায় জেগে রাত কেটে গেল।

ফরসা হতেই ঝোপের ফাঁক দিয়ে চার ধার দেখে নিলাম, কোথাও বাঘকে দেখতে পাওয়া গেল না। মাচানের অবস্থা আমাকে বিস্মিত করে দিল—ভাবতে লাগলাম,—বেঁচে গেলাম কেমন করে। বন্দুক রাখার গর্ত্তটি হাত দুই ফাঁক হয়ে গিয়েছে—অস্ত্রটির নল ব্যবহারে বাতিল হয়ে গিয়েছে—তার উপর এসে পড়েছে মাচানের ছাউনী। বাহিরে আসার পথও বন্ধ। মাটিতে গলা পর্য্যন্ত গর্ত্ত না থাকলে বাঘের ওজনসহ মাচানের চাপেই দম বন্ধ হয়ে মারা পড়তাম।

ক্যাম্প থেকে লোকজন আসার অপেক্ষায় বসে রইলাম। রদ্দুর উঠতে জনতার কোলাহল শোনা গেল। ওরা নিকটে আসতে বুঝলাম আর্দ্দালী দুঃসাহসিক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগুয়ান হয়ে আছে—জোর হুকুম চলেছে—ইধর নেহি উধার, লে জলদি চলো,—কুছ ডর নেহী, আগে চলো—আরো কত কি কথা। মানুষের কলরবের সঙ্গে গো জাতীয় জন্তুর ক্ষুরধ্বনিও শুনলাম। নিশ্চয় মোষ, আর্দ্দালীর বডিগার্ড (body guard) লোকেদের চেষ্টায় স্বখাত কবর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ছেলেটার মুখ ফুলে উঠেছে, আজ রাত থেকেই পচতে আরম্ভ করবে। অন্য জায়গায় সুবিধা মতন মাচান করে, গলিত মাংসকে শিকারের টোপ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না। যে ভাবেই বাঁধা যাক, গলা মাংসের উপর সামান্য টান পড়লেই হাড় খুলে যাবে।

বাঘ কি ভাবে এসেছিল দেখবার জন্য কুতুহলী হয়েছিলাম। জায়গাটা পরীক্ষা না করে পারলাম না। দুচার কদম ঘুরতেই দেখি, বহুবার আমার মাচান প্রদক্ষিণ করেছিল। সন্দেহ গাঢ় হয়ে উঠলেও শেষ পর্য্যন্ত লোভ সামলাতে পারে নি। যে সময় ছেলেটার কাছে এসে পড়েছিল সেই সময় আমার মাচানে নানা রকম শব্দ হয়। একে আহারে বিঘ্ন, তার উপর মানুষের তৈরী সন্দেহজনক শব্দে বাঘ আমার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। আক্রমণের চরম কারণ ঘটল দিয়াশালাইএর আলোয়।

আমার স্নায়ু একটু কড়া ধরণের। রাত্রের ঘটনার পরেও শিকারের সখ বা কর্ত্তব্যকে বাতিল করতে পারি নি। নানা ফন্দি মাথায় ঘুরতে লাগল। এই সময় আর্দ্দালী এসে আমার সামনে দাঁড়াল, প্রার্থনা, লম্বা ছুটি চাই, ছেলের ভারী অসুখ। খবর এসেছে চিঠিতে। একটি পোষ্ট কার্ড আমার সামনে ধরে দিল—হরফ তার ফার্সি। কার্ডের খবর না পড়তে পারলেও ডাকের তারিখ দেখলাম গত মাসের, বললাম—চিঠির বয়স যে এক মাসের কাছাকাছি। অকাট্য নথী বেফাঁস হয়ে যায় দেখে অম্লান বদনে বলে বসল,—এতদিনে বাড়াবাড়ি হয়ে থাকবে। লোকটার কথায় কান না দিয়ে আহারে মন দিলাম। সকালের খানা আর্দ্দালীই নিয়ে এসেছিল। আমার বৃহত্তর কর্ত্তব্যে বিঘ্ন ঘটাতে আর সাহস পেল না।

তিনদিন কেটে গেল কোন খবর নেই। ক্যাম্প তোলার আদেশ দিয়ে দিলাম। সদর আপিস এখান থেকে একত্রিশ মাইল। একদিনে এতটা পথ হেঁটে পাড়ী দেয়া সম্ভব নয়, মাঝ পথে ষ্টেশনের কাছেই তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল। ষ্টেসনও এখান থেকে কম হলেও পনের মাইল হবে।

ব্রেক ফাষ্টের পরেই বেরিয়ে পড়া গেল। গন্তব্য স্থানে যখন এসে পৌঁছালাম, তখন বেলা দুপুর।

আমাদের তাঁবু খাড়া করার ব্যবস্থা চলেছে, ঘোড়াটাকে বটের ছায়ায় বেঁধে আমিও ক্যাম্প চেয়ারে বসে বিশ্রাম করছিলাম। আমার পিছনেই খানিকটা জঙ্গলের মত। জঙ্গল একেবারে ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের গা ঘেঁসা। ঘোড়াটা থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। কখন ক্ষুর দিয়ে মাটি উপড়ে ফেলে, কখন ডাক দিয়ে ওঠে, কখন বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার পথ খুঁজতে থাকে। কিছু না হোক লেপার্ড এসে আমার বাহনটিকে জখম করে দিলেই তো চমৎকার। আর্দ্দালীকে বললাম, ঘোড়াটাকে জঙ্গলের ধারে না রেখে লোকজনের কাছে বেঁধে দাও। আর্দ্দালী খানিকটা পথ এগিয়েই—এমন ভাবে ফিরে এল যাতে মনে হয় ওর ওপরই বাঘ লাফিয়ে পড়তে চেয়েছিল। বাস্তবিকই সে ভয়ে বাক্যহীন হয়ে গিয়েছিল। কয়েক দিন ধরে ওর ব্যবহার দেখছি, ভয়ের ন্যাকামি অসহ্য হয়ে উঠেছে। কোন কথা না শুনে ধমক দিয়েই বললাম—ঘোড়া এদিকে নিয়ে এস—সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু গাড়ার কুলীরা চেঁচিয়ে উঠল পুলী, পুলী (বাঘ)। আর্দ্দালী তখন একেবারে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে অফিসিয়াল সব কেতা চুরমার করে। ঘোড়ার জীনে লাগান চামড়ার খাপে ম্যাগাজীন রাইফেল ঢোকান ছিল। পায়ের তলাতেই তখনো সেটা পড়ে। অস্ত্র বার করে নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগুলাম কোথাও কিছু নেই, ঘোড়ার অস্থিরতাও থেমে গিয়েছে। লোকেরা বললে প্রকাণ্ড বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার দিকে আসছিল, সকলে দেখেছে।

আমাদের আড্ডায় গোলমাল থেমে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ষ্টেশন মাষ্টার আট দশ জন লোক সঙ্গে নিয়ে হন্ত দন্ত হয়ে এলেন আমাদের দিকে। নিকটে এসেই জানালেন তাঁহার সিগন্যালারকে ঘণ্টা তিন আগেই বাঘে মেরেছে। বাঘ তাড়া খেয়ে মানুষটাকে ছেড়ে পালায়, সিগন্যালার এখনও একই জায়গায় পড়ে আছে।

রাইফেল নিয়ে উঠলাম। ঘটনাস্থলে এসে দেখি মরা লোকটির স্ত্রী ও পুত্র শোকে অভিভূত। চার ধারে গ্রামের লোক জড় হয়েছে। লোক সরিয়ে, বাঘকে সনাক্ত করার চেষ্টা করলাম। পায়ের দাগ পাওয়া গেল না। ভীড়ের উৎপাতে সব একাকার হয়ে গিয়েছে। শোকের মাঝে লাস চাইতে দ্বিধা আসছিল কিন্তু কর্ত্তব্যের খাতিরে কঠোর হতে হল। ষ্টেসন মাষ্টারের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত সিগন্যালারের স্ত্রী রাজি হয়।

যেখানে মানুষটিকে ছেড়ে পালিয়েছিল—তার কাছেই দরজাহীন গুমটি ঘর। আবার মাটিতে! কিন্তু অন্য উপায়ই বা কি আছে,—কাছাকাছি কোন বড় গাছ নেই। তখন জীদও চেপে গিয়েছিল। মাটিতেই বসব ঠিক করে ফেললাম।

এবার আর বাঁশের আড়াল নিচ্ছি না, ষ্টেসন মাষ্টারকে জানালাম একটি বড় সড় ময়লা ও শক্ত কাঠের তক্তপোষ চাই। এ অঞ্চলে অত বড় সৌখিনতায় কেহ অভ্যস্ত নয়, মাষ্টার মশাই মাথা চুলকে বললেন "আমারটাই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

তক্তপোষ আসতে চারটি মোটা ডালও সংগ্রহ হয়ে গেল। ঘরের ভিতর থেকে চাড় দিয়ে তক্তপোষের উপর ঠেকা লাগাব বলে। তখুনি, আশ্রয়ের পরীক্ষা করে নিলাম। ভিতর থেকে ঠেকা দিয়ে বললাম —পাঁচ ছয় জনে ছুটে এসে ধাক্কা লাগাও। পরীক্ষায়, আড়ালের শক্তি পাশ করে গেল। ঠেকা সরিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঠিক আছে অন্ধকারে দরজা খোলা কি বন্ধ বোঝা যাবে না। মোটা খুঁটি পুঁতিয়ে লোকটাকেও তার দিয়ে বাঁধালাম। খুঁটিকে লতা পাতা দিয়ে ঢেকে এবং নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা সেরে ক্যাম্পে ফিরলাম।

বিকেল পার হতেই শিকারের জায়গায় আসতে হল। ধারণা জন্মেছিল একটু নিরিবিলি পেলেই বাঘ এদিকে এসে পড়বে।

বন্দুকের নল বার করার জায়গা খালি রেখে—আড়াল মজবুৎ করে ফেলা হল। লোকজনদের চলে যেতে বললাম।

লোকেদের সঙ্গে শেষের ট্রেণও বিদায় হল। ষ্টেশন জনমানব শূন্য, দূরে রাখাল গরু চরিয়ে গ্রামে ফিরছে—কখন সখন কুকুরের ডাক শুনছি। সন্ধ্যা ধীরে এগিয়ে আসছে,—অল্পসময়ের ভিতরই অন্ধকার রাজ্য বিস্তার করে ফেলল। তক্তার ফাঁক দিয়ে মরা মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছি—আকার অস্পষ্ট হলেও—বোঝার কোন অসুবিধা নেই। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা রাতের দিকে হেলে পড়ল। এমনি সময় ষ্টেসন ঘেঁসা গ্রামে—এক সঙ্গে অনেকগুলি কুকুর ডেকে উঠল—তার সঙ্গে যোগ পড়ল মানুষের চিৎকার। একটু পরেই গোলমাল থেমে গেল। বুঝলাম চিতাবাঘ বেরিয়েছে কেলেঙ্কারী না করে বসে। ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়ল। সাজান আহার সামনে পেয়ে যাবে—আসল শিকারে বিঘ্ন ঘটিয়ে দেবে।

অভিজ্ঞতা অল্পক্ষণেই প্রামাণিক হয়ে গেল, ঠিক আমার পিছনেই চিতার ডাক শুনলাম। মিনিট তিন চার পরেই মাংস ছেঁড়ার আওয়াজ আসতে লাগল। অতি নিকটে একটা মানুষকে খেয়ে চলেছে, আর আমি রাইফেল হাতে নির্লিপ্তের মত বসে আছি। গত্যন্তর ছিল না একবার বন্দুক চললে নরভুক্‌কে আর পাওয়া যাবে না।—শেষ পর্য্যন্ত শিকারীর ধৈর্য্যকে আর পরীক্ষার মধ্যে রাখা গেল না।

সন্তর্পণে দাঁড়ালাম, তক্তপোষের পিছনে। বন্দুকের নল ধীরে উপরের খালি জায়গা থেকে বার করে শব্দের দিকে ঘোরালাম। সবে আলোর সুইচ টিপেছি—সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম বুক ফাটিয়ে দেয়া বড় বাঘের ডাক—পরমহূর্ত্তে লেপার্ড আর মানুষ আড়াল পড়ে গেল। আলোর মাঝ পথে দেখলাম বাঘ, শূন্যে উড়ছে। ঘটনাগুলির সঙ্গে একই সময় যোগ দিল ট্রিগারের (বন্দুকের ঘোড়া) উপর আমার আঙ্গুলের চাপ। গুলি বেরিয়ে গেল।

কেমন করে বিনা নিশানায় গুলি চালিয়েছিলাম আমারমনে নেই। ধোঁয়া কেটে যেতে দেখলাম, হিংসার প্রতীক, মহাশক্তিশালীর ভয়ঙ্কর রূপ—অসাড় অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল—মাত্র কয়েক হাত দূরে। সুধু বাঘ নয় চিতাও—ধীরে মানুষটার মুখের উপর নেতিয়ে পড়ল। টর্চের আলো তখনো জ্বলছে—পুনরায় গুলি চালাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু প্রয়োজন হল না, দুটোই মরেছে। এক গুলিতে দুই শিকার!—বাহবা পেলাম যথেষ্ট,—কেউ জানল না আসল শিকারী আমার কপাল।

পশ্চিম বাঙলায় লবণ উৎপাদনের পটভূমিকা

শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক-সরকারের পক্ষ হইতে পশ্চিম বঙ্গ ও উড়িষ্যার সমুদ্রউপকূলে লবণ প্রস্তুতের বর্ত্তমানে কোন সম্ভাবনা আছে কিনা বা উৎপন্ন লবণ দ্বারা ঐ প্রদেশগুলিকে লবণের দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন আজ নূতন নয় আর অপ্রত্যাশিত নয়—বরঞ্চ এই প্রদেশের লবণ শিল্প এককালে যথেষ্ট সমৃদ্ধই ছিল। সেই সমৃদ্ধি আজ নাই সত্যই, কিন্তু আছে অধিকতর উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী আর আছে আমাদের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদে ও সেই সঙ্গে অনুকূল পরিবেশে লবণ প্রস্তুতের এই আন্দোলন নিশ্চয়ই সার্থক হইবে।

খ্রীষ্ট জন্মের ৩০০ বছর পূর্ব্বে মৌর্য্যবংশের রাজত্বকালেও বাঙলায় লবণ প্রস্তুত হইত। মিঃ এফ, এইচ, ম্যানহান তাহার 'বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসে' মৌর্য্যবংশের ইতিহাস সম্বলিত 'অর্থশাস্ত্র' নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে—সেই প্রাচীন যুগেও এদেশে সরকারী তত্ত্বাবধায়ক লবণাধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে লবণ উৎপন্ন হইত এবং উৎপন্ন লবণের উপর কিছু করধার্য্য করিয়া উহার ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া হইত। ('দি সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ইন ইণ্ডিয়া')। তারও পরের যুগে মোগল সম্রাটগণের রাজত্বকালে এই বাঙলায় যে লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল তাহারও বহু ঐতিহাসিক নজীর পাওয়া যায়। পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে (১৭৫৭) লবণ উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে সুন্দরবন

খ্যাত ছিল। অবশ্য তখনও তমলুক ও ২৪পরগণার কয়েকটী অঞ্চলে লবণ উৎপন্ন হইত এবং ঐ লবণ উৎপাদনের সহায়তার জন্য কয়েকটী বিশেষ অঞ্চল জালানী কাঠের জন্য বিশেষ ভাবে রক্ষিত ছিল, তখন সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুতের বিধি প্রচলিত ছিল। লবণ প্রস্তুতকারকদের ও ব্যবসায়ীদের সরকারকে কর দিতে হইত।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাঙলা তথা ভারতের স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে ভারতের বুকে কায়েম হইয়া বসিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পান। ঐ সালেই ধূর্ত্ত লর্ড ক্লাইব বাঙলার লবণ শিল্পের প্রচলন দেখিয়া লবণ ব্যবসায়ী সমিতি স্থাপন করিতে ও সেই সঙ্গে ঐ ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তিনি উহা সম্ভব করিতে না পারিলেও ওয়ারেণ হেষ্টিংস তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন লবণ শিল্পের উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া এবং সেই সঙ্গে লবণ উৎপাদনকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে আনিয়া। তখন সমস্ত উৎপন্ন লবণ সরকারকে বিক্রয় করিতে হইত একটা বাঁধা দরে, আর সরকার তাহাই বাজারে ছাড়িতেন দর ঠিক করিয়া দিয়া। ১৭৮০ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস লবণের এজেন্সী প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের মতে ঐ প্রথার প্রবর্ত্তন ও শিল্পকে সরকারের কুক্ষীগত করিয়া রাখিবার যে দুইটী কারণ ছিল তাহার একটী হইতেছে খাজনা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আর অন্যটী ভারতীয় মহাজনদের হাত হইতে লবণ উৎপাদকদের রক্ষণাবেক্ষণ।" (দি সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ইন ইণ্ডিয়া)।

বাঙলা দেশে লবণ শিল্পের উপর বৃটিশ বণিকগণের একচেটিয়া অধিকার বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিল না—বিলাতের লবণ উৎপাদকদের চেষ্টায়। তাহারা বার বার চেষ্টা করিতে লাগিল এদেশের লবণ শিল্প বন্ধ করিয়া দিয়া এদেশে বিলাতে উৎপন্ন লবণ চালু করিতে। তাহাদের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় প্রথম বাহির হইতে লবণ আমদানী হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে লবণ কর উঠিয়া গেল ও সেইসঙ্গে বাঙলা দেশে বিলাতের লবণ আমদানীর পরিমাণও বাড়িয়া গেল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে অতি সস্তাদরের প্রথম শ্রেণীর চেশায়ার লবণ' (Cheshire Salt) বাঙলা দেশকে ছাইয়া ফেলিল। তবুও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সমুদ্রের জল ফুটাইয়া লবণ প্রস্তুত করার উন্নততর ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি হয়। সরকার একচেটিয়া অধিকার উঠাইয়া দিয়া স্থানীয় প্রস্তুতকারকগণের উপর আবগারী কর ধার্য্য করেন ও অনুমতি লইয়া লবণ প্রস্তুতের চিঠি প্রবর্ত্তিত করেন। সেই প্রথম বাঙলার লবণ শিল্পের উপর আসিল সরকারী আঘাত। ১৮৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে এদেশে যেখানে ৪৫ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইত সেখানে সস্তাদরের বিলাতী লবণের প্রতিযোগিতায় করভার ও ব্যয়ভার নিপীড়িত বাঙলার লবণ শিল্প লুপ্ত হইয়া আসিল মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে। অবশেষে কুটনৈতিক ব্রিটিশ সরকার তাহার শেষ আঘাত হানিলেন লবণ শিল্পের উপর। "১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এদেশে লবণ উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়া গেল।" (ট্যারিফ বোর্ড রিপোর্ট অন সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ১৯৩১)।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় এই প্রদেশে নূতন করিয়া লবণ প্রস্তুতের উদ্যোগ দেখা যায়। কিন্তু নানা কারণে সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর লবণ আন্দোলন ও গান্ধী-আরউইন চুক্তি এই শিল্পে অনেকখানি আলোকসম্পাত করে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় লবণ সম্পর্কীয় ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্ট এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয় লবণ আইন। তাহার পর হইতে বহু ফার্ম্ম ও বহু ব্যক্তি লাইসেন্স লইয়া লবণ তৈয়ারীর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই। তাহারা মেদিনীপুরের অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুর, দাদনপুর, সেরপুর, কাঁথির নিকটবর্ত্তী কাদোয়া ও ২৪পরগণা জেলার কাকদ্বীপে লবণ তৈয়ারীর কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। যাহা হউক বর্ত্তমান ভারত সরকার "বিনা লাইসেন্সে সর্ব্বোচ্চ দশ একর পরিমিত জমিতে লবণ উৎপাদনের কাজ পরিচালনা করিতে পারিবার সুবিধা দান করিয়া ব্যাপকভাবে লবণের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া সত্যই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।" (ভারতের খনিজ সম্পদঃ বর্ত্তমানঃ বৈশাখ ১৩৫৬)।

ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে ও তাহারও পূর্ব্বে যাহারা লবণ প্রস্তুত করিত তাহাদিগকে বলিত 'মলঙ্গী'। ইহার উত্তাপের সাহায্যে সমুদ্রের জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিত। এক চিল্কা হ্রদ অঞ্চলে করকচ লবণ তৈয়ারী ব্যতীত অন্য কোথাও রৌদ্রের সাহায্যে লবণ প্রস্তুতের বিধি প্রচলিত ছিল না। সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চলে লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে 'পাঙ্গা' নামক একপ্রকার লবণ তৈয়ারী হইত, ব্রিটিশ আমলে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল।

লবণ উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ যে পরিবেশের প্রয়োজন হয় তাহা হইতেছে বাতাসে কম আর্দ্রতা, আবহাওয়ার উষ্ণতা, কম বৃষ্টি, বাতাসের অনুকূল গতি ও কাজের সময়ের দীর্ঘতা। (দি সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ইন ইণ্ডিয়া)। ইহা ছাড়াও আর দুইটী জিনিষের প্রয়োজন আছে। প্রথমটা হইতেছে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের গাঢ়তা, আর অন্যটী হইতেছে লবণ উৎপাদনের ভূমির অবস্থা। উপরোক্ত অবস্থাগুলির দিক হইতে পশ্চিম বঙ্গের স্থান কোথায় সেই সম্বন্ধে (শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগের) 'পশ্চিম বঙ্গের লবণ প্রস্তুতি' (বঙ্গশ্রী কার্ত্তিক ১৩৫৫) প্রবন্ধটী হইতে ভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আর্দ্রতা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে নিম্ন বঙ্গের আবহাওয়া লবণ প্রস্তুতির পক্ষে মন্দ নহে, কারণ মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর সমুদ্র উপকূলে যেখানে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হয় সেখানকার আর্দ্রতাও প্রায় এখানকার মত। বরঞ্চ শীতের সময় এখানে আর্দ্রতা কম থাকে।" শুধু আর্দ্রতা নয় আবহাওয়ার দিক হইতেও নিম্ন পশ্চিম বাঙলা কোকনদ ভাইজাগ প্রভৃতি অঞ্চলের চাইতে ভাল। বৃষ্টির দিক হইতেও মাদ্রাজের তুলনায় হিজলী, ২৪পরগণার নিম্ন অঞ্চলে এমন কিছু বেশী বৃষ্টি হয় না

যাহাতে লবণ চাষ চলিতে পারে না. কাঁথি ও সুন্দরবন উপকূলের বাতাসের গতিও মাদ্রাজের মতই, জমি ও সমুদ্রের জলের লবণাক্ত অংশের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ পূর্ব্বে ২৪পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত এবং বর্ত্তমানেও কিছু কিছু প্রস্তুত হয়।" সুতরাং আবহাওয়া স্থান প্রভৃতি দিক হইতে কোন পরিবেশই যে লবণ প্রস্তুতের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে বাধা নহে সে বিষয় অবশ্য স্বীকার্য্য। অনেকে বলেন বাঙলাদেশের বেশী বৃষ্টিপাত ও বায়ুর আর্দ্রতাই লবণ প্রস্তুতির অন্তরায়। কিন্তু সে আশঙ্কা যে ভুল তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে বিভিন্ন পরীক্ষায়। তাছাড়া লবণ প্রস্তুতির কথায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার কথা বিবেচনা করিলে চলিবে না, কারণ লবণ উৎপাদনের স্থানগুলি একমাত্র নিম্ন পশ্চিম বাঙলাতেই সীমাবদ্ধ। আর সেই অঞ্চলের আবহাওয়া লবণ প্রস্তুতের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে—১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এই দেশে প্রথম বিদেশী লবণ আমদানী হয় ও তাহার পর হইতে আমদানীকৃত লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তবে বিস্ময়ের কথা এই যে—"বিদেশ হইতে আমদানীকৃত লবণের সবটুকুই বাঙলা ও আসামের বাজারে সীমাবদ্ধ থাকিত।" (ট্যারিফবোর্ড রিপোর্ট অন সল্ট ইণ্ডাষ্ট্রী ১৯৩১)। মাত্র বাঙলা. আসাম ও বিহারের সামান্য অংশে বিদেশী লবণের চাহিদা থাকায় বিদেশী বণিকদের কৌশলে দর নিয়ত উঠানামা করিত এবং দর বৃদ্ধির অন্যতম যন্ত্র হিসাবে আমদানীকৃত লবণের পরিমাণও উঠানামা করিত। ঐই অবস্থার প্রতিরোধকল্পে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এদেশে লবণ আমদানী সমিতি গঠিত হয়। তাঁহারা অবস্থা অনেকখানি আয়ত্তে আনিয়াছেন সত্য কিন্তু এদেশে লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া বিদেশী লবণ বর্জ্জন করিবার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারেন নাই। এখনো পশ্চিম বাঙলার প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত লবণই সরবরাহ করে এডেন প্রভৃতি অঞ্চলসমূহ। মধ্যে মধ্যে মাদ্রাজের তুতিকোরিণ হইতে কিছু লবণ আসিত, বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। "গত ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাবে দেখা যায় যে—ঐ এগার মাসে পশ্চিম বাঙলায় ২লক্ষ ৬৭হাজার টন লবণ আমদানী হইয়াছে যাহার মূল্য প্রায় দুই কোটী টাকা। ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে (এপ্রিল হইতে মার্চ্চ) সমগ্র ভারতে বিদেশের লবণ আমদানী হইয়াছিল ৩৭৮৮৫৮ টন তাহার মধ্যে পশ্চিম বাঙলায় আসিয়াছিল ৬৬২৬৮৩ টন। যাহার মোট মূল্য হইতেছে ২কোটী ৭৭লক্ষ টাকা।" (এ্যাকাউন্ট রিলেটিং টু দি সী বোর্ণ ট্রেড এণ্ড নেভিগেশন অব ইণ্ডিয়া; মার্চ্চ ১৯৪৮ হইতে)। ঐ বিপুল পরিমাণ বহিরাগত লবণের আমদানী বন্ধ করিয়া পশ্চিম বাঙলা স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে কিনা, সেইটাই হইতেছে আমাদের প্রধান প্রশ্ন।

পশ্চিম বাঙলার আদিবাসীরা সাধারণতঃ সমুদ্র জল জ্বাল দিয়া তৈয়ারী শুদ্ধ ও খাঁটী লবণ পছন্দ করে। সেইজন্য ঐ শ্রেণীর লবণই পশ্চিম বাঙলায় খুব বেশী পরিমাণ আমদানী হয়। তাছাড়া লবণের দিক হইতে ঐ শ্রেণীর লবণই গড়ে প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে। সমুদ্র জল জ্বাল দিয়া তৈয়ারী লবণের মোটামুটি গুণগুলি হইতেছে এই যে উহা সাদা রঙের, দানাগুলি ঝরঝরে ও সুন্দর এবং আর্দ্রতাহীন। বাঙালীদের মধ্যে এই শ্রেণীর লবণের প্রচলনের মূলে অতীত বাঙলার লবণ শিল্পের যে অনেকখানি সংস্কার আছে সেকথা বলা বাহুল্য।

. কুটীর শিল্পের দিক হইতেও যে পশ্চিম বাঙলার লবণ শিল্পের অভ্যুত্থান ও ব্যাপক প্রচার একই সঙ্গে বেকার সমস্যা ও লবণ সমস্যার কিছুটা সমাধান করিতে পারে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে কুটীর শিল্প হিসাবে লবণ শিল্পের চলন পূর্ব্ব হইতে কম হইলেও কিছুটা এখনও আছে। আইনের দিক হইতেও এই ধরণের কুটীর শিল্প সম্বন্ধে সহৃদয়তার সহিত বর্ত্তমান সরকার বিবেচনা করিয়াছেন। মিঃ সি, এইচ, পিট তাঁহার "রিপোর্ট অনদি ইনভেষ্টিগেশন ইনটু পসিব্লিটিজ অব সল্ট প্রডাক্সন ইন বেঙ্গল, বিহার এণ্ড উড়িষ্যা" শীর্ষক রিপোর্টে লবণ শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—"আন্তরিকতার সহিত কাজ করা হইলে উপকূল অঞ্চলের প্রতি মাইলে মাসে ৪০০।৫০০ মণ লবণ উৎপন্ন হইতে পারে।" এই স্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে—পশ্চিম বাঙলার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের দৈর্ঘ্য প্রায় একশত মাইল। সুতরাং লবণ উৎপাদনের পরিমাণও বড় কম হইবে না। মিঃ পিট সেই সঙ্গে সাধারণভাবে লবণ উৎপাদনের জন্য কাঁথির নিকটে, পুরুষোত্তমপুর, বৈচিবেনিয়া, তাজপুর, মন্দারমানি প্রভৃতি অঞ্চলগুলি মনোনীত করিয়া সুপারিশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে—"পশ্চিম বাঙলায় লবণাক্ত মাটী হইতে লবণ উৎপাদন বন্ধ করিয়া শুধু মাত্র সমুদ্র জল হইতে লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।" "এদেশে সমুদ্র জলকে রৌদ্রের সাহায্যে ঘনীভূত করিয়া উত্তাপের সাহায্যে লবণকে শুদ্ধ করিয়া লওয়ার পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সাফল্যজনক হইবে।"

মিঃ সি, এইচ পিটের অনুসন্ধানের পরে ঐ ধরণের কোন পরীক্ষা-মূলক কাজ হইয়াছে কিনা জানা নাই। কিন্তু গবেষণা ও পরীক্ষামূলক কাজের যে প্রয়োজন আছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। একমাত্র জ্বালানী প্রভৃতি বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাপের কথা বাদ দিলে সমস্ত উপকরণ যখন সহজলভ্য ও পরিবেশ যখন অনুকূল তখন এ বিষয়ে অনুরাগী হইতে আমাদের ব্যবসায়ী মহলের কোন বাধা নাই বলিয়াই মনে হয়, আর কুটীর শিল্প হিসাবে উপকূলবর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীরা লবণ শিল্পকে গ্রহণ করিতে পারে স্বচ্ছন্দে।* ১৯৩০ সালের লবণ আন্দোলন বাঙালী এখনো ভোলে নাই বলিয়াই মনে হয়। তখন ছিল আগ্রহ ও ইচ্ছা, ছিল না সুযোগ। আর আজ—সে সুযোগ সমুপস্থিত। কিন্তু আগ্রহ নাই। ইহা ঔদাসিন্য না অপমৃত্যু।

* তাহাতে নিজেরা তো উপকৃত হইবেনই বরঞ্চ দেশবাসীদেরও উপকৃত করা হইবে।
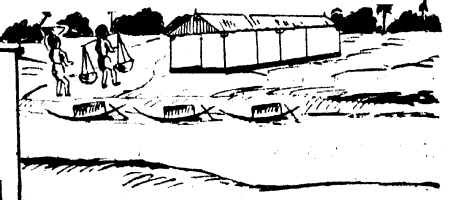
(দুই)

অধিকাংশ লোকই ফিরিয়া গেল। মনক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিল। তাহারা কি কল্পনা করিয়া আসিয়াছিল সেটা তাহাদের নিজেদের কাছেও স্পষ্ট নয়, কিন্তু এমন সংক্ষিপ্ত এমন কলরবহীন একটা ঘটনা তাহাদের কল্পনার—সে কল্পনা যতই অস্পষ্ট হোক—তাহার বিপরীত। গোটা অঞ্চলটা উত্তেজনায় কালবৈশাখার অপরাহ্নের মত উত্তপ্ত হইয়া রহিয়াছে; একটা ঝড় বজ্রাঘাতের সঙ্গে বর্ষণ তাহাদের প্রত্যাশা। সেখানে এমন শব্দহীন আলোড়নহীন একটা স্তিমিত ঘটনা কোন মতেই মনঃপূত হইবার কথা নয়। যেন বহু প্রত্যাশার একটুকরা মেঘ দিগন্ত হইতে উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, না একটা বিদ্যুৎ চমকে সৃষ্টির চোখ ধাঁধাইয়া জানাইয়া দিল—হ্যাঁ আমি আসিয়াছি, না-তাহার গর্জ্জনে সমস্ত কাঁপাইয়া বলিল—ভয় নাই, এমন কি খানিকটা ঝড় উঠিয়া ধুলা উড়াইয়াও দিল না, যাহাতে মানুষ ঠাণ্ডা বাতাস আসিবে এ প্রত্যাশাতেও একটু আশ্বস্ত হয়।

অনেকেই বলিল—ধু-রো! এই ঠাণ্ডায় শেষ রাত্রে—ধু-র্!

—চল, চল। বাড়ী চল। ভোর হতে হতে বাড়ী পৌছুব। মাঠে অনেক কাজ।

—আমি বলি, না জানি কি হবে! এই রাতেই হয় তো কিছু মিছু হয়ে যাবে। যত—সব—। হুঁঃ! কার্তিক মাসের শেষ রাতের ঠাণ্ডা! কাতির শিশিরে হাতী পড়ে যায়, মানুষ তো মানুষ। একটা হুই ক'রে দিলে—চল, সব চল; ঠাকুর মাশায় আসবেন। তাঁর কথাতেই সব মামদোবাজী ফুস মন্তরে উড়ে যাবে। লে—বাবা। যত নষ্ট গুড়ের খাজা আমাদের—

নাম করিতে হইল না, নষ্ট গুড়ের খাজা নিজেই ফোঁস করিয়া সাড়া দিয়া উঠিল—কি বলেছিলাম, বলি হ্যাঁরে, কি বলেছিলাম আমি? বল—আমি কি বলেছিলাম?

—বল নাই—চল্ সব, ঠাকুর মাশায় আসছেন?

—ঠাকুর মাশায় এসেছেন কি, না?

—তা এসেছেন।

—তবে? তবে? বলি ওরে—তুই এমন ক'রে চেল্লাচ্ছিস কেন? নষ্ট গুড়ের খাজা! নষ্ট গুড়ের খাজা!

—এই দেখ। তুমি আবার 'আগ' করছ। এই শেষ রাতে 'আগাআগি' ভাল লাগে না। আমি বলছি—ঠাকুর মাশায় এলেন, বেশ কথা—তা' এই শেষ রাতে এসে হ'ল কি!

—কি হ'ল? বল হে, তোমরাই সব বুঝিয়ে বল—লটবরকে—কি হ'ল! এত বড় একটা মানুষ, দেখলে পুণ্য হয়, তিনি এলেন এতকাল পরে—এলেন আমাদের জন্যে, আসব না ছুটে? হ'লই বা শেষ রাত, হ'লই বা ঠাণ্ডা! এই—এই করেই হিঁদুর সব্বনাশ হয়েছে। দেখেছিলি—সেদিন লীগের সেক্রেটারী এসেছিল—সেদিন মিয়া-সায়েবদের ভিড়। দেখেছিলি? তোদের ছত্রিশ জাতের বাহাত্তোরটা হাঁড়ি, কেউ কারও ছোঁওয়া খাবি না, কেউ কারুর বিপদে সাহায্য করবি না, জাতজ্ঞাতের মড়া মরলে—তোরা ঘরে বসে মজা দেখিস, কুচক্রীর দল, ভীরুর দল, অবিশ্বাসীর দল, পাষণ্ডের দল—।

বাজার দ্বারমণ্ডলের পূর্ব্বদিকে মহিষতলী গ্রামের হেরম্ব মিত্র সুদীর্ঘ একটি গালাগালি বহুল বক্তৃতা দিয়া শীতকাতর শেষ রাত্রিরও শেষাংশটুকু গরম করিয়া তুলিল। হেরম্ব মিত্র গ্রামের মাতব্বর। অবস্থা বেচারার ভাল নয়, কিন্তু উৎসাহের তাহার অন্ত নাই। সামান্যতম কারণকে অবলম্বন করিয়া অসামান্য উৎসাহে সে গ্রাম আলোড়িত করিয়া দেয়। কোথায় মেলা, কোথায় চব্বিশপ্রহর মহোৎসব, কোথায় বারোয়ারী কালীপূজা, কোথায় জমিদারের সঙ্গে মামলা, কোথায় কাহার সঙ্গে কাহার কলহ —এই লইয়াই সে চব্বিশ ঘণ্টাই নিজেও মাতিয়া থাকে,

গ্রামকেও মাতাইয়া রাখে। এইখানেই তাহার মাতব্বরী সীমাবদ্ধ নয়—অন্তত সে তাহা রাখিতে চায় না, সে-মাতব্বরীকে সে প্রসারিত করিবার চেষ্টায় গত তিনবার ইউনিয়ন বোর্ডে মেম্বর হইবার জন্য ভোটে দাঁড়াইয়াছে কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হইয়াছে—পাশের মুসলমান প্রধান খাঁয়ের পাড়া গ্রামের মাতব্বর আবুতাহের খাঁয়ের নিকট।

হেরম্ব মিত্র বলে—আবুতাহের পারে না এমন কাজ নাই। "লোকটার পরণে কয়েক বৎসর আগেও থাকিত তাঁতের খাটো বহরের লুঙ্গি। হঠাৎ আঙুল ফুলিয়া কলাগাছের মত লোকটা মোটা হইয়াছে, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর হইয়াছে, আজকাল পরিতেছে ঢিলা-পায়জামা—আচকান।"

হেরম্ব জানে আবুতাহের তলে তলে নিজের গ্রামকে দাঙ্গার জন্য তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছে। হেরম্বও বসিয়া নাই। সে দ্বারমণ্ডল বাজার, দ্বারমণ্ডল জংসন, সদর শহর চরকীর মত পাক দিয়া ফিরিতেছে। সমস্ত আন্দোলনটার খবরাখবর তাহার নখাগ্রে। ন্যায়রত্নের আগমন উপলক্ষে সে স্বাভাবিক উৎসাহেই আসিয়াছে এবং দশজনকে উৎসাহিত করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

প্রবীণ মানুষ ভগবান মণ্ডল—ন্যায়রত্নের কালের মানুষ। ভগবান বলে—মহাগ্রামের ঠাকুর বাড়ীর ব্রহ্মত্র এ অঞ্চলে প্রতি গ্রামে। ওই যে আবুতাহেরের খাঁয়ের পাড়া—ও সীমাতেও দু বিঘে ব্রহ্মত্র আছে। আমরা পাঁচপুরুষ ধ'রে ওই জমি করছি। যখন দশ বছরের ছেলে আমি—তখন বাবা চাল দিতে যাবার সময় গাড়ীতে চাপিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই প্রথম দেখলাম টকটকে সোনার মত রঙ—বারো চৌদ্দ বছর বয়স ঠাকুর মশায়কে। আমাকে নাম জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে গেলেন নিজের মায়ের কাছে, নাড়ু দিলেন মা—খেলাম, ঠাকুর মশায় নিজেহাতে আমাকে জল ঢেলে দিলেন—আমি খেলাম। ওরে বাবা—তখন কি জানতাম—উনি সাক্ষাৎ আগুন। সেই মানুষকে আজ পঞ্চাশ বছর দেখি নাই! পঞ্চাশ বছর!

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান অপরাধ করিয়াছিল। সামাজিক অপরাধ। যৌবনের অতি ক্ষুধায় সে এক বিধবার প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। একদা সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেদিন ন্যায়রত্নই ভগবানের প্রায়শ্চিত্ত বিধান দিয়াছিলেন। লোকমুখে বিধান শুনিয়া সে বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল। ভগবান সেই দিন হইতে কখনও ন্যায়রত্নের সামনে আসে নাই। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সে যে ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল—তাহাতে লোক একবাক্যে বলিয়াছিল—মানুষের ভুল হয় বৈকি। কার না ভুল হয় বল? কিন্তু ভগবান মানুষের মত মানুষ, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছে। শুধু সামাজিক ও শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই ভগবান ক্ষান্ত হয় নাই, বিধবাটিকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া তাহার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত মাসিক পাঁচটাকা হিসাবে খরচ জোগাইয়া আসিয়াছে। ন্যায়রত্নও এ সংবাদ শুনিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছিলেন—হেরম্ব মিত্রের পিতামহ তখন ছিলেন গ্রামের গমস্তা, তাহাকেই বলিয়াছিলেন—মিত্রজা, ভগবানকে বলো—আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত উপলব্ধিতে, মনের দহনে। শাস্ত্র, সেই উপলব্ধি, সেই দহন জাগ্রত করবার জন্য উপবাস—সর্ব্বসমক্ষে মন্ত্র পাঠ করে পাপ স্বীকার, অপরাধ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা—ইত্যাদির বিধান দিয়ে থাকে। সমাজ শাসন ক'রে সেই বোধ জাগ্রত করাতে চায়। আমি শাস্ত্রের বিধান দিয়েছি। ওইটুকুর বেশী তো আমার অধিকার নাই। সমাজ ভোজ আদায় করেছে—এখন সমাজের যেমন অবস্থা তাতে ওই আদায় হলেই সে খুসী। কিন্তু আমার দুঃখ ছিল অভাগী মেয়েটির জন্য। শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করেও তার পরিত্রাণ নাই। সমাজ ভোজ নিয়েও ঠাঁই দিতে পারবে না। তাই ভগবান যখন নিজেই প্রায়শ্চিত্তের এই বিধানটা নিজের ওপর চাপালে—তখন আমার মনটা শান্ত হ'ল, প্রসন্ন হ'ল। এই আমার আশীর্ব্বাদ। বলো তুমি ভগবানকে আমার নাম করে বলো।

মিত্তির জা—এ কথা ভগবানকে জানাইয়াছিল। ভগবান সেইখান হইতেই দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ন্যায়রত্নকে নমস্কার জানাইয়াছিল; আশীর্ব্বাদ পাইয়াও কিন্তু ন্যায়রত্নের সঙ্গে দেখা করে নাই।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভগবান ন্যায়রত্নের সম্মুখে আসে নাই। আজ কিন্তু থাকিতে পারে নাই, সে হেরম্বদের দলের সঙ্গে বাহির হইয়া

পড়িয়াছিল—বলিয়াছিল—একটু 'ধেরো-ধেরো' চলো দাদারা। রাত্তিরি কাল—শীতের রাত্তি—তার উপরে—বয়েস বলছে—আসি-আসি—আশীর ঘরের ফটক খুলছে; পড়ে গেলে আর উঠব না। আক্ষেপ নাই তাতে, তবে একবার ঠাকুর মহাশয়কে দেখবার সাধ, পঞ্চাশ বছর—আজ যাই—কাল যাই ক'রে—লজ্জা আর কাটাতে পারলাম না। আজ লজ্জা কাটিয়েছি!

সমস্ত পথটা ভগবান আর কথা বলে নাই। ষ্টেশনে ন্যায়রত্নকে দুর হইতে আবছা দেখিয়াই ফিরিতে হইয়াছে, কাছে যাওয়ার সুযোগ ঘটে নাই; একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিতেছে। হেমন্ত মিত্রের গালিগালাজ পূর্ণ বক্তৃতায় বাধা দিয়া সে সবিনয়ে বলিল—মিত্তির ভাই একটা কথা বলি। রাগ করো না যেন! গালাগালকে লোকে বলে ঠাণ্ডা জল, তা ভাই এই শীতের রাতে ঠাণ্ডাজলে শরীর বড় শিরশির করছে। লোকে ক্ষুণ্ণ হবে বৈ কি দাদা, একবার ভাল ক'রে দেখতে পেলাম না, পেন্নাম করতে পেলাম না, এই শীতের শেষ রাতে ইষ্টিশানে থাকতাম—তা পর্য্যন্ত দিলে না।

এ কথাটা দেবু ঘোষ উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু উপায় ছিল না। একাদশীর উপবাস করিয়া অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ কাশী হইতে বাঙলা দেশ এই সুদীর্ঘ-পথ অতিক্রম করিয়াছেন—এই অবস্থায় তাঁহাকে এত লোকের উচ্ছ্বাসের সম্মুখীন করিবার কল্পনাও যে করা যায় না। তাহার উপর ন্যায়রত্ন যত দেশের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন—ততই যেন কঠিন শীতল শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন। ট্রেণে চড়িয়া প্রথম দিকটায় কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, সাহেবগঞ্জ পার হইতেই বলিলেন—এইবার দেশ কাছে এল। সাহেবগঞ্জ!

আরও খানিকটা আসিয়া একটা বড় ষ্টেশন।

ষ্টেশনটার নামের হাঁক শুনিয়া ন্যায়রত্ন চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িতেই আধশোওয়া হইয়া দেহখানা এলাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। দেবু ভাবিয়াছিল—ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু প্রপৌত্র অজয় মৃদুস্বরে বলিয়াছিল—না। ধ্যান করছেন।

ন্যায়রত্ন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—শঙ্খপুর ষ্টেশন কি পার হলাম পণ্ডিত? দ্বারমণ্ডল আসছে? কথা বলিতে বলিতেই ন্যায়রত্ন উঠিয়া বসিয়াছিলেন—অজয়ের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—অজুমণি, তোমার দেশ এল ভাই!

ময়ূরাক্ষীর ব্রিজের উপর ট্রেণ উঠিতেই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া প্রপৌত্রকে বলিয়াছিলেন—প্রণাম কর, তোমার বহু পুরুষের ভিটের দেশ।

ষ্টেশনে নামিয়া যেন নিতান্ত অবসন্ন অসুস্থের মত বলিলেন—অজয় আমার বিছানাটা বিছিয়ে দাও তো ভাই!

যে কেহ কাছে আসিল—সকলকেই এক কথা বলিলেন—কাল। কাল। কাল।

ন্যায়রত্নের কণ্ঠস্বরে কথাটা শুনিলে লোকে সজল চক্ষে তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া বাকী রাত্রিটা সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষায় পূর্ব্বদিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। তাঁহার একটা কথায় লোকে গলিয়া যাইত। যদি তিনি কথাটা একটু উচ্চকণ্ঠে বলিতেন; কোন একটা উঁচু কিছুর উপর দাঁড়াইয়া দেখা দিয়া বলিতেন! সে তো জানে, তাহার চেয়ে এ কথা তো ভাল করিয়া আর কেউ জানে না। হয় তো-ঠাকুর নিজেও জানেন না—তিনি এখানকার মানুষের মনের কোন মণি বেদীতে বসিয়া আছেন!

দেবু কথাটা বলিয়াওছিল। জংসন শহরের শেঠ মহাশয়েরা, বড় মাতব্বরেরা, কঙ্কনার বাবুরা—তাহার গ্রামের জমিদার শ্রীহরি ঘোষ প্রভৃতি কথাটা নাকচ করিয়া দিয়াছেন। ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তি ছিল; পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষও আপত্তি করিয়াছেন। মুসলমান সম্প্রদায় দরখাস্ত করিয়াছে। এমনভাবে হিন্দুরা এখানে জমায়েত হইলে—যে কোন অজুহাতে শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে। কথাটা যুক্তিযুক্ত। তবুও কর্ত্তৃপক্ষ ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনার জন্য আসিতে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নাই। শুধু স্থানীয় মাতব্বরদের সঙ্গে সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, কোন বক্তৃতা কেহ দিতে পারিবে না। এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিটি আগন্তককে জংসন শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এই কারণেই জমিদার ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ দেবু ঘোষের কোন কথাই কানে তোলেন নাই। দেবু বলিয়াছিল—বক্তৃতা তো নয়, ঠাকুর মশায় শুধু বলবেন—আমি ক্লান্ত—

—আরে, সে কথা তো উনি ট্রেণ থেকে হাত জোড় ক'রে বলে দিয়েছেন। ষ্টেশন থেকে নড়লেন না পর্য্যন্ত।

না-না—ও সব হবে না। তোমাদের ওসব স্বদেশী ধারা ধরণ, এ সবের মধ্যে খাটিয়ো না। পুলিশ তা' হ'তে দেবে না।

পুলিশ সাহেবও দৃঢ় স্বরে বলিয়াছিলেন—যা বলবার আমি বলছি।

বলিয়াই তিনি ঘোষণা জানাইলেন—আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলে ষ্টেশন এলাকা থেকে বেরিয়ে যাও। পর মুহূর্ত্তেই নিজের কথা সংশোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—ষ্টেশন এলাকা থেকেই নয়, এ শহর থেকেই চলে যেতে হবে। আপন আপন গ্রামে চলে যাও।

ষ্টেশনে দশজন আর্মড পুলিশ দশ গজ অন্তর পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল। ষ্টেশনের বাহিরটা সাধারণ কনেষ্টবল—চৌকিদার—সে প্রায় জন পঞ্চাশেক—ঘিরিয়া রাখিয়াছিল।

মাতব্বরেরা—গুরু গম্ভীর মুখভাব লইয়া—ঘন ঘন হাত নাড়িয়া—ইসারায় এবং চাপা গলায়—যাও—যাও—। চলে যাও সব। জলদি। যাও! বলিয়া ব্যস্ত হইয়া এমনভাবে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন যে পল্লীবাসীরা শঙ্কিত না হইয়া পারিল না। তাহারা পরস্পরের গা-টিপিয়া মৃদুস্বরে বলিল—চল্‌রে বাপু—চল্। বলছে সব এমন ক'রে! তা—ছাড়া—।

তা ছাড়া তাহারা বন্দুকধারী পুলিশ দেখিয়া ভীতও হইয়াছিল। কয়েকদিন ধরিয়াই নূরুল হক ইনসপেক্টার পঞ্চাশ জন আর্মডগার্ডের একটি দল লইয়া গ্রামে গ্রামে প্যারেড করিয়া ইতিমধ্যেই মানুষের মনে একটা ভীতি সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছে।

তাহারা চলিয়া গেল। ক্ষুণ্ণ হইয়াই গেল।

ষ্টেশনে থাকিল শুধু জনকয়েক। একজন ইনসপেক্টার, একজন এ-এস-আই থাকিলেন সরকারী তরফ হইতে। শ্রীহরি ঘোষ এবং রামগোপাল ভকত চেয়ার পাতিয়া বসিয়া রহিলেন। আর রহিল দেবু ঘোষ।

ন্যায়রত্ন নিষ্পলক শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিয়া শুইয়াছিলেন। এত সব কাণ্ডের তিনি কিছুই জানতে পারেন নাই। জানিতে চান নাই বলিয়াই জানিতে পারেন নাই। মৃদুস্বরে হইলেও এত মানুষের কথা—সে একটা কোলাহল—সে শুনিয়াও তিনি ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য কোন প্রশ্ন করেন নাই। প্রশ্ন করা দূরের কথা—বারেকের জন্য সেদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখেন নাই পর্য্যন্ত।

দেবু বুঝিয়াছেন—অন্তরে তাঁহার প্রচণ্ড আলোড়ন চলিতেছে। সুদীর্ঘকালের কত কথা কত স্মৃতি কত সুখ কত দুঃখ টগবগ করিয়া আগ্নেয়গিরির গর্ভের গলিত ধাতু সম্ভারের মত ফুটিতেছে। পাহাড় হইলে সে কম্পনে কাঁপিয়া উঠিত, কিন্তু মানুষ বোধ করি পাথরের চেয়েও অটল হইতে পারে। দেবুর অন্তর অকস্মাৎ ন্যায়রত্নের প্রতি গভীর সমবেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল;—মনে হইল—এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক অবস্থা আর মানুষের হয় না; যেন কোন সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ স্বর বদ্ধ হইয়া মূক হইয়া গিয়াছে। অথবা কোন মানুষ অন্তিম মুহূর্ত্তে বাকবদ্ধ পঙ্গু হইয়া সংসারের দিকে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে।

ধূমায়মান গরম জল ভর্ত্তি একটি পিতলের বালতী হাতে একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ন্যায়রত্ন তবুও কোন কথা বলিলেন না। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

দেবু তাহার দিকে চাহিয়া কিছু ইঙ্গিত করিল। মেয়েটি জলের বালতী নামাইয়া রাখিয়া নতজানু হইয়া ন্যায়রত্নকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রণাম করছি আমি।

ন্যায়রত্ন নীরবে ডান হাতখানি নাড়িয়া নিষেধ করিলেন। —না।

—আমি স্বর্ণ, ঠাকুর মশায়। আমি তো এ কথা শুনব না।

ন্যায়রত্ন এবার ফিরিয়া তাকাইলেন। স্বর্ণ? কে স্বর্ণ?—ও! দেখুড়িয়ার তিনকড়ি মণ্ডলের সেই বালবিধবা কন্যাটি! একেবারেই চিনিবার উপায় নাই। শুধু সধবা বেশের জন্যই নয়—একটা আসল রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে, যেন চাষীর ঘরের গৃহস্থালীর নিত্যব্যবহার্য্য ধাতুপাত্র গালাইয়া নিপুণ যন্ত্রশিল্পী কোন ধারালো দীপ্তিময় অস্ত্রে পরিণত করিয়াছে। ঠিক দেবুর মতই তাহার রূপান্তর।

দেবু মৃদুস্বরে বলিল—আমার স্ত্রী!

ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিলেন—ন্যায়রত্ন।—ও! হ্যাঁ। দেবু তিনকড়ির বালবিধবা কন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছে বটে। দেবু নিজেই তাঁহাকে অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিল।

ন্যায়রত্ন মৃদুস্বরে বলিলেন—প্রণাম করো না। এক-একজন এক-একটা বিশেষ আচরণকে মেনে চলে। সংসারে যেমন দেশাচার আছে কুলাচার আছে তেমনি আত্মাচারও আছে। ওটাতে আঘাত করতে নেই। আমি এমনিই আশীর্ব্বাদ করছি।

—কিন্তু আমি যে গরম জল নিয়ে এসেছি। পা ধুইয়ে দেব। শীতের রাত্রি—

—গরম জল! ন্যায়রত্ন একটু হাসিলেন।—জল গরম ক'রে তো কোন কালে ব্যবহার করিনি মা। আজও অরুদয়ে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গঙ্গাস্নান করি। একটু পরেই তো যাব ময়ূরাক্ষীতে স্নান করতে। তুমি ওটা রাখ। বস' তুমি। তোমায় দেখে আনন্দ হচ্ছে। পণ্ডিত!

—বলুন।

—তোমাদের দুজনকে আমার আশীর্ব্বাদ করা হয় নি। তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।

স্বর্ণ পায়ের কাছে বসিয়া বলিল—তা হ'লে যে প্রণাম করতে দিতেই হবে। মাথা যদি নোয়াতেই না দেন তবে আপনার আশীর্ব্বাদ ধরব কোথায়—ধরব কি ক'রে? ও তো হাতের অঞ্জলিতে নেওয়া যায় না। আপনিই বলুন।

ন্যায়রত্ন মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—তর্কশাস্ত্রে তোমার অধিকার জন্মেছে। কিন্তু আরও একটা কথা আছে। তোমরা প্রণাম করতে চাইলে—আমি বললাম—আমার নিজস্ব আচার আছে একটি—তাতে প্রণাম নেওয়া নিষিদ্ধ। আমি আশীর্ব্বাদ করতে চাচ্ছি, তাতে যদি তোমাদের আচারে বাধা থাকে তবে অবশ্যই না বলবে তোমরা। আর মাথা নিচু করার কথা বলছ—তার দরকার নেই মা, আলো জল বায়ু এদের মত আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাঙ্গে বর্ষিত হয়; তা-ছাড়া—তোমরা দুজনে যতই লম্বা হয়ে থাক—আমি বুড়ো হয়ে যতই নুয়ে পড়ে থাকি, হাত বাড়ালে—মাথা নাগাল অবশ্যই পাব। কি বল?

দু জনের মাথার উপর দক্ষিণ হস্তের স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—কল্যাণ হোক। আত্মার কল্যাণ!

ওদিকে রাত্রি শেষ ঘোষণা করিয়া পাখীরা কলরব করিয়া উঠিল।

ন্যায়রত্ন হাত দুইটি জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর ডাকিলেন—অজয়!

অজয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ন্যায়রত্ন তাহার দিকে চাহিয়া পায়ের কাপড়খানা ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিলেন। তাহাতেই অজয় জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিয়া বলিল—পাখী ডাকছে!

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আর একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি আসছি স্নান ক'রে।

—সে কি? আপনি একা যাবেন কোথায়? দেবু প্রশ্ন করিল।

—এখানকার সব যে আমার পরিচিত পণ্ডিত। আশী বছরের পরিচয়। মধ্যে কয়েক বৎসর কাশী গিয়েছি।

—না। সে হয় না ঠাকুর মশায়। আমি সঙ্গে যাব।

অজয় তৎক্ষণে কাপড় গামছা ঘটি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অজয় মৃদুস্বরে বলিল—ঘুম হবে না।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—চল। ঘুম হবে না যখন, তখন চল।

শ্রীহরি ঘোষ এবং পুলিশ ইনস্পেক্টর উঠিয়া কাছে আসিয়া বলিল—কোথায় যাবেন?

—স্নানে যাবেন। ময়ূরাক্ষীর ঘাটে।

—দাঁড়ান। লোক সঙ্গে দিই।

—কেন? লোক কেন? সবিস্ময়ে ন্যায়রত্ন প্রশ্ন করিলেন।

—দরকার আছে ঠাকুরমশায়। এখানকার অবস্থা আপনি জানেন না। শ্রীহরি ঘোষ হাত জোড় করিয়াও বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল—আপনাকে এ অবস্থায় কোন মতেই আমরা এইভাবে—এই সময়ে নদীর ঘাটে নির্জ্জনে যেতে দিতে পারব না। কোন কিছু যদি ঘটে যায় তবে—

—কিছু ঘটবে না শ্রীহরি। লোকের প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে অজয় যাচ্ছে—দেবনাথ যাচ্ছে।

—অজয় ছেলে মানুষ—আর দেবনাথ। শ্রীহরির চোখে একটা যেন ঝিলিক খেলিয়া গেল, বলিল—দেবনাথকেই কে রক্ষা করে ঠাকুরমশায়—তার ঠিক নাই। আপনি জানেন না বোধ হয়, দেবনাথ তিনকড়ি পালের বিধবা মেয়েকে বিয়ে ক'রে সমাজে পতিত, শিবকালীপুর পরিত্যাগ ক'রে জংসনে এসে বাস করছে।

—আমি জানি শ্রীহরি।

—হ্যাঁ আমি জানি। লোকের কোন প্রয়োজন নেই।

—লোক আমাদের—মানে সরকারী লোক—কনেষ্টবল দুজন আপনার সঙ্গে যাবে। দায়িত্ব দেবু ঘোষের নয়, দায়িত্ব আমাদের।

দেবু হাসিয়া এবার বলিল—শ্রীহরিবাবু—এতটা পথ আমিই ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। নিরাপদেই এনেছি। লোক যদি পাঠাতে চাও, পাঠাতে পার। সঙ্গে সঙ্গে যাবে—আমরা তাতে আপত্তি করব কেন ?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—না। দেবু তোমাকেও আমি সঙ্গে নেব না। আমি আর অজয় দুজনে যাব। এস অজয়।

বৃদ্ধ অগ্রসর হইলেন।

ময়ূরাক্ষীর ঘাট।

প্রকাণ্ড প্রাচীন বট—বহু শতাব্দী ধরিয়া ঘাটের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। চারিপাশে ঝুরি নামিয়া সে এক মনোরম আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়াছে। ভিতরটা শুধু বালি। বটগাছের পল্লবের জন্য রোদ পড়ে না। রাত্রে হিম পড়ে না। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই গাছতলাটি পথিকের আশ্রয় স্থল। নদীর ধারের দিকের মোটা বাঁকা শিকড় উঠিয়া রহিয়াছে অনেকগুলি। ওই শিকড়গুলিতে আগের কালে বন্দর-ঘাট দ্বারমণ্ডলে যে সব নৌকা আসিত, মোটা কাছি দিয়া ওই শিকড়ের সঙ্গে বাঁধা থাকিত। এখন একখানা জীর্ণ খেয়া নৌকা বাঁধা থাকে। কার্ত্তিক মাস, ময়ূরাক্ষীতে এখন হাঁটু জল। নৌকাখানা বালির উপর কাত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্ব দিগন্তে প্রতি মুহূর্তে আলোর আভাস উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। ওপারে ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী পঞ্চগ্রামের বাঁধ।

ন্যায়রত্ন দাঁড়াইলেন।

—অজয়।

—ঠাকুর!

—ছেলেবেলার কথা কিছুই মনে নেই ? গ্রাম মনে নেই ?

—না ঠাকুর। শুধু মনে পড়ে একটা মস্ত খড়ের চালা।

—হ্যাঁ। আটচালা। টোল বসত সেখানে। যাবে ওপারে ? বাঁধের উপর দাঁড়ালে বাড়ীর পিছন দিকের তালগাছটা দেখা যাবে।

—চলুন।

ন্যায়রত্ন কি ভাবিলেন। তার পর বলিলেন—যাব, পরে যাব। এখন থাক। এ ব্যাপারটা মিটে যাক। আমার যা বলবার আছে—বলে দায়মুক্ত হই—তারপর যাব।

—বেশ।

—চল। ঘাটে নামি। এই ভোরে তুমি স্নান করো না। দেশ আমাদের বটে—বড় ভাল দেশই ছিল এককালে। কিন্তু এখন শ্মশান ভাই। ম্যালেরিয়ায় জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। তুমি মুখ হাত ধুয়ে নাও।

ন্যায়রত্ন নদীতে নামিলেন।

অজয় মুখ হাত ধুইয়া ঘাটে বসিল।

পূর্ব্ব মুখে চলিয়া গিয়াছে ময়ূরাক্ষী। উত্তর দিকটায় পাঁচ ভাইয়ের বাঁধের ঘন জঙ্গল একটা অরণ্যপ্রাচীরের মত ময়ূরাক্ষীর ধারার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় চলিয়া গিয়াছে। ওই বাঁধের ওপারে গেলে—তাহার বহু পুরুষের ভিটা দেখা যাইবে। এদিকে দক্ষিণ দিকটা উঁচু। লাল কাঁকর-মেশানো পাথরের মত শক্ত মাটি। ঘাটের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে জংসন। সোজা দক্ষিণে ওই একটা দীর্ঘায়তন ঘন সবুজ—ওটা কি ? তার ওপাশে—আরও একটা সবুজ আভাস। দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রান্তরটা ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন স্নান শেষ করিয়া উঠিয়া আসিলেন।

—দেখছ ?

—ওই সবুজ দেখাচ্ছে—ওটা কোন গ্রাম ঠাকুর ?

—ওইটা ? ওইটিইতো জয়তারা দেবীর আশ্রম। ওখানেই তো বিবাদ! তার দক্ষিণে ওই হ'ল—বাজার দ্বারমণ্ডল। এই যে সোজা রাস্তাটা চলে গিয়েছে—এইটেই এককালের রাজপথ। এই বটতলা—এই ছিল বন্দর। কি বলব অজয়, এই যে আজ বিবাদ—

—আরে—ইটা কে বটে ? অাঁ ? ন্যায়রতন ঠাকুর মালুম হচ্ছে!

ন্যায়রত্ন চকিত হন না কিছুতে। তিনি মুখ ফিরাইলেন ধীরে ধীরে।

একখানা ডুলী ওপারে নদীর ঘাটে নামিতেছে। আরও একজন কেহ ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া সঙ্গে আসিতেছে।

—কে ঠাকুর ? আপনাকে ডাকছে এমনভাবে ?

—কেন? মনে মনে ক্ষুণ্ণ হচ্ছ? অপমান বোধ করছ? হাসিলেন ন্যায়রত্ন। কিন্তু কে তাহা তো ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না।

অজয় বলিল—একজন বুড়ো মুসলমান।

—বুড়ো মুসলমান?

—হ্যাঁ—মাথায় ফেজ টুপী, মস্ত লম্বা পাকা দাড়ী—

ডুলীটা এপারের ঘাটে আসিয়া উঠিল। তাহার আগেই ঘোড়াটা আসিয়া উঠিয়াছিল। ঘোড়ার সওয়ার ঘোড়া হইতে নামিয়া সেলাম করিয়া বলিল—আপনি? ভাল আছেন?

কুসুমপুরের ইব্‌সাদ সেখ।

ডুলী হইতে নামিয়া বৃদ্ধ মুসলমান আগাইয়া আসিয়া বলিল—ভাল আছ? চিনতে পারছ?

সে হাতখানা বাড়াইয়া দিল ন্যায়রত্নের হাতখানা ধরিবার জন্য।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—হাজী? দৌলত?

—হাঁ। সাক্ষী দিতে আসছ? কিন্তু ছুঁইবা না না-কি আমাকে?' আঁ?

ন্যায়রত্ন নমস্কার করিলেন, বলিলেন—ওভাবে তো আমরা সম্ভাষণ করি না দৌলত!

হাজী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—দোষটা কি?

—আছে।

—কি? শুনি? আমি মুসলমান—আমারে ছুইবানা। এই তো?

—তোমার সঙ্গে হাত ধরে কি কোলাকুলি ক'রে সম্ভাষণ করার মত গাঢ় সদ্ভাব তো কখনও ছিল না দৌলত। সেই জন্যেই করব না। আর মুসলমানের কথা যদি বল—তবে বলব—মুসলমান কেন—পৃথিবীর কেউই আজ আমার কাছে অচ্ছুত নয়। কিন্তু উপাসনার সময়টায়—ওই দেখ আমার প্রপৌত্র বিশ্বনাথের ছেলে বসে রয়েছে, ওকেও আমি ছোঁব না।

দৌলত ডুলীতে গিয়া উঠিল—উঠাও ডুলী। আরে আসো আসো—চলি আসো ইব্‌সাদ।

(ক্রমশঃ)

বাংলায় ব্যাঙ্কিং

শ্রীশিবশঙ্কর দত্ত

বাংলা দেশে গত মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার দেখা যায়। মহাযুদ্ধের মধ্যে মোটামুটি ভালভাবে কাজ চলে। কিন্তু যুদ্ধের শেষ ভাগ হইতে ব্যাঙ্ক জগতে এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে এবং বহু ব্যাঙ্ক কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশে ব্যাঙ্কের প্রসার মোটামুটি ভাল। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে শুধু বর্ত্তমান যুগে নহে, বহুকাল হইতেই বাংলা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রচলন ছিল।

জগৎশেঠের নাম প্রথমেই উল্লেখ করা যায়, নবাবী আমলে বর্ত্তমান পদ্ধতির ব্যাঙ্ক ছিল না কিন্তু জগৎশেঠ ব্যাঙ্কারের কাজ করিতেন। মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলি খাঁর ব্যাঙ্কার ছিলেন। সুবর্ণবণিকেরাও বল্লাল সেনের সময় ব্যাঙ্কিং কাজ করিতেন। এই সকল ব্যাঙ্কারদের বড় বড় সহরে গদি ছিল এবং হুণ্ডির সাহায্যে টাকা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠান হইত। তবে এই সকল ব্যাঙ্কার ব্যাঙ্কিং কাজের সহিত অন্য কারবার করিতেন।

ধীরে ধীরে এই সকল ব্যাঙ্কিং অপ্রচলিত হইয়া গিয়া আধুনিক ব্যাঙ্কিং দেখা দিল। ১৭৭০ সালে আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোম্পানী ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠিত করেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা এই সময়ে পর পর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কগুলি সে যুগে সাধারণ ব্যাঙ্কিং ছাড়া দেশে নোট প্রথা প্রচলন করেন। সরকারী মুদ্রা ছাড়া এই সকল ব্যাঙ্কের নোট দেশে টাকা হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং তাহার পিছনে ছিলো কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতা; অংশীদারদের সীমাবদ্ধদায়িত্ব। বহির্বাণিজ্যের জন্য এক দেশ হইতে অন্য দেশে টাকা লেনদেন করা, কর্জ্জ দাদন প্রভৃতি ব্যাঙ্কিং কাজ এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে এই সকল ব্যাঙ্কের কারবার প্রসার লাভ করে। কিন্তু তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতির ব্যাঙ্কিং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতেই ধীরে ধীরে ব্যাঙ্কিং প্রসার লাভ করিতেছে। আগেই আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে আজকাল বাংলা দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে এক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এই সঙ্কটের মু

অনুসন্ধান করিতে হইলে ব্যাঙ্কিং কাজের রূপ কি তাহা একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। অল্প কথায় বলিলে টাকাও ক্রেডিটের বিনিময়ে ব্যাঙ্কিং বলা যাইতে পারে। ব্যাঙ্ক যখন টাকা জমা রাখে, তখন আমানতকারীকে ক্রেডিট দেয় এবং ব্যাঙ্ক যখন টাকা দাদন করে তখন ক্রেডিট অর্জ্জন করে। অর্থনীতিবিশারদদের মধ্যে এই লেনদেনের প্রকৃতি লইয়া বহু তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। টাকা দাদন দিয়াই আমানত সৃষ্টি করা হয় এইরূপ (Loans create deposits) অভিমত বহুকাল হইতে স্বীকৃত ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে একটি ভিন্ন মতবাদ দেখা দিয়াছে। এই মতবাদীরা ব্যাঙ্ককে স্বোপার্জ্জিত আমানতের উপর নির্ভর করিয়াই ক্রেডিটের কাজ করিতে হয় এই কথা বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছিল। মোট কথা এই লেনদেনের মধ্য দিয়াই ব্যাঙ্কিং এবং ব্যাঙ্কারের কাজ এই লেনদেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করা। এই লেনদেনের গোলমালই ব্যাঙ্ক ফেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। আমানত টাকা ব্যবহার করিয়া উপযুক্ত পথে অর্জ্জন করিতে না পারিলে ব্যাঙ্কিং চলিতে পারে না। সেজন্য ব্যাঙ্কের পরিচালকদের কর্ত্তব্য কি ভাবে ব্যাঙ্কের অর্থ Invest করা হইবে তাহা স্থির করা; এই বিষয়ে ভুল বা অসাধুতার জন্যই অধিকাংশ ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।

সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের দুই প্রকার আমানত হয়। (১) সাধারণ আমানত (২) স্থির বা স্থায়ী আমানত ও সেভিংস আমানত। প্রথম শ্রেণীর আমানত পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কের Demand Liability বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর আমানত পরিমাণ টাকা time Liability বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আবার সেভিংস আমানত টাকা ব্যবসায়ের দিক দিয়া প্রায় Demand liability শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কিং পরিচালনের সাধারণ নিয়মে time space liability পরিমাণ টাকার ১/৩ অংশ invest করা উচিৎ। Demand liability পরিমাণ টাকা সব সময়ে ব্যাঙ্কে মজুত থাকা উচিৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি এই নিয়মানুসারে চলেন নাই। ভুল বশতঃ বা কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকের সুবিধার জন্য নানা ভাবে যথা জমি, বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে বহু অর্থ এভাবে জড়িত হইয়া যায় যে সময়মত Demand liability মিটাইয়া দিবার টাকার অভাব হইয়া যায়। আমাদের দেশের ব্যাঙ্ক ফেলের ইতিহাস হইতে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় ব্যাঙ্কিং জগতে অনেক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা বড় কম নহে।

কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক ব্যাঙ্ক সুপ্রতিষ্ঠিত। আর যে ব্যাঙ্কগুলি বড় হইয়াছে তাহারাও দুই বা ততোধিক ব্যাঙ্ক একত্র হইবার ফলে ইহা হয় নাই—কতকগুলি অধিকসংখ্যক শাখার উদ্বোধন করিয়া বড় হইয়াছে। কিন্তু এই ধারার ফল অবাঞ্ছনীয় প্রতিযোগিতা, সেজন্য মনে হয় ব্যাঙ্ক জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রীভূত করিতে পারিলে এই দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ হয়। কিন্তু হয়তো স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য সম্পূর্ণভাবে একত্রীভূত করা সম্ভব না হইতে পারে। সেক্ষেত্রে পরস্পর সাহায্যকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবসা করিবার জন্য কতকগুলি ব্যাঙ্কের মধ্যে সহযোগিতার চেষ্টা করা উচিৎ। এই সহযোগিতার কার্য্যকরী রূপ দিবার জন্য একটি বোর্ড গঠন করা যাইতে পারে। বিভিন্ন সহযোগী ব্যাঙ্ক হইতে প্রতিনিধি এই বোর্ডের সভ্য হইবেন এবং কাজের সুবিধার জন্য এই বোর্ডের সভ্যেরা একটি কার্যনির্ব্বাহক পরিচালক মণ্ডলী নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। একজন নিরপেক্ষ লোক হিসাবে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ছাড়া অপর কোন বিশিষ্ট লোককে এই বোর্ডের সভাপতি করা যাইতে পারে। সভাপতি এবং তাহাঁর অধীন পরিদর্শক সকল সহযোগী ব্যাঙ্ক পরিচালনের উপর বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

কিন্তু এই একত্রীকরণে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে সকল অঞ্চলের অবস্থা এক নহে। বিশেষত, গ্রামাঞ্চল এবং সহর এই দুই বিশেষ বিভাগ আমাদের মনে রাখিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিংএর ধারার বিশেষ রূপ আছে। সেজন্য মনে হয় গ্রামাঞ্চলের ব্যাঙ্ক ও সহরের ব্যাঙ্ক একত্রীভূত করা উচিৎ নহে। তবে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে গ্রামে সাধারণত ব্যাঙ্ক না হইয়া সমবায়-ব্যাঙ্ক মারফৎ কাজ হওয়া অধিক সুবিধাজনক।

এই সহযোগিতার মধ্য দিয়া যে নুতন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গঠিত হইয়া উঠিবে তাহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারিবে। মোটামুটি কয়েকটি বড় ব্যাঙ্কের চারিধারে আরও কয়েকটি করিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান জড়িত হইয়া কাজ করিতে থাকিবে। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। এই সহযোগিতা এবং যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যে বৃহত্তর সত্তার সৃষ্টি হইবে তাহার মধ্যে কোন দুর্ব্বল প্রতিষ্ঠান থাকিলে কুফল দেখা দিবে। সেজন্য বিশেষ ভাবে দেখা প্রয়োজন যে যে সকল ব্যাঙ্ক সহযোগিতা করিয়া নুতন ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সৃষ্টি করিবে তাহাদের বিক্রীত মূলধন, আদায়ীকৃত মূলধন এবং মজুত তহবীল কি তাহা দেখিতে হইবে। যদি কোন ব্যাঙ্ক এ সকল বিষয়ে অন্যায় পথে পরিচালিত হয় তাহা হইলে সেই ব্যাঙ্ককে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন, ব্যাঙ্ক পরিচালনে অন্য একটা পরিবর্ত্তনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে Demand liabilityর বেশীর ভাগ অংশই ব্যাঙ্ককে সকল সময় মজুত রাখিতে হয় বলিয়া কর্জ্জদাদন করিতে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি ব্যাঙ্ক এ ভাবে টাকা আমানত গ্রহণ করেন যে অনেক দেয় টাকা time liability এই পর্য্যায়ে জমা থাকে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সুবিধা হয়। অধিকদিনের জন্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করিয়া অথবা সেভিংস সার্টিফিকেট বা ক্যাশসার্টিফিকেট দিয়া এই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফল হইতে পারে। তাহা হইলে যে টাকা এই সকল বাবদে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে তাহার জন্য বিশেষ হারে সুদ দিয়াও ঐ টাকা দাদন করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বেশ ভাল ভাবে চলিতে পারে।

ব্যাঙ্ক বিষয়ে কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতসরকার একটি আইন পাশ

করিয়াছেন। তাহাতে ব্যাঙ্ক পরিচালন বিষয়ে নানাবিধ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরিশেষে আমরা তাই সকল বিধির বিষয় আলোচনা করিব।

Banking Companies Act 1949 অনুসারে ব্যাঙ্কের কর্জ্জ দাদন বিষয়ে আইন করা হইয়াছে। প্রথমত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারকে বা যে কোম্পানীতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার আছেন, সেই কোম্পানীকে কোন বন্ধক না রাখিয়া কর্জ্জদাদন বে-আইনী করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্জ্জদাদন বিষয়ে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের নিকট হইতে রিপোর্ট চাহিবেন এবং উচিৎ মনে করিলে কর্জ্জদাদন বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। ১৯৫১ সাল নাগাৎ প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে দৈনিক কার্য্যের শেষে নগদ টাকা, সোনা এবং কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে একত্র করিয়া ব্যাঙ্কের সকল আমানতি টাকার অন্তত শতকরা দুই ভাগ পরিমাণ মজুত রাখিতে হইবে। বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি (assets) থাকিবে তাহা সকল আমানতি টাকার অন্তত শতকরা ৭৫ ভাগ হওয়া চাই। প্রত্যেক ব্যাঙ্কে আদায়ীকৃত মূলধন বিষয়েও আইন করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের ব্যাঙ্কের জন্য বিভিন্ন মূলধন আদায় না হইলে ব্যাঙ্কিং কাজ করা বে-আইনী হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

যে সকল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হয় নাই তাহাদিগকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালন পদ্ধতি হিসাবে চলিতে হইবে। Demand liabilityর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে এবং time liabilityর শতকরা দুই টাকা হিসাবে টাকা প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে নগদ জমা রাখিতে হইবে অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হইবে। যে সহরে ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইতেছে তাহার বাহিরে নূতন শাখা উদ্বোধন করিতে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যাঙ্ক জগতে বহু দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ভারতসরকার এই কঠিন বিধিনিষেধকে সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আশা করা যায় যে এ সকল বিধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া ব্যাঙ্ক জগতে সুফল দেখা দিবে। কিন্তু ব্যাঙ্কিং ব্যাপারে সকলের মূলে রহিয়াছে আস্থা। সে জন্য যদি পুনরায় আস্থা ফিরিয়া আসে ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ব্যবসা করা সহজ হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের দেশে সাধারণ ভাবে প্রত্যেক লোকের আয়ের পরিমাণ এত স্বল্প যে ব্যাঙ্কের হাতে ছাড়িয়া রাখিবার অর্থের খুবই অভাব। ইহাও আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের সু-প্রসারের পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

যাই হোক ন্যায়পথে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালনে নূতন ব্যাঙ্ক আইনের বিধিনিষেধ অনুসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতায় এবং সম্ভব হইলে একত্র হইয়া কাজ করিলে আমরা ব্যাঙ্কিং জগতে অন্যান্য দেশ হইতে পিছনে পড়িয়া থাকিবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

ভলটেয়ার

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

Zadig গল্পের নায়ক বেবিলনের Zadig নামক এক দার্শনিক। মানুষের যতটা জ্ঞান থাকা সম্ভব, তাহা তাঁহার ছিল। সেমিরানাম্নী এক মহিলাকে ভালবাসেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। একদিন দস্যুহস্ত হইতে সেমিরাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি চক্ষুতে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। চিকিৎসার জন্য মিশরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হার্মিসকে আনা হইল। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবে। কবে কোন সময় দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবে, তাহাও গণনা করিয়া বলিয়া দিলেন। আরও বলিলেন, যে আঘাত যদি দক্ষিণ চক্ষুতে হইত, তাহা হইলে আরোগ্য করা যাইত, কিন্তু বাম চক্ষুতে বলিয়া তাহা সম্ভব হইবে না। বেবিলনের অধিবাসিগণ শুনিয়া দুঃখিত হইল এবং হার্মিসের জ্ঞানের তারিফ করিতে লাগিল। জাডিগের চক্ষুর ক্ষত কিন্তু শুকাইতে আরম্ভ করিল এবং দুই দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গেল। তখন এক গ্রন্থ লিখিয়া হার্মিস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে জাডিগের চক্ষুর আরোগ্যলাভ করা উচিত হয় নাই। জাডিগ সে গ্রন্থ স্পর্শও করেন নাই।

আরোগ্যলাভ করিয়াই জাডিগ সেমিরার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু গিয়া শুনিলেন অন্য একজনের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। এক চক্ষু লোককে তো আর বিবাহ করা চলে না!

তখন জাডিগ এক কৃষক রমণীকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পরে স্ত্রীর ভালোবাসা পরীক্ষা করিবার জন্য এক বন্ধুর সহিত ষড়যন্ত্র করিলেন। স্থির হইল জাডিগ মৃত্যুর ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহার বন্ধু তখন গিয়া তাঁহার স্ত্রীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবেন। নির্দিষ্টদিনে বন্ধু গিয়া দেখিলেন, জাডিগ মৃতের মত পড়িয়া আছেন, তাঁহার স্ত্রী রোদন করিতেছেন। বন্ধু কিছুক্ষণ সান্ত্বনার কথা বলিয়া পরে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। জাডিগের স্ত্রী প্রথমে ভীষণ আপত্তি করিয়া পরে সম্মত হইলেন। জাডিক সেই মুহূর্ত্তে উঠিয়া পড়িলেন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বনে চলিয়া গেলেন।

বনবাস ত্যাগ করিয়া জাডিগ এক রাজার উজীর হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে রাণী তাঁহার প্রেমে পড়িয়া গেলেন।

রাজা দুই জনকেই বিষ প্রয়োগে হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। জানিতে পারিয়া জাডিগ আবার বনবাসী হইলেন।

বনে গিয়া জাডিগের অন্তঃকরণে নির্বেদ সঞ্জাত হইল। মনে হইল মনুষ্য-জাতি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের এক কণার উপর অবস্থিত, পরস্পর হত্যাকারী। এক দল কীটমাত্র। এই সত্য উপলব্ধি করামাত্র তাঁহার মনের গ্লানি বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি বিশ্বের ইন্দ্রিয়াতীত রূপের ধ্যান করিতে লাগিলেন। হঠাৎ রাণীর কথা মনে পড়িয়া গেল। হয়তো তাঁহার জন্য রাণীকে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে. এই কথা মনে হইবামাত্র বাস্তব জগতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল এবং তিনিও বনবাস ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

পথে যাইতে যাইতে জাডিগ দেখিতে পাইলেন, একটা লোক একটি স্ত্রীলোককে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছে। স্ত্রীলোকটির সাহায্যে অগ্রসর হইলে লোকটি তাহাকে আক্রমণ করিল। আত্মরক্ষার জন্য জাডিগ সেই দুর্বৃত্তকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে লোকটির মৃত্যু হইল। স্ত্রীলোকটী তখন তাহার প্রণয়ীকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া জাডিগকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট

কিছুদিন পরে জাডিগ বন্দী হইয়া ক্রীতদাসে পরিণত হইলেন। প্রভুকে দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া জাডিগ তাহার বিশ্বাস অর্জন করিলেন। তাঁহার পরামর্শে রাজা বিধবাদের সহমরণ বন্ধ করিবার জন্য এক আইন প্রণয়ন করিলেন। সেই আইনে বিধিবদ্ধ হইল কোনও বিধবা সহমরণে ইচ্ছুক হইলে, সহমরণের পূর্বে কোনও সুন্দর পুরুষের সহিত তাঁহাকে এক ঘণ্টা কাটাইতে হইবে।

এইরূপে গল্প চলিয়াছে।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে Frederickএর সহিত Voltaireএর পত্র ব্যবহার আবদ্ধ হয়। Frederick তখনও যুবরাজ, The great হন নাই। ভলটেয়ারকে লিখিত প্রথম পত্রে ফ্রেডারিক লিখিয়াছিলেন "আপনি ভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। আমি যে আপনার সমকালে জন্মলাভ করিয়াছি,ইহা আমার জীবনের একটি বিশিষ্ট গৌরব বলিয়া মনে করি।" ফ্রেডারিক স্বাধীন চিন্তার উপাসক (Freethinker) ছিলেন। ভলটেয়ার আশা করিয়াছিলেন, যে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি জ্ঞানালোক বিস্তারে সাহায্য করিবেন এবং Dionysius এর উপর প্লেটো যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, ফ্রেডারিকের উপর তিনিও সেইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইবেন। ফ্রেডারিকের পত্রের উত্তরে তাঁহার প্রশংসা করিয়া ভলটেয়ার যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে ফ্রেডারিক সেই প্রশংসাতে আপত্তি করেন। উত্তরে ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন "চাটুবাদের বিরুদ্ধবাদী নরপতি অভ্রান্তবাদের (Infallibility) বিরুদ্ধবাদী পোপের সহিত তুলনীয়।" Anti-machiavel গ্রন্থে ফ্রেডারিক যুদ্ধের অনৌচিত্য এবং শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে রাজার দায়িত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভলটেয়ার আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। কয়েকমাস পরেই কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ফ্রেডারিক Silesia আক্রমণ করিলেন। ইয়োরোপ একপুরুষ স্থায়ী রক্তস্রোতে নিমজ্জিত হইল।

১৭৪৫ সালে প্রণয়িনী সহ প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া ভলটেয়ার French Academyর সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে বিশ্বাসী ক্যাথলিক বলিয়া তিনি আপনাকে অভিহিত করেন এবং অক্লান্ত ভাবে মিথ্যা বলিতে থাকেন। সেবার তাঁহার চেষ্টা সফল না হইলেও, পরবৎসর তিনি Academyর সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তখন তিনি Academyতে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, ফরাসী সাহিত্যে তাহা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য বলিয়া (classic) পরিগণিত হইয়াছে।

১৭৪৮ সালে ভলটেয়ার প্রণয়িনী একটী নূতন প্রণয়ী লাভ করেন জানিতে পারিয়া ভলটেয়ার ভীষণ রুষ্ট হন। কিন্তু Mrrquis de St. Lambert (নূতন প্রণয়ী) ক্ষমা প্রার্থনা করায় বিগলিত হইয়া বলিলেন "তা—বেশ করেছ! তুমি যুবক, আমি বৃদ্ধ। তোমার প্রতি

মার্কিজের অনুরাগ অসঙ্গত নয়। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই। আমি Richelieuকে স্থানচ্যুত করেছিলাম। তুমি আমাকে বহিস্কৃত করেছো। এই রূপই হয়ে থাকে। একটা পেরেক অন্য পেরেককে বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে সংসার চলে।" ১৭৪৯ সালে সন্তান প্রসবে Mme du Chatelet এর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে তাহার স্বামী ও দুই প্রণয়ীই উপস্থিত ছিলেন। কেহই কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন নাই। প্রত্যেকের প্রতি সমবেদনায় প্রত্যেকের হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল।

ইহার পরে ফ্রেডারিক ভলটেয়ারকে তাঁহার Potsdamএর রাজ সভায় নিমন্ত্রণ করেন এবং পাথেয় বাবদ ৩০০০ ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দেন। ১৭৫০ সালে ভলটেয়ার বার্লিনে উপনীত হন।

বার্লিনে ভলটেয়ার প্রচুর সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন এবং ফ্রেডারিকের ব্যবহারে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সন্তোষ স্থায়ী হয় নাই। দুই বৎসর পরে বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয় এবং ভলটেয়ার বার্লিন হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু জার্মাণির সীমান্ত অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই জানিতে পারিলেন, ফরাসী সরকার তাঁহার প্রতি নির্বাসন দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

Valtaireএর "An Essay on the morals and the Spirit of the nations from Charlemagne to Louis XIII" গ্রন্থই এই নির্বাসন দণ্ডের কারণ। এই গ্রন্থ তাহার লিখিত সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বৃহত্তম এবং তাঁহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। কাইরীতে অবস্থান কালে Madame du Chateletএর তৎকালীন প্রচলিত ইতিহাসের সমালোচনা হইতে ইহার উৎপত্তি। Madame বলিয়াছিলেন "বর্ত্তমান ইতিহাসের সহিত পঞ্জিকার পার্থক্য কি? ইহা তো ঘটনাপরম্পরা একত্র সমাবেশ মাত্র। কোন্ রাজা কখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কে কাহার পুত্র, কাহার সহিত কাহার যুদ্ধ হইল, তাহা জানিয়া লাভ কি? কোনও ঘটনার সহিত অন্য ঘটনার সম্বন্ধ বর্ণনার চেষ্টা এ ইতিহাসে পাওয়া যাইবে না।" ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন "ইতিহাসে দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ না করিলে এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অন্তরালে মানব মনের ইতিহাস অনুসন্ধান না করিলে, প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। ইতিহাস রচনার কাজ দার্শনিকের। সকল জাতির মধ্যেই ইতিহাসের সহিত উপকথা মিশিয়া গিয়াছে এবং বহু শতাব্দীর ভ্রান্তি-জালে মানুষের মন এতই জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, যে দর্শনের প্রয়োগ দ্বারাও সে ভ্রান্তির অপনয়ন সহজসাধ্য নহে। ভবিষ্যতে আমরা যাহা চাই, ইতিহাসে তাহারই উপযোগী করিয়া অতীতকে রূপান্তরিত করি। এইরূপ ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাহা ইচ্ছা তাহাই ইতিহাস দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে।"

এই ইতিহাস লিখিতে ভলটেয়ারকে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল; বন্ধু লোকের নিকট পত্র লিখিয়া প্রকৃত ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাবলীর প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহই ইতিহাস রচনার জন্য একমাত্র প্রয়োজন নহে। সংগৃহীত ঘটনাবলীর একত্ববিধানকারী তত্ত্বের (principle) আবিষ্কার এবং সেই তত্ত্বসূত্রে ঘটনাবলী গ্রথিত করা ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য্য। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সংস্কৃতির ইতিহাসই এই সূত্র। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহার ইতিহাসে রাজাদিগের কাহিনী থাকিবে না; থাকিবে প্রজা সাধারণের কথা, থাকিবে যে সমস্ত শক্তি সমাজে পরিবর্ত্তন সাধন করে, সেই সমস্ত শক্তি ও তাহা হইতে উদ্ভূত আন্দোলনের কাহিনী। যুদ্ধের বর্ণনা থাকিবে না, থাকিবে মানব-মনের অগ্রগতির ইতিহাস। ইতিহাসের যে চিত্র তিনি মনে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে যুদ্ধ ও বিপ্লবের জন্য সামান্য স্থানই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এক বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, বসিয়াছি সমাজের ইতিহাস লিখিতে, পরিবারের মধ্যে মানুষ কি ভাবে বাস করে, এবং কোন্ কোন্ কলার অনুশীলন করে তাহাই বর্ণনা করিতে। আমার উদ্দেশ্য মানবমনের ইতিহাস রচনা করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় বর্ণনা নয়; বড় বড় লর্ডদিগের ইতিহাস লেখাও আমার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। বর্ব্বর অবস্থা অতিক্রম করিতে মানুষ কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাই আমি আবিষ্কার করিতে চাই"। ইতিহাস হইতে রাজাদিগের বর্জ্জনেই দেশের শাসনযন্ত্র হইতে তাহাদিগের বহিষ্কারের সূত্রপাত। ভলটেয়ারের ইতিহাস হইতে Baron দিগের সিংহাসনচ্যুতি আরম্ভ। ইহাই প্রথম দার্শনিক ইতিহাস, ইয়োরোপে মানব মনের ক্রমবিকাশের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার আবিষ্কারের ইহাই প্রথম সুষ্ঠু উদ্যম। এই উদ্যমে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার স্থান নাই। প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তির উপর এইরূপ ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। Buckle বলেন ভলটেয়ারের এই গ্রন্থে আধুনিক ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের (Historical science) ভিত্তি রচিত হইয়াছে।" গিবন, নাইবুথর, বাক্‌ল্ ও গ্রোট তাঁহার পন্থা অনুসরণ করিয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। এখনও এই ক্ষেত্রে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হন নাই।

সত্য বলিতে গিয়া ভলটেয়ার সকলেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। পুরোহিত সম্প্রদায় রুষ্ট হইয়াছিলেন, কেননা ইয়োরোপে প্রাচীন ধর্ম্মের উপর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিজয় ও তাহার দ্রুত প্রসারকে ভলটেয়ার রোমক সাম্রাজ্যের সংহতি—বিনাশের ও বর্ব্বরদিগের দ্বারা তাহার পরাজয়ের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহাদের রোষের আরও একটা কারণ এই ছিল, যে তিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া চীন, ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশ ও তাহাদের ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রচলিত ইতিহাস-গ্রন্থে জুডিয়া ও খ্রীষ্টান দেশসকলের বর্ণনা যতটা স্থান অধিকার করিয়া থাকিত, তাঁহার গ্রন্থে তাহা অপেক্ষা স্বল্পতর স্থান তাহার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলে, পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে এক নূতন জগত উদঘাটিত হইয়াছিল; ভূ-পৃষ্ঠে এশিয়া যতটা স্থান ব্যাপিয়া আছে, ভলটেয়ারের ইতিহাসে তাহা তদনুপাতিক স্থানলাভ করিয়াছিল। ইয়োরোপীয়েরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে ইয়োরোপ তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর মহাদেশের সংস্কৃতির পরীক্ষাক্ষেত্র মাত্র। যে ইতিহাস হইতে এইরূপ ফল

উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার দেশপ্রেম-বর্জ্জিত লেখককে ক্ষমা করা সম্ভবপর ছিলনা। যে লেখক আপনাকে মুখ্যত: মানব ও গৌণত ফরাসী বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, রাজার আদেশে ফ্রান্সে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।

নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভলটেয়ার কোথায় যাইবেন প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। জেনিভার সন্নিকটে উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে 'Les-Delices' নামক eslateএর সন্ধান পাইয়া তিনি তাহা কিনিয়া ফেলিলেন এবং তথায় বাস স্থাপন করিলেন। চারি বৎসর তথায় বাস করিয়া ১৭৫০ সালে সুইস ও ফরাসী সীমান্ত প্রদেশে (সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে) Ferney নামক স্থানে তিনি স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব পর্য্যন্ত তিনি Ferneyতেই ছিলেন।

Ferneyতে ভলটেয়ার নিজের বাগানে স্বহস্তে কাজ করিতেন, অনেক বৃক্ষও তিনি রোপণ করিয়াছিলেন। তাহাদের ফলভোগ করিবার আশা তাঁহার ছিলনা—বয়স তখন তাঁহার ৬৪ বৎসর। একদিন তাঁহার এক ভক্ত, তিনি ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন বলায়, ভলটেয়ার বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, চারি হাজার বৃক্ষ আমি রোপন করিয়া গেলাম।"

আকাশ ও মৃত্তিকা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কবিত্ব কল্পনা দিয়া যদি ভগবান্,
গ'ড়েছিলে আমার এ প্রাণ ;
যদি প্রভু, মর্ম্মমাঝে দিয়েছিলে দৈব অসন্তোষ
জৈবক্ষুধাতৃষা তবে কেন মোর তরে ?
অমৃতের লাগি' যার আকুল অন্তর—
তারো কি প্রাণান্ত হবে
প্রাণ-ধর্ম্ম পালিবার তরে
শাশ্বত প্রথায় ?

হায়,
এ দেহের অন্তহীন দাবী,
পশুসম রিরংসার এ কলুষ ভার,
বুভুক্ষার তীব্র জ্বালা—
বহিতে সহিতে হবে সবাকার মত
নতশীরে আজীবন ?
এ সবার হাত হ'তে নাহি কি নিস্তার ?

কি কদর্য্য পরিবেশ
সুন্দরের পূজারীর লাগি'!
গোলাপে কণ্টকসম—
সুললিত নারীদেহে দুষ্টক্ষতপ্রায়
কবি ভাগ্যে চিরন্তন এ কি অভিশাপ—
এ কি বিড়ম্বনা !
সৃষ্টিছাড়া ক'রে যার গ'ড়েছিলে প্রাণ
কেন তবে তার তরে সে আদিম সৃষ্টির বিধান
দুঃসহ নির্ম্মম ?
বিশ্বের আনন্দ লাগি' যারে তুমি ক'রেছ সৃজন,
সে যে অনুক্ষণ
আনন্দের সিন্ধুতটে বসি' বসি' করিছে ক্রন্দন ?
চিরপিয়াসীর বুকে সাহারার তৃষা—
কীর্ত্তি—যশ—অমরতা সব মিথ্যা কথা !

আলেয়ার প্রলোভন !
মায়ামরীচিকা !
উদ্বাহুবামনচিত্তে চাঁদের স্বপন !
কে চাহে অমর হ'তে মরণের পরে,—
জীবনে যে পেল শুধু ব্যর্থতা বিশাল ?

হায় ভগবান্,
বক্ষ যার দিবারাতি ছন্দে স্পন্দমান,
চক্ষে যার কল্পনার মায়ার অঞ্জন—
তারেও করে না ক্ষমা
দয়াহীন সংসার তোমার !
চিত্ত যার ভাবলোকে করিছে বিহার—
তারো তরে বাস্তবের পঙ্কিল পশ্বল ?
তবে তার কি আশ্বাস—
কিসের সান্ত্বনা ?
কালস্রোতে ভাসাইয়া কাগজের তরী
তবে কোন্ ফল ?

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বৈভার ও বিপুল পাহাড়কে পশ্চাতে ফেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি রত্নগিরির উদ্দেশে। বৈভার ও বিপুল শিখরে অবস্থিত হিন্দু ও জৈনমন্দিরগুলি দূর থেকে ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হ'য়ে আসছিল। রত্নগিরি বিপুল পর্বতেরই দক্ষিণ ভাগে। প্রকৃতপক্ষে একে বিপুল পর্বতেরই একটা অংশ বলা চলে। এই রত্নগিরির দক্ষিণ অংশেই হ'ল আমাদের গন্তব্য গিরি গৃধ্রকূট। গৃধ্রকূট বেশী উঁচু নয়। উপরে ওঠবার সুবিধার জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে পর্বত দেহ কেটে কেটে সিঁড়ির মতো করে দেওয়া হয়েছে। উপরের দিকে বেশ একটি বড় গুহা দেখতে পাওয়া যায়। এইটিকেই 'আনন্দ গুহা' বলা হয়। এইখানে তথাগতের প্রধান শিষ্য আনন্দ তপস্যা করতেন।

আনন্দ গুহা ডাইনে রেখে পথ ঘুরে পর্বতের আরও উপরে উঠেছে।

গৃধ্রকূট পর্ব্বতশৃঙ্গে ওঠবার শৈল সোপান

দক্ষিণে আরও কয়েকটি গুহা আছে, এগুলিকে অতিক্রম করে উপরে উঠলে একটি সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যায়। এই চত্বরটির চারিদিক ইট দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। তথাগত গৌতম বুদ্ধ এইখানে বসেই বোধ করি শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধযুগের সেই শ্রেষ্ঠ দিনগুলির কথা স্মৃতি পথে উদিত হ'য়ে সমস্ত হৃদয় মন শ্রদ্ধায় অবনত হ'য়ে পড়ে। হ্যাঁ, ঈশ্বরোপাসনা—সর্বশক্তিমান সর্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের ধ্যান ধারণার উপযুক্ত স্থানই বটে। অসীমের সঙ্গে সীমার যোগ দেখে এখানে আত্মহারা হয়ে পড়তে হয়। সমগ্র চিত্ত হ'তে একটা বিরাট সত্তার উপলব্ধি জেগে ওঠে যেন। এই পবিত্র ভূমে ভগবান বুদ্ধদেবের পদরজ মিশে আছে, আছে আনন্দ মহাস্থবির মৌদ্গল্যায়ন সারিপুত্তদের চরণরেণু, আছে বৌদ্ধভক্ত মহাপ্রাণ জীবকের পদধূলি।

গৃধ্রকূট থেকে নামবার পথে অল্প দূর এসেই দক্ষিণ পশ্চিমে পাওয়া যায় জীবকের আম্র কানন। রাজবৈদ্য জীবক ছিলেন মহারাজ বিম্বিসারের চিকিৎসক। মগধে তাঁর জন্ম। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ইনি তথাগতের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। স্বীয় আম্রকাননে এক মনোহর বিহার নির্মাণ করিয়ে ভগবান বুদ্ধদেবের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আজ সেটির ধ্বংসাবশেষ গভীর জঙ্গলে সমাকীর্ণ। আমরা গৃধ্রকূট হতে নেমে বাণগঙ্গা যাবার পথে গাড়ী একটু ঘুরিয়ে নিয়ে 'মণিয়ার মঠ' দর্শন করতে গেলুম।

গৃধ্রকূটের চূড়ায় এই গিরি চত্বরে ভগবান তথাগত শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন

'মণিয়ার মঠ' নামটা একটু রহস্যজনক। একটা উঁচু মাটির ঢিবির উপর এখানে একটি ছোট্ট জৈনমন্দির ছিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে জেনারেল কানিংহাম—যাঁর কাছে ভারত তার লুপ্তপ্রায় অতীত গৌরবের প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচয় ও প্রমাণসমূহের জন্য ঋণী, তাঁর সন্দেহ হয় যে এ ঢিবির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও বৌদ্ধস্তূপ চাপা পড়ে আছে। জৈনমন্দিরের কোনও ক্ষতি না করে তিনি একটু আধটু খোঁচাখুঁচি চালিয়েই দেখেন তাঁর

অনুমান মিথ্যা নয়। তিনটি মূর্তি তিনি এই ঢিবির তলা একটু খসিয়েই আবিষ্কার করেন। একটি পালঙ্কশায়িনী মায়ার শিয়রে শ্রমণবেশে বুদ্ধদেব, আর একটি সপ্তফণাবিস্তৃত এক নাগছত্র তলে দণ্ডায়মান একটি নাগসাধুর মূর্তি, যিনি জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বলে অনুমিত হয়েছেন, তৃতীয়টি এত ভোঁতা যে কার মূর্তি সেটা সনাক্ত করতে পারা যায় নি।

এর প্রায় ৪৫ বছর পরে ১৯০৫।৬ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের Dr Blooh এখানে খননকার্য্য শুরু করেন। তিনি ঢিবির মাথার উপর থেকে ক্ষুদ্র জৈনমন্দিরটি ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে একটি ইষ্টক নির্মিত বিরাট স্তূপ আবিষ্কার করেন। এই স্তূপটিকে এখন সযত্নে রক্ষা করবার চেষ্টা হয়েছে। মাথার উপর করোগেটেড টিনের এক চূড়া করে

এই স্তূপটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এর ভিত্তিমূল গুপ্তযুগে নির্মিত হলেও এর উপরিভাগ অনেকবারই নূতন নূতনভাবে নির্মিত হয়েছিল। কারণ ভিতরের অংশ যে মাপের ইটে তৈরী হ'য়েছিল, উপরের অংশ তার চেয়েও বড় আকারের ইটে নির্মিত হ'য়েছিল দেখা যায়। তাছাড়া আরও একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায় যে এটি প্রথম আরম্ভ হয়েছিল চক্রাকারে, তারপর চতুষ্কোণে রূপান্তরিত হয়, তারপর আবার কয়েকবার চক্রাকারপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই স্তূপের উপরে উঠবার সিঁড়ি আছে এবং চারিপাশে প্রদক্ষিণ পথ বা বারান্দা ঘেরা আছে। সবার উপর শেষ যে গাঁথনি হয়েছিল সে আর ইটে তৈরী হয়নি, পাথরে নির্মিত হয়েছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এই প্রস্তরাংশের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু,

চূর্ণবালির গড়া মূর্ত্তির দুটি এখানে বড় ক'রে দেখানো হয়েছে

ছাউনি দিয়ে একে ঝড়বৃষ্টির আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হ'য়েছে। এই স্তূপের ভিত্তিমূলের চারিপাশ ঘিরে অতি সুন্দর সুন্দর চূণ বালির গড়া মূর্তি ছিল। মূর্তিগুলি তখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। প্রত্যেক মূর্তিটি প্রায় ২ ফুট উঁচু, কোনোটি পুষ্পমাল্য শোভিত শিবলিঙ্গ, কোনওটি মুকুট-শোভিতশীর্ষ চতুর্ভুজ বানাসুরের মূর্তি, কোনওটিবা পঞ্চনাগ ও নাগিনীর ফণাধরা মূর্তি, কোনওটি পর্বত শিখরে উপবিষ্ট ও সর্বাঙ্গে সর্পবেষ্টিত গণেশ মূর্তি, কোনওটি ষড়ভুজ নটরাজ শিব—ব্যাঘ্রচর্মশোভিত হয়ে ভুজঙ্গ নিয়ে নৃত্য করছেন। এই মূর্তিগুলি থেকে প্রমাণ হয়েছিল যে এই স্তূপটি গুপ্তযুগে নির্মিত হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে একমাত্র নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত গণেশ মূর্তিটি ভিন্ন অন্য আর সব মূর্তিগুলি অপহৃত হয়েছে।

বৌদ্ধ ও জৈন পর পর তিনটি ধর্মের সংস্পর্শে এসেছিল এই 'মণিয়ার মঠ'। পুরাকালে এর কি সংজ্ঞা ছিল জানা যায় না, জৈন আমলেই নাকি এর নাম হয়েছিল 'মণিয়ার মঠ'।

১৯০৫-৬ সালের খননকার্য্যের পর নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে এটি কোনও মন্দির বা দেবদেউল নয়, কারণ এর মধ্যে প্রবেশের কোনও দ্বার নেই। একেবারে ভিত্তিমূলে বা তলদেশে সামান্য একটু উন্মুক্ত পথ আছে। এর ভিতর খনন করে প্রচুর ভস্ম পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় মৃত সাধুগণের চিতাভস্ম হয়ত সংরক্ষিত হ'ত এইখানে। এই মূল স্তূপের প্রাঙ্গণে আশে পাশে ইষ্টকনির্মিত অসংখ্য বেদী দেখতে পাওয়া যায়, কোনওটি গোল, কোনওটি চতুষ্কোণ, কোনওটিবা ষটকোণ। এই বেদীগুলি যে কি কাজে লাগতো তা অনুমান করা আজ কঠিন। তবে

এটা নিঃসন্দেহ বোঝা যায় যে ধর্মসংক্রান্ত কোনও অনুষ্ঠানেই এগুলির প্রয়োজন হ'ত। অথবা পরলোকগত প্রত্যেক সাধু যাদের মৃতদেহের ভস্মাবশেষ এই ভস্মস্তূপে রাখা হ'ত, তাদের স্মৃতির উদ্দেশে বা আঁধার মৃত্যু পথে আত্মাকে আলো দেখাবার জন্য এই বেদীগুলির উপর প্রদীপ জ্বেলে দেবার প্রথা ছিল।

খননকার্য্যের সময় মাটির ভিতর থেকে এখানে নানা আকারের প্রচুর মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। কোনও কোনও পাত্র প্রায় জালার মত বড়—৪ফুট উঁচু এবং সর্বাঙ্গে অসংখ্য গাড়ুর মুখের মতো নল লাগানো। এই মৃৎপাত্রগুলির আকার কোনওটি ভুজঙ্গ-ফণার মতো, কোনওটির বা কীর্ত্তিমুখের আকার, কোনওটি মানবাকৃতি। সরু লম্বা গলা, তলাটি গোল, কাঁধের চারিদিকে আবার প্রদীপের সারিও দেখা যায় কোনও কোনওটির। এই ধরণের অসংখ্য মৃৎপাত্র এখানে পাওয়া গেছে বলে

বহুনলমুখ সংযুক্ত কলসাকার মৃৎপাত্র

কেউ কেউ বলেন, মণিয়ার মঠ ছিল সন্ন্যাসীদের কুমোরশালা! তাঁরা মাটির যা যা গড়তেন উপরওয়ালারা তা অনুমোদন করলে তাঁরা সেগুলি সন্ন্যাসীদের এই সরকারী চুল্লীতে পুড়িয়ে নিতেন।

এ অনুমান একেবারেই অসঙ্গত। Dr. Blochএর মতে এটি ছিল রাজগৃহের একটি 'সর্ব দেবায়তন'। অর্থাৎ, এখানে পূজা দিলে হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবদেবীকে পূজা দেওয়া হ'ত। তবে কেউ যদি একথা বলেন যে, ঐ বহুমুখী মৃৎপাত্র বা কলসগুলি সম্ভবতঃ পবিত্র তীর্থসলিলে পূর্ণ করে অথবা দুগ্ধ মধুতে ভরে পূর্বোক্ত বেদীগুলির উপর পুষ্প চন্দনে চর্চ্চিত ক'রে উৎসর্গ করা হ'ত নাগ-পূজার উদ্দেশে, তাহ'লে সেটা অনেকটা সম্ভাব্য বলে গ্রাহ্য হ'তে পারে। নাগবৃন্দ গিয়ে ওই একাধিক নলমুখে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে দুগ্ধ মধু পানান্তে তৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসতেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ সার জন মার্শাল কিন্তু বলেন—ওটি মন্দিরও নয়, দেউলও নয়, স্তূপও নয়। ওটি একটি বিরাট শিবলিঙ্গ! যেমন বিরাট শিবলিঙ্গ কাশ্মীরে বারমূলার সন্নিকটস্থ ফতেগড়ে দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে আরও আবিষ্কার, অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এই স্তূপের দেওয়ালের ভিতর পিঠে যে সব চূণবালি ও লাল পাথরে তৈরী নাগ নাগিনীর মূর্তি, সাপের ফণা ও কুণ্ডলি-পাকানো অজগর

নাগছত্রযুক্ত নাগরাজের মূর্ত্তি

দেখতে পাওয়া গেছে এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে নাগপূজায় ব্যবহৃত মাটির ঘটগুলি আজও অবিকল এইরকম আকারেরই তৈরী হয় দেখে নিঃসন্দেহে জানা গেছে যে এটি সেকালের একটি প্রসিদ্ধ 'নাগতীর্থ' ছিল। বিশেষতঃ পাষাণবক্ষে নাগমূর্ত্তি উৎকীর্ণকরা যে ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে, তার উপর মণিনাগের নাম পর্য্যন্ত খোদাই করা রয়েছে দেখা গেছে। এ থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে এই মণিয়ার মঠ আর অন্য কিছু নয়, এটি সেই প্রাচীন মণিনাগের পুণ্য পীঠস্থান। মহাভারতেও উল্লিখিত আছে যে মণিনাগের আবাসস্থল রাজগৃহ।

অর্ব্বুদঃ শক্রবাপী চ পন্নগৌ শত্রুতাপ নৌ।
স্বস্তিকস্তালয়স্চাত্র মণি নাগস্যচোত্তমঃ॥

(মহাভারত, সভা পর্ব্ব, ৯ম শ্লোক)

অর্থাৎ: ইহার নিকটে শত্রুতাপক অর্বুদ নাগ, স্বস্তিক নাগ এবং মণিনাগের উৎকৃষ্ট ভবন রহিয়াছে।

১৯৩৭-৩৮ সালে আবার এখানে খনন কার্য্য শুরু হয়েছিল। সেই সময় জানা গেছে যে এই সব ইষ্টকনির্ম্মিত স্থাপত্য কার্য্যের তলদেশে অসংখ্য পাথরের তৈরী প্রাসাদ মন্দির ও গৃহাদি আছে। হয়ত এতদিনে সে সব আবিষ্কৃত হ'ত যদি না অর্থাভাবে খননকার্য বন্ধ থাকতো।

মণিয়ার মঠ প্রদক্ষিণ করে আমরা উত্তর-পশ্চিমের পথ ধরে অগ্রসর হলুম। মনে রাখতে হবে যে আমরা অনেকদূর এলেও এখনও সেই বৈভার পর্ব্বতের সীমানা ছাড়াতে পারিনি। মণিয়ার মঠ থেকে কিছুদূরে পাহাড়ের দক্ষিণ গায়ে দুটি গুহা-গৃহ দেখা যায়। এদুটিকে বলা হয়

সোনভাণ্ডার

'সোনভাণ্ডার'। বিশেষজ্ঞদের মতে এ পাহাড়ের পাথর ঠিক গুহা নির্ম্মাণের উপযোগী নয়, তাই পুবদিকের গুহার ছাদ সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ে গেছে এবং পশ্চিমদিকের গুহার চাদ ও দেওয়ালে প্রকাণ্ড ফাট ধরেছে। পশ্চিমের গুহার মধ্যে একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে, দক্ষিণে একটি গবাক্ষও আছে। এই গুহার অভ্যন্তরে প্রাচীর দেহলি শীর্ষে কি যেন সব শ্লোক লেখা ছিল, কিন্তু কালের সর্ব্ব বিধ্বংসী স্থূল হস্তাবলেপনে তা প্রায় অস্পষ্ট হ'য়ে এসেছে, আর পড়া যায় না। কেবল প্রবেশ দ্বারের বাইরে বামদিকের দেওয়ালে যে শ্লোকটি লেখাছিল সেটি এখনও মিলিয়ে যায়নি। এই লেখা থেকেই গুহা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য কি এবং কোন সময় এই গুহা নির্ম্মিত হয়েছিল তা' জানা যায়। শ্লোকটি এই:—

নির্ব্বাণ লভ্যায় তপস্বী যোগ্যে: শুভে: গুহে: র্হৎ, প্রতিমা প্রতিষ্ঠে

আচার্য্য রত্নম মুনি বৈরদেবঃ বিমুক্তে কারয়াৎ—দীর্ঘতেজঃ

শ্লোকটির পাঠ সন্দেহজনক, কারণ মধ্যে মুছে গেছে। অর্থ—মোটামুটি এই, "জ্যোতির্ম্ময় মহামুনি বৈরদেব—গুরুগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ রত্ন—তাঁরই আদেশে অর্হৎ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এই দুটি গুহা নির্ম্মিত হ'ল তপস্বীগণের মুক্তি ও মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে।

জেনারেল কানিংহাম এই ধ্বংসাবশেষ গুহাদুটি প্রথম আবিষ্কার করেন। ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করে এটিকে সযত্নে রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ। ভগ্ন অবস্থা দেখেও বোঝা যায় যে এই গুহাদ্বয়ের সম্মুখে গাড়ীবারান্দার মতো প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা ছিল। তার সামনে ছিল ইট দিয়ে বাঁধানো চত্বর বা অঙ্গন। এখনও এর ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু রয়েছে। গুহার ছাদের উপর উঠবার পাহাড় কাটা সিঁড়ি রয়েছে দেখে মনে হয় হয়ত গুহাদ্বয় দ্বিতল ছিল। গুহার
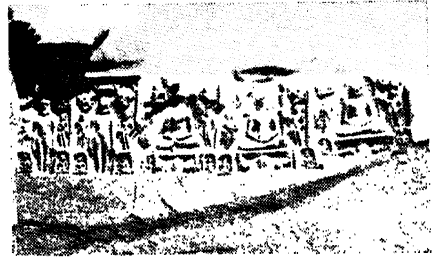
সোনভাণ্ডারস্থ পূর্ব্বগিরি গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ
জৈনতীর্থংকরগণের মূর্ত্তি

মধ্যে একটি গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মূর্ত্তির সুন্দর ভাস্কর্য্যকলা দেখে বোঝা যায় এটি গুপ্তযুগের তৈরী। এটি নাকি আগে বাইরের বারান্দায় উপুড় করা পড়েছিল। এটি যে পরবর্ত্তীকালে কেউ এখানে এনেছিলেন এরূপ সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে, যে-হেতু পাশের ছাদভাঙা গুহাটির দেওয়ালে সারি সারি ছোট বড় আকারের জৈনতীর্থংকরের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে কোনও জৈন ভক্ত জৈনসাধুদের বসবাসের জন্য এই গুহা নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। আর একটি 'শিখরাকার' কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড ওখানে রয়েছে। এই প্রস্তর খণ্ডের শিখরাকার চারটি দিকই ত্রিভুজাকৃতি। প্রত্যেক দিকেই এক একজন জৈনতীর্থংকরের নগ্ন মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে। এই মূর্ত্তিগুলির পাদদেশে জোড়ায় জোড়ায় বৃষ, হস্তী, অশ্ব ও বানর উৎকীর্ণ করা আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে এ মূর্ত্তি চতুষ্টয় জৈনদের চারটি আদি তীর্থংকর—ঋষভদেব, অজিতনাথ, সম্ভবনাথ এবং অভিনন্দন।

আমরা এইবার আমাদের রথ ফেরালুম জরাসন্ধের 'রণভূমির' দিকে। সোনভাণ্ডার সম্বন্ধে একটা গল্প এখানে প্রচলিত আছে যে ওটি নাকি মহারাজ জরাসন্ধের গুপ্ত ধনাগার। এর পথের সন্ধান নাকি

মণিয়ার মঠ থেকে কিছু দূরেই পর্ব্বতগাত্রে লেখা আছে। কিন্তু সে যে কি ভাষা, তা আজ পর্য্যন্ত কেউ নির্ণয় করতে পারেন নি। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ এই আঁচড়গুলির নামকরণ করেছেন "Shell Inscriptions।" এ নাম যে কেন হ'ল তাও দুর্ব্বোধ্য। তবে স্থানটির পাথুরে রং কতকটা লালচে ধরণের, প্রায় ঝিনুকের খোলের মতো বলা চলে। ষ্টেশন থেকে মাইল চারেক দূরে উদয়গিরির সানুদেশে খানিকটা প্রশস্ত

কোনও ধনলোভী নাকি বলপ্রয়োগে এই রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ ক'রতে উদ্যত হয়েছিলেন অর্থাৎ কামান বন্দুকের সাহায্যে পর্ব্বত ভেদ করে পথ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হতাশ হয়েছেন। এ পর্ব্বত নাকি ডিনামাইটও ফাটাতে পারে না, অতএব গল্পিকাসেবী পাণ্ডাদের এই গল্পিকাপুরাণ এইখানেই বন্ধ করে দেওয়া যাক।

'রণভূম্' বা জরাসন্ধের আখড়া নামে খ্যাত এই প্রাচীর ঘেরা স্থানটি

মণিয়ার মঠ
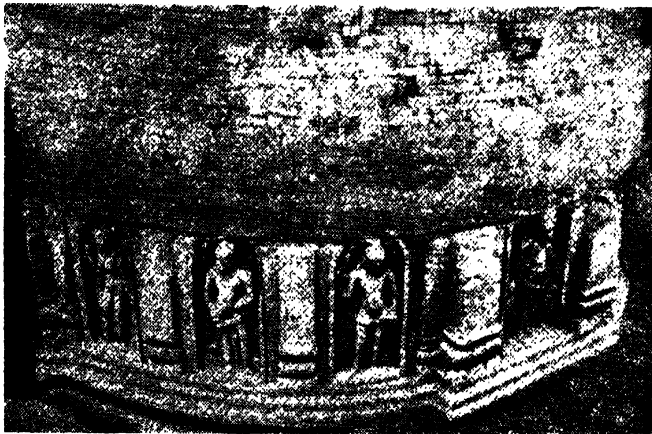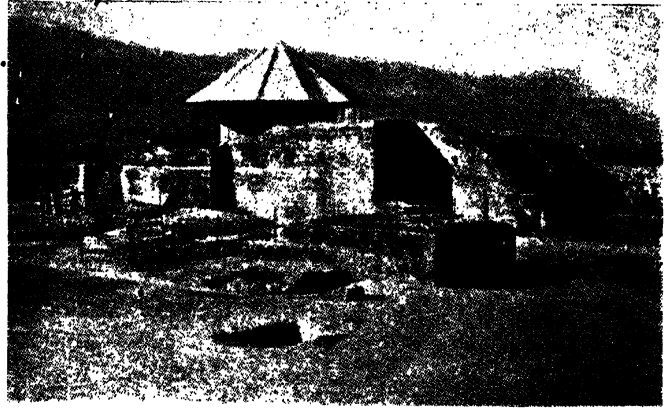
মনিয়ার মঠের প্রধান স্তূপের ভিত্তিমূলে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্য শিল্প

সমতল স্থান—যেন মনে হয় পাথর দিয়ে বাঁধানো। আমাদের গন্তব্য বাণগঙ্গা থেকে এ স্থান মাত্র আধমাইল উত্তরে। এই সমতল ভূমির উপর হিজি-বিজি কতকগুলো এলোমেলো দাগ বা আঁচড়কাটা আছে। এই দুর্ব্বোধ্য অক্ষরগুলি যে নিরক্ষর ভাগ্যবানে বুঝতে পারবে তারই ভাগ্যে লাভ হবে গিরিব্রজপুরের নৃপতিগণের যুগ যুগ সঞ্চিত বার্হদ্রথ বংশের অফুরন্ত ধনভাণ্ডার। শোনা গেল হরফ পড়তে না পেরে কোনও

সোনভাণ্ডার থেকে মাইল খানেক দূরে। জনশ্রুতি এই যে দ্বাপর যুগে মহাভারতে বর্ণিত মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন এবং মগধেশ্বর মহাবীর জরাসন্ধের মধ্যে সুদীর্ঘ ২৮ দিন ব্যাপী মল্ল যুদ্ধ নাকি এই রাজকীয় মল্লভূমিতেই হ'য়েছিল এবং ভীমসেন কিছুতেই জরাসন্ধকে পরাস্ত ক'রতে না পেরে শেষ শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অন্যায় উপায় অবলম্বনে সেই মহাবীরকে হত্যা করেন। গল্প হোক, স্থানটা কিন্তু কুস্তীর

আখড়ার মতই। দুধের মতো সাদা নরম মাটি এখানে এই পাহাড়ের কোলে পাথরের বুকে। বাহুবলাভিলাষীরা এই মাটি নাকি মুঠো মুঠো নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে মাখে, কপালে ছোঁয়ায়, জিভেও ঠেকায়! কারণ, তাদের বিশ্বাস যে এই মাটির গুণে তাদের দেহে অযুত হস্তীর বল সঞ্চারিত হবে। করা হয়েছে। মহাকবি বাল্মিকী বলেছেন 'এই ক্ষীণাঙ্গী সুদর্শনা গিরি স্রোতস্বিনী গিরিব্রজের পঞ্চ শৈলের কণ্ঠে একগাছি কুসুম মাল্যের মতো শোভা পাচ্ছে।

দক্ষিণে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ক্রমে আমরা বাণগঙ্গার

মনিয়ার মঠের একধারে বিক্ষিপ্ত অজস্র মৃৎপাত্র

গৃধ্রকুটে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ আশ্রমের অন্যান্য নিদর্শন 'সুমাগধী' গিরি-নির্ঝরিণী

এই রণভূমের একপাশ দিয়ে একটি ক্ষুদ্র গিরি নির্ঝরিণী ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। সম্ভবত এইটিকেই রামায়ণে 'সুমাগধী' নদী বলে বর্ণনা পার্ব্বত্যকূলে এসে পৌছলুম। অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য এখানে। সমস্ত মন মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

(ক্রমশঃ)

পারিবারিক আয় বৃদ্ধির একটি সহজ উপায়, পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু কিছু আয় করা। প্রত্যেকে যদি কিছু কিছু আয় করে, তাহা হইলে সমষ্টিগত আয় নিতান্ত কম হয় না। কিন্তু প্রায়ই পরিবারে দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি আয় করে, আর সকলে বসিয়া তাহার আয়ের উপরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইহার ফলে আয়কারী ব্যক্তির উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে। সংসারেরও অভাব মিটে না। অথচ পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা কিছু না করিয়া দিন কাটায়। এরূপ পরিবারে একদিকে অতিশ্রম ও অন্যদিকে পরম আলস্য দেখা যায়। একদিকে দায়িত্বের গুরুভারে অবসন্নতা, অন্যদিকে দায়িত্বহীনতাজনিত উচ্ছৃঙ্খলা। গৃহে শান্তি ও সুখের পরিবর্ত্তে কলহ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

—সত্যাগ্রহ পত্রিকা

* * * *

আমাদের বিবেচনায় ভারত সরকার নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী গ্রহণ করিলে জমীর অসুবিধার কতকটা প্রতিকার হইতে পারে।

(১) যে সকল জমি ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক প্রয়োজনে বর্ত্তমানে লাগিতেছে না তাহা অধিকৃত (requisitioned) বা গৃহীত (acquired) এমন কি ক্রীত (purchased) হইলেও তাহার মালিকদিগকে প্রত্যর্পণ করা। ইহার দ্বারা সাময়িক প্রয়োজন মিটিবে, অথচ জমিপ্রাপ্ত ব্যক্তির অসুবিধা ঘুচিবে। খাদ্যশস্যও উৎপন্ন হইবে। দেশের এই ঘাটতির দিনে ঘাটতি পূরণে সাহায্য হইবে। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যর্পণ করিতে হইলে যে সকল আর্থিক বা আইনগত বা অন্যবিধ অসুবিধার প্রশ্ন উঠিতে পারে তাহাদের সমাধান করা কঠিন হইবে না। অথবা ঐ জমিগুলিকে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলে এই গবর্ণমেণ্টে উহা খাস মহাল রূপে গণ্য করিয়া ঐ সকল ব্যক্তিকে তাহাদের জমি রায়তি স্থিতিবান সত্বে বন্দোবস্ত দিতে পারে।

(২) সামরিক প্রয়োজনে যে সকল জমি রাখা আবশ্যক তাহাদের মালিকেরা যাহাতে প্রচলিত হারে দাম পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ, সমাজের কোন শ্রেণীকে দরিদ্রতর করিয়া দিলে কোন না কোন সময়ে তাহাদের ভার কোন না কোন রূপে রাষ্ট্রের উপর বর্ত্তাইবে। তবে এবিষয়ে আইনগত অসুবিধা আছে। তাহা দূর করিতে পারিলে ভাল হয়।

(৩) ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশরক্ষা বিভাগের কোন প্রতিনিধি এই সকল বিষয়ের সরজমিনে তদন্ত করিয়া অতি সত্বর ব্যবস্থা করুন, আমরা ইহা কামনা করি।

—সত্যাগ্রহ পত্রিকা

* * * *

ভারতে বর্ত্তমানে বৎসরে ২৪ লক্ষ টন লবণ দরকার হয়। উহার মধ্যে ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টন লবণ ছাড়া আর সমস্ত লবণ ভারতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। উক্ত ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টন লবণ প্রধানতঃ এডেন ও পাকিস্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে। সম্প্রতি ভারত সরকারের লবণ উপদেষ্টা কমিটি দিল্লীতে একটি সভায় স্থির করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৫২ সালের মধ্যে ভারত যাহাতে লবণের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে তৎপক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। এজন্য ভারত সরকারের সল্ট কন্ট্রোলার শ্রী ডি এল মুখার্জ্জি বোম্বাইয়ে ভারতীয় লবণ প্রস্তুতকারক কোম্পানীগুলির প্রতিনিধিদের সহিত একটি বৈঠকে সমবেত হন। এই বৈঠকে পশ্চিম উপকূল, বোম্বাই, প্রভৃতি সমস্ত অঞ্চলের লবণ উৎপাদনকারিগণই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তাঁহারা লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যত প্রকার সম্ভব চেষ্টা করিবেন। ভারতকে প্রতি বৎসর পাকিস্থান হইতে ৭৪ হাজার টন সৈন্ধব লবণ আমদানী করিতে হয়। এই লবণ যাহাতে সম্বর ও খারাগোটাস্থিত গবর্ণমেণ্টের কারখানাগুলিতে প্রস্তুত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইবে স্থির হইয়াছে।

—আর্থিক জগৎ

* * * *

কাশ্মীর সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘের সালিশ বা ভারত ও পাকিস্থানের নেতৃত্বের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে না, কাশ্মীরের জনগণ, সেখানকার শ্রমিক—কৃষক—কারিগর—~~বুদ্ধিজীবী~~ মধ্যবিত্তদের উদ্যোগের উপর নির্ভর কচ্ছে; সঙ্কট অবসানের উপায় সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরশাসনের অবসান, জনমত প্রতিষ্ঠা, কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দাবীর ভিত্তিতে চতুর্দ্দিকে জনসাধারণকে সংগঠিত করতে পারলেই আসন টলবে ডোগরারাজের কুশাসন ও কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতার, ব্যর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদীদের জঘন্য চক্রান্ত; তার উপরে গড়ে উঠবে নয়া কাশ্মীর, ধরায় প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকারের ভূস্বর্গ সুন্দর কাশ্মীর।

—প্রতিধ্বনি

* * * *

আজকাল আশ্রয়প্রার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীর ছদ্মবেশী ব্যক্তিদের মধ্যে রাতারাতি গবর্ণমেণ্ট ও বেসরকারী ব্যক্তিদের জমিযায়গা দখল করিবার যে রেওয়াজ দাঁড়াইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া খুব সময়োচিত কাজ করিয়াছেন। এদেশে প্রত্যেক ব্যক্তিই অভাবগ্রস্ত এবং ছোট বড় সকলেরই কোন না কোন বিষয়ে অভাব রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় যাহার যে অভাব রহিয়াছে সে যদি তাহা তাহার প্রতিবেশী বা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বেআইনী ভাবে দখল করিয়া পূরণ করিতে চাহে তাহা হইলে এদেশে মাৎস্যন্যায় প্রচলিত হইবে এবং ছোট বড় সকল ব্যক্তিরই জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিলুপ্ত হইবে। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যাহারা লোভ পরবশ হইয়া এইভাবে জমি দখলের ব্যাপারে যোগদান করিতেছেন তাঁহারা জানেন না যে উহার

ফলে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির সহানুভূতি হইতে উহারা বঞ্চিত হইতেছেন। কারণ উহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে বিপন্ন বোধ করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট আশ্রয়প্রার্থীগণকে উহাদের দখলীকৃত জমি ত্যাগ করিয়া জমির জন্য উহাদের নিকট আবেদন করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের তাহাদের নিজের স্বার্থের জন্যই উহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত।

—আর্থিক জগৎ

* * * *

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ভারত কেন্দ্রীয় সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণকল্পে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষক সংগ্রহের পরিকল্পনা করিয়াছেন। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা সমন্বয় কেন্দ্রের উদ্বোধন প্রসঙ্গে শিক্ষাসচিব মৌলনা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা এবং বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবকগণকে বাধ্যতামূলকভাবে কাজে লাগান যায় সরকার তাহার ব্যবস্থা করিতে রাজী হইয়াছেন। তিনি অবশ্য আরো বলেন যে, অর্থাভাবের জন্য এক্ষণেই অনুরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না।

ইতিপূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছিল যে, শিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তাকে যুদ্ধকালীন জরুরী প্রয়োজনীয়তার ন্যায় গণ্য করা হইবে। কিন্তু এক্ষণে সরকার যখন অর্থাভাবের কথা বলিতেছেন, আমরা পীড়াপীড়ি করার পক্ষপাতী নই। তবে আমরা দাবী করিব যে, সরকারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যথাযথ অনুকূল হইবামাত্রই যেন এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয়।

—নির্ণয়

* * * *

আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে ভারত সম্প্রতি যে ১ কোটী ডলার কর্জ্জ পাইয়াছে, তাহার ফলে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৎসরে ১০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের কৃষি বিভাগের একজন কর্ম্মচারী বলেন যে, ভারত সরকার আগামী ৭ বৎসর কালের মধ্যে এ দেশের ৩০ লক্ষ একর আগাছা আচ্ছাদিত জমি চাষাবাদে আনিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহা ছাড়া অতিরিক্ত আরও ১ লক্ষ ২০ হাজার একর জমি আবাদে আনা হইবে। তিনি বলেন যে, এজন্য মোট খরচ হইবে ১৫ কোটী টাকা। উহার মধ্যে উপরোক্ত ১ কোটী ডলার ঋণ দ্বারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ট্রাক্টর ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করা হইবে। বাকী সরঞ্জাম ডলার বহির্ভূত অঞ্চল হইতে ক্রয় করা হইবে। আশা করা যাইতেছে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী হইতে মে মাসে চাষাবাদের যে মরশুম আসিবে তাহার পূর্ব্বেই আমেরিকা হইতে ৩৭৫টি ট্রাক্টর আসিয়া পৌঁছিবে। উহার সাহায্যে আগামী ৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার একর করিয়া নূতন জমি আবাদে আনা সম্ভবপর হইবে। উহাতে প্রত্যেক বৎসরে অতিরিক্ত হিসাবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টন করিয়া রবি শস্য উৎপন্ন হইবে এবং যখন সমগ্র পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হইবে তখন অতিরিক্ত হিসাবে বৎসরে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইবে।

—আর্থিক জগৎ

* * * *

হ্যাণ্ডলুম এডভাইসরী কমিটি পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশে এ প্রদেশের তাঁতবস্ত্রের কাটতি বাড়াইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, ইহা ভাল কথা। কিন্তু এ প্রদেশে তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস না করিতে পারিলে উহার মূল্য কমিবে না। বর্ত্তমান চড়া মূল্যে অন্যান্য স্থানের তাঁত বস্ত্রের প্রতিযোগিতার সমক্ষে দেশে বা বিদেশে উহা উপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই তাঁতশিল্পের স্থায়ী উন্নতি দেখিতে হইলে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন খরচ অবশ্যই হ্রাস করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন মূল্য হ্রাস করিবার জন্য সস্তা মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণ সূতা সরবরাহের ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হউন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

—আর্থিক জগৎ

* * * *

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মধ্যে চাউল, ডাইল, তরকারী, লবণ যেমন চাই-ই—তেমন চাই সরিষার তৈল। সরিষার তৈল না হইলে আমাদিগের স্নান আহার চলে না! এই সরিষার তৈলের মূল্য দিন দিন অতিশয় মহার্ঘ্য হইতেছে। বর্ত্তমানে সরিষার তৈলের সের প্রায় তিন টাকা হইয়াছে। গরীব লোকদের পক্ষে উহা ক্রয় করা সাধ্যাতীত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ বাঙ্গালাদেশে সরিষার চাষ হয় না। উহার জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। সরিষা তৈল বলিয়া যাহা খাই তাহা অখাদ্য খনিজ তৈল। উহা খাইয়া আমাদের নানাবিধ রোগ হইতেছে। সেই কারণ আমার দেশের চাষীভাইদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন সরিষার চাষ করিতে সচেষ্ট হন। ২১৪ জন অভিজ্ঞ চাষীর নিকট জানিলাম যে আমাদের এই দেশের মাটিতে সরিষা ভালই উৎপন্ন হয়। এই চাষে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না ও বেশী জলেরও প্রয়োজন হয় না। তৈল ব্যবসায়ী ও তৈল কলের মালিকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি তাহারা যেন এই বিষয়ে চাষীগণকে উৎসাহিত করেন। সর্ব্বশেষ সরকার বাহাদুরকে ও প্রাদেশিক ধান্য-চাষী সংঘকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

—দামোদর

* * * *

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের গায়েই আঘাত সবচেয়ে বেশী লাগিতেছে বলিয়া আন্দোলনে তাহাদের চীৎকারই সবচেয়ে বেশী। ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মত তাহাদের অবস্থা হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত সমাজে তাহারা স্থান চায় কিন্তু তাহার জন্য যথেষ্ট আয় নাই। আসলে 'ইতরেজনা'কে শোষণ করিবার জন্য পুঁজিপতিরা যে লোকদের কাজে লাগায় তাহারই এক অংশ হইল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। উহাদিগকে মালিকেরা

গোমস্তা ও সহায়করূপে নিয়োগ করে। সহায়তার বিনিময়ে মালিকদের কাছে কিছু আর্থিক দস্তুরী এবং আরাম ও বিলাসের কিছুটা অংশ পাইয়া থাকে। আরাম ও বিলাসের প্রলোভনে লক্ষ লক্ষ অধীনস্থ চাকুরীয়ারা প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া উহা প্রাপ্তির যোগ্য হইবার আশায় কর্তাদের নকল করিয়া চলে। এইরূপে মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখন এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, সকলের পক্ষে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ অলস জীবন টানিয়া চলা আর সম্ভব হইতেছে না। তাই তাহাদের শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। শোষণাত্মক সংস্থার সংগঠন, পালন এবং বিস্তার ঘটাইবার কৃতিত্ব যখন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রাপ্য, তখন শ্রেণীবিহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করাও তাহাদেরই কর্তব্য।

—হরিজন পত্রিকা

* * * *

ভারতবর্ষে চিনি ব্ল্যাকমার্কেট বন্ধ করা খুব সোজা। প্রথমতঃ ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট নামক মিল মালিকদের জোটটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার। তাহা হইলে দল পাকাইয়া একচেটিয়া কারবারের দ্বারা ক্রেতাদের অনিষ্ট সাধনের সুযোগ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হইবে। আমাদের দেশে কৌটিল্যের আমলে শ্রমিকদের সঙ্ঘ গঠন অনুমোদিত ছিল, কিন্তু মালিকদের কখনও জোট বাঁধিতে দেওয়া হইত না। আধুনিককালে আমেরিকাতে শেরমান আইন অনুসারে উহা নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে এই পাপ ইংরেজ আমলে প্রবেশ করিয়াছে এবং এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। সুগার সিণ্ডিকেট ভাঙ্গিয়া দিলে মিলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে এবং তাহাতে দাম কমিবে। ইহারা ১৭ বৎসর যাবৎ চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক ভোগ করিয়াছে, এখনও উহা বজায় রাখিতে চাহিতেছে। এবার এটা তুলিয়া দেওয়া দরকার। তাহা হইলে ইহারা বাহিরের প্রতিযোগিতায় পড়িয়া দাম আরও কমাইতে বাধ্য হইবে। বিড়লা-ডালমিয়া-থাপড়-শ্রীবাস্তব-নারাং-বেগসাদারল্যাণ্ডের পকেটে বছরে ২৫।৩০ কোটি টাকা তুলিয়া দিবার জন্য অনন্তকাল একটি "শিশু" শিল্প পোষার চেয়ে গুড় খাওয়া ঢের ভাল। সংরক্ষণ শুল্কের সাহায্যে চিনি-লর্ডেরা কি দাম আদায় করিতেছে তার একটু নমুনা সুগারকেন টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান স্যার টি বিজয় রাঘবাচার্য্যের মন্তব্যে পাওয়া গিয়াছে। তিনি হিসাব দিয়াছেন যে ব্রেজিলে চিনির দাম ৪০০ টাকা টন, অষ্ট্রেলিয়ায় ২৩৬ টাকা টন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০৮ টাকা টন, আর ভারতবর্ষে ৭৭০ টাকা টন।

—যুগবাণী

* * * *

বর্ত্তমানে যে প্রকার উন্নত প্রণালীতে ইউরোপ ও জাপানে মাছধরা, মাছ সংরক্ষণ ও মাছের চাষের ব্যবস্থা হয় ভারত সরকার সেই ধরণের একটি পঞ্চবার্ষিক ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্ত্তন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা মতে ভারতে প্রত্যহ ১০ হাজার টন মাছের সংস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। বর্ত্তমানে এদেশে প্রত্যহ ৫ হাজার টন মাছের যোগান রহিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা মতে ভারতের সমুদ্রোপকূল জরীপ করিয়া প্রথমে পরীক্ষামূলক ৭টি মাছ ধরার কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। উহার মধ্যে কলিকাতাতেও একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যবস্থা হইবে। এই কাজ ২ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে। অতঃপর মাছ সংরক্ষণ এবং সরবরাহের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ঠাণ্ডা গুদাম এবং যানবাহনের ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতের মিঠাজলে যে মাছ আছে ভারত সরকার তাহার সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করিবেন। এজন্য ইতিমধ্যেই দিল্লীর নিকটস্থ কতিপয় পুকুরে প্রায় ৩৪০ রকম মাছ ছাড়া হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ মাছের চাষ, মাছ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য বোম্বাইয়ে একটা গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছেন। এদিকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পলতাতে এবং মাদ্রাজের মণ্ডপম নামক স্থানে শিক্ষাকেন্দ্রে ২৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উক্ত পরিকল্পনায় এককালীন হিসাবে মোট ১ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ৬৫॥ লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় করিবেন। বোম্বাই, কোচিন, ভিজাগাপটম, চাঁদবালি এবং কলিকাতা (অথবা হুগলী নদীর মুখে অন্য কোনও জায়গায়) কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হইবে।

—সৈনিক

* * * *

ভারতের খাদ্যাভাব দূর করার পরিকল্পনার অন্ত নাই। শুনা যাইতেছে—১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারত খাদ্যে স্বাবলম্বী হইবে। চতুর্দ্দিকেই এই বিষয়ে বক্তৃতা চলিয়াছে। জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে। উৎপাদন-বৃদ্ধির অধ্যবসায়ের ত্রুটি নাই। ভারত খাইয়া পরিয়া বাঁচিতে না পারিলে তাহার অসাধারণ সংস্কৃতির পরিচয় ম্লান হইয়া পড়িবে। ভারতের প্রাক্তন কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য্য কৃপালিনী বক্তৃতা দিতে গিয়া বলিয়াছেন—দেশবাসী যদি সপ্তাহে একদিন উপবাস করে, তবেই খাদ্যাভাব অনেক পরিমাণে দূর হয়। আর যাহা অপ্রয়োজন, সেই বস্তুর চাহিদা যদি কমে, চোরাবাজার অচল হইবে। উপবাসের কথা শুনিলে নিরন্ন, অভুক্ত ভারতবাসী শিহরিয়া উঠিবে। প্রতি মাসে যে জাতি একাদশীর ব্রত পালন করে, যে জাতি রামনবমী ও জন্মাষ্টমীর দিনে অনশন-ব্রতী হয়, দুর্গাষ্টমী ও শিবচতুর্দ্দশী যাহারা উপবাসে সংযম-ব্রত পালন করে, এই কথা তাহাদের দিকে চাহিয়া যে উক্ত হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। ভারতের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে যে সকল উপবাস বিহিত আছে, তাহা স্বাস্থ্য ও অধ্যাত্মনীতিরক্ষার অনুকূল বলিয়া ভারতে প্রচলিত ছিল। ধর্ম্মের বালাই আর নেতৃবর্গের নাই। আজ অকারণ উপবাসে দেশের খাদ্যাভাব দূর করার এই বিধান অত্যন্ত বাহ্য। ভারতের প্রাণ ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইবে না। আচার্য্য আরও বলেন—অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদের চাহিদা না থাকিলে দেশে চোরাকারবার উঠিয়া যাইবে। এই কথাও ঠিক নহে। খাদ্যদ্রব্য কোন দিনই অপ্রয়োজনীয় নহে। তরী-তরকারীর মূল্য চড়া দরে যেমন বিকায়, চাল, চিনি, তেলও আদৌ মিলে না। টাকার জোর থাকিলে কিন্তু কিছুরই অভাব হয় না। আসলে জাতির প্রয়োজনই মিটে না,

অপ্রয়োজনের কথা উঠাইয়া বস্তুতন্ত্র জগৎ হইতে তিনি যে কত দূরে, তাঁহার কথায় ইহাই প্রমাণিত করিলেন। —নবসংঘ

* * * *

দুর্নীতি আছে বলিয়া সরকারী দুর্নীতি নিবারণ বিভাগের জন্ম। কিন্তু 'দুর্নীতি নিবারণ কল্পে সরকারকে সাহায্য করুন' বলিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওয়াটা একটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। বরঞ্চ উক্ত বিজ্ঞপ্তিটির ভাষা বদলাইয়া দুর্নীতি নিবারণের জন্য সরকারকে সাহায্য করিতে দিয়া বিপদে পড়ুন' বলিলে মানানসই হইত। আমরা সংবাদ পাইয়াছি জনৈক ভদ্রলোক দুর্নীতি নিরোধ অফিসারকে কোনও এক রিলিফ বিভাগের দুর্নীতির খবর দিয়া আইনের বেড়া জালে পড়িয়াছেন। ব্যাপারটি বর্ত্তমানে বিচার-সাপেক্ষ। সুতরাং আলোচনা করিয়া পুনরায় আদালত অবমাননার হাতে না পড়াই বাঞ্ছনীয়। তবে দুর্নীতি নিবারণের জন্য যে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা সাধারণ লোককে বিপদে পড়িবার আমন্ত্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এইভাবে চলিলে জলে থাকিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিবার moral force আর কত দিন থাকিবে? —গণরাজ

* * * *

আমাদের কর্তারা পাকিস্থানী প্রেমে একেবারে ডগমগ। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্থানী সাপ্তাহিক 'নকিব' কি বলিতেছেন ?—"আগষ্টের আজাদীর পর হিন্দুস্থানে যে খাঁটী হিন্দু হুকুমতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের কোন ভুল ধারণা নাই। শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র-লাঞ্ছিত তাহার জাতীয় পতাকাই প্রথম হইতে তাহার নির্ভেজ হিন্দুত্বের প্রমাণ দিতেছে। তবে হিন্দুস্থানের চিয়াং কাইশেক পণ্ডিত নেহেরু এবং অন্যান্য হিন্দুস্থানী নেতৃবৃন্দ ভণ্ডামীপূর্ণ 'সিকিউলারিজম'-এর বুলি আওড়াইয়া এ-যাবত দুনিয়াকে ধোকা দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের অবলম্বিত নীতি ও কার্য্যধারার ফলে ক্রমেই বিশ্বের নিকট তাহার ভণ্ডামী মুখোস খুলিয়া যাইতেছে।" চালাকি চলিবে না! 'নকীবের' ঈগল চক্ষুর নিকট সবই ধরা পড়িতেছে! 'নকীব' এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। ভারতীয় মুসলমানদের দুঃখ এবং ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় নকীব ইতিহাসের পাতা ঘাঁটিয়া কতকগুলি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। 'অতীতের ভয়াবহ অবস্থা' হইতে ভবিষ্যতের স্বধর্মীদের বাঁচাইবার জন্য হিন্দুবংশোদ্ভব-নকীব 'সাবধান-বাণী'ও উচ্চারণ করিয়াছেন। —সারথি

* * * *

বিহার গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের এক স্থানে ৩০ হাজার একর জমিতে যন্ত্রপাতি সাহায্যে চাষাবাদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহাতে ব্যয় হইবে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। তবে এই স্থান হইতে বৎসরে ১৫ হাজার টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের নানা স্থানে ৮ হাজার কূপ এবং ২ শত নলকূপ স্থাপনেরও সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহাতে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং উহার ফলে উক্ত প্রদেশে বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ২০ হাজার টন বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। বিহার গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের বড় বড় সহরের অধিবাসিগণ যাহাতে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারী পাওয়ার দরুণ খাদ্যশস্যের ব্যবহার কমাইতে পারে তজ্জন্য এই ধরণের প্রত্যেক সহরের চতুর্দ্দিকে তরি-তরকারী উৎপাদনের জন্য জমি খাস করিবেন বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। —খাদ্যউৎপাদন

* * * *

ষ্টেটস্‌ম্যান হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি সহরের ইংরাজী দৈনিক কাগজগুলিতে বিজ্ঞাপন দেখিলাম কৃষকেরা বেশী করিয়া চাউল দিলে সরকার তাহাদের বোনাস্ দিবেন ঘোষণা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটি পড়িয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। মাত্র দুই বৎসরের স্বাধীনতায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অভিভাবকত্বে বাংলার চাষীরা ষ্টেটস্‌ম্যান প্রভৃতি পড়িতে সুরু করিয়াছে ইহা কম গৌরবের কথা নয়। —যুগবাণী

* * * *

বাস্তুহারাদের সমস্যা লইয়া পশ্চিম বঙ্গে যাঁহারা কাজ করেন তাহাদের মধ্যে শ্রীযুত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁহার সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন—

"আর এক শ্রেণীর লোক জুটিয়াছেন যাঁহারা 'গাছের খান, তলারও কুড়ান', অর্থাৎ তাঁহারা এখানে বাস্তুহারা শ্রেণীভুক্ত হইয়া যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা আদায় করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া সেখানকার লভ্যাংশও আদায় করিয়া আনিতেছেন। অপর এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই এখানে স্থায়ীভাবে কাজ কারবার করিতেন এবং প্রয়োজন মত কখনও কখনও স্বদেশে যাইতেন, তাঁহারাও অনেক বাস্তুহারা পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া যথাসম্ভব সুযোগ লাভের চেষ্টা করিতেছেন, এবং আমার বিশ্বাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে এই চতুর শ্রেণীর লোকেরাই প্রকৃত নিঃস্ব বাস্তুহারাদের তুলনায় ঋণ, এমন কি খয়রাতি সাহায্যও অধিক কুড়াইয়াছেন। এ ছাড়া আর এক শ্রেণী আছেন যাঁহারা নিরক্ষর বাস্তুহারাদের নানাপ্রকারে প্রবঞ্চিত করিয়া স্বীয় উদর পূরণ করিতেছে। ঋণ, জমি কিম্বা খয়রাতি সাহায্য আদায় করিয়া দিবার আশ্বাস দান করিয়া তাঁহারা নিঃস্ব বাস্তুহারাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেছেন ও আত্মসাৎ করিতেছেন। এই শ্রেণীর লোকদের বাছিয়া বাহির করা এবং তাহাদের মুখোস খুলিয়া ফেলিবার দায়িত্ব স্বয়ং বাস্তুহারাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা তাঁহারা সর্ব্বক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত ও অতৃপ্তই থাকিয়া যাইবেন। তাঁহাদের অভাব অভিযোগ কদাপি মিটিবে না।" ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে এই শ্রেণীর বাস্তুহারা ও বাস্তুহারা-দরদীদের লোক অবাঞ্ছিত যদি বলে দোষ কি? —জনসেবক

ইউরোপীয়দের খাদ্য পদ্ধতি

ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

ইউরোপীয় চরিত্রের সর্বাপেক্ষা অনুকরণীয় বৈশিষ্ট্য—তাদের আহারের সময়ানুবর্তিতা। যে যেখানেই থাকুক ট্রেনে, ষ্টিমারে, কলেজে, কারখানায় বা অফিসে, তাদের খাওয়ার সময়ের কোনও নড়চড় হয় না। আমাদের দেশে দেবতার পূজার সময় আমরা দণ্ড পল বিপল মেনে ভোগ-নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া থাকি, কিন্তু নিজেদের আহারের বেলায় বাঁধাধরা নিয়ম মানতে আমরা নিতান্তই অনভ্যস্ত। শরীরতত্ত্ববিদেরা বলেন—আহারের নির্দিষ্ট সময় থাকলে পরিপাকযন্ত্রের যে সব জারকরসে খাদ্য জীর্ণ হয় সেগুলি ঐ সময়ে নিয়মিত বেশী ঝরায় ভুক্ত খাদ্যের পরিপাক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

সাহেবরা আহারের প্রথমে যে 'সুপ' খায় তাহাতে পাকস্থলী সরস হওয়ায় জারক রস সহজে নির্গত হয় এবং উহার দরুণ আহারকালে হিক্কা হতে পারে না। তদ্ভিন্ন সুপের মধ্যে মাংসের কুচি, হাড়ের ভিতরের মজ্জার রস প্রভৃতির মধ্যে যে সকল পদার্থ থাকে তাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। সুপের মধ্যে টম্যাটো, ফুলকপি, গাজর প্রভৃতির কুচি সংযুক্ত হওয়ায় উহাতে বহু উপকারী ভিটামিন ও লবণ পদার্থও পাওয়া যায়।

ওদের আহার্যে ঝালমসলা বেশী থাকে না। এমন কি পেঁয়াজ রসুনের ব্যবহারও খুব কমই দেখলাম। শীতপ্রধান দেশ বলে ক্ষুধার তীব্রতা ওদের বেশী, তদ্ভিন্ন অতিরিক্ত শীতের দরুণ খাদ্যদ্রব্যে ব্যাধিবীজ ঢুকবার বা জন্মাবার সম্ভাবনাও অনেক কম। সুতরাং ঝালমসলার প্রায় অভাব বা অল্পতার দরুণ ওদের তেমন অসুবিধা জন্মে না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে খিদে সাধারণতঃ কম পায়—সে কারণ জারকরস ইত্যাদি ঝরে কম। ঝালমশলার গন্ধে ও স্বাদে জারকরসগুলি বেশী মাত্রায় ক্ষরিত হয়; তদ্ভিন্ন অনেক প্রকার মশলাই ব্যাধিবীজ নাশক। কাজেই সাহেবদের দেখাদেখি মশলার ব্যবহার অযথা বেশী কমাতে গেলে আমরা মারাত্মক ভুল করব বলেই আমার ধারণা। আমাদের সরিষার তেলের ব্যাধি বীজনাশক ক্ষমতা সুবিদিত। হলুদের ত পচন-নিবারক ক্ষমতা যথেষ্ট। পাড়াগাঁয়ে অনেক সময় মাছ কুটে নুন হলুদ মেখে রেখে পরদিন রান্না করে—ইহা সকলেই জানেন। হলুদ মিশ্রিত থাকায় মাছ পচে উঠতে পারে না।

ইউরোপের সব দেশেই বিনা তেল বা চর্বিতে সিদ্ধ গোল আলু, সিদ্ধ ফুলকপি, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে লোকে প্রত্যহ খেয়ে থাকে। ওদের দেখাদেখি যদি আমরা ঐ সব পদার্থ কেবল সিদ্ধ করে খাই তবে ভুল করা হবে। আমাদের আলু সিদ্ধ, কলাসিদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ঘি বা তেল দিয়ে মাখিয়ে যেভাবে খেয়ে থাকি উহাই প্রশস্ত। কারণ আহারকালে আমরা তেল জাতীয় পদার্থ অতি কমই খেয়ে থাকি। ওদেশে প্রত্যেকবার আহার কালেই লোকে বেশ খানিকটা মাখন, ডিম, মাংস, মাছ প্রভৃতি খায়। উহাতে যথেষ্ট তৈল-জাতীয় পদার্থ তারা পায়। কাজেই তারা শুধু গোল আলু, কপি, কড়াইশুঁটি সিদ্ধ খেলেও মোটের উপর তাদের আহারীয় পদার্থে স্নেহপদার্থের ঘাটতি পড়ে না।

ওদেশে প্রত্যেকবার আহারের সময় ওরা বেশ খানিকটা মাছ মাংস অথবা পণির খায়। উহাতে মূল্যবান্ আমিষ জাতীয় পদার্থ তারা খেয়ে থাকে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্যবশতঃ উপযুক্ত আমিষ পদার্থ সংগ্রহ করতে পারি না—ফলে উহার অভাবে শরীর সমান প্রকারে গঠিত হতে পারে না—রোগ প্রবণতাও এজন্য বেশী দেখা যায়। ওরা আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগানর দরুণ নানা দিগ দেশ থেকে মাংস মৎস্যাদি আমদানী করে জাতীয় খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বাড়িয়ে থাকে। পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী বলে এরা মানুষের মত বাঁচার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করে খাদ্য আহরণ করে। রেশন প্রথাও এত উন্নত এবং লোকের কর্তব্যজ্ঞানও এত বেশী যে খাদ্য বিষয়ে চোরা কারবার ঠাঁই পায় না। ধনী দরিদ্র সবাই তাদের ডিম ও দুধ পেয়ে শরীর রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে।

ওদেশের সর্বত্রই প্রধান আহারের শেষদিকে ননী প্রভৃতি সংপৃক্ত মিষ্টি ও পাকা ফল খেয়ে আহার শেষ করে। আমাদের দেশেও "মধুরেণ সমাপয়েৎ" বলে কথা আছে। কিন্তু অভাবের তাড়নায় আমরা ডাল ভাতের সংস্থানই করতে পারিনে—ফল মিষ্টি আর কি করে খাব। অবশ্য চিরদিন আমাদের এরূপ অবস্থা ছিল না। গ্রামের একটু অবস্থাপন্ন লোকেই দুধ-কলা, দুধ-আম, বাড়িতে পাতা দই গুড় কলা প্রভৃতি খেয়ে আহার শেষ করিতেন। গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হওয়ায় আজ খাদ্য বিষয়ে আমরা ঐ সব উৎকৃষ্ট পদ্ধতি ভুলে মরবার পথে এসে দাঁড়িয়েছি। আধুনিক বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের দেশের অপর্য্যাপ্ত আম জাম প্রভৃতি এবং যে সব অজ-পাড়াগাঁয়ে দুধ সস্তা সে সব স্থানের দুধ ও ফল সংরক্ষিত অবস্থায় সস্তায় পেলে খাদ্যাভাব অনেকটা দূর করতে পারব। এর জন্য চাই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দীক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিরলসভাবে কার্য্যে ব্রতী হয়ে জাতীয় ধন-সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হওয়া।

ওদেশ সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে মনে হল সুইজারল্যাণ্ডের রান্না অধিকতর মুখরোচক। বোধ করি মশলা ইত্যাদির একটু বেশী ব্যবহার করে। মাছ দিলে সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা লেবুখণ্ডও (অনেকটা আমাদের পাতিলেবুসহ ইলিশ মাছের মত) পাতে দিত।

ইংরেজ এবং মার্কিনদের তুলনায় জার্মান এবং সুইসরা ব্রেকফাষ্ট বা

প্রাতরাশে মাংস ডিম্বাদি কম ব্যবহার করে বলে মনে হল। ইংরেজ ও মার্কিনদের Broakfast প্রায় 'গাদিয়ে' খাওয়া গোছের, কিন্তু খাস জার্মান বা সুইসরা সকালে খুব অল্প খাদ্যই গ্রহণ করে—মাছ ডিম মাংস বড় একটা খায় না। ইজারল্যাণ্ডের খুব বড় হোটেলেও দেখেছি, বিশেষ অর্ডার না দিলে সকালে ডিম দেয় না। শুধু রুটি মাখন, জেলি বা মধু এবং চা কফিই এদের প্রাতরাশে সাধারণতঃ দিয়ে থাকে। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর সোয়াইটজারের কাছে শুনলাম সকালে তিনি একখণ্ড মাখনযুক্ত রুটি ও চা খেয়ে কলেজে আসেন। ১২টায় ফিরে লাঞ্চ খান।

মধুর ব্যবহার প্রাতরাশের সময় অনেক স্থলেই দেখেছি। মধু যে অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য তা আমাদের দেবতার নৈবেদ্যে উপহার স্থান দেখেই বুঝা যায়। মধুতে নানা প্রকার লবণ পদার্থ, ভিটামিন কার্বোহাইড্রেট ও উপকারী উপাদান থাকে; সুতরাং আমাদের মধ্যে যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা নিয়মিত মধু খেলে তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। সাহেবদের খাদ্য পুষ্টিকর উপাদানে ভরপুর। খাদ্য পদ্ধতিও প্রশস্ত। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি উহার আংশিক অনুকরণ করেন তবে তিনি বড় ঠকবেন। সাহেবদের দেখাদেখি যদি মাছ মাংস ডিম্বাদি প্রচুর খেতে থাকি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের মত স্যালাড ও ফলমূল না খাই তাহলে স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয়ে অকালমৃত্যুর পথই হবে প্রশস্ত। অবশ্য কাঁচা শাকপাতা দিয়ে তারা যেভাবে স্যালাড করে আমাদের ব্যাধিবীজপ্রধান গরমের দেশে ঐরূপ কাঁচা শাকপাতা খাওয়ার বিপদ আছে। আমাদের শাকসবজী নোংরা জায়গায় জন্মে—পাচক চাকরদের কর্ত্তব্য জ্ঞানও কম; সুতরাং শাকপাতা আমাদের পৈতৃক প্রথায় রান্না করে খাওয়াই ভাল। তাতে ব্যাধিবীজের শরীরে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। শাকের সি ভিটামিনের কথঞ্চিৎ ঘাটতি হলেও পাতিলেবু প্রভৃতি খেয়ে তার পূরণ করা চলে। সুইজারল্যাণ্ডে ত আমাদের দেশের শাক রান্নার মত শাকের ঘণ্টই খেয়েছি। অবশ্য স্যালাডও প্রায় দিনই থাকত। যাঁদের নিজেদের বাগান আছে এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে স্যালাড তৈরীর ব্যবস্থা আছে তাঁদের পক্ষে উহা খাওয়া অসম্ভব নয়।

ওদেশে প্রাতরাশে অনেক সময় আপেল প্রভৃতি পাকা ফল বা বাতাবি জাতীয় লেবুর রস খেতে দিত। আমাদের দেশে যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তাঁরা সকালে বাতাবি লেবুর রস পাকা টম্যাটোর রস খেলে উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন বলেই মনে করি।

'আমাদের খাদ্য' পুস্তকে খাদ্যের উপাদান এবং খাদ্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই দিয়েছি। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠে উপকৃত হবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সাহিত্যের ইতিহাসে অভিব্যক্তি

শ্রীকৃষ্ণনাথ মল্লিক

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রচলিত ইতিহাসের অপূর্ণাঙ্গতা লক্ষ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলেন—প্রচলিত ইতিহাস ভারতবর্ষের "নির্জীব কালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র," কেবল মারামারি কাটাকাটির বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এই "রক্ত বর্ণে রঞ্জিত পরিবর্ত্তমান স্বপ্ন দৃশ্য-পটের" অন্তরালে—"সেই ধূলি-সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে, পল্লীর গৃহে গৃহে যে চেষ্টার তরঙ্গ নানক চৈতন্য তুকারাম—ইহাদের জন্ম দিয়াছিল, —তাহার সম্মিলিত রূপই ভারতবর্ষের সত্যকার ছবি। যাহার দ্বারা আমরা ভারতবর্ষের সেই মূলভাব ও আদর্শটিকে বুঝিতে পারিব—তাহাই হইবে ভারতবর্ষের সত্যকার ইতিহাস।"

(স্বদেশ)

রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষকে লইয়া, ভারতের জাতীয় ইতিহাসের পটভূমিতে। জাতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং সংগতি কতখানি তাহা ঐতিহাসিকগণের বিচার্য্য, তবে কথাটা যে, যে-কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রযোজ্য ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বিভিন্ন যুগের আলঙ্কারিক এবং সমালোচকগণ 'সাহিত্য' শব্দটিকে কেন্দ্র করিয়া ইহার চতুষ্পার্শে যে ব্যূহ রচনা করিয়াছেন, তাহা যেমন দুর্গম তেমনি দুরতিক্রম্য। কিন্তু সেই মতভেদ নিষিক্ত তর্ক বহুল কণ্টকময় পথে পাদক্ষেপ না করিয়াও সাহিত্য সম্বন্ধে একটা কথা বোধহয় নিঃসন্দেহে বলা চলে, যে মনের সহিত ইহার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সাহিত্য এবং আর্টের প্রথমতম এবং গোড়ার কথাই বোধহয় এই। সাহিত্য মানব মনেরই সৃষ্টি এবং মানব মনই তাহার গ্রাহক ও রসোৎসুক। বাহ্যজগতের যে রূপ, রঙ্গ, বৈচিত্র্য—হাসি, কান্না, গান—সাহিত্যেও তাহাকেই ফিরিয়া পাই; কিন্তু ঠিক যেমনটি বাহ্যজগতে, ঠিক তেমনটি নয়। বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক ভাবে দেখিলে এই দুইটির পার্থক্য বোঝা যায় না; সর্ব্বাঙ্গীণ রূপটি লইয়া বিচার করিলে কোথায় যেন একটা পার্থক্যের অনুভূতি জন্মায়। এই পার্থক্যটুকুর মূলে সাহিত্যিকের হৃদয়। বাস্তব জগৎ সাহিত্যিকের মনের মধ্য দিয়া আসে বলিয়াই এই পার্থক্যটুকু গড়িয়া উঠে। কেমন করিয়া এই পার্থক্যটুকু গড়িয়া উঠে, সাহিত্যকে মনের কোন কোন উপাদান ইহার খোরাক

জোগায়—প্রভৃতি প্রশ্ন তর্কবহুল অলঙ্কারশাস্ত্রের কথা—এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানব-মনের অংশ অনেকখানিই—কি লেখকের দিক দিয়া, কি পাঠকের দিক দিয়া।

তবে একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন যে সাহিত্য সচেতন মনের সৃষ্টি। জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে কবিগণ অত্যন্ত অচেতন হইতে পারেন—কিন্তু অনুভূতি ও সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহারা অত্যন্ত সচেতন। বাস্তব পৃথিবীতে যেমনি, তেমনি কাব্যের জগতে—সচেতনতার অভাবে এক মুহূর্ত্তও চলে না। সাহিত্যের জগতে যে একটা কথা আছে, যাহাকে বলে 'সিমেট্রি'—তাহা এই সচেতন মানসের একটা প্রধান লক্ষণ। বাস্তব পৃথিবীতে পারম্পর্য্যহীন অনেক ঘটনা ঘটে—কিন্তু সাহিত্যে তাহা ঘটলে চলে না। ইহার মূলে ঐ সচেতন মানসের সিমেট্রি বোধ।

যেহেতু মনের সৃষ্টি এবং সেই মন সচেতন—তখন একথা বলা চলে—যে সাহিত্যে সাহিত্যিকের মনের প্রভাব আমরা পাই। সাহিত্যের মধ্যে তাঁহার অনুভূতি, তাঁহার চিন্তাধারা, তাহার আদর্শ, তাঁহার দৃষ্টি-ভঙ্গি—প্রভৃতির ইঙ্গিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। আবার কেবল সাহিত্যিককে লইয়াই ত সাহিত্য হয় না। সাহিত্যে পাঠকের'ও একটা অংশ আছে এবং এ অংশও মোটেই ন্যুন নয়। পাঠক মনের রুচি, চিন্তাধারা প্রভৃতিকে অস্বীকার করিয়া লেখকের যাহা একক সৃষ্টি কালের দরবারে, তাহা কখনও টিঁকিতে পারে নাই। ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকিয়া নবীন যুবা কাশীনাথ যেদিন গান গাহিয়াছিল এবং সভার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল সেদিন শুভ্রকেশী বৃদ্ধ বরজলালকে উৎসব ঘর ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল, কারণ—

একাকী গায়কের নহেত গান, মিলিতে হবে দুই জনে।
গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা, আর একজন গাবে মনে॥

(গান ভঙ্গ—সোনার তরী)

পাঠক এবং লেখকের সম্পর্কটি এই দুইটি পংক্তিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা প্রাচীন আলঙ্কারিকবাদের সেই "সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী"রই টীকা এবং ব্যাখ্যাস্বরূপ।

সুতরাং সাহিত্যের মাঝে আমরা কেবল লেখক অর্থাৎ সাহিত্য-কারেরই মন খুঁজিয়া পাই না। যে সাহিত্য তৎকালীন পাঠক দ্বারা গৃহীত ও আদরণীয় হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা তৎকালীন জন-সাধারণেরও মনে চিন্তাধারার সন্ধান পাই এবং এই মনের সন্ধানই সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, প্রাচীন যুগ আধুনিকতার পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সেই আদিমযুগের বন-চারী উচ্ছৃঙ্খল অসভ্য জাতি পর্ব্বত সানুদেশের শিলাতল হইতে সোপানে সোপানে পদক্ষেপ করিয়া আধুনিক সুসভ্য নগরের হর্ম্ম্যতলে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই অগ্রগমনের পথের দুই পার্শ্বে কি কোনও চিহ্ন তাহারা ফেলিয়া আসে নাই? আসিয়াছে। প্রস্তর যুগের শিলাগঠিত মারণাস্ত্র হইতে আধুনিক পূর্ব্বযুগের প্রাচীন সাহিত্য—সেই অগ্রগমনের ইতিহাসের কালজয়ী স্বাক্ষর।

শিলাময় যুগের মানব অন্নকেই বুঝিয়াছিল—তাহার পর তাহারা প্রাণকে আবিষ্কার করিল—তাহার পর মন ও বুদ্ধির ধাপে ধাপে আনন্দকে অনুভব করিল।

অন্নং প্রাণো মনোবুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চতে।
কোসাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥

(পঞ্চদশী—১।৪৩)

—ব্রহ্মানন্দের স্বরূপত্ব বোধের দিক ছাড়াও মানব জাতির ইতিহাসের ধারায় ইহার মূল্য আছে। সাহিত্যের ইতিহাস সেই অগ্রগমনশীল মানব জাতির আনন্দময় সত্তার নানাভিব্যক্তির ইতিহাস।

সুতরাং কোনও দেশের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আমরা সেই জাতির অনুভূতি মূলক চিন্তাধারার নানাভিব্যক্তির সহিত পরিচিতি লাভ করি।—কথাটা কিন্তু আরও একটু ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। মানুষের চিন্তাধারার সহিত সমাজের একটা সম্বন্ধ আছেই। সে কবে কতদিন পূর্ব্বে কেহ জানে না—আদিম যুগের মানুষের অসুবিধামূলক অনুভূতির মধ্য দিয়া সমাজ সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পর কত যুগ অতীত হইয়াছে সমাজ মানুষের সহিত অঙ্গাঙ্গী-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। সমাজের পথ ধরিয়া আসিয়াছে সংস্কার, পরার্থপরতা, দয়া, স্নেহ, প্রীতি;—মানুষ তাহাদের একান্তভাবেই আপনার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সমাজিক মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারিয়াছে? অগ্রগমনশীল মানবের প্রয়োজন নিত্যই নব নব। মানুষ প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারে না।—একটা পাইলে আর একটার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সাধারণ মানসে প্রথমে এই প্রয়োজন বোধ থাকে অত্যন্ত গোপনে, সংস্কারের আবরণে আপনাকে গোপন করিয়া। কিন্তু সাহিত্যিক তাঁহার সচেতন মানসে ইহাকে উপলব্ধি করেন এবং সাহিত্যে রূপদান করেন। ক্রমশঃ জনসাধারণের মনে এই প্রয়োজনবোধ স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় এবং সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন লাভ করে। তাই বলা হইয়া থাকে, সাহিত্যে ভাবীযুগের ছায়াপাত হয়।

সুতরাং যদি বলা যায় সাহিত্য সমাজের প্রতিফলন—তাহা হইলে সবটুকু বলা হয় না। সেই যুগের সমাজ ছাড়াও ভাবীযুগের সমাজের খানিকটা ছায়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমরা পাইয়া থাকি। এক যুগের মানুষ কিরূপ সমাজ চায় তাহা তাহার চিন্তাধারার মধ্য দিয়া সেই যুগের সাহিত্যে প্রকাশ পায়। সেইজন্যই সাহিত্যের আলোচনায় মানুষের চিন্তাধারা মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গি—মানুষের মনের প্রাধান্য বাঞ্ছনীয় এবং যাহার মধ্য দিয়া এই চিন্তাধারার, এই দৃষ্টি ভঙ্গির ধারাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে, যাহার দ্বারা বিভিন্নযুগের সাহিত্যের পটভূমিকায় জাতির সভ্যতার ধারাটি—মনের ক্রমাভিব্যক্তির ধারাটি ফুটিয়া উঠিবে তাহাই হইবে সাহিত্যের সত্যকার ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের যে দৈন্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাহা পরিপূর্ণতা করিবে সেই ইতিহাসের প্রস্তুতিতে। ইহার মধ্য দিয়া জাতি তাহার পূর্ব্ব পুরুষকে চিনিতে পারিবে, তাহাদের অগ্রগমনের ধারাটিকে চিনিতে পারিবে। অতীত ও বর্ত্তমানের এই প্রভেদ দূর হইবে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আরম্ভ দশম একাদশ শতাব্দী হইতে সিদ্ধাচার্য্যগণের গীতি-কবিতার মধ্য দিয়া। ঠিক ইহার পূর্ব্বেই বাংলা ভাষা মাগধি অপভ্রংশ হইতে জন্মলাভ করিয়া স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আরম্ভ হইলেও সাহিত্যের ইতিহাস এখানে আরম্ভ নয়। সাহিত্য ও ভাষা একটা বস্তু সামগ্রী নয়। পাঁচ জনে মিলিয়া একটা কমিটি করিয়া মানুষ ভাষা ও সাহিত্যের সূত্রপাত কোনও দিন করে নাই। কালের ক্রম-অগ্রমান গতিপথে নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজন, যুগোপযোগী চিন্তাধারার অভিব্যক্তি সব মিলিয়া মিশিয়া একটা স্বয়ং সক্রিয় উপায়ে ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে। বৈয়াকরণ আসিয়াছেন পর যুগে—স্বয়ংসৃজিত ভাষাকে বিজ্ঞানের ধারা দিয়া বাঁধিয়া দিতে। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অনুবর্ত্তন করিতে হইলে মাঝ পথ হইতে তাহার সঙ্গ লইলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় জানা যায় না। আর তাহা ছাড়া সাহিত্য যেদিন সৃষ্ট হইল জাতিও সেদিনই সৃষ্ট হয় নাই। সাহিত্য ও ভাষা জাতির ক্রম বিকাশের ধারার একটা বিশেষ কালের অভিব্যক্তি মাত্র। যে কোনও দেশ হইতে হউক আর খৃঃ পূঃ যত অব্দেই হউক, যাহারা বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী ত তাহাদেরই চিন্তা রাশির ধারা বহন করিয়া আসিতেছে—বিভিন্ন জাতির সহিত সংমিশ্রণে বিভিন্ন শক্তির সহিত সংঘাতে তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যদি আমরা বাঙ্গালীর মনের সহিত পরিচয় লাভ করিতে চাই তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব যেদিন—সেদিন হইতে আলোচনা সুরু করিলে চলিবে না—যে মানসিক সচেতনতা—যে প্রয়োজনবোধ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ঘৃণিত একটা কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের দরবারে উন্নীত করিয়া দিয়াছিল তাহারও সহিত সম্যক পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

ইতিহাস ও সাক্ষ্য প্রমাণের অতীত আদিম মানবের গুরু পদভরে কম্পিত বিশাল অরণ্যানীর গভীর গহনে কি চেষ্টা উঠিয়াছিল, কি আশা স্পন্দিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কিছুটা আমরা অনুমান করিতে পারি কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া। সেই আদিম মানবের মনে প্রথম কোন বৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাই বা আজ কে সঠিক বলিতে পারে। তবে সৃষ্টি বাসনা এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা যে মানবের সুপ্রাচীন আদিম যুগেরই আহরণ ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই। সৃষ্টি বাসনা প্রথম দেখা দিয়াছিল অত্যন্ত স্থূলভাবে। আপনার সন্তান সন্ততির মধ্য দিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য পুরুষ ও নারী পরস্পরকে জীবনের সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল। তবে এই বাসনা ছিল ইন-বর্গ, কিংবা ইভলিউ সানারি। ইতিহাসের প্রথম যুগের এই স্থূল ও দৈহিক সৃষ্টি বাসনা মানবের যে অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, সেই অন্তর পরবর্ত্তীকালে ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টির মত দুষ্কর কার্য্যে অগ্রসর হইল। প্রথম যুগে মানব আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল সন্তান সন্ততির মধ্য দিয়া; পরবর্ত্তী যুগে মানব আপনাকে বাঁচাইতে চাহিল আপনার চিন্তার মধ্য দিয়া। আমার চিন্তা রাশি, আমার ভাবনা সঞ্চারিত হোক অপরের হৃদয়ে, স্থান, কাল, পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যপ্ত হোক বিশ্বচরাচরে, সঞ্চালিত করুক আগামী কালের মনুষ্য সমাজকে—মানুষের এই প্রকার একটা চিন্তার ফল প্রথমতঃ ভাষা এবং পরে সাহিত্য।

কিন্তু মানুষের চিন্তা ও একটিমাত্র পথ দিয়া চলে না। সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে, মানুষের চিন্তাধারা বিস্তৃত ও বিস্তৃততর হইয়া চারিদিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। মানুষের সাহিত্যের মধ্য দিয়া অমরতার পথ প্রস্তুতির অবসরে মানুষের আর যে সকল বৃত্তি বিকশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অন্যতম প্রধান।

আদিম মানুষ দেখিল পৃথিবী বিশাল এবং তাহার মধ্যে সে একা। সূর্য্য উঠিতেছে, প্রভাতের স্নিগ্ধতা মধ্যাহ্নের দীপ্ততার মধ্য দিয়া সায়াহ্নের মাধুরিমায় নিমীলিত হইতেছে। বাতাস বহিতেছে, কখনও দক্ষিণের মলয় বাতাস নরনারীর হৃদয় অকারণ পুলকে ভরিয়া দিতেছে, কখনও বা প্রলয়ের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত সৃষ্টিকে ছারখার করিয়া দিতেছে। মানব দেখিল ফুল ফুটিতেছে, গাছ পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হইয়া আবার ঝরিয়া পড়িতেছে। আদিম মানব ভাবিল এই বিশাল বিচিত্র পৃথিবীতে সে একা। এই বিরাট একাকিত্ব, এই অসহ অসহায়ত্ব মানুষের চিন্তাও কল্পনা শক্তিকে ভগবানের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিল। পাহাড় পর্ব্বত নদী, বৃক্ষ, বায়ু, জল—প্রতিটি প্রাকৃতিক বস্তুতে বিস্ময় বিমুগ্ধ মানব তাহার হৃদয় অঞ্জলি তুলিয়া দিল। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব ত পরবর্ত্তীকালের যোজনা। ঈশ্বর পরিকল্পনার প্রথম যুগে ঈশ্বরের প্রতি দ্বিধাবিহীন, কুণ্ঠাহীন শ্রদ্ধা অর্পণ। পরবর্ত্তী যুগ বিজ্ঞানের—যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃ প্রণোদিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রতিষ্ঠা।

বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ সিদ্ধ আচার্য্যগণের গীতি কবিতায় মুখরিত। কিন্তু বাঙ্গালী মানসের কোন স্তর এই ধর্ম্মমূলক গীতি-কবিতার সৃষ্টি করিয়াছিল সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কালে তাহাই বিবেচ্য। বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি, কালের দিক দিয়া জাতির উৎপত্তির অনেক পরবর্ত্তী স্তরের, ইহা নিঃসন্দেহ। চর্য্যাপদগুলিতে যে উপায়ে ধর্ম্মের তত্ত্ব ও পন্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিকতা সম্পন্ন ইহা লক্ষণীয়। মনুষ্য সৃষ্টির বহু পরের কথা—তখন প্রথম বিস্ময় ও যুক্তিহীন উচ্ছ্বাস কাটিয়া গিয়াছে—মানুষ ভাবিতে শিখিয়াছে—সকল কিছুকে বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাঁধিতে শিখিয়াছে। বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের সুমহান ঐতিহ্য পিছনে। দুঃখ শোক জরা ক্লিষ্ট মানব চাহিয়াছিল মুক্তি—শারীরিক এবং মানসিক। চিন্তাশীল সম্প্রদায় আছেন সর্ব্বযুগেই; চর্য্যাপদ গুলিতে রহিয়াছে সেই যুগের চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘ চিন্তার ফল। যে জাতির অন্নের অভাব ছিলনা, কঠোর জীবন সংগ্রামে যাহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয় নাই—সুজলা সুফলা বাংলা দেশের সরল নির্ব্বিরোধ গ্রাম্য জীবন তাহাদিগকে মানসিক চিন্তাধারার কোন সুউচ্চ পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত এই চর্য্যাপদগুলি। সংস্কৃত সাহিত্য সুউন্নত ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য ছিল একান্তভাবে আভজাত-

গণের গণ্ডির দ্বারা সুরক্ষিত। দেশের আপামর জনসাধারণ যাহা চাহিয়াছিল, যাহা চিন্তা করিয়াছিল—তাহার প্রকাশ কথ্য ভাষায় লিখিত এই গানগুলি। সংস্কৃতাভিমানী অভিজাত সম্প্রদায়ের কঠোর দৃষ্টির আড়াল করিবার জন্য তাই ইহার কবিগণের সচেষ্টতা—সন্ধ্যা ভাষার অনুসরণ।

এই চর্য্যাপদের যুগের পর দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন নাই। যাহারা শুধু চিন্তাই করিয়াছিল—যুদ্ধ বিগ্রহের উন্মাদনা যাহাদের মনে এতটুকুও শিহরণ জাগাইতে পারে নাই—মুসলমানগণের তীব্র আক্রমণ তাহারা প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। সরল শান্তিপ্রিয় আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিভোর জাতি এই তুর্কী অভিযানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই দেড় দুইশত বৎসরের রক্ত চিহ্নিত ইতিহাস জাতির জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাই ইহার পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য আলোচনা করিয়া।

তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির মনে অভিব্যক্তির ইতিহাস খুঁজিতে গিয়া মধ্যে দুইশত বৎসরের একটি ছেদ পড়িতেছে। চর্য্যাপদে বাঙ্গালী মানসের যে পরিচয় পাইয়াছিলাম—তাহা এই দুইশত বৎসর অনেক কিছুই সঞ্চয় করিয়াছে। সুতরাং তুর্কী অভিযান শেষ হইলে যে সাহিত্য আমরা পাই—তাহা অনেকটা উন্নত স্তরের। এই সাহিত্যের ধারাকে মোটামুটী ভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদের মধ্য দিয়া মঙ্গল কাব্যের গোড়াপত্তন ও (২) মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের বীজ বপন।

কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদের মধ্য দিয়া যে মঙ্গল কাব্যের ধারার প্রবর্ত্তন করিলেন—তাহার একটা সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব। এই নূতন কাব্য ধারার প্রবর্ত্তনার পটভূমিকা স্বরূপ রহিয়াছে সুদীর্ঘ দেড়-দুইশত বৎসরের পরাজয়ের গ্লানি ও নিরুদ্ধ-অভিমান প্রহত প্রাণস্পন্দন—যাহার অলিখিত নিদর্শন আজিও অনাবিষ্কৃত। তুর্কী আক্রমণ একদিন আসিয়া পড়িয়াছিল অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে আপনার ধ্যান ধারণায় নিরত বঙ্গবাসীর উপর। পরাজয়ের তীব্র জ্বালা ও মসী-চিহ্নিত বিপর্য্যয় বাঙ্গালী মানসের চিন্তাধারা ও কল্পনাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছিল—পরবর্ত্তী যুগের মঙ্গল কাব্য সেই পথেরই প্রকাশ। পরাজিত মানব যেমন তাহার নিশীথ শয্যায় আপনার উপর অলৌকিক বীরত্বের কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে, তেমনি তুর্কী আক্রমণে বিপর্য্যস্ত জাতি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, অপরাজেয় আদর্শ-পুরুষের কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা চাহিয়াছিল। গ্লানি লাঞ্ছিত দুইশত বৎসরের ইতিহাস তাই জাতিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের চন্দ্র-সদৃশ মানব রামচন্দ্রের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। তাই মঙ্গলকাব্যসমূহ দেবানুগৃহীত নায়কের তাৎপর্য্যহীন বীরত্ব কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই নূতন কাব্য ধারার প্রবর্ত্তনা—এই নূতন বিষয় সন্নিবেশ—এই দিক দিয়া দেখিলে মুসলমান আক্রমণের একটি অত্যন্ত শুভ ফল।

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্য দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে বীজ বপন করিলেন—তাহা চর্য্যাপদের কবির বাক্যধারারই অনুবর্ত্তন। দেশে বিপ্লব আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সে বিপ্লব পূর্ব্বতন চিন্তাধারার স্রোতকে ও রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে নাই। তন্ত্রের যুগ হইতে কেমন করিয়া বৈষ্ণব যুগের উদ্ভব হইল, ধীরে ধীরে কেমন করিয়া এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হইল—তাহা আজও অন্ধকারে। তবে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া খানিকটা ধারণা করা সম্ভব হইতে পারে। রাধাকৃষ্ণ কাহিনী, কাহিনী হিসাবে বহুদিনই এদেশে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও শৈব আচার্য্যগণের সহজ ধর্ম্মতত্ত্ব তাহার সহিত কালের চক্রে মিশিয়া গিয়াছিল এবং কাহিনীর কৃষ্ণ দেবতায় পরিণত হইয়া গেল। মানুষের মানসিক বৃত্তিগুলিও ক্রমশঃ ক্রমশঃ সজাগ হইয়া উঠিতেছে। প্রেম এবং ভক্তি মানবকে এতখানি নাড়া দিয়াছিল যে তাহাদের স্রোতকে একই খাতে বহাইবার জন্য সেই প্রাচীন যুগেই একটা বিরাট প্রচেষ্টার কম্পন জাগিয়াছিল। জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কাব্যে এই প্রেম ও ভক্তির মিশ্রণের ধারাটি সুন্দর। জয়দেব প্রেম ও ভক্তি কতকটা স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া মিশ্রণ ঘটাইয়াছিলেন—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই প্রেম ও ভক্তিকে সম্পূর্ণ-ভাবেই মিশাইয়া দিয়াছেন তবে একটু যেন কাঁচাহাতে। অবশেষে কাব্যের কল্পনা বাস্তবরূপ লাভ করিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মধ্য দিয়া। আপনার জীবন-খাতে প্রেম ও ভক্তির ধারায় ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল প্লাবিত করিয়া, প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে স্পন্দন জাগাইয়া শ্রীচৈতন্য হইলেন যুগপ্রবর্ত্তক। কবি ভাবিলেন—এই ত প্রেমময়ী রাধা—এই ত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ—

"রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপং"

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে চৈতন্যের পর বহুদিন ধরিয়া চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেরই অনুসরণ ও অনুবর্ত্তন চলিল। অগণিত ভক্তকবি চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত এই ধর্ম্মের তত্ত্ব ও মর্ম্ম অবলম্বনে বহুসংখ্যক গীতি রচনা করিয়া গিয়াছেন—যাহার সমাদর জনসাধারণের নিকট আজিও বজায় আছে। নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণকে হৃদয়ের একটি চিরন্তন শাশ্বত বৃত্তি স্বীকার করিয়া তাহাকে ভক্তির স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে জাতির মনের যে গভীরতা ও উদারতা প্রকাশ পাইয়াছে—এই প্রসঙ্গে তাহাও বিবেচ্য।

এমনি করিয়া মুসলমান অভিযানের পর বাংলা সাহিত্য দুইটি পথ ধরিয়া যাত্রা সুরু করিল—একটি শাক্ত ভাব, অপরটি বৈষ্ণবভাব; একটি শক্তি ও বিজয়ার উপাসনা, অপরটি প্রেম ও ভক্তির আরাধনা। কিন্তু লক্ষণীয় যে উভয় পথই ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া। জাতির কল্পনা নেত্রে তখনও ঈশ্বরের মোহাঞ্জন লাগিয়া আছে। তাহার সকল ভাবনা, সকল চিন্তা, সকল পরিকল্পনার মূলে ঈশ্বর। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বাংলা সাহিত্যের এই দুটি ধারা আগাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে নয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাংলা

দেশে এতখানি বিপ্লব জাগাইয়াছিল যে শাক্ত ধারাতেও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদ্ভাসিত জোয়ার বহুলাংশেই পড়িয়াছিল। মঙ্গল কাব্যগুলি বিশেষ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাব্যগুলিতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই প্রভাব লক্ষণীয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধারা আধুনিক-কাল পর্য্যন্ত ত প্রায় অবিকৃত ভাবে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু মঙ্গল কাব্যেরধারা আরও বিভিন্ন ভাগ হইয়া সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ গঠন করিয়াছে।

প্রথম যুগে মানব ঈশ্বরের নিকট প্রশ্নহীন দ্বন্দ্ববিরহিত চিত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সে যত অগ্রসর হইয়া আসিল—তত তাহার নিষ্কলঙ্ক চিত্তক্ষেত্রে দুই একটি সংশয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। এই সংশয়ের রন্ধ্র পথে মানব আসিয়া প্রবেশ করিল দেবতার স্থানে অভিষিক্ত হইয়া। মনুষ্য ইতিহাসের নূতন যুগ মনুষ্য অধিকারের যুগ; মানবের স্বীয় অধিকার দাবী এবং দেবতার পরিবর্ত্তে মানবের পূজা—আধুনিক যুগের প্রধান লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। এই আধুনিকতা, মানবের এই অধিকার দাবী অবশ্য একদিনে আসে নাই; মানুষের চিন্তাধারার সহিত ক্রমশঃ ধীর পাদক্ষেপে ইহা অধুনা-কাল অবধি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। যেদিন পৃথিবীরই একজন মানব আপনার অপরিসীম প্রেম ও ভক্তিতে স্বর্গের দেবতার স্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন—সেইদিনই পৃথিবীর মানুষ মানুষের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের হাতে বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় ধারায় যে গীতি কবিতার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বাঙ্গালী জাতির চিন্তাধারায় বিশিষ্ঠতার পরিচায়ক। মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পাদক্ষেপে দেবতার নরত্ব আরোপ এবং মানবে দেবত্ব আরোপ। ইহার পরবর্ত্তী স্তর আপনার মহিমায় মহিমান্বিত মানবের বর্ণনা। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সমাশ্রিত সাধারণ মানবের প্রতিষ্ঠা আরও পরবর্ত্তী যুগের। ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদনের কাব্য কালানুক্রমিক ভাবে পাঠ করিলে মানবের এই ক্রমিক বাস্তবাভিমুখীন চিন্তা ধারার সহিত পরিচয় লাভ করা যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ধারা চৈতন্যদেবের পর প্রায় অবিকৃত ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলিগুলি বাঙ্গালী মানসের সহিত এতখানি মিশিয়া গিয়াছে, সর্ব্বোপরি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙ্গালী জাতির উপর এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে আজও কীর্ত্তনের আকারে পদগুলি গৃহীত ও আস্বাদিত হইতেছে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের যে ধারাটি তুর্কী অভিযানের পরেই বীরত্ব কাহিনী লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা চৈতন্য আবির্ভাবের পর দুই ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে। এই দুই ভাগই বাঙ্গালী জাতির মনের বিশিষ্টতার পরিচায়ক। বাঙ্গালীর যে মন চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত প্রেম ধর্ম্মে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল—মঙ্গল কাব্যের একটি ধারা তাহার সহিত প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রাণ দেবতাকে স্বর্গের অনধিগম্য শীর্ষ দেশে অপাংক্তেয় করিতে পারে নাই—কৃষ্ণ ও রাধার মতই—মেনকা, ও উমাকে আপনার কুটীরে অবনমিত করিয়াছে। আপনার প্রাণের রক্ত ও রসে কবিতাগুলি সত্যই অপূর্ব্ব, এবং বাঙ্গালী বিশিষ্ট মানসের সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের এই ধারা যাহা বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে শাক্ত পদাবলীর আকার ধারণ করিয়াছে—পরবর্ত্তী কালে বাউল গান—তর্জ্জা গান—ও কবিগণের আকার ধারণ করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের অপর ধারাটি ভারতচন্দ্র রঙ্গলালের হাতে যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া আগাইয়া গিয়াছে।

আখ্যায়িকার প্রতি আকর্ষণ মানুষের মনের একটা প্রধান অঙ্গ। মানুষ চিরকালই নিজের কথা শুনিতে চায়। মঙ্গল কাব্যের এই ধারাটি প্রধানতঃ আখ্যানমূলক। মঙ্গল কাব্যের উৎস স্থল মানবের ভক্তি গদগদ মনোভাব। মঙ্গল কবিরা যাহা বর্ণনা করিতেন, যে দেব দেবীর গুণকীর্ত্তন করিতেন প্রথমে তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়া নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। ফলে মঙ্গলকাব্যের একটি বৈশিষ্ট্যই ছিল ভক্তির আতিশয্য ও প্রাবল্য, অকারণ উচ্ছ্বাস; প্রশ্নহীন, যুক্তিহীন অস্বাভাবিকত্ব ইত্যাদি। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যুগের অগ্রগতির সহিত মানবের মন যত সুসংবদ্ধ ও চিন্তাধারা যত দৃঢ়বদ্ধী হইয়া উঠে ততই এই অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের ভাব কাটিয়া যায়। আপ্রশ্ন হৃদয় উচ্ছ্বাসের স্থানে ক্রমশঃ যুক্তিপ্রিয়তা, বুদ্ধির দ্বারা বিচার-প্রয়াস, প্রভৃতি স্থান গ্রহণ করে। ভাষাতেও ক্রমশঃ অকারণ উচ্ছ্বাস কমিয়া গিয়া ইঙ্গিতমূলক ক্ষুদ্র অথচ অর্থগূঢ় উক্তি আসিয়া আসন লয়—আধুনিকতার এই লক্ষণগুলি আমরা ভারতচন্দ্র হইতে দেখি; সুতরাং বলা হইয়া থাকে ভারতচন্দ্রে আধুনিক যুগ আরম্ভ।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের অভ্যুদয়ক্ষণে দুর্ব্বার বেগে যাহা ইহার উপর পতিত হইয়া আসায় কালজয়ী স্বাক্ষর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে—তাহা হইতেছে পাশ্চাত্য প্রভাব। বস্তুতই বাঙ্গালীর সমাজ, জীবন, সাহিত্য—সর্ব্বক্ষেত্রেই এই পাশ্চাত্য প্রভাব,বিশেষ করিয়া ইংরাজি প্রভাব বিরাট। এই ইংরাজি দর্শন, সাহিত্য ধ্যান ধারণার প্রভাব যখন প্রথম আসিয়া উপস্থিত হইল—তখন প্রথম দৃষ্টিক্ষেপে এই উজ্জ্বল আলোক বাঙ্গালীর অনভ্যস্ত চোখে ঠিক সহ্য হয় নাই। তাই বিভ্রান্ত-দৃষ্টি হইয়া প্রথমটায় বাঙ্গালী আবিলতার স্রোতে গা ভাসাইয়াছিল। সাহিত্যেও ইহার নিদর্শন বিদ্যমান। কিন্তু কিছুকাল পরেই পশ্চিমাগত এই উজ্জ্বল আলোক বাঙ্গালীর চক্ষেও অভ্যস্ত হইয়া গেল, সে তাহাকে সহজভাবেই গ্রহণ করিল। বাঙ্গালী জাতির অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ভাবধারার সবচেয়ে বড় প্রভাব বোধ হয় ইহাই —যে বাঙ্গালী যাহা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিতেছিল—ইহা তাহাকেই গতি চাঞ্চল্য দিয়া বহুদূর ঠেলিয়া দিয়াছে। স্বাভাবিক ভাবে জাতির মনে যে আত্মসচেতনা জাগিয়াছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য জাতির সহিত পরিচয় লাভ তাহাকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি তখন চঞ্চল হইয়া মানবের দিকেও ফিরিয়াছে—বলিষ্ঠ সুগঠিত ইংরাজি সাহিত্য সেই দৃষ্টিকে অবনমিত, নির্য্যাতিত ও উপেক্ষিতের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের রোমান্সের প্রচলন ক্রমশঃ উপন্যাসের উদ্ভাবন, সমালোচনা মূলক সাহিত্যের প্রবর্ত্তন, গরিমাময় স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কন,—প্রভৃতির পিছনে এই ইংরাজি প্রভাব অনেক

পরিমাণেই কার্য্যকরী। ইংরাজি সভ্যতার সহিত সংঘর্ষের ফলে এ দেশের সমাজে যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছিল যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল—জাতির মন যেভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত; মধুসূদন, বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—তাহার প্রকাশক।

ইহারও পরবর্ত্তীকালে জাতির চিন্তাধারা আরও বিস্তৃত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তরের এমন কি পতিতাদেরও দাবী সাহিত্যে স্বীকৃত হইয়াছে। যুগোপযোগী চিন্তাধারা, বিভিন্ন দেশের সহিত মেলামেশা, জ্ঞানের বৃদ্ধির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান যুগের মানুষ আজ এমন মানসিক স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে পতিতাদের উপরেও ঘৃণার পরিবর্ত্তে আজ অনুকম্পা জাগিয়া উঠিয়াছে। উদার ও ব্যাপক মনোবৃত্তি আজ সকলকেই স্ব স্ব স্থানে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্য আধুনিকতার পথে আরও অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

একটা কথা আজকাল প্রায়ই শুনা যায় যে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারা নাকি নিম্নাভিমুখী। কিন্তু সাহিত্যকে মনের অভিব্যক্তি ও জাতির ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া বিচার করিলে মনে হয়—ক্রম-অগ্রসরমান জাতির ইতিহাসে ঊর্দ্ধমুখী, নিম্নমুখীর কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যে সৃষ্টি সাধারণের দ্বারা গৃহীত—তাহাই জাতির চিন্তাধারার প্রকাশ—তাহাই এ যুগে সত্য। নীতি বা moralityর কোন প্রশ্ন নাই—কারণ সবই ত মানবের প্রয়োজন প্রসূত।

আজ যখন জাতিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার আয়োজন আসিয়াছে, বিশ্বের সকলের সম্মুখে যখন সগর্বে দাঁড়াইবার সময় হইতেছে, তখন সর্ব্বপ্রথম যাহা প্রয়োজন—তাহা হইতেছে জাতির আপনার ইতিহাসের সহিত পরিচয় লাভ। কিন্তু এই ইতিহাস যদি আমরা শুধু মাত্র বিদেশী শাসনবর্গের লিপিবদ্ধ তালিকা লইয়া গঠন করি তবে তাহা হইবে অসম্পূর্ণ। জাতির সত্যকার ইতিহাস রহিয়াছে জাতির সাহিত্যের মধ্যে। সেই সাহিত্য সাগর উন্মোচিত করিয়া রচিত হইবে জাতির জাতীয় ইতিহাস। ইতিহাস যুগবিভাগ অনুসারে হইবে, না শতাব্দীর হিসাবে হইবে সে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। অভিব্যক্তি-মূলক ইতিহাসে বিভাগ কতটা সম্ভব তাহাও বিবেচ্য। তবে মানুষের মন ইহার প্রধান উপাদান—তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

মাকড়সা

শ্রীসত্যেন সিংহ

সুরযমলের চোখ দুটো বাথরুমের দেওয়ালে আটকে গেলো। তুচ্ছ একটা দৃশ্য তাঁর মনকে আজ গভীর ভাবে নাড়া দিলে। মাকড়সার জালে আবদ্ধ সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িং। ক্রমে ক্রমে মাকড়সা ফড়িংটাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে, ফড়িংটাও প্রাণ নিয়ে সরে পড়বার প্রয়াসে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে। কিন্তু তার বড় দুটো পা মাকড়সার জালে জড়িয়ে যাওয়ায় কোন ক্রমেই সে উড়তে পারছে না—বহু আয়াসে একটু অগ্রসর হলেই মাকড়সাও সঙ্গে সঙ্গে চলে।

বড়বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুরযমলের এমন একটা দৃশ্য দেখে বিচলিত হওয়া খুবই আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী—জীবের কষ্ট তাঁর প্রাণে ব্যথা দেয়, তাঁর ধর্ম্ম নাশ করে। প্রতিদিন তিনি দুবার করে পিঁপড়ার গর্ত্তে সুমিষ্ট শর্করা ছড়িয়ে দিয়ে জীবের সেবা করেন, গঙ্গাফড়িঙের অবস্থা দেখে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কি কষ্টই পাচ্ছে না জানি বেচারি! এমনি অনেকক্ষণ তিনি বসে বসে দেখতে ও চিন্তা করতে লাগলেন। এক সময় হঠাৎ মন স্থির করে উঠে পড়লেন—ফড়িংটাকে ঐ দুর্ব্বৃত্ত মাকড়সাটার কবল থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। এগিয়ে গেলেন সুরযমল জৈন, কিন্তু নিকটে গিয়ে আবার দাঁড়ালেন। মাকড়সাও তো একটা জীব—তার মুখের গ্রাস তিনি কেড়ে নেবেন? ফড়িং ও অন্যান্য কীট পতঙ্গ আহার করবে বলেই তো ভগবান মাকড়সার সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বহু চেষ্টায় যে আহার মাকড়সা সংগ্রহ করেছে তাই তিনি তার মুখ থেকে ছিনিয়ে নেবেন? এক্ষেত্রেও কি জীব কষ্ট পাবে না? মাকড়সা বাঁচবে কি খেয়ে?

কঠিন সমস্যা। চিন্তিত মুখে সুরযমল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পরে তিনি গদিতে গিয়ে বসলেন। নানা জনে নানা কাজের বিষয় নিয়ে অপেক্ষা কচ্ছিল। সংক্ষেপে সকলকে তিনি বিদায় দিলেন। মনে স্বস্তি নেই। কি করা উচিত তাঁর—

ফড়িংটার এতক্ষণ কি অবস্থা হোল একবার দেখে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বড় ছেলে এসে জানালেন—চাল আজ এক শত টাকা মণ অবধি উঠেছে, কিছু ছাড়বো বাজারে ?

চমকে উঠলেন সুরযমল, মাথার হলদে পাকানো পাগড়ীটা তাঁর ঢিলে হয়ে গেলো।—চাল? কত চাল মজুত আছে আমাদের আড়তে ?

কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ছেলে বললেন—সব মিলিয়ে পাঁচ লাখ মনের কম তো নয়ই।

—দাঁড়াও, আমি আসছি। সুরযমল আবার বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করলেন। ছেলেরা, কর্ম্মচারীরা অবাক হয়ে গেলো কর্ত্তার অস্বাভাবিক ভাবান্তরে।

ফড়িংটা তখনও ছট্ফট্ কচ্ছে। কিছুতেই সে মাকড়সার লালাসিক্ত সূক্ষ্ম জালের ফাঁস থেকে নিজের পা দুটোকে উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে না। গালে হাত দিয়ে সুরযমল চেয়ে রইলেন। তাঁর ভাবনাগুলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ঐ ছোট্ট মাকড়সা অত বড় একটা ফড়িংকে ধরে কি করবে? প্রথমে তিনি মাকড়সার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে ইতস্ততঃ কচ্ছিলেন, এখন ভাবলেন ফড়িংটা তো মাকড়সার প্রয়োজনের অনেক বেশী। সে তো শুধু ফড়িঙ্গের মৃত্যু ঘটাবে। একটা ক্ষুদ্র মাকড়সা বৃহৎ গঙ্গাফড়িংকে কখনই আহার করতে পারবে না। সমস্ত দ্বিধা তিনি মুছে ফেললেন—ফড়িঙ্গের যন্ত্রণায় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো। একটা কাঠি দিয়ে তিনি ফড়িঙ্গের পা দুটো মাকড়সার জাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন—ফড়িংটা উড়ে গেলো মুক্তির আনন্দে। সুরযমল সেদিকে আর চাইলেন না। মনটা তাঁর হালকা হয়ে গেলো। সকাল থেকে যে গুরুভারটা বুকের ওপর চেপে বসেছিলো সেটা নেবে গেলো।

তিনি আবার গদিতে এসে বসলেন। কর্ত্তার হাসি-খুসি মুখ দেখে সকলে আশ্বস্ত হোল। ছেলে আবার চালের বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এলেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চাইলেন সুরযমল। এ ধরণের দৃষ্টিপাত ছেলের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। প্রথমটা সে হকচকিয়ে গেলো। ধীরে ধীরে সুরযমল জিজ্ঞাসা করলেন—চাল আমাদের কত দামে খরিদ করা হয়েছিলো ?

—আমরা চৌদ্দ টাকা মণ দরে কিনেছি।

পাগড়িটা মাথা থেকে নামিয়ে সুরযমল পুনরায় প্রশ্ন করলেন—মণ প্রতি অন্যান্য খরচা আমাদের কত পড়েছে ?

—তা প্রায় আট আনা হবে।

এবার সুরযমল যা বললেন তা শুনে ছেলে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। বসেছিলেন, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন।

—মাত্র পনেরো টাকা দরে সব চাল ছেড়ে দেবো—আপনি বলছেন কি ?

—আমি ঠিকই বলছি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুত করে শত শত মানুষকে আমি মারতে চাই না—জীবের সেবাই আমার ধর্ম্ম, জীবের মৃত্যু ঘটানো নয়।

বিদ্রোহের সুরে ছেলে বললেন—জীবের সেবা করলে ব্যবসা রাখা যাবে না।

কঠিন কণ্ঠে সুরযমল ছেলেকে তিরস্কার করলেন—তোমার উপদেশ শুনতে চাই নি—আমার ইচ্ছামত কাজ যাতে হয় তাই দেখ গিয়ে।

সমস্ত ক্রোধ ও অভিমান দমন করে নতমুখে ছেলে পিতার আদেশ পালন করতে চলে গেলেন।

বাড়ীর সকলের স্থির ধারণা হোল সুরযমলের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে—নইলে এত বড় ব্যবসায়ী কি এমন একটা আদেশ দিতে পারে। যদিও তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা কারুরই নেই, তবু ছেলেরা ষড়যন্ত্র সুরু করলেন—তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করবার জন্য।

সুরযমলের বাথরুমে যাওয়া বেড়ে গেছে। ঘন ঘন তিনি সেখানে যাতায়াত কচ্ছেন। তাঁর আহার কমে গেছে—রাত্রে নিদ্রা হয় না—বার বার বাথরুমে ছুটে যান। একটি দিনে তাঁর ললাটে গভীর চিন্তাজনিত রেখাগুলি দ্বিগুণ গভীর হয়ে ফুটে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিতে মস্ত উদাসীনতার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

হু হু করে জলের দরে এতদিনের মজুত-করা চাল বেরিয়ে যাচ্ছে, তার অর্দ্ধেক প্রায় শেষ হয়ে এলো। অসন্তুষ্টিতে ছেলেদের মুখ ভার হয়ে আছে ঠিক ঐ বিফল মাকড়সাটার মত। গদিতে বসে সুরযমল তাদের মুখ নিরীক্ষণ কচ্ছেন। মাথায় তাঁর পাগড়ি নেই, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ীর উদ্ভব হয়েছে, পরণের কাপড় হয়েছে

মলিন। সহরের সেরা ডাক্তার এসে দেখা দিলেন। দেহ ও মন দুয়েরই চিকিৎসায় তিনি পারদর্শী। আগেই ছেলেরা তাঁকে তালিম দিয়ে রেখেছিলেন; তাই অতি সাবধানতার সঙ্গে তিনি সুরযমলের সম্মুখে হাজির হলেন। হেসে সুরযমল ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করলেন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করতেও ভুললেন না। অল্প কয়েকটি কথায় ডাক্তার জানালেন যে, এই বাজারে নাকি সুরযমল সস্তায় চাল সরবরাহ করে দেশবাসীর উপকার কচ্ছেন তিনিও তাই এঁদের ডাক্তার হিসাবে কিছু চাল কিনে রাখতে চান।

আবার হেসে প্রশ্ন করলেন সুরযমল—কত চান?—

—তা হাজার মণ কিনে রেখে দিলেই ভাল হয়—আবার কখন দর চড়ে যাবে কিছু বলা তো যায় না।—ষ্টেথস্কোপটা নাড়াচাড়া করে ডাক্তার বললেন।

—হাজার মনে আপনার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার খাবার জন্য একমণ চাল দিতে পারি।

ডাক্তার বিস্মিত হলেন, কিন্তু সে বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন—বেশ তাই দেবেন, এখন আসি তবে। নমস্কার করে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন এবং পাশেই সুরযমলের ছেলের গদিতে প্রবেশ করলেন। ডাক্তারকে সম্বোধন করে ছেলে যে কথা বললো সেটা তীরের মত এসে বিঁধলো সুরযমলের কানে—কেমন দেখলেন? পাগল বলেই মনে হোল না?

হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে সুরযমল বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করলেন। সমস্ত দিন সেখান থেকে আর বার হলেন না। সুরযমল—বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুরযমল বদ্ধ পাগল বলে প্রচারিত হতে সুরু হ'ল। ডাক্তার তাঁকে পাগল বলে অভিহিত করে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। সেই সার্টিফিকেট সুরযমলের ছেলেরা কাল আদালতে পেশ করে পিতার সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্ব উত্তরাধিকারের দাবীতে নিজেরা গ্রহণ করবেন।

তখন মধ্যরাত্রি। বাড়ীর সকলে নিদ্রিত। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন সুরযমল। অতি স্বাভাবিক মানুষের মত তিনি এসে নিজের নির্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরবেলা সুরযমল গদিতে গিয়ে নিজের আসন গ্রহণ করলেন। ছেলেরা বা কর্ম্মচারিরা কেউ তখনো আসেনি। ছেলে ঠিক করেছিলেন আজ তিনি বাপের গদিতে বসবেন, ঘরে পা দিয়েই কিন্তু ছেলে থমকে দাঁড়ালেন। বাপ সুরযমল নীরবে মাথা হেঁট করে বসে কাজ করছেন। পরণে তাঁর ধোয়া ধুতি, সাদা লম্বা কোট, নূতন পাগড়ি সযত্নে মাথায় বসান। সদ্য-ক্ষৌরিত মুখমণ্ডলে প্রথম সূর্য্যের লালচে আভা পড়ে তাঁকে ঠিক তিনদিন আগের সেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুরযমল বলেই বোধ হচ্ছে। পাগল সুরযমল যেন পালিয়ে গেছে। ছেলের পদশব্দে সুরযমল চোখ তুলে চাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—এই যে এসেছো, এত দেরী হয় কেন তোমাদের উঠতে বল দেখি। আচ্ছা এখন চাল আমাদের কত মজুত আছে।

—দেড়লাখ মণ।

গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন সুরযমল—দেড়লাখমণ কেন, তিনদিন পূর্ব্বে আমি পাঁচলাখমণ চালের হিসাব পেয়েছি।

—আপনার আদেশমত এই তিনদিনে সাড়েতিনলাখমণ চাল পনেরো টাকা দরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

—আমার আদেশমত? তোমরা কি সব পাগল হয়ে গেছো—এ রকম একটা অন্যায় আদেশ আমি কখনো দিতে পারি? যাও দাঁড়িয়ে থেকো না আমার সম্মুখে—বাজারে চাল সরবরাহ একেবারে বন্ধ করে দাও। কেবল মজুত কর, মজুত কর।

ছেলে আগেই বুদ্ধি করে সাড়েতিনলাখমণ চাল অন্যের বেনামিতে কিনে মজুত করেই রেখেছিলেন কিন্তু সে তথ্য প্রকাশ না করে বোকা মানুষের মত মুখ করে বেরিয়ে গেলেন।

একটা বড় শীকারের পেছনে সমস্ত প্রচেষ্টা ও শরীরের লালা নিঃশেষ করে সুরযমলের নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপে হতাশ হয়ে মাকড়সাটার নূতন শীকার ধরবার উদ্যম থাকলেও শক্তি ছিলো না। দুদিন অনাহারে নির্জ্জীবের মত পড়ে থেকে কাল মধ্যরাত্রে সুরযমলেরই বাথরুমে তাঁরই চোখের সামনে মাকড়সাটা শুকিয়ে মরে গেছে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আততায়ীকে ধরিবার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু দক্ষ আততায়ী সকলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার ফেলিয়া যাওয়া একটি রিভলবার কেবল কুড়াইয়া পাওয়া গেল।

এই ঘটনার পর ঢাকা সহরের বহুস্থানে যথারীতি খানাতল্লাস ও ধরপাকড় সুরু হইল। প্রকৃত আততায়ীকে ধরিতে না পারিলেও পুলিশ আপন দক্ষতা প্রকাশ করিতে কসুর করিল না। নির্দ্দোষ ও নিরপরাধ লোকরাই পুলিশের হাতে প্রহৃত হইতে লাগিল। অত্যাচারের মাত্রা এতই গুরুতর রকমের হইল যে বহু লোককে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালেও ভর্ত্তি হইতে হইল। যাঁহাকে আততায়ী বলিয়া পুলিশের সন্দেহ হইল, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও যাঁহাকে ধরিতে পারিল না—তাঁহার নাম বিনয় বসু।

১লা সেপ্টেম্বর লোম্যান সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিনয়

বিনয় বসু

বসুকে ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে বলিয়া ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন।

বিনয় বসু তখন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন—মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁহার সুনামও ছিল। তাঁহার পিতার নাম রেবতীমোহন বসু—তিনি থাকিতেন জামসেদপুরে। তাঁহাদের নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরের রাউতভোগ-এ। বিনয় বসুকে ধরাইয়া দিতে পারিলে যে পুরস্কার দানের বিষয় ঘোষিত হয়, তাহাতে সরকার পক্ষ তাঁহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করেন। সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে ১৯২৮ সালে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত যোগদান করিয়াছিলেন এবং তিন জনেই যথাক্রমে মেজর, লেফ্‌টেন্যান্ট এবং ক্যাপ্টেন-এর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদল গুপ্তের পিতার নাম অবনীমোহন গুপ্ত—নিবাস বিদগাঁও এবং দীনেশ গুপ্ত ছিলেন যশোলঙ্গ-এর সতীশচন্দ্র গুপ্তের পুত্র। সতীশচন্দ্র জামালপুরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। দীনেশও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন—আইন-অমান্য-আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি পড়া ছাড়িয়া দেন।

ঢাকার ঘটনার পর বিনয় বসুর পুনরায় সাক্ষাৎ মিলিল ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। সেদিন তিনি ছিলেন এক দুর্দ্দান্ত ও দুঃসাহসিক অভিযানের দক্ষ নায়ক। ঐ তারিখে বিনয় বসু তাঁহার অপর দুইজন সঙ্গী দীনেশ গুপ্ত ও বাদল (সুধীর) গুপ্ত সহ ডালহৌসি স্কোয়ারের রাইটার্স বিল্ডিং-এ দুপুর বেলায় হানা দিলেন। তাঁহারা তিন জনেই সাহেবী পোষাকে সজ্জিত ছিলেন—মাথায় টুপিও ছিল। তাঁহারা সরাসরি রাইটাস বিল্ডিং-এর দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। বাংলার তৎকালীন ইনস্‌পেক্টর জেনারল অফ প্রিসনস্ কর্ণেল সিমসন তখন আপন কক্ষে বসিয়া অফিসের কার্য্যে রত ছিলেন। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বিপ্লবীরা তাঁহাকে গুলি করিলেন—সঙ্গে সঙ্গেই সিমসন সাহেবের দেহ চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িল। ইহার পর বিপ্লবীরা বাহিরের বারান্দায় আসিয়া চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ গুলি নিক্ষেপ সুরু করিলেন। জনৈক সেক্রেটারি তাঁহাদিগকে আঘাত করিবার অভিপ্রায়ে কি একটা বস্তু তাঁহাদের দিকে নিক্ষেপ করিলেন—কিন্তু তাহা তাঁহাদের গায়ে লাগিল না। বিপ্লবীরা তখন সেই ইংরাজ সেক্রেটারিকেও গুলি মারিয়া ভূতলশায়ী করিলেন। ইহার পর বিপ্লবীরা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, হোম সেক্রেটারি মিঃ আলবিয়ান মার-এর। তাঁহাদের গুলির আঘাতে মার্ সাহেবের কক্ষের দরজার কাচ ভাঙ্গিয়া গেল।

ইহার পর দ্বিতলের বারান্দায় বাধিয়া গেল এক রীতিমত খণ্ড-যুদ্ধ। বাংলার পুলিশ-বিভাগের তৎকালীন ইনস্‌পেক্টর জেনারল মিঃ ক্রেগ্ তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়া রিভলবারের গুলি চালাইলেন—কিন্তু তাহা বিপ্লবীদের গায়ে লাগিল না। মিঃ ফোর্ড নামে অপর একজন ইংরাজ অতঃপর মিঃ ক্রেগের হাত হইতে তাঁহার রিভলবারটি লইয়া বিপ্লবীদের লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইতে লাগিলেন—উহাও কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে লাগিল। পুলিশ-বিভাগের সহকারী ইনস্‌পেক্টর জেনারল মিঃ জোনস্ আসিয়াও কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাইলেন—তাহাতেও কোন কাজ হইল না।

সেদিন যেন রণদুর্ম্মদ হইয়াই বিপ্লবীরা আক্রমণ পরিচালনায় মত্ত হইয়াছিলেন। একদিক হইতে অপরদিক পর্য্যন্ত দ্বিতলের প্রায় প্রতিটি কক্ষেই তাঁহারা একে একে হানা দিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় অফিসার ও কর্ম্মচারীবর্গ প্রাণভয়ে এদিকে-সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। সকলের চোখে-মুখেই আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা, ভয়ে সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। লালবাজারের পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে সংবাদ পৌঁছাইবামাত্র কলিকাতার পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ গর্ডন ও মিঃ বার্ট প্রভৃতি শক্তিশালী পুলিশ-বাহিনী লইয়া অবিলম্বে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনজন বিপ্লবীকে পরাভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু চেষ্টাতেও তাঁহারা কিন্তু বিপ্লবীদের কিছুই করিতে পারিলেন না। এক সময় দীনেশের বাহুতে পুলিশের একটি গুলি লাগিল বটে, তাহাতেও তিনি কিন্তু কাবু হইলেন না, পূর্ব্ববৎ সমানেই গুলি চালাইতে লাগিলেন।

তিনজনে অতঃপর পাসপোর্ট অফিস আক্রমণ করিলেন। সেই সময় সেখানে ছিলেন একজন আমেরিকান পাদ্রী—তাঁহার নাম জনসন্। প্রাণভয়ে তিনি কোনওমতে দেওয়ালের গা-নল বাহিয়া নীচে পলায়ন করিলেন।

বিপ্লবীদের গুলি এই সময় প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সেদিন তাঁহারা আসিয়াছিলেন জীবন লইবার এবং জীবন দিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া; সুতরাং কার্য্য সমাধা করিয়া নায়ক বিনয় বসুর নেতৃত্বে একটি কক্ষে তাঁহারা মৃত্যু-বরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাদল গুপ্ত ভক্ষণ করিলেন পটাসিয়াম সায়নাইড বিষ—মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। চেয়ারের উপর তাঁহার দেহ এলাইয়া পড়িল। বিনয় ও দীনেশ আপন আপন আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। ইহার ফলে উভয়েই গুরুতররূপে আহত হইলেন।

বিনয় জানিতেন যে পুলিশের নিকট তাঁহার পরিচয় গোপন থাকিবে না। তাই পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজের নাম সঠিকই বলিলেন, কিন্তু সঙ্গী দুইজনের পরিচয় দিলেন ছদ্মনামে। তাঁহাদের তিনজনের শরীর তল্লাস করিয়া পুলিশ অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ উদ্ধার করিল। বাদল গুপ্তের পকেট হইতে একটি জাতীয় পতাকাও পাওয়া গেল।

বিপ্লবীদের আক্রমণে সেদিন অন্যান্য যাঁহারা আহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মিঃ নেলসন্ এবং সেক্রেটারি মিঃ ট্যুয়নাম-এর নাম উল্লেখযোগ্য। Statesman পত্রিকায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ের এই ঘটনাকে "Secretariat Raid" ও "Battle veranda" নামে অভিহিত করা হয়।

আহত অবস্থায় বিনয় ও দীনেশকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দীনেশের গলার বাম পার্শ্বে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল—আর বিনয়ের ললাটের উভয় পার্শ্বেই গুলির আঘাত চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিয়া দীনেশ ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কর্তৃপক্ষের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন বিনয় বসু। যে কয়দিন তিনি হাসপাতালে জীবিত ছিলেন—তাহার অধিকাংশ সময়ই তিনি অচৈতন্য অবস্থায় থাকিতেন। যখন তাঁহার সামান্য সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিত, তখন তিনি হাতের আঙুল দিয়া ক্ষতস্থান ঘাঁটিয়া বিষাক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। এইভাবে তাঁহার ক্ষত শেষ পর্য্যন্ত 'সেপটিক' হইয়া গেল এবং ১৩ই ডিসেম্বর তিনি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার জননী শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

দীনেশ গুপ্ত সুস্থ হইয়া উঠিলে এক স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুন্যালে তাঁহার বিচার সুরু হইল। এই ট্রাইব্যুন্যালে বিচারক ছিলেন মিঃ গার্লিক, শ্রী এন, কে, বসু ও জনাব আদিলজ্জমান সাহেব। বিচারে দীনেশের প্রাণদণ্ড হইল। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে পর পর হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিল-এ আপিল করা হয়—কিন্তু উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল থাকে।

তাঁহার প্রাণদণ্ড রদ্ করাইবার প্রচেষ্টায় সারা দেশে রীতিমত আন্দোলন হইল—কর্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ১৯৩১

দীনেশ গুপ্ত

সালের ৭ই জুলাই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দীনেশের ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের পূর্ব্বে তিনি ইংরাজ প্রহরীকে আঘাত হানিয়া যান।

দীনেশের ফাঁসিতে কলিকাতায় হরতাল প্রতিপালিত হয়। মনুমেন্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় দীনেশের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অপরাহ্নকালে একটি শোভাযাত্রা কৃষ্ণ পতাকাসহ চৌরঙ্গী হইতে ভবানীপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের নিকট পর্য্যন্ত গমন করে। ৮ই জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় দীনেশের ফাঁসিতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সভা স্থগিত রাখা হয়।

১৯৩০ সালের ১২ই ডিসেম্বর কালীঘাটে ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে চুনীলাল মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহার নিকট পুলিশ একটি রিভলবার প্রাপ্ত হইল। এই প্রসঙ্গে আরও যে দুইজন ধরা পড়িলেন,

তাঁহাদের নাম—মণীন্দ্রলাল সেন ও সুবোধ দাশগুপ্ত। মিঃ গার্লিক, শ্রী এন, কে, বসু এবং জনাব আদিলজ্জমানকে লইয়া গঠিত ট্রাইব্যুন্যালে ইঁহাদেরও তিন জনের বিচার হয়। বিচারে তিন জনের প্রতিই প্রদত্ত হয় এক বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড।

এই বৎসরেই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার G. D. Montworenoy-র উপর আক্রমণ চালান হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় তিনি গিয়াছিলেন সভাপতিত্ব করিতে। তাঁহার উদ্দেশে সেই সময় উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। গভর্ণরকে রক্ষা করিতে গিয়া সহকারী দারোগা চনন সিং নিহত হন এবং আর একজন শ্বেতাঙ্গ ইনস্পেক্টরও আহত হন। একটি ইউরোপীয় মহিলাও এই ঘটনায় আহতা হইয়াছিলেন। গভর্ণরের দক্ষিণ হস্তে গুলির আঘাত লাগে। তিনি পাশের ঘরে গিয়া নিজেই হাতের রক্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলেন এবং নিজ আঘাতের বিষয়

বাদল (সুধীর) গুপ্ত

কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ফেলো (তিনি চিকিৎসকও ছিলেন) শেষ পর্য্যন্ত উহা জানিতে পারিয়া তাঁহার ক্ষতস্থানে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেন।

আততায়ীকে ঘটনাস্থলেই ধরিয়া ফেলা হয়। তাঁহার নিকট হইতে জানা যায় যে তাঁহার নাম হরকিষণ, বয়স বাইশ বৎসর, বাড়ী পেশোয়ার জেলায়। কোনও একজন আফ্রিদির নিকট হইতে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করিয়া গভর্ণরকে হত্যা করিবার জন্যই তিনি নাকি আসিয়াছিলেন। ১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারি হরকিষণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

পাঞ্জাবের গভর্ণরকে হত্যা করিবার ষড়্‌যন্ত্র করার অভিযোগে "মিলাপ" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক দুর্গাদাস, চমনলাল এবং রণবীর সিং অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহাদের প্রতিও মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

মেদিনীপুরের দাসপুর থানায় পুলিশের অত্যাচারের বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মেদিনীপুরের নানা স্থানে যখন পুলিশী জুলুম চলিতেছিল, তখন মিঃ পেডি ছিলেন সেখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। ন্যায়পরায়ণ বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তিনি তাহা বন্ধ করিতে পারেন নাই। সকল অত্যাচারই তাঁহার জ্ঞাতসারে এবং অনুমোদন ক্রমে অবশ্য নাও হয় তো সংঘটিত হইয়া থাকিতে পারে। মোটের উপর পেডি সাহেব লোক নেহাৎ মন্দ ছিলেন না এবং বহু সময় আপন প্রভাবে গভর্ণমেণ্টকে দ্রুত অর্থ বরাদ্দ করিতে বাধ্য করিয়া লোকের অসুবিধা নিবারণের চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় যে সকল অনাচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহার উপর গিয়া পড়িল। উপরন্তু আবার তাঁহারই সময়ে জেলখানায় বন্দীদের উপরও উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হয়; সুতরাং বিপ্লবীরা পেডি সাহেবকে হত্যা করিয়া এই সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন।

মেদিনীপুরের কলেজিয়েট স্কুলে যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়, তাহাতে ১৯৩১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি মিঃ পেডি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্য যখন চলিতেছিল, তখন জনৈক বিপ্লবী তাঁহার উপর আগ্নেয়াস্ত্র হইতে গুলি বর্ষণ করিয়া পলায়ন করিলেন। কেহই আততায়ীকে ধরিতে বা চিনিতে পারিলেন না। পেডি সাহেব আহত হইয়া টলিতে টলিতে পাশের ঘরে গেলেন এবং সেখানে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

এই ঘটনা উপলক্ষে পুলিশ সন্দেহবশতঃ বিমল দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে। বিচারপতি মেসার্স পিয়ারসন, এস, কে, ঘোষ এবং মল্লিক সাহেবের এজলাসে হাইকোর্টে বিমল দাশগুপ্তের বিচার হয়। প্রমাণাভাবে বিচারপতিগণ তাঁহাকে খালাস দেন।

বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণরের উপরও এই বৎসর আক্রমণ পরিচালিত হয়। গভর্ণর সার আর্ণেষ্ট হট্‌সন ১৯৩১ সালের ২৩শে জুলাই পুণার ফার্গুসন কলেজে গমন করিয়াছিলেন। কলেজের লাইব্রেরি কক্ষে তিনি যখন ছাত্রগণের সমক্ষে বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন বাসুদেব বলবন্ত গোগাটি নামে একটি উনিশ-কুড়ি বৎসরের মহারাষ্ট্রীয় যুবক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলিবর্ষণ করেন। গভর্ণর কিন্তু অক্ষতদেহে বাঁচিয়া যান।

দীনেশ গুপ্তের বিচার প্রসঙ্গে মিঃ গার্লিকের নাম পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। মিঃ আর, আর, গার্লিক, আই-সি-এস ছিলেন আলিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসনস্ জজ। অস্থায়ীভাবে তিনি হাইকোর্টেও কিছুদিন বিচারপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। কানে তিনি কিছু কম শুনিতেন। তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া যে ট্রাইব্যুন্যাল গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বিচার হয় ও তাঁহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। ইহার ফলে বিপ্লবিগণের ক্রোধ গার্লিক সাহেবের উপর গিয়া পড়ে। ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একখানি পত্রও একবার লেখা হইয়াছিল। দীনেশের ফাঁসির

দিন কুড়ি পরে ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে হত্যা করা হইল।

ঐদিনে তিনি আপন এজলাসে উপবিষ্ট হইয়া মোকদ্দমার শুনানী শ্রবণ করিতেছিলেন। আদালতের কার্য্য চলিতে থাকার সময়ই সহসা একজন যুবক তাঁহার এজলাসে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। সেখানে তখন অধিক লোক ছিল না। গুলিবিদ্ধ হইয়া মিঃ গার্লিক চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িলেন। যথাসম্ভব দ্রুত তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু সেখানে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ঘটনার সময় সেখানে একজন সার্জ্জেণ্ট, একজন কনষ্টেবল এবং গোয়েন্দা-বিভাগের একজন দারোগা ছিলেন। আততায়ীর সহিত তাঁহাদের তিনজনের ধ্বস্তাধ্বস্তি ও গুলি-বিনিময় সুরু হইল। ইহার ফলে কনষ্টেবলটিও আহত হইল সাংঘাতিকভাবে। যুবকটিকে জীবন্ত ধরা সম্ভব হইল না—বিষ ভক্ষণ করিয়া তিনি ঘটনাস্থলেই আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার পকেট হইতে যে লিপিখানি পাওয়া গেল, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"তুমি ধ্বংস হও, দীনেশকে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছ, তাহার ফল ভোগ কর।"

লিপিখানির নিম্নে "বিমল গুপ্ত" নাম স্বাক্ষর পাওয়া যায়, কিন্তু উহাই তাঁহার প্রকৃত নাম কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁহার দেহটি কাহারও দ্বারা সনাক্ত করানো যায় নাই। অনেকে উক্ত যুবকের উপাধি "ভট্টাচার্য্য" ছিল বলিয়া অনুমান করেন।

এই ঘটনার পর ৩০শে জুলাই তারিখে ডালহৌসি ইনস্‌টিটিউটে কিছু সংখ্যক লোকের এক সভা হয়। উক্ত সভায় ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উপস্থিত ছিলেন। গভর্ণমেণ্টের বিচার-বিভাগের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার লেনসেট স্যাণ্ডারসন ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উহাতে মিঃ গার্লিকের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা এবং দীনেশের ফাঁসিতে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, উহার তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঢাকার কমিশনার মিঃ এ. ক্যাসেল্-এর উপর আক্রমণ চালান হয় ১৯৩১ সালের ২১শে আগষ্ট। ঐদিনে তিনি গিয়াছিলেন টাঙ্গাইলের সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ কার্য্যালয়ে। সেই সময় জনৈক বিপ্লবী তাঁহার উপর গুলিবর্ষণ করেন। মিঃ ক্যাসেল্ ইহাতে সামান্য আহত হন বটে, কিন্তু তাঁহার জীবন রক্ষা পায়।

হিজলীর বন্দী-নিবাসে এই সময় যে অত্যাচার সংঘটিত হয়—তাহা যেমনি নারকীয়, তেমনি মর্ম্মন্তুদ। কোনও সভ্য গভর্ণমেণ্টের জেলখানার মধ্যে অসহায় নিরস্ত্র বন্দীদের উপর যে এইরূপ আক্রমণ পরিচালিত হইতে পারে, তাহা যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে—সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কোনও অপরাধের অনুষ্ঠানেই তাঁহারা কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হন নাই। ক্ষমতালিপ্সা তাঁহাদিগকে নরঘাতন অনুষ্ঠানে প্রেরণা যোগাইয়াছে, নৃশংস নিষ্ঠুরতায় তাঁহাদিগকে মত্ত করিয়াছে, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য করিয়াছে। বৃটিশ-শাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এইরূপ বহু দৃষ্টান্তই খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুর হইতে প্রায় মাইল দেড়-দুই দূরে হিজলী বন্দীনিবাস অবস্থিত। এক সময়ে ঐস্থানে কয়েকটি সরকারী অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহারই কয়েকখানি বড় বড় বাড়ীতে গভর্ণমেণ্ট বন্দী-নিবাস স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং কয়েক শত বন্দীকে সেখানে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল বন্দীর অধিকাংশেরই কোন বিচার হয় নাই—রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে তাঁহাদিগকে শুধু সন্দেহবশে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল; সুতরাং বন্দীদের মন স্বভাবতঃই সর্ব্বদা বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকিত। বিনা অপরাধে বিনা বিচারে যাঁহারা আবদ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহারা যে সঙ্গতভাবেই বিক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

বন্দীদিগকে যে খোরাকী দেওয়া হইত, তাহাতে তাঁহাদের খরচ কুলাইত না। এজন্য তাঁহাদের মনে অসন্তোষ ছিল এবং তাঁহারা উহা বাড়াইবার জন্য পুনঃ পুনঃ দাবী করিয়াও ব্যর্থ মনোরথ হন। এই ব্যাপার লইয়াই কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বন্দীদিগের মূলতঃ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি গৌণ কারণ ছিল। আলিপুরের জজ মিঃ গার্লিক নিহত হওয়ার পর বন্দীগণ জেলখানায় আলোক-সজ্জা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা লইয়াও বন্দীদিগের সহিত জেলখানার কর্ত্তৃপক্ষের সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ হয়। কোন কোন ইংরাজ অফিসার বন্দীদিগের সহিত এরূপ আচরণ করিতেন যে বন্দীদিগের আত্মসম্মানে তাহাতে আঘাত লাগিত। ১৯৩১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর জনৈক বন্দীকে হিজলী বন্দীশালা হইতে অপসারিত করার সময় অন্যান্য যে সকল বন্দী তাঁহাদের সঙ্গীকে বিদায় জানাইতে প্রধান ফটক পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত বন্দীনিবাসের প্রহরীদের কিছু বচসা হয় এবং সামান্য ধাকাধাকিও হয়। প্রহরীরা ইহার ফলে উত্তেজিত হইয়া উঠে। ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটা-নয়টার সময় বন্দীনিবাসের প্রাঙ্গণে যে সকল বন্দী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত প্রহরীদের পুনরায় কথা কাটাকাটি হয়। বিপ্লবীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্যই প্রহরীরা যেন সুযোগ খুঁজিতেছিল। অল্প গণ্ডগোল আরম্ভ হইতেই বন্দীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করিতে থাকে। কোনও কোনও প্রহরী এই সময় এই গুজব রটাইয়া দেয় যে বন্দীদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য উপর-ওয়ালাদের আদেশ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনা চরমে পৌঁছায় এবং প্রহরীরা ইচ্ছামত বন্দীদের উপর গুলি চালাইতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রের মত এই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ও উপর্য্যুপরি

গুলিবর্ষণে নিরস্ত্র বন্দীগণ যেন দিশাহারা হইয়া যান। কেহ কেহ হয় তো তখন খাওয়া-দাওয়া সারিতেছিলেন, কেহ কেহ হয় তো গল্প-গুজবে রত ছিলেন। প্রহরীদের একতরফা অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণে অল্পক্ষণ মধ্যেই বন্দীদের এক শতেরও অধিক জন আহত হইলেন। তাঁহাদের যন্ত্রণা-কাতর আর্ত্তনাদে জেলখানা পূর্ণ হইয়া গেল। যে দুইজন বিপ্লবী এই গুলিবর্ষণের ফলে জীবন হারাইলেন—তাঁহাদের নাম সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত।

সন্তোষ মিত্র ছিলেন তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র-সন্তান। তাঁহার পিতার নাম দুর্গাচরণ মিত্র। সন্তোষ মিত্র ও সুভাষচন্দ্র একই বৎসরে ১৯১৯ সালে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এম-এ পরীক্ষায়ও সন্তোষ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তারকেশ্বরের পিতার নাম হরিনারায়ণ সেন।

মূর্খ ও নিষ্ঠুর প্রহরীদের দ্বারা যে নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল, তাহার সংবাদ অবিলম্বে কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় সকলেই প্রাপ্ত হইলেন। খবর পাইয়াই মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডগ্‌লাস, কমাণ্ডাণ্ট মিঃ বেকার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারগণ সকলেই গিয়া উপস্থিত হইলেন হিজলীর বন্দীনিবাসে। ব্যাপার দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই শোকাবহ ঘটনার বিষয় জানিতে পারা মাত্র কলিকাতা হইতে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতৃবর্গ হিজলীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে বন্দীদিগের বিরুদ্ধে তাঁহারাই একটি মামলা রুজু করিবেন; কিন্তু পুলিশ ইনস্‌পেক্টর তাঁহার রিপোর্টে বন্দীগণের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর উপযোগী তথ্য ও প্রমাণ নাই বলিয়া মত প্রকাশ করায় এবং সরকারী উকিলও সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করায় সরকার পক্ষ শেষ পর্য্যন্ত মামলা দায়ের করেন নাই।

ইহার পর বিচারপতি সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ড্রামণ্ডের দ্বারা একটি বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা হয়। উক্ত তদন্তে বন্দীগণকে সাহায্য করিবার জন্য ও তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি নেতৃবর্গ পুনরায় হিজলীতে গমন করেন। তদন্তের পর শ্রীযুক্ত মল্লিক ও মিঃ ড্রামণ্ড এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বন্দীদের আচরণ কখনও কখনও বিরক্তিকর হইয়া থাকিলেও যথেচ্ছ গুলিবর্ষণ যথেষ্ট অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

ঘটনার পরদিন ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তের মৃতদেহ হাওড়া ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছায়। হাওড়া ষ্টেসন হইতে এক বিরাট শোকযাত্রা মৃতদেহ দুইটি লইয়া কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত যায়। সেইখানেই তাঁহাদের শেষকৃত্য সাধিত হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গড়ের মাঠে দুইজন শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এক বৃহৎ জনসভার অনুষ্ঠান হয়। লক্ষাধিক লোক সেই সভায় যোগদান করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনন্যসাধারণ ভাষায় শাসকবর্গের কলঙ্কলাঞ্ছিত নিষ্ঠুর কার্য্যের নিন্দা করিয়া শহীদ দুইজনের দেহমুক্ত আত্মার উদ্দেশে তাঁহার শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেন।

(ক্রমশঃ)

আহ্বান

শ্রীকমলরাণী মিত্র

তবু ঘোচে নাক' শঙ্কা ও সংশয়,
তিমির রাত্রি বুঝিবা হলোনা শেষ!
তবু দিকে দিকে ধ্বনি উঠে জয় জয়
ভবিষ্যতের নিশ্চিত নির্দেশ॥
চরম-লক্ষ্যে বাকী আছে আরো পথ,
আরো পথচলা আরো দৃঢ়তর পায়ে—
তবু দিকে দিকে ঘর্ঘর জয়রথ,
বিজয়-পতাকা গর্বে উড়িছে বায়ে॥
মহা-ভারতের অমোঘ অজেয় বাণী
নিখিল বিশ্বে আলোকের বর্ত্তিকা—
মুক্তি তীর্থে পথিক অগ্রগামী
জ্বালো সে আলোক লক্ষ দীপ্তশিখা!
সাধনা তোমার বজ্র কঠোর হো'ক
ত্যাগ সত্যের স্বার্থবিহীন ব্রতে,
তোমার পুণ্যে পুণ্য পিতৃলোক
তৃপ্তি লভিবে সপ্ত স্বর্গ হতে॥
করযোড়ে করি আলোকের বন্দনা,
উদয়-শিখরে রাখিনু নমস্কার—
'জয় জয় হো'ক নিশব্দ অর্চ্চনা
জন্মভূমি এ ভারতের আত্মার।

টাকার মূল্যহ্রাসে ব্রিটেন ও ভারতের স্বার্থ

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটেন কর্তৃক ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের মূল্যহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস করিয়াছে।* যে অবস্থার মধ্যে পড়িয়া এই মূল্যহ্রাস ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইল। এছাড়া মুদ্রা মূল্যহ্রাসের পর ব্রিটেন এবং ভারতের শাসন কর্তৃপক্ষ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে যে আশা পোষণ করিতেছেন, তাহাও আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হইতেছে।

ব্রিটেন মুদ্রা মূল্যহ্রাসের পথ দেখায় এবং ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি (আমেরিকাস্থ 'ব্রিটিশ হণ্ডুরাস' বাদে), কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি (পাকিস্তান বাদে) এবং কমনওয়েলথভুক্ত নয় এমন ষ্টার্লিং এলাকার ব্রহ্মদেশ, আইরিশ রিপাবলিক, ইরাক, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি মুদ্রামূল্যহ্রাসের ব্যাপারে ব্রিটেনেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এছাড়া ব্রিটেনের সঙ্গে নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইসরাইল, হল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, গ্রীস, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি দেশও মুদ্রামূল্যহ্রাস করিয়াছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের দাম কমাইবার সময় এই মুদ্রামূল্যহ্রাসের নীতি শুধু মাত্র ব্রিটেনের জন্যই গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং কমনওয়েলথের বা ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলির বা অপর কোন দেশেরই এই নীতি অনুসারে আপন আপন মুদ্রামূল্যের পরিবর্ত্তন সাধনের কোন প্রশ্ন ছিল না; কিন্তু ব্রিটেনের মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাক্ষেত্রে ষ্টার্লিংয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উল্লিখিত দেশগুলি ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত অনুকরণ করিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে টাকার মূল্যহ্রাসের ইহাই কারণ। পাকিস্তান অবশ্য তাহার আশাপ্রদ বহির্বাণিজ্যিক গতি, পাট, তূলা, চামড়া প্রভৃতি অর্থকরী পণ্য, কৃষিকেন্দ্রিক সরল অর্থনীতি, জনসাধারণের জীবনযাপনের নিম্ন-মান, শিল্প প্রসারের প্রভূত সুযোগ, বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটেনের তুলনায় মার্কিন সাহায্যের, মার্কিন পণ্যসংগ্রহের ও মার্কিন মূলধন লাভের আপেক্ষিক সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনায় ব্রিটেনের সহিত হাত না মিলাইয়া মার্কিন মুদ্রা ডলারের সহিত পাকিস্তানী টাকার পূর্ব্বের হার বজায় রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর কালে ব্রিটেন সহ ষ্টার্লিং এলাকার ডলার সঙ্কট ক্রমেই এত তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে যে, মার্কিন সাহায্য এবং ক্যানাডার নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়াও ব্রিটেনের পক্ষে ষ্টার্লিং এলাকার ঘাটতি ডলারের অর্দ্ধেকের বেশী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ইহার ফলে ষ্টার্লিং এলাকার অন্যান্য দেশগুলির ও ব্রিটেনের মজুত স্বর্ণ ও ডলার তহবিল ক্রমেই নিঃশেষ হইতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে ব্রিটেনের ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটতি ছিল ৭ কোটি পাউণ্ড, ইহা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বাড়িতে বাড়িতে ৬৩ কোটি পাউণ্ডে পৌছায়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ডলার বাণিজ্যে সমগ্র ষ্টার্লিং এলাকার ঘাটতি ছিল ১০২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড। অবস্থা কিরূপ অসহায় হইয়া উঠে তাহা নিম্নের তুলনামূলক হিসাব হইতে উপলব্ধি করা যাইবে:—

ষ্টার্লিং এলাকার নিট ডলার ও স্বর্ণ ঘাটতি

১৯৪৮ (জানুয়ারী—সেপ্টেম্বর)—৩৩ কোটি ষ্টার্লিং

১৯৪৯ (জানুয়ারী—সেপ্টেম্বর)—৩৭ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং

ব্রিটেনের মজুত স্বর্ণ ও ডলার তহবিল

১৯৪৮ (সেপ্টেম্বর)—১৪৬ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং

১৯৪৯ (সেপ্টেম্বর)—১১২ কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং

যুদ্ধের আগে মার্কিন পণ্যের দর তো এখনকার তুলনায় কম ছিলই, তাছাড়া ডলার অঞ্চলের সহিত ষ্টার্লিং এলাকার বাণিজ্যে ঘাটতি মিটাইতে ব্রিটেন তাহার ডলার এলাকাস্থ নিয়োজিত মূলধনের মুনাফা ব্যয় করিতে পারিত। যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্বের হিসাবে অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠায় আমদানী পণ্যের প্রয়োজন তাহার কমিয়া যায় অথচ পণ্য উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে মার্কিন পণ্যের প্রভূত চাহিদা সত্ত্বেও ইহার দাম বাড়ে। ব্রিটেনে না হইলেও এই সময়ে ষ্টার্লিং এলাকার অন্যান্য দেশে মার্কিন পণ্যের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা দেখা যায়। ইতিমধ্যে যুদ্ধের প্রথম দিকে অর্থাৎ ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা অনুসারে মার্কিন সাহায্য লাভের পূর্ব্বেই ব্রিটেন অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র কিনিবার জন্য ডলার এলাকাস্থ তাহার নিয়োজিত মূলধনের ৪০ কোটি পাউণ্ডের বেশী খরচ করিয়া ফেলে এবং ফলে ডলার এলাকা হইতে এই মূলধনজনিত আয়ও আনুপাতিকভাবে কমিয়া যায়। এ অবস্থায় যথাসাধ্য ডলার এলাকার পণ্য আমদানী কমাইয়াও ব্রিটেন ডলার সঙ্কট এড়াইতে সমর্থ হয় না এবং শেষ পর্য্যন্ত ডলারের হিসাবে ষ্টার্লিংয়ের মূল্যহ্রাস ছাড়া পথ থাকে না। এইভাবে ষ্টার্লিংয়ের মূল্যহ্রাস সত্ত্বেও ব্রিটেন অন্তর্দ্দেশীয় অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় পূর্ব্বানুসৃত নীতি চালু রাখিবারই ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলি যে শতকরা ২৫ ভাগ ডলার-এলাকাজাত পণ্য কম আমদানী করিবার সংকল্প করিয়াছে, তাহাতে শুধু ব্রিটেনের হিসাবেই ৪০ কোটি ডলার এবং সমগ্র ষ্টার্লিং এলাকার হিসাবে ১২০ কোটি ডলার বাঁচিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ নিজ দেশে ব্যয় সঙ্কোচ

---

* গত মাসের ভারতবর্ষে আমার লেখা 'টাকার মূল্যহ্রাস' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

করিয়াও আর্থিক বাজারে সমতা রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। মুদ্রা-মুল্যহ্রাসের ফলে যাহাতে দেশের মুদ্রাস্ফীতিরোধ নীতি কার্য্যকরী করার পক্ষে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না হয়, তদুদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মোট ২১০ কোটি পাউণ্ড খরচ কমাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিমাণ ব্রিটেনের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ। কাজেই এই বিপুল ব্যয়সঙ্কোচের ফলে লোকের হাতে নগদ টাকার স্বাচ্ছল্য স্বভাবতঃই কমিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে ডলার এলাকার পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ব্রিটেনে একই সঙ্গে মুদ্রা-সঙ্কোচের কার্য্য অগ্রসর হইবে ও ডলার এলাকাজাত পণ্য বিক্রয় কমিবে বলিয়া ডলার সঙ্কটের তীব্রতা হ্রাস পাইবে।

ব্রিটেন মুদ্রামূল্যহ্রাস দ্বারা বৈদেশিক ঋণ এবং আভ্যন্তরীণ মুদ্রা-নীতির হিসাবে কিরূপ লাভবান হইয়াছে তাহা গত মাসের 'টাকার মূল্যহ্রাস' প্রবন্ধেই আলোচিত হইয়াছে। মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে ডলার এলাকায় ষ্টার্লিং অঞ্চলের পণ্যের ঘাটতি যে ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ আশান্বিত হইয়াছেন। গত ১৭ই নভেম্বর ব্রিটেনের অর্থসচিব স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় অক্টোবর মাসে ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৩৫ ভাগ ও ২৫ ভাগ ষ্টার্লিং মূল্যের পণ্য চালান বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ঘোষণায় আরও জানা গিয়াছে যে সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি হইতে ব্রিটেনের জন্য মজুত সোনা ও ডলারের পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে। এই বাবদ ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়াছে ২০ কোটি পাউণ্ড।

মুদ্রামূল্যহ্রাস দ্বারা ব্রিটেনের সবচেয়ে বেশী লাভ হইয়াছে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের হিসাবে। সকলেই জানেন, ব্রিটেন অন্য দেশ হইতে কাঁচামাল আমদানী করিয়া শিল্পজাত পণ্য রপ্তানী করে। সস্তা হইবার ফলে ডলার এলাকায় ব্রিটিশ পণ্য এখন যত বেশী বিক্রীত হইবে, ব্রিটেনে ততই কলকারখানা অধিকতর চালু থাকিবার সম্ভাবনা এবং এইভাবে কলকারখানা চালু থাকিলে কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ অবশ্যই বাড়িয়া যাইবে। ব্রিটেনের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিক কাঠামোর হিসাবে এইরূপ শিল্প-গতি ও কর্ম্মসংস্থানের সুযোগের গুরুত্ব যথেষ্ট।

যদিও ষ্টার্লিংয়ের সহিত যোগাযোগ রক্ষা, মুদ্রানীতির সমতাবিধান প্রভৃতি নানা হিসাবে ভারতের টাকার মূল্যহ্রাসের পক্ষেও যুক্তি আছে, তবু মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে এই দিক হইতেই ভারতের সবচেয়ে অধিক অসুবিধা। ভারতে শিল্পপ্রসার হয় নাই বলিয়া শ্রমমূল্য এদেশে জাতীয় আয়ের অতি নগণ্য অংশ, এখানকার যে সব পণ্য আন্তর্জ্জাতিক বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশই খনি বা কৃষিজাত কাঁচামাল। এই কাঁচামালের মধ্যে পাট, তুলা ও কাঁচা চামড়ার স্থান উল্লেখযোগ্য হইলেও পাকিস্তান মুদ্রামূল্যহ্রাস না করায় এগুলির হিসাবে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে লাভবান হইবার সুযোগ কমিয়া গিয়াছে। তাছাড়া যে সব পণ্য এখন ভারত ডলার-এলাকায় পাঠাইতে পারে তাহার হিসাবে অন্তর্দ্দেশীয় চাহিদাও কিছু আছে, কাজেই টাকার মূল্যহ্রাসের দরুণ শতকরা ৩০.৫ ভাগ বেশী মাল পাঠাইয়া আগের সমপরিমাণ ডলার অর্জ্জনের হিসাবে ভারতের কতটা সুবিধা হইবে তাহা বলা কঠিন। শিল্প শ্রমবিক্রয়কারী ব্রিটেনের সহিত ভারতের এখানেই তফাৎ; ব্রিটেন মুদ্রামূল্যহ্রাস করিয়া দেশের শিল্পোন্নতি ও তৎসহ সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের আশা করিতেছে, কাঁচামাল রপ্তানীকারী ভারতের সে আশা করারও বিশেষ অর্থ হয় না। ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট পত্রিকা গত ২৩শে সেপ্টেম্বরের-সংখ্যায় আশঙ্কা করিয়াছেন যে মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের ফলে ডলার এলাকার সহিত বাণিজ্যে ভারতের পাট জাত পণ্যের হিসাবে ৭ কোটি টাকা এবং চা, কাঁচা তুলা ও পাট, চামড়া প্রভৃতির হিসাবে ২ কোটি টাকা ক্ষতি হইবে। ইহার বিপরীত দিকে লাক্ষা, বাদাম, মশলা, অভ্র ও তৈলাদির হিসাবে ভারতের বাড়তি লাভ হইবে ৩ কোটি টাকা। কাজেই সব জড়াইয়া মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের ফলে ডলার বাণিজ্যে অতঃপর ভারতের বৎসরে ৬ কোটি টাকার মত ঘাটতি হইবে। এছাড়াও ভারত সাধারণতঃ ডলার এলাকায় যে সব কাঁচামাল পাঠাইত, সেগুলির চাহিদা এত বেশী ছিল যে যোগাইতে পারিলে তখনই বাজার প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেদিক হইতে বিচার করিলে এখন সস্তা করিয়া সেগুলির বাজার বাড়াইবার কথা আলোচনা করাই নিরর্থক। যন্ত্রপাতি এবং খাদ্যশস্যের জন্য ভারতকে এখনও বেশ কিছুদিন ডলার এলাকার উপর নির্ভর করিতে হইবে, কাজেই মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে ডলার এলাকার পণ্যের দাম বাড়িলে তাহা ভারতের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে না। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে মার্কিন সাহায্যের অত্যাবশ্যকতার প্রশ্ন যদি সত্যই থাকে, তাহা হইলে মুদ্রামূল্যহ্রাস করা-না-করার সিদ্ধান্তে পাকিস্তান ভারতের তুলনায় লাভবান হইবেন বলিয়াই মনে হয়। এছাড়া ডলার এলাকার পণ্যের 'মূল্যবৃদ্ধির অর্থ শেষ পর্য্যন্ত ষ্টার্লিং এলাকার পণ্যেরও কিছু মূল্যবৃদ্ধি। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু হইতে সুরু করিয়া ছোটবড় অনেকেই মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে ভারতে পণ্যের দাম বাড়িবে না বলিয়া ভরসা দিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই ভরসার মূল্য যতই হোক, আসলে ইহার ফলে সাধারণ দেশবাসীর বেশী দুঃখ দূর হইবে না। যুদ্ধের জন্য ভারতের পণ্যবাজারে একটা ফাঁপা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্যভাবে এদেশে বাড়িয়া ছিল পণ্যের দাম। এখন যুদ্ধের পর লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা কমিতেছে বলিয়া বাজার এখন নামিবার দিকে যাইতেছে। ফাঁপা বাজারের চতুর্গুণ দাম স্বাভাবিকভাবেই অনেকখানি নামিবার কথা। বর্ত্তমানের তুলনায় বাজার অবশ্যই কিছুটা নরম হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক গতিতে যতটা নামা সম্ভব ছিল, টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে পণ্যবাজার ঠিক ততটা আর নামিবে না। ডলার এলাকার পণ্যের মূল্য যতই বাড়ুক, এদেশের একশ্রেণীর অধিবাসীর (ইহাদের মধ্যে ছোট ব্যবসাদারের সংখ্যাই বেশী) পক্ষে এই পণ্য কেনা একেবারে বন্ধ করা কঠিন। কাজেই যদি তাহারা বাড়তি দামে ডলার এলাকার পণ্য কিনিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই বাড়তি দামটুকু তাহাদের উপর কোন না কোন

ভাবে নির্ভরশীল দেশের লোকের স্কন্ধেই চাপাইয়া দিবে। খাদ্যশস্য ও যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারেও ভারতসরকারকে এখন কিছুদিন যথেষ্ট খরচ করিতে হইবে। অবশ্য ব্রিটেন মুদ্রামূল্যহ্রাসের পর ক্যানাডা ডলার এলাকার দেশ হইলেও তাহার মুদ্রামূল্য শতকরা ১০ভাগ হ্রাস করিয়াছে; কিন্তু ক্যানাডার এই শতকরা ১০ভাগ মূল্যহ্রাসে সমগ্র ডলার এলাকা হইতে খাদ্যশস্য আমদানী সমস্যার অতি সামান্য সমাধানই হইতে পারে। ষ্টার্লিং এলাকার কাঁচামাল সস্তায় কিনিবার জন্য এবং বেশী দামে ষ্টার্লিং এলাকায় মাল বেচার অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া ডলার এলাকা শেষ পর্য্যন্ত পণ্যাদির দাম কমাইবে বলিয়া অনেকে এখন যে আশা করিতেছেন, তাহা আকাশকুসুম না হইলেও কার্য্যকরী হইতে সময় লাগিবে। এই অন্তর্বর্ত্তী সময়ে ডলার এলাকার পণ্য বেশী দামে সংগ্রহ করিয়া কাজ চালাইতে ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষকে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক যে সব প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যবস্থা ডলারের হিসাবে সংরক্ষিত, তাহাদের চাঁদার হিসাবেও ভারতের এখন বেশী খরচ হইবে। পাকিস্তানের সহিত গত বছরের (১৯৪৮ জুলাই—১৯৪৯, জুন) বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি হয় ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, পাকিস্তানের সহিত স্বাভাবিক বাণিজ্য সংরক্ষিত হইলে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও বাড়িতে পারে। পাকিস্তানে ভিন্ন মুদ্রা বিনিময় হার প্রচলিত হওয়া মাত্র পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পণ্যাদির লেনদেন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ফলে মাছ, কাঁচা-বাজার ও খাদ্যশস্যের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতিও বাড়িয়াছে যথেষ্ট। এই ঘাটতি বাড়া মানেই পণ্যমূল্যবৃদ্ধি এবং জনসাধারণের সর্ব্বনাশ। অসম মুদ্রাহ্রাসের ফলে পাকিস্তানের পাট সম্পর্কে ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও কলওয়ালাদের দারুণ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে।

যাহা হউক, বর্ত্তমানে অবস্থা যতটা সম্ভব আয়ত্তে রাখিতে হইলে ডলার এলাকায় শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি, এদেশে যথাসম্ভব কম ডলারজাত পণ্য আমদানী, ষ্টার্লিং এলাকা হইতে পণ্য সংগ্রহ এবং আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংস্কারে বিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে। ষ্টার্লিং এলাকায় ডলার এলাকার পণ্য আমদানী ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২৫ভাগ কম করা হইবে বলিয়া এমনি স্থির হইয়াছে, তাছাড়া মার্কিন পণ্যের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের জন্য ভারত সরকারের কিছু ডলার দায় কমিবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের শিল্পজাত পণ্য, সৌখীন দ্রব্যাদি ও এদেশে অত্যাবশ্যক নয় এমন কাঁচা মাল রপ্তানী বাড়াইতেও ভারত সরকারের এখন সচেষ্ট হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ডলার অঞ্চল হইতে ভ্রমণকারীরা যাহাতে অধিক সংখ্যায় ভারতে আসেন, তজ্জন্য ডলার এলাকার বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য-প্রতিনিধিরা এখন প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। ষ্টার্লিং এলাকা হইতে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ পণ্য-সংগ্রহের দিকেও ভারত সরকার নজর দিতেছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। মনে হয় এই সব উপায়ে ডলার সঙ্কট কতকটা এড়ানো যাইবে।*

দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যও ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ এখন চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা যে মুদ্রাস্ফীতি রোধের প্রয়াসের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্যয়সঙ্কোচ এবং পণ্যবাজারে সমতা রক্ষা ইহার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ। মুদ্রামূল্যহ্রাস-জনিত নূতন অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করার জন্য ভারত সরকার অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাইয়ের সভাপতিত্বে একটি 'এড হক' কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটির কাজ হইল মুদ্রামূল্যহ্রাসজনিত সমস্যার কুফল প্রতিরোধে এদেশে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সেগুলি বিবেচনা করা। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারীভাবে নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী ঘোষিত হইয়াছে :—

(১) শুধু মাত্র অত্যাবশ্যক পণ্যের জন্য নিম্নতম পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের উপযোগী বাণিজ্য-নীতি গঠন;

(২) ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় অধিকতর মুদ্রামূল্য সম্পন্ন দেশ হইতে যথাসঙ্গত সস্তা দরে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;

(৩) আইন ও শাসন বিভাগীয় ব্যবস্থা দ্বারা ফাটকাবাজী বন্ধ করা;

(৪) অধিকতর পরিমাণ ডলার মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য ডলার এলাকায় প্রেরিতব্য পণ্যের উপর রপ্তানী শুল্ক বসানো এবং বৈদেশিক পণ্য আমদানীকারক ভারত সরকার বা ভারতীয় উৎপাদক কেহই যাহাতে মুদ্রামূল্য হ্রাসজনিত সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত না হন, তাহার ব্যবস্থা করা;

(৫) মূলধন নিয়োগে উৎসাহ দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জন-সাধারণকে সঞ্চয়ের দিকে আকর্ষণ;

(৬) যুদ্ধকালীন মুনাফা সম্পর্কে কর-তদন্ত-কমিশনের নিকট যাহাদের বিষয় প্রেরিত হয় নাই, তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় কর মিটাইয়া দিবার সুযোগ দান;

(৭) ব্যয়সঙ্কোচ নীতিতে চলতি বৎসরের রাজস্ব ও এককালীন ব্যয়খাতে ৪০ কোটি টাকা ও আগামী বৎসরে অন্ততঃ ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস;

(৮) অত্যাবশ্যক পণ্যাদি ও খাদ্যদ্রব্যের খুচরা মূল্য শতকরা অন্ততঃ ১০ ভাগ হ্রাস।

এছাড়া ভারত সরকার বর্ত্তমানে নূতন লোক নিয়োগ বন্ধ রাখিয়া, কর্ম্মচারীদের রাহা-খরচ শতকরা ১০ ভাগ কমাইয়া এবং অন্যান্য নানা-ভাবে ব্যয় সঙ্কোচের চেষ্টা করিতেছেন। কর্ম্মচারীদের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়াও কর্ত্তৃপক্ষ দেশের উপর হইতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইবার এবং এইভাবে সঞ্চিত অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে লগ্নি করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।*

---

* এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে ডলার বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় উঠিয়া গেলেও ডলার এলাকার পণ্য আমদানী কমাইবার নীতি কার্য্যকরী হওয়ায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৪৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় নামিয়াছে।

* এই প্রবন্ধে 'ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস' প্রচারপত্র হইতে কিছু তথ্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

(পূর্বানুসরণ)

আলিমুদ্দিন মাষ্টার চলতে চলতে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন একবার।

উনিশ শো তিরিশ সালের সে ধ্বনির সঙ্গে 'আল্লা হো আকবর' জয়ধ্বনিত উঠেছিল আকাশে বাতাসে। তিন রঙা পতাকার সবুজ-সংকেত তাঁকে সেদিন দিয়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সেদিন তিনিও কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন :

"ইসি ঝাণ্ডেকে নীচে নির্ভয়,
বোলো ভারত মাতা কী জয় !"

'ভারত মাতা কী জয় !' সেদিন ভারত মাতাকে বন্দনা করতে জিভে জড়তা আসেনি, মনে জাগেনি পৌত্তলিক কুসংস্কারের প্রশ্ন। দেশের মাটিকে খানিকটা নিষ্প্রাণ বস্তুপিণ্ড বলেই মনে হয়নি সেদিন। 'সুজলাং সুফলাং সুখদাং বরদাং' এক বিচিত্র মাতৃকামূর্তি সেদিন আলোক-লেখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল দৃষ্টির সম্মুখে। সে ভারত-বর্ষের পূজা-মণ্ডপে এসে অঞ্জলি সাজিয়েছিল : 'হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খৃষ্টানী'—

কিন্তু তারপর ? সাবানের ফেনায় গড়া বুদ্বুদ চোখের সামনে মায়ার মত মিলিয়ে গেল।

মনে পড়ছে হিন্দু মেয়েদের স্নিগ্ধ করাঙ্গুলিতে পরিয়ে দেওয়া সেই চন্দনের তিলক। সত্যাগ্রহের পথে নির্ভীক অভিযাত্রীর দল। আনন্দে-উৎসাহে সারা প্রাণ প্রদীপের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সেই চন্দন-চিহ্নকে সেদিন মনে হয়েছিল গৌরবের জয়টীকা।

মহিষবাথানের নোনা জল দিগন্তে হেলে-পড়া অস্ত চাঁদের আলোয় চিক চিক করে। হু হু করে রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে সে জলে কলরোল ওঠে—মনে হয় মন্দ্রোঙ্কার উঠছে : 'মোরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। জ্যোৎস্না-ঝকিত কালো জলে ছায়া-ফেলা দীর্ঘকায় তালবীথি সারা রাত মর্মরিত হয়। দূরে আলোর মালা পরে রাত্রির অপ্সরী কলকাতা ঘুমিয়ে থাকে—উৎসব শেষে রঙ্গমঞ্চে লুটিয়ে পড়া কোনো সালঙ্কারা নর্তকীর মতো।

বাতাসে শীত ধরে। তাঁবুর মধ্যে বিনিদ্র চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখা যায় : একটার পর একটা উল্কা ঝরে পড়ছে। বৃশ্চিক রাশি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ক্রমে পাণ্ডু হতে থাকে। সকাল থেকে আবার সংগ্রাম শুরু। পুলিশ আসবে—লাঠি আসবে, প্রিজন্ ভ্যানের খোলা দরজা অভ্যাগত-বরণের মতো এগিয়ে আসবে হাত বাড়িয়ে।

নিদ্রাহীন চোখে সমস্ত রাত বুকের মধ্যে কী যেন জ্বলতে থাকে। জ্বালা নেই—অথচ আশ্চর্য আগ্নেয় অনুভূতি আছে একটা। ঘুম আসে না, তবু স্বপ্ন ভাসতে থাকে। কন্যাকুমারীর প্রান্তরেখা থেকে সমুদ্রের সফেন জলে স্নান সাঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালেন জননী ভারতবর্ষ ; সিংহল তাঁর পায়ের তলায় ফুটে উঠল একটি রক্তকমলের মতো, সিন্ধু-শীকরলিপ্ত কেশজাল ছড়িয়ে পড়ল কারাকোরাম-শিবালিক থেকে খাসী-জয়ন্তীর বেণীবন্ধনে চন্দ্রনাথের সীমান্ত অবধি। বামকর প্রসারিত করে তিনি আরব-সমুদ্রের এলিফ্যাণ্টা থেকে প্রার্থনা করে নিলেন ত্রিশীর্ষ মহাকালের বরাভয়, দক্ষিণকরের নীবার-মঞ্জরী ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে দিলে গঙ্গাহৃদি শ্যামল বাংলার। উন্নত-কিরীটের তুষারশীর্ষে সৌরদীপ্ত স্বর্ণলেখা জ্বলতে লাগল, আকাশ থেকে আরত্রিকের রাশি রাশি দেবধূপ নেমে এল কুণ্ডলিত মেঘপুঞ্জের মতো।

তারপর ছয়মাস জেল। আরো ভাস্বর হল স্বপ্ন, প্রতিজ্ঞা হল আরো কঠিন। কিন্তু—

মনে পড়ছে কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী নিকুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। সঙ্গে ছিলেন আর একজন সহকর্মী—হৃষীকেশবাবু।

নিকুঞ্জবাবুর বাড়ির বাইরের লনে ফুট্‌ফুটে একটি ছেলে খেলা করছিল। হৃষীকেশ বললেন, তোমার বাবাকে

একটা খবর দাও খোকা, দরকারী কাজে আমরা এসেছি।

ছেলেটি ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে গিয়েছিল। তারপরেই শোনা গিয়েছিল তার উচ্চকিত গলার স্বর: মা, মা, একটি ভদ্রলোক আর একটা মুসলমান বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটি ভদ্রলোক আর একটা মুসলমান। পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে ব্যাখ্যা করে সেটা আর বোঝাতে হয়না। অপমানে কান দুটো জ্বালা করে উঠল, শরীরের সমস্ত রক্তকণা মুহূর্তে এসে জমা হল মুখের প্রতিটি রোমকূপে।

হৃষীকেশবাবু অপ্রতিভের মতো হাসলেন। যেন কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে চাইলেন, ছেলেমানুষ।

—না, না, তাতে আর কী হয়েছে!—প্রাণপণে একটা কাষ্ঠহাসি হাসতে হল আলিমুদ্দিনকে। মনে পড়ে গেল সারদাবাবুর ক্লাশে সেই অভিজ্ঞতা: ওযে মুসলমান স্যার।

এক আধটা নয়, এমন অনেক খুঁটিনাটি। সর্বশেষ অভিজ্ঞতা হল আরো দিনকতক পরে।

হৃষীকেশবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্বটা দানা বেঁধে উঠেছিল একটু একটু করে। ভদ্রলোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী, দেশের জন্যে সব কিছু সমর্পণ করে বসে আছেন। তাঁর মা 'হরিজন পল্লীতে' নাইট-ইস্কুল করেছেন, তাঁর বোন কল্যাণী স্বেচ্ছাসেবিকাদের নেত্রী।

আলি দা' বলে ডাকত কল্যাণী। নিজের বোন নেই আলিমুদ্দিনের, বড় ভালো লাগত মেয়েটিকে। আরো ভালো লেগেছিল—যেদিন হৃষীকেশবাবুর পাশে বসিয়ে তাঁকেও ভাইফোঁটা দিয়েছিল কল্যাণী: 'যমের দুয়োরে দিলাম কাঁটা'—। চোখ ভরে সেদিন তাঁর জল ঘনিয়ে এসেছিল, সেকথা আজও তো স্পষ্ট মনে পড়ে।

স্কুলের সেকেণ্ড্ ক্লাশে পড়ত কল্যাণী। মধ্যে মধ্যে তাকে দু' চারটে অঙ্ক বুঝিয়ে দিতেন আলিমুদ্দিন। হাতে যেদিন কোনো কাজ থাকত না সেদিন অযাচিতভাবেই এসে বসতেন হৃষীকেশের বৈঠকখানায়, ঘরে কেউ না থাকলেও খবরের কাগজের পাতা উল্‌টে সময় কেটে যেত। তারপরে হয়তো হৃষীকেশ অথবা কল্যাণী কেউ এঘরে এসে তাকে আবিষ্কার করত: বাঃ—এইযে, কখন এলেন আপনি?

—এই তো কিছুক্ষণ হল।

—তবু একবার ডাকেননি! আচ্ছা মানুষ তো! এতদিন ধরেও পরের মতো হয়ে রইলেন!

—পরের মতো নই বলেই তো বিনা-নিমন্ত্রণে নিশ্চিন্তে এসে বসে আছি। বাইরে থেকে কেউ এসেছি, এটাকে তারস্বরে ঘোষণা করতে চাইনি—হেসে জবাব দিতেন আলিমুদ্দিন।

কিন্তু এই নিঃশব্দে আসাটাই কাল হল তার পরে?

কাল? না—না, সেই হল আশীর্বাদ। সত্যকে চিনলেন তিনি, আবিষ্কার করলেন মুখোসের আবরণে লুকিয়ে থাকা বাস্তবের মুখশ্রীকে। মহিষবাথানের শীতার্ত রাত্রিতে জাগ্রৎ-স্বপ্নে-দেখা আলোকময়ী মহাভারতী মূর্তি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল—আকাশ থেকে ঝরে-পড়া এক একটা উল্‌কাখণ্ডের মতো।

ঝিমঝিম করে সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টি। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছিল পূবদিক থেকে। ভিজতে ভিজতে আলিমুদ্দিন হৃষীকেশবাবুর বৈঠকখানায় এসে উঠলেন। বড় ভালো লাগছে সন্ধ্যাটাকে। কল্যাণীর মায়ের কাছে খিচুড়ি খাওয়ার আবদার করা যেতে পারে, গান শোনবার দাবী করা যেতে পারে কল্যাণীর কাছে।

হৃষীকেশ বৈঠকখানায় নেই। টেবিলে একটা শেজ-বাতি জ্বলছে। হাওয়ায় দোলা-লাগা ক্যালেণ্ডারগুলোর ছায়া নাচছে দেওয়ালের গায়ে। অভ্যাসবশে একটা ইজি-চেয়ারে আরামে এলিয়ে বসলেন আলিমুদ্দিন।

একটা ডাক দিতে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই শব্দটা ভেসে এল। ভেসে এল অলক্ষ্য কোনো ব্যাধের স্থির লক্ষ্য একটি শাণিত তীরের মতো। বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি, হাওয়ার শন্‌শনানি, আর উড়ন্ত ক্যালেণ্ডারের খস্ খস্ আওয়াজ তাকে প্রতিরোধ করতে পারলনা।

—কী দরকার অত মাথামাথি করার? সবটারই একটা সীমা আছে।

হৃষীকেশের মায়ের গলা। হরিজন পল্লীতে যিনি নাইট-ইস্কুল করেছেন, নিজের হাতে বোনা সুতোর খদ্দরের

শুভ্র শাড়ীতে যাঁকে কখনো কখনো ভুল হয়েছে তপতী ভারতবর্ষ মনে করে।

অপরাধিনীর স্বরে জবাব এল কল্যাণীর।

—তোমরাও বড্ড বেশি দোষ ধরো। কী এমন অপরাধটা হয়েছে? বাড়িতে নিয়মিত আসেন, এত ভালোবাসেন, দাদা বলে ডাকি—

কল্যাণীর মার স্বর আরো বেশি তীব্র শোনালো। শাণিত-তীরের ফলকাগ্রটা বিষনিষিক্ত।

—ওঃ, একেবারে সাতকেলে দাদা! জাত নয়, গোত্তর নয়—ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি?

চেতনাটা যেন ক্রমশঃ অভিভূত হয়ে পড়ছে। ফাঁসির দড়িতে অবধারিতভাবে ঝুলে পড়বার পরেও বাঁচবার একটা প্রাণান্তিক অন্তিম আক্ষেপের মতো সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করবার চেষ্টা করছেন আলিমুদ্দিন—চেষ্টা করছেন একটা মর্মান্তিক প্রয়াসে। নিশ্বাস বন্ধ করে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন—যেন এখুনি শুনতে পাবেন এ আক্রমণের লক্ষ্য তিনি নন।

কিন্তু আত্মবঞ্চনা চললনা বেশিক্ষণ। কল্যাণীর মা নিজেই সে স্বপ্নকে ভেঙে খান্ খান্ করে দিলেন পরমুহূর্তে।

—দিনরাত 'আলি দা' আর আলি দা'—নাম করে করে মেয়ে আমার অজ্ঞান। বেশ তো, দাদা আছে থাক, মাঝে মাঝে আসুক যাক—কিন্তু এ কী! আলি দা' একটা অঙ্ক কষে দিন, আলি দা' একখানা নতুন গান শুনুন—এ সমস্ত কী! ও জাতের সঙ্গে মাখামাখি কিসের!

ও জাত! ছেলেবেলায় সারদাবাবুর ক্লাসের সেই হাসির আওয়াজটা যেন আকাশ ফেটে ভেঙে পড়ল। দু হাতে কান চেপে ধরে উঠে পড়লেন আলিমুদ্দিন। সমুদ্রের অতল জলে যেন ডুবে যাচ্ছেন তিনি, নিশ্বাস নেবার মতো এতটুকু ফাঁকা আকাশ বুঝি কোনোখানে নেই!

যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে পথে নেমে গেলেন আলিমুদ্দিন। দিক্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ালেন শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। চোখে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, সম্মুখের সব কিছু লক্ষ্য বস্তুকে চিরদিনের মতো তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস সাপের লেজের মতো তাঁর চোখে মুখে ঝাপটা মারতে লাগল সর্বাঙ্গে, বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে লাগল নাইট্রিক অ্যাসিডের জ্বালার মতো। অবশেষে নগ্ন পায়ের বুড়ো আঙুলে যখন নুড়ির একটা ঠোকা লাগল, নোখ ফেটে গিয়ে গড়াতে লাগল রক্ত—সেই মুহূর্তে নিজের মধ্যে ফিরে এলেন আলিমুদ্দিন।

—ওর গায়ে বিশ্রী রসুনের গন্ধ।

—একজন ভদ্রলোক, আর একটা মুসলমান।

—ও জাতকে বিশ্বাস আছে নাকি?

রক্তাক্ত বুড়ো আঙুলটা চেপে বৃষ্টি-ঝরা আকাশের তলায় পথের কাদার ওপরেই বসে পড়লেন আলিমুদ্দিন। তাঁর ধর্ম জানে, তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা জানে, নিজের বোনের চাইতে আলাদা দৃষ্টিতে কোনোদিন তিনি দেখেননি কল্যাণীকে।

সেই ভাই ফোঁটার তিলক তো এখনো তাঁর ললাটের স্পর্শানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে আছে। সেই 'যমের দুয়োরে দিলাম কাঁটা'—সে তো তাঁরই প্রতি অকৃপণ মঙ্গল-কামনা। তবে?

কাটা নোখের অসহ্য যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে তীব্রতর যন্ত্রণার মধ্যে তার উত্তর এল। কল্যাণী আছে, তার কল্যাণ কামনাও আছে। কিন্তু কল্যাণীর সামনে ভ্রাতৃত্বের সত্যিকারের গৌরব নিয়ে দাঁড়াতে জানলেই সেই কল্যাণ কামনার পূর্ণ ফল আসবে তাঁর হাতে।

কিন্তু সে কেমন করে? কী উপায়ে?

মাথা তুলে দাঁড়াও। ছোট হয়ে নয়, ঘৃণার অনুকম্পায় নয়, অনুগ্রহের প্রসাদের মধ্য দিয়েও নয়। যেদিন তাঁকে ছোট করে দেখবার মতো স্পর্ধাও কারুর থাকবেনা, যেদিন মক্কা থেকে মস্কো পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলা ইস্‌লামী সমশেরের দীপ্তি পড়বে ভারতবর্ষের মুখে—সেইদিন। সেইদিনই কর্ম দেবীর রাখীবন্ধন উৎসব সফল হবে শাহেন্‌শা বাদশা হুমায়ুনের সঙ্গে।

সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাবনার গতি মোড় ঘুরল। দিন কয়েক সীমাহীন অনিশ্চয়তায় কাটাবার পরে পথের নির্দেশ মিলল তাঁর।

—"I am first a mussalman, then an Indian"—

মৌলানা মহম্মদ আলীর উক্তি। দেশের কাজে সমর্পিত-প্রাণ জননায়কের স্বপ্নভঙ্গের স্বীকৃতি।

না, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর তাঁর বিদ্বেষ নেই। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ইংরেজকেই কি তিনি ঘৃণা করেন? না—তা নয়। কিন্তু হিন্দুর যে দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানকে বিচার করে, ইংরেজের যে মনোভাব ভারতবর্ষকে শাসন করে, তারই বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান।

এত বড় হিন্দু সমাজ।• নতুন ভারতবর্ষকে গড়েছে, এনে দিয়েছে জাতীয় আন্দোলনের অমর মন্ত্র, আজাদীর শপথ। কেমন করে তিনি ভুলবেন তাঁর সেই অনলব্রতী সহকর্মীদের, কেমন করে ভুলবেন তাঁদের কথা—যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুক্তি ঘোষণা করে গেলেন হিন্দু আর মুসলমানের? মহিষবাথান যাত্রার আগে যে বোনেরা কপালে চন্দন চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, যে মায়ের দল ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন, যে কল্যাণীর কল্যাণ স্পর্শ তাঁর জীবনের একটা অপরূপ সঞ্চয়, তাদের তিনি ঘৃণা করেন না। শুধু চান'—তাদের কাছে প্রতিদিন পাওয়া এই ঘৃণার কলঙ্ককে মুছে নিতে, সোজা মাথায়, বলিষ্ঠ পেশল বুকে নিজের পূর্ণ মর্যাদায় দাঁড়াতে। হিন্দু হিন্দুত্বের ধ্বজা বয়ে বেড়াক—মুসলমান কেন ভুলে যাবে তার শেষ নবীর দীপ্ত বাণীকে, ভুলে যাবে তার দিগ্বিজয়ী তলোয়ারকে?

বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। মিত্রতা হয় সমমর্যাদার ভিত্তিতে। সেই সাম্য—সেই মর্যাদাকে আগে নিতে হবে আদায় করে। আগে করতে হবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা। 'পাকিস্তান হামারা'—

পথ চলতে চলতে কি এতক্ষণ দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন আলিমুদ্দিন? এইবারে তিনি চোখ রগড়ালেন। ফতেশা পাঠানের বৈঠক থেকে বেরিয়ে নিজের খেয়ালে হাঁটতে হাঁটতে কতদূরে চলে এসেছেন তিনি! পাল-বুরুজ অনেক পেছনে পড়ে গেছে, তার চূড়োর ওপর উড়ন্ত জালালী কবুতরগুলোকে এতদূর থেকে দেখাচ্ছে ঠিক এক ঝাঁক প্রজাপতির মতো।

অতীতের রোমন্থন করতে করতে প্রায় এক মাইল পথ পার হয়ে এসেছেন আলিমুদ্দিন। হেঁটে চলেছেন উঁচু নীচু টিলা জমির লাল ধুলো ভরা পথ দিয়ে। বেলা প্রায় মাথার ওপর। মাঠের ভেতর 'দিয়ে একটা ঘূর্ণি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে, যেন রৌদ্রদগ্ধ সীমান্তের ওপার থেকে কারুর অদৃশ্য হাতছানি দেখতে পাচ্ছে। একটু দূরেই একটা উঁচু ডাঙার ওপর 'কারবালা'। প্রতি বছর পাল-নগরে মহরম শেষ হলে এই কারবালাতেই তাজিয়া বয়ে আনা হয়।

কারবালার পাশেই 'বাদিয়া'দের ছোট একটি গ্রাম: মুস্তাফাপুর। এলাকার মানুষগুলি তাঁর ভারী অনুগত, পালনগরে ফতে শাহুর কাছে দরবার করতে গেলে প্রায়ই তাঁর কাছে সেলাম বাজিয়ে আসে। একটা হোমিওপ্যাথিক বাক্স আছে তাঁর, আর আছে একখানা 'সরল গৃহ-চিকিৎসা'। আপদে-বিপদে, সময়ে অসময়ে কিছু কিছু ওষুধ বিতরণ করে তিনি মুস্তাফাপুরের দুর্ধর্ষ বাদিয়াদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বলতে গেলে এরাই ফতেশার সামরিক শক্তি—দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় লাঠি, হাঁসুয়া আর বে-আইনি গাদা-বন্দুক নিয়ে এরাই সর্বাগ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে রণক্ষেত্রে। প্রত্যেকের গায়েই দুটো চারটে আঘাতের চিহ্ন আছে, অনেকেরই নাম তোলা আছে থানার দারোগাবাবুর দাগী আসামীর ফিরিস্তিতে। রাত বিরেতে প্রায়ই চৌকীদার এসে হাঁক পাড়ে: "করমুদ্দি, ঘরে আছ? ও গণি ভুঁইয়া, তোমার খবর কী?

হোক দাগী, হোক দুরন্ত। তবু ইসলামের এরাই প্রাণ-শক্তি—মনে মনে প্রত্যাশা রাখেন আলিমুদ্দিন। পাকিস্তানের লড়াইয়ে এরাই আগামী মুহূর্তের জঙ্গী ফৌজ। ইসলামী ঝাণ্ডার এরাই সত্যিকারের উত্তর সাধক।

মুস্তাফাপুরের বস্তিতে ঢুকে পড়লেন আলিমুদ্দিন। এসেছেন যখন, একবার খবর নিয়ে যাওয়া যাক।

বাদিয়াদের বস্তির চেহারা একটু ভিন্ন ধরণের। ক্ষেত-খামার, গাছ-গাছালি নিয়ে এদেশের গৃহস্থ পল্লীর মতো নয়, প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির একখানা আমবাগান কিংবা একটা এঁদো ডোবার ব্যবধান নেই। এরা অদ্ভুতভাবে দলবদ্ধ—যেন নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের এতটুকু সীমারেখা টেনে রাখতে চায় না। সারি সারি চালা ঘর গায়ে-গায়ে সাজানো, মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ চলার পথ। সেই চলার পথটুকুও কখনো একটা খাটলি অথবা দুটো একটা জলচৌকি কিংবা আরো দশটা জিনিষে অবরুদ্ধ। যেন নিজেদের ভেতর দিয়ে কাউকে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে দিতে চায় না—গণ্ডির মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চায়।

—মাস্টার সাহেব যে! আদাব—আদাব।

সম্বর্ধনা এল পাশের একটি ঘরের দাওয়া থেকে। পাকা-দাড়ি এক বৃদ্ধ জলচৌকির ওপর বসে হুঁকো টানছে। কাঁচা পাকায় মেশানো তার বিশৃঙ্খল চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে ঝুলে পড়েছে তার ভুকানের ওপর দিয়ে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং জ্বলন্ত; গা খোলা—হাতের আর কাঁধের পেশীগুলি ভাঙা চুরো অবস্থায় শরীরের নানা জায়গায় শিরা স্নায়ুর বাঁধনে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। দেখলেই মনে হয়, শুধু হাওয়াতেই তার বয়েস বাড়েনি, অনেক সমুদ্রের ভেতর দিয়ে তাকে পাড়ি জমাতে হয়েছে।

—আদাব, আদাব। ভালো আছো তো ইলাহী?

—জী আছি একরকম। তা এই দুপুরবেলা এদিকে কোথায়? কোনো রোগী আছে নাকি?

—না, রোগী খুঁজতে এলাম।—আলিমুদ্দিন হাসলেন।

—আসুন, আসুন, উঠে বসুন—ইলাহী আহ্বান জানালো: তামুক খান।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দাওয়ায় উঠে বসলেন আলিমুদ্দিন। একটা খাট্‌লির ওপর বসলেন আরাম করে। ইলাহীর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে তাতে মৃদু মন্দ টান দিতে দিতে তাঁর মনে হল, আঃ সত্যিই তিনি বড় ক্লান্ত! সকাল থেকে এখনো কিছু খাওয়া হয়নি, খাওয়ার কথা ভুলেও গিয়েছিলেন। ফত্তেশাহুর বৈঠকখানায় এন্তাজ চাচার সঙ্গে সেই তর্ক বিতর্ক, উত্তপ্ত মস্তিষ্কে পথে বেরিয়ে আসা। তারপর পথ চলতে চলতে স্মৃতির ওপর থেকে একটার পর একটা আবরণ সরিয়ে দেওয়া। সমস্ত বোধ যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—এখনো বুঝি চান-খাওয়া কিছু হয়নি মাস্টার সাহেবের?—মনের ভাবটা রূপ পেয়ে উঠল ইলাহী বক্সের জিজ্ঞাসায়।

—নাঃ—তামাকের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন।

—সে কি কথা! এলাহী শিউরে উঠল: বেলা তিনপহর যে কখন পেরিয়ে গেছে! তা হলে আমার এখানেই যা হোক কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা করি।

—না-না ওসব কিছু করতে হবেনা—ধীরে ধীরে জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন। বললেন, কোনো দরকার নেই ব্যস্ত হবার। একটু বেশি বেলাতেই খাওয়া আমার অভ্যেস।

—তা হোক। একটু চিঁড়ে-মুড়ির জলপান! নতুন গুড় আছে ঘরে—আগ্রহভরে আবার জানতে চাইল এলাহী।

—বলেছি তো কিছু করতে হবেনা—আলিমুদ্দিনের গলার স্বরে এবার যেন একটু বিরক্তি ফুটে বেরুল। মিনিট খানেক নিঃশব্দে তামাক টেনে জানতে চাইলেন, পাড়ার খবর কী?

—চলছে এক রকম করে!

—এক রকম কেন? ভালো নয়—হুঁকো নামিয়ে জানতে চাইলেন আলিমুদ্দিন।

এর মধ্যে কখন কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেন একটা নিড়ানি হাতে করে এসে দাঁড়িয়েছে নীচের ফালি পথটুকুতে। সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই-ই একটা ফোঁড়ন ছেড়ে দিলে কথার মাঝখানে।

—ভালো আমাদের থাকতে দেবে কেন সাহেব! শাহু কি তেমন লোক?

আচমকা যেন একটা ঢিল এসে ছিটকে লাগল আলিমুদ্দিনের কপালে। চমকে তাকিয়ে দেখলেন হোসেনের দিকে। কালো মুখের ভেতর থেকে দু সারি সাদা দাঁত বের করে উজ্জ্বল হাসি হাসছে সে।

—কী সব যা-তা বলছিস বেকুব?—চটে একটা ধমক দিলে ইলাহী: শাহু আমাদের ভাত দেয়না? আমরা খাইনা তার নিমক?

—খুন দিয়ে নিমক পাই চাচা। কিন্তু নিমকের চাইতে খুনের দাম বেশি—হোসেনের শাদা শাদা দাঁতে আবার সেই উজ্জ্বল হাসি। এবার যেন হাসিটাকে কেমন হিংস্র বলে মনে হল আলিমুদ্দিনের।

কেমন যেন অনুভব করলেন এ আক্রমণের লক্ষ্য শুধু শাহুই নয়—এর আঘাত সমানে তাঁরও ওপরে এসে পড়েছে। মুখ লাল করে বললেন, তোমার যে খুব লম্বা চওড়া কথা শুনতে পাচ্ছি!

—না জনাব, লম্বা কথা আমরা বলব কোত্থেকে! আমরা ছোটলোক, আমরা আছি কেবল খুন দেবার বেলায়, জেলে যাবার বেলায় আর উপোস করার বেলায়। লম্বা কথা বললেই বা তা শুনছে কে!

ব্যঙ্গোক্তিটা এবার আরো তীব্র, আঘাতটা তাঁর ওপরে আরো প্রত্যক্ষ। রাগে অপমানে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার—অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাও জোগালো না তাঁর মুখে।

—আদাব মাস্টারসাহেব, চলি—হোসেন আর এক ঝলক শাদা হাসি বিতরণ করে বিদায় নিলে।

—কী আস্পর্দ্ধা! খানিক পরে সংক্ষেপে বলতে পারলেন মাস্টার।

—তা বটে, ভারী অন্যায়। ইলাহী বক্স মাথা চুলকোতে লাগল: তবে কিনা নেহাৎ অন্যায় বলেনি। আমরা তো তিনপুরুষ ধরে দেখে আসছি—

—কী বললে! হাতের হুঁকোটা ঠক্ করে নামিয়ে রাখলেন আলিমুদ্দিন: তোমরাও সবাই মিলে ওই সব ভাবছ বুঝি? মুসলমান হয়ে মতলব আঁটছ নিমকহারামীর?

—তোবা, তোবা।—দু হাতে কানে আঙুল দিলে ইলাহী বক্স। জিভ কেটে বললে, জী না—না, ওসব আমরা কখনো বলি না। দুঃখে কষ্টে মানুষের মুখ দিয়ে দুচারটে এটা-ওটা কথা বেরিয়ে পড়ে আর কি।

—এটা-ওটা কথা। না, না, এটা-ওটা কথাকে তো প্রশ্রয় দেওয়া যায় না—কড়া গলায় আলিমুদ্দিন বললেন। মুখে ছায়া পড়েছে, মনের মধ্যে ঘনিয়েছে মেঘ। শাহুর খাস জঙ্গী জোয়ানদের মধ্যেও একি অতৃপ্তি আর অভিযোগ মাথা তুলেছে আজ! এই হিংস্র, আর যন্ত্রের মতো নির্মম মানুষগুলোর ভেতরেও কি শুরু হয়ে গেছে নতুন করে চেতনার আলোড়ন! চেতনা জাগুক তা তিনিও চান—কিন্তু তার এ কী রূপ! এ রূপের সম্ভাবনা তাঁর মনে আসেনি, এর পরিণাম কী তাও তাঁর যা কিছু ধারণার বাইরে। হঠাৎ গভীর একটা আশঙ্কার সঙ্গে তিনি অনুভব করলেন, এক একটা রৌদ্রদগ্ধ চৈত্র-দুপুরে যখন আচমকা কোনো 'বাদিয়া'-পল্লীতে আগুন লাগে, আর হঠাৎ আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া দমকা হাওয়া উদ্দাম উল্লাসে একটির পর একটি খড়ের চালে সে আগুনকে বয়ে নিয়ে যায়—আধ ঘণ্টার মধ্যে এত বড় পাড়াটায় পড়ে থাকে শুধু রাশীকৃত ছাইয়ের পিণ্ড,—সেই আগামী অগ্নি-সম্ভাবনার একটি স্ফুলিঙ্গ কোথাও একটা চকমকি পাথরের মধ্যে লহমার জন্যে আত্মপ্রকাশ করল।

হঠাৎ ঘরের মধ্য থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল।

চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন: সে কি—অসুখ কার?

—আজ্ঞে না, ও কিছু না—ইলাহী বক্স জিনিসটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করল যেন।

কিন্তু আবার গোঙানির আওয়াজ এল। আলিমুদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, লুকোতে চাইছ কেন? অসুখ কার?

মাথা নত করে ইলাহী বক্স বললেন, আমার বড় বেটির।

—কী অসুখ?

—ইলাহী বক্স নিরুত্তর হয়ে রইল।

—অসুখটা কী, তাও বলতে বারণ আছে নাকি? দরকার হলে আমি তো চিকিৎসা করতে পারি।

—আপনি পারবেন না জনাব।

—পারব না!

—না। ওর সারা গায়ে পারার ঘা বেরিয়েছে। অসীম লজ্জায় যেন মাটির মধ্যে মিলিয়ে গিয়ে জবাব দিলে ইলাহী বক্স।

—পারার ঘা!—শরীর শিউরে উঠল আলিমুদ্দিনের: ছিঃ, ছিঃ, কী করে হল?

—শাহুর বাড়ীতে বাঁদীর কাজ করত—সংক্ষেপে উত্তর এল।

—শাহুর বাড়ীতে!

—জী!—একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালো ইলাহী বকস: শাহুকে ডাকত ধর্মবাপ বলে।—নিষ্প্রাণ শীতল কণ্ঠের উত্তর এল।

ঘরের মধ্যে আবার গোঙানি শব্দ। দূরে রৌদ্রজ্বলা মাঠ। অভুক্ত পেটে ক্ষিদের আগুন জ্বলছে। আলিমুদ্দিন মাষ্টারের মনে হল চারদিকের খরধার রোদে কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেনের তীক্ষ্ণ শাণিত হাসিটা যেন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে।

(ক্রমশঃ)

জাতীয় জীবনে নারীশিক্ষা

শ্রীবিভা মুখোপাধ্যায়

রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের ক্রমবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতার ধারাও পরিবর্ত্তিত হয়। সেই সভ্যতার ধারাকে অবলম্বন করিয়া যুগে যুগে এক একটী স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আজ যাহা নূতন, কাল তাহা পুরাতন; সেই পুরাতন আবার নূতনের বেশে দেখা দিতেছে বর্ত্তমানের আলোয়। যুগের স্বতন্ত্র মূর্ত্তিটিকে স্বীকৃতি দেওয়াই হইতেছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে রাষ্ট্র ও সমাজ অনুযায়ী শিক্ষাধারার ভিতরেও বিবর্ত্তনের স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয়। ভারতের জাতীয় জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমাদের দেশে নারী শিক্ষা সুদূর অতীতেও প্রসারিত ছিল। বৈদিক যুগ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কখনও বা ধারাটী বিস্তীর্ণ, কখনও বা শীর্ণ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় নারী একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। উচ্চতর শিক্ষালাভের পথে তাহাদের সেদিন কোন বাধাবিপত্তি ছিল না—স্বাধীনতা তাহাদের কোথাও তেমন ব্যাহত হয় নাই। সে যুগের নারীদের মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপমুদ্রা ও শাশ্বতী, লীলাবতী, ক্ষমা (খনা) প্রভৃতির নাম সুবিদিত। কিন্তু পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে যুগের সামাজিক পরিস্থিতির নানা রূপান্তর ঘটিতে থাকে। মনুর বিধিনিয়ম সমাজে প্রচারিত হইবার পর নারীর স্থান অনেকখানি সংকীর্ণ হইয়া আসে। স্বাধীনভাবে নিজেকে চালাইবার অধিকার হইতে তখন তাঁহারা বঞ্চিতা হইয়া পড়েন। বেদপাঠ তাঁহাদের জন্য নিষিদ্ধ হইল, ক্রমে সমাজে বাল্য-বিবাহের প্রচলন হইলে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইল। স্বামীর গৃহে কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই হইল তখন তাঁহাদের একমাত্র অধিকার—এবং এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের শিক্ষাই হইল তখনকার নারী-শিক্ষা।

বৈদিক যুগের পর বৌদ্ধযুগে নারীশিক্ষার ধারাটী আবার বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। বৌদ্ধমঠে বিদুষী ভিক্ষুণীরা বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান যুগে এই প্রবহমান স্রোতটী পুনরায় শীর্ণ হইয়া বাহিরের জগত হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বৈদিক যুগের পর হইতেই শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অধিকার ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শিক্ষার মানটী ক্রমশঃ নিম্নতন হওয়াতে নারী-সমাজে নানা কুসংস্কার ধীরে ধীরে দানা বাঁধিতে থাকে এবং পরবর্ত্তী যুগের নারীও ইহা হইতে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না।

এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারিত হইবার পর, আবার জীবনদর্শনে রূপান্তর ঘটিয়াছে। সমাজের পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়াছে নানা পরিবর্ত্তন, নারীর সামাজিক জীবনধারা নূতন গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে নারী-শিক্ষার পথটী অবশ্য অনেকখানি সুগম হইয়া উঠিয়াছে। তাই নারীর গতিবিধির গণ্ডী আজ অনেক প্রশস্ততর। যুগের প্রভাবকে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কোথায়, পুরুষের স্বাধীন উন্মুক্ত চলার পথে সাম্প্রতিক নারীও অংশ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। উচ্চতর শিক্ষা এবং জ্ঞান আহরণের পথ আজ তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত। তবুও নারী-শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা আজ দেশে দেখা যাইতেছে না—তবে বাধা কিছু অপসারিত হইয়াছে মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক হইতে নারী-শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। মহামতি ডেভিড হেয়ার, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বেথুন সাহেব, রাধাকান্তদেব প্রভৃতি মহামান্য ব্যক্তির বদান্যতার কথা নারী-সমাজ কোনদিনই ভুলিবেন না। কয়েকজন স্বদেশী ও বিদেশী মহাপ্রাণ পুরুষের প্রচেষ্টায় এদেশে নারী-শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটিল। বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা ও কৃষ্টির পথে নারীর জয়যাত্রা শুরু হইল।

সমাজে নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ, আনন্দ ও পরিপুষ্টির জন্য নারী ও পুরুষ উভয়েরই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। Man and woman is a composite whole. নারী ও পুরুষ—এক অপরকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। নারীকে পিছনে ফেলিয়া রাখিলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। নারীর অজ্ঞানতা পারিবারিক জীবনে বহু অনর্থ সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র পুরুষের মানসিক উৎকর্ষ জীবনকে কল্যাণময় ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ নারী কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতাকেই পাথেয় করিয়া জীবনযাত্রা সুরু করে—এবং তাহার মারাত্মক প্রভাব আজ আমাদের সমাজদেহে প্রতিফলিত হইতেছে। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র বাহির বিশ্বে—নারীর স্থান পরিবারের কেন্দ্রস্থলে। পরিবারের মধ্য-বিন্দুটীর স্থিতিসাম্য যদি না থাকে তবে পরিবারের জীবনে অকল্যাণ ও অশান্তি অনিবার্য্য। সুতরাং নারীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার বাঞ্ছনীয়।

নারীশিক্ষার প্রয়োজন যে আছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আদর্শ কন্যা, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতার সৃষ্টি করাই প্রত্যেক রাষ্ট্রের আজ প্রধান লক্ষ্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। সুপরিকল্পিত শিক্ষাবিধি জাতির জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের ভিত্তি স্বরূপ। শিক্ষা-জনগণের অন্তর-শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তোলে, শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় জীবনে দেখা দেয় সংহতির রূপ—জাতির চিন্তা, ভাব এবং কর্ম্মপ্রেরণায় জাগে ঐক্যের সুর। শিক্ষার আলো মানুষের সুপ্ত

শক্তিকে বিকাশোন্মুখ করিয়া সমগ্র জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করে বিপুল ঐক্য চেতনা।

আজ আমরা স্বাধীন—স্বরাজ আর গণতন্ত্র আজ আমাদের করতলগত। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও শিক্ষার গণতান্ত্রিক কাঠামো বা রূপ এখনও পরিলক্ষিত হইতেছে না। বর্ত্তমানে আমাদের সমস্যা হইতেছে—নারীশিক্ষার বিস্তৃতি ও প্রকৃতি লইয়া, অর্থাৎ কি ভাবে ও কোন ধারায় এই শিক্ষার প্রণালী প্রবাহিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা। ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান দেশ, পল্লীর দুঃখদুরবস্থা আজ বর্ণনাতীত। সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও দরিদ্র জনসাধারণ গ্রামেই বাস করে। গ্রাম্য পাঠশালায় এদেশের মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা সুযোগ পাইয়া থাকে—অক্ষর পরিচয় এবং অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানলাভ করে। কিন্তু মানসিক বৃত্তির বিকাশের পক্ষে তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়। দৈনন্দিন চলার পথে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা অর্জ্জন করিবার সুযোগ ভারতীয় গ্রাম্য-বালিকাদের ঘটে না। গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য কখনও লাভ করে নাই। যে দেশে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা শোচনীয়, সেদেশে নারীশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান পল্লীগ্রামে গড়িয়া তোলা একপ্রকার দুঃসাধ্য। মেয়েদের শিক্ষার যথার্থ সুযোগদানের প্রশ্নটা সম্পূর্ণভাবেই নিরুত্তর রহিয়াছে। গ্রামের চেয়ে সহরে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা কিছুটা ভাল। কিন্তু ভারতের মত দরিদ্র দেশের কয়জন লোক তাহাদের ছেলেমেয়েদের সহরে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন? সুতরাং বাধ্য হইয়া বহু মেয়েকে আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ নির্মমতা পরাধীন দেশেই সম্ভব হইয়াছে।

আমাদের দেশে সহশিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। সহশিক্ষাকে অনেক পিতামাতা সুনজরে দেখেন না; সুতরাং ছেলেদের শিক্ষাকেন্দ্রে মেয়েদের প্রবেশ অধিকার নাই। সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সহজ নয়, তবে বাংলা দেশে নারীশিক্ষা প্রসারের সমস্যা সমাধান করিতে হইলে সরকারী অর্থসাহায্যের নিতান্ত প্রয়োজন। সহর অঞ্চলেও আরও অধিক নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের গোড়ার কথা হইবে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার। সমগ্র দেশে প্রতিটী নারী যাহাতে অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া শিক্ষার আলো লাভ করিতে পারে, জাতীয় সরকারের সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বর্ত্তমান ভারতের নারীসমাজে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়জন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাইয়া থাকেন—বৃহত্তর নারী গোষ্ঠী থাকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে। জাতির কাঠামো শক্ত করিয়া গড়িতে হইলে, চাই গণ-শিক্ষার বিস্তৃতি। গণ-শিক্ষা বিস্তারের সুব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরে সকল বয়সের নরনারী যাহাতে শিক্ষার যথার্থ অধিকার ও সুযোগ লাভ করিতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাথমিক নারীশিক্ষা এবং বয়স্কাদের শিক্ষার কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নাই। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার আইন আমাদের দেশে তৈরী হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু তাহাও দেশের সর্বত্র আজও কার্য্যকারী হইয়া উঠে নাই। আধুনিক আবশ্যিক শিক্ষার নানা পরিকল্পনার কথা আমরা শুনিতেছি। কংগ্রেসের তরফ হইতে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ জাতীয় শিক্ষার একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নিখিল ভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্যোগেও একটী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী রচিত ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা এবং ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর ভারতের শিক্ষা-পরিকল্পনা এদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবে কতখানি রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই ভাবিবার বিষয়। গান্ধীজী সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালক বালিকাদের জন্য সাত বৎসর পরিসরের আবশ্যিক বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলিয়াছেন। এই সব পরিকল্পনা যদি দেশে সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইয়া উঠে, তবে আমাদের শিক্ষা ব্যাপারে কিছুটা দুর্দশা দূর হইতে পারে।

যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও দেশে প্রচলিত আছে তাহাতে বালক বালিকারা যথার্থ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছে না। বহুদিনের পুরাতন পরিত্যক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদিগকে আজিও বিদ্যা-চর্চ্চার চেষ্টা করিতে হইতেছে। ইহাতে আনন্দ নাই—শিশু মনস্তত্ত্বের স্থান নাই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নাই—আছে শুধু পুঁথির বোঝা ও রূঢ় শাসন কিন্তু সাম্প্রতিক যুগ অতীতের সেই পদ্ধতিকে আর মানিয়া লইতে চাহিতেছে না। বর্ত্তমান শিক্ষায় আর্টের সঙ্গে রহিয়াছে বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান শিক্ষায় রাজ্যে আনিয়াছে এক নূতন যুগ-বিপ্লব। তা[illegible] আজ সৃষ্টি হইয়াছে 'Educational Psychologyর'। প্রত্যে[illegible] শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা ও সুপ্ত সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করা[illegible] প্রয়োজন আছে। শিশুমন কি চায় এবং কতটুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ শিশুর আনন্দ কোন বিষয়ে এবং কোন পথে অগ্রসর হইলে সে জীবন সংগ্রামকে জয়ী হইতে পারিবে এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে চা[illegible] আধুনিক শিক্ষা। পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলিতে সেইজ[illegible] ইন্দ্রিয়মূলক শিক্ষা এবং কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ছোট ছো[illegible] বালিকাদের জন্য। ফ্রোয়েবেল এবং মন্টেসরি পদ্ধতিতে এই রক[illegible] শিক্ষার একটা বিশিষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়, নার্সারী স্কুলে শিক্ষা একেবারে প্রাথমিক স্তরে খেলাধুলা, আনন্দ এবং কর্ম্মের ভিতর দি[illegible] ইহা রূপান্তরিত হইয়া উঠে, স্বাধীন ভারতে যদি আজ নারী-শিক্ষা আদর্শ কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত করিতে হয় তবে প্রথমে বালিকাদে[illegible] জন্য এই মন্টেসরি পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অনেকটা ফলপ্র[illegible] হইবে। পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও অনে[illegible] বাড়াইতে হইবে।

মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের শিক্ষার প্রয়োজন ভারতীয় নারীকে সম্যকভাবে শিক্ষিত করিতে হইলে বিভিন্নমুখী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আগেই ব[illegible] হইয়াছে। আমাদের দেশে তরুণীরা মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করি[illegible] উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার জন্য কলেজের মুখে ধাবিত হন, দেশী

কলেজগুলিতে ভারতীয় নারীরা কতদূর শিক্ষিতা হইয়া উঠিতে পারেন, বলা শক্ত। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষায় তাহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অনেক বারই অধিকার করিয়াছেন। ইহা যোগ্যতার মাপকাঠি হইলেও, সুব্যবস্থিত শিক্ষার মাপকাঠি বলিয়া ধরা যায় না। সুশিক্ষিত ও সুসভ্য ইংরাজ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া দেড় শত বছরে আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহার লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশ করিলে দেখিতে পাইব যে তাহা আমাদের পুরুষের জীবনেও ফলপ্রসূ হয় নাই। এই শিক্ষা আমাদের স্বাবলম্বী করে নাই—আত্মশক্তি দান করে নাই—জাতীয় জীবনে এবং সকল প্রকার উদ্যম ও কর্ম্মশক্তির ভিতর দুরারোগ্য পক্ষাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। বিজাতীয় শিক্ষার আদর্শে যদি ভারতীয় নারীকে অগ্রসর হইতে হয়, তবে পুরুষের মত নারীদের জীবনও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। ইহার জন্যই বাংলার নারী জীবনের আদর্শের মধ্যেও যেন ভাঙ্গন ধরিয়াছে। পশ্চিমের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে অন্ধভাবে শিক্ষিত নারী সমাজ আজিকার দিনে অনুসরণ করিতেছে। তাই নারী-শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইল ইহার প্রকৃতি লইয়া। এ দেশে নরনারীর শিক্ষা-পদ্ধতি একই ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। জীবন আদর্শে নারীর একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। এই বিশিষ্টতাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাতে জীবন আবর্ত্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ভারতের নারীর বিশিষ্ট স্থান পরিবারের কেন্দ্রস্থলে, সন্তান-সন্ততির রক্ষণা-বেক্ষণ, গৃহের শৃঙ্খলা, আনন্দ, কল্যাণ সব কিছুই নির্ভর করে নারীর মমতাময়ী মূর্তির উপর। পরিবারে নারীর শক্তি অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং নারী ও পুরুষের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যের কথা সহজে আসিয়া পড়ে। অথচ এ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু জাতির সংস্কৃতি অনুযায়ী পারিবারিক জীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই নারীকে স্বতন্ত্র শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সেজন্যই আয়োজন এদেশের নারী-শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার। তাহার জন্য নূতন করিয়া পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে রূপান্তর সাধন করিতে হইবে, নানা রকমের গৃহস্থালী বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সূচীশিল্প, রন্ধনশিল্প, গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, শিশুমনস্তত্ব, সঙ্গীত শিক্ষা, এবং সাধারণ গণিত, ইংরাজী, বাংলা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস নারী-শিক্ষার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ও এই বিষয় সচেতন হইয়াছে—মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতি সেই বৃত্তিশিক্ষার তালিকায় সহজেই স্থান পাইতে পারে।

অধুনা প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষিতা হইয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন নারীর পক্ষে নানা কারণে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। পুরুষের বেকার সমস্যা যেখানে এত ব্যাপক, সেখানে নারী সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির সহজ পথটী খুঁজিয়া বাহির করা আজ অত্যন্ত কঠিন। দেশে আর্থিক দুরবস্থার জন্য বহু নারীকে আজ জীবিকা উপার্জ্জনে তৎপর হইতে দেখা যাইতেছে। বাহিরে নারীর কর্ম্মস্থলটি বড়ই সংকীর্ণ। অর্থ-উপার্জ্জনের ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া এবং পুরুষের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান সমাজে নারী আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির একান্ত প্রয়োজন। দেশের আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত হইলে নারী সম্প্রদায় খানিকটা রেহাই পাইবে। কিন্তু বিপদের দিনে স্বামী, পুত্র ও ভাইদের গলগ্রহ হইয়া না থাকিয়া প্রয়োজনমত স্বাধীনভাবে যাহাতে তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের পল্লী অঞ্চলে কুটীর শিল্পের প্রসার ঘটিলে বহু নারী সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়া সহজে জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ খুঁজিয়া পাইবে।

যে শিক্ষা আমাদের চরিত্রে সংযম আনিবে, যাহা আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনিয়া দিবে আমাদের কুসংস্কার দূর করিবে এবং সর্ব্বোপরি মনুষ্যত্বের সন্ধান দিবে সেইরূপ শিক্ষাবিধি প্রবর্ত্তনের পথ যাহাতে সুগম হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রতিভাসম্পন্ন নারী ও পুরুষ সর্ব্ব দেশেই বিরল। সুতরাং প্রতিভা যাঁহাদের আছে তাঁহারা উচ্চতর সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের আলোচনা করুন, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ও লোকায়ত শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আদর্শ ও লক্ষ্যহীন পথে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিলে চলিবে না। শিক্ষার বিলাস আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের যদি পরিপূর্ণরূপে বাঁচিতে শিখিতে হয় তবে নারী ও পুরুষের যথার্থ শিক্ষার পথটি সহজে প্রসারিত করিয়া তুলিবার পন্থা ভারতবাসীকে খুঁজিতে হইবে। না হইলে আলেয়ার পিছনে ছুটিলে ভারতের জাতীয় জীবনের অপমৃত্যু অনিবার্য্য। যে আদর্শে নারী শিক্ষার ধারা প্রচলিত করিলে বলিষ্ঠ সমাজ ও ভবিষ্য সন্তানগণের জীবনধারা এবং শিক্ষা-দীক্ষা বৃহত্তর কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাই হওয়া উচিত নারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন কালে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, নারীই ভবিষ্য-জাতির জননী ও বনিয়াদী শিক্ষার প্রথম ও প্রধান সহায়ক।

শান্তি-সম্মিলন—

যে সময়ে একদিকে ইংরাজ ও আমেরিকা যুক্তভাবে এবং অন্যদিকে রুশিয়া যুদ্ধায়োজনে বিশেষভাবে নিযুক্ত, ঠিক সেই সময়ে ভারতে শান্তি-সম্মিলন উপলক্ষে জগতের বিভিন্ন দেশের বহুসংখ্যক প্রতিনিধি সমবেত হইয়া শান্তি-প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করিতেছেন। যাঁহারা এই সম্মিলনে সমবেত হইয়াছেন, পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়া তাঁহারা সকলেই অসাধারণ—কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার সহিত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ নাই। এ অবস্থায় শান্তি-সম্মিলন যে শুধু কাগজপত্রের সৃষ্টি করিবে, জগৎ হইতে বর্ত্তমান অশান্তি দূর করিতে সমর্থ হইবে না, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতনের আম্রকুঞ্জে শান্তি-সম্মিলন আরম্ভ হইয়াছে—এখানে ৮ দিন সভার পর মহাত্মা গান্ধীর সেবাগ্রামে সম্মিলনের ৮ দিন সভা হইবে। বিদেশী সুধীবৃন্দ এই দুইটি তীর্থস্থান দর্শন করার ফলে—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি যে আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সেই আদর্শের সহিত পরিচিত হইবেন। আমাদের বিশ্বাস, জগতে সেই আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দ্বারাই একদিন শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারা যে জগতে শুধু অশান্তি সৃষ্টি করে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির চিন্তাধারা যে চির-শান্তিময় জগৎ প্রতিষ্ঠায় সমর্থ—এই বিশ্বাস লইয়া জগতের সুধীবৃন্দ যদি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবেই জগত প্রকৃতভাবে উপকৃত হইবে। গান্ধীজির আদর্শে বিশ্বাসী নহে বলিয়াই আজও ভারতের জনগণ দুঃখদুর্দ্দশায় নিমগ্ন। মনে প্রাণে লোক গান্ধীজিকে গ্রহণ করে নাই বলিয়াই স্বাধীনতা লাভের পরও দেশে শান্তি আসে নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির আশ্রমে গমন করিয়া, নিষ্ঠার সহিত সেই আদর্শের সহিত পরিচিত হইয়া, যদি তাহা প্রচার করেন, তবে আবার নূতন করিয়া জগতের জনসাধারণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং শান্তি-সম্মিলনের তাহাই লাভ বলিয়া আমরা মনে করিব। গান্ধীজির জীবিতকালে এই সম্মিলনের সূচনা হইয়াছিল—আমাদের দুর্ভাগ্য গান্ধীজি জীবিত থাকিয়া জগদ্বাসীর নিকট জীবন্ত আদর্শ দেখাইবার সুযোগ লাভ করিলেন না। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, এই সম্মিলন হইতে প্রত্যাগত বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী সেই আদর্শের প্রচারের সহায়ক হইয়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইবেন।

আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা—

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের উত্তর ভারতে পুনর্বসতি দান ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত ব্যক্তিদের জন্য কোন অর্থ ব্যয় করেন নাই। তাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত জনগণের দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সকল হিন্দু আসামে বা বিহারে গিয়াছেন, সে সকল প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতার জন্য বহিরাগত বাঙ্গালীদের দুঃখদুর্দ্দশার অন্ত নাই। অবশ্য উড়িষ্যা সরকার এক দল বাঙ্গালীকে উড়িষ্যায় পুনর্বসতির সুযোগ ও সুবিধা দান করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম বাংলায় লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী পরিবার চলিয়া আসিয়াছে—বঙ্গ বিভাগের সময় স্থির ছিল, সরকার তাহাদের সাহায্য ও পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জন্য কিছুই করা হয় নাই। শাসন ব্যবস্থার গলদের জন্য যে সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও উপযুক্ত পাত্রে যায় নাই। এ বিষয়ে যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয়, তবে অনেক দুর্নীতি প্রকাশ পাইবে। মন্ত্রিসভা সেরূপ কোন তদন্তের প্রয়োজন বোধ করেন না—কারণ পুনর্বসতি বিভাগে নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীরা নানাভাবে মন্ত্রিসভার সমর্থক। অথচ সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা নাই। পশ্চিমবঙ্গে বাড়ী ভাড়া খুব বাড়িয়া গিয়াছে, তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতেছে না। আশ্রয়প্রার্থীরা

কি ভাবে পশুর মত অল্পস্থানের মধ্যে বহুলোক বাস করিতেছে, তাহা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। দেশে দারুণ খাদ্যাভাব, যাহাদের নির্দ্দিষ্ট আয় আছে, তাহারাই সে আয়ে সংসার প্রতিপালন সঙ্কুলান করিতে পারে না। যাহাদের নির্দ্দিষ্ট আয় নাই, তাহারা খাদ্যাভাবে ও বস্ত্রাভাবে কি কষ্ট পায়, তাহা বর্ণনার অতীত। গত ২ মাস হইতে পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা পশ্চিমবঙ্গে বে-আইনিভাবে পতিত জমী দখল করিয়া তথায় গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে। গত ২ বৎসরে কোন সরকারী পুনর্বসতি পরিকল্পনা প্রস্তুত বা কার্য্যকরী হয় নাই—কাজেই লোক বাধ্য হইয়া এইরূপ বে-আইনি কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অবশ্য ইহাদের পশ্চাতে একদল স্বার্থান্ধ লোকও আছে। কিন্তু অধিকাংশ আশ্রয়প্রার্থীই অতি কষ্টের মধ্যে আছে। তাঁহাদের জন্য ইতিমধ্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্ত্তব্য ছিল। এ অবস্থায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ২ মাস হইয়া গেল, সরকার একটি বিবৃতি প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করেন নাই। যে সকল জমী অন্যায়ভাবে দখল করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বহু জমী গত ২০ বৎসর কাল পড়িয়াছিল—মালিকের কোন লাভের কারণ ছিল না। মালিকও সেগুলিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন নাই। এ অবস্থায় যদি সরকার উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দখলীকারের নিকট তাহা আদায় করিয়া মালিককে প্রদানের ব্যবস্থা করেন, তবে এই বিবাদের মনোভাব চলিয়া যাইবে। এ বিষয়ে সত্বর কোন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের সহিত বিরোধ দিন দিন বাড়িয়াই চলিবে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিকতা—

স্বাধীনতা লাভের পরও পশ্চিমবঙ্গে প্রাদেশিকতা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই শঙ্কিত হইতেছেন। বাঙ্গালার বাহিরে নানা প্রদেশে—বিশেষ করিয়া বিহারে ও আসামে বাঙ্গালীদের উপর নানাভাবে নির্য্যাতন হইতেছে বলিয়া বাঙ্গালায়ও বাঙ্গালীরা অবাঙ্গালীদের প্রতি ভাল মনোভাব রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ইহা অবশ্যই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারে অবাঙ্গালীর প্রভাব অধিক বলিয়া সেখানে বাঙ্গালী আর নূতন করিয়া প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ হয় না—নানা ক্ষেত্রে অবাঙ্গালী বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। যে সকল অবাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাস করিতেছে, তাহারাও ঐ সুযোগে বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীদের উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করে। এইভাবে বাঙ্গালায় বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিবাদ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। সহরতলী অঞ্চলে বহু অবাঙ্গালীর বাস। বাঙ্গালী সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী বলিয়া প্রথমতঃ তাহাদের সকল স্থানে সুযোগ ও অধিকার দান করিয়াছে। তাহার ফলে সকল কার্য্যক্ষেত্রে এখন বাঙ্গালীদের পশ্চাদপদ হইতে দেখা যাইতেছে। ইহাতে বাঙ্গালীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক—অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালা দেশে বাস করুন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু যদি প্রতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে অবাঙ্গালীর মুখাপেক্ষী হইয়া বাঙ্গালা দেশে বাস করিতে হয়, তবে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা সহ্য করাও সহজ নহে। যাহাতে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেশ হইতে দূরীভূত হয়, সরকার পক্ষ হইতে সেজন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। নচেৎ বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহা বন্ধ করা সুকঠিন হইবে।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা—

হিন্দী ভাষা ও দেবনাগরী বর্ণমালা ভারতের রাষ্ট্র-ভাষারূপে গৃহীত হওয়ায় এ বিষয়ে আলোচনা শেষ হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা এই ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পারেন নাই। হিন্দীর প্রতি দক্ষিণ ভারতের বিদ্বেষের মূল কারণ, তাহাদের আশঙ্কা, উত্তর ভারত এই ভাবে দক্ষিণ-ভারতকে দাবাইয়া রাখিবে, দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, কানাড়ী প্রভৃতির সহিত হিন্দী ভাষার কোন মিল না থাকায় দক্ষিণ ভারতের পক্ষে হিন্দী ভাষা শিক্ষা করা সহজসাধ্য হইবে না। আর এক দিকে উত্তর ভারতের মুসলমানগণ উর্দ্দু বর্ণমালা গৃহাত না হওয়ায় রুষ্ট হইয়াছেন। এই ব্যাপারে শিক্ষা-সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পর্য্যন্ত তীব্র ভাষায় হিন্দু নেতাদের সঙ্কীর্ণতার ও আত্মম্ভরিতার নিন্দা করিয়াছেন। এখানে যুক্তির কোন বালাই নাই। পাকিস্তান পৃথক হইয়াছে—হিন্দুস্থানে উর্দ্দু বর্ণমালা দাবী করার কোনই অর্থ হয় না।

ইংরাজি আগামী ১৫ বৎসর কাল রাজকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে স্থির হইয়াছে। কাজেই হিন্দী যাহারা না শিখিবে, তাহারা ইংরাজির মারফত সকল কাজ করিতে সমর্থ হইবে। সংস্কৃত বা দেবনাগরী বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃত ভাষাকে যতই মৃত-ভাষা বলিয়া নিন্দা করা হউক না কেন, ঐ সংস্কৃত ভাষাই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবার একমাত্র দাবীদার—কাজেই অদূর ভবিষ্যতে তাহাই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া গৃহীত হইবে।

বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়া—

বর্ত্তমান বৎসরে বর্দ্ধমান জেলার প্রায় সকল স্থানে ম্যালেরিয়া এত ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে—এরূপ বহু বৎসর পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তাহার একমাত্র কারণ, খাদ্যাভাব বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত নিরাশ্রয় লোকের দল গ্রামে গ্রামে যাইয়া বাস করিতেছে, কিন্তু কৃষি প্রভৃতির সুযোগ সুবিধা না থাকায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। ধনী জমীদারের দল বহুদিন গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে, গ্রামগুলি শ্রীহীন—পচা পুকুর ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া আছে। আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ম্যালেরিয়া দরিদ্রের ব্যাধি—কাজেই এ বৎসর যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িবে, তাহা আর বিচিত্র কি? বহু টাকা ব্যয় করিয়া সরকার কৃষি ও স্বাস্থ্য বিভাগ পুষিয়া থাকেন, তাহাদের কার্য্য সরকারী দপ্তরখানার ফাইলের মধ্যেই নিবদ্ধ—গ্রামের লোক ঐ সকল বিভাগের অস্তিত্বই বুঝিতে পারে না। স্বাধীন দেশেও এ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইল না—এজন্য কাহাকে দোষী করিব?

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন—

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে তদন্তের জন্য সার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয়। ভারতের মোট ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা ২০জন অধ্যয়ন করে। কলিকাতায় ১৮৮২ সালে কলেজে-পড়া ছাত্রসংখ্যা ৩৮২৭—১৯৪৭ সালে তাহা হইয়াছে ৪৫০০৮। বঙ্গ ভঙ্গের পরও ১৯৪৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪১ হাজার। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৭৪টি কলেজের মধ্যে ৩৬টি কলিকাতা সহরে অবস্থিত। শুধু ৫টি কলেজে—বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ, সিটি, বঙ্গবাসী ও আশুতোষে মোট ৩০৪৯২ ছাত্র অধ্যয়ন করে। সহরের ভিড়ের মধ্যে ছাত্র না রাখিয়া কলেজগুলিকে গ্রামাঞ্চলে লইয়া না গেলে ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতি যে বাড়িয়া যাইবে, সে কথা কমিশন একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষাদান ব্যবস্থা এতই অসন্তোষজনক যে ছাত্ররা সেজন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে সমর্থ হয় না। সরকারী কলেজগুলির অবস্থাও গত ৩০ বৎসরে খারাপ হইয়া গিয়াছে। যে দেশে এত অধিক বেসরকারী কলেজ হইয়াছে, সে দেশে আর সাধারণ শিক্ষার জন্য সরকারী কলেজ রাখার প্রয়োজন দেখা যায় না। সরকারী কলেজগুলির জন্য অযথা সরকারী অর্থ অপব্যয়িত হইয়া থাকে। বেসরকারী কলেজগুলিতেও এত অধিক ছাত্র গ্রহণ করিতে দেওয়া উচিত নহে। বেসরকারী কলেজগুলিকে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলা চলে না—ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলিলেই ভাল হয়। কলেজ শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য অবিলম্বে কঠোর আইন প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর দেশবাসীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে—যদি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন না করা হয়, তবে দেশ যে ক্রমে অধঃপতিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বহু সত্য কথা প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে দেশবাসী জনগণের ও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। ৫টি বড় কলেজের ছাত্রসংখ্যা যাহাতে এখনই কমান হয়, তাহার ব্যবস্থা প্রয়োজন। ঐ সকল কলেজে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের কখনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়া সম্ভব হয় না। মফঃস্বলে ছোট ছোট [illegible] হইলে, ঐ সকল ছাত্র সেখানে [illegible] শিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে। এ বিষয়ে [illegible] ব্যক্তিগণেরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

বন সম্পদ বৃদ্ধি—

১৯৪৭ সালের সরকারী হিসাবে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে ১৬৯৭৬১১ একর জমী বনভূমি। দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ী

জেলাতে ও ২৪পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলে সরকারী বনভূমি আছে। তাহা ছাড়া ২৬৮১৯০ একর বনভূমি ব্যক্তিগত অধিকারে আছে। সম্প্রতি বনসম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। প্রকাশ নদীয়া জেলাতে ২০০০ একর জমী, মেদিনীপুরে ১৫০১ একর জমী, বীরভূমে ৭৩ একর, মুর্শিদাবাদে ৫০ একর ও বাঁকুড়ায় ১৬৫ একর জমী বনভূমিতে পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে। সংবাদটি আশাপ্রদ সন্দেহ নাই কিন্তু অন্যান্য সকল ব্যবস্থার মত এই ব্যবস্থাতেও যেন 'পর্বতের মূষিক প্রসব' না হয়—ইহাই আমাদের কামনা।

সর্দ্দার পেটেল ও পণ্ডিত নেহরু—

গত ১লা নভেম্বর সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের ৭৫তম জন্মোৎসব ও গত ১৫ই নভেম্বর পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর ৬০তম জন্মোৎসব ভারতের সর্ব্বত্র পালিত হইয়াছিল। উভয় ব্যক্তিই বর্ত্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধার এবং উভয়েই অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন। সর্দ্দারজী ৭৫ বৎসর বয়সেও যে ভাবে কাজ করেন, তাহার হিসাব দেখিলে যে কোন যুবকও বিস্মিত হইবেন। ভারতে নূতন সংযুক্ত-ভারত প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তিনি যে ভাবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রের অধীন করিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই বিস্ময়জনক। পণ্ডিত নেহরু এখনও কত কাজ করেন, তাহা তাঁহার আমেরিকাবাসের দৈনন্দিন কার্য্যসূচি দেখিয়া আমরা জানিতে পারি। তাঁহাদের উভয়ের পরিচালনাধীনে দেশ আবার তাহার লুপ্ত গৌরব লাভ করুক, ইহাই সকলে কামনা করে। পণ্ডিতজী ও সর্দ্দারজী দীর্ঘজীবী হইয়া দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট ভারতবাসীর সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে দেশবাসী চিরদিন তাঁহাদের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

বিনা টিকিটে ভ্রমণ—

গত জুলাই মাসে ই-আই-রেলে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের নিকট হইতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭ শত ১১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। বুক করা হয় নাই, এমন মালের জন্যও ঐ মাসে ৭ হাজার ২ শত ৮৮ টাকা আদায় হইয়াছে। আমরা সকলে অপরকে আজ দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে দুর্নীতি কি ভাবে ব্যাপক হইয়াছে, তাহা এই বিনা টিকিটে ভ্রমণের হিসাব দেখিলেই বুঝা যায়। অনেকে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী ধরা পড়িলে তাহার মুক্তির জন্য সুপারিশ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করি না। প্রত্যেক লোক যদি বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করি, তবে এই পাপ অতি সহজে দূর করা হয়। আমরা কিন্তু কেহই সে বিষয়ে চিন্তা পর্য্যন্ত করি না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্যাক্স—

কলিকাতা কর্পোরেশনের তদন্ত কমিশনের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছিল যে সহরের বহু বাড়ীর ট্যাক্স কম ধরা হইয়াছে। এ বিষয়ে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চিফ ভ্যালুয়ার মত প্রকাশ করিয়াছেন—তিনি অনেকগুলি বাড়ীর ট্যাক্সের অঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, প্রায় সব ক্ষেত্রেই উহা যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা অপেক্ষা কম। এ বিষয়ে ৫ হাজার বাড়ীর ট্যাক্স পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে, শতকরা ৭৫টি বাড়ীর ট্যাক্স কম ধরা হইয়াছে, ১৫টির ঠিক আছে ও ১০টির বেশী আছে। এখন এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা কে করিবে? বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ধনীদের দ্বারা গঠিত না হইলেও তাঁহারা ধনীদেরই সমর্থন করিয়া থাকেন। অধিকাংশ কেন, সকল বড়গৃহের মালিকই ধনী—কাজেই শতকরা ৭৫টি বাড়ীর ট্যাক্স বাড়াইতে গেলে ধনীদের পকেটে হাত পড়িবে—কাজেই 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?' যদি বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা এই সকল দুর্নীতি দমন না করেন, তবে আগামী নির্ব্বাচনে কেহই তাঁহাদের ভোট দিবেন না। অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে গেলেও মন্ত্রীদের আর ধনিক-তোষণ নীতি চালানো সম্ভব হইবে না। জনগণ আর কতদিন এই দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

নূতন ভাগবত বিদ্যালয়—

১৮৬৪ সালে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী কাশীনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার ১৬১ হ্যারিসন রোডস্থ বাসগৃহ ও বহু সম্পত্তি ভাগবত ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দান করিয়া গিয়াছিলেন। গত ১৪ই অগ্রহায়ণ তথায় পশ্চিমবঙ্গের মহাপরিপালক শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এক ভাগবত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খ্যাতনামা বাগ্মী ও পণ্ডিত শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী ঐ বিদ্যালয়ের আচার্য্য।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন ও কলিকাতার বহু সুধী উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান যুগে এই ধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক—কাজেই আমাদের বিশ্বাস—এই বিদ্যালয় দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করিবে।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাব্রতী ও কোবিদ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার গত ২৪শে নভেম্বর ৬৩ বৎসর বয়সে আমেরিকার ওয়াসিংটন সহরে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী (ইউরোপীয় মহিলা) শ্রীমতী ইদা মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে ছিলেন ও তাঁহার একমাত্র কন্যা ইন্দিরা ফ্রান্সে পড়াশুনা করিতেছেন। ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯০৪ সালে ডবল অনার্স সহ বি-এ পাশ করেন; সে সময়ে তাঁহাকে বিদেশে শিক্ষার সরকারী বৃত্তি ও ডেপুটীর চাকরী দেওয়া হয়—তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন ও ১৯০৬ সালে এম-এ পাশ করিয়া বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি মালদহের অধিবাসী ছিলেন ও মালদহ জেলার সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯০৯ সাল হইতে তিনি এলাহাবাদে পানিনি কার্য্যালয়ে গবেষক ছিলেন এবং ১৯১৪ সালে বিলাত গমন করেন। বিশ্ব-যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় তিনি আমেরিকা যান ও তথায় ১০ বৎসর বাস করেন। ১৯২৫ সালে তিনি সস্ত্রীক স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ও বহু সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৬ হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন এবং গত কয় বৎসর অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি বিদেশে বাংলার সংস্কৃতি প্রচারে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন ও ১২ বৎসর আমেরিকায় সংস্কৃতি প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অতি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, সর্ব্বদা নিজেকে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতেন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

বাঙ্গালার প্রবীণতম রস-সাহিত্য-স্রষ্টা সাহিত্যাচার্য্য কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রি শেষ ৪ ঘটিকার সময় পূর্ণিয়ায় তাঁহার বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়স হইয়াছিল। জীবন সায়াহ্নে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতকে স্বাধীনতা লাভ করিতে দেখিয়া তিনি নিজ ডায়েরীর পাতায় লিখিয়াছিলেন—

"এখন মোরে শ্রীপদে লও কৃপা করি রসরাজ।
শেষ কথাটি বলে যাই, স্বাধীন মোরা, স্বাধীন দেশ॥"

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌবন কালেই তিনি সাহিত্য সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংসার দর্পণ নামক সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণেশ্বরে ১৮৬৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। দক্ষিণেশ্বর, উত্তর পাড়া ও বরাহনগর স্কুলে পড়িয়া তিনি অগ্রজের সহিত মীরাট ও আম্বালায় যাইয়া তথায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৩০১ সালে তিনি 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' নাম দিয়া কবিগান সংগ্রহ করেন—সে গানগুলি তাঁহার পিতার রচিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার

'সাধনা' মাসিক পত্রে ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কেদারনাথ 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রেও 'নন্দি শর্ম্মা' নামে কাব্য লিখিতেন। তিনি সরকারী চাকরী করিতেন, ১৯০২ সালে চীনে গমন করিয়াছিলেন ও ১৯০৫ সালে ফিরিয়া কাণপুরে কাজ পান। ঐ স্থানে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা হয়—কেদারনাথ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯১০ সালে সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্য সাধনায় পুনরায় মন দেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা বর্ত্তমান, তিনি কয়েক বৎসর কাশীবাসের পর পূর্ণিয়া ভাট্টাবাজারে আসিয়া বহুকাল বাস করেন। তিনি দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক ছিলেন এবং লেখনীর মধ্য দিয়া তাহাদের সুখ দুঃখের কথাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ১৩২২ সালে প্রথম তাঁহার 'কাশীর কিঞ্চিৎ' প্রকাশিত হয়—তাহার পর তিনি অবিরাম বহু লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের পাঠকগণ সে সকলের সহিত সুপরিচিত। চীন-যাত্রী, শেষ খেয়া, আমরা কি ও কে, কবুলতি, দুঃখের দেওয়ালী, পাথেয়, কোষ্ঠীর ফলাফল, ভাদুড়ী মশাই, উড়ো খৈ, আই-হ্যাজ, পাওনা, মা-ফলেষু প্রভৃতি অন্যতম। ১৯২৬ সালে দিল্লীতে, ১৯২৭ সালে মীরাটে, ১৯২৯ সালে নাগপুরে ও ১৯৩৪ সালে কলিকাতায় তিনি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৪১ সালে কাশীতে উক্ত সম্মিলনের তিনি মূল সভাপতি হন, কিন্তু অসুস্থতার জন্য যাইতে না পারিয়া লিখিত অভিভাষণ প্রেরণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

কলিকাতার দুগ্ধ সমস্যা—

ডাঃ সিক্কা নামক একজন অবাঙ্গালী বহুদিন যাবৎ বাঙ্গালা সরকারের কৃষি বিভাগে কাজ করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যকারিতার কথা কেহ জানে না, তবে তিনি যে অনেক অকাজ করিয়া থাকেন, তাহা কাঁচড়াপাড়ার নিকট হরিণঘাটার পশুপালন কেন্দ্রের বিবরণ হইতে জানা যায়। তিনি এখন দুগ্ধ সরবরাহের কর্ত্তা হইয়াছেন এবং সম্প্রতি কলিকাতায় কি ভাবে দুগ্ধ-সমস্যার সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতায় জনগণ যে দুগ্ধ ক্রয় করে, তাহার শতকরা ৮৫ ক্ষেত্রে জলমিশ্রিত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি ইহার প্রতীকারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বাঙ্গালার লোক সন্দেশ খাইয়া দুগ্ধের অপব্যবহার করে, ইহাই তাঁহার অভিমত। এ সকল বাজে কথা না বলিয়া এবং সরকারী গৌরী সেনের টাকায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ না করিয়া তিনি যদি সত্যই কোন কাজ করিতেন, তবে লোক তাঁহার সমালোচনা শুনিত। এই সকল ফাঁকা কথার কোন মূল্য আছে বলিয়া কেহ মনে করে না।

পেশা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি—

বোম্বায়ে পেশাদার ভিক্ষুকদিগকে আর সহরে ভিক্ষা করিতে দেওয়া হইবে না—আইন করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য আশ্রয়-স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। বিষয়টি খুবই প্রয়োজনীয়। কলিকাতা সহরে আবার ভিক্ষুকদের ভিক্ষা করাইয়া নাকি একদল লোক অর্থোর্জ্জন করে—তাহাই নাকি ব্যবসা। কলিকাতায়ও পেশাদারী ভিক্ষা বন্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সমাজ ব্যবস্থার যে গলদের জন্য লোক ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়, তাহার কি কোন সুবন্দোবস্ত করা যায় না। ভিক্ষুক ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ভাবে পালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাহারা আর ভিক্ষুক হইবে না, সমাজের উপকারী মানুষ হইবে—ইহা ত পরীক্ষিত সত্য। এ কার্য্যের জন্য যদি গভর্ণমেণ্ট অগ্রসর হন, তবে আইন করিয়া ভিক্ষা বন্ধ করার প্রয়োজন হইবে না।

পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা—

পূর্ণবয়স্কদের শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকারী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, ইহা দেশবাসী সকলের পক্ষে আশা ও আনন্দের সংবাদ। দেশে কোটি কোটি লোক বাল্যে শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করেন নাই, আজ তাহাদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান প্রচার না করিলে রাষ্ট্র পরিচালনার নানারূপ অসুবিধা হইবে ও রাষ্ট্র অচল হইয়া যাইবে। এ কথা সত্য হইলেও দেশের একদল স্বার্থান্ধ লোক পূর্ণ-বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বাধাদান করিতেছে ও করিবে। কি ভাবে শিক্ষা দান করা প্রয়োজন, তাহা স্থির করা

সুকঠিন। সকলক্ষেত্রে একরূপ ব্যবস্থা চলিবে না। দেশের আবহাওয়া ও জনসাধারণের অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথকতার মধ্য দিয়া শিক্ষা প্রচারের উপায় স্থির করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের পূজা-পার্ব্বণ ও মেলাগুলিকে জনশিক্ষার কাজে লাগাইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান নহে, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির শিক্ষাদান সর্ব্বাধিক প্রয়োজন। কে এই শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিবে? প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক ভাবে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। দেশে ত্যাগব্রতী জনসেবকের দলকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। যে শিক্ষা মানুষকে অকর্ম্মণ্য ও পঙ্গু করিয়া দিয়াছে, ইংরাজ প্রবর্ত্তিত সেই শিক্ষার প্রসারের আর কোন প্রয়োজন নাই। নূতন ভাবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ গড়িবার জন্য সকল শিক্ষারই সংস্কার প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া বয়স্কদের শিক্ষাদান আরও কঠিন ব্যাপার। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি সপ্তাহে অন্তত একদিন করিয়া যদি ২ ঘণ্টা স্থানীয় নিরক্ষর পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের চেষ্টা করেন, তবে দেশের প্রভূত উপকার হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এ জন্য চিন্তা করিয়া আমাদের কর্ম্মপথ স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমরা কি আজও তাহা গ্রহণ করিব না?

বিশ্ব-শান্তি—

গত জুলাই মাসে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবী ক্রমেই শান্তির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমেরিকার সমরসজ্জা, এ্যাট্‌ল্যাণ্টিক চুক্তি, দ্রুততর এবং মারাত্মক বিমান পোত ও আণবিক বোমার ক্রমশঃ ব্যাপক ধ্বংস-শক্তির গবেষণা প্রভৃতি বিশ্ব-শান্তি স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিতেছে কি না বলা যায় না; কিন্তু বর্ত্তমানে মাও সে তুং কর্ত্তৃক কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপন হইতে চীনে গৃহবিবাদের কথঞ্চিৎ শান্তি এবং রুশ কর্ত্তৃক আণবিক বোমার গুপ্তত্থ্য আবিষ্কার যে বিশ্বযুদ্ধের নিবারণ—অন্ততঃ বিলম্বের সূচনা করিতেছে তাহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। যাহার নাই, সে ত চাহিবেই, কিন্তু যাহাদের আছে, তাহারাও যে আরও বেশী চায়, ইহাই অশান্তির মূল। সারা পৃথিবীর সম্পদে যোগ্যতানুসারে সকলের অধিকার-সম্ভাবনা না হইলে শান্তি লাভ সম্ভব বলিয়া ত মনে হয় না।

সুলক্ষণ—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতের বাহিরে দূতাবাস প্রভৃতির ব্যয় হ্রাসের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বেই এই আদেশ জারি হওয়া উচিৎ ছিল; আমাদের মনে হয়, দূতাবাস স্থাপন কালেই—ভারতবর্ষের কেবল বিত্তের নয়, আদর্শের অনুযায়ী ব্যয় ব্যবস্থা করিয়া দূতাবাসগুলি স্থাপন করা উচিৎ ছিল। "জাতির জনক" বলিয়া চীৎকার করা যাঁহাদের পেশা, তাঁহারা প্রকাশ্যে বলেন, আড়ম্বর না থাকিলে ভারতের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং ভারতীয় দূতাবাসগুলির ব্যয় কল্পনারাজ্যের আমীর ওমরাহ বাদশাহের আড়ম্বর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়া শোনা যায়। একবার মনে করিয়া দেখা ভাল যে মহাত্মাজী মাত্র আজানুলম্বিত বস্ত্রে বার্কিংহাম রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; তাঁহার মর্য্যাদার হানি হইয়াছিল বলিয়া কখনও শোনা যায় নাই। "জাতির জনক" বলিয়া চীৎকার করিয়া লাভ নাই; তাঁহার আদর্শ কতকটাও কার্য্যে পরিণত হইলে সকলের মঙ্গল।

সত্যমেব জয়তে—

সত্যের জয় অথবা জয়ই সত্য অর্থাৎ যে প্রকারে হউক জয়লাভ করিলে তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। ইহা ন্যায়ের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা চলে। বুদ্ধিমান লোকে বলিবে "যা হবার হ'য়ে গেছে" আর বিতর্কে লাভ নাই; "সত্য" এখানে "truth বা "honest dealings" না হইয়া "fact" অর্থে গ্রহণ করিলে অনেক অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; কারণ কথায় বলে "factum valet." আধুনিক যুগে ইহাই "সত্যমেব জয়তে" কথার অর্থ হওয়া ভাল। দেখা যাইতেছে "বৃহৎ কার্য্যে" এই সত্য বিশেষ চালু হইয়া উঠিতেছে। ভারতীয় অর্থসচিব বলেন, 'ডিভ্যালুয়েশন অর্থাৎ মুদ্রার মান হ্রাস করার ব্যাপারে ব্রিটিশ অর্থ-সচিবকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, তাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে; সত্য পথে গেলে ক্রিপস্ সাহেবের উচিৎ ছিল, ভারতবর্ষকে জানাইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ভারতীয়

বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীক্ষিতীশ নিয়োগী বলেন যে পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়, তাহা ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পাকিস্তানে সেই চুক্তি প্রচারিত হইবার সময় দেখা গেল, সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সর্ত্তটী প্রকাশিত হয় নাই। জেনারেল ডেল্‌ভোয়ী রাষ্ট্র সঙ্ঘের প্রতিনিধি হইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ মিটাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়া আছেন। তিনি কাশ্মীরের শত্রু একেণ্ডি সাহেবের মূল্যবান মালপত্র লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া কাশ্মীর সরকারের অজ্ঞাতসারে, পূর্ব্বতন মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। তিনি এক্ষেত্রে ব্যবহার করিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের শ্বেতবর্ণ বিমান। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অপর একজন কর্ম্মচারী উইংকমাণ্ডার স্মিথ বিনা ছাড়পত্রে কাশ্মীর প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে তারিখ পর্য্যন্ত ছাড়পত্র দেওয়া ছিল, তাহার অবসানের মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিমান চাপিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিয়া আনন্দে কাশ্মীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইহা এক সপ্তাহের সংবাদ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহার পরও যদি জগতে সত্যের জয় হইতেছে বলিয়া কাহারও সন্দেহ থাকে, তিনি নূতন করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম মতে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে অশান্তি ভোগ করিবেন; তাহাতে পৃথিবীতে কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

খাদ্য মূল্য হ্রাস প্রচেষ্টা—

এত কাল বাদে মন্ত্রী মহোদয়দের টনক নড়িয়াছে যে দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার তুলনায় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বেশী এবং তাহার কিছু হ্রাস করা প্রয়োজন। শোনা যাইতেছে আগামী জানুয়ারী মাস হইতে শতকরা দশ টাকা কমাইবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা হইবে। এতদিন যে চেষ্টা হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সকলেই মনে করেন, লোকের খাদ্য দ্রব্যের উপর রাজ্য শাসন হইতে অপচয় পর্য্যন্ত সকল লোকসানের খরচ চাপাইয়া এরূপ চড়া দর করা হইয়াছে। ক্রয়কালীন যদি চাউল প্রভৃতি দেখিয়া লওয়া হয় এবং ভোজ্য চাউল যদি ক্রেতাকে দিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলেই গৃহস্থের অনেক সুরাহা হয়। অপচয় ও চুরি বন্ধ বা যথাসম্ভব রদ করা, তণ্ডুল যথা সময়ে যথাস্থানে পৌঁছাইবার যান বাহনের ব্যবস্থা করা, ন্যায্য মূল্যে যথার্থ পরিমাণ তণ্ডুলাদি সংগ্রহ করিবার উপায় করিতে পারিলেই দর শতকরা দশ ভাগ কমে। এ সকলের ব্যবস্থা করা যাঁহাদের হাতে তাঁহারা যে এ বিষয়ে খুব আগ্রহশীল তাহা মনে হয় না। এই সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট যেরূপ আস্ফালন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, দেশে সকল শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় খাদ্য দ্রব্যের মূল্য আরও কমিবে। তবে চিনি প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারী তৎপরতা, দূরদৃষ্টি ও কর্ম্মকুশলতার যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে হতাশ হইতেই হয়।

পঃ বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা—

পশ্চিম বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যে উৎসাহজনক নহে তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলিতে পারে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪,১৫৩ ও ছাত্র সংখ্যা ১১,৫৬,১০৫ আর শিক্ষক আছেন ৪২,৯০০। বাঙ্গালা সরকার ৬ হইতে ১১ পর্য্যন্ত সকল বালক বালিকাকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাও আবার বনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে। পশ্চিম বাঙ্গালার মোটামুটি আড়াই কোটী লোকের শতকরা ১২০৫ জন এই হিসাবে শিক্ষা লাভের অধিকারী হয়, অর্থাৎ অন্ততঃ ৩১ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠ লওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে তাহার মাত্র এক তৃতীয়াংশ ছাত্র রহিয়াছে। আমরা কোথায় পড়িয়া আছি, তাহা ইহা হইতে অনুমান হয়।

দিল্লীতে টেলিফোনের চার্জ্জ হ্রাস—

একটানা মূল্য বৃদ্ধির সংবাদে অভ্যস্ত ভারতবাসী, হঠাৎ ব্যয় হ্রাসের সংবাদে উৎফুল্ল হইবার কথা। দিল্লীর টেলিফোন ব্যবহারকারিগণ বস্তুতই ভাগ্যবান, ১৬ই অক্টোবর হইতে তাহাদের কল-প্রতি মূল্যের হার কমিবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ভাগ্যবানদিগের প্রতি হিংসা পোষণ করি না, কেবল বলি যে যাঁহারা টেলিফোন ব্যবহার করেন তাঁহার অধিকাংশই ধনী, আর না হয় অর্থোপার্জ্জনের জন্ত টেলিফোন ব্যবহার করেন। সুতরাং সরকারী তরফে ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হইলে—ভাত, কাপড়, তেল, শাক-সব্জী অথবা বিক্রয়কর—রেল, ডাক মাশুল প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য দিলে ভাল হইত। এই দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়িলে সকলে সুখী হয়।

যোগব্যায়ামের আদর্শ আজ সভ্য জগতের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এখানেই তাঁদের থামলে চলবে না— নিজের এই অজ্ঞ দেশের প্রতিও যথেষ্ট নজর দিতে হবে। ভারতবর্ষে ষ্টকহলমের অনুরূপ যোগব্যায়ামের স্কুল বা শিবির নানা জায়গায় স্থাপন করার দরকার। যাতে সাধারণে সহজেই এই ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করতে পারেন তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষাদানের সুব্যবস্থাও করতে হবে। এই সব কাজ সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এর জন্য গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদের সাহায্যও প্রয়োজন। বিশ্বলিম্পিয়াডে আচার্য্য গোস্বামী ও ডাঃ প্রামাণিকের সাফল্য লাভের পর আশা করি ভারত সরকার ভারতীয় যোগব্যায়ামের প্রসারের জন্য সচেষ্ট হবেন। আমরা আচার্য্য শ্যামসুন্দর গোস্বামী ও ডাক্তার দীনবন্ধু প্রামাণিককে তাঁদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
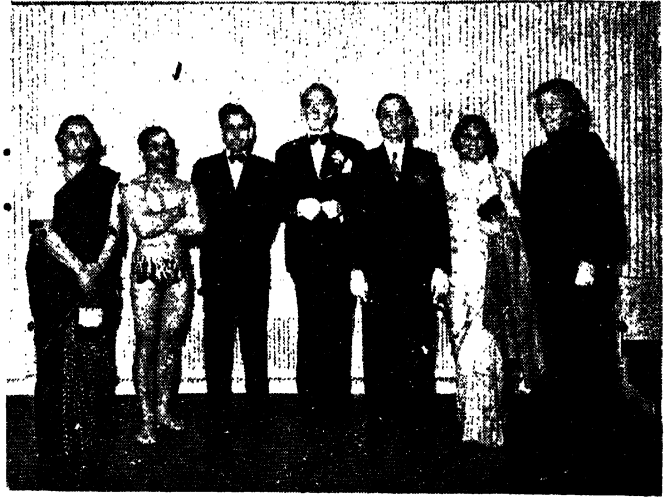
ষ্টকহলমের ইণ্টারন্যাশানাল ক্লাবে আচার্য্য গোস্বামী ও ডাঃ প্রামাণিক
বামদিকের দ্বিতীয় স্থান থেকে—ডাঃ প্রামাণিক, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীআর, কে, নেহেরু, ইণ্টারন্যাশানাল ক্লাবের সভাপতি ত্রিলিয়ম্‌, আচার্য্য গোস্বামী, শ্রীমতী নেহেরু ও ডাঃ হান্না রীথ্‌

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রথম টেষ্ট ম্যাচ ঃ

কমনওয়েলথ ঃ ৬০৮ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ও ১২ (১ উইঃ)

ভারতবর্ষ ঃ ২৯১ ও ৩২১

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় দল বনাম কমনওয়েলথ দলের প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় কমনওয়েলথ দল ৯ উইকেটে ভারতীয় দলকে পরাজিত করেছে।

ভারতীয় দলের পক্ষে মানকড় এবং অমরনাথ আহত থাকায় প্রথম টেষ্ট খেলায় যোগদান করতে পারেননি।

১১ই নভেম্বর দিল্লীর উইলিংডন ষ্টেডিয়ামে প্রথম টেষ্ট খেলা সুরু হয়। কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক এল লিভিংষ্টোন টসে জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ গ্রহণ করেন। টসে ভারতীয় দলের দুর্ভাগ্যের সমান ভাগীদার আর কোন দেশ আছে কিনা সন্দেহ। ওল্ডফিল্ড এবং লিভিংষ্টোন কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। লাঞ্চের সময় কমনওয়েলথ দলের পক্ষে ওল্ডফিল্ড এবং লিভিংষ্টোনের জুটি ৯৭ রান করেন। লাঞ্চের পর মোট ১২৫ মিনিট খেলার পর দলের ১০০ রান উঠে। লিভিংষ্টোন ১২৩ রান করে ফাদকারের অফ ব্রেক বলে আউট হয়ে যান। তাঁর এ রানে ১০টা

বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার বাউণ্ডারী ছিল এবং তিনি দুবার আউটের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে যান। ওল্ডফিল্ডের জুটি হ'ন এ্যালে। ওল্ডফিল্ড ৪ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে তাঁর নিজস্ব শতরান পূর্ণ করেন। তাঁর রানে ১০টা বাউণ্ডারী ছিল। চা-পানের সময় কমনওয়েলথ দলের এক উইকেটে ২৩৫ রান উঠে। ৪-৩০ মিনিটে ৫ ঘণ্টার খেলায় দলের ২৫০ রান উঠতে দেখা যায়। খেলার নির্দিষ্ট সময়ে কমনওয়েলথ দলের ২ উইকেটে ২৮৪ রান উঠে। ওল্ডফিল্ড ১১০ এবং ফ্রেয়ার শূন্য রান ক'রে নট আউট থাকেন। প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় দলের ফিল্ডিং খুবই খারাপ হয়েছে। মোট পাঁচটা ক্যাচ নষ্ট হয়। বিজয় মার্চেণ্ট নিজেই একটা সহজ লো-ক্যাচ ফেলে দেন। উদয় মার্চেণ্ট তাঁর দেখাদেখি স্লিপে তিনটে ক্যাচ নষ্ট করেন, তার মধ্যে একটা ক্যাচ ধরা খুবই সোজা ছিল।

১২ই নভেম্বর দ্বিতীয় দিনের খেলায় কমনওয়েলথ দলের ৮ উইকেটে ৬০৮ রান উঠে। সি এস নাইডু ১৯৪ রান দিয়ে ৩টে উইকেট পান। ফাদকারও ৩টে উইকেট পান ১৬৩ রান দিয়ে। এদিনের খেলায় বিজয় মার্চেণ্ট এবং উদয় মার্চেণ্ট দু'ভাই আহত হ'ন। ওল্ডফিল্ড ১৫১ রানে আউট হন। পেটিফোর্ডের ৬৫ নট আউট, ফ্রেয়ারের ৫১, এবং ওরেলের ৫৮ রান উল্লেখযোগ্য।

১৩ই নভেম্বর, খেলার তৃতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের ক্যাপটেন পূর্ব্বদিনের ৮ উইকেটে ৬০৮ রানের উপরই দলের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন। মার্চেণ্ট ভ্রাতৃদ্বয় খেলায় যোগদান করতে পারবেন না এ খবর শুনে ভারতীয় খেলোয়াড় এবং দর্শকেরা হতাশ হয়ে পড়লেন। সারভাতে এবং মন্ত্রী ব্যাট করতে নামলেন। সূচনা ভাল হ'ল না। দলের মাত্র ১ রানে সারভাতে কোন রান না করেই বোল্ড হ'লেন। দলের ৪০ রানের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে গেল। চতুর্থ উইকেট পড়ল [illegible]৬ রানে। এর পর ফাদকার এবং অধিকারী পঞ্চম উইকেটের জুটি হয়ে দলের পতন রোধ করলেন এবং অন্যদিকে খেলার মোড়ও ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁদের জুটিতে দলের ১৬১ রান উঠে। ফাদকার ১১০ রান ক'রে ফ্রেয়ারের বলে বোল্ড হ'ন। ফাদকারের ব্যাটিং খুবই দর্শনীয় হয়েছিল এবং কোন সময়েই খেলায় বিপক্ষদলকে তাঁকে আউট করবার সুযোগ দেননি। তৃতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৫ উইকেটে ২৫৫ রান উঠে। অধিকারী ৭৪ এবং উমীরগড় ১ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

১৪ই নভেম্বর, খেলার চতুর্থ দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ২৯১ রানে শেষ হয়। ৩১৭ রান পিছনে থেকে ভারতীয় দল ফলো-অন করে। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভালই হ'ল। ওপনিং ব্যাটস উমীরগড় এবং মন্ত্রী যথাক্রমে ৫৪ এবং ৫৫ রান করেন। চতুর্থ দিনের শেষে দেখা গেল ভারতীয় দলের পক্ষে ৩ উইকেটে ১৬৫ রান উঠেছে। হাজারে ৪৫ এবং ফাদকার ১ রান করে নট আউট থাকেন। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা শেষ পর্য্যন্ত এক হাত না লড়ে যে হার স্বীকার করবে না দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার ধরণ দেখে দর্শকেরা অন্ততঃ বুঝতে পারলেন। বাকি হাতে ৬টা উইকেট, হাজারের খেলায় দৃঢ়তা দেখে একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিল, হয়ত খেলাটা ড্র যেতে পারে।

১৫ই নভেম্বর, টেষ্ট খেলার শেষ দিন। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩২৭ রানে শেষ হয়ে গেল। হাজারে ১৪০ রান করলেন। খেলাটা ড্র করার হাজারের আপ্রাণ চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হ'ল। অধিকারী ৪৪ রান ক'রে শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। কমনওয়েলথ দল তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। এবং জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১২ রান উঠতে ১টা উইকেট পড়ে। খেলা শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের

৬৫ মিনিট আগেই খেলার ফলাফল চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। কমনওয়েলথ দল প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দলকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে।

টেবল্‌ টেনিস ঃ

ক'লকাতায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত টেবল টেনিস টেষ্টম্যাচ খেলায় ইংলণ্ড ৫-০ গেমে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রণাই একটা গেম পেয়েছিলেন বার্ণার সঙ্গে খেলায়। বার্ণা প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ গেমে চন্দ্রণাকে পরাজিত

করেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের পরাজিত করতে ইংলণ্ডের বার্জম্যান এবং বার্ণাকে কোন বেগ পেতে হয়নি। পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন খেলোয়াড় বার্জম্যান এবং বার্ণার খেলার কাছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলা নিষ্প্রভ হয়ে ছিল। ভারতীয় টেবল টেনিস খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কত নীচে ভারতীয় খেলোয়াড়রা এ থেকে উপলব্ধি করতে পারলে ভারতবর্ষে বার্জম্যান এবং বার্ণার আগমন সার্থক হবে।

টেষ্টখেলার ফলাফল ঃ

বার্জম্যান ২১-১০, ২১-১৫, ২১-১৪ সেটে চন্দ্রণাকে পরাজিত করেন।

বার্জম্যান ২১-৯, ২১-৮, ২১-১৯ সেটে ভাণ্ডারীকে পরাজিত করেন।

বার্ণা ২১-৯, ২১-১৬, ২১-৯ সেটে ভাণ্ডারীকে পরাজিত করেন।

বার্ণা ২১-১৪, ১৭-২১, ২১-১৮, ২১-১০ সেটে চন্দ্রণাকে পরাজিত করেন।

বার্জম্যান ও বার্ণা ২১-১৪, ২১-১৫, ২১-১১ সেটে চন্দ্রণা ও কুমার ঘোষকে পরাজিত করেন।

প্রদর্শনী খেলা ঃ

আগন্তুক দল ৪-১ গেমে বাঙ্গলাদেশকে পরাজিত করেন। আগন্তুকদলে খেলেন বার্জম্যান ও চন্দ্রণা। বাঙ্গলা দলে ছিলেন ভাণ্ডারী, কুমার ঘোষ এবং জয়ন্ত। জয়ন্ত (বাঙ্গলা) ২১-১৬, ১৯-২১, ২১-১৬ ও ২১-১০ সেটে চন্দ্রণাকে পরাজিত করেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেবল টেনিস ঃ

ক'লকাতায় ইউনিভারসিটি হলে অনুষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান রিচার্ড বার্জম্যান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন ভূতপূর্ব্ব পৃথিবীর টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান ভিক্টর বার্ণাকে হারিয়ে। বার্জম্যান তিনটি বিষয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেন।

ফলাফল ঃ

সিঙ্গলসে রিচার্ড বার্জম্যান ২১-১১, ২১-১১, ২১-১৯ সেটে ভিক্টর বার্ণাকে পরাজিত করেন।

ডবলসে—বার্জম্যান ও বার্ণা ২১-১২, ২৪-২২, ২১-১[illegible] সেটে কে ঘোষ ও চন্দ্রনাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে বার্জম্যান ও মিসেস সি মদন ২৬-২৪, ১৭-২১, ২১-১৬, ১৫-২১, ২১-১৬ সেটে বার্ণা ও মিসে[illegible] বার্ণাকে পরাজিত করেন।

সুইডিস ফুটবল দল ঃ

মোহনবাগান ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হেলসিংব[illegible] সুইডিস ফুটবল দলের প্রদর্শনী খেলাগুলি ক'লকাতা[illegible] ফুটবল মহলকে এমনভাবে যে আকৃষ্ট করবে তা কেউ আশ[illegible] করতে পারে নি। অসময়েও ফুটবল খেলা যে ক'লকাতা মাঠে দর্শকদের বিপুলভাবে আকৃষ্ট করতে পারে সাম্প্রতি[illegible] অনুষ্ঠিত সুইডিস দলের খেলা থেকে একটা দৃষ্টান্ত র[illegible] গেল। লীগ বা আই এফ এ শীল্ডের গুরুত্বপূর্ণ খেলা[illegible] মতই সুইডিস দলের প্রদর্শনী খেলার টিকিটের চাহিদা ছি[illegible] এবং শেষ পর্য্যন্ত ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ স্থানাভাবের জন্য বহু সহ[illegible] দর্শককে হতাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বিপু[illegible] জনসমাগমকে মোহনবাগান ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ যে সুশৃঙ্খ[illegible] ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন তার জন্য প্রশংসা তাঁদে[illegible] এবং দর্শকদের উভয়েরই প্রাপ্য। সুইডিস দলের খে[illegible] সম্পর্কে বহু আলাপ আলোচনা খেলার মাঠে শুনা গেছে প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের 'Physical fitness' দর্শকদে[illegible] মুগ্ধ করেছে। ফুটবল খেলার উপযোগী যে সব দৈহি[illegible] গুণাগুণ থাকা দরকার এ দলের সে সমস্তের কোন অভা[illegible] নেই, এমনভাবেই দলে খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করা হয়েছে প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই বলিষ্ঠ ওজনে ভারী এবং দ্রুতগামী ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাদের পাশে অনেক দিক থেকে অশোভন ছিল। ক'লকাতায় সুইডিস দল তিনটি ম্যা[illegible] খেলেছে। প্রথম খেলা মোহনবাগানের সঙ্গে গো[illegible] শূন্য ড্র গেছে। দ্বিতীয় খেলায় ইষ্টবেঙ্গল দলকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছে। তৃতীয় খেলায় আই এফ এ দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে হেলসিংবর্গ ফুটবল দল তাদের পূর্ব্ব অঞ্চলের সফরে অপরাজেয় সম্মান লাভ করেছে। মোহন বাগান ক্লাব তার গত ৭/৮ বছরের খেলোয়াড় জীবনে এত ভাল খেলা কোন দিন খেলেনি; এতবড় নাম করা শক্তি শালী দলের বিপক্ষে তাদের খেলা দর্শনীয় এবং উ[illegible]

হয়েছিল। খেলার সমস্ত দিক বিচার করলে ঐ দিন মোহনবাগান ক্লাবের জয়লাভ এমন কি অযৌক্তিক হ'ত না। খেলার গোড়ার দিকে মোহনবাগানের যে বল দুর্ভাগ্যক্রমে বারের উপর দিয়ে গোল-কিপারকে পরাস্ত ক'রে চলে গেছে দর্শকেরা খেলা প্রসঙ্গে উল্লেখ করবার একটা বড় খোরাক পাবে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের এ বছরের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারে নি। তাদের আক্রমণ ভাগ এমন বিশৃঙ্খলভাবে যে খেলবে তা কেউ আশা করেনি। অনেকেই মোহনবাগানের সঙ্গে সুইডিস দলের খেলার ফলাফল দেখে আশা করেছিলেন ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ফরওয়ার্ডরা এদের সঙ্গে জোর লড়বে। কিন্তু আমরা হতাশ হয়েছি। সুইডিস দল প্রথম দিনের তুলনায় ঐদিন উচ্চশ্রেণীর ফুটবল খেলা দেখায়। আমাদের শেষ আশা ছিল আই এফ এ জিততে পারলে আমাদের মুখ রক্ষা হয়। কিন্তু তাও পূর্ণ হ'ল না। আই এফ এ-র দল গঠনে পক্ষপাতিত্ব দেখে সকলই নিরাশ হয়েছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে আই এফ এ-র নির্ব্বাচন যে সঠিক হয়নি তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ ব্যাপার নতুন নয়। খেলোয়াড় নির্ব্বাচন কমিটির সভ্যরা দলীয় স্বার্থে জড়িত, জাতীয় সম্মানের এবং স্বার্থের কথা ভাববার মত লোকের একান্ত অভাব সেখানে আছে। তাঁরা যে ক্ষমতাবান এটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন নিজ দলের বা দলীয় সভ্যের মনোনীত খেলোয়াড়ের স্বপক্ষে ভোট দিয়ে। আই এফ এ দলের খেলা সুইডিস দলের কাছে পরাজিত ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলার থেকে অনেক নিকৃষ্ট হয়েছে। দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে কোন বোঝাপড়া ছিল না। হাতে একদিন সময় ছিল ঐ দিন একটা প্রদর্শনীয় খেলায় আই এফ এ-র নির্ব্বাচিত দলটি প্র্যাকৃটিশ করলে একসঙ্গে না খেলার দোষ ত্রুটি অনেকটা স্খালন হ'ত, খেলোয়াড়দের মধ্যে আগে থেকে একটা বোঝাপড়া হ'ত। এ সমস্তর ব্যবস্থা করার ভার আই এফ এ-র। কিন্তু সভ্যরা দলের খেলোয়াড় মনোনীত করেই খালাস।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত